ইমাম আজমের আকিদা

(প্রাচীন সূত্রগ্রন্থাবলির আলোকে ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর ভাষ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা সংকলন)

মীযান হারুন

ইমাম আজমের আকিদা

[প্রাচীন সূত্রগ্রন্থাবলির আলোকে ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর ভাষ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা সংকলন]

মীযান হারুন

(দাওরা হাদিস) জামিআ মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া, বনানী, ঢাকা

(আরবি ভাষা ও সাহিত্য) জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা (আকবর কমপ্লেক্স)

(মাস্টার্স) দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

(ডিপ্লোমা, অনার্স, মাস্টার্স) আকিদা ও সমকালীন মতবাদ

কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সৌদি আরব

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

ইমাম আজমের আকিদা

লেখক	মীযান হারুন
প্রকাশকাল	এপ্রিল ২০২৩
সর্বস্বত্ব	লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ	আহমাদুল্লাহ ইকরাম
মুদ্রণ	জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স প্যারিদাস লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক	রাহনুমা প্রকাশনী ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা কওমী মার্কেট, ১ম তলা, ৬৫ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ১৬০০.০০ (ষোলো শ টাকা মাত্র)

EMAM AZOMER AKIDAH
Writer: Mizan Harun, Published by: Rahnuma Prokashoni
Price: Tk. 1600.00, US $ 10.00 only.

ISBN : 978-984-94989-3-9
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
web : www.rahnumabd.com

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর আকিদা কী? এই প্রশ্নের জবাবে পুরো বই নিবেদিত। ফলে এখানে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ইমাম আজম রহ.-এর আকিদা গুরুত্বপূর্ণ কেন? এই বিষয়ে কিছু কথা এখানে বলা জরুরি।

একজন তাবেয়ি। সালাফে সালেহিনের যুগের এক বরেণ্য ইমাম। আকিদার ময়দানের এক বীর সেনাপতি। মুসলিম উম্মাহর দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে সহায়ক চারটি মাযহাবের মাঝে সর্ববৃহৎ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। ইসলামের স্বর্ণযুগ থেকে কোটি কোটি মুসলমান যে মাযহাবের অনুকরণে নিজেদের দ্বীন পালন করে আসছেন, সেই মাযহাবের মূল ব্যক্তিত্ব, আহলুস সুন্নাহর আকিদার এক লড়াকু সিপাহসালারের আকিদা গুরুত্বপূর্ণ হবে, এটাই স্বাভাবিক। ফিকহের মতো আকিদার ক্ষেত্রেও মানুষ তাঁর অনুসরণ করবে, কুরআন-সুন্নাহ থেকে যে আকিদা তিনি আহরণ করেছেন, মানুষ সেটা গ্রহণ ও চর্চা করবে—এটাই যৌক্তিক। এজন্যই আমরা দেখতে পাই, তার সন্তান হাম্মাদ নিজে আকিদার গ্রন্থ রচনা না করে পিতার আকিদা বর্ণনা করেন (আল-ফিকহুল আকবার)। তার শাগরেদ আবু মুতি বলখি নিজে আকিদার স্বতন্ত্র গ্রন্থ না লিখে শায়খের আকিদা সংকলন করেন (আল-ফিকহুল আবসাত)। ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, যুফারের মতো জগদ্বিখ্যাত আলেমরাও আকিদার ক্ষেত্রে নিজেরা কোনো গ্রন্থ রচনা না করে ইমামের আকিদা অনুসরণ করতে থাকেন। তাদের গ্রন্থাবলিতে বর্ণনা করেন।

ইমাম আজমের ওফাতের প্রায় শত বছর পরে আগমন ঘটে ইমাম আবু জাফর ত্বহাবির। একপর্যায়ে তিনি নিজে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমাম হয়ে যান। তখনো নিজের পক্ষ থেকে কোনো আকিদা না লিখে ইমাম আবু হানিফার আকিদা পুনর্বিন্যস্ত করেন, যা পরবর্তীতে 'আকিদাহ ত্বহাবিয়্যাহ' নামে গোটা জগতজুড়ে খ্যাতি লাভ করে। আজও যা আহলুস সুন্নাহর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং সর্বাধিক পঠিত ও চর্চিত আকিদাগ্রন্থ। একইভাবে যখন ইমাম আবু মনসুর আল-মাতুরিদি

আগমন করেন, তিনিও আকিদার ক্ষেত্রে নিজস্ব ও 'স্বতন্ত্র মাযহাব' প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ইমাম আজমের মাযহাব গ্রহণ করেন এবং যুগের প্রয়োজনে সংযোজন-বিয়োজন-পরিবর্ধন-পরিমার্জনসহ সেটাকেই নিজের মাযহাব বলে ঘোষণা করেন। একইভাবে যখন ইমাম আবুল আলা সায়েদ নিশাপুরি আগমন করেন, তিনি আকিদার ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে বক্তব্য না দিয়ে ইমাম আজম ও তার শাগরেদদের বক্তব্যগুলো সংকলন করেন। তার 'আল-ইতিকাদ' পুস্তিকাটিও এ কারণে জগদ্বিখ্যাত হয়েছে। ফলে আহলুস সুন্নাহর বরেণ্য ইমাম হিসেবে ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর আকিদা সংকলন, সংরক্ষণ ও চর্চার কাজটি যুগ যুগ ধরে চলমান। আমাদের সময়ে আকিদাগত নানান বিতর্ক-বচসা, আহলুস সুন্নাহর শাখাগত বিভিন্ন মাসায়েলকে বড় বড় মাশাকেলে (সমস্যাতে) রূপদান করে সাম্প্রদায়িক কাদা ছোড়াছুড়ি এবং গোষ্ঠীগত টানাপোড়েনের যুগে ইমাম আজমের আকিদা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কারণ, একই বিষয়ে নানান বিরোধপূর্ণ বক্তব্যদাতারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে ইমামের আকিদার অনুসারী দাবি করছেন। তাদের আকিদাকে ইমামের আকিদা বলছেন। ফল দাঁড়াচ্ছে, বিভিন্ন সাংঘর্ষিক বক্তব্য আর বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ আকিদাকে এক ব্যক্তির আকিদা হিসেবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। এতে করে ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. একাধিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। নানা মতাদর্শের আবু হানিফা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ বাস্তবে তিনি এক ব্যক্তিই। এক আবু হানিফা। তার আকিদা এক ও অভিন্ন আকিদা।

এই কারণে আমরা পরবর্তীদের টানাটানির পরিবর্তে ফিরে গিয়েছি সেই প্রথম যুগে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে। তখন ইমাম আজম রহ. জীবিত। পড়াচ্ছেন। সফর করছেন। ইজতিহাদ করছেন। ইবাদতে ডুবে আছেন। সংগ্রাম করছেন। ভ্রান্তি খণ্ডন করছেন। আকিদার নানান বিচ্যুত ফিরকার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন! এই সব বিষয় আমরা কাছাকাছি থেকে দেখেছি। তার আকিদার বক্তব্যগুলো তার 'মুখ' থেকে গ্রহণ করেছি। তিনি আকিদা বিষয়ে যাদের কাছে চিঠি লিখেছেন, সেই চিঠিগুলো থেকে নিয়েছি। এভাবে আমরা ইমাম আজমের আকিদাগুলো পরবর্তীতে উদ্ভাবিত এসব মতাদর্শের কয়েক শত বছর আগের সূত্রাবলি থেকে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। যখন ভূপৃষ্ঠে সেগুলোর কোনোটির অস্তিত্ব ছিল না। যখন মানুষ জানত না, এসব মতাদর্শ একসময় পৃথিবীতে আসবে। ফলশ্রুতিতে আমরা আশা করছি, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর যে চিত্র ফুটে উঠেছে, সেটা

তার বাস্তব ও প্রকৃত চিত্র। এই গ্রন্থে যে আকিদা লেখা হয়েছে, সেটা ইমাম আজমের আকিদার বিশ্বস্ত ও আমানতপূর্ণ অনুলিপি। পরবর্তীতে উদ্ভাবিত সংঘাতপূর্ণ বক্তব্য ও মতাদর্শিক প্রভাব থেকে মুক্ত, ইনশাআল্লাহ।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আমাদের 'আকিদাহ ত্বহাবিয়্যাহ'র ব্যাখ্যার কথা উঠে আসছে। কয়েক মাস আগে ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রাহনুমা প্রকাশ করেছে। গ্রন্থটিকে ঘিরে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের অভূতপূর্ব সাড়া পেয়ে আমি সীমাহীন আনন্দিত। এটা ভেবে যে, উম্মাহমুখী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। আকিদার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিগূঢ় বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর বিভিন্ন ধারার মতপার্থক্যকে বিচ্যুতির পরিবর্তে বৈচিত্র্য হিসেবে দেখতে সক্ষম আলোকিত মানুষের মিছিল দিনে দিনে দীর্ঘ হচ্ছে। উপরন্তু ব্যক্তিগতভাবে দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য সম্মানিত মানুষ, শুভানুধ্যায়ী আমাকে দোয়া দিয়েছেন, সাহস জুগিয়েছেন, উম্মাহর নানা বৈচিত্র্যকে সঙ্গে নিয়ে পথচলার এই নিঃসঙ্গ সফরে সঙ্গী হবার আশ্বাস দিয়েছেন। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ 'ইমাম আজমের আকিদা' সেই পথচলার আরেক পর্ব। 'আকিদাহ ত্বহাবিয়্যাহ'র ব্যাখার মতো এই গ্রন্থও আমরা গোটা উম্মাহর জন্য লিখেছি। সাধারণ মানুষের সামনে সালাফের আকিদার বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে লিখেছি। নতুন কোনো মাসলাক প্রতিষ্ঠা কিংবা সুন্নাহর অন্তর্গত প্রচলিত বিশেষ কোনো মাসলাক বলিষ্ঠ বা বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে লিখিনি; বরং ইমাম আজম রহ.-এর আকিদা হানাফি মাযহাবের মৌলিক সূত্রগুলোতে যেমন পেয়েছি এবং তার শাগরেদ ও পরবর্তী বিশ্বস্ত অনুসারীদের কলমে যেভাবে দেখেছি, আমানতের সঙ্গে সেগুলোই তুলে ধরেছি।

রচনা-পদ্ধতি নিয়ে কথা বলতে গেলে সর্বাগ্রে বলতে হবে, গ্রন্থটি ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর আকিদার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে, যা নামেই সুস্পষ্ট। তিনি আকিদা বিষয়ে সহজ বা কঠিন, সরল বা জটিল যা কিছু বলেছেন, সামগ্রিকভাবে সবই তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে এখানে এমন কিছু বিষয়ের আলোচনা রয়েছে, যা আকিদার প্রাথমিক পাঠকের জন্য দুর্বোধ্য কিংবা কষ্টসাধ্য মনে হবে। তবে মাতৃভাষায় একাডেমিক স্তরে আকিদা বিষয়ক আলোচনা সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে এর বিকল্প ছিল না। এতে আকিদার উচ্চস্তরের শিক্ষার্থী এবং বিশেষজ্ঞ গবেষকরা উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ। তদুপরি সাধারণ পাঠকদের কথা ভেবে এবং 'আহলে সুন্নাতের সাধারণ আকিদা'র পূর্ণ চিত্র পেশ করার লক্ষ্যে কেবল ইমাম আজমের একক বক্তব্যের মাঝেই আক্ষরিক অর্থে সীমাবদ্ধ থাকা

হয়নি, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ আকিদা গ্রন্থে যেসব আলোচনার উপস্থিতি আবশ্যক— সবই আনা হয়েছে। এটা করতে গিয়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইমামের মতামত নেই কিংবা থাকলেও নিতান্তই সংক্ষিপ্ত, সেগুলো পরবর্তী হানাফি আলেমদের গ্রন্থাবলি থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণত—ঈমান, আল্লাহর সিফাত, তাকদির, কুরআন ইত্যাদি বিষয়ে ইমাম আজমের দীর্ঘ ও সবিস্তার মতামত পাওয়া গেলেও ফেরেশতা, নবি-রাসুল ইত্যাদি বিষয়ে তার বক্তব্যের পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। কারণ, এগুলো নিয়ে সে সময়ে বিচ্যুতি ছিল না। পরবর্তীতে যেহেতু এসব ক্ষেত্রেও নানাবিধ বিচ্যুতি তৈরি হয়েছে, যুগে যুগে হানাফি আলেমগণ সেগুলো নিয়ে কথা বলেছেন, ফলে প্রয়োজনের কথা ভেবে সেগুলোও তুলে ধরা হয়েছে। এটা করার সুবাদে হানাফি আলেমদের আকিদা বিষয়ক প্রকাশিত-অপ্রকাশিত নানান প্রাচীন গ্রন্থ ও দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিগুলোর বক্তব্য উঠে এসেছে, যা প্রথমবারের মতো পাঠকরা বাংলা ভাষায় পড়ার সুযোগ পাবেন। আলেমদের বক্তব্য উল্লেখের ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থানে হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ পেশ করা হয়েছে। কখনো প্রয়োজনে সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে।

ফলে 'ইমাম আজমের আকিদা' নাম হলেও এখানে স্রেফ ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, বরং সালাফে সালেহিন তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—ইমাম ছিলেন যেই সালাফের একজন, যেই সুন্নাহভিত্তিক আকিদার প্রধানতম ভাষ্যকার। ফলে প্রত্যেকটি মাসআলা আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমে কুরআন-সুন্নাহকে ভিত্তি ধরে আলোচনা করা হয়েছে; অতঃপর ইমাম আবু হানিফার আকিদার পঞ্চপুস্তক [আল-ফিকহুল আকবার, আল-ফিকহুল আবসাত, আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম, আর-রিসালাহ, আল-ওয়াসিয়্যাহ], তার বরাতে ইমাম আবু জাফর ত্বহাবির 'আকিদাহ ত্বহাবিয়্যাহ', সায়েদ নিশাপুরির 'আল-ইতিকাদ' ইত্যাদির মতো মৌলিক গ্রন্থগুলোর ভিত্তিতে ইমামের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে অন্যান্য হানাফি আলেমদের বক্তব্য আনা হয়েছে। অতঃপর মতাদর্শিক গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠে গোটা আহলুস সুন্নাহকে ধারণ করার লক্ষ্যে আকিদার যেসব মাসআলাতে ইমাম আজমের সঙ্গে অন্যান্য আলেমদের মতবিরোধ রয়েছে, সেগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। সবশেষে লেখকের পক্ষ থেকে সেসব মতপার্থক্যের কারণ ও প্রকৃতি আলোচনাপূর্বক স্থানভেদে কখনো সমন্বয়, আবার কখনো সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ মত নির্ধারণের কোশেশ করা হয়েছে।

আমরা কসুর করিনি। তবে পূর্ণতা আল্লাহ তাআলার গুণ। ফলে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ নির্ভুল করার কোশেশ থাকা সত্ত্বেও কিছু ভুল-বিচ্যুতি রয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই বিশেষজ্ঞ পাঠকের প্রতি সেই অনুরোধ করছি, যা 'আকিদাহ ত্বহাবিয়্যাহ'র ক্ষেত্রেও করেছি। সেটা হলো, এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট শরিয়ত-বিরুদ্ধ কোনো বক্তব্য, কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক কিংবা সালাফের পথ থেকে বিচ্যুত কোনো বিষয়, তথ্যগত কোনো ভুল-ভ্রান্তি চোখে পড়লে সেটা আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। আমরা নির্দ্বিধায় পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ। একইভাবে অনুরোধ করছি—দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, শাখাগত বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর নানান ধারার বৈচিত্র্য, বিভিন্ন আলেমদের ব্যক্তিগত গবেষণালব্ধ ফলাফল (ইজতিহাদ), লেখকের শব্দচয়ন ও বাকভঙ্গি—এগুলোকে যথাযথ স্থানে রেখে বিচার করতে, ভারসাম্য ও দরদপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতে। সেটা না করা হলে আহলুস সুন্নাহর অভ্যন্তরীণ বিভেদ ও আন্তঃসংঘাত বাড়বে। অর্থহীন বিবাদে উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

গ্রন্থটি প্রকাশের পেছনে কিছু মুখলিস মানুষের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাদের নাম-পরিচয় উহ্যই থাকুক। পাশাপাশি 'আকিদাহ ত্বহাবিয়্যাহ'র পরে এই গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রেও রাহনুমার আগ্রহ ও সহযোগিতার জন্য আমি তাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। হে অন্তর্যামী, আপনি সবাইকে জাযায়ে খায়র দিন। গ্রন্থটিকে সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন। উম্মাহর কল্যাণের উদ্দেশে নিবেদিত আমাদের শ্রম ও ঘাম কবুল করুন। অনন্তকাল এই গ্রন্থের কল্যাণ জারি রাখুন। ইমাম আজমসহ উম্মাহর সকল ধারার মুখলেস আলেমগণকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দিন। উম্মাহকে নেক ও এক রাখুন। আমিন।

ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ। ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।

মীযান হারুন
কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ
১১ রমজান ১৪৪৪ হিজরি
৩ এপ্রিল ২০২৩

বিষয়সূচি

আকিদা ও ইমাম আবু হানিফা

ঈমান-সম্পর্কিত আলোচনা

ঈমান ও আমল

ফেরেশতাদের উপর ঈমান

কিতাবের উপর ঈমান

নবি-রাসুলের উপর ঈমান

আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের উপর ঈমান

সুন্নাত ও বিদআত

বিবিধ মাসআলা

আত্মশুদ্ধি এবং উন্নত জীবন গঠন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আকিদা ও ইমাম আবু হানিফা

আকিদার পরিচয়

'আকিদা' (العقيدة) শব্দের শাব্দিক অর্থ জানাশোনা, ধারণা, বিশ্বাস ইত্যাদি। প্রায়োগিকভাবে আকিদার একটি অর্থ হলো : সংশয়মিশ্রিত ধারণা ও অনুমান। যেমন বলা হয়, 'প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস অনুযায়ী...'। আকিদার আরেকটি অর্থ হলো দৃঢ় ও অনড় বিশ্বাস, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।[১] আমরা যখন ইসলামি আকিদা এবং মুসলিম আকিদার কথা বলি, তখন দ্বিতীয় অর্থ তথা দৃঢ় বিশ্বাস উদ্দেশ্য নিয়ে থাকি।

ইসলামি পরিভাষায় 'আকিদা' শব্দটি 'ঈমান'-এর সমার্থক। ফলে আকিদার পারিভাষিক সংজ্ঞার্থ হলো : 'আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, নবি-রাসুল, আখেরাত এবং তাকদিরের ভালোমন্দের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ (ﷺ) কর্তৃক আনীত সকল অদৃশ্যের বিষয় (علم الغيب) স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেওয়া এবং সকল দৃশ্যমান মৌলিক বিধিবিধান (أصول الدين وأحكام الشريعة)-এর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা।

যুগে যুগে আকিদা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। একটি নাম হলো 'আল-ফিকহুল আকবার' (শ্রেষ্ঠ ফিকহ), যেটা সর্বপ্রথম ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. ব্যবহার করেছেন। আরেকটি নাম হলো 'ইতিকাদ' (বিশ্বাস), যেটা ইমাম আজম তাঁর 'আল-ফিকহুল আকবার' ও 'আল-ফিকহুল আবসাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আরেকটি নাম হলো 'উসুলুদ্দিন' (দ্বীনের যাবতীয় মৌলিক বিষয়)। এটাও ইমাম আজমের 'আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম'-সহ বিভিন্ন গ্রন্থে বিদ্যমান। 'আকিদা' শব্দটিও সালাফে সালেহিন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। ইমাম আবু জাফর তহাবি রহ. তাঁর আকিদার শুরুতে এ শব্দটি উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নামই রেখেছেন 'আকিদাহ তহাবিয়্যাহ'। কখনো কখনো

---

১. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, আবুল মুনতাহা মাগনিসাভি (১০৩)।

এটাকে 'ইলমুত তাওহিদ ওয়াস সিফাত' (আল্লাহর একত্ববাদ ও গুণাবলিবিষয়ক শাস্ত্র) বলা হয়।[২] আরেক দল মুহাক্কিক আলেম এটাকে 'ইলমুল কালাম' (তর্কশাস্ত্র) হিসেবে অভিহিত করে থাকেন।[৩]

আকিদার গুরুত্ব

আকিদা দ্বীনের মূল ভিত্তি, মানবদেহের মাথার মতো। এটা ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকবে। এখানে সংকট দেখা দিলে বিপর্যয় অনিবার্য। এর কারণ সুস্পষ্ট। মানুষের বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে গেলে কাজকর্মও এলোমেলো হয়ে যায়। কেউ কোনোকিছুতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে না পারলে সে কাজটাও করতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। ফলে হালাল-হারামের মাসআলা জানার আগে আকিদা জানা আবশ্যক। ইমাম আজম রহ. বলেন, **"দ্বীন সম্পর্কে 'তাফাক্কুহ' তথা জ্ঞান অর্জন বিধিবিধানের তাফাক্কুহ অর্জনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিপুল পরিমাণ ইলম অর্জনের চেয়ে শ্রেফ কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে সেটুকু ইলম অর্জন করা ঢের উত্তম।"**[৪] তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বোত্তম ফিকহ (জ্ঞানশাস্ত্র) কোনটি? তিনি বললেন, **"ঈমান শেখা। শরিয়ত, সুন্নাত, হদ-কিসাস ও উম্মাহর ইমামদের মতামত ইত্যাদি জানা। আকিদা (الاعتقادات) সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাই 'আল-ফিকহুল আকবার' তথা সর্বোত্তম জ্ঞান।"**[৫]

আকিদার গুরুত্ব বোঝাতে এবং আমলের চেয়ে ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট করতে ইমাম আজম রহ. একটি প্রায়োগিক উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, **'শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন চোখের অনুকরণ করে, একইভাবে আমলও ইলমের অনুসরণ করে। ফলে ইলম অর্জন জরুরি। অজ্ঞতার সঙ্গে বিপুল আমলের পরিবর্তে ইলমের আলোকে সামান্য আমলও অধিক উপকারী। এর উদাহরণ হলো মরুভূমিতে সফরকারী দুই মুসাফিরের মতো, যাদের একজনের কাছে স্বল্প পাথেয় আছে কিন্তু সে পথ চেনে; আরেকজনের কাছে প্রচুর পাথেয় ও রসদ আছে কিন্তু সে পথ চেনে না। এই দুই ব্যক্তির মাঝে নিঃসন্দেহে প্রথম ব্যক্তি অধিক সৌভাগ্যবান। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,** ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

---

২. দেখুন : শরহুল আকায়িদ আন-নাসাফিয়্যাহ, সাদ তাফতাযানি (১৪)।

৩. দেখুন : তালখিসুল আদিল্লাহ লিকাওয়াইদিত তাওহিদ, আবু ইসহাক সাফফার বুখারি (৬৫)।

৪. আল-ফিকহুল আবসাত, আবু হানিফা (৪০)।

৫. আল-ফিকহুল আবসাত (৪০)। আল-উসুলুল মুনিফাহ, কামালুদ্দিন বায়াযি (৮)।

অর্থ : 'বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? কেবল বিবেকবানরাই উপদেশ গ্রহণ করে।' [যুমার : ৯][৬]

কারণ, আকিদা বিশুদ্ধ থাকার পরে আমলের ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও একদিন সুপথপ্রাপ্তির আশা করা যায়, পরকালে ক্ষমা ও মুক্তির প্রত্যাশা রাখা যায়। কিন্তু যার মৌলিক আকিদায় বিচ্যুতি থাকবে, তার আমল যত সুন্দর হোক, সেটা কাজে আসবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا﴾ অর্থ : 'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।' [ফুরকান : ২৩] আল্লাহ আরেক আয়াতে বলেন, ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ﴾ অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে (মুরতাদ হয়ে) যাবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।' [বাকারা : ২১৭] অন্য আয়াতে বলেন, ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَـٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ﴾ অর্থ : 'যে ব্যক্তি ঈমান প্রত্যাখ্যান করে, তার সকল আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' [মায়িদা : ৫] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ﴾ অর্থ : 'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে—যদি আপনি আল্লাহর শরিক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হয়ে পড়বে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।' [যুমার : ৬৫]

ইমামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আকিদার (সবিস্তার ও খুঁটিনাটি) আলোচনা জরুরি কেন? সাহাবায়ে কেরাম রাজি. তো এমন করেননি। তারা আকিদার যাবতীয় বিষয় নিয়ে বিস্তৃত ও বিস্তারিত কথা বলেননি। তাহলে আমরা কেন বলব? ইমাম জবাবে বলেন, **'আমরা যদি সাহাবাদের যুগে তাদের পর্যায়ে থাকতাম, তাহলে তাঁরা যা করতেন যতটুকু করতেন, আমাদের ক্ষেত্রেও তা শতভাগ প্রযোজ্য হতো। কিন্তু আমাদের যুগ তাদের যুগ নয়। আমরা যেসব সমস্যার মোকাবিলা করছি, সেগুলো তাদের যুগে ছিল না। আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সামনে এসে পড়েছি, যারা**

---

৬. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম, আবু হানিফা (৯)।

আমাদের আঘাত করে, আমাদের রক্তকে হালাল মনে করে। তাহলে তাদের মাঝে কারা সঠিক কারা বেঠিক সেটা না জেনে বসে থাকা যাবে? আমরা আমাদের জানমালের হেফাজত না করে বসে থাকব? সাহাবায়ে কেরামের যুগে তারা ছিল না; ফলে তাদের হাতিয়ার হাতে নিতে হয়নি। আমাদের যুগে তারা আছে; ফলে হাতিয়ার হাতে নিতে হবে। তা ছাড়া, মানুষ মতভেদপূর্ণ এসব বিষয় শুনে মুখ বন্ধ রাখলেও হৃদয় বন্ধ রাখতে পারে না। ফলে হৃদয়ে এগুলো প্রভাব ফেলে। দুটো বিষয় শুনলে যেকোনো একটার দিকে মন চলে যায়। মনের মাঝে এগুলো নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলতে থাকে। আল্লাহ না করুন, যদি মিথ্যা ও বাতিলের দিকে মন ঝুঁকে পড়ে, তবে তো সে বাতিলপন্থিদের পছন্দ করতে শুরু করবে। আর যখন তাদের পছন্দ করবে, তখন সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। বিপরীতে যদি হকের দিকে হৃদয় ঝুঁকে পড়ে, তবে হকপন্থিদের বন্ধু হিসেবে গণ্য হবে।'[৭]

ইমামের কথায় স্পষ্ট যে, ইসলামি আকিদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের অন্যতম মৌলিক কারণ হলো বিশ্বাসগত বিচ্যুতি ও পদস্খলন থেকে সুরক্ষিত থাকা। অন্ধকার চিনলে আলোতে পথ চলা সহজ হয়। মন্দ সম্পর্কে জানলে মানুষ ভালোটা গ্রহণ করতে পারে। আলো-আঁধার ও ভালোমন্দের পার্থক্যই যদি কারও জানা না থাকে, সে ভালো ও আলো গ্রহণ করবে কী রূপে? একইভাবে ঈমানের বিপরীতে কুফর, তাওহিদের বিপরীতে শিরক-সহ যাবতীয় ভ্রান্ত আকিদা সম্পর্কে জানা না থাকলে মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত আকিদার জালে ফেঁসে যেতে পারে, বিশুদ্ধ আকিদা খুইয়ে ফেলতে পারে। এখানেই সহিহ আকিদা শেখার তাৎপর্য প্রকাশ পায়।

ইমামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ভুল-শুদ্ধ, হকপন্থি ও বাতিলপন্থিদের সম্পর্কে যদি জ্ঞান না থাকে, তাহলে কি কোনো ক্ষতি আছে? তিনি বললেন, **'হয়তো এক দিক থেকে ক্ষতি হবে না, কিন্তু দশ দিক থেকে ক্ষতি হবে। যে ক্ষেত্রে ক্ষতি হবে না তা হলো, তাদের কর্ম সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে না। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে ক্ষতি হবে তন্মধ্যে কয়েকটি হলো : এক. তুমি মূর্খ গণ্য হবে। কারণ, তুমি ভুল-শুদ্ধের মাঝে ফারাক করতে পারবে না। দুই. অন্যদের মতো নিজেও হয়তো একসময় সন্দেহে পতিত হবে এবং সেখান থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাবে না। কারণ, তুমি ভুল না শুদ্ধ সেটাই জানো না। ফলে সেখান থেকে পরিত্রাণের চেষ্টাও করবে না। তিন. কাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে আর কাকে ঘৃণা করবে, সেটা বুঝতে**

---

৭. প্রাগুক্ত (৯-১০)।

পারবে না। কারণ, তুমি কে হক আর কে বাতিল সেটাই জানো না।'[৮] ফলে নিজের ঈমান রক্ষার জন্যই বিশুদ্ধ আকিদা শিখতে হবে।

আকিদা শেখা মুস্তাহাব নয়, ওয়াজিব

অনেকে আকিদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনকে নফল বা মুস্তাহাব পর্যায়ের মনে করেন। তাদের ধারণা—আকিদা জেনে কী হবে? নামায-রোযা, ইবাদত-আমল নিয়ে থাকাই যথেষ্ট। অথচ এটা সম্পূর্ণ গলত কথা। আকিদার বিষয়ে নিরপেক্ষ স্থানে থাকার সুযোগ নেই। অন্যকথায়, ঈমান ও কুফর, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝামাঝি থাকার অবকাশ নেই; বরং ঈমান গ্রহণ করতে হবে, কুফর বর্জন করতে হবে; তাওহিদ মেনে নিতে হবে, শিরক প্রত্যাখ্যান করতে হবে। স্পষ্ট যে, কোনো কাজ করতে গেলে সে বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা প্রধান শর্ত। তাই ঈমান গ্রহণ যেমন আবশ্যক, ঈমান সম্পর্কে জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। কুফর থেকে বিরত থাকা যেমন আবশ্যক, কুফর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাও আবশ্যক। ফলাফলে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আকিদার জ্ঞান লাভ করাও আবশ্যক (ওয়াজিব)।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষকে ঈমান, আকিদা ও তাওহিদ শেখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, ﴿فَاعْلَمْ اَنَّه لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ اللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْوٰكُمْ﴾ অর্থ : 'সুতরাং জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার এবং মুমিন নর-নারীদের ক্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।' [মুহাম্মাদ : ১৯] আরও বলেন, ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ ۚ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ অর্থ : 'আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশ-সহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অতএব, তোমরা না জানলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো।' [নাহল : ৪৩]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজের ও সাহাবাদের জীবনে এই নীতি বাস্তবায়িত করেছেন। তিনি যখনই সাহাবাদের কোথাও পাঠাতেন, সর্বপ্রথম মানুষকে ঈমানের দিকে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। মুআজ ইবনে জাবালকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় তাকে বললেন, 'তুমি আহলে কিতাব (তথা একটি খ্রিষ্টান) সম্প্রদায়ের কাছে যাবে। সর্বপ্রথম তাদের তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করবে। যখন তারা তাওহিদ শিখে ফেলবে, তখন

---

৮. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১০)।

তাদের জানাবে—আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যখন তারা নামায পড়া শুরু করবে, তাদের জানাবে— আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। যখন তারা মেনে নেবে, তখন তাদের থেকে সেটা গ্রহণ করবে। কিন্তু মানুষের প্রিয় ও মূল্যবান জিনিস নেওয়া থেকে বিরত থাকবে...।'[৯]

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাসুলুল্লাহর দেখানো পথেই হেঁটেছেন। তারা সবকিছুর আগে আকিদা শিখেছেন। বিশুদ্ধ সূত্রে সাহাবি জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা কিশোররা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কুরআন শেখার আগে ঈমান শিখেছি, অতঃপর কুরআন শিখেছি। তখন আমাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।'[১০] তাবারানির বর্ণনায় এসেছে, 'আর আজ তোমরা আগে কুরআন শিখছ। ঈমান শিখছ পরে!'[১১] বাইহাকি হুযাইফা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমরা কুরআন শেখার আগে ঈমান শিখেছি। আর আজ তোমরা ঈমান শেখার আগে কুরআন শিখছ।'[১২] সাহাবাদের উলটো পথে চলা আজও অব্যাহত আছে। মুসলিম উম্মাহ আজ সবকিছু শিখছে, স্রেফ ঈমানটাই শিখছে না।

ফলে মানবজীবনের সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো তাওহিদ শেখা, ঈমান ও আকিদা শেখা। এক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করার সুযোগ নেই। ইমাম আজম রহ. বলেন, **'যখন কারও মনে তাওহিদের কোনো সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে যেটা সত্য, সেটার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা করার জন্য কোনো আলেম পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে দেরি করা যাবে না। নীরব বসে থাকলেও পার পাওয়া যাবে না। যদি নিরপেক্ষ হয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে বসে থাকে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।'**[১৩] কারণ, ঈমানের জরুরি বিষয়গুলোতে ঈমান আনা আবশ্যক। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ঈমানের পথে অন্তরায়, সত্যায়ন ও স্বীকৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ফলে এসব বিষয়ে কেউ নিরপেক্ষ থাকলে সেটা কুফরের

---

৯. বুখারি (কিতাবুত তাওহিদ : ৭৩৭২)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৯)।

১০. সুনানে ইবনে মাজা (আবওয়াবুস সুন্নাহ : ৬১)। মুসতাদরাকে হাকেম (কিতাবুল ঈমান : ১০২)।

১১. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ : ২/১৬৫; হাদিস নং : ১৬৭৮)।

১২. সুনানে কুবরা, বাইহাকি (কিতাবুস সালাত : ৫৩৭৪)।

১৩. আল-ফিকহুল আকবার, আবু হানিফা (৮)। জামেউল মুতুন, গুমুশখানভি (৩০)।

পর্যায়েই থাকবে, ঈমান গণ্য হবে না। ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি কোনো জায়গা নেই। তাই ঈমানবিষয়ক জ্ঞান লাভ করা ফরয। একইভাবে ঈমানের বিপরীত তথা কুফরবিষয়ক জ্ঞান লাভ করাও ফরয। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

এবার আমরা আকিদা শেখার গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু মুহাক্কিক আলেমের মতামত উল্লেখ করব, যাতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আকিদা কোনো নতুন বিষয় নয়। আজকের যুগে এসে আমরাই আকিদা শিখতে এবং চর্চা করতে বলছি এমন নয়; বরং যুগে যুগে আমাদের উলামায়ে কেরাম আকিদা শেখার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন।

- ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদি (৩৩৩ হি.) লিখেন, 'আল্লাহ সম্পর্কে এবং তাঁর নির্দেশাবলি সম্পর্কে জানার জন্য দলিল-প্রমাণ ও গবেষণা প্রয়োজন। ফলে যতটুকু জানলে মানুষের কল্যাণ এবং যতটুকু না জানলে অকল্যাণ রয়েছে, ততটুকু জানা এবং সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা আবশ্যক।'[১৪]

- আবু সালামাহ সমরকন্দি (৩৪০ হি. পূর্ব) বলেন, 'উসুলুদ্দিন (তথা দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো) ও আহকামুদ্দিন (তথা হালাল-হারাম, বিধিবিধান) হলো সত্যকে জানা, (আল্লাহর) নির্দেশ পালন করা, নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকা। আর এগুলো জ্ঞানের আলো ব্যতীত বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। সত্যকে জানতে হলে, শরিয়তের বিধিবিধান মানতে হলে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ কারণে এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয।'[১৫]

- আল্লামা আবু ইসহাক সাফফার বুখারি (৫৩৪ হি.) বলেন, 'আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। এটা শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। ...**উসুলুদ্দিন** তথা দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান হলো সকল জ্ঞানের আধার ও ভান্ডার; দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। যে ব্যক্তি এই ইলম থেকে বঞ্চিত থাকল, সে সবকিছু থেকেই বঞ্চিত। কারণ, এটা মৌলিক, গোড়া; বাকিগুলো গৌণ, শাখা-প্রশাখা। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা কুরআন শেখার আগে তাওহিদ শিখতাম। আর তোমরা এখন আগে কুরআন শেখো, এরপর তাওহিদ শেখো।' ...তাফসিরবিদদের মতে, কুরআনের আয়াতসংখ্যা প্রায় ছয়

---

১৪. আত-তাওহিদ, আবু মনসুর মাতুরিদি (১০২)।

১৫. জুমাল মিন উসুলিদ্দিন, আবু সালামাহ সমরকন্দি (১৩)।

হাজার দুই শত ছত্রিশটি। এর মাঝে শরিয়তের আহকাম (হালাল-হারাম)-সম্পর্কিত আয়াত প্রায় পাঁচ শত। বাকি সবগুলো তাওহিদ, শিক্ষণীয় ঘটনা, কাফেরদের বিরুদ্ধে নবি-রাসুলদের ঈমানি সংগ্রাম ও মুনাযারা (বিতর্ক) ঘিরে। এর দ্বারা বোঝা যায়, তাওহিদের ইলমই সর্বোত্তম ইলম। তা ছাড়া, নিজের দ্বীন রক্ষা ও বিভ্রান্তি-বিচ্যুতি থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্যও এই ইলম অর্জন করা আবশ্যক।'[১৬]

- আলাউদ্দিন উসমান্দি (৫৫২ হি.) লিখেন, 'উসুলুদ্দিন তথা দ্বীনের মৌলিক বিষয় হলো সঠিক আকিদা বর্ণনা করা, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। এর মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে জান্নাতে যাওয়া।'[১৭]

- সুলতানুল উলামা খ্যাত ইয ইবনে আবদুস সালাম (৬৬০ হি.) বলেন, 'আলেমরা নবিগণের উত্তরসূরি। সুতরাং নবিদের উপর যেমন সত্য প্রকাশ আবশ্যক ছিল, আলেমদের উপরও আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে আর সৎকর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করবে। বস্তুত তারাই সফলকাম।' [আলে ইমরান : ১০৪] তাজসিম ও তাশবিহ (দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদ—অন্যকথায়, আকিদাকেন্দ্রিক ভ্রান্তি) বড় ধরনের অসৎ কাজ। আর সবচেয়ে সৎ ও পুণ্যের কাজ হলো তাওহিদ ও তানযিহ (বিশুদ্ধ দেহবাদমুক্ত একত্ববাদ)। সালাফে সালেহিন প্রথমে এ ব্যাপারে দীর্ঘ কথা বলেননি; কারণ, তাদের যুগে বিদআত প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীকালে যখন বিদআত প্রকাশিত হয়, তখন তারাই সেসবের খণ্ডনে ময়দানে নেমে পড়েন; সব ধরনের বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি ঠেকিয়ে দেন। কাদারিয়্যাহ, জাহমিয়্যাহ, জাবরিয়্যাহ-সহ সকল ভ্রান্ত ফিরকার বিরুদ্ধে তারা লড়াই করেন।[১৮]

আকিদা শেখার ন্যূনতম পরিমাণ

আকিদা শেখার গুরুত্ব স্পষ্ট হওয়ার পরে প্রশ্ন আসতে পারে, আকিদা ঠিক কতখানি শিখতে হবে? একজন দাঈ ও ইমামের আকিদা সম্পর্কে যতটা জ্ঞান

---

১৬. তালখিসুল আদিল্লাহ, সাফফার বুখারি (২৮-৩২)।

১৭. লুবাবুল কালাম, আলাউদ্দিন উসমান্দি (পাণ্ডুলিপি : ৩৪ ডান)।

১৮. রাসায়েল ফিত তাওহিদ, ইয ইবনে আবদুস সালাম (১৮)। এসব ফিরকার পরিচয় সামনে উল্লেখ করা হবে।

থাকা আবশ্যক, সমাজের একজন সাধারণ মুসল্লির কি ততটা জ্ঞান থাকা আবশ্যক? তা ছাড়া, আবশ্যক বলা হলেও সবার জন্য তো সমান পর্যায়ে শেখা সম্ভবও নয়। একজন আলেম যতখানি আকিদা শিখতে পারবেন, একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে ততখানি শেখা সম্ভব হবে না। বোঝা গেল, আকিদা শেখার আবশ্যকতা, পর্যায় ও স্তর সবার জন্য সমান নয়। ফলে 'আকিদা শেখার পরিমাণ' সম্পর্কে কিছু কথা বলা আবশ্যক মনে করছি।

সংক্ষেপে প্রথমেই যে বিষয়টি বুঝে নিতে হবে সেটা হলো, আকিদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন জরুরি হলেও আকিদার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন জরুরি নয়। কারণ, আকিদার আলোচনায় এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলো দ্বীনের কোনো মৌলিক মাসআলা নয়, ঈমানের জরুরি বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন—আল্লাহর সিফাতসংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনা, ঈমান ও কুফরের বিস্তৃত সংজ্ঞায়ন, প্রকারভেদ ও ব্যাখ্যা, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আসমানি কিতাবসমূহ, পরকাল ইত্যাদির সবিস্তার বিবরণ ঈমানের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। সবার উপর এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা আবশ্যক নয়। বরং এ ব্যাপারে মোটা দাগে ধারণা থাকাই যথেষ্ট।[১৯] তবে যদি কোনো বিষয় নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়, সে সন্দেহ দূর করা আবশ্যক। অন্যকথায়, ঈমানের ছয় রুকন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকাই যথেষ্ট, বিস্তারিত জানা আবশ্যক নয়। যেমন—নবি-রাসুল সম্পর্কে ঈমান আনা আবশ্যক; কিন্তু প্রত্যেক নবির নাম, তাঁর বংশপরিচয় ও গোত্রের নাম, তাঁর দাওয়াতের বিস্তারিত ইতিহাস জানা আবশ্যক নয়। তবে যদি কোনো নবি নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়, তখন তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে বিভ্রান্তি দূর করা জরুরি।

ইমাম আজম আবু হানিফাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ঈমান ও কুফর সম্পর্কে অজ্ঞতার বিধান কী? তিনি বললেন, **'মানুষ মুমিন হিসেবে গণ্য হয় আল্লাহকে চেনা ও স্বীকার করার মাধ্যমে। একইভাবে কাফের হয় আল্লাহকে অস্বীকার করার মাধ্যমে। ফলে কেউ যখন আল্লাহকে রব ও মাবুদ হিসেবে স্বীকার করবে, তাওহিদকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবে, আল্লাহর কাছ থেকে আগত সবকিছু মেনে নেবে, তার জন্য ঈমান কিংবা কুফরের সংজ্ঞার্থ জানা থাকা জরুরি নয়। কারণ, সে জানে ঈমান ভালো আর কুফর মন্দ, ঈমান কল্যাণ আর কুফর অকল্যাণ। এটুকু জানা ও মানাই যথেষ্ট। যেমন—কেউ মধু ও মাকাল ফল দুটোই মুখে দিয়ে পরীক্ষা**

---

১৯. দেখুন : ফাতাওয়া তাতারখানিয়্যাহ (১৮/৩)।

করে মধুর মিষ্টতা আর মাকালের তিক্ততা অনুভব করল। তার জন্য মধু কিংবা মাকালের নাম বা সংজ্ঞার্থ জানা জরুরি নয়। তার ব্যাপারে এ কথাও বলা যাবে না যে, সে মিষ্টতা বা তিক্ততা চেনে না। বেশির চেয়ে বেশি এটুকু বলা যাবে যে, সে এগুলোর সংজ্ঞার্থ জানে না। একই কথা ঈমান ও কুফরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যখন কেউ জানবে যে, ঈমান ভালো আর কুফর মন্দ, এটুকু জানলে ও মানলেই যথেষ্ট হবে। আলাদা করে ঈমান ও কুফরের সংজ্ঞার্থ জানার দরকার নেই। কেউ এই সংজ্ঞার্থ না জানলেই তাকে অস্বীকারকারী বলা যাবে না।'[২০]

বরং এগুলো নিয়ে যখন অর্থহীন বিতর্কের আশঙ্কা থাকবে, তখন এগুলো নিয়ে আলোচনা বর্জন করাই কর্তব্য হবে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, "তোমরা দ্বীন নিয়ে বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করো। কেননা, দ্বীন স্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা কিছু ফরয বিধান দিয়েছেন, কিছু সুন্নাত দিয়েছেন। কিছু সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। হালাল বলে দিয়েছেন। হারাম স্পষ্ট করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾ অর্থ : 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।' [মায়িদা : ৩] সুতরাং কুরআনে যা হালাল করা হয়েছে, সেটা হালাল হিসেবে গ্রহণ করো। কুরআনে যা হারাম করা হয়েছে, সেটা হারাম মানো। কুরআনের স্পষ্ট বিষয়গুলোর উপর আমল করো। অস্পষ্ট (মুতাশাবিহ) বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকো। যদি দ্বীন নিয়ে বিতর্কের মাঝে তাকওয়া থাকত, তবে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর পরে সাহাবায়ে কেরাম সবার আগে সেটা করতেন। তারা কি দ্বীন নিয়ে বিবাদ করেছেন? হ্যাঁ, তারা ফিকহ নিয়ে আলোচনা করেছেন, ফারায়েজ নিয়ে মতভেদ করেছেন। নামায, হজ, হালাল-হারাম, তালাক ইত্যাদি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। কিন্তু কেউ দ্বীন (তথা আকিদা) নিয়ে বিতর্ক করেননি। এ বিষয়ে বিবাদ করেননি। সুতরাং তোমরা তাকওয়ার উপর থাকো। সুন্নাতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকো। এটুকুই যথেষ্ট হবে। পরবর্তী লোকেরা দ্বীন নিয়ে যেসব ঝগড়া সৃষ্টি করেছে, যেগুলো নিয়ে বিবাদ-বিতর্কে জড়িয়েছে, সেগুলো থেকে দূরে থাকো। কারণ, সুন্নাতের অনুসরণের মাঝেই মুক্তি।"[২১]

---

২০. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২৯)।

২১. ফাযায়িলু আবি হানিফাহ, ইবনে আবিল আওয়াম (৩২৮-৩২৯)।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ অর্থ : 'যখন আপনি তাদের আমার আয়াতসমূহ নিয়ে উপহাস করতে দেখবেন, তখন তাদের থেকে সরে যান যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে আর বসবেন না।' [আনআম : ৬৮] আল্লাহ চাইলে কুরআনের মাঝেও বিতর্ক ও বিবাদ অবতীর্ণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সেটা করেননি; বরং নিষেধ করেছেন। সুতরাং বিতর্ককারীদের সঙ্গ পরিহার করো। তাদের সঙ্গে বসো না। যদি তারা গায়ে পড়ে বিতর্ক করে, তবে কুরআনের আইন মানো : ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ অর্থ : "যদি তারা আপনার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে আপনি বলুন, 'আমি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারীগণও।' আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের ও নিরক্ষরদের বলুন, 'তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ?' যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে নিশ্চয়ই তারা হেদায়াত পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ বান্দাদের সবকিছু দেখছেন।" [আলে ইমরান : ২০] এখানে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে, বিতর্ক করতে বলা হয়নি।'[২২]

বরং ইমাম আবু ইউসুফ থেকে **'দ্বীন নিয়ে বিতর্ক নিষিদ্ধ'** শিরোনামে একটি পুস্তিকাতে এসেছে, 'দ্বীন নিয়ে বিতর্ক বিদআত। বাতিলপন্থিরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যা করে, সেগুলো বিদআত। যদি তাতে কোনো কল্যাণ থাকত তবে সাহাবিরা এবং সাহাবিদের সন্তানরা এগুলো আগে করতেন। কারণ, তারা এগুলো করতে বেশি সক্ষম ছিলেন। এগুলো সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখতেন; দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং সুন্নাতের সুরক্ষা ও প্রচারে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। যদি তাতে কোনো কল্যাণ থাকত, তারা সবার আগে সেটা অর্জনের চেষ্টা করতেন। একদল দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে বিদআতি হয়ে গেছে। আরেক দল দ্বীন থেকে উদাসীনতা দেখিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। আহলে সুন্নাতের অবস্থান এই দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি সিরাতে মুস্তাকিমের উপর প্রতিষ্ঠিত।'[২৩]

---

২২. দেখুন : ফাযায়িলু আবি হানিফাহ, ইবনে আবিল আওয়াম (৩২৮-৩২৯)।

২৩. দেখুন : আল-ইতিকাদ, সাইয়েদ নিশাপুরি (১৭৪-১৭৫)।

তথাপি প্রশ্ন থেকে যায়—তাহলে **ঈমানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সীমারেখা কী?** ইসলাম, ঈমান, তাওহিদ এবং আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন কতটুকু জানা জরুরি? কতগুলো সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি?

ইমাম আজমসহ আমাদের ইমামগণ বিভিন্ন গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, এখানে যার সবকিছু উল্লেখ করা সম্ভব নয়। ফলে আমরা কেবল তাদের আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরার চেষ্টা করব।

(ইমাম মুহাম্মাদের ছাত্র) আবু সুলাইমান জুযজানি থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ইমাম আজমের কাছে এসে বলল, (দ্বীনের) বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের বিভিন্ন কথা শুনে আমি পেরেশান হয়ে পড়েছি। কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক বুঝতে পারছি না। তাই আমি চাই, আপনি আমাকে এমন একটা পথ দেখান, যার উপর অটল থাকলে আমি কাল জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পেতে পারি। আপনি নিজের জন্য যা পছন্দ করেন আমাকেও তা-ই বলুন। আমার বিশ্বাস, আপনাকে অনুসরণ করলে আমি নিন্দিত হব না। ইমাম বললেন, **'আমি এমন একদল মানুষ পেয়েছি (সাহাবা ও তাবেয়িন) যারা বলতেন, "যে ব্যক্তি 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসুল।'—এমন সাক্ষ্য দেবে, সে আল্লাহর একনিষ্ঠ (বান্দা) হয়ে যাবে। আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহর জন্য শরিক ও প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করা থেকে পবিত্র থাকবে। এভাবে আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার পরে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত যাবতীয় ফরয ইবাদত, যথা—নামায, রোযা, যাকাত ও হজ ইত্যাদির স্বীকৃতি দিতে হবে। সেগুলোর উপর আমল করতে হবে। কুফর ও শিরক থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। যদি কেউ এ সবকিছুর উপর অবিচল থেকে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে আল্লাহর ওলি গণ্য হবে। আর যদি কেউ শাহাদাতের উপর অটল থাকে, কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি করে, তবে তার পরিণতি আল্লাহর উপর সমর্পিত থাকবে—চাইলে তিনি তাকে বিচ্যুতির শাস্তি দেবেন অথবা চাইলে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহর রাসুলের কোনো সাহাবির সমালোচনা করবে না। তাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহর কাছে সঁপে দেবে। কারণ, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন, 'তারা এক গত সম্প্রদায়। তারা যা করেছে সেটার ফল তারা পাবে। তোমরা যা করছ সেটার ফল তোমরা পাবে।' তাকদিরের সবকিছুর উপর ঈমান আনবে। আল্লাহর ব্যাপারে কোনো অন্যায়-অশোভন কথা বলবে না। নিজের জন্য যা পছন্দ করো, মানুষের জন্য তা পছন্দ করবে। নিজের জন্য যা অপছন্দ করো, মানুষের জন্য তা**

অপছন্দ করবে। দ্বীনের ক্ষেত্রে মনগড়া কথা বলবে না। আল্লাহর উপর নিজের ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেবে না। তাঁর কোনো নির্দেশের উপর আপত্তি করবে না। কারণ, তিনি যা করেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন না, মানুষ যা করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" [আম্বিয়া : ১২৩][২৪]

ইমাম আজমের উপরের কথাগুলো মূলত ঈমানের ছয় রুকনের সারমর্ম। এটুকুই দ্বীন। এটুকুর উপর অবিচল থাকলেই পরকালে মুক্তি মিলবে, আল্লাহর দিদার লাভ হবে। জান্নাত পাওয়া সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। এর বাইরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানলে ভালো, না জানলে অসুবিধা নেই। কিন্তু বিস্তারিত জানতে গিয়ে যদি বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতিতে নিমজ্জিত হতে হয়, দ্বীন বিকৃতির শিকার হয়, তবে সেটা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্য।

এ বক্তব্য ইমাম আজমের নিজের নয়, বরং তিনি—যেমনটা শুরুতেই বলেছেন—এগুলো সাহাবি ও তাবেয়িদের বলতে শুনেছেন। এ জন্য আমরা একাধিক হাদিসে ইমামের বক্তব্যের সত্যতা দেখি। যেমন—তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত; নজদ থেকে এলোকেশী (সাধারণ) এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে।' সে বলল, আর কিছু? তিনি বললেন, 'না। তবে চাইলে অতিরিক্ত (নফল নামায পড়তে পারো)।' অতঃপর রাসুল (ﷺ) বললেন, 'রমযানের রোযা রাখবে।' সে বলল, আর কিছু? রাসুল বললেন, 'না। তবে চাইলে অতিরিক্ত (নফল রোযা রাখতে পারো)।' অতঃপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন, 'যাকাত দেবে।' সে বলল, আর কিছু? তিনি বললেন, 'না। তবে অতিরিক্ত (নফল সদকা করতে পারো)।' তখন লোকটি এ কথা বলে চলে গেল : আল্লাহর শপথ! আমি এগুলোর উপর কিছু বাড়াব না, কমাবও না। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'যদি সত্য বলে, তবে সে সফল!'[২৫]

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত; এক গ্রাম্য সাহাবি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যেটা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করব। তিনি বললেন, 'আল্লাহর ইবাদত

---

২৪. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (৯৫-৯৬)।

২৫. বুখারি (কিতাবুল ঈমান : ৪৬)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৪)।

করবে। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। ফরয নামাযগুলো আদায় করবে। ফরয যাকাত দেবে। রমযানের রোযা রাখবে।' লোকটি বলল, ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আমি এর উপর কিছু বাড়াব না। সে চলে যাওয়ার পরে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'যদি কেউ জান্নাতি কাউকে দেখতে চায় তবে যেন তাকে দেখে!'[২৬]

আল্লাহর দ্বীনের সারল্য দেখুন! আল্লাহর দ্বীনের সহজ প্রকৃতি দেখুন! দেখুন জান্নাতের পথ কত সংক্ষিপ্ত! দ্বীনের এসব মৌলিক বিষয় মেনে নেওয়াই যথেষ্ট। বাকি সব অতিরিক্ত। সবার উপর অপরিহার্য নয়। ইমাম আজমের উপরের বক্তব্য আর এই হাদিসগুলোর সামঞ্জস্য বিস্ময়কর, কিন্তু অদ্ভুত নয়। কারণ, সকল সালাফে সালেহিনের মানহাজ এটা। জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে পরবর্তী সময়ে বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর কারণে।

কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের এই আলোকিত মানহাজের উপরই হেঁটেছেন আহলে সুন্নাতের অন্যান্য ইমাম। ফলে এবার আমরা এ ব্যাপারে আলেমদের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করব :

- ফখরুল ইসলাম বাযদাবি (৪৮২ হি.) লিখেন—ঈমান ও ইসলামের অর্থ হলো আল্লাহর সকল গুণের সত্যায়ন করা এবং স্বীকৃতি দেওয়া; তাঁর শরিয়তের সকল বিধান কবুল করে নেওয়া। এটার দুটো পর্যায় রয়েছে। এক. মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত বিশ্বাস—মাতা-পিতা ও পরিবারের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ইসলামের বিধান। দুই. দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সকল গুণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। এটাই প্রকৃত কামালত তথা পূর্ণাঙ্গতা; কিন্তু এটা সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। কেননা, আল্লাহ তায়ালার গুণাবলির তফসিলি জ্ঞানের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমস্তরের নয়। ফলে কামালত দ্বিতীয় পর্যায় থেকে প্রথম পর্যায়ে স্থানান্তরিত হবে। ইজমালিভাবে সত্যায়ন ও স্বীকৃতিই ঈমানের ক্ষেত্রে কামালত গণ্য হবে; ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ-সহ জানা জরুরি হবে না। এ কারণে মুসলমানকে (ঈমানের তফসিল) প্রশ্ন না করে তার কাছে বরং ঈমান তুলে ধরে বলা হবে, 'ঠিক আছে?' যদি সে বলে, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে', তাহলে তার ইসলাম পূর্ণ হয়ে যাবে। এটা যদি কোনো আলামত দ্বারা প্রকাশ পায়, তবে জিজ্ঞাসা করাও নিষ্প্রয়োজন। যেমন—রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যখন কোনো

---

২৬. বুখারি (কিতাবুয যাকাত : ১৩৯৭)।

ব্যক্তিকে তোমরা জামাতে (নামাযে) অভ্যস্ত দেখবে, তার ঈমানের সাক্ষ্য দেবে।' আরেক হাদিসে বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়বে, আমাদের কিবলা অভিমুখী হবে, আমাদের যবাইকৃত পশু খাবে, তোমরা তার জন্য ঈমানের সাক্ষ্য দাও।' (কারণ, এগুলোই প্রমাণ করে সে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর শরিয়তকে স্বীকার করে। তফসিল জানা আবশ্যক নয়।) হ্যাঁ, যদি কারও সামনে তফসিল উপস্থাপন করে বলা হয়, 'ঠিক আছে?' তদুপরি সে অজ্ঞতা জাহির করে, তবে সে মুমিন গণ্য হবে না।[২৭]

- আবুল ইউসর বাযদাবি বলেন, 'আহলে সুন্নাতের মতে ইজমালি ঈমান যথেষ্ট, তফসিলি ঈমান আবশ্যক নয়। ফলে কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসুল, তাঁর নিয়ে আসা দ্বীন আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য—এটুকু মেনে নেয়, তাতেই যথেষ্ট। তবে যদি কোনো মাসআলাতে সন্দেহ-সংশয় তৈরি হয়, সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং সন্দেহ দূরীভূত করা আবশ্যক।'[২৮]

- আলাউদ্দিন আবদুল আযিয বুখারি (৭৩০ হি.) লিখেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহকে সত্যায়ন করবে, মুখে তাঁর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেবে, একত্ববাদ (তাওহিদ), জ্ঞান (ইলম), কুদরত, জীবন-সহ আল্লাহর সকল গুণ, পরম করুণাময় (রহমান), দয়ালু (রহিম), সর্বশক্তিমান (কাদের), মহাজ্ঞানী (আলিম) ইত্যাদি সকল সুন্দর নামের স্বীকৃতি দেবে, সে মুসলিম হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ তায়ালা যেহেতু আমাদের ইন্দ্রীয়-অনুভবের ঊর্ধ্বে, ফলে এমন কিছু নাম ও গুণ দরকার, যার মাধ্যমে তাকে চেনা সম্ভব। আল্লাহর পাশাপাশি আল্লাহর ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, রাসুল, পুনরুত্থান, তাকদিরের ভালোমন্দে বিশ্বাসও দরকার। আর এ সবকিছু মুসলিম পরিবারে এবং ইসলামি সমাজে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান থাকে। একটা শিশু যখন এখানে বড় হয়, এগুলোর সাক্ষ্য এবং এগুলোর মাধ্যমে ইবাদতের উপরই বড় হয়। এটা হলো সত্যায়ন ও স্বীকৃতির এক পর্যায়। আরেকটা পর্যায় হলো দলিল-প্রমাণের মাধ্যেমে ইয়াকিনি পদ্ধতিতে আল্লাহকে

---

২৭. উসুলুল বাযদাবি (১৬৭)। প্রথম হাদিসটি তিরমিযি (আবওয়াবু তাফসিরিল কুরআন : ৩০৯৩) এবং ইবনে মাজাতে (আবওয়াবুল মাসাজিদ ওয়াল জামাত : ৮০২) এসেছে। আর দ্বিতীয় হাদিসটি বুখারি (কিতাবুস সালাত : ৩৯১), নাসায়ি (কিতাবুল ঈমান ওয়া শারায়িউহু : ২/৫০১২)-সহ একাধিক গ্রন্থে এসেছে।

২৮. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৫৪)।

জানা ও মানা; পরিবার ও সমাজ অনুসরণের মাধ্যমে নয়। এটা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে ইজমালিভাবে ঈমানকেই গ্রহণযোগ্য ও কামালত ধরা হবে। ঈমান সাব্যস্ত করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হবে।'[২৯]

- এগুলো ইমাম তহাবিরও সেই বক্তব্যের ব্যাখ্যা, যেটা তিনি আকিদাতু তহাবিয়্যাহতে এভাবে দিয়েছেন, 'আমরা আমাদের কিবলার অনুসারীদের ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম-মুমিন হিসেবে আখ্যায়িত করব, যতক্ষণ তারা নবি কারিম (ﷺ) আনীত সকল বিষয়ের স্বীকৃতি দেবে, তাঁর সকল বক্তব্য এবং সংবাদকে সত্যায়ন করবে।' তিনি আরও বলেন, 'একজন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয় না, যতক্ষণ না সে সেসব মূলনীতি অস্বীকার করে, যেগুলোর স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে ঈমানে প্রবেশ করেছিল।'[৩০] প্রথম বাক্যে সকল বিষয়ে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, ঈমানের সবগুলো বিষয় জানা ও শেখা সবার জন্য জরুরি; বরং ইজমালি সাক্ষ্য দেবে। এটার প্রমাণ হচ্ছে ইমামের দ্বিতীয় বাক্য। অর্থাৎ, স্বাভাবিক অবস্থায় (ঈমানের ছয় রুকনের) ইজমালি সাক্ষ্যদানের মাধ্যমেই প্রত্যেকে মুমিন গণ্য হবে। কিন্তু যদি এমন কোনো কথা বলে বা কাজ করে, যা ঈমানের তফসিলি আলোচনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তবে সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

- আবদুল আযিয বুখারি আরও লিখেন, "যদি কাউকে বলা হয়—তুমি কি বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ তায়ালা এক, তাঁর কোনো শরিক নেই, তিনি শক্তিমান, তিনি জ্ঞানী, তিন সর্বশ্রোতা, তিনি সর্বদ্রষ্টা, তিনি সবকিছুর ইচ্ছা ও ফয়সালাকারী ইত্যাদি...? অথবা বলা হয়—তুমি কি বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ সকল পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী, আল্লার রাসুল মুহাম্মাদ (ﷺ) যা-কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন সব সত্য? প্রশ্নের জবাবে যদি সে 'হ্যাঁ' বলে, তার ঈমানকে বিশুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। এসব সাক্ষ্যের তফসিলি আলোচনা তার কাছে চাওয়া হবে না। তবে এটা স্বাভাবিক অবস্থায়। ফলে সে ব্যক্তি যদি ইসলামবিরোধী কোনো আকিদা লালন করে, তবে তার জন্য স্রেফ 'হ্যাঁ' বলা যথেষ্ট হবে না, বরং সেই আকিদা পরিবর্তন করা জরুরি হবে।"[৩১]

২৯. কাশফুল আসরার, আলাউদ্দিন বুখারি (২/৫৮৭)।

৩০. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২০-২১)।

৩১. কাশফুল আসরার (২/৫৮৭)।

■ সাফফার বুখারি বলেন, 'কেউ যদি ঈমানের ছয়টি বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, সে মুমিন গণ্য হবে। তবে বিস্তারিত বিশ্বাস এই সংক্ষিপ্ত ঈমানের মূলনীতিতে হতে হবে। ফলে কেউ ছয়টি বিষয়ের উপর ঈমান আনার পরে যদি বিস্তারিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহকে সাদৃশ্য দেয়, তবে সে মুমিন গণ্য হবে না। তাই এসব সংক্ষিপ্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা জানা জরুরি।'[৩২]

অর্থাৎ, যদি কারও মনে কোনো অভিযোগ-আপত্তি না আসে, তবে তার জন্য ইজমালি ঈমানই যথেষ্ট। কিন্তু যখন মনে সন্দেহ-সংশয় দানা বাঁধবে, তখন সেটা দূর করা আবশ্যক হবে। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির সন্দেহ-সংশয় কিংবা অবস্থার প্রেক্ষিতে ঈমান আনার 'নূন্যতম সীমারেখা' নির্ধারিত হবে, বিস্তৃত ও সংকুচিত হবে। প্রত্যেকের জন্য একই পর্যায়ের 'ন্যূনতম সীমারেখা' নির্ধারণ করা যাবে না।

উপরন্তু সকল মাসআলাতেই এক ব্যক্তির জন্য একই পর্যায়ের 'ইজমালি ঈমান' বা ন্যূনতম সীমারেখা নির্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। যেমন—আল্লাহর ক্ষেত্রে ন্যূনতম সীমারেখা হলো তাঁর তাওহিদ তথা এক লা-শরিক রব ও ইলাহ হওয়ার বিশ্বাস রাখা। আল্লাহর মৌলিক সিফাতগুলো, যেমন—তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি রিযিকদাতা, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি সর্বজ্ঞানী, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত ইত্যাদি জানা এবং পূর্ণ বিশ্বাস রাখা। সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সব ধরনের সাদৃশ্য নাকচ করা। তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করা। স্রেফ 'আল্লাহ বলতে একজন আছেন' এটা ন্যূনতম সীমা কিংবা যথেষ্ট পরিমাণ নয়। ফেরেশতার ক্ষেত্রে ন্যূনতম সীমারেখা হলো তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। কিন্তু ফেরেশতা বলতে যদি কেউ কিছুই না চেনে, ফেরেশতা ও শয়তান যদি কারও কাছে সমান অর্থ বহন করে, তবে সেটাকে ন্যূনতম ঈমান বলে না। আসমানি কিতাবের ক্ষেত্রে নূন্যতম সীমা হলো সেগুলোর উপর ইজমালি ঈমান রাখা। কিন্তু কুরআন ও ত্রিপিটকের মাঝে পার্থক্যজ্ঞান না থাকা ন্যূনতম পরিমাণ নয়। রাসুলের ব্যাপারে ঈমানের ন্যূনতম সীমারেখা হলো তাঁর ব্যাপারে জানা থাকা। কেউ যদি বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসুল, কিন্তু তিনি কুরাইশ বংশের নাকি পারসিক, তিনি হেজাযে ছিলেন নাকি খোরাসানে সেটা জানি না, অথবা তিনি কি জীবিত আছেন নাকি মৃত তাও জানি না, যদি কেউ অজ্ঞতা কিংবা গ্রহণযোগ্য ওজরের কারণে বলে থাকে, তবে তার উপর এগুলো জানা আবশ্যক

---

৩২. তালখিসুল আদিল্লাহ (১৫০-১৫১)।

হবে। কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃতভাবেই এগুলো না জানে, জানার আগ্রহ ও চেষ্টাও না থাকে অথবা জানার পরও এমন কথা বলে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।[৩৩]

ন্যূনতম সীমা নির্ধারণে সংশয় নিরসন : ইমাম আজম রহ.-এর নামে 'নূন্যতম' জ্ঞানের সীমা নির্ধারণে বিভিন্ন ভুল বক্তব্য প্রচার করা হয়েছে, যা থেকে তিনি মুক্ত। এটা মূলত মুহাদ্দিস ও ফকিহদের সংঘাতের কুফল ছিল, যার কিছু চিত্র আমরা সামনে বিভিন্ন স্থানে পেশ করব। যেমন—তাঁর ব্যাপারে বর্ণনা করা হয় : তাকে মক্কাতে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সে ব্যক্তির বিধান কী যে বিশ্বাস করে আল্লাহ শূকর হারাম করেছেন, কিন্তু শূকর বলতে কী উদ্দেশ্য সেটা তার জানা নেই? তিনি বললেন, 'সে মুমিন!' তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো : সে ব্যক্তির বিধান কী যে বিশ্বাস করে আল্লাহ কাবার হজ ফরয করেছেন, কিন্তু সে মক্কার কাবার ব্যাপারে নিশ্চিত নয়; বরং অন্য কোথাও কাবা হতে পারে? আবু হানিফা বললেন, 'সেও মুমিন!' তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি কেউ বলে, আমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আল্লাহর রাসুল মানি; কিন্তু তিনি আফ্রিকানও হতে পারেন, তার ব্যক্তির বিধান কী? আবু হানিফা বললেন, 'সেও মুমিন!'[৩৪]

এটা ইমাম আজমের উপর ভিত্তিহীন অপবাদ। কোনো সাধারণ আলেমও এটা বলতে পারে না, তাহলে ইমাম কীভাবে বলবেন? এটা ন্যূনতম ঈমান হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এমন হলে মদ খেয়ে বলা হবে, কুরআনে মদ বলতে অন্যকিছু বোঝানোও হতে পারে! ব্যভিচার করে বলবে, কুরআনে এই ধরনের ব্যভিচার নিষিদ্ধ নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা দিয়ে বলা হবে, কুরআনে শিরক বলতে কী বোঝানো হয়েছে আমি নিশ্চিত নই! এটা চরমপন্থি মুরজিয়াদের বক্তব্য হতে পারে। কিন্তু ইমাম আজম রাহিমাহুল্লাহ এ ধরনের আকিদা থেকে পবিত্র। ইবনে আবিল আওয়াম বর্ণনা করেন—আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, **'যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কাবা ছাড়া অন্য কোনো দিকে ফিরে নামায পড়ে, ঘটনাক্রমে সেটা কাবার দিকে হয়ে গেলেও উক্ত ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।'**[৩৫] কারণ, সে কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধান অস্বীকার করেছে। ফলে কাবা

---

৩৩. দেখুন : আল-ফাসল, ইবনে হাযাম (৩/১৩৯)। আত-তাবসির ফি মাআলিমিদ দ্বীন, তাবারি (১৪৯)।

৩৪. মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন, আশআরি (১/১১৯)। খতিবও তারিখে বাগদাদে উক্ত বক্তব্য নকল করেছেন (১৫/৫০৭)।

৩৫. ফাযায়িলু আবি হানিফা, ইবনে আবিল আওয়াম (৩৬৯)।

সম্পর্কে জানে অথচ কোন কাবা উদ্দেশ্য সেটা না জানলেও মুমিন থাকবে এমন হতে পারে না।

মোটকথা, উসুলুদ্দিন তথা দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে এটুকু জ্ঞান অর্জন প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব, যা তাকে তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শিরক ও কুফর থেকে সুরক্ষিত রাখে। ফলে বিস্তারিত জ্ঞান ব্যতীত কেউ তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারলে মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু সংশয়ের মাঝে পড়লে, তাওহিদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো বিশ্বাস মনে এলে সেটা দূর করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ন্যূনতম সীমারেখা নেই। বরং বিশুদ্ধ তাওহিদের সুরক্ষা এবং কুফর-শিরক প্রতিহত করতে পারাই ন্যূনতম সীমারেখা। ইমাম আজমের বক্তব্যও উক্ত কথার সাক্ষী। তিনি বলেন, **'যখন কারও মনে তাওহিদের কোনো সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে যেটা সত্য সেটার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা করার জন্য কোনো আলেম পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে দেরি করা যাবে না। নীরব বসে থাকলেও পার পাওয়া যাবে না। যদি নিরপেক্ষ হয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে বসে থাকে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।'**[৩৬]

হ্যাঁ, যদি ইমামের উপরের (আপত্তিকর) বক্তব্যগুলো প্রমাণিত ধরাও হয়, তবে সেটা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। সে ব্যাখ্যা হলো, বাস্তবেই যদি কারও এসব বিষয়ে অজ্ঞতার ক্ষেত্রে যৌক্তিক কারণ থাকে, গভীর জঙ্গল কিংবা জনবিচ্ছিন্ন দ্বীপে বসবাস কিংবা যেকোনো গ্রহণযোগ্য ওজরের কারণে কেউ উপরের বিষয়গুলো কিংবা দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে সেটা তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ওজর (অপারগতা) গণ্য হবে। এটা বিভিন্ন হাদিস এবং ইমামদের বক্তব্য থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। যেমন—আবু সাইদ খুদরি ও আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, (পূর্বযুগে) 'এক ব্যক্তি তার নফসের উপর অত্যধিক জুলুম করেছিল (অর্থাৎ, গুনাহে লিপ্ত ছিল)। মৃত্যু ঘনিয়ে এলে সে তার পুত্রদের বলল, মৃত্যুর পর আমাকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করবে। অতঃপর ছাইগুলো গুঁড়া করে বাতাসে উড়িয়ে দেবে। কারণ, আল্লাহ যদি আমাকে ধরতে পারেন, তবে তিনি আমাকে এত কঠোর শাস্তি দেবেন, যা অন্য কাউকে দেননি। সত্যি সত্যিই যখন তার মৃত্যু হলো, ওসিয়ত মোতাবেক সেভাবেই তাকে পুড়িয়ে ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হলো। অতঃপর আল্লাহ জমিনকে

---

৩৬. আল-ফিকহুল আকবার (৮)।

সে ব্যক্তির ছাইগুলো একত্র করার আদেশ দিলেন (জমিন তৎক্ষণাৎ ছাইগুলো একত্র করল এবং) লোকটি (জীবিত হয়ে) দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এমন করলে কেন? সে বলল, হে প্রভু, আপনার ভয়ে! আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।'[৩৭]

উক্ত হাদিসটিতে গভীরভাবে লক্ষ করে দেখুন। উক্ত ব্যক্তি দ্বীনের একাধিক মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তার এ কাজের মাধ্যমে প্রকারান্তরে সে আল্লাহর 'সর্বশক্তিমান' হওয়া, 'মৃতকে জীবিত করা', 'শারীরিক পুনরুত্থান' ইত্যাদির মতো একাধিক অত্যাবশক আকিদার বিষয় নাকচ করেছে। সে ভেবেছে, স্বাভাবিক অবস্থায় তাকে দাফন করা হলে আল্লাহ তাকে সশরীরে পুনরুত্থিত করতে সক্ষম। কিন্তু লাশ পুড়িয়ে ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দিলে আল্লাহ তার শরীর পুনর্গঠিত করতে পারবেন না। ফলে তাকেও জীবিত করা সম্ভব হবে না! এ ধরনের বিশ্বাস না থাকলে উক্ত ব্যক্তি এমন কাজ করত না। এগুলো সুস্পষ্ট কুফরি আকিদা। তথাপি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারণ, সে যা করেছে প্রথমত অজ্ঞতা এবং দ্বিতীয়ত আল্লাহর ভয়ে করেছে। তার অজ্ঞতার কারণ সম্ভবত যৌক্তিক ছিল। সে কারণে আল্লাহ তার ভয়কে মূল্যায়ন করে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

ইবনে আবদিল বার লিখেন, "উক্ত ব্যক্তি যে মুমিন ছিল সেটা স্পষ্ট। কিন্তু 'আল্লাহ যদি আমাকে ধরতে পারেন'—এ কথার দ্বারা বোঝা যায়, সে আল্লাহর 'কুদরত' (তথা তিনি সর্বশক্তিমান) সিফাত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। এক্ষেত্রে প্রথম যুগের (অর্থাৎ সালাফের) আলেমদের বক্তব্য হলো, যদি কেউ আল্লাহর সকল সিফাত জানে ও মানে কিন্তু কিছু সিফাত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে তাতে কাফের হবে না। কারণ, অজ্ঞতা কুফর নয়; কুফর হলো সত্যকে জেনেবুঝে প্রত্যাখ্যান করা।'[৩৮]

কেবল পূর্বযুগে নয়, দ্বীনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে এমন না জানার চিত্র সাহাবাদের মাঝেও বিদ্যমান। এ ব্যাপারে একাধিক হাদিস রয়েছে, যার সবগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। যেমন—কোনো কোনো সাহাবি তাকদিরের বিষয়ে রাসুলুল্লাহকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। সেসব প্রশ্নে স্পষ্ট হয় যে, তারা এগুলো

---

৩৭. বুখারি (কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া : ৩৪৮১)। মুসলিম (কিতাবুত তাওবা : ২৭৫৭)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবি সাইদ খুদরি : ১১২৬৫)।

৩৮. আত-তামহিদ (১৮/৪২)।

জানতেন না। ফলে অজ্ঞতাকে কুফর বলা হলে সাহাবাদেরও উত্তর জানার আগে কাফের বলতে হবে। ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসুল, কারা জান্নাতি আর কারা জাহান্নামি এটা কি (আল্লাহর) জানা বিষয়? রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, তাহলে আমল করে কী লাভ? রাসুল (ﷺ) বললেন, 'প্রত্যেককে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে।'[৩৯]

এ ধরনের প্রশ্ন অন্যান্য সাহাবা থেকেও বর্ণিত। যেমন—আয়েশা রাযি. প্রশ্ন করেন, 'মানুষ যখন কোনোকিছু গোপন করে, আল্লাহ তায়ালা কি সেটা জানতে পারেন?' রাসুলুল্লাহ (ﷺ) জবাবে বলেন, 'হ্যাঁ।'[৪০]

খেয়াল করে দেখুন, আল্লাহর ইলম তথা জ্ঞান ও তাকদির নিয়ে না জানার কারণেই সাহাবাগণ এ ধরনের প্রশ্ন করেছেন। কেউ তাকদিরের কথা জানতেন না। কেউ মানুষের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ জ্ঞাত কি না সেটা জানতেন না। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের জানিয়ে দিয়েছেন। অথচ জানানোর আগে তারা কাফের হয়ে যাননি। সুতরাং মূল ঈমানের অধিকারী থাকার কারণে সাহাবাদের ক্ষেত্রে যদি ঈমানের কোনো মৌলিক রুকন এবং আল্লাহর মৌলিক কোনো সিফাত জানার আগ পর্যন্ত অজ্ঞ থাকা বৈধ হয় এবং এ জন্য তারা সে সময় কাফের সাব্যস্ত না হন, বোঝা গেল, এটা অন্যদের ক্ষেত্রেও বৈধ। অন্যরাও এতে কাফের সাব্যস্ত হবে না। অর্থাৎ, বাস্তবেই গ্রহণযোগ্য কোনো কারণে যদি কেউ দ্বীনের কোনো মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে দ্বীনের অন্য সকল বিষয় জানে ও মানে, তবে আশা করা যায়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।[৪১]

ইবনে কুতাইবা (২৭৬ হি.) লিখেন, 'মুসলিম ব্যক্তি কিছু সিফাতের ক্ষেত্রে ভুল করে ফেলতে পারে। এর জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না। খাত্তাবি লিখেন, সে এগুলো অস্বীকার করেনি, বরং অজ্ঞ ছিল। কিন্তু মৌলিক ঈমান থাকাতে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'[৪২] যেমনটা আমরা বলেছি যে, এটা অসম্ভব নয়। কারণ, আহলে ফাতরাহ (যার কাছে দ্বীন বা নবিদের দাওয়াত পৌঁছয়নি)

৩৯. মুসলিম (কিতাবুল কদর : ২৬৪৯)। আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৭০৯)।

৪০. মুসলিম (কিতাবুল জানায়েয : ৯৭৪)। নাসায়ি (কিতাবুল জানায়েয : ১/২০৩৬)।

৪১. দেখুন : আত-তামহিদ, ইবনে আবদিল বার (১৮/৪২-৪৭)।

৪২. ফাতহুল বারি (৬/৫২৩)।

কিংবা জনবিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ বা জঙ্গলের অধিবাসীদের জন্য এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া মোটেও বিস্ময়কর নয়। ফলে এমন ব্যক্তি কিংবা এমন ব্যক্তির মতো যেকোনো ব্যক্তির যৌক্তিক ওজর অজ্ঞতার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। আর তাই 'ইজমালি ঈমানের ন্যূনতম পরিমাণ' মৌলিক ছয়টি বিষয় নির্ধারণ করা হলেও ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির আলোকে বিধান ভিন্ন হতে পারে।

এক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের ব্যাপক দায়িত্ব রয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের যেন দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সব ধরনের জাহালাত ও অজ্ঞতা থেকে রক্ষা করা যায়, সে মহান আমানত আলেমদের কাঁধে রয়েছে। আমরা আমাদের নিজেদের চারপাশে দৃষ্টি দিলে এমন অনেক লোককে পাব যারা দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, ভুল ধারণা ও বিচ্যুতিতে লিপ্ত। এক্ষেত্রে তাদের যৌক্তিক ওজরের চেয়ে অলসতা, ইচ্ছাকৃত গাফিলতি, আলেমদের দাওয়াত ও তাবলিগের ক্ষেত্রে ত্রুটি বিভিন্ন বিষয় দায়ী। ফলে উপরের হাদিসগুলোর উপর ভিত্তি করে অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এমন আশা নিয়ে নির্লিপ্ত বসে থাকা নির্বুদ্ধিতা। কারণ, এ ধরনের ক্ষমা পাওয়ার জন্য 'গ্রহণযোগ্য ওজর' থাকা জরুরি। অথচ অলসতা, ইচ্ছাকৃত গাফিলতি গ্রহণযোগ্য ওজর নয়।

আহলে সুন্নাতের পরিচয়

ইজমালি তথা সংক্ষিপ্ত ঈমানের ব্যাপারে গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত। ফলে ঈমানের ছয়টি রুকন (আল্লাহ, ফেরেশতা, নবি-রাসুল, আসমানি কিতাব, আখেরাত ও তাকদির) বিষয়ে সামগ্রিকভাবে সকল মুসলিম ঈমান রাখে। কেউ এগুলোর কোনোটা সরাসরি নাকচ করলে সে মুমিনই থাকবে না। ফলে এগুলোর উপর ঈমান আনার আবশ্যকতার ক্ষেত্রে গোটা মুসলিম উম্মাহর মাঝে দ্বিমত নেই। কিন্তু এসব বিষয়ের যখন তফসিলি ব্যাখ্যার কথা আসে, তখনই জটিলতা তৈরি হয়। কারণ, এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়েই মুসলিম উম্মাহর মাঝে চরম মতভেদ-মতবিরোধ, বিবাদ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত তৈরি হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর অন্তর্গত অনেক ফিরকা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। ফলে আমরা দেখব :

ঈমানের প্রশ্নে বেশকিছু সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়েছে। কেউ কেউ ঈমানকে স্রেফ জানার নাম দিয়েছে। কেউ বিপরীতে ঈমানকে স্রেফ মুখের স্বীকৃতি আখ্যা দিয়েছে। কেউ কোনো গুনাহ করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে মুমিনদের তালিকা থেকে ফেলে

দিয়ে কাফের বানিয়ে দিয়েছে। কেউ আবার বলেছে, যত গুনাহই করুক, যত অপরাধে জড়াক, কালিমা পড়লেই সে খাঁটি মুমিন গণ্য হবে! কুফর বিষয়টা তারা সম্পূর্ণ ভুলেই গেছে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে বিশাল একদল লোক গোমরাহ হয়ে গিয়েছে। কেউ আল্লাহকে সৃষ্টির মতো বানিয়ে ফেলেছে; আবার কেউ তাঁর সকল গুণ নাকচ করে তাকে 'অস্তিত্বহীন' (মাদুম) করে দিয়েছে। আরেক দল তাঁর উপর এমন অনেক শব্দ প্রয়োগ করেছে, তাঁর শানে এমন আকিদা ও বিশ্বাস রেখেছে, যেগুলো তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। কেউ আল্লাহর তাওহিদ জানতে না পেরে শিরকে লিপ্ত হয়েছে, কেউ সুন্নাহ চিনতে না পেরে বিদআতে ডুবে গেছে।

ফেরেশতার ক্ষেত্রে নানান সম্প্রদায় নানা প্রকারের বিচ্যুতির শিকার হয়েছে; নবি-রাসুলদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। নবিদের মুজিযা অস্বীকার করেছে। ওলিদের নবি-রাসুলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দিয়েছে। আরেক দল নবিদের দার্শনিক মনে করেছে। নবিদের সহচর তথা সাহাবাদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছে—একজনকে ভালোবেসে আরেকজনকে শত্রু বানিয়ে ফেলেছে।

আসমানি কিতাবের ক্ষেত্রে কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়েছে। আল্লাহর কুরআন, যা তাঁর সিফাত বা গুণ, সেটাকে সৃষ্টি বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর 'কালাম' (কথা) সিফাত নিয়ে উম্মাহ শতাব্দের পর শতাব্দ সংক্ষুব্ধ ও শতধাবিভক্ত থেকেছে, আজও আছে।

পরকালসম্পৃক্ত অনেক বিষয় বিভিন্ন ফিরকা অস্বীকার করেছে। কবরের শাস্তি, দৈহিক পুনরুত্থান, মিযান (দাঁড়িপাল্লা), হিসাব, হাউযে কাউসার, পুলসিরাত, আল্লাহর দিদার—এ সবকিছু অস্বীকার করেছে কিংবা নিদেনপক্ষে অপব্যাখ্যা করেছে। অনেকে জান্নাত-জাহান্নামের বর্তমানে বিদ্যমান থাকা এবং এগুলোর সৃষ্টি হওয়াকে অস্বীকার করেছে। কেউ কেউ জাহান্নামকে অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল বলেছে।

তাকদিরের ক্ষেত্রে অনেকে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে—একদল মানুষকে পূর্ণ স্বাধীন স্বীকৃতি দিয়ে তাকদির অস্বীকার করেছে; আরেক দল মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। তাকদিরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে মানুষকে মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতার মতো বানিয়ে ফেলেছে, যা বাতাসের সঙ্গে ভেসে বেড়ায়, যার নিজের নড়াচড়ার কোনো ক্ষমতা নেই।

এভাবে দ্বীনের প্রত্যেকটি মাসআলায় কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে। বিভিন্নমুখী প্রান্তিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে, যারা কেউ একেবারে ডানে আবার কেউ একেবারে বামে চলে গেছে; মাঝামাঝি থাকেনি। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা এ সবকিছু জানতেন, এ জন্য কুরআনে আমরা দেখব বারবার মধ্যপথ থেকে সরে ডানে-বামে চলে যেতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একদিন মাটিতে একটি সোজা দাগ দিলেন। বললেন, এটা আল্লাহর পথ। অতঃপর সেটার ডানে ও বামে অনেকগুলো দাগ দিলেন। বললেন, এগুলোর প্রত্যেকটি পথের উপর শয়তান দাঁড়িয়ে ডাকছে। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন, ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ অর্থ : 'আর এ পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করো। অন্য পথগুলোতে যেয়ো না। গেলে তা তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন, যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হও।' [আনআম : ১৫৩][৪৩]

আকিদাকে কেন্দ্র করে যে মুসলিম উম্মাহর মাঝে অসংখ্য ফিরকার জন্ম হবে সেটা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ওহির মাধ্যমে আগেই জেনেছেন। ফলে তিনি সাহাবাদের এ ব্যাপারে বারবার সতর্ক করেছেন। পরবর্তী উম্মাহর জন্য নসিহত রেখে গিয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। ইরবাজ ইবনে সারিয়াহ রাযি. থেকে বর্ণিত, একদিন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষে আমাদের দিকে ফিরে গুরুগম্ভীর ওয়াজ করলেন। তাতে অশ্রু প্রবাহিত হলো, হৃদয় কম্পিত হলো। কেউ বলল, হে আল্লাহর রাসুল, মনে হচ্ছে আপনি বিদায়ের ওয়াজ করলেন! আমাদের প্রতি আপনার ওসিয়ত কী? রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'আমি তোমাদের তাকওয়া ও আনুগত্যের ওসিয়ত করছি। একজন হাবশি দাসকেও তোমাদের শাসক বানানো হলে তার আনুগত্য করবে। কেননা আমার পরে তোমরা প্রচণ্ড মতভেদ দেখতে পাবে...।'[৪৪]

বরং তিনি মুসলিমরা কতগুলো ফিরকাতে বিভক্ত হবে সেটাও বলে গিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, 'ইহুদিরা একাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে; খ্রিষ্টানরা বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে। আমার উম্মত তিয়াত্তর

---

৪৩. ইবনে হিব্বান (মুকাদ্দিমা : ৬)। দারেমি (মুকাদ্দিমা : ২০৮)।
৪৪. আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৬০৭)। দারেমি (মুকাদ্দিমা : ৯৬)। ইবনে হিব্বান (মুকাদ্দিমা : ৫)।

ফিরকায় বিভক্ত হবে। সবগুলো ফিরকা জাহান্নামে যাবে, কেবল একটি জান্নাতে যাবে...।' আবু হুরাইরা থেকে হাদিসটি বর্ণনার পরে ইমাম তিরমিযি লিখেন, 'এ হাদিসটি সাদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আউফ ইবনে মালেক-সহ বিভিন্ন সাহাবি থেকে বর্ণিত।'[৪৫]

ইমাম আজম আবু হানিফা নিজস্ব সনদে আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর এই হাদিস বর্ণনা করেন, **'বনি ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। তারা সকলে জাহান্নামে। (মুক্তি পাবে) কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মুসলমান (সাওয়াদে আজম)।'**[৪৬]

ফলে আকিদার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর শতধাবিভক্ত হওয়া কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে প্রমাণিত। বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকার আবির্ভাব সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত। এ কারণে কেবল 'আমি ইসলামি আকিদা' মানি অথবা 'আমি মুসলিম' এটুকুই যথেষ্ট নয়। কারণ, ইসলামের উপর থেকেও, মুসলিম দাবি সত্ত্বেও বিভ্রান্ত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। তিয়াত্তর দলের মাঝে সবাই নিজেকে মুসলিম দাবি করবে, অথচ কেবল একটি জান্নাতে যাবে, সেটাও প্রমাণিত। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের দাবি সত্ত্বেও বিভ্রান্ত ও গোমরাহ শত শত ফিরকার উদ্ভব এ তিক্ত বাস্তবতার সাক্ষী। এগুলোর কিছু ফিরকা বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত। আর কোনো কোনো ফিরকা কুফরে নিমজ্জিত, ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে খারিজ তথা বহিষ্কৃত।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? হকপন্থি দল কারা? কোন পথে কিংবা কাদের সঙ্গে থাকলে এই শত শত বিভ্রান্ত ফিরকা থেকে বেঁচে থেকে প্রকৃত ইসলামের অনুসারী হওয়া যাবে? ইসলামের বিশুদ্ধ রূপ কাদের কাছে বিদ্যমান? এই সবকিছুর উত্তর হলো 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা বিশুদ্ধ আকিদা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ বিশুদ্ধ পথ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঙ্গে থাকা হকপন্থি দলের সঙ্গে থাকা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর থাকা মানে বিশুদ্ধ কুরআন ও সুন্নাহর পথে থাকা, সালাফে সালেহিনের সঙ্গে থাকা।

---

৪৫. তিরমিযি (আবওয়াবুল ঈমান : ২৬৪০)। আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৫৯৬)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুল ফিতান : ৩৯৯১)।

৪৬. আল-ফিকহুল আবসাত (৫২)।

কেউ কেউ মনে করেন, কুরআন ও সুন্নাহতে তো এমন কোনো ফিরকার কথা নেই; বরং এর নামে ইসলামে কি আরেকটি ফিরকা বানানো হলো না? এটা অজ্ঞতাপ্রসূত বক্তব্য। কারণ, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' কারও বানানো মত নয়, কারও মনগড়া শিরোনাম নয়; বরং এটা খোদ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলে গিয়েছেন। 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'-কে তিনি বিশুদ্ধতার সনদ দিয়েছেন। পিছনে উল্লিখিত ইরবাজ ইবনে সারিয়ার হাদিসের শেষাংশে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আমার পরে তোমাদের যারা বেঁচে থাকবে, প্রচণ্ড মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরবে। সেগুলো তোমরা মজবুতভাবে ধরে রাখবে। দাঁত কামড়ে পড়ে থাকবে। সাবধান! (দ্বীনের মাঝে) নবসৃষ্ট বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, (দ্বীনের ক্ষেত্রে) প্রত্যেক নবসৃষ্ট বিষয় বিদআত; আর প্রত্যেক বিদআত গোমরাহি।'[৪৭] উম্মাহর বিভক্তিসংক্রান্ত হাদিসের শেষে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'সবগুলো ফিরকা জাহান্নামে যাবে। কেবল একটি জান্নাতে যাবে।' জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা কারা, হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, 'যারা আমার এবং আমার সাহাবাগণের পথে থাকবে।'[৪৮] অর্থাৎ, সুন্নাত এবং সাহাবাগণের জামাত বা দলের সঙ্গে থাকবে। অন্যকথায়, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী হবে।

ইমাম আজম বলেন, **'তোমরা যেসব বস্তু শিখছ এবং মানুষকে শেখাচ্ছ, তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম (ইলম) হলো সুন্নাত। মানুষের আবিষ্কৃত বিদআতের মাঝে হেদায়াত নেই। হেদায়াত তো কেবল কুরআন, রাসুলুল্লাহর সুন্নাত এবং সাহাবায়ে কেরামের পথে। এ ছাড়া সবই দ্বীনের ক্ষেত্রে সংযোজন ও বিদআত।'**[৪৯] ইমাম আরও বলেন, **'সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো। সালাফের অনুসরণ করো।** প্রত্যেক নবসৃষ্ট বিষয় থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, সেগুলো বিদআত।'[৫০]

মোটকথা, রাসুলুল্লাহর সুন্নাত এবং তাঁর সাহাবাদের পথ মুক্তির পথ। এই পথে যারা থাকবে তারাই 'আহলে সুন্নাত' তথা সুন্নাতের অনুসারী হিসেবে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সত্যপন্থি দল হিসেবে বিবেচিত হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এ পথেই অটল-

---

৪৭. আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৬০৭)। দারেমি (মুকাদ্দিমা : ৯৬)। ইবনে হিব্বান (মুকাদ্দিমা : ৫)।

৪৮. তিরমিযি (আবওয়াবুল ঈমান : ২৬৪০)। আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৫৯৬)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুল ফিতান : ৩৯৯১)।

৪৯. আর-রিসালাহ (৩৫)।

৫০. যাম্মুল কালাম ওয়া আহলিহি (৫/২০৭)।

অবিচল ছিলেন। তাদের পরে তাদের ছাত্ররা (তাবেয়িন) এ পথের অনুসরণ করেছেন। তাদের পরে তাদের ছাত্ররা (তাবে-তাবেয়িন) এ পথেই হেঁটেছেন। এ পথে ছিলেন চার ইমাম এবং প্রত্যেক যুগের সকল ফকিহ ও মুহাদ্দিস। সকল যুগের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এবং তাদের অনুসারী এই 'আহলে সুন্নাতের' পথেই ছিলেন। আর আল্লাহর অনুগ্রহে যুগে যুগে তারাই যেহেতু সংখ্যগরিষ্ঠ (সাওয়াদে আজম) ছিলেন, বিভ্রান্ত ও প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলো সংখ্যালঘু ছিল, এ কারণেই তাদের বলা হয়েছে 'জামাত'। তারা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন তথা সালাফে সালেহিনের জামাতের পথের উপর প্রতিষ্ঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম উম্মাহ। আর এভাবে এই সত্যপন্থি ও মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নাম হয়েছে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'। তাদের আকিদাই ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা। তারাই ইসলামের প্রকৃত প্রতিনিধি। হ্যাঁ, আহলে সুন্নাতের মাঝেও বিভিন্ন শাখাগত বিষয়ে বিরোধ রয়েছে, তথাপি সামগ্রিকভাবে তারা সকলেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একটি হাদিসে বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে গোমরাহির উপর একত্র করবেন না। তাই যখন মতভেদ দেখতে পাবে, তখন সাওয়াদে আজম তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের সঙ্গে থাকবে।'[৫১] অর্থাৎ, আল্লাহর অনুগ্রহে অধিকাংশ মুসলিম সবসময় হকের উপর থাকবে। বিভ্রান্ত ফিরকাগুলো মূল ধারার মুসলিমদের চেয়ে নিতান্তই ক্ষুদ্র ও গৌণ হবে। এটাই উক্ত হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, একদল লোক খোদ আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ধারার উপর এই হাদিস প্রয়োগ করেন। তারা সাওয়াদে আজম কিংবা জামাতের অপব্যাখ্যা করে নিজেদের বিচ্ছিন্ন মতামত ও সংখ্যালঘু দলকে 'জামাত' ও 'সাওয়াদে আজম' আহলে সুন্নাত দাবি করেন এবং আহলে সুন্নাতের অনুসারী বিভিন্ন ধারার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমকে বিভ্রান্ত আখ্যা দেন। এটা যুগপৎ ভয়ংকর ও বেদনাদায়ক; বরং যুগে যুগে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম উম্মাহ, উলামা-ফুকাহা, মুতাকাল্লিমিন-মুহাদ্দিসিন, সুফি-সাধক, দাঈ, সংস্কারক এবং সাধারণ মুসলমান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামক হক, মধ্যমপন্থি ও সত্যাগ্রহী দল হিসেবে বিবেচিত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

---

৫১. ইবনে মাজা (আবওয়াবুল ফিতান : ৩৯৫০)। মুসনাদে আহমদ (আউয়ালু মুসনাদিল কুফিয়্যিন (১৯৬৫৯))।

আবুল ইউসর বাযদাবি বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, যে পথে ছিলেন সাহাবা, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন এবং উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম। তারা 'জাহমিয়্যাহ',[৫২] 'মুতাযিলা'[৫৩] ও 'কাদারিয়্যাহ'দের[৫৪] মতো আল্লাহর সিফাত অস্বীকার করে না। আবার সিফাত সাব্যস্তের নামে চরমপন্থি 'হাম্বলি', 'কাররামিয়্যাহ' ও 'মুজাসসিমাহদের'[৫৫] মতো আল্লাহর জন্য শরীর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চলাফেরা ও স্থানান্তর সাব্যস্ত করে না। বরং তারা আল্লাহর 'ইলম', 'কুদরত', 'দর্শন', 'শ্রবণ', 'সৃষ্টি'-সহ সকল কদিম সিফাতে বিশ্বাস করে। আল্লাহকে 'দেহ', 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ', 'স্থানান্তর' ও 'পরিবর্তনে'র ঊর্ধ্বে মনে করে। ...তাকদিরের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত তাকদির অস্বীকারকারী

---

৫২. ইসলামের ইতিহাসের জঘন্যতম ভ্রান্ত সম্প্রদায়। তাদের নেতা জাহম ইবনে সাফওয়ানের দিকে সম্পৃক্ত হয়ে তারা জাহমিয়্যাহ নামে পরিচিত হয়েছে। এই ফিরকা ইসলামের ইতিহাসের সকল বিভ্রান্তির কারখানা। আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে তারা 'মুআত্তিলাহ' তথা সিফাত অস্বীকারকারী। তাকদিরের ক্ষেত্রে তারা জাবরিয়্যাহ। তারা মনে করে, মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই; মানুষ পরাধীন ও বাধ্য। একইভাবে আল্লাহর কালামের ক্ষেত্রে মুতাযিলা (তথা কালামকে সৃষ্টি আখ্যাদানকারী), ঈমানের ক্ষেত্রে মুরজিয়া। তারা মনে করে, কেবল জানার নামই ঈমান; সত্যায়ন কিংবা স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। [আল-ফাসল, ইবনে হাযাম; উসুলুদ্দিন, বাযদাবি : ২৫৮]

৫৩. কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে আকলের অনুসারী ভ্রান্ত সম্প্রদায়। যুগে যুগে তারা উলামায়ে সুন্নাতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ইসলামের বিকৃতি সাধন করেছে। আকিদার অধিকাংশ মাসআলাতে তারা কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের অনুসারী। ফলে কাদারিয়্যাহরা আল্লাহ ও পরকালসংশ্লিষ্ট যেসব বিষয় অস্বীকার করে, তাদের অধিকাংশ ব্যক্তি সেসব বিষয় অস্বীকার করত। আবার জাহমিয়্যাহদের অনুসরণে কুরআনকে মাখলুক বলত। [উসুলুদ্দিন, বাযদাবি : ২৫৫, ২৫৭]

৫৪. আল্লাহর সিফাত অস্বীকার, পরকালে আল্লাহর দিদার অস্বীকার, আল্লাহর কালামকে মাখলুক বলা-সহ বিভিন্ন গোমরাহির উৎস এই ফিরকা। তাকদিরের ক্ষেত্রেও তারা বিভ্রান্ত। তারা আল্লাহকে মানুষের কর্মের স্রষ্টা মনে করে না, বরং মানুষকে নিজেদের কর্মের স্রষ্টা বলে। তাদের মাঝে প্রথম যুগের চরমপন্থি কাদারিয়্যাহরা আল্লাহর ইলমকে অস্বীকার করত। পরকাল-সম্পৃক্ত—যেমন কবরের শাস্তি, মুনকার নাকিরের প্রশ্ন, পুলসিরাত, মিযান-সহ—অধিকাংশ বিষয় তারা অস্বীকার করে। কিয়ামতের দিন আমলনামা পাঠকে তারা নাকচ করে। জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টি হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে। মিরাজকে অস্বীকার করে। কারামতে আউলিয়াতে বিশ্বাস রাখে না। প্রথম যুগের কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় পরবর্তীকালে 'মুতাযিলাহ'তে রূপান্তরিত হয়। [উসুলুদ্দিন, বাযদাবি : ২৫৬]

৫৫. মুজাসসিমাহ মানে দেহবাদী সম্প্রদায়। ইসলামের অনেকগুলো ভ্রান্ত সম্প্রদায় এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, যারাই আল্লাহর সিফাতগুলো সাব্যস্তের নামে বাড়াবাড়ি করে আল্লাহকে সৃষ্টির মতো মনে করবে, তারাই মুজাসসিমাহ (দেহবাদী) ও মুশাব্বিহাহ (সাদৃশ্যবাদী) নাম পাবে। এ হিসেবে মুহাম্মাদ ইবনে কাররামের অনুসারী কাররামিয়্যাহ, মুকাতিল ইবনে সুলাইমান, হিশাম ইবনুল হাকাম সকলে এবং তাদের অনুসারী মুজাসসিমাহ। উল্লেখ্য, এখানে 'হাম্বলি' বলতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এবং তাঁর প্রকৃত অনুসারীদের বোঝানো হয়নি। কারণ, তারা বিশুদ্ধ আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত; বরং ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আহমদের অনুসারী এবং নিজেদের হাম্বলি পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ে হাম্বলিদের একটি ধারা প্রচণ্ডভাবে দেহবাদের শিকার হয়। এখানে সেই চরমপন্থি দেহবাদীদেরই বোঝানো হয়েছে। [উসুলুদ্দিন, বাযদাবি : ২৫৮-২৫৯]

'কাদারিয়্যাহ' এবং তাকদিরের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনকারী 'জাবরিয়্যাহ'[৫৬]-দের মাঝামাঝি থাকে। ঈমানের প্রশ্নে 'খারেজি'[৫৭] ও 'মুরজিয়া'[৫৮]-দের মাঝামাঝি থাকে। সাহাবাদের ভালোবাসার প্রশ্নে 'নাসেবি' (খারেজি) ও 'রাফেযি'-দের মাঝামাঝি থাকে। এভাবে দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত সকল প্রান্তিকতামুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থি জামাত।[৫৯]

এটা মূলত ইমাম আজম রহ.-এর বক্তব্যের সারমর্ম। ইমাম আজম বলেন, 'আমরা (সর্বত্র) দুই প্রান্তিক বক্তব্যের মাঝামাঝি অবস্থান করি। ফলে (সিফাতের ক্ষেত্রে) আল্লাহকে সৃষ্টির সদৃশ মনে করি না, আবার তাঁর সিফাতগুলো নাকচও করি না। (তাকদিরের ক্ষেত্রে) মানুষকে বাধ্য বলি না, আবার সর্বৈব ক্ষমতার অধিকারী মনে করি না।'[৬০]

'আল-হাভি'র উদ্ধৃতিতে তাতারখানিয়্যাহতে এসেছে—আহলে সুন্নাতের দশটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে : এক. আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয় এমন কিছু তাঁর ব্যাপারে না বলা। দুই. কুরআনকে আল্লাহর কালাম গাইরে মাখলুক (সৃষ্টি নয়) বলা। তিন. প্রত্যেক সৎ-অসৎ ব্যক্তির পিছনে জুমা ও জামাতের নামায পড়া। চার. তাকদিরের

---

৫৬. তাকদিরের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত সম্প্রদায়। কাদারিয়্যাহদের বিপরীত প্রান্তে তাদের অবস্থান। তারা আল্লাহকে সকল কাজের স্রষ্টা ও কর্তা মনে করে। ফলে বান্দাকে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং কোনোকিছু করতে সক্ষম নয় বলে বিশ্বাস করে। তাদের ধারণা—বান্দার কোনো স্বাধীনতা নেই। তাদের কাছে মানুষের নড়াচড়া, কম্পন, নাচানাচি সব সমান। সিফাত অস্বীকারের কারণে এরা জাহমিয়্যাহ নামেও পরিচিতি।

৫৭. ইসলামের প্রথম দিকের একটি বিচ্যুত সম্প্রদায়। এরা আলি, উসমান, যুবাইর, তালহা, আয়েশা ও মুআবিয়া রাযি.-কে কাফের মনে করে; বরং যেকোনো মুমিন কবিরা গুনাহ করে ফেললে তাকে কাফের বলে। মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ মনে করে। আল্লাহর সিফাত, তাকদির-সহ বিভিন্ন মাসআলায় তারা ভ্রান্ত কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের মতো আকিদা রাখে। তারা মুসলিম উম্মাহর একটি নিকৃষ্টতর ভ্রান্ত সম্প্রদায়। তারা 'মুহাক্কিমাহ', 'শুরাহ', 'ওয়াইদিয়্যাহ' নামেও পরিচিত। [দেখুন : আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, বাগদাদি; আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, শাহরাস্তানি]

৫৮. এরাও বিভিন্ন গোমরাহির উৎস। তাদের মূল মাযহাব ছিল ঈমানের প্রশ্নে। তারা মনে করত, জানার নামই ঈমান। সুতরাং কেউ মুমিন হওয়ার পরে যত গুনাহ করুক কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহ কোনো মুমিনকে জাহান্নামের শাস্তি দেবেন না। গুনাহ ঈমানের কোনো ক্ষতি করে না। অতঃপর তারা সকল ভ্রান্ত সম্প্রদায় থেকে ভ্রান্তি ধার করে—জাহমিয়্যাহদের কাছ থেকে সিফাত অস্বীকারের আকিদা নেয়; জাবরিয়্যাহদের কাছ থেকে তাকদির নিয়ে বাড়াবাড়ি এবং মানুষের পরাধীনতার আকিদা নেয়; রাফেযিদের কাছ থেকে সাহাবা-সম্পর্কিত আকিদার বিভ্রান্তি নেয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা খারেজিদের আকিদাও গ্রহণ করে। ঈমানের সংজ্ঞার্থে তাদের একদল কাররামিয়্যাহদের আকিদাও গ্রহণ করে। [বাগদাদি; শাহরাস্তানি]

৫৯. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২৪৪-২৪৫)।

৬০. তালবিসুল আদিল্লাহ, সাফফার (১৫১)।

ভালো ও মন্দ দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বাস করা। পাঁচ. মোজার উপর মাসাহ বৈধ মনে করা। ছয়. শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ না করা। সাত. আবু বকর, উমর ও উসমানকে বাকি সকল সাহাবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা। আট. গুনাহের কারণে আহলে কিবলার কাউকে কাফের না বলা। নয়. আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত সকল মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া। দশ. জামাত তথা ঐক্যকে আল্লাহর রহমত মনে করা, অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলাকে আযাব মনে করা।[৬১]

আবু হানিফা : আহলে সুন্নাতের আকিদার ইমাম

ইমাম আজম রহ.-এর সকল জীবনীকার ও ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, ফিকহের প্রতি মনোযোগী হওয়ার আগে তিনি বিধর্মী, নাস্তিক ও ইসলামবিরোধীদের বিরুদ্ধে ইসলামের একজন প্রখ্যাত মুনাযির হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তির মাধ্যমে তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতেন। সালাফের আকিদার সুরক্ষা নিশ্চিত করতেন। বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর বিভ্রান্তি খণ্ডন করতেন। আকিদা ছাড়া সে সময়ে তিনি আর কোনো শাস্ত্র চর্চা করতেন না। ফলে তিনি ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মুনাযির, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। খালেদ ইবনে ইয়াযিদ আল-উমরি বলেন, 'আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, যুফার ও হাম্মাদ ইবনে হানিফা, তাদের প্রত্যেকেই কালাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। তারা মানুষের সঙ্গে মুনাযারা করেছেন, তাদের খণ্ডন করেছেন। তারা এ শাস্ত্রের ইমাম।'[৬২]

যুফার বলেন, 'আমি আবু হানিফা রহ.-কে বলতে শুনেছি—(ইমাম বলেন) আমি কালাম চর্চা করতাম। এ শাস্ত্রে পর্বতপ্রমাণ প্রসিদ্ধি লাভ করি...।' কবিসা ইবনে উকবা বলেন, 'আবু হানিফা তাঁর জীবনের প্রথম দিকে প্রবৃত্তিপূজারী ও বাতিলপন্থিদের বিরুদ্ধে মুনাযারা (বিতর্ক) করতেন। এক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তর্কশাস্ত্র পরিত্যাগ করে ফিকহ ও সুন্নাহতে মনোযোগী হন, আহলে সুন্নাতের ইমামে পরিণত হন।' ইয়াহইয়া ইবনে শাইবান থেকে বর্ণিত, আবু হানিফা রহ. বলেন, 'আমাকে কালামশাস্ত্রে আল্লাহ গভীর জ্ঞান দান করেছিলেন। বিশাল একটা সময় আমি এ শাস্ত্রে ব্যাপৃত থাকি, চর্চা করি, এর সুরক্ষা নিশ্চিত করি। বসরা তখন ছিল (ধর্মীয় বিষয়গুলো নিয়ে) বিতর্ক-বিবাদের কেন্দ্রবিন্দু। আমি কুড়িবারেরও বেশি সেখানে গিয়েছি। কোনো

---

৬১. ফাতাওয়া তাতারখানিয়্যাহ (১৮/১৩)।

৬২. মানাকিব, মক্কি (১০০)। বাযযাযি (৪৪)।

কোনোবার এক বছর থেকেছি। কখনো আরও কম বা বেশি। **আমি ইবাযিয়্যাহ ও সুফরিয়্যাহ-সহ বিভিন্ন খারেজি ও হাশাভি সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিতর্ক করি**...। পরবর্তীকালে আমি বিতর্ক ছেড়ে দিই। সালাফে সালেহিনের আদর্শ (ফিকহ, হাদিস ইত্যাদিতে) মনোযোগী হই।'[৬৩]

জীবনের এই পরিবর্তনের মুখে তিনি আকিদাচর্চা কিংবা আকিদার সুরক্ষা ছেড়ে দিয়েছিলেন এমন নয়, বরং তৎকালীন কালামশাস্ত্র ও প্রচলিত বিতর্ক ছেড়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ আকিদাচর্চা এবং বিভ্রান্ত আকিদার খণ্ডন কখনোই পরিত্যাগ করেননি। সেটা সম্ভবও ছিল না। কারণ, ইরাক ছিল বিভিন্ন বিভ্রান্ত ফিরকার কারখানা। কুফা ও বসরাতে প্রতিদিন নতুন নতুন বিভ্রান্তি ও বিদআতের জন্ম হতো, মক্কা কিংবা মদিনা যা থেকে মুক্ত ছিল। ফলে ইমাম আজমকে জীবনভর সহিহ আকিদার সুরক্ষা এবং নানামুখী গোমরাহির বিরুদ্ধে যতটা লড়াই করতে হয়েছে, খুব কম ইমামকেই সেটা করতে হয়েছে। কেবল নিজে নন, ছাত্রদেরও তিনি আকিদার ক্ষেত্রে বীর সেনানী করে গড়ে তোলেন। ফিকহের পাশাপাশি তাঁর মজলিসগুলোতে আকিদাচর্চা অব্যাহত রাখেন। আবু ইউসুফের সঙ্গে এক কুরআনের মাসআলা নিয়ে দীর্ঘ ছয় মাস আলোচনা করেন।[৬৪] আকিদার বিভিন্ন মাসআলায় তাঁর বিছিন্ন ছাত্র ও আলেমের কাছে চিঠি লিখেন।[৬৫] বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর বিরুদ্ধে তিনি ও তাঁর ছাত্ররা মুনাযারা অব্যাহত

---

৬৩. মানাকিবে মক্কি (৫১, ৫৪,৫৫)।

৬৪. আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (১/৩৮১)।

৬৫. শাদ্দাদ ইবনে হাকিম বর্ণনা করেন, আবু হানিফা রহ. কাদারিয়্যাহদের সঙ্গে মুনাযারার পদ্ধতি শেখাতে গিয়ে বলেন, "যখন তাকদির অস্বীকারকারীর সঙ্গে বিতর্ক করবে, তখন মাত্র দুটো কথা দিয়েই তাকে পরাস্ত করতে পারবে। হয়তো তাওবা করবে, নয়তো কাফের হয়ে যাবে। তৃতীয় কোনো পথ নেই। তাকে জিজ্ঞাসা করবে, আল্লাহ তায়ালা অনাদিতে বর্তমানের সবকিছু সম্পর্কে জানতেন কি না? যদি বলে, 'না', তবে সে কাফের। আর যদি বলে, 'হ্যাঁ', তবে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তিনি কি চেয়েছেন তাঁর জানা ঠিক থাকুক এবং তাঁর নির্দেশে সবকিছু সেভাবেই ঘটুক, নাকি চাননি? যদি বলে, 'না', তবে সে কাফের। আর যদি বলে, 'হ্যাঁ', তবে সে তাকদির স্বীকার করে নিল।" [তালখিসুল আদিল্লাহ, সাফফার : ৫৩-৫৪] উক্ত বর্ণনাটি আবু ইউসুফ রহ.-এর সূত্রে খতিব বর্ণনা করেছেন। [তারিখে বাগদাদ : ১৫/৫১৬] এ বর্ণনা দ্বারা ইমাম কর্তৃক তাঁর ছাত্রদের আকিদার ক্ষেত্রে প্রস্তুতকরণের চিত্র ফুটে ওঠে। পাশাপাশি কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি খণ্ডনে তাঁর মুজাহাদা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

হাসান বসরির শাগরেদ উসমান আল-বাত্তির কাছে লেখা চিঠিতে ইমাম তাকে আকিদার ব্যাপারে বলেন, 'এটা আপনার সঙ্গী-শাগরেদদের শিক্ষা দিন। তাদের এ পথে ডাকুন। এর উপর উৎসাহিত করুন। কেননা, এটাই

রাখেন। হিজরি দ্বিতীয় শতকের তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যার দিকে আকিদার কমপক্ষে পাঁচটি কিতাব সরাসরি সম্পৃক্ত করা হয়। এ কারণে ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি যেমন ইমাম, আকিদার ক্ষেত্রেও তিনি আহলে সুন্নাতের প্রধান সারির ইমাম।

কিন্তু এটা এত সহজ ছিল না। অসংখ্য কুরবানি দিতে হয়েছে এর জন্য। বিশুদ্ধ আকিদা প্রচার এবং ভ্রান্তদের খণ্ডনের কারণে তিনি কম মুসিবতের শিকার হননি। বরং আকিদার কারণে ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. যতটা চতুর্মুখী সংকট, নানামুখী জটিল সমস্যা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন, সালাফে সালেহিনের ইমামদের মাঝে সেটা একদম বিরল। খারেজিরা বারবার তাঁর মাথায় তরবারি ধরেছে, হত্যা করতে চেয়েছে। দাহরিয়্যিন নাস্তিকরা তাকে হত্যা করার জন্য উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে কুফার মসজিদে হামলা করেছে। জাহমিয়্যাহরা তাকে খারেজি আখ্যা দিয়েছে। মুরজিয়ারা তার নামে নিজেদের মতাদর্শ বিক্রির উদ্দেশ্যে তাকে মুরজিয়া বলে প্রচার করেছে। এগুলো বাইরের আঘাত। ভিতরের আঘাতও কম নয়। একদল তাকে 'খালকে কুরআন' (কুরআন সৃষ্টির) মিথ্যা অভিযোগে মুশরিক আখ্যা দিয়েছে, আরেক দল মুরজিয়া বানিয়ে দিয়েছে। একদল হাদিস-বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করেছে, আরেক দল তাকে যমিনের উপর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ, ইসলামের কলঙ্ক বানিয়ে দিয়েছে। শেষে শাসকগোষ্ঠীর হাতে তিনি অন্তরিন অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন।

আকিদা ও আদর্শের কারণে ঘর ও বাইরের এত আঘাত আর কোনো তাবেয়ি ইমামকে সহ্য করতে হয়নি।[৬৬] জীবনভর বিভ্রান্ত লোকেরা তার বিরুদ্ধে লড়াই

সর্বোত্তম ইলম। এরচেয়ে উত্তম কোনো ইলম আপনি শিখতে পারবেন না, শেখাতে পারবেন না। এটা করতে পারলে নামাযি, রোযাদার এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারীর চেয়ে আপনার বেশি পুণ্য মিলবে। যদি আহলে বিদআত আপনার মাঝে কোনো সন্দেহ তৈরি করে, তবে আমাকে জানান। আমি আপনার সংশয় দূর করতে সহায়তা করব।' [আর-রিসালাহ : ৩৭; তালখিসুল আদিল্লাহ : ৫৪]

৬৬. ইমাম আজম রহ. তাবেয়ি ছিলেন। তিনি আনাস ইবনে মালেক (৯৩ হি.), আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (৮৭ হি.), আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (৮৮ হি.), আবুত তুফাইল-সহ (১১০ হি.) একাধিক সাহাবিকে দেখেছেন। এটা ইবনে সাদ, শিরাজি, সাইমারি, বাযযাযি, খতিবে বাগদাদি, নববি, আসকালানি, সাখাভি, সুয়ুতি, আইনি-সহ সকল মুহাক্কিক ইমামের বক্তব্য। কাযি সাইমারি (৪৩৬ হি.) আনাস ইবনে মালেক রাযি.-এর সঙ্গে ইমামের কথোপকথনের কথাও উল্লেখ করেছেন। খতিবে বাগদাদিও আনাস রাযি.-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেছেন। শিরাজি (৪৭৬ হি.) তাকে ফকিহ তাবেয়িদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। এ এমন এক বিরল সৌভাগ্য যা তাঁর সামসময়িক অন্যান্য প্রসিদ্ধ ইমামের কারও নসিব হয়নি। যেমন—তখন আওযায়ি শামে ছিলেন, বসরায় হাম্মাদ

করেছে, অপবাদ রটিয়েছে, হত্যার চেষ্টা করেছে। আর ঘরের লোকেরা ভুল বুঝেছে। কিন্তু আল্লাহ তাকে চিনেছেন। তাঁর কুরবানির মূল্য দিয়েছেন। ফলে জীবদ্দশায় যে মানুষটি মুশরিক, মুরজিয়া, পরিত্যক্ত-সহ নানান অপবাদবাণে জর্জরিত হয়েছেন, মৃত্যুর পরে আল্লাহ তাকে সুরাইয়াসম উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। তাকে 'ইমাম আজম' হিসেবে কবুল করে নিয়েছেন। ফিকহ ও আকিদা উভয় ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম বানিয়ে দিয়েছেন। রাযিয়াল্লাহু আনহু।

এই গ্রন্থে আমরা তাঁর উপর ঘরে-বাইরের লোকদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত সকল অভিযোগ-অপবাদের জবাব দিতে পারব না। কারণ, এটা আমাদের মূল

ছিলেন, কুফাতে ছিলেন সাওরি, মদিনাতে ছিলেন মালেক, মক্কায় ছিলেন মুসলিম ইবনে খালেদ, মিসরে ছিলেন লাইস ইবনে সাদ। কিন্তু তাদের কেউ কোনো সাহাবির সঙ্গে মোলাকাতের সৌভাগ্য লাভ করেননি। ইবনে হাজার মক্কি বলেন, ইমাম আজম আটজন সাহাবির সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাদের মাঝে আনাস ইবনে মালেক, আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা, সাহল ইবনে সাইদ এবং আবুত তুফাইল রয়েছেন। [তাবাকাতুল ফুকাহা, আবু ইসহাক শিরাজি : ৮৬] [আখবারু আবি হানিফাহ ওয়া আসহাবিহি, কাযি সাইমারি : ১৮-১৯] [তারিখে বাগদাদ : ১৫/৪৪৪] [আল-খাইরাতুল হিসান, ইবনে হাজার হাইতামি : ৬৩] [উকুদুল জুমান, সালেহি : ৭০-৭২] [শরহু মুসনাদে আবি হানিফা, আলি কারি : ৫৮১-৫৮২]

উল্লেখ্য, বিপরীতে কেউ কেউ ইমাম আজম রহ.-এর তাবেয়ি হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। তাদের দাবি, ইমাম সাহাবাদের সাক্ষাৎ পেলেও তিনি তাদের কারও কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেননি। বাস্তবতা হলো, আনাস-সহ কিছু সাহাবি থেকে তাঁর হাদিস বর্ণনা পাওয়া যায়, যদিও সেগুলো সন্দেহ বা আপত্তির ঊর্ধ্বে নয়। [আল-জাওয়াহিরুল মুযিআহ, কুরাশি : ১/২৮] [আল ইনতিসার, সিবতু ইবনিল জাওযি : ১৪-১৮] কিন্তু হাদিস বর্ণনা করেননি, তাই তিনি তাবেয়ি হতে পারবেন না—এটা সঠিক বক্তব্য নয়। সাহাবি হওয়ার জন্য যেমন মুমিন অবস্থায় রাসুলুল্লাহর সাক্ষাৎ যথেষ্ট, হাদিস বর্ণনা কিংবা লম্বা সান্নিধ্য শর্ত নয়, একইভাবে তাবেয়ি হওয়ার জন্য সাহাবির সাক্ষাৎ যথেষ্ট, হাদিস বর্ণনা কিংবা লম্বা সান্নিধ্য শর্ত নয়। শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, 'তাবেয়ি হলেন, যিনি সাহাবির সাক্ষাৎ পেয়েছেন।' [নুখবাতুল ফিকার : ৪/৭২৪] একইভাবে হাফেজ ইরাকি লিখেন, 'তাবেয়ি হলেন, যিনি সাহাবির সাক্ষাৎ পেয়েছেন।' [আলফিয়াতুল ইরাকি : ১/১৬৭] এটাই বিশুদ্ধ মত। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি হাদিস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায় : 'মুবারকবাদ যে আমাকে দেখেছে, আর যে তাকে দেখেছে যে আমাকে দেখেছে।' [মুসতাদরাকে হাকেম, কিতাবু মারিফাতিস সাহাবাহ : ৭০৮৬; মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ : মুসনাদু আবি সাইদ খুদরি : ১০০০] ফলে সাক্ষাতের মাঝেই সৌভাগ্য থাকা প্রমাণিত। দারাকুতনি, ইবনে খাল্লিকান এবং সমকালীন আবদুর রহমান মুআল্লিমি-সহ কেউ কেউ বরং আনাস রাযি.-এর সঙ্গে ইমামের সাক্ষাৎকেও অস্বীকার করেছেন। এটা দলিলবিহীন বক্তব্য, যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আনাস রাযি.-এর সঙ্গে ইমামের একাধিকবার সাক্ষাৎ বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত, যা শাইখুল ইসলাম আসকালানি, সুয়ুতি, হাকেম-সহ অন্য ইমামগণ স্বীকার করেছেন; বরং কিছু কিছু বর্ণনায় দেখা যায়, দারাকুতনিও আনাস রাযি.-এর সঙ্গে ইমামের সাক্ষাৎকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। [আল-আসামি ওয়াল কুনা ৪/১৭৬] [তাবয়িযুস সহিফাহ, সুয়ুতি : ৩৩-৩৫] [তানিবুল খতিব, কাওসারি : ৩২-৩৩]

আলোচ্য বিষয় নয়। তবে বিশুদ্ধ আকিদা প্রচার এবং ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডনে তাঁর কুরবানির কিছু দিক অবশ্যই উল্লেখ করার চেষ্টা করব। পাশাপাশি বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে আলোচনার সময় প্রতিপক্ষ কীভাবে তাকে ভুল বুঝেছে কিংবা ভিত্তিহীন অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, সেগুলো দেখাব, ইনশাআল্লাহ।

জাহমিয়্যাহদের বিরুদ্ধে ইমাম

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. আবু হানিফার কাছে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কী খবর? ইবনুল মুবারক বলেন, জাহম নামের এক লোকের আর্বিভাব ঘটেছে। ইমাম বললেন, সে কী বলে? ইবনুল মুবারক বললেন, কুরআনকে মাখলুক বলে। তখন আবু হানিফা রহ. এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, ﴿مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ অর্থ : 'এই বিষয়ে এদের কোনো জ্ঞান নেই এবং এদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। এদের মুখনিঃসৃত কথা কী সাংঘাতিক! এরা তো কেবল মিথ্যাই বলে।' [কাহাফ : ৫][৬৭] তিনি তাঁর পিছনে নামায পড়তেও নিষেধ করেন।[৬৮]

একপর্যায়ে ইমাম আজম রহ. জাহম ইবনে সাফওয়ানের বিভ্রান্তি সম্পর্কে জানার পর সেগুলোকে কুফর আখ্যা দেন। জাহমিয়্যাহদের বিভ্রান্ত ফিরকা হিসেবে গণ্য করেন; বরং তাকফিরের ক্ষেত্রে ইমাম আজম রহ. অত্যন্ত সতর্ক ও রক্ষণশীল হওয়া সত্ত্বেও জাহম ইবনে সাফওয়ানকে তিনি কাফের ফাতাওয়া দেন।[৬৯]

আবু ইসহাক খাওয়ারযেমি বলেন, একবার জাহম ইবনে সাফওয়ান আবু হানিফার কাছে এলেন। জাহম বললেন : আমি আপনার সাথে কিছু কথা বলার জন্য এসেছি। ইমাম বললেন : তোমার সঙ্গে কথা বলা কলঙ্কের। আর ওসব বিষয়ে প্রবেশ করা আগুনের মাঝে প্রবেশের মতো।

জাহম : আমার সঙ্গে দেখা কিংবা আমার কথা শোনার আগেই এ ধরনের মন্তব্য করা উচিত হলো?

ইমাম : আমি তোমার ব্যাপারে এমন অনেক কথা শুনেছি যা কোনো মুসলিম বলতে পারে না।

---

৬৭. তারিখে বাগদাদ (১৫/৫১৭)।

৬৮. তালখিসুল আদিল্লাহ, সাফফার (৫৬)।

৬৯. দেখুন : তারিখে বাগদাদ (১৫/৫০২)।

জাহম : আপনি অদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে আমার উপর ফয়সালা করবেন?

ইমাম : এগুলো তোমার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। সকল জনসাধারণের কাছে এগুলো স্পষ্ট হয়ে গেছে। ফলে এ ব্যাপারে তোমার উপর অভিযোগ করতে বাধা নেই।

জাহম : আমি আপনার কাছে শুধু ঈমান সম্পর্কে জানতে এসেছি। ফলে কেবল এটা নিয়েই কথা বলুন।

ইমাম : এখন পর্যন্ত ঈমান চিনতে পারোনি?

জাহম : হ্যাঁ, পেরেছি। কিন্তু আমি একটু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংশয়ে আছি।

ইমাম : ঈমানের বিষয়ে কোনো ধরনের সংশয় কুফর।

জাহম : কোন দিক থেকে কুফর বুঝিয়ে বলবেন কি?

ইমাম : তুমি কোনটা জানতে চাও?

জাহম : যদি কেউ তার হৃদয়ে আল্লাহকে চেনে। জানে যে, আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। অংশীদার ও প্রতিপক্ষ নেই। তাঁর সকল গুণও জানে। তাঁর মতো কেউ নেই জানে। কিন্তু মুখে সেগুলো স্বীকার না করে মৃত্যুবরণ করে। এমন ব্যক্তির মৃত্যু মুমিন না কাফের অবস্থায় হলো?

ইমাম : যদি অন্তরের জানা মুখে স্বীকার না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে কাফের, জাহান্নামের অধিবাসী।

জাহম : আল্লাহর সকল সিফাত জানার পরও মুমিন হবে না কীভাবে?

ইমাম : যদি তুমি কুরআনকে দলিল হিসেবে মানো, তবে তোমার সাথে কথা বলব। আর যদি কুরআনকে দলিল হিসেবে না মানো, তবে তোমার সাথে কথা নেই।

জাহম : কুরআনে আমি বিশ্বাস করি এবং দলিল হিসেবে মানি।

ইমাম : আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঈমানকে হৃদয় ও মুখ দুটোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾﴾ অর্থ : 'আর তারা রাসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন শোনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত দেখতে পাবেন। এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে, হে আমাদের

প্রতিপালক, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন। আল্লাহ এবং আমাদের কাছে আগত সত্যে আমাদের ঈমান না আনার কী কারণ থাকতে পারে যখন আমরা প্রত্যাশা করি আল্লাহ আমাদের সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন? সুতরাং তাদের এ কথার কারণে আল্লাহ তাদের এমন সব উদ্যান দান করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান।' [মায়িদা : ৮৩-৮৫] ফলে জান্নাতে যাওয়ার জন্য অন্তরের জানা এবং মুখের স্বীকৃতি দুটোই জরুরি। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, ﴿قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ অর্থ : 'তোমরা বলে দাও যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সেই বাণীর প্রতি যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে আর যা ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের সন্তানদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা দেওয়া হয়েছিল মুসা ও ঈসাকে, যা অন্য নবিগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল। আমরা নবিগণের মাঝে কোনো পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই অনুগত। এবং তারা যদি ঈমান আনে যেভাবে তোমরা ঈমান এনেছ, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।' [বাকারা : ১৩৬-১৩৭] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ﴾ অর্থ : 'আর তাদের তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন...।' [ফাতাহ : ২৬] তিনি আরও বলেন, ﴿وَهُدُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ﴾ অর্থ : 'তাদের পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথে।' [হজ : ২৪] আরও বলেন, ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾ অর্থ : 'তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ সমুত্থিত হয়।' [ফাতির : ১০] অন্যত্র বলেন, ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ﴾ অর্থ : 'যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী, তাদের দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।' [ইবরাহিম : ২৭] আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেন, 'তোমরা বলো লা ইলাহা ইলাল্লাহ, তাহলে সফলতা লাভ করবে।' ফলে মুখের স্বীকৃতি ছাড়া কেবল অন্তরে জানলে কেউ মুমিন হবে না। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "জাহান্নাম থেকে সে ব্যক্তি বের হয়ে

আসবে যে বলত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', আর যার অন্তরে দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে।" রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এটা বলেননি যে, আল্লাহকে চিনত; বরং ঈমান যদি স্বীকৃতির পরিবর্তে কেবল জানার নামই হতো, তবে ঈমান প্রত্যাখানকারী পত্যেককে মুমিন বলা হতো। এই যুক্তিতে ইবলিসও মুমিন হতো। কেননা, সে আল্লাহকে চেনে ও জানে। তাঁকে স্রষ্টা, রিযিকদাতা, জীবিত ও মৃত্যুদাতা হিসেবে চেনে। ...বরং এতে সকল কাফের মুখে অস্বীকার করা সত্ত্বেও মুমিন হয়ে যেত। আল্লাহ বলেন, ﴿وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾ অর্থ : 'তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলিকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।' [নামল : ১৪] এখানে তাদের অন্তরের বিশ্বাস সত্ত্বেও তাদের মুমিন বলা হয়নি। কারণ, তারা মুখে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ﴾ অর্থ : 'তারা আল্লাহর নেয়ামত চেনার পরও অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।' [নাহল : ৮৩] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ امَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ অর্থ : "আপনি জিজ্ঞাসা করুন, কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন? শোনা ও দেখা কার কর্তৃত্বাধীন? জীবিতকে মৃত থেকে কে বের করেন, আর মৃতকে জীবিত থেকে কে বের করেন? এবং সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ'। বলুন, তবুও কি তোমরা (তাকে) ভয় পাবে না?" [ইউনুস : ৩১] এখানেও দেখো কেবল অন্তরের জানাশোনা কোনো কাজে আসেনি। মুখে অস্বীকার করার কারণে অন্তরে নবিজিকে নিজেদের সন্তানদের মতো চিনেও তারা মুমিন হতে পারেনি।

ইমাম আজম রহ.-এর এই নুসুসভিত্তিক বুদ্ধিদীপ্ত কথা শুনে জাহম কিছুক্ষণ নীরব থেকে আস্তে উঠে চলে গেল।[৭০]

নুহ ইবনে ইবরাহিম বলেন, 'আমরা আবু হানিফার কাছে ছিলাম। তখন তিরমিয থেকে জাহমের অনুসারী এক নারী কুফায় এলো। সে কুফাবাসীকে তার (জাহমি) মতবাদের দিকে মানুষকে ডাকতে লাগল। হাজার হাজার মানুষ তার বক্তব্য শুনত। তখন তাকে বলা হলো, এখানে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ আবু হানিফা নামের একজন মানুষ আছেন। মাহিলাটি ইমামের কাছে এসে বলল, আপনি মানুষকে মাসআলা-মাসায়েল শেখাচ্ছেন, অথচ নিজে দ্বীন ত্যাগ করে বসে

---

৭০. মানাকিব, মক্কি (১২৪-১২৬)।

আছেন? আপনি যেই মাবুদের উপাসনা করেন, আপনার সেই মাবুদ কোথায় বলুন তো। ইমাম আজম নীরব থাকলেন। সাত দিন পর বললেন, **'আল্লাহ তায়ালা আকাশে, যমিনে নন।'** তখন একব্যক্তি বলল, তাহলে আল্লাহর বাণী 'তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথে আছেন'-এর অর্থ কী? ইমাম বললেন, এটার অর্থ ঠিক তেমন, যেমন তুমি কোনো লোকের কাছে চিঠি লিখলে, 'আমি তোমার সাথে আছি'। অথচ তুমি তার কাছে নেই।[৭১]

খারেজিদের বিরুদ্ধে ইমাম

ভ্রান্ত আকিদা থেকে সৃষ্ট সকল অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে ইমাম আজম সবসময় সরব ছিলেন। সত্যপ্রকাশ এবং বিশুদ্ধ আকিদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি জালেমের জুলুম কিংবা শাসকের উৎপীড়নকে ভয় করতেন না। খারেজি নেতা যাহহাক ইবনে কাইস শাইবানি যখন কুফা দখল করে নিল, জামে মসজিদে ঢুকে সেখানকার পুরুষদের হত্যা এবং নারীদের বন্দি করার নির্দেশ দিলো। ইমাম আজম একটি জামা ও চাদর গায়ে জড়িয়ে মসজিদে গেলেন। যাহহাককে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই।' যাহহাক বলল, 'বলুন!' ইমাম বললেন, 'কীসের ভিত্তিতে আপনি এসব পুরুষকে হত্যা এবং নারী-শিশুকে বন্দি করা হালাল বানিয়েছেন?' যাহহাক বলল, 'তারা ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে গিয়েছে, তাই।' ইমাম বললেন, 'আগে কি তাদের অন্য কোনো ধর্ম ছিল যে, ইসলাম ত্যাগ করে সে ধর্মে ফিরে গিয়েছে?' যাহহাক বলল, 'কী বললেন বুঝিনি! আবার বলুন।' ইমাম আবার বললেন। যাহহাক তাঁর কথা শুনে বলল, 'ভুল হয়ে গেছে।' অতঃপর তারা তরবারি কোষবদ্ধ করে চলে গেল। ইমামের বরকত ও সাহসে কুফাবাসী রক্ষা পেল। এ কারণে কুফাবাসীকে 'আবু হানিফার মাওয়ালি' (আযাদকৃত দাস) বলা হতো।[৭২]

কাযি আবু বকর আতিক ইবনে দাউদ খারেজিদের সঙ্গে ইমামের আরও একটি মুনাযারার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, খারেজিরা যখন কুফা দখল করে নিল, আবু হানিফা তাদের হাতে আটক হলেন। তাদের বলা হলো, এই লোক (আবু হানিফা) এখানকার শায়খ। খারেজিরা যেহেতু তাদের প্রতিপক্ষকে কাফের মনে করত, ফলে তারা ইমামকে লক্ষ্য করে বলল, 'শায়খ, আপনি কুফর থেকে তাওবা

---

৭১. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (১/৫৮৮-১৫৮৯)। ইমামের উক্ত বক্তব্যের অর্থ এবং আরশের উপরে আল্লাহর ইস্তিওয়া নিয়ে তাঁর আকিদার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

৭২. দেখুন : মানাকিব, মক্কি (১৪৯)।

করুন।’ ইমাম বললেন, ‘আমি আল্লাহর কাছে সকল প্রকারের কুফর থেকে তাওবা করলাম।’ তারা তাঁর পথ ছেড়ে দিলো। ইমাম চলে যাওয়ার পরে কেউ তাদের বলল, ‘তিনি কুফর বলতে আপনাদের কুফর থেকে তাওবা করেছেন।’ তখন তারা আবার তাকে ডেকে পাঠাল। ইমাম আসার পর খারেজিদের নেতা বলল, ‘শায়খ, আপনি কি আমাদের মতাদর্শকে কুফর মনে করে সেটা উদ্দেশ্য নিয়েছেন?’ ইমাম বললেন, ‘এটা তুমি ধারণা করে বললে, নাকি জেনেশুনে?’ খারেজি নেতা বলল, ‘ধারণা করে।’ ইমাম বললেন, “আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ‘নিঃসন্দেহে কিছু ধারণা পাপ।’ সুতরাং তুমি পাপ করেছ। আর তোমাদের কাছে পাপ হচ্ছে কুফর। অতএব, তুমি আগে কুফর থেকে তাওবা করো।’ খারেজি নেতা বলল, ‘সত্য বলেছেন। ঠিক আছে, আমি কুফর থেকে তাওবা করছি। আপনিও তাওবা করুন।’ ইমাম বললেন, ‘আমি আল্লাহর কাছে সকল প্রকারের কুফর থেকে তাওবা করছি।’ তারা ইমামকে ছেড়ে দিলো।[৭৩]

ইমামপুত্র হাম্মাদ বর্ণনা করেন, যখন খারেজি সম্প্রদায় জানতে পারে ইমাম আবু হানিফা গুনাহের কারণে কোনো মুসলমানকে কাফের বলেন না, তখন তাদের সত্তর জন লোকের একটি দল কুফায় আসে। ইমামের আশেপাশে তখন অনেক ছাত্র ছিল। তারা তাকে ঘিরে রাখে। খারেজিরা ইমামকে লক্ষ্য করে বলল, আবু হানিফা, আমরা সবাই এক মিল্লাতের অনুসারী। লোকদের দূরে সরে যেতে বলুন। তিনি সবাইকে সরে যেতে বললেন। খারেজিরা ইমামের মাথার কাছে এসে তরবারি খুলে দাঁড়াল। অতঃপর তাকে লক্ষ্য করে বলল, হে আবু হানিফা, হে উম্মাহর দুশমন! তাদের কেউ কেউ বলল, হে উম্মাহর শয়তান! তোমাকে হত্যা করা আমাদের প্রত্যেকের কাছে সত্তর বছর জিহাদ করার চেয়ে উত্তম। কিন্তু আমরা তোমার উপর জুলুম করতে চাই না। ইমাম তাদের বললেন, ‘তাহলে কি ইনসাফ করতে চাও?’ তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ‘তবে সবার আগে তরবারি কোষবদ্ধ করো।’ তারা বলল, সেটা সম্ভব নয়। তোমার রক্ত দিয়ে আমরা এগুলো সিক্ত করতে চাই। ইমাম বললেন, ‘তবে আল্লাহর নাম নিয়ে কথা শুরু করো।’ তারা বলল, ধরুন মসজিদের দরজায় দুটো জানাযা আছে; একটা হলো পুরুষ লোকের, যে মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করে মারা গিয়েছে। আরেকটা এক নারীর, যে ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভবতী হওয়ার পর আত্মহত্যা করেছে। তাদের দুজনের বিধান কী? ইমাম বললেন, ‘তাদের দুজন কি ইহুদি ছিল?’ তারা বলল, না। ইমাম বললেন, ‘খ্রিষ্টান

৭৩. প্রাগুক্ত (১৪৯)।

ছিল?' তারা বলল, না। ইমাম বললেন, 'অগ্নিপূজক ছিল?' তারা বলল, না। ইমাম বললেন, 'তাহলে তারা কোন ধর্মের ছিল?' তারা বলল, যে ধর্ম বলে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনা ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসুল। ইমাম বললেন, 'তবে এবার আমাকে বলো, এই সাক্ষ্য ঈমানের কতটুকু অংশ? অর্ধেক নাকি এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ?' তারা বলল, ঈমানের মাঝে কোনো বিভাজন হয় না। তিনি বললেন, 'তাহলে এই সাক্ষ্য ঈমানের কতটুকু অংশ?' তারা বলল, এটাই পূর্ণ ঈমান। তিনি বললেন, 'তোমরা নিজের মুখেই স্বীকার করেছ তারা দুজন মুমিন ছিল। তাহলে আবার এমন প্রশ্ন কেন?' তারা বলল, এসব বাদ দিন। আমরা জানতে চাচ্ছি তারা জান্নাতি নাকি জাহান্নামি? ইমাম বললেন, 'এটা তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। যদি বলতেই হয়, তবে আমি তাদের ব্যাপারে সে কথা বলব, যা আল্লাহর নবি নুহ আ. তাদের চেয়েও অধিক অপরাধী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলেছিলেন, ﴿قَالَ وَمَا عِلۡمِی بِمَا كَانُوا۟ یَعۡمَلُونَ﴾ অর্থ : 'নুহ বললেন, তারা কী কাজ করত আমি কীভাবে বলব?' [শুআরা : ১১২] যেমনটা আল্লাহর খলিল ইবরাহিম আ. তাদের দুজনের চেয়ে অত্যন্ত জঘন্য অপরাধী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলেছিলেন, ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضۡلَلۡنَ كَثِیرࣰا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِی فَإِنَّهُۥ مِنِّی وَمَنۡ عَصَانِی فَإِنَّكَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ﴾ অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব, যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার দলভুক্ত; আর যে আমার অবাধ্য হলো, নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।' [ইবরাহিম : ৩৬] যেমনটা ঈসা ইবনে মারইয়াম তাদের দুজনের চেয়ে গর্হিত অপরাধে নিমজ্জিত সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলেছিলেন, ﴿إِن تُعَذِّبۡهُمۡ فَإِنَّهُمۡ عِبَادُكَۖ وَإِن تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِیزُ ٱلۡحَكِیمُ﴾ অর্থ : 'যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [মায়িদা : ১১৮] আমি সে কথা বলব যা অবতীর্ণ হয়েছিল আমাদের নবি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর : ﴿وَلَاۤ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِی خَزَاۤىِٕنُ ٱللَّهِ وَلَاۤ أَعۡلَمُ ٱلۡغَیۡبَ وَلَاۤ أَقُولُ إِنِّی مَلَكࣱ وَلَاۤ أَقُولُ لِلَّذِینَ تَزۡدَرِیۤ أَعۡیُنُكُمۡ لَن یُؤۡتِیَهُمُ ٱللَّهُ خَیۡرًاۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا فِیۤ أَنفُسِهِمۡ إِنِّیۤ إِذࣰا لَّمِنَ ٱلظَّـٰلِمِینَ﴾ অর্থ : 'আর আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার রয়েছে। এ কথাও বলি না যে, আমি গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ জানি। এ কথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আর আমি এ কথা বলি না যে, তোমাদের দৃষ্টিতে যারা ক্ষুদ্র-নগণ্য, আল্লাহ তাদের কোনো কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হব।' [হুদ : ৩১] ইমামের এসব কথা শুনে

তারা বলল, আমাদের মুক্ত করলেন। আল্লাহ আপনাকেও মুক্ত করুন। আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাঁর কাছে আমাদের সকল বিভ্রান্তি থেকে তাওবা করছি। অতঃপর তারা খারেজি মতাদর্শ ত্যাগ করে আহলে সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গেল।[৭৪]

খারেজিরা আলি ও মুআবিয়া রাযি.-সহ সিফফিনের 'তাহকিম' [সালিশ নিয়োগ]-এর ঘটনার সঙ্গে জড়িত সাহাবাদের কাফের মনে করত। তাদের সমর্থন করার কারণে আহলে সুন্নাতকেও তারা বিভ্রান্ত ও কাফের আখ্যা দিত। খারেজিরা যখন কুফা দখল করে নিল, তখন ইমামকে তাওবা করতে বলল। ইমাম বললেন, 'কীসের তাওবা?' তারা বলল, আলি ও মুআবিয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্টি থেকে তাওবা। তিনি বললেন, 'তোমরা আমার সঙ্গে মুনাযারা করবে?' তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'যদি কোনো বিষয়ে আমাদের দ্বিমত হয়, তবে সেটা কে নিরসন করবে?' তারা তাদের একজনকে দেখিয়ে বলল, অমুক। ইমাম বললেন, 'তাকে আমাদের মাঝে মীমাংসাকারী হিসেবে তোমরা রাজি?' তারা বলল, হ্যাঁ। ইমাম বললেন, "এই তোমরাও তো 'তাহকিম'-এর সমর্থক।" (অর্থাৎ আলি ও মুআবিয়াকে যে কারণে তোমরা কাফের মনে করো, একই কারণ তো তোমাদের মাঝেও বিদ্যমান!) তখন তারা চুপ হয়ে গেল।[৭৫]

কাদারিয়্যাহদের বিরুদ্ধে ইমাম

বাশশার ইবনে কিরাত বর্ণনা করেন, একবার কুফায় কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের সত্তর জন ফকিহ আগমন করেন। তারা কুফার মসজিদে তাকদির বিষয়ে কথা বলেন। আবু হানিফা রহ.-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন, 'গোমরাহি প্রচার করতে এসেছে।' আবু হানিফা রহ.-এর এ মন্তব্য শুনে তারা তাঁর কাছে এসে বলল, আমরা আপনার সঙ্গে মুনাযারা করতে চাই। তিনি বললেন, 'কী বিষয়ে?' তারা বলল, তাকদির বিষয়ে। ইমাম বললেন, 'তোমরা কি জানো তাকদিরের দিকে তাকানো দ্বিপ্রহরের সূর্যের দিকে তাকানোর মতো—যতই সেদিকে তাকাবে, ততই অস্থিরতা বাড়বে?' তারা (কৌশলের আশ্রয় নিয়ে) বলল, তাহলে আল্লাহর ফয়সালা ও ইনসাফ (কাযা ও আদল) নিয়ে বিতর্ক করব। ইমাম বললেন, 'ঠিক আছে, আল্লাহর নামে শুরু করো।'

---

৭৪. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১১৫-১১৬)। মানাকিব, মক্কি (১০৮-১০৯)। বাযযাযি (১৮১-১৮২)।

৭৫. আল-ইনতিকা (৩০৭)।

কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় : কোনো মানুষের আল্লাহর দুনিয়ায় তাঁর ফয়সালার বাইরে কিছু করার সাধ্য আছে? (তাহলে কাফেরদের দোষ কী?)

ইমাম : না। তবে ফয়সালা দুই প্রকার। একটা হলো ওহির নির্দেশ তথা অপার্থিব, আরেকটা হলো পার্থিব। পার্থিব নির্দেশ চূড়ান্তরূপে বাস্তবায়িত হয়। বিপরীতে ওহির নির্দেশ। এখানেও আল্লাহর ফয়সালা আছে (কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে মানুষকে স্বাধীনতা দেন)। ফলে তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে কুফরের ফয়সালা করেন, কিন্তু সেটার নির্দেশ দেন না; বরং উলটো নিষেধ করেন (ফলে মানুষ নিজ ইচ্ছামতো ঈমান ও কুফর বেছে নিতে পারে)।

কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় : আল্লাহর নির্দেশ কি তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, নাকি সাংঘর্ষিক?

ইমাম : আল্লাহর নির্দেশ তাঁর ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইচ্ছা নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয় (অর্থাৎ, যখন নির্দেশ দেন, তখন নিজের ইচ্ছাতেই দেন। কিন্তু নির্দেশ দিলেই সেটা বাস্তবায়নের ইচ্ছা করবেন, সেটা জরুরি নয়। ফলে নির্দেশ দেওয়ার পরও কোনোটা বাস্তবায়িত নাও হতে পারে)। যেমন—ইবরাহিম আ.-এর ব্যাপারে আল্লাহর বক্তব্য : ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْۤ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ﴾ অর্থ : "এরপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলো, তখন ইবরাহিম বলল, 'বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাই করছি। এখন তোমার অভিমত কী, বলো।' সে বলল, 'হে আমার পিতা, আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন'।" [সাফফাত : ১০২] এখানে না চাইলেও ধৈর্যশীল হবেন এমন কথা বলেননি। কারণ, এটা তাঁর নির্দেশ (আর ইচ্ছা নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়)। যেহেতু তার যবাই হওয়া আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না, তাই তাকে যবাই হতে হয়নি।

কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় : ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ﴾ অর্থ : 'ইহুদিরা বলে উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে মসিহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মতো কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। কোন

উলটো পথে যাচ্ছে তারা?' [তাওবা : ৩০] আল্লাহ কি নিজের ব্যাপারে চেয়েছেন যে, তাকে গালি দেওয়া হবে অথবা তার জন্য স্ত্রী ও সন্তান নির্ধারণ করা হবে?

ইমাম : আল্লাহ নিজের উপর কোনো ফয়সালা করেন না, বরং বান্দাদের উপর ফয়সালা করেন। নিজের উপর ফয়সালা করলে তিনি নিজেও তাকদিরের ভিতরে পড়ে যান (অর্থাৎ, ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা নিজেদের জন্য আল্লাহর সমালোচনাকে বেছে নিয়েছে, তখন আল্লাহ তাদের ব্যাপারে উক্ত ফয়সালা দিয়েছেন, অর্থাৎ সমালোচনার সুযোগ ও ক্ষমতা দিয়েছেন। নিজ থেকে নিজের বিরুদ্ধে তাদের সমালোচনার নির্দেশ ও তৌফিক দিয়েছেন—এমন নয়)।

কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় : আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কাছ থেকে কুফর চান, তিনি কি তার প্রতি ইনসাফ করলেন, নাকি জুলুম করলেন?

ইমাম : নির্দেশের বিরোধিতার নাম জুলুম। আল্লাহ এটা থেকে পবিত্র। কারণ, তিনি বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের কাছ থেকে ঈমান চান (অর্থাৎ, আল্লাহ বান্দাদের থেকে ঈমান চান, তাদের ঈমানের নির্দেশ দেন। ফলে আল্লাহ ইনসাফগার। বিপরীতে মানুষ নিজে কুফর বেছে নিয়ে আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করে। ফলে মানুষ নিজে জালেম)।

কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় : আবু হানিফা, আপনি কি মুমিন?

ইমাম : আলবত।

কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় : আপনি কি আল্লাহর কাছেও মুমিন?

ইমাম : তোমরা কি আমার জানার থাকা কথা জানতে চাইছ, নাকি আল্লাহর কাছে যেটা আছে সেটা?

কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় : আপনার যেটা জানা সেটা বলুন, আল্লাহরটা না।

ইমাম : আমি যেটা জানি সেটা হলো আমি মুমিন। আল্লাহর কাছে কী আছে সেটা আমার জানা দরকার নেই (অর্থাৎ, পরিণতির ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি সদিচ্ছা রেখে নিজের দায়িত্ব নিজে পালন করে যাওয়া মুমিনের কাজ)।

কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় : আবু হানিফা, কত দিন পর্যন্ত মানুষকে গোমরাহ করতে থাকবেন?

ইমাম : গোমরাহ তিনিই করতে পারেন, যিনি হেদায়াত দিতে পারেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দেন, যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন।[৭৬]

---

৭৬. আল-ইনতিকা (৩১৫-৩১৭)।

আলি ইবনে হারমালা এবং ইমামপুত্র হাম্মাদ বর্ণনা করেন, (কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের নেতা) গায়লান দিমাশকির এক শাগরেদ শাম থেকে কুফায় এলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল আবু হানিফা রহ.-এর সঙ্গে তাকদির বিষয়ে বিতর্ক করা। ইমাম তাকে বললেন, তোমার প্রশ্ন উত্থাপন করো।

আগন্তুক বললেন : আল্লাহ তায়ালা ফিরাউনের জন্য কী চেয়েছেন?

ইমাম : আল্লাহ তার জন্য কুফর চেয়েছেন।

আগন্তুক : ইবলিস ফিরাউনের জন্য কী চেয়েছে?

ইমাম : ইবলিস তার জন্য কুফর চেয়েছে।

আগন্তুক : ফিরাউন নিজের জন্য কী চেয়েছে?

ইমাম : সে নিজের জন্য কুফর চেয়েছে।

আগন্তুক : মুসা আ. ফিরাউনের জন্য কী চেয়েছেন?

ইমাম : মুসা আ. তার জন্য ঈমান চেয়েছেন।

আগন্তুক : তাহলে কি মুসার চাওয়া আল্লাহর চাওয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, আর ইবলিসের চাওয়া আল্লাহর চাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে গেল না? কারণ, আল্লাহ কুফর চেয়েছেন, ইবলিসও কুফর চেয়েছে; অথচ মুসা আল্লাহর চাওয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে তার জন্য ঈমান চেয়েছেন!

ইমাম : না। কারণ, আল্লাহ ফিরাউনের জন্য কুফর চেয়েছেন। ইবলিসের জন্য চেয়েছেন সে যেন ফিরাউনের জন্য কুফর চায়। ফিরাউনের জন্য চেয়েছেন সে যেন নিজের জন্য কুফর চায়। আর মুসার জন্য চেয়েছেন তিনি যেন ফিরাউনের জন্য ঈমান চান। ফলে ইবলিসের চাওয়া, ফিরাউনের চাওয়া এবং মুসার চাওয়া— সবগুলো আল্লাহর চাওয়ার অধীনে।

আগন্তুক : (ইমামের জবাব শুনে হতভম্ব হয়ে) আল্লাহ মুসলমানদের জন্য আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। আমার অতীতের বক্তব্য থেকে তাওবা করছি। কিন্তু আমার প্রকৃত তাওবা কীভাবে হবে? ইমাম বললেন, 'তোমার তাওবা হলো, শামে ফিরে গিয়ে যাদের এতদিন বিভ্রান্ত করেছ, তাদের হেদায়াতের পথে ফিরিয়ে আনবে।' তখন লোকটি তাওবা করে

শামে ফিরে গেল। সেখানকার বিভ্রান্ত লোকদের মাঝে দাওয়াত ও মুনাযারার কাজ করতে লাগল। একসময় অনেক লোক তার হাত ধরে সুন্নাহর পথে ফিরে এলো।[৭৭]

মুতাযিলাদের বিরুদ্ধে ইমাম

মুতাযিলাদের বিভিন্ন সংশয় ও বিভ্রান্তি নিরসনেও ইমামের ভূমিকা ছিল সরব। তাদের সঙ্গে তিনি মুনাযারা করতেন, তাদের খণ্ডন করতেন। একবার মুতাযিলা ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা আমর ইবনে উবাইদ ইমাম আজম রহ.-এর কাছে এসে প্রশ্ন করল :

আমর : মানুষের কর্মের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

ইমাম : আল্লাহর সৃষ্টি, বান্দার কামাই।

আমর : তাহলে বান্দা যা করে না, আল্লাহ সেটা সৃষ্টি করেন না?

ইমাম : এভাবে বলা যাবে না; বরং এভাবে বলতে হবে—আল্লাহ সৃষ্টি করেন, বান্দা কর্ম করে। কারণ, আল্লাহ মানুষের কর্মেরও সৃষ্টিকর্তা।

আমর : এটা তো যৌক্তিক কথা হলো না।

ইমাম : বরং এটাই যৌক্তিক। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির মৃত্যুদানকে কখনো নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, তিনি বলেন, ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ অর্থ : 'আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময়।' [যুমার : ৪২] কখনো একজন মৃত্যুর ফেরেশতার দিকে সম্পৃক্ত করেছেন : ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ অর্থ : 'বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে।' [সাজদা : ১১] আবার কখনো একাধিক ফেরেশতার দিকে সম্পৃক্ত করেছেন: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ 'তিনি স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী, আর তিনিই তোমাদের জন্য রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায়, আর তারা কোনো ত্রুটি করে না।' [আনআম : ৬১] এই সম্পৃক্ততা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে। একইভাবে আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন, ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾ অর্থ : 'তোমরা তাদের

---

৭৭. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১২২)। তালবিসুল আদিল্লাহ (৭৪৩-৭৪৪)। কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় মূলত আল্লাহ কর্তৃক মানুষের জন্য নির্ধারিত তাকদিরকে অস্বীকার করত। ফলে ইমাম তাদের এভাবে জবাব দিয়েছেন। এটা থেকে আবার কেউ যেন মনে না করেন যে, মানুষ বাধ্য ও পরাধীন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা তাকদিরের উপর ঈমান অধ্যায়ে দেখুন।

হত্যা করোনি, আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। (হে রাসুল) আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।' [আনফাল : ১৭] এখানেও আল্লাহ তায়ালা হত্যাকে কখনো নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। এটা সৃষ্টি হিসেবে। কিন্তু মূল কাজ মানুষই করেছে। একইভাবে নিক্ষেপটা সৃষ্টি হিসেবে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। নতুবা এটা করেছেন রাসুলুল্লাহ নিজেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই। সুতরাং যে আল্লাহর গুণকে সৃষ্টির উপর প্রয়োগ করল, সে যেন আল্লাহর সঙ্গে শিরক করল! পৃথিবীতে অসংখ্য উপাস্য বানাল!

ইমামের এ কথা শুনে আমর নীরবে উঠে চলে গেল।[৭৮]

মুতাযিলাদের বিভিন্ন কুতর্কের ব্যাপারে ইমাম ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। তাকে 'জিসম' (দেহ) ও 'আরাজ' (অমৌল; রূপ-রং) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, **'আমর ইবনে উবাইদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। সে মুসলমানদের উপর এটা নিয়ে বিতর্কের দরজা উন্মুক্ত করেছে।'**[৭৯]

নুহ আল-জামি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হানিফাকে জিজ্ঞাসা করলাম 'জিসম', 'আরাজ' ইত্যাদি নিয়ে মানুষ যেসব নতুন কথা শুরু করেছে, সে ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী? তিনি বললেন, "এগুলো দার্শনিকদের কথা। 'আসার' তথা সুন্নাত ও সালাফের অনুসরণ করো। প্রত্যেক নবসৃষ্ট বিষয় থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, সেগুলো বিদআত।"[৮০]

শিয়াদের বিরুদ্ধে ইমাম

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো শিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও ইমাম আজম রহ. সংগ্রাম করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে মুনাযারা করেছেন। বিশেষত কুফায় বসবাসকারী শিয়া নেতা মুহাম্মাদ ইবনে আলি আল-বাজালির সঙ্গে তিনি একাধিকবার বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাকে পরাস্ত করে আহলে সুন্নাতের আকিদার বিজয়-নিশান উড়িয়েছেন।[৮১]

---

৭৮. তালবিসুল আদিল্লাহ (৬৬৫-৬৬৬)।

৭৯. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/২৬১-২৬২)। শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৩৪-৩৫)।

৮০. যাম্মুল কালাম ওয়া আহলিহি (৫/২০৭)।

৮১. দেখুন : মিনহাজুস সুন্নাহ (৮/১৯৮)।

শানে সাহাবার ইজ্জত-আবরু রক্ষার ক্ষেত্রেও রাফেযিদের বিরুদ্ধে ইমামের সংগ্রাম প্রসিদ্ধ। ইয়াহইয়া ইবনে নসর ইবনে হাজেব মারওয়াযি বলেন, 'ইমাম আজম রাসুলুল্লাহর সাহাবাদের প্রতি সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাশীল (মুআদ্দাব) ছিলেন। তাদের ব্যাপারে সর্বোত্তম কথা বলতেন।'[৮২] ফলে স্বাভাবিকভাবেই সাহাবিবিদ্বেষী রাফেযিদের তিনি অপছন্দ করতেন। তাদের সাহাবাবিদ্বেষী মতাদর্শকে ঘৃণা করতেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকে বর্ণিত, নুহ ইবনে আবি মারইয়াম ইমামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করব? তিনি বললেন, 'প্রত্যেক ইনসাফগার সত্যে অবিচল (আদল) ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করো। তবে রাফেযিদের কাছ থেকে গ্রহণ করো না। কেননা, তাদের মাযহাবের ভিত্তিই হচ্ছে নবিজির সাহাবাদের গোমরাহ বলা। আবু বকর ও উমরকে শ্রেষ্ঠ বলো। আলি ও উসমানকে ভালোবাসো। তাদের যে ভালো না বাসে, তার থেকে হাদিস গ্রহণ করো না।'[৮৩]

ইমাম রাফেযিদের খণ্ডনে আরও বলেন, **'খাদিজাতুল কুবরার পরে আয়েশা রাযি. জগতের নারীদের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি মুমিনদের মাতা (উম্মুল মুমিনিন)। ব্যভিচার থেকে পূত-পবিত্র। রাফেযিদের অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যদি তাকে কেউ ব্যভিচারিণী বলে, তবে সে নিজে ব্যভিচারের ফসল (হারামজাদা)।'**[৮৪] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সাহাবা-সংক্রান্ত আকিদা অধ্যায়ে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

মুরজিয়াদের বিরুদ্ধে ইমাম

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো ভ্রান্ত মুরজিয়াদের বিরুদ্ধেও ইমাম সংগ্রাম করেছেন। মুনাযারা ও বিতর্ক করে তাদের ভ্রান্তি উন্মোচিত করেছেন। বিভিন্ন সময় তাদের ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডন করেছেন। ঈমানের প্রশ্নে জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় মুরজিয়া। ফলে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মূলত মুরজিয়াদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম। এ ছাড়াও ইমাম আজম তাঁর আকিদাবিষয়ক গ্রন্থগুলোতে ঈমান ও ইরজা, ঈমান ও আমল ইত্যাদি সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে মুরজিয়াদের নানান ধারার সকল ভ্রান্তি খণ্ডনপূর্বক এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের বিশুদ্ধ আকিদা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

---

৮২. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৫৭)।

৮৩. প্রাগুক্ত (১৫৮)।

৮৪. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৬১)।

ইমাম আজম রহ. একদিন কুফার মসজিদে ছিলেন। তখন একব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, আপনি কি মুরজিয়া? ইমাম আবু হানিফা বললেন, "আমি আল্লাহর 'রাজি' (আশাবাদী)। আল্লাহ তায়ালা কুরআনেও জানিয়েছেন তাঁর বান্দাদের মাঝে কিছু 'মুরজাআ' (যাদের পরিণতি স্থগিত/আল্লাহর কাছে সমর্পিত) আছে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ অর্থ : 'আল্লাহর আদেশের প্রতীক্ষায় অন্য কিছু লোকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকল। তিনি তাদের শাস্তি দেবেন অথবা ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' [তাওবা : ১০৬] আল্লাহ চাইলে তাদের গুনাহের কারণে তাদের শাস্তি দিতে পারেন। আবার চাইলে নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করতে পারেন। সুতরাং আমি যদি আল্লাহর গুনাহগার বান্দাদের পরিণতি তাদের সৃষ্টিকর্তার হাতে 'ইরজা করি' (সঁপে দিই), তবে আমাকে নিষেধ করো না (মুরজিয়া বলো না)। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ তাদের ক্ষমার ঘোষণা করেছেন, ﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ﴾ অর্থ : 'তোমাদের উপর যেসব বিপদাপদ পতিত হয়, সেগুলো তোমাদের কর্মের ফল। উপরন্তু তিনি তোমাদের অনেক অপরাধ ক্ষমা করে দেন'।" [শুরা : ৩০]

আগন্তুক : খুনি ও ব্যভিচারীর ব্যাপারে আপনার মত কী? আল্লাহ কি তাকে জাহান্নামের শাস্তি দেবেন না?

ইমাম : যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মুখে স্বীকৃতি দেয়, অন্তরে বিশ্বাস করে, পরকাল, পুনরুত্থান এবং গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে, তবে তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে—এমন কথা বৈধ নয়। আল্লাহ চাইলে তাদের অপরাধ পরিমাণ শাস্তি দিতে পারেন; চাইলে একেবারেই শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

আগন্তুক : চিরস্থায়ী শাস্তি দিতে কী সমস্যা?

ইমাম : কারণ, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যার অন্তরে এক দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে।' রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেছেন, 'আগুনে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়ার পরে আমার শাফায়াতের মাধ্যমে একদল মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।'[৮৫]

দাহরিয়্যাহদের বিরুদ্ধে ইমাম

আকিদাগত বিভিন্ন বিচ্যুতি এবং বিভ্রান্ত ফিরকার বিরুদ্ধে ইমামের অব্যাহত সংগ্রামের কারণে একাধিকবার তাঁর জীবন সংকটের মাঝে পতিত হয়েছে।

---

৮৫. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৪৮-১৪৯)।

দাহরিয়্যাহ (বস্তুবাদী নাস্তিক) সম্প্রদায়কে তিনি কঠোরভাবে খণ্ডন করতেন; অথচ তারা সে সময় অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তাদের সংখ্যাও অনেক বেশি ছিল। কিন্তু ইমাম তাদের শক্তি ও সংখ্যাধিক্যকে পরোয়া করতেন না। বিশুদ্ধ আকিদা প্রচার করতেন। তাদের বিভ্রান্তির মুখোশ উন্মোচন করতেন। ফলে তারা ইমামকে হত্যার সুযোগ খুঁজত। একাধিকবার তারা ইমামের উপর সশস্ত্র আক্রমণ করেছে এমন ঘটনাও ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে প্রমাণিত।

মক্কি বর্ণনা করেন, একদিন ইমাম তার মসজিদে একা ছিলেন। তখন একদল দাহরিয়্যিন তার উপর তরবারি ও ছুরি নিয়ে আক্রমণ করে। তারা তাকে হত্যার উপক্রম করে। তখন ইমাম তাদের বলেন, 'একটু সবর করো! আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যা মন চায় করো।' তারা বলল, কী প্রশ্ন? তিনি বললেন, 'সে ব্যক্তির ব্যাপারে তোমাদের কী বক্তব্য যে বলে, আমি তরঙ্গোদ্‌বেল সমুদ্রে একটি মালবোঝাই জাহাজ দেখেছি যেটা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ এবং ঝোড়ো হাওয়ার মাঝেও ডানেবামে না গিয়ে সোজা ধীরস্থিরভাবে চলছে, অথচ তাতে কোনো মাঝিমাল্লা নেই, পাল-মাস্তুল নেই। এই কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?' তারা বলল, কখনো নয়। এটা কোনো যৌক্তিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক কথা নয়। ইমাম বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! মাঝিমাল্লাবিহীন একটি নৌকা যদি সমুদ্রে সোজাভাবে চলতে না পারে, তবে এই বিশাল পৃথিবী, পৃথিবীতে বিদ্যমান এত রং ও রূপ, এত সৃষ্টি ও বৈচিত্র্য—এগুলো কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এমনিতেই অস্তিত্বে চলে এসেছে? কোনো রক্ষাকর্তা ছাড়া এমনিতেই বিদ্যমান রয়েছে?' ইমামের কথা হামলাকারীদের মনে দারুণ প্রভাব ফেলল। সকলে কাঁদতে কাঁদতে ইমামকে বলল, আপনি সত্য বলেছেন। অতঃপর তারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে ইমামের হাতে তাদের গোমরাহি থেকে তাওবা করে ঈমানে ফিরে এলো।[৮৬]

অভ্যন্তরীণ লড়াই (অভিযোগ-অপবাদ)

বিভ্রান্ত ফিরকার বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রামের পাশাপাশি ইমামকে অভ্যন্তরীণ সংকটও মোকাবিলা করতে হয়েছে সমানভাবে। কখনো বিভ্রান্ত ফিরকার অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডার ফলে, আবার কখনো ভুল বোঝাবুঝির ফলে, কখনো মতাদর্শিক পার্থক্যের টানাপোড়েনে, আবার কখনো-বা **স্রেফ হিংসার বশবর্তী হয়ে** খোদ আহলে সুন্নাতের অনুসারী বিভিন্ন ব্যক্তি ইমামের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছেন, তাঁর শক্ত সমালোচনা করেছেন। তাদের অভিযোগ—ইমাম আবু হানিফা

৮৬. মানাকিব, মক্কি (১৫১)।

কুরআনকে 'মাখলুক' বলেন। আর যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলে, সে কাফের। ফলে তারা এ যুক্তিতে ইমাম আজমকে **'মুশরিক'** আখ্যা দেন।[৮৭] অথচ ইমাম আজমের উপর এটা সর্বৈব মিথ্যাচার। তিনি জীবনের কোনো এক মুহূর্তেও কুরআনকে মাখলুক বলেননি। তাঁর কোনো শাগরেদ বা শাগরেদের শাগরেদও কুরআনকে মাখলুক বলেননি। বরং উলটো জাহম ইবন সাফওয়ান এবং জাহমিয়্যাহদের এই বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে ইমাম আজম এবং তাঁর শাগরেদরা নিরন্তর লড়াই চালিয়েছেন। অথচ শেষে তাদের ঘাড়েই জাহমিয়্যাহদের এই অপবাদ চাপিয়ে মুশরিক বলা হয়েছে! 'জাহমি অবস্থায় তিনি মারা গেছেন' বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে![৮৮] নাউযুবিল্লাহ! কুরআন-সংক্রান্ত আলোচনায় এর বাস্তবতা বিস্তারিত দেখব, ইনশাআল্লাহ।

আরেক দল তাকে **মুরজিয়া** আখ্যা দিয়েছে। তারা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণি হলো ভ্রান্ত খারেজি, মুতাযিলা ও মুরজিয়া সম্প্রদায়। গাসসানিয়্যাহ মুরজিয়ারা ইমামকে মুরজিয়া হিসেবে প্রচার করত ইমামের নামের মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শ সহজে মানুষের মাঝে বিকানোর উদ্দেশ্যে। খারেজি ও মুতাযিলারা তাকে মুরজিয়া বলে অপ্রপচার চালাত তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন বলে।[৮৯]একদিকে ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অপপ্রচার, অপরদিকে ইমাম আজমের কিছু বক্তব্য ভুল বুঝে স্বয়ং আহলে সুন্নাতের ইমামগণ নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হন। তারা ইমামকে মুরজিয়া আখ্যা দিতে থাকেন। কারণ, ইমাম তাত্ত্বিকভাবে আমলকে ঈমানের সংজ্ঞার্থের অন্তর্ভুক্ত করতেন না। কবিরা গুনাহকারীর পরিণাম আখেরাতে আল্লাহর কাছে ছেড়ে দিতেন। এটাকে 'ইরজা' তথা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা বলতেন। এ থেকেই তারা তাঁর নাম দিয়েছেন মুরজিয়া। অথচ ভ্রান্ত মুরজিয়া আর ইমাম আজমের 'ইরজা'র মাঝে আকাশপাতাল তফাত। ভ্রান্ত মুরজিয়ারা মনে করে ঈমানের সঙ্গে আমলের কোনো সম্পর্কই নেই। সুতরাং কেউ ঈমান আনার পরে যত অন্যায়-অপরাধ করুক, ঈমানের কোনো ক্ষতি হয় না। বিপরীতে ইমাম আজম রহ. মনে করতেন আমল ঈমানের জন্য আবশ্যক

---

৮৭. দেখুন : আল-ইবানাহ আন উসুলিদ দিয়ানাহ, আবুল হাসান আশআরি (২৯)। খালকু আফআলিল ইবাদ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারি (৭)। আত তারিখুল কাবির, বুখারি (৪/১২৭)। তারিখে বাগদাদ, আবু বকর খতিবে বাগদাদি (১৫/৫১৮)।

৮৮. দেখুন : তারিখে বাগদাদ (১৫/৫১৩)।

৮৯. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, আবদুল করিম শাহরাস্তানি (১/১৪১)।

ফলাফল—গুনাহ ঈমানের ক্ষতি করে। গুনাহগারকে আল্লাহ চাইলে পরকালে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারেন।[৯০] এটা সকল আহলে সুন্নাতের আকিদা। উপরন্তু ইমাম আজীবন মুরজিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, তাদের ভ্রান্তি উন্মোচিত করেছেন, যেমনটা পিছনে উদাহরণ দেখানো হয়েছে, সামনেও এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

এতকিছুর পরও ইমামের উপর আক্রমণ বন্ধ হয়নি; বরং মুরজিয়া অপবাদ ইমামকে রীতিমতো বিমর্ষ করে তোলে। ইমামের অনেক কাছের মানুষও তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ করতে থাকেন। ফলে তাঁকে চিঠি লিখে স্পষ্ট করতে হয় যে, তিনি মুরজিয়া নন। উসমান আল-বাত্তির (১৪৮ হি.) কাছে ইমামের 'আর-রিসালা' চিঠির মূল প্রেক্ষাপট এই অভিযোগেরই খণ্ডন। সেখানে ইমাম বলেন, **"আপনার কাছে নাকি সংবাদ পৌঁছেছে যে, আমি মুরজিয়া। কুরআন এবং রাসুলুল্লাহর সুন্নাহর বাইরে মুক্তির কোনো পথ নেই। এর বাইরে যা-কিছু আছে, সব ভ্রষ্টতা ও বিদআত। তাই আমার বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করুন। মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে সতর্ক থাকুন। আমি আল্লাহর কাছে আমার নিজের জন্য এবং আপনার জন্য রহমত ও তৌফিক কামনা করছি। ...সুতরাং আমার বক্তব্য হলো, আহলে কিবলার সকলে মুমিন। ফরয ইবাদতের ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতির কারণে আমি কাউকে ঈমান থেকে বের করে দিই না। যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে সকল ফরয বিধান মেনে চলবে, সে আমাদের কাছে 'জান্নাতের অধিকারী' বিবেচিত হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমান ও আমল দুটোই ছেড়ে দেবে, সে জাহান্নামের অধিবাসী কাফের বিবেচিত হবে। আর যে ঈমানকে ঠিক রেখে ফরযের ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি করবে, সে আমাদের কাছে গুনাহগার মুমিন গণ্য হবে। পরকালে সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থাকবে—চাইলে তিনি শাস্তি দেবেন, চাইলে বিনা শাস্তিতে ক্ষমা করে দেবেন।"** ...চিঠির শেষে ইমাম তাঁর মুরজিয়া হওয়াকে গোমরাহ ফিরকাগুলোর পক্ষ থেকে অপবাদ সাব্যস্ত করে বলেন, **'এক সম্প্রদায় ইনসাফের সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু বিদআতিরা তাদের মুরজিয়া আখ্যা দিয়েছে; অথচ তারা মুরজিয়া নয়, বরং তারা ইনসাফের পতাকাবাহী আহলে সুন্নাত। বিদ্বেষবশত সেসব সম্প্রদায় তাদের এই অপবাদ দিয়েছে।'**[৯১]

---

৯০. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২৩)।

৯১. রিসালাতু আবি হানিফা ইলা উসমান আল-বাত্তি (৩৪-৩৮)।

এর পরও তারা থামেননি। ফলে আজও একশ্রেণির মানুষ ইমাম ও তাঁর শাগরেদদের 'মুরজিয়াতুল ফুকাহা' বলার মাঝে তৃপ্তি খোঁজেন। আকিদার ক্ষেত্রে ইমামের উচ্চাবস্থান ও গ্রহণযোগ্যতাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। সহজে গ্রহণ করতে পারেন না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আমরা 'ঈমান ও ইরজা' অধ্যায়ে করব, ইনশাআল্লাহ।

অন্য একদল ইমাম আজমকে পরকালে **'আল্লাহর দিদার অস্বীকারকারী'** আখ্যা দেয়; অথচ ইমাম তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর দিদার সংঘটনের স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে এটাও যে ভিত্তিহীন অপপ্রচার ছিল, সেটা স্পষ্ট। কিন্তু তাতেও প্রোপাগান্ডা থামেনি। শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারেও তাকে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে চিঠি লিখতে হয়েছে। যেমন—জনৈক ব্যক্তির কাছে পাঠানো একটি চিঠিতে ইমাম বলেন, **"তুমি আমার নামে প্রচার করেছ যে, আমি নাকি জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহর দিদারে বিশ্বাস করি না! সুবহানাল্লাহ! এটা কী করে সম্ভব হতে পারে? আমি কী করে এমন কথা বলতে পারি? অথচ আল্লাহ বলেছেন, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ অর্থ : সেদিন কতক চেহারা হবে আলোকোজ্জ্বল; তাকিয়ে থাকবে তাদের পালনকর্তার দিকে।' [কিয়ামাহ : ২২-২৩] ফলে আমি যদি বলি আল্লাহকে দেখা যাবে না, সেটা তো কুরআনকে অস্বীকার করা হবে।"**[৯২]

এখানেই শেষ নয়। ইমাম থেকে জান্নাতে আল্লাহর দিদার-সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও ইমাম আবু হানিফার অনুসারী দাবিদার একদল জাহমিয়্যাহ সেগুলোর অর্থ বিকৃত করেছে। উদাহরণস্বরূপ : কারও দাবি, যদিও ইমাম বলেছেন পরকালে আল্লাহকে দেখা যাবে, কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর কাজ ও নিদর্শনাবলি দেখা। তাঁর সত্তাকে দেখা নয়।[৯৩] অথচ এটা ইমামের উপর অপবাদ, যা আমরা সামনে প্রমাণ-সহ দেখব, ইনশাআল্লাহ।

আরেক দল তাঁর নামে অভিযোগ করেছে, তিনি নাকি জান্নাত ও জাহান্নামকে ধ্বংসশীল বলতেন।[৯৪] এটাও ইমামের নামে সুস্পষ্ট মিথ্যাচার। তিনি কোনো দিন জান্নাত-জাহান্নামকে ধ্বংসশীল বলেননি। তাঁর আকিদার কিতাবগুলো এর সাক্ষী। বরং তিনি বলেছেন, **'জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্ট। বর্তমানে বিদ্যমান। কখনো ধ্বংস**

---

৯২. কালায়িদু উকুদিদ দুরার, আবুল কাসিম আল-ইয়ামানি (৫৯)।

৯৩. দেখুন : নাকজুদ দারেমি আল-বিশর আল-মারিসি (১/১৯৩)।

৯৪. তারিখে বাগদাদ (১৫/৫৩১)।

হবে না। জান্নাতের হুর কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। আল্লাহর শাস্তি কখনো শেষ হবে না। শেষ হবে না তাঁর প্রতিদান।'[১৫] ইমাম তাঁর ওসিয়তে বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য। এ দুটি সৃষ্টি, বর্তমানে বিদ্যমান। এগুলো কিংবা এগুলোর অধিবাসীরা কখনো ধ্বংস হবে না। আল্লাহ তায়ালা এ দুটো মুমিনদের পুরস্কার এবং কাফেরদের শাস্তির জন্য সৃষ্টি করেছেন।'[১৬]

সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, একটি বিশাল পুণ্যবানের দলও উপরে বর্ণিত জুলুমবাজদের সঙ্গে যোগ দেন। ফলে তারা মানবিক দুর্বলতা এবং স্রেফ মতাদর্শিক সংকীর্ণতার কারণে ইমামের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে যান। উম্মাহর কাছে ইমামের অবস্থান, গ্রহণযোগ্যতা, শুহরাত ও কবুলিয়্যাত ইত্যাদি তাদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তারা ইমামের নামে অযৌক্তিক ও অনৈতিক প্রোপাগান্ডা চালান। তাঁর অন্যায় সমালোচনা করেন। তাদের কেউ কেউ ইমামকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি আখ্যা দেন! কেউ আবার বলেন, ইসলামে তার চেয়ে অলক্ষুনে ও ক্ষতিকর কারও জন্ম হয়নি! খারেজিদের বিরুদ্ধে ইমামের অব্যাহত সংগ্রাম, খারেজি কর্তৃক তাকে তাওবা পড়ানো এবং ইবনে হুবাইরার পক্ষ থেকে প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাবকে নাকচ করার ফলে ইবনে হুবাইরার জুলুমের ঘটনাকে তারা 'কুফর থেকে তাওবা করানো' বলে প্রকাশ করেন![১৭] বরং একজন আরও জঘন্যভাবে বলেন, ছাগলের মতো তাঁর দাড়ি ধরে মানুষের মজলিসে মজলিসে ঘোরানো হতো আর তাওবা করানো হতো! একদল লোক তাঁর মৃত্যুতে উচ্ছ্বসিত স্বরে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়েন! বিশ্রী ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করেন! 'এক জাহমি মারা গেছে' বলে উল্লসিত হন। বরং তাদের কেউ কেউ বিদ্রুপ করে তাঁর নাম বিকৃত করে 'আবু হানিফা'র বদলে 'আবু জিফাহ' [শবের বাপ] বলে ডাকতেন![১৮]

এগুলো কোন শরিয়তে বৈধ? অথচ তাদের কেউ কেউ আহলে সুন্নাতের বড় আলেম ছিলেন! অবশ্য তারা না চিনলেও অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় ইমাম তাঁকে চিনেছিলেন। ইমাম শুবা ইবনুল হাজ্জাজের কাছে যখন ইমাম আজমের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছায়, তিনি দোয়া পড়ার পরে বলেন, 'কুফার ইলমের প্রদীপ নিভে গেল। তাঁর

---

১৫. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।
১৬. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৫৪-৫৬)।
১৭. ফাযায়িলু আবি হানিফা (৬৭, ৭৫)।
১৮. দেখুন : তারিখে বাগদাদ (১৫/৫১৩, ৫২৪, ৫৪৮, ৫০৬)। আস-সুন্নাহ, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ (১৩৮- ১৮৬)।

মতো আর কাউকে তারা পাবে না।'[৯৯] বরং সাধারণ মানুষও তাকে চিনেছিল। ফলে তাঁর জানাযায় এত অধিক সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়েছিল, যা কারও পক্ষে গণনা সম্ভব ছিল না। অত্যধিক মানুষ হওয়ার কারণে ছয়বার তাঁর জানাযা আদায় করা হয়। অত্যধিক ভিড়ের কারণে দাফনের কাজ বিলম্বিত হয়। বরং দাফনের পরও বিশ দিন পর্যন্ত মানুষ তাঁর কবরের কাছে এসে জানাযার নামায আদায় করে।[১০০]

বস্তুত ইমামের প্রতিপক্ষের এসব বক্তব্যের পক্ষে তাদের কাছে যৌক্তিক ও শক্তিশালী কোনো দলিল কিংবা কারণ ছিল না। স্রেফ অপপ্রচার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, যাচাই-বাছাই ছাড়া এগুলো গ্রহণ করেছেন, আবার অনেক সময় যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ত্রুটির শিকার হয়েছেন, কখনো ব্যক্তিগত দুর্বলতা তথা হিংসার কাছে নতিস্বীকার করে এসব বক্তব্য দিয়েছেন।[১০১] নতুবা তারা যদি ইখলাস ও ইহতিমামের সঙ্গে যাচাই করে দেখতেন, তবে বুঝতেন তাদের আকিদা ও মূলনীতির সঙ্গে ইমাম আজমের আকিদা ও মূলনীতির মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। তারা তাঁর ব্যাপারে যা বলেছেন, ভুল বলেছেন। ন্যায়নিষ্ঠ মুহাক্কিক আল্লামা ইবনে আবদিল বার লিখেন, 'ইমাম আজমকে মানুষ হিংসা করত। তাঁর ব্যাপারে মিথ্যাচার করত। তাঁর নামে এমন অনেক কথা বলত, যা তিনি কখনো বলেননি।'[১০২] বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ ও আহমদ ইবনে হাম্বলসহ অসংখ্য মুহাদ্দিসের শায়খ ও উস্তায ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনও এই তিক্ত বাস্তবতা স্বীকার করে তুলনামূলক নম্রভাবে বলেন, 'আমাদের লোকজন (তথা মুহাদ্দিসগণ) আবু হানিফার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছে।'[১০৩] সুফিয়ান সাওরিও সেটা বিনয়বশত স্বীকার করেছেন। সাইমারি বর্ণনা করেন—যখনই সাওরিকে কোনো সূক্ষ্ম মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো তিনি বলতেন—'এ ব্যাপারে একজন মানুষের চেয়ে আর কেউ ভালো বলতে পারবে না, অথচ আমরা তাকে হিংসা করেছি।' অতঃপর ইমাম আজমের শাগরেদদের জিজ্ঞাসা করতেন—এ ব্যাপারে আপনাদের শাইখের বক্তব্য কী; এবং তিনি সে অনুযায়ী ফাতাওয়া দিতেন।[১০৪]

---

৯৯. আখবারু আবি হানিফা, সাইমারি (৯০)।

১০০. দেখুন : আল-খাইরাতুল হিসান, হাইতামি (১৫৪)।

১০১. দেখুন : কাশফুল আসারিশ শরিফাহ, হারেসি (১/৩৩৭-৩৯)। ইবনে আবিল আওয়াম তাঁর জীবনীগ্রন্থে 'হিংসা'র ঘটনাগুলো নিয়ে আলাদা একটা অধ্যায় তৈরি করেছেন। দেখুন : ফাযায়িলু আবি হানিফা (৭৬)।

১০২. জামেউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহি (১০৮০)।

১০৩. দেখুন : প্রাগুক্ত (১০৮১)।

১০৪. দেখুন : আখবারু আবি হানিফা (৬৪)।

মোটকথা, ইমাম আজম রহ.-কে আল্লাহ তায়ালা অনেক ভালো মানুষের জন্য 'পরীক্ষা'স্বরূপ বানিয়েছিলেন। মানবিক ও নৈতিক এ পরীক্ষায় অনেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন, অনেকে হননি। এই গ্রন্থে এরচেয়ে বেশি আলোচনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাদের সবাইকে ক্ষমা করে ফিরদাউস নসিব করুন।

আহলে সুন্নাতের ইমাম : একদিকে ইমাম আজম রহ.-এর ইলমি সনদ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী; কারণ, তিনি নিজে তাবেয়িদের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে তাঁর শিক্ষকগণ প্রথম সারির তাবেয়ি, সাহাবাদের শাগরেদ এবং তাদের শাগরেদদের শাগরেদ। ফলে তিনি দ্বীন ও আকিদা গ্রহণ করেছেন এ উম্মাহর শ্রেষ্ঠ একদল মানুষের হাতে। খলিফা মনসুর ইমাম আজমকে জিজ্ঞাসা করলেন, নুমান, আপনি ইলম নিয়েছেন কাদের থেকে? ইমাম জবাবে বললেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাবের ছাত্রদের মাধ্যমে উমর থেকে। আলি ইবনে আবি তালিবের ছাত্রদের মাধ্যমে আলি থেকে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ছাত্রদের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস থেকে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ছাত্রদের মাধ্যমে ইবনে মাসউদ থেকে।' মনসুর বললেন, 'পবিত্র সব মানুষের সনদ আপনার হাতে।'[১০৫]

অন্যদিকে আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার সাগরসম গভীর জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিশুদ্ধ আকিদার প্রচার ও বিভ্রান্ত ধ্যানধারণা খণ্ডনে, খারেজি, কাদারিয়্যাহ, জাহমিয়্যাহ, মুরজিয়া, মুতাযিলা-সহ সে যুগের বিভিন্ন গোমরাহ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম, ত্যাগ ও কুরবানির ফলে আল্লাহ তাঁকে উত্তম বদলা দান করেন। ফলে বাইরের ও ভিতরের এত সংকট ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁকে ফিকহের মতো আকিদার ক্ষেত্রেও আহলে সুন্নাতের ইমাম বানিয়ে দেন। পৃথিবীর বিশাল সংখ্যক মানুষকে তাঁর বিশ্বাস ও ইজতিহাদের অনুসারী বানিয়ে দেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁকে চিরদিনের জন্য অনিবার্য এবং গোটা মানবেতিহাসে অমর করে রাখেন।

মোটকথা, ইমাম আজম রহ.-এর আহলে সুন্নাতের ইমাম হওয়া একটি স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়। যুগে যুগে ইমামগণ এটার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং কাজে পরিণত করে দেখিয়েছেন। ফলে ইমাম তহাবিকে দেখি হিজরি তৃতীয় শতকে এসে ইমাম আজম রহ.-এর আকিদা সংকলন করে আকিদাহ তহাবিয়্যাহ লিখেন। গ্রন্থের শুরুতেই স্পষ্ট করে বলে দেন, 'এটা ফুকাহায়ে মিল্লাত ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর দুই শাগরেদ আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর আকিদা।' এতে

---

১০৫. দেখুন : ফাযায়িলু আবি হানিফা (১০১)।

আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, তিনি সালাফে সালেহিনের অন্তর্ভুক্ত। হাদিসে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ তিন প্রজন্মের দ্বিতীয় প্রজন্ম। উপরন্তু তিনি সালাফের ফিকহ এবং আকিদার ধারক ও বাহক, প্রচারকারী ও প্রহরী। ফলে ফিকহ ও আকিদা উভয় ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করাই আবশ্যক এবং এটাই নিরাপদ। তাঁর মাসলাক—যা মূলত সাহাবায়ে কেরাম ও রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পথ—এর উপর থাকা জরুরি। এবার আমরা এ বিষয়ে আলেমদের কিছু মূল্যায়ন উল্লেখ করব :

- শাইখুল হারাম আবদুল আযিয ইবনে আবি রাওয়াদ (১৫৯ হি.) বলেন, 'আবু হানিফা রহ. আমাদের ও মানুষের মাঝে সত্যের মাপকাঠি। যে তাঁকে ভালোবাসবে, তাঁর সঙ্গে থাকবে, সে আহলে সুন্নাত। আর যে তাঁকে অপছন্দ করবে, তাঁর প্রতি বিদ্বেষ রাখবে, সে আহলে বিদআত।'[১০৬]

- ওয়াকি ইবনুল জাররাহ (১৯৭ হি.) বলেন, 'ফিকহ ও কালাম (তথা উসুলুদ্দিন=আকিদা)-এর ক্ষেত্রে আবু হানিফার যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল, তা অন্য কারও ছিল না। এর সুবাদে তিনি মুসলমানদের জন্য এক সরল কর্মপদ্ধতি তৈরি করেন। সংশয়ের অন্ধকারে তাঁর মাযহাব আলো, মুক্তি ও আশ্রয়ে পরিণত হয়।'[১০৭]

- আবুল মুজাফফর আল-ইসফারায়েনি (৪৭১ হি.) লিখেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ি, মালেক, আওযায়ি, দাউদ, যুহরি, লাইস ইবনে সা'দ, আহমদ ইবনে হাম্বল, সুফিয়ান সাওরি, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক হানযালি, মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম তুসি, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, হুসাইন ইবনুল ফযল বাজালি, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, যুফার, আবু সাওর প্রমুখ হিজায, শাম, ইরাক, খোরাসান, মা-ওয়ারাউন-নাহর (ট্রান্স-অক্সিয়ানা)-সহ সবার আকিদা ছিল এক। এটাই ছিল সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িদের আকিদা।'[১০৮]

- ইবনে তাইমিয়্যাহ (৭২৮ হি.) লিখেন, 'শাফেয়ি, মালেক, সাওরি, আওযায়ি, ইবনুল মুবারক, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ সবার আকিদা ছিল এক ও অভিন্ন। এই একই আকিদা লালন করতেন ফুযাইল ইবনে

---

১০৬. আখবারু আবি হানিফাহ (৮৬)। মানাকিব, মক্কি (২৮৫)।
১০৭. তালবিসুল আদিল্লাহ, সাফফার (৫৩)।
১০৮. আত-তাবসির ফিদ-দ্বীন (১৮৪)।

ইয়ায, আবু সুলাইমান দারানি, সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতরি প্রমুখ (সুফি) মাশায়েখে কেরাম। দ্বীনের মৌলিক আকিদার ক্ষেত্রে এসব ইমাম মতভেদ করেননি। একই আকিদা পোষণ করতেন ইমাম আবু হানিফা রহ.। তাওহিদ, তাকদির ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত আকিদা অন্যান্য ইমামের আকিদার মতোই। আর এটাই সাহাবি ও তাবেয়িদের আকিদা, কুরআন ও সুন্নাহর আকিদা।'[১০৯]

- এ কারণে হানাফি মুহাক্কিক আলেমগণ যুগে যুগে ফিকহ ও আকিদা উভয় ক্ষেত্রে ইমাম আজমের অনুসরণ করেছেন, তাঁর অনুসারী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। ফখরুল ইসলাম বাযদাবি (৪৮২ হি.) বলেন, 'তাওহিদ ও সিফাতের ইলমের ক্ষেত্রে কর্তব্য হলো কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও বিদআত বর্জন করা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথে অবিচল থাকা, যে পথে ছিলেন সাহাবা, তাবেয়িন এবং সকল সালাফে সালেহিন। এ পথেই অটল ছিলেন আমাদের সালাফ তথা ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ এবং তাঁদের সকল শাগরেদ।'[১১০]

- ফখরুল ইসলামের সহোদর আবুল ইউসর বাযদাবি (৪৯৩ হি.) বলেন, 'আমরা আবু হানিফার অনুসরণ করি। তিনি উসুল ও ফুরু (আকিদা ও ফিকহ) উভয় ক্ষেত্রে আমাদের ইমাম।'[১১১] তিনি অন্যত্র বলেন, 'আবু হানিফা এই মাসআলাতে আহলে সুন্নাতের প্রধান (রইস)। কেবল এই মাসআলা নয়; তিনি সকল মাসআলাতে আহলে সুন্নাতের প্রধান। আহলে সুন্নাতের সকল মাযহাব আবু হানিফা রহ. থেকেই বর্ণিত।'[১১২] তিনি তাঁর 'উসুলুদ্দিন'-শীর্ষক পুরো গ্রন্থে নিজেদের মতাদর্শকে 'আহলে সুন্নাত' বলেছেন। বিভিন্ন জায়গায় নিজেকে আবু হানিফার অনুসারী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।[১১৩]

- মাইমুন নাসাফি (৫০৮ হি.) বলেন, 'আমাদের আসহাবগণ (আকিদার) মাযহাব গ্রহণ করেছেন আবু হানিফা রহ. থেকে।'[১১৪] তিনি আরও

---

১০৯. মাজমুউল ফাতাওয়া ৫/২৫৬।

১১০. উসুলুল বাযদাবি (৩)।

১১১. উসুলুদ্দিন (১৬)।

১১২. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১২০)।

১১৩. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২৫০)।

১১৪. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/৪৯৮)।

বলেন, 'আবু হানিফার শাগরেদ ইমামগণ উসুল ও ফুরু তথা ফিকহ ও আকিদা উভয় ক্ষেত্রে তাঁর অনুসারী ছিলেন, মুতাযিলাদের মাযহাব থেকে দূরে ছিলেন। মা-ওয়ারাউন-নাহর, খোরাসান, মারভ, বলখ ইত্যাদি অঞ্চলের আলেমগণ প্রাচীন কাল থেকেই এই (হানাফি) মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।'[১১৫]

- তাজুদ্দিন সুবকি (৭৭১ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ 'আসসাইফুল মাশহুর' গ্রন্থে 'আশআরি মাযহাবের' বিপরীতে 'হানাফি মাযহাব', 'হানাফি জামাতের আকিদা' শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন।[১১৬]

- আবু শাকুর সালেমি (মৃ. ৪৬০ হি. পরবর্তী) তাঁর বিখ্যাত 'আত-তামহিদ' গ্রন্থে ইমাম আজমকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' (ফিরকায়ে নাজিয়ার) ইমাম হিসেবে তাঁর মত উল্লেখ করেছেন। পুরো গ্রন্থে মুতাযিলা, আশআরিদের বিপরীতে 'আহলে সুন্নাত' কিংবা 'ফুকাহায়ে আহলিস সুন্নাহ' পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।[১১৭]

- আবু ইসহাক সাফফার বুখারি (৫৩৪ হি.) তাঁর 'তালখিসুল আদিল্লাহ'-শীর্ষক পুরো গ্রন্থ জুড়েই ইমাম আজম রহ.-এর আকিদাগুলো পরিবর্তিত সময়ের আলোকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর গ্রন্থে মুতাকাল্লিমিন তথা কালামি ধারার প্রভাব সুস্পষ্ট হলেও তিনি ইমাম আজম রহ. এবং সালাফে সালেহিনকেই আগে রেখেছেন। সর্বত্র ইমাম আজমের মতামতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[১১৮]

- নাজমুদ্দিন (মানকুবারস) নাসেরিও (৬৫২ হি.) তাঁর 'আন-নুরুল-লামি'তে ইমাম তহাবির আকিদাকে আহলে সুন্নাতের একাধিক হানাফি মুজতাহিদ ইমাম, যথা—আবু হাফস কাবির, হাকিম সমরকন্দি, আবু আবদুর রহমান আল-বুখারি এবং আবু মনসুর আল-মাতুরিদি প্রমুখ সকলের বক্তব্যের আলোকে ব্যাখ্যার কথা বলেছেন।[১১৯]

---

১১৫. প্রাগুক্ত (১/৫৫২-৫৫৩)।

১১৬. দেখুন : আসসাইফুল মাশহুর (১১, ১২, ১৭ ইত্যাদি)।

১১৭. উদাহরণস্বরূপ দেখুন : আত-তামহিদ ফি বায়ানিত তাওহিদ (পাণ্ডুলিপি) (৬৪, ৮০)।

১১৮. দেখুন : তালখিসুল আদিল্লাহ (১৩২, ২০৯)।

১১৯. আবু শুজা মানকুবারস সালেহি কৃত 'আন-নুরুল-লামি' (পাণ্ডুলিপি) (৫)।

■ আল্লামা শায়খ যাদাহ 'নাজমুল ফারায়েদ' গ্রন্থে সর্বত্র আশআরিদের বিপরীতে 'মাশায়েখে হানাফিয়্যাহ' বা হানাফি মাশায়েখ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[১২০]

এভাবে একদল বড় বড় হানাফি ইমাম নিজেদের সরাসরি ইমাম আজম আবু হানিফার প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন; ইমাম তহাবি বা মাতুরিদি কিংবা পরবর্তী কারও প্রতি সম্পৃক্ত করেননি। কারণ, তারা ইমাম তহাবি ও মাতুরিদির মতো আলিমদের স্বতন্ত্র ও ভিন্ন কোনো মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা মনে করতেন না; বরং তাদের হানাফি মাযহাব ও আকিদার অনুসারী মুজতাহিদ মনে করতেন। নাসাফি বাহরুল কালামে লিখেন, 'শায়খ ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদি উসুল ও ফুরু (আকিদা ও ফিকহ) উভয় ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর প্রচণ্ড বেশি অনুসারী ছিলেন।'[১২১] আর এটা তো স্পষ্ট যে, মাযহাবের অনুসারী এবং মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত কোনো আলেম যত বড়ই হোন না কেন তাঁর নামে আলাদাভাবে নিজেদের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

হ্যাঁ, আরেক দল বৃহৎ সংখ্যার আলেম নিজেদের ইমাম মাতুরিদির প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন। আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম মাতুরিদির যুগান্তকারী ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ তারা সেটা করেছেন। কিন্তু সেটা প্রথম যুগে প্রসিদ্ধ ছিল না। বরং আমরা যদি গভীরে যাই, দেখব, 'মাতুরিদি আকিদা' শব্দের প্রথম ব্যবহার ছিল নেতিবাচক অর্থে মুতাযিলা-সহ বিভিন্ন প্রতিপক্ষ বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে, সেসব সম্প্রদায় যারা নিজেদের ফিকহে হানাফি হিসেবে পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও আকিদায় বিভ্রান্ত ছিল, ইমাম মাতুরিদি যাদের বিভ্রান্তি খণ্ডন করতেন, যাদের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ হানাফি আকিদার প্রচারে সংগ্রাম করতেন। ফলে তারা তাঁর খণ্ডনকে উড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শব্দসন্ত্রাস শুরু করল। তারা তাঁর আকিদাকে তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ, অন্যকথায়, 'মাতুরিদি আকিদা' আখ্যা দিতে লাগল। আকিদার ক্ষেত্রে তারা নিজেদের হানাফি এবং ইমাম আবু হানিফার প্রকৃত অনুসারীদের 'মাতুরিদি' বলা শুরু করল।[১২২]

এভাবে 'মাতুরিদি আকিদা' নামে স্বতন্ত্র 'নিসবত' প্রসিদ্ধ হয়। নেতিবাচক থেকে একসময় ইতিবাচকে বিবর্তিত হয়। নুতবা শুরুর দিকে এই নামটির আলাদা প্রচলন ছিল না। এই কারণে ইমাম তহাবির (৩২১ হি.) 'আকিদাহ', সায়েদ

---

১২০. উদাহরণস্বরূপ দেখুন : নাজমুল ফারায়েদ ওয়া জামউল ফাওয়ায়েদ (৪০-৪২)।

১২১. আত-তামহিদ ফি উসুলিদ্দিন (৩৫)।

১২২. দেখুন : মাসালিকুল আবসার, উমরি (৬২)।

নিশাপুরির (৪৩২ হি.) 'আল-ইতিকাদ', মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখির (৪১১ হি.) 'আল-ইতিকাদ' (কিতাবুল খিসাল), কিংবা বিখ্যাত 'আস-সাওয়াদুল আজম' ইত্যাদির মতো প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে কালামি ধারার পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন আলোচনা-সমালোচনা থাকলেও ইমাম মাতুরিদি কিংবা 'মাতুরিদিয়্যাহ' শব্দের অস্তিত্বই নেই এগুলোতে। কারণ, ইমাম মাতুরিদি ছিলেন হানাফি ফিকহি মাযহাব এবং 'আকাদি' মানহাজের অনুসারী একজন মুজতাহিদ ইমাম। মূল মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম আজম রহ.। তিনি দ্বীনের উসুল ও ফুরু (আকিদা ও ফিকহ) উভয় ক্ষেত্রেই হানাফি-সহ গোটা আহলে সুন্নাতের ইমাম।

ইমাম আজম ও ইলমুল কালাম

আকিদার মূল ভিত্তি হলো কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহিনের ইজমা (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত)। অনুমান, কল্পনা, মনগড়া মতামত, কোনো ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন বক্তব্য কিংবা মানবরচিত শাস্ত্রীয় মূলনীতির আলোকে আকিদা গড়ার সুযোগ নেই। এ কারণেই আমাদের সালাফে সালেহিন কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার বাইরে অন্য কোনো বিষয়কে আকিদার মাসদার (সূত্র) ও মি'য়ার (মানদণ্ড) বানাতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। তাদের এই নিষেধাজ্ঞার মাঝে উল্লেখযোগ্য একটি শাস্ত্র হলো 'কালাম' (তর্কশাস্ত্র)।

অথচ পরবর্তী যুগের আলেমগণ ইলমুল কালামকে আকিদার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেন। বরং আকিদার একটি নামই হয়ে যায় 'ইলমুল কালাম'। আকিদাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেমদের নাম হয়ে যায় 'মুতাকাল্লিম।' কুরআন-সুন্নাহর আকিদাবিষয়ক সকল মাসআলাকে 'কালামি' মাসআলা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। বরং 'ইলমুল কালাম' ছাড়া আকিদা পড়া ও বোঝাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়!

এই বৈপরীত্যের সমাধান কী? সালাফ যেখানে কালামশাস্ত্রের প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন, খালাফ তথা পরবর্তী যুগের আলেমগণ সেই কালামকেই কীভাবে আকিদা বানিয়ে ফেললেন? আমাদের এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু যেহেতু ইলমুল কালাম নয়, বরং ইমাম আজমের আকিদা, তাই আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারব না। তবে বিষয়টির গুরুত্ব ও স্পর্শকাতরতার প্রতি লক্ষ রেখে এ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক তথা ভারসাম্যপূর্ণ ধারণা দেওয়ার জন্য কিছু কথা বলব। প্রথমে আমরা কালামের প্রতি সালাফের ইমামদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করব। এরপর সেসব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ঐতিহাসিক কারণ ও প্রণোদনাগুলো নির্ণয় করে এ ব্যাপারে সঠিক কর্মপন্থা এবং ইনসাফপূর্ণ সিদ্ধান্ত বর্ণনা করব।

ইলমুল কালামের ব্যাপারে ইমাম আজম রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? যেমনটা পিছনে বলে এসেছি, প্রথম জীবনে ইমাম নিজেই ছিলেন একজন বড় মাপের মুতাকাল্লিম (কালাম বা তর্কশাস্ত্রবিদ)। 'কালাম'-শাস্ত্রে তিনি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। হারেসি (৩৪০ হি.) লিখেন : 'আবু হানিফা রহ., আবু ইউসুফ, যুফার, মুহাম্মাদ, হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা—তারা প্রত্যেকেই কালাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। তারা মানুষের সঙ্গে বিতর্ক করেছেন, মুনাযারা করেছেন, প্রতিপক্ষকে পরাভূত করেছেন।'[১২৩]

কিন্তু পরবর্তীকালে এ শাস্ত্রের প্রতি তিনি আস্থা হারান এবং সুন্নাহ, ফিকহ ও ইজতিহাদে মনোযোগী হন। জীবনের এক ময়দান ছেড়ে অন্য ময়দানে যাওয়াটাই প্রমাণ করে প্রথমটার প্রতি তিনি বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ ছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর প্রশান্তি, তৃপ্তি এবং জীবনের মঞ্জিল খুঁজে পাননি। ফলে পথ পরিবর্তন করেন। মুহাম্মাদ সালেহি (৯৪২ হি.) বর্ণনা করেন, 'জীবনের প্রথম দিকে ইমাম প্রবৃত্তিপূজারী (তথা বাতিল) ফিরকাগুলোর সঙ্গে বিতর্ক ও মুনাযারা করতেন। একপর্যায়ে তিনি (তর্কশাস্ত্রে) শিরোমণিতে পরিণত হন। কিন্তু পরবর্তীকালে তর্ক ছেড়ে দেন। ফিকহ ও সুন্নাহর প্রতি মনোযোগী হন। আল্লাহ তাকে ইমাম বানিয়ে দেন।'[১২৪]

কালামের সমালোচনায় ইমাম : ইমাম কেবল কাজের মাধ্যমেই এটা প্রমাণ করেছেন এমন নয়, বরং মুখেও পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন এবং কালামশাস্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেছেন। যুফার ইবনুল হুযাইল থেকে বর্ণিত, ইমাম আজম বলেন, 'আমি কালাম চর্চা করতাম। এ শাস্ত্রে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করি। একদিন এক নারী আমাকে তালাকের মাসআলা জিজ্ঞাসা করে। আমি জবাব দিতে পারিনি। ...পরে এ শাস্ত্র পরিত্যাগ করে হাম্মাদের মজলিসে যোগদান করি।'[১২৫] মক্কির বর্ণনামতে, ইমাম আজম বলেন, 'আমি কালামশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও প্রসিদ্ধির অধিকারী ছিলাম। প্রায় বিশ বছরের অধিক সময় এ শাস্ত্র ও বিতর্ক নিয়ে ব্যস্ত থাকি। কালামকে আমি সর্বোত্তম শাস্ত্র মনে করতাম। আমি এটাকে দ্বীনের মূল বিষয় বলতাম। দীর্ঘ একটা সময় পরে আমার নিজের মনে অনেক ভাবনা জমতে থাকে। আমি নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকি, আমরা যা জানি আমাদের

---

১২৩. কাশফুল আসার (১/৬৬)।

১২৪. উকুদুল জুমান (১৬৩)।

১২৫. মানাকিব, মক্কি (৫১)।

পূর্বে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবা, তাবেয়িন ও তাবে-তাবেয়িগণও তো এগুলো জানতেন। বরং তারা আমাদের চেয়ে আরও বেশি জানতেন, বেশি বুঝতেন। প্রত্যেকটি বিষয় বেশি চিনতেন। অথচ তারা কখনো বিতর্ক করেননি, বিবাদে জড়াননি। বরং বিবাদ থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। বিতর্ক করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। বিপরীতে তারা ফিকহ ও শরিয়ত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ফিকহের গভীরে নিমগ্ন ছিলেন। এসব বিষয়ে তারা মজলিস করতেন। এগুলোর উপর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন। এগুলোর দিকে মানুষকে ডাকতেন, এগুলোই শেখাতেন। ...এভাবেই প্রথম যুগ কেটে গেল। পরবর্তী মানুষেরা (তাবেয়িরা) এসে তাদের অনুসরণ করল। যখন এ বাস্তবতা আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন আমি তর্কবিতর্ক ও বিবাদ-বিসংবাদ ছেড়ে দিলাম। কালামশাস্ত্র পরিত্যাগ করলাম। এ ব্যাপারে যতটুকু জ্ঞান লাভ করেছি, সেখানেই থেমে গেলাম। ফিরে গেলাম সালাফের পথে। তাদের ইলম গ্রহণ করলাম। তাদের মজলিসে বসতে লাগলাম। উপরন্তু আমি দেখেছি, যারা কালাম চর্চা করে, তাদের চেহারায় মুতাকাদ্দিমিন (তথা সালাফের) নুর নেই। তাদের পথ সালেহিনের পথ নয়। বরং আমি দেখেছি, তাদের হৃদয় শক্ত হয়, কুরআন-সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহিনের বিরোধিতা করতে তাদের বুক কাঁপে না। তাদের তাকওয়া ও খোদাভীতিও নেই। তখন আমি বললাম, যদি এতে (কালামশাস্ত্রে) কল্যাণ থাকত, তবে সালাফে সালেহিন এটা গ্রহণ করতেন, ছোটলোকরা গ্রহণ করত না। অবশেষে আমি এটা পরিত্যাগ করলাম। আলহামদুলিল্লাহ।'[১২৬]

বাযযাযি তাঁর মানাকিবে ইমাম রহ. থেকে কাছাকাছি বক্তব্য বর্ণনা করেন, 'আমি কালামশাস্ত্রে দক্ষ ছিলাম। বসরা শহর তখন বাতিলপন্থিদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। আমি বিশের অধিকবার সেখানে গিয়েছি। কখনো কখনো বছরখানেক কিংবা কমবেশি সেখানে থেকেছি। তাদের সঙ্গে বিতর্ক করেছি। কারণ, আমার তখন বিশ্বাস ছিল, কালামশাস্ত্র সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। কিন্তু কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে আমি ভাবলাম—সালাফ তো আমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন, তথাপি তারা তর্কে জড়াননি, বরং দূরে থেকেছেন। শরয়ি ইলমে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছেন। এ কারণে আমি কালামশাস্ত্র পরিত্যাগ করে নিজেকে ফিকহে নিয়োজিত করেছি। উপরন্তু কালামশাস্ত্রে মশগুল লোকদের আমি দেখেছি—তাদের চেহারায় সালেহিনের নুর নেই। তাদের হৃদয় শক্ত। তাদের মন ও মনন নির্দয়। কুরআন-

---

১২৬. মানাকিব, মক্কি (৫৪-৫৫)।

সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহিনের বিরোধিতা করতে তাদের বুক কাঁপে না। যদি কালামশাস্ত্র ভালো কিছু হতো, তবে সালাফে সালেহিন এটা চর্চা করতেন।'[১২৭]

কালামের সমালোচনায় অন্যান্য ইমাম

- আবু ইউসুফ রহ. বলেন, 'কালাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাই অজ্ঞতা। আর কালাম সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা জ্ঞান। কোনো ব্যক্তি যখন কালামের শিরোদেশে পৌঁছে যায়, তখন সে যিন্দিকে পরিণত হয় অথবা কমপক্ষে যিন্দিক লকব পায়।'[১২৮]

- হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুইকে ইমাম যুফার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তিনি কি কালাম চর্চা করতেন?' ইবনে যিয়াদ বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! নির্বোধের মতো কথা বলো না। আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, যুফার-সহ আমাদের সকল মাশায়েখ, যাদের বৈঠকে আমরা বসতাম, যাদের কাছ থেকে ইলম শিখতাম, ফিকহ এবং সালাফে সালেহিনের অনুসরণ ছাড়া তারা অন্য কোনো দিকে তাকাতেন না।'[১২৯]

- শাফেয়ি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আহলে কালামের ব্যাপারে আমার রায় হলো, তাদের খেজুরের ডাল দিয়ে পেটানো হবে। পাড়ায়-মহল্লায় তাদের ঘোরানো হবে। কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে যারা কালামে মগ্ন হয়, তাদের এটাই শাস্তি।' বরং শাফেয়ি থেকে আরও বর্ণিত আছে, 'শিরক ছাড়া যেকোনো গুনাহ নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া, কালাম নিয়ে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে উত্তম।' তিনি আরও বলেন, 'মানুষ যদি জানত কালামের মাঝে কী পরিমাণ প্রবৃত্তির অনুসরণ থাকে, তবে তারা এটা থেকে সেভাবে পালাত, যেভাবে বাঘের মুখ থেকে পালায়।'[১৩০]

- আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, 'কালামের অধিকারী কখনো সাফল্য লাভ করে না। যখনই কোনো ব্যক্তি কালামের মাঝে প্রবেশ করে, তার হৃদয় নষ্ট হয়ে যায়।'[১৩১]

---

১২৭. মানাকিব, বাযযাযি (১৩৭-১৩৮)।

১২৮. তারিখে বাগদাদ, খতিবে বাগদাদি (৭/৫৩৮)।

১২৯. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ইবনে আবদিল বার (২/৯৪২)।

১৩০. দেখুন : জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ইবনে আবদিল বার (২/৯৪১)। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১৪/১৩৭)।

১৩১. আল-বুরহান ফি বায়ানিল কুরআন, ইবনে কুদামা (১/১৪৩)।

■ গাযালি বলেন, 'মানুষের উপর আল্লাহর বিশাল অনুগ্রহ যে, মানুষের হৃদয় ছোট থেকেই ঈমান গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। এর জন্য বড় বড় দলিল-আদিল্লার দরকার হয় না। আর এই ঈমান বৃদ্ধি ও অবিচল রাখার উপায় হলো কুরআন তেলাওয়াত, তাফসির ও হাদিস নিয়ে ব্যাপৃত থাকা। তর্কশাস্ত্র ও কালাম শিখে ঈমান মজবুত করা সম্ভব নয়। ...মুমিনের কান বিতর্ক ও কালাম থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা উচিত। কারণ, এটা পথ যতটা সহজ করে, তারচেয়ে বেশি কঠিন করে; যতটা না গড়ে, তারচেয়ে বেশি ভাঙে। ...এ কারণে একজন সাধারণ মানুষের আকিদা একজন মুতাকাল্লিমের আকিদার চেয়ে বেশি অনড় ও অটল থাকে; সন্দেহ-সংশয়ের ঝড়-তুফানের সামনে পাহাড়ের মতো দৃঢ় থাকে। আর মুতাকাল্লিমের অবস্থা হয় বাতাসে ছেড়ে দেওয়া সুতোর মতো, যাকে বাতাস কখনো এদিকে উড়িয়ে নেয়, কখনো ওদিকে।'[১৩২]

এভাবে ইমাম আজম রহ. থেকে শুরু করে একসময়ের কালামের ময়দানের বীর সেনানী গাযালি পর্যন্ত অসংখ্য ইমাম পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ ইলমুল কালামের কঠোর সমালোচনা করেছেন। এ কারণে একদল আলেম মনে করেন, কালাম মানেই ইসলামবিরোধী শাস্ত্র। এটা চর্চা করা হারাম। ইসলামি আকিদার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বাস্তবেই কি তা-ই?

সালাফের কালাম বিরোধিতার প্রকৃত রহস্য : এটা খোলা চোখের সিদ্ধান্ত। বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের আরেকটু গভীরে যেতে হবে। গভীরে গেলে আমরা দেখব—ইমাম আজমসহ সালাফের অন্যান্য আলেম সামগ্রিক কালামের সমালোচনা করেননি, বরং বিশেষ প্রেক্ষাপটে বিশেষ ধরনের 'কালাম'-এর সমালোচনা করেছেন। কারণ, সে যুগে ইলমুল কালাম পূর্ণ একটা শাস্ত্র হিসেবেই গড়ে ওঠেনি। তাহলে তারা সমালোচনা করলেন কোন কালামের?

বস্তুত হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দে 'কালাম' বলতে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতে যুক্তিতর্ক এবং ওহির বিপরীতে আকলকে কেন্দ্র করে ঈমান ও আকিদাচর্চা বোঝানো হতো। ফলে 'কালাম'-শাস্ত্রটা কুরআন-সুন্নাহ ও ওহির সাংঘর্ষিক শাস্ত্র গণ্য হতে থাকে। কাদারিয়্যাহ, মুরজিয়া, মুতাযিলা ও জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলো 'কালাম' নামে পরিচিতি পায়। সালাফে সালেহিনের বিপরীতে সে যুগের বিভ্রান্ত লোকজন, যেমন—মাবাদ জুহানি, গাইলান

---

১৩২. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, গাযালি (১/৯৪)।

দিমাশকি, জাদ ইবনে দিরহাম, জাহম ইবনে সাফওয়ান, ওয়াসিল ইবনে আতা, আমর ইবনে উবাইদ, বিশর আল-মারিসি প্রমুখ 'মুতাকাল্লিম' হয়ে ওঠেন। এভাবে 'কালাম' তখন ফালসাফা (দর্শন)-সহ সব ধরনের নব-আবিষ্কৃত, প্রত্যাখ্যাত, বিদআত ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার সমার্থক হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় শতকে 'কালাম' কীভাবে ওহির বিপরীতে লাগামহীন যুক্তিতর্ক এবং সে কারণে একপর্যায়ে বিচ্যুতির সমার্থক হয়ে ওঠে, সেটা ইমাম আজমের বক্তব্য দ্বারাও বোঝা যায়। ইমাম আজম রহ. একাধিক জায়গায় বলেছেন, 'আমি কালাম চর্চা করতাম' (كنت أنظر في الكلام)। একপর্যায়ে এ শাস্ত্রে এতটাই এগিয়ে যাই যে, মানুষ আমার দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করত।' এটা ছিল মূলত ইমামের প্রথম জীবনের কথা, যখন তিনি বিভিন্ন যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নাস্তিকদের খণ্ডন করতেন; কিন্তু তিনি তখনও ফিকহের জগতে প্রবেশ করেননি। এমন সময় একদিন এক নারী তাকে তালাকের একটি সাধারণ মাসআলা জিজ্ঞাসা করে। কালাম সম্পর্কে এত বড় পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সেই নারীকে সেদিন তিনি জবাব দিতে পারেননি। তখন তাঁর মনে দুঃখবোধ তৈরি হয়। কালাম তাকে 'ফিকহ' সম্পর্কে গাফেল করে রেখেছে মনে করেন তিনি। এভাবে বলে ওঠেন, 'আমার কালাম দরকার নেই।'[১৩৩] অথচ পরবর্তী সময়ের অসংখ্য আলেম একইসঙ্গে ফকিহ ও মুতাকাল্লিম ছিলেন; ফিকহ, হাদিস, তাফসির, কালাম সকল শাস্ত্রে সমান পাণ্ডিত্যের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত ছিলেন।

বিষয়টি আরেকটু স্পষ্ট করার জন্য আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। যেমন—মুতাযিলা ও জাহমিয়্যাহদের গুরু বিশর আল-মারিসি ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর শাগরেদ। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন খলকে কুরআন (কুরআনকে সৃষ্টি বলা)-সহ বিভিন্ন বিভ্রান্ত আকিদায় জড়িয়ে পড়েন, খোদ আবু ইউসুফ তাকে সতর্ক করেন। আবু ইউসুফ তাকে লক্ষ্য করে বলেন, "বিশর, 'কালাম' সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাই অজ্ঞতা। আর 'কালাম' সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা জ্ঞান। কোনো ব্যক্তি যখন কালামের শিরোদেশে পৌঁছে যায়, তখন সে যিন্দিকে পরিণত হয় অথবা কমপক্ষে যিন্দিক লকব পায়! বিশর, আমি শুনেছি তুমি কুরআন নিয়ে 'কালাম' করছ (কথা বলছ)। যদি আল্লাহর জন্য ইলম সাব্যস্ত করো, তবে নিজেই নিজেকে খণ্ডন করলে। আর যদি আল্লাহর ইলম অস্বীকার করো, তবে তো কাফের

---

১৩৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবি (৬/৩৯৭)।

হয়ে গেলে।"[১৩৪] উক্ত বক্তব্যে স্পষ্ট যে, ইমাম আবু ইউসুফ বিশরের পরিণতি দেখে কালামের সমালোচনা করেছেন। ফলে এটা 'বিশরীয় কালামের' সমালোচনা গণ্য হবে।

এক ব্যক্তি হাসান ইবনে যিয়াদের কাছে প্রশ্ন করেন, যুফার রহ. কি কালাম চর্চা করতেন? তিনি বললেন, 'নির্বোধের মতো কথা বলো না। তারা ইলম ও ফিকহের প্রাসাদ। কালামের মাঝে তো সে ব্যক্তি প্রবেশ করে যার আকল নেই। আর এসব ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহর বিধিবিধান সম্পর্কে এতটা বেশি অবগত ছিলেন যে, তারা তোমার উদ্দিষ্ট এসব কালামে প্রবেশ করতে পারেন না (هؤلاء كانوا أعلم بالله عز وجل وبحدود الله من أن يدخلوا في الكلام الذي تعني)। আমি আবু হানিফা, তাঁর পূর্বে যারা ছিলেন, যুফার ও আবু ইউসুফ-সহ আমাদের কোনো শায়খকে ফিকহ এবং পূর্ববর্তী সালাফের অনুসরণ ছাড়া আর কিছুতে মনোযোগ দিতে দেখিনি।' তখন লোকটি বলল, কিন্তু বিশর আল-মারিসি তো দাবি করে, কুরআনের ক্ষেত্রে তার বক্তব্য আর আবু হানিফা, যুফার ও আবু ইউসুফের বক্তব্য এক। ইবনে যিয়াদ বলেন, 'আল্লাহর কসম! সে মিথ্যা বলেছে। আমি তাদের কাউকে এ ব্যাপারে কথা বলতে দেখিনি। তাদের এমন কোনো কথা আমার কাছে পৌঁছয়নি। তুমি বরং বিশরকে বলবে—তুমি আবু ইউসুফের সান্নিধ্যে ছিলে। তিনি কেন তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন? এর মাধ্যমেই তার মিথ্যাচার স্পষ্ট হয়ে উঠবে।'[১৩৫]

এই কয়েকটি বর্ণনার মাধ্যমেই স্পষ্ট হয় যে, সালাফে সালেহিন যখন কালামের সমালোচনা করেছেন, তারা কালাম বলতে কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন এবং তখন মুতাকাল্লিম কারা ছিল। অর্থাৎ, তখন জাহমিয়্যাহ, মুরজিয়া ও মুতাযিলারাই 'মুতাকাল্লিম' ছিল। ফলে সালাফ তাদের প্রতিহত করবেন, তাদের ভ্রান্ত আকিদার নিন্দা করবেন—এটা নিতান্তই স্বাভাবিক, শরিয়ত ও যুক্তিরও দাবি।

আবদুল কাদের কুরাশি বর্ণনা করেন, ইমাম আজম রহ. বলেন, 'আমর ইবনে উবাইদের উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক। কারণ, সে মানুষের উপর **ইলমে কালামের** দরজা খুলে দিয়েছে।'[১৩৬] আবদুর রহমান ইবনে মাহদি বলেন, আমি মালেকের কাছে গেলাম। তখন তার কাছে একব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে প্রশ্ন

---

১৩৪. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি (২/৯৪২)।

১৩৫. ফাযায়িলু আবি হানিফা (১১৮)।

১৩৬. আল-জাওয়াহিরুল মুযিআহ, কুরাশি (১/৩১)।

করছিল। মালেক তাকে বললেন, 'তুমি সম্ভবত আমর ইবনে উবাইদের শাগরেদ। আমরের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক! সে দ্বীনের মাঝে এসব **কালাম** নামক বিদআত ঢুকিয়েছে। যদি কালাম কোনো 'ইলম' হতো, তবে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িগণ দ্বীন ও শরিয়ত নিয়ে যেভাবে কথা বলেছেন, এটা নিয়েও কথা বলতেন। বোঝা গেল, এটা বাতিল।'[১৩৭] উপরের দুটো বক্তব্যে স্পষ্ট যে, ইমাম আবু হানিফা ও মালেক দুজনই মুতাযিলাদের সমালোচনা করেছেন। তারাই তখন মুতাকাল্লিম ছিল। কালাম বলতে তখন তাদের আকিদাই বোঝাত।

একইভাবে ইবনে ইসহাক বলেন, একদিন শাফেয়ি রহ. একদল ফকিহের সঙ্গে বিতর্ক করলেন। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোচনা ও মুনাযারা করলেন। আবু ইসহাক তাকে বললেন, আবু আবদুল্লাহ, এগুলো তো আহলে কালামের (মানহাজ বা কর্মপদ্ধতি)। আহলে হালাল ও হারাম (তথা ফকিহদের) মানহাজ নয়। তিনি বললেন, এটার আগে আমরা ওটা মজবুত করে শিখেছি।[১৩৮] এতে স্পষ্ট হয়, ইমাম শাফেয়িও কালামের ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেছিলেন। কারণ, বিভ্রান্ত লোকদের খণ্ডন করতে হলে এর বিকল্প নেই। ফলে ইমাম শাফেয়ি যে কালাম শিখতে নিষেধ করেছেন, সেটা হলো গোমরাহদের কালাম, যারা এটাকে হাতিয়ার বানিয়ে বিভ্রান্ত আকিদা প্রচার করে। বরং শাফেয়ির বক্তব্যও—শিরক ছাড়া যেকোনো গুনাহ নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হওয়া কালাম নিয়ে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে উত্তম—সে কথার প্রমাণ। নুতবা চুরি, ডাকাতি, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদির চেয়ে ইলমুল কালাম নিকৃষ্ট, এটা হতেই পারে না। হ্যাঁ, এটাকে যখন নেতিবাচকভাবে গোমরাহির কাজে ব্যবহার করা হবে, তখন নিঃসন্দেহে নিকৃষ্ট; কিন্তু উন্মুক্তভাবে নয়।

ইমামদের এসব বক্তব্যের মাধ্যমে 'কালাম'-এর সমালোচনার ক্ষেত্রে ঠিক কোন ধরনের কালাম এবং কারা উদ্দেশ্য সেটা স্পষ্ট। আর এমন কালাম ও কালামিদের সমালোচনা যুক্তিযুক্ত, বরং আবশ্যক বইকি!

পরবর্তীকালে উলামায়ে ইসলামের একটি দলই 'কালাম'-এর 'ইসলামিকরণ' করেন। এতদিন যেটা কুরআন-সুন্নাহ এবং বিশুদ্ধ আকিদা ভাঙার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, সেটাকে কুরআন-সুন্নাহ এবং বিশুদ্ধ আকিদা সুরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে

---

১৩৭. যাম্মুল কালাম, হারাভি (৫/৭২-৭৩)।
১৩৮. মানাকিবে শাফেয়ি, বাইহাকি (১/৪৫৭)।

গ্রহণ করেন। বিশেষত ইসলামি রাষ্ট্রের পরিবর্তিত পরিস্থিতি, অন্যান্য সভ্যতা ও জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর সংস্পর্শ ও সম্পর্ক, জ্ঞান ও সংস্কৃতির সম্মিলন ও আদানপ্রদান, বিভিন্ন মতাদর্শ ও ধর্মের গ্রন্থসমূহ এবং চিন্তা-দর্শনের আরবি অনুবাদ ইত্যাদি নানা কারণে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিত্য-নতুন আপত্তি তৈরি হয়, 'আল্লাহ বলেছেন', 'আল্লাহর রাসুল বলেছেন'—এটুকুতে সন্তুষ্ট না হতে পারার মতো 'সুশীল চিন্তক' ও 'বুদ্ধিজীবী' মস্তিষ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যুক্তি ও বাস্তবতার আলোকে ইসলামি আকিদা বুঝতে চাওয়া লোকদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, তখন 'ইসলামি' কালামের চাহিদাও বাড়তে থাকে। উলামায়ে কেরামের একটি দল নিজেদের ইসলামি আকিদার সুরক্ষা এবং যুক্তিতর্কের মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজে ইসলাম প্রচারের খেদমত আঞ্জাম দিতে মাঠে নামেন। শুরু হয় সুশীল (মুতাযিলা) ও আলেমদের লড়াই। এ লড়াইয়ে মুতাযিলাদের বিরুদ্ধে উলামায়ে ইসলাম দ্বীনের ব্যাপক খেদমত করেন। মুতাযিলাদের বিভ্রান্তিকর আকিদা থেকে মুসলিম উম্মাহকে হেফাজতের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তাদের যুক্তিতেই তাদের পরাজিত করেন। যে শাস্ত্র ছিল তাদের সকল বিভ্রান্তির ভিত, সেটাকেই ধসিয়ে দেন আহলে সুন্নাতের আলেমগণ। এভাবে যে শাস্ত্রটি একসময় ইসলাম ভাঙার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, যেগুলোর চর্চাকারী সালাফে সালেহিনের কাছে 'যিন্দিক' নামে পরিচিত হয়েছে, একসময় মূল ধারার আলেমগণ সেটাকে সংস্কার করে ইসলামের খেদমতে লাগান। 'কালাম' তখন 'বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদা'র সমার্থক হয়ে ওঠে। আলেমরাই মুতাকাল্লিম হয়ে ওঠেন।[১৩৯] শাহরাস্তানি (৫৪৮ হি.) লিখেন, 'একপর্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ ইবনুল কুল্লাব, আবুল আব্বাস কালানিসি, হারেস ইবনে আসাদ মুহাসেবি প্রমুখের আগমন ঘটে। তারা সামগ্রিকভাবে সালাফের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা সরাসরি ইলমুল কালাম চর্চা করেন। সালাফের আকিদাকে কালামি দলিল-আদিল্লাহ এবং উসুলি প্রমাণের মাধ্যমে সুসংহত করেন। ...একপর্যায়ে আসেন আবুল হাসান আশআরি। তিনি তাদের (তথা সালাফের) বক্তব্যকে কালামি মানহাজে শক্তিশালী করেন।[১৪০]

তবে শুরুটাই যেহেতু জটিলতাপূর্ণ ছিল, কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের প্রাকৃতিক ও সহজ-সরল পথের সঙ্গে প্রথম থেকেই এর দূরত্ব ছিল (অর্থাৎ,

---

১৩৯. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৬৩-৬৪)। আরও দেখুন : ইমাম আশআরির দিকে সম্বন্ধকৃত পুস্তিকা 'ইসতিহসানুল খাওজ ফি ইলমিল কালাম'।

১৪০. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/৯৩)।

কালামের সাহায্যে আকিদাচর্চা ফিতরত ও স্বাভাবিক অবস্থা নয়; বরং উদ্ভূত পরিস্থিতির ফল, বিদ্যমান জটিলতার বিরুদ্ধে লড়াই), ফলে 'ইসলামিকরণ' করা সত্ত্বেও দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতিগত দূরত্ব অব্যাহতই থাকল। যতই 'কালাম'-শাস্ত্রের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছিল, নতুন নতুন পরিভাষা ও শাখা-প্রশাখা সংযুক্ত হচ্ছিল, ততই সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল। আর এটাই ছিল মুহাদ্দিসিন ও মুতাকাল্লিমিনের সংঘাতের অন্যতম কারণ। সেসব জটিলতার সংজ্ঞায়ন, সেগুলো মোকাবিলার পদ্ধতি নির্ধারণ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে কালামের প্রতি আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি মতভেদপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই এ ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প নেই। একদিকে যেমন সালাফের কালাম-বিরোধিতাকে উন্মুক্ত নিষেধাজ্ঞা মনে না করা চাই, অপরদিকে এটা চর্চার দরজা অবাধে উন্মোচিত না করা চাই। সকল যুগের মুহাক্কিক আলেমের দৃষ্টিভঙ্গিও এটা।

বাযযাযি লিখেন, 'ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, 'কালাম চর্চাকারী (মুতাকাল্লিম) হক কথা বললেও তার পিছনে নামায পড়া বৈধ নয়।' এই নিষেধাজ্ঞাকে কয়েকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। **এক.** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই ব্যক্তি, যে ইলমুল কালাম চর্চার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে। কালামের অত্যন্ত জটিল ও গভীর গলি-ঘুপচিতে প্রবেশ করে কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহচর্চা বাদ দিয়ে কালামের মাঝেই ডুবে থাকে। **দুই.** কারও মতে এটা কালামচর্চার উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, প্রথম যুগে ইমামগণ মুনাযারা করতেন প্রতিপক্ষকে ভ্রান্তি থেকে ফেরানোর জন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে মুনাযারা ও বিতর্কের উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্তিতে ফেলার চেষ্টা করা। ফলে ইমামগণ কালামকে নিষিদ্ধ করেন। তাই কেউ যদি কালামশাস্ত্রের মাধ্যমে হকের কাছে পৌঁছতে চায়, অন্যের হেদায়াত উদ্দেশ্য হয়, তবে এটা তো উত্তম। **তিন.** কারও মতে, ইমামগণ যে 'কালাম' নিষিদ্ধ করেছেন, সেটা হলো আহলে বিদআত ও হুকামা তথা দার্শনিকদের কালাম, মাশায়েখের কালাম নয়।'[১৪১]

বাইহাকি লিখেন, 'উমর ইবনে আবদুল আযিয-সহ অন্যান্য সালাফ কালামের মাঝে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তারা মনে করতেন, বিশুদ্ধ দ্বীন বোঝার জন্য এটার প্রয়োজন নেই। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যেসব দলিল-প্রমাণ নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন সেগুলো তাওহিদ, নবুওত ইত্যাদি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। উপরন্তু তারা ভয় করতেন, যদি ইলমে কালামের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া

---

১৪১. দেখুন : মানাকিব, বাযযাযি (১৩৮-১৩৯)। তাবয়িনু কাযিবিল মুফতারি, ইবনে আসাকির (৩৩৪)।

হয়, তবে অদূরদর্শী লোকেরা তাতে বিভ্রান্ত হবে এবং অবিশ্বাসীদের জালে ফেঁসে যাবে। সাঁতার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোককে সমুদ্রে ফেললে যেমন হয়, তাদের অবস্থাও তেমন হবে। মোটকথা, ইলমে কালাম থেকে তাদের নিষেধাজ্ঞা এ কারণে নয় যে, মৌলিকভাবে এটা নিন্দনীয় ও অনুপকারী শাস্ত্র। এমন এক শাস্ত্র যার মাধ্যমে আল্লাহকে জানা যায়, তাঁর গুণাবলি চেনা যায়, রাসুলদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়, যার মাধ্যমে সত্য নবি ও মিথ্যা নবির মাঝে পার্থক্য করা যায়, সেটা কীভাবে নিন্দনীয় শাস্ত্র হতে পারে? তাই কালামশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাদের নিষেধাজ্ঞা ছিল মূলত বিভ্রান্তি থেকে দুর্বলচিত্তের মানুষদের বাঁচানোর তাগিদে।'[১৪২]

আবু আলি দাক্কাক বলেন, 'যদি দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়িস্বরূপ বিবাদ (কালাম) করা হয়, সেটা নিষিদ্ধ; হক প্রকাশের জন্য হলে নিষিদ্ধ নয়। আবু নসর সাফফার বলেন, কাফেররা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে সব ধরনের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করত, যুক্তিতে পরাজিত করতে চাইত। তাহলে নবিজি নীরব থাকতে এবং বিবাদ পরিত্যাগ করতে আদিষ্ট হবেন কোন যুক্তিতে? হ্যাঁ, যদি দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি এবং অর্থহীন বিসংবাদ হয়, সে ক্ষেত্রে বিবাদ পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ অর্থ : 'যখন আপনি তাদের আমার আয়াতসমূহ নিয়ে উপহাস করতে দেখবেন, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত না তারা অন্যকথায় প্রবৃত্ত হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে আর বসবেন না।' [আনআম : ৬৮] কিন্তু হক প্রকাশের জন্য বিবাদ করা দূষণীয় নয়।'[১৪৩]

স্বয়ং ইমাম আজমের পরবর্তী সময়ের বক্তব্যের মাঝেও কালামকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করার বৈধতা পাওয়া যায়। আবু মুকাতিল সমরকন্দি ইমামকে বলেন, অনেকে এসব বিষয়ে (কালাম/মুনাযারা ইত্যাদিতে) ঢুকতে নিষেধ করেন। তাদের কথা, রাসুলের সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তো এ পথে হাঁটেননি। আমরা কেন হাঁটব? ইমাম জবাবে বলেন, **'আমরা যদি সাহাবাদের যুগে তাদের পর্যায়ে থাকতাম, তাহলে তারা যা করতেন যতটুকু করতেন, আমাদের ক্ষেত্রেও তা শতভাগ প্রযোজ্য হতো। কিন্তু আমাদের যুগ তাদের যুগ নয়। আমরা যেসব সমস্যার**

---

১৪২. শুআবুল ঈমান, বাইহাকি (১/৯৫)।
১৪৩. তালখিসুল আদিল্লাহ (৫৭-৫৮)।

মোকাবিলা করছি, সেগুলো তাদের যুগে ছিল না। আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সামনে এসে পড়েছি, যারা আমাদের আঘাত করে, আমাদের রক্তকে হালাল মনে করে। তাহলে তাদের মাঝে কারা সঠিক কারা ভুল সেটা না জেনে বসে থাকা যাবে? আমরা আমাদের জানমালের হেফাজত না করে বসে থাকব? সাহাবায়ে কেরামের যুগে তারা ছিল না; ফলে তাদের হাতিয়ার হাতে নিতে হয়নি। আমাদের যুগে তারা আছে; ফলে হাতিয়ার হাতে নিতে হবে।'[১৪৪]

সুতরাং হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করলে সেটা করা যাবে এবং খোদ ইমামও প্রথম জীবনে সেটা করেছেন। কিন্তু অতিরঞ্জন তৈরি হলে, মাধ্যমকে গন্তব্য মনে করা হলে, উপলক্ষ্যকে লক্ষ্য গণ্য করলে সেটা বর্জন করতে হবে, যেমনটা ইমামও করেছেন। কামাল ইবনুল হুমাম লিখেন, 'ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ সূত্রে মুহাম্মাদ রহ. বর্ণনা করেন, কালাম চর্চাকারীর পিছনে নামায হবে না। এর দ্বারা মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে কালামের অত্যন্ত গভীরের বিষয়গুলোতে যাওয়া।' কারও মতে, কালামশাস্ত্রকে অন্যায় পথে ব্যবহারকারীরা এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে, সাধারণ কালামচর্চা নয়। তাদের দলিল হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর সন্তান হাম্মাদের একটি ঘটনা। হাম্মাদকে তিনি একদিন কালাম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে নিষেধ করেন। তখন হাম্মাদ বলেন, আপনাকেও তো আমি এ শাস্ত্র চর্চা করতে দেখেছি। তাহলে আমাকে নিষেধ করছেন কেন, আব্বাজান? ইমাম বললেন, আমরা এটা নিয়ে মুনাযারা করার সময় আতঙ্কিত থাকতাম যেন কেউ বিভ্রান্ত না হই। আর তোমরা এখন এটা নিয়ে মুনাযারা করোই প্রতিপক্ষকে গোমরাহ করতে। আর যে ব্যক্তি এমন কামনা করে, সে মূলত তার কুফর কামনা করে। আর যে ব্যক্তি অন্যের কুফর কামনা করে, দেখা যায়, সে অন্যের আগে নিজে তাতে পতিত হয়। এটা নিষিদ্ধ। ফলে এ ধরনের মুতাকাল্লিমের পিছনে নামায হবে না।[১৪৫]

ইমাম আজমের প্রসিদ্ধ জীবনীকার মুওয়াফফাক ইবনে আহমদ মক্কির (৫৬৮ হি.) কথায় কালামের প্রতি ইমাম রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন এবং সেটার কারণ আরও স্পষ্ট হয়। তার বর্ণনানুযায়ী—হাম্মাদ বলেন, আব্বাজান আমাকে কালাম শিখতে বলতেন। এটা চর্চার প্রতি অত্যন্ত উদ্‌বুদ্ধ করতেন। আমাকে বলতেন, বৎস, কালাম শিক্ষা করো। কারণ, সেটা সবচেয়ে বড় ফিকহ (আল-ফিকহুল আকবার)। হাম্মাদ বলেন, তখন থেকে আমি কালাম শেখা শুরু করি মূলত তাকে

---

১৪৪. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (৯)। দেখুন : আত-তামহিদ, আবু শাকুর সালেমি (১৯১)।
১৪৫. ফাতহুল কাদির (১/৩৫০)। দেখুন : তাতারখানিয়্যাহ (১৮/২৭৬-২৭৭)।

সন্তুষ্ট করার জন্যই। একপর্যায়ে কালামশাস্ত্রে আমি গভীর জ্ঞান লাভ করি। তখন সেটা আমি আমার নিজের নফস ও শাহওয়াতের জন্য চর্চা করতে থাকি। একদিন আমি একদল লোকের সঙ্গে বিতর্ক করছিলাম। আমাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে উঠছিল। এমন সময় আব্বাজান এলেন। আমি তাঁর কাছে ছুটে গেলাম। তিনি বললেন—হাম্মাদ, তোমার সাথে এরা কারা? আমি বললাম, অমুক অমুক—তাদের সকলের নাম জানালাম। তিনি বললেন, কী নিয়ে বিতর্ক করছ? আমি বললাম, অমুক বিষয়ে। তিনি বললেন—হাম্মাদ, কালাম ছেড়ে দাও! ইতঃপূর্বে আমি আব্বাজানকে কোনো জিনিসের নির্দেশ দিয়ে সেটা ছাড়তে বলতে দেখিনি। তাই আমি বললাম—আব্বাজান, আপনিই কি আমাকে এটা শিখতে বলেছিলেন না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আজ আবার আমিই নিষেধ করছি। আমি কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, কালামের বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ককারী মানুষগুলো একই মতবাদ এবং একই দ্বীনের অনুসারী ছিল। কিন্তু একপর্যায়ে শয়তান তাদের মাঝে ঢুকে যায়। তাদের মাঝে শত্রুতা, বিদ্বেষ ও মতভেদের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তাদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। একে অপরকে কাফের বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মাশায়েখ এটা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং একত্র হয়ে বলেন—হে লোকসকল, তোমরা এক দ্বীনের অনুসারী। তোমাদের ইমাম একজন। কিবলা এক। কিতাব এক। শরিয়ত অভিন্ন। তবুও ইবলিস তোমাদের মাঝে ঢুকে বিভেদের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সত্যের জয় সুনিশ্চিত। মিথ্যার পরাজয়ও অবধারিত। তাই তোমরা সত্যকে প্রকাশ করো। দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে মিথ্যার খণ্ডন করো। এতে হয়তো তোমাদের মতভেদ দূর হবে। ঐক্য ও হৃদ্যতা ফিরে আসবে। আবু হানিফা বলেন, 'এই পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা কালামচর্চা শুরু করেছিলাম। আমরা যখন কথা বলতাম, শয়তান প্রবেশের ভয়ে আমরা তটস্থ থাকতাম। কান্নায় আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসত। ...আর আজ দেখছি কালামের মজলিসে মানুষ হইহই করে হাসে, বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করে। প্রতিপক্ষকে কুপোকাত করাই হয় তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই যেহেতু কালামের অবস্থা, তাই এটাকে পরিত্যাগ করাই কল্যাণ।'[১৪৬]

আল্লামা তাফতাযানি লিখেন, 'সালাফে সালেহিন থেকে কালামের সমালোচনা এবং এটা চর্চায় নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়। এ মূলত সে কালাম যাতে ইয়াকিন আসার পরিবর্তে ইয়াকিন বিনষ্ট হয়, মুসলমানদের আকিদা বরবাদ হয়, আকিদার পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় ফালসাফা তথা দর্শন চর্চা হয়। নতুবা এ শাস্ত্র (যাতে মূলত

১৪৬. মানাকিব, মক্কি (১৮৩-১৮৪)।

তাওহিদ ও আকায়েদ নিয়ে আলোচনা করা হয়) সর্বপ্রধান ওয়াজিব এবং সকল আমলের ভিত্তি। এটার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা সম্ভব কী করে?'[১৪৭]

কাযি সদর আবুল ইউসর বাযদাবি (৪৯৩ হি.) লিখেন, 'ইলমুল কালাম' চর্চার ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ মুতাকাল্লিম এটাকে সম্পূর্ণ বৈধ বলেছেন। আশআরি ও মুতাযিলাদের মত এটাই। বিপরীতে অধিকাংশ মুহাদ্দিস কালাম চর্চাকে অবৈধ বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. প্রথম জীবনে এটা চর্চা করেছেন। 'আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম' গ্রন্থে তিনি কালাম চর্চাকে বৈধ বলেছেন। এটাকে হাতিয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ...কিন্তু আমাদের অঞ্চলের অধিকাংশ ফকিহ ও ইমাম মানুষকে প্রকাশ্যে এটা শিখতে, শেখাতে এবং এ বিষয়ে বিতর্ক করতে নিষেধ করেন। ...আমরা আকিদা ও ফিকহ উভয়ক্ষেত্রে আবু হানিফাকে অনুসরণ করি। তিনি (প্রথম জীবনে) কালাম শিক্ষা ও শিক্ষাদান, কালাম বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন ইত্যাদি সবকিছু বৈধ বলতেন। কিন্তু জীবনের শেষদিকে তিনি কালাম নিয়ে মুনাযারা পরিত্যাগ করেন। এর মাঝে তাঁর শাগরেদদের প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। তিনি তাদের যেভাবে প্রকাশ্যে ফিকহ শিক্ষা দিতেন, সেভাবে এটা শেখাতেন না...।' অতঃপর বাযদাবি নিজের মত প্রকাশ করেন এভাবে : 'তবে যেহেতু দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো দলিল-সহ জানা দরকার, এ জন্য ইলমে কালাম শেখা মুবাহ (বৈধ)। বরং কখনো কখনো ফরযে কিফায়াহ। তবে যে এটা শিখবে, সবার কাছ থেকে শিখবে না; বরং আহলে ইলম ও আহলে সুন্নাতের আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত এ শাস্ত্রে ইমাম পর্যায়ের ব্যক্তি থেকে শিখবে।'[১৪৮]

ফাতাওয়া তাতারখানিয়্যাহর সংকলক আল্লামা ইবনুল আলা দেহলভি (৭৮৬ হি.) 'সিরাজিয়্যাহ'র উদ্ধৃতিতে লিখেন, 'একদল আলেম ইলমে কালাম চর্চা করতে নিষেধ করেছেন। এটা মূলত দ্বীন নিয়ে ঝগড়া-বিবাদসম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার উপর আরোপিত হবে। কারণ, তখন সেটা বিদআত ও ফেতনা ছড়াতে সহায়ক হবে। আকিদার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে। একইভাবে নিষিদ্ধ হবে যখন

---

১৪৭. শরহুল আকায়েদ (২৪)। বিস্ময়ের বিষয় হলো, সাদ মুতাআখখিরিনের যে কালামের সমালোচনা করেছেন, তাঁর ব্যাখ্যার শুরুতে তিনি নিজেও সেগুলোর অবতারণা করেছেন। এর অন্যতম কারণ মানহাজগত আবশ্যকতা। এই আবশ্যকতা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শরহুল আকায়েদ কিংবা সমধারার আকিদার অন্যান্য কিতাবের শুরুতে যেসব আলোচনা দেখা যায়, সেগুলোর অধিকাংশই ফালসাফি তথা দর্শনভিত্তিক আলোচনা। ইসলামি আকিদার সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক সুদূর পরাহত।

১৪৮. দেখুন : উসূলুদ্দিন (১৫-১৬)।

বিতর্ককারী অদূরদর্শী হবে (ফলে সহজে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে)। অথবা সত্যের জয়ের জন্য নয়, নফসের জন্য লড়াই করবে। কিন্তু এসব নিষিদ্ধ বিষয়ের পরিবর্তে এটা যদি আল্লাহর মারিফাত, তাওহিদ, নবুওত এবং ইসলামের অন্যান্য আকিদা জানার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়, তবে এমন কালাম নিষিদ্ধ নয়।'[১৪৯]

কারও মনে হতে পারে, এগুলো স্রেফ মুতাকাল্লিমিনের বক্তব্য। তারা তো কালামকে বাঁচাতে পক্ষে বলবেনই। তাদের বাইরে অন্যান্য আলেমের বক্তব্য দেখানো হোক। হাম্বলি ফকিহ ইবনে মুফলিহ লিখেন, 'বিশুদ্ধ মাযহাব মতে ইলমে কালাম শেখা বৈধ ও অনুমোদিত। এটার সহায়তায় আহলে বিদআতের সঙ্গে মুনাযারা এবং তাদের খণ্ডন করা, তাদের বিরুদ্ধে (এর মানহাজে) গ্রন্থ লেখা জায়েয। এটাই (হাম্বলি মাযহাবের) মুহাক্কিক ইমামদের মত। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ থেকে ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়; কিন্তু সেটা খোদ তার কর্মের বিপরীত। কারণ, ইমাম তাঁর নিজের 'আর-রাদ্দু আলায যানাদিকাহ' গ্রন্থে কুরআন-সুন্নাহ এবং আকলি দলিলের মাধ্যমে তাদের খণ্ডন করেছেন। বরং তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে বোঝা যায়, কালামের বিরোধিতায় দেওয়া প্রথম বক্তব্য থেকে তিনি ফিরে এসে বলেন, আমরা এ ব্যাপারে চুপ থাকতাম। কিন্তু যখন তারা এগুলোতে প্রবেশ করল, তখন তাদের খণ্ডন না করে উপায় ছিল না।'[১৫০] 'ইকনা'র ব্যাখ্যায় আরেক হাম্বলি আলেম বাহুতি লিখেন, "নিন্দিত অথবা হারাম ইলমে কালাম হলো সেটা, যেটা স্রেফ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেটা 'নস' তথা কুরআন-সুন্নাহর সমর্থনে আকলের সমন্বয়ে গঠিত, সেটা 'আসলুদ-দ্বীন' (আকিদা) এবং আহলে সুন্নাতের মানহাজ।"[১৫১] আরেক হাম্বলি আলেম সাফারিনি লিখেন, 'আমাদের ইমামগণ যে ইলমে কালাম শিখতে নিষেধ করেছেন, সেটা হলো ফালসাফা (দর্শন), তাবিল (রূপক ব্যাখ্যা), ইলহাদ (সীমালঙ্ঘন, বক্রতা ও বিকৃতি), মিথ্যা-জোচ্চুরি, কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা ইত্যাদি দিয়ে ভরা।'[১৫২] বোঝা গেল, সকল মাযহাব-মাসলাকের মুহাক্কিক আলেমের সর্বসম্মতিক্রমে সত্তাগতভাবে কালাম নিন্দনীয় নয়; বরং কীভাবে এটাকে ব্যবহার করা হবে সেটার উপর এর বিধান নির্ভর করবে।

---

১৪৯. ফাতাওয়া তাতারখানিয়্যাহ (১৮/২৭৬)।

১৫০. আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ (১/২২৬-২২৭)।

১৫১. কাশশাফুল কিনা (৭/৮)।

১৫২. লাওয়ামিউল আনওয়ার (১/১১-১১২)।

অধমের পর্যবেক্ষণ : তবে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, কেবল সালাফে সালেহিনের প্রথম যুগে কুরআন-সুন্নাহর মানহাজ থেকে বিচ্যুত লোকজন কালামকে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ভ্রান্তি প্রচারে ব্যবহার করেছে আর ইসলামিকরণের পরে সেটা কেবল ইতিবাচক অর্থে, কুরআন ও সুন্নাহর খেদমতে, আহলে সুন্নাতের সুনির্মল আকিদা প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে ব্যবহৃত হয়েছে—এমন সরল সমীকরণ সঠিক নয়। বরং কালামচর্চার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন অব্যাহত থেকেছে। কখনো কখনো এর সঙ্গে দর্শন ও মানতেক মিশ্রিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর সরল ও সহজ আকিদার পথে প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করেছে। আকিদার নামে এমন অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে, যেগুলোর মাঝে আর দার্শনিকদের গ্রন্থাবলির মাঝে ফারাক করা কঠিন; বরং সেগুলোতে সকল ইলম আছে, স্রেফ আকিদাটাই নেই। ইসলামের ইতিহাসের মাঝামাঝি শতাব্দের বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি আমাদের কথার সুস্পষ্ট সাক্ষী। খোদ তাফতাযানির ভাষায়—'সামইয়্যাত (তথা গায়েব ও আখেরাতবিষয়ক কিছু আকিদা, যা কেবল শেষের দিকে আলোচনা করা হয়) যদি না থাকত, তবে এসব (কালামি) গ্রন্থ আর ফালসাফা তথা দর্শনের গ্রন্থগুলোর মাঝে কোনো ফারাক খুঁজে পাওয়া যেত না।'[১৫৩]

তাই কালামের ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ ও ইনসাফপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প নেই। আমাদের মনে রাখা উচিত, কালাম ওহিভিত্তিক মানহাজের বিকল্প নয়; সুন্নতে নববির হেদায়াতের সমার্থক নয়; ইসলামি আকিদার উৎস নয়। ইসলামি আকিদার উৎস ও ক্ষেত্র হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। আধুনিক বিভিন্ন শাস্ত্রকে ইসলামের সেবায় ব্যবহার, যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভ্রান্তির অপনোদন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার বিষয়টি খোদ কুরআন-সুন্নাহতেই বিদ্যমান। এটা নবিদের দাওয়াতের সুস্পষ্ট ও অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। কুরআন ও সুন্নাহ এমন সুস্থ যুক্তির সমৃদ্ধ ভান্ডার। এর জন্য নতুন কোনো শাস্ত্র গঠন নিষ্প্রয়োজন। তাই 'কালাম' বলতে যদি নিত্যনতুন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে, যুগ সমস্যার সংকটে ইসলামকে নবরূপে উপস্থাপন বোঝায়, যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর আকিদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা বোঝায়, তবে এমন যুক্তিতর্ক ইসলামে সাধুবাদযোগ্য। সেটা করতে গিয়ে যদি ইসলামের বাইরে থেকে বিভিন্ন উপাদান ও উপকরণ নিতে হয়, বিভিন্ন পরিভাষা ও শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি আকিদাকে ব্যাখ্যা করতে হয়, তবে সেটা অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহর বেঁধে দেওয়া সীমার ভিতরে হতে হবে, কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি এবং সালাফে সালেহিনের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হতে হবে।

---

১৫৩. দেখুন : শরহুল আকায়েদ (২৩)। শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৬৪)।

এমন 'কালাম' ইসলামে গ্রহণযোগ্য। বরং এ পদ্ধতিতে কেবল 'ইলমে কালাম' নয়, জগতের যেকোনো শাস্ত্রকে ইসলামের সেবায় ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। বিপরীতে যদি কোনো শাস্ত্র ওহির ফিতরতি পথে প্রতিবন্ধক হয়, ইসলামি আকিদা ও উসুলকে এমন পথে নিয়ে যায় যা সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহিনের পথ নয়, তবে ইসলামে এমন কোনো শাস্ত্র গ্রহণ ও চর্চার অনুমোদন নেই। সেটার নাম, উৎস কিংবা প্রতিষ্ঠাতা যে বা যারাই হোন না কেন।

কালামের ময়দানের সিপাহসালার হুজ্জাতুল ইসলাম গাযালি রহ. কালামের পক্ষের ও বিপক্ষের লোকদের মতামত ও দলিল-প্রমাণ বিস্তারিত পর্যালোচনার পর তাঁর নিজের লম্বা মতামত তুলে ধরেন, যা সকল প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ এবং কালামের ময়দানের এক অগ্রদূতের বক্তব্য হিসেবে মূল্যায়িত। তাঁর বক্তব্যের সারকথা হলো :

"...'জাদাল' ও 'কালামশাস্ত্র' নিয়ে মানুষ প্রান্তিকতায় লিপ্ত—বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির শিকার। একদল এটাকে বিদআত ও হারাম ফাতাওয়া দিয়েছে। কালাম নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে দুনিয়ার সকল গুনাহ নিয়ে উপস্থিত হওয়াকে উত্তম বলেছে! আরেক দল এটাকে ওয়াজিব ও ফরয ঘোষণা করেছে। সকল আমলের চেয়ে উত্তম, সবচেয়ে বড় ইবাদত ঘোষণা করেছে। কারণ, তাদের মতে, এটা ইলমে তাওহিদ বাস্তবায়ন এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রতিরক্ষার হাতিয়ার। প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন শাফেয়ি, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল, সুফিয়ান সাওরি ও সালাফের মুহাদ্দিসিনে কেরাম। তারা বিভিন্ন যুক্তি দেখান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, সাহাবায়ে কেরাম এমন কোনো জ্ঞান চর্চা করেননি। তা ছাড়া, হাদিসে দ্বীনের ব্যাপারে বিতর্ক করতে নিষেধ করা হয়েছে। বিপরীত দলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন মুতাকাল্লিমিন। তাদের দলিল হচ্ছে কুরআনের সেসব আয়াত এবং সালাফের সেসব ঘটনা, যেখানে তারা যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে বাতিলকে খণ্ডন করেছেন, কাফের ও বিদআতিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের স্তব্ধ করে দিয়েছেন।'[১৫৪]

'মোটকথা, এক কথায় কালামশাস্ত্রকে ভালো কিংবা মন্দ বলার সুযোগ নেই। কেননা, এর মাঝে উপকার ও অপকার, ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক দুটোই আছে। ইতিবাচক দিকের প্রতি লক্ষ করলে এটা হালাল, আর নেতিবাচক দিকে লক্ষ করলে হারাম। এটার উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর দিক হলো, মনে সন্দেহ ও সংশয়

১৫৪. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, গাযালি (১/৯৪-৯৯)।

তৈরি করা, ঈমান-আকিদার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ভিত দুর্বল করে ফেলা, মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত গোঁড়ামি তৈরি করা, প্রতিপক্ষকে হারানোর নেশার সামনে সত্য ও হককে গৌণ বানিয়ে ফেলা। বিপরীতে এর উপকারী দিক হিসেবে মনে করা হয়, বিভিন্ন বিষয়ের হাকিকত তথা স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, বাস্তবতা উপলব্ধীকরণ ইত্যাদি। কিন্তু আফসোস! কালামের মাঝে এই মহান উদ্দেশ্যগুলো পূর্ণ করার ক্ষমতাই নেই। বরং এর মূল কাজই হলো মানুষের সন্দেহ-সংশয় আরও বাড়িয়ে দেওয়া, অন্ধকারের মাঝে ছেড়ে দেওয়া।' গাযালি বলেন, 'এই কথা যদি কোনো মুহাদ্দিস বা হাশাভি বলত, তুমি হয়তো তাকে কালামের শত্রু গণ্য করে পাত্তা দিতে না। কিন্তু তোমাকে এটা বলছে সে ব্যক্তি যে কালামকে চর্চা করেছে, সবদিক থেকে পর্যবেক্ষণ করেছে। কালামের মাঝে প্রবেশ করে মুতাকাল্লিমিনের ইমাম হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কালাম কিছু কিছু বিষয়ের ভালো ব্যাখ্যা দেয়, অস্পষ্টতা দূর করে। কিন্তু সেটা একেবারেই দুর্লভ। বরং কালাম এমন বিষয়ের অস্পষ্টতা দূর করে, যেগুলো কালাম ছাড়াই বোঝা সম্ভব! ...কারণ, কালামের মাঝে যেসব যুক্তি থাকে, কুরআন-সুন্নাহতেও সেসব সুন্দর যুক্তি রয়েছে। বিপরীতে কালামের মাঝে যে অস্পষ্ট প্রকরণ এবং জটিল বিভাজন-বিন্যাসকরণ ইত্যাদি রয়েছে, কুরআন-সুন্নাহ ও স্বচ্ছ হৃদয় সেগুলো থেকে মুক্ত। আর এ কারণেই শাফেয়ি-সহ অন্য ইমামগণ কালাম চর্চা করতে নিষেধ করেছেন।'[১৫৫]

তা ছাড়া, সাধারণ মানুষকে এ শাস্ত্রে জড়িয়ে ফেলার পরিণতি সুখকর নয়। এ জন্য এটা চর্চা করলেও সীমিত পরিসরে করতে হবে। খোদ ইমাম আজম রহ. আবু ইউসুফকে প্রদত্ত তার প্রসিদ্ধ ওসিয়তের মাঝে বলেন, 'সাধারণ মানুষের মাঝে কালাম ও উসুলুদ্দিন নিয়ে কথা বলো না। কারণ, এমন করলে তারা এক্ষেত্রে তোমার তাকলিদ (অনুসরণ) করবে এবং তাতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে।'[১৫৬] শুরুম্বুলালি লিখেন, 'ইমাম আবু হানিফা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কালাম শেখা এবং মুনাযারাকে মাকরুহ বলেছেন।'[১৫৭] ফাতাওয়া আলমগিরিতেও প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত কালাম শেখা ও চর্চা করা মাকরুহ বলা হয়েছে।[১৫৮]

---

১৫৫. প্রাগুক্ত (১/৯৪-৯৯)।
১৫৬. মানাকিব, মক্কি (৩৭৩)।
১৫৭. গুনইয়াতু যাবিল আহকাম (১/৩১৩) [দুরারুল হুক্কামের সঙ্গে সংযুক্ত হাশিয়া]।
১৫৮. দেখুন : ফাতাওয়া আলমগিরি (৫/৩৭৭)।

কালাম নিষিদ্ধ হলে আকিদা নিয়ে সকল বিতর্কও নিষিদ্ধ : এখানে আরও একটি বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। সেটা হলো, একদল লোক সালাফের বিভিন্ন বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে কালামকে সর্বাঙ্গীণভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ মনে করলেও আকিদাকেন্দ্রিক অর্থহীন ঝগড়া-বিবাদ ও তর্কবিতর্ককে ঠিকই বড় জিহাদ এবং দ্বীনের বিশাল খেদমত মনে করেন। অথচ সালাফের কালামচর্চার নিষেধাজ্ঞা স্রেফ শাস্ত্র হিসেবে নয়, বরং এই অর্থহীন বিতর্কের মূল উপকরণ হওয়ার কারণে। ইমাম আজমসহ সালাফের বক্তব্যে এ বাস্তবতা স্পষ্ট হলেও তারা এটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। যেমন—ইমাম আজম রহ. যখন পুত্র হাম্মাদকে কালামচর্চা করতে নিষেধ করেন, তখন কারণ হিসেবে বলেন, 'আমরা এটা নিয়ে মুনাযারা করার সময় আতঙ্কিত থাকতাম যেন কেউ বিভ্রান্ত না হই। আর তোমরা এখন এটা নিয়ে মুনাযারা করোই প্রতিপক্ষকে গোমরাহ করতে। যে ব্যক্তি এমন কামনা করে, সে মূলত তার কুফর কামনা করে। আর যে ব্যক্তি অন্যের কুফর কামনা করে, দেখা যায়, সে অন্যের আগে নিজে তাতে পতিত হয়। এটা নিষিদ্ধ। এ ধরনের মুতাকাল্লিমের পিছনে নামায হবে না।'[১৫৯] এখানে স্পষ্ট যে, শাস্ত্রটা কালাম হোক কিংবা অন্যকিছু হোক সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, দ্বীন নিয়ে বিবাদ-বিতর্ক করা, অন্য মুসলিমকে ভ্রান্ত সাব্যস্তের কোশেশ করাটাই নিন্দনীয়।

একইভাবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত আরেকটি ঘটনাতে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। আবু ইউসুফ রহ. বর্ণনা করেন, 'আমরা আবু হানিফা রহ.-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় একদল লোক দুই ব্যক্তিকে নিয়ে এলো। এসে বলল, এই ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলে। আর দ্বিতীয় জন তাকে নিষেধ করে বলে, কুরআন মাখলুক নয় (আমরা তাদের ব্যাপারে কী করব?)। ইমাম বললেন, **'তাদের কারও পিছনে নামায পড়ো না।'** আমি বললাম, প্রথম জনের ব্যাপার তো স্পষ্ট। কারণ, সে কুরআনকে মাখলুক বলে। কিন্তু দ্বিতীয় জনের পিছনে নামায বাদ দেওয়ার কারণ কী? তার কথা তো ঠিকই আছে। ইমাম বললেন, **'কারণ, তারা দ্বীন নিয়ে বিবাদ করেছে। অথচ দ্বীন নিয়ে বিবাদ বিদআত।'**[১৬০]

এখানে কালামের কোনো উল্লেখ নেই; বরং স্রেফ কুরআন নিয়ে বিতর্ককেও ইমাম নিষেধ করেছেন। এসব বিষয় নিয়ে বিতর্ককারীর পিছনে নামায পড়তে বারণ করেছেন। ফাতহুল কাদিরে আরও স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.

---

১৫৯. ফাতহুল কাদির (১/৩৫০)। তাতারখানিয়্যাহ (১৮/২৭৬-২৭৭)।

১৬০. তালখিসুল আদিল্লাহ, সাফফার (৫৬)।

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মুতাকাল্লিম তথা কালাম চর্চাকারীর পিছনে নামায পড়া বৈধ নয়, সত্য বললেও।'[১৬১] অর্থাৎ আকিদা নিয়ে যে বিতর্ক করবে সে-ই বিদআতি গণ্য হবে, হোক সে সত্যবাদী। তার পিছনে নামায বর্জন করা হবে।

সুতরাং বিতর্ক কোন নামে হচ্ছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং আহলে সুন্নাতের মাঝে এগুলো নিয়ে বিতর্ক করা সর্বতোভাবেই নিন্দনীয়। কারণ হলো, এগুলো দ্বীনের কোনো মৌলিক বিষয় নয়। সামগ্রিকভাবে সকলেই হকের উপর। স্রেফ উত্তম-অনুত্তমের ব্যাপার। কিন্তু সেটা নিয়ে যখন বিতর্ক অব্যাহত থাকবে, একপর্যায়ে তা বিরাট বিষয়ে পরিণত হবে। ফেতনা ছড়াবে। দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ হ্রাস পাবে। উপরন্তু শাখাগত বিষয়ে বিতর্ক শুরু করলে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি অনিবার্য হবে। ঐক্য বিনষ্ট হবে। উম্মাহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে গুরুত্বহীন বিষয়ের মাঝে ডুবে যাবে। দ্বীনের শাখাগত বিষয়গুলোকে মৌলিক বানিয়ে ফেলবে। এটা অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাপার, যা আমাদের চারপাশে আমরা নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি। ফলে কালামকে নিন্দা করে 'আকিদা'র নামে উম্মাহর মাঝে শাখাগত ও গৌণ বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক করা, একে অন্যকে আহলে সুন্নাত থেকে খারিজ করা এবং বিদআতি আখ্যা দিয়ে মুসলিম উম্মাহর দুর্বল দেহকে কেটে টুকরো টুকরো করা আর যা-ই হোক, ইসলামের কাজ নয়। এটা এক ধরনের তালবিসে ইবলিস তথা শয়তানের ধোঁকা। কালামকে নিন্দা করলে আকিদার নামে শাখাগত বিষয় নিয়ে উম্মাহর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করারও নিন্দা করতে হবে।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'হেদায়াত লাভের পরে কোনো সম্প্রদায় তখনই বিভ্রান্ত হয়, যখন তারা বিতর্কে জড়ায়।'[১৬২] ফলে দ্বীনের শাখাগত সকল বিষয় নিয়ে বিতর্ক বাদ দিতে হবে। কারণ, তাতে হেদায়াত নেই, কল্যাণ নেই। আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ধারা হাজার বছর ধরে আকিদার শাখাগত বিষয়গুলো নিয়ে বিরোধ করছে। আজ পর্যন্ত কোনো সর্বসম্মত সমাধানে আসতে পেরেছে? পারেনি। কিয়ামত পর্যন্ত আসতে পারবে না। কারণ, এগুলো একমত হওয়ার বিষয়ই নয়। আবার এগুলোতে দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও তাদের একদল অন্যদলকে কাফের বা জাহান্নামি বলতে পারছে না, নিজেকে জান্নাতি সনদও দিতে পারছে না। ফলে এই সহস্রাধিক বছরের বিতর্ক একটা বদ্ধগলিতে গিয়ে আটকা পড়ছে।

---

১৬১. ফাতহুল কাদির (১/৩৫১)।
১৬২. তিরমিযি (আবওয়াবু তাফসিরিল কুরআন : ৩২৫৩)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুস সুন্নাহ : ৪৮)

এখান থেকে উম্মাহকে বের হতে হবে। দ্বীনের মৌলিক বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিলে সকলে মিলে সেটার বিরোধিতা করতে হবে। শিরকের পরিবর্তে তাওহিদ এবং বিদআতের পরিবর্তে সুন্নাহ প্রচারের জিহাদ অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু নিজেদের মাঝে বিদ্যমান শাখাগত বিষয়ে বিতর্ক পরিহার করতে হবে। উম্মাহর আলেম ও ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ এটা যত দ্রুত উপলব্ধি করবেন, ততই মঙ্গল।

আকিদা বিষয়ে ইমাম আজমের গ্রন্থগুলোর প্রামাণ্যতা

আকিদা বিষয়ে লিখিত পাঁচটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন পুস্তিকা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। সেগুলো হলো : এক. আল-ফিকহুল আকবার। সংকলক : ইমামপুত্র হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা। দুই. আল-ফিকহুল আবসাত। সংকলক : আবু মুতি বলখি। তিন. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম। সংকলক : আবু মুকাতিল সমরকন্দি। চার. আর-রিসালাহ। বসরার আলেম উসমান আল-বাত্তির কাছে লেখা ইমামের চিঠি। পাঁচ. আল-ওয়াসিয়্যাহ। জীবনের শেষলগ্নে ইমামপ্রদত্ত ওসিয়ত সংকলন।

যেহেতু এসব গ্রন্থ অত্যন্ত প্রাচীন, সহস্র বছরের চেয়েও বেশি পুরোনো, ফলে স্বাভাবিকভাবেই এসব গ্রন্থের প্রামাণ্যতার উপর আপত্তি ওঠে, যেমন প্রাচীন অসংখ্য গ্রন্থের উপরই উঠেছে। এগুলোর উপর ওঠা আপত্তি মোটা দাগে দুই ধরনের। নিচে আমরা সেসব আপত্তি এবং সেগুলোর উপর আমাদের পর্যালোচনা ধারাবাহিকভাবে পেশ করছি।

সামগ্রিক সংশয় :

যদিও এসব গ্রন্থ অত্যন্ত প্রাচীন এবং সেই প্রথম কয়েক শতাব্দেই এগুলোর উপর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখা হয়েছে, এসব গ্রন্থের আলোকে বড় বড় ইমাম আবু হানিফার আকিদা লিখেছেন, চর্চা করেছেন, বিচার করেছেন, যাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইমাম আবু জাফর তহাবি, আবু মনসুর আল-মাতুরিদি, আবুল লাইস সমরকন্দি, ইবনে ফওরক, আবদুল কাহের বাগদাদি, আবুল মুজাফফর ইসফারায়েনি প্রমুখ, তবুও কোনো কোনো গবেষক এসব গ্রন্থের উপর আপত্তি তুলেছেন; বরং তাদের কেউ কেউ সুস্পষ্ট ভাষায় এসব গ্রন্থকে ইমাম আবু হানিফার নয় বলে মত দিয়েছেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ওরিয়েন্টালিস্ট গবেষক কার্ল ব্রুকলম্যান। তিনি তাঁর 'আরবি সাহিত্যের ইতিহাস'-শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, 'আবু হানিফা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত কোনো গ্রন্থ নেই। ফলে আল-ফিকহুল

আকবার নামে প্রসিদ্ধ দুটো গ্রন্থ তাঁর নয়। খুব সম্ভবত এগুলো আশআরির পরে লেখা হয়েছে।'[১৬৩]

মিশরীয় গবেষক আহমদ আমিন 'আল-ফিকহুল আকবার'-এর উপর নানান সন্দেহ ও সংশয় উত্থাপন করেছেন। এ কিতাবগুলোর প্রামাণ্যতার ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। শেষে অবশ্য আংশিকভাবে হলেও ইতিবাচক মত দিয়েছেন। তার মতে, আমাদের সামনে বিদ্যমান 'আল-ফিকহুল আকবার' মৌলিকভাবে ইমাম আবু হানিফার গ্রন্থ। তবে তাতে পরবর্তী সময়ে কিছু সংযোজিত হয়েছে। কী সংযোজিত হয়েছে সেটা অবশ্য বলেননি।[১৬৪]

শায়খ শিবলি নুমানিও 'আল-ফিকহুল আকবার'-এর প্রামাণ্যতার উপর সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং এটা যে ইমামের কিতাব সেটা মেনে নিতে তাঁর দ্বিধার কথা জানিয়েছেন। তাঁর একটি যুক্তি হলো, আল-ফিকহুল আকবারে এমন কিছু পরিভাষা এসেছে, যেগুলো ইমামের যুগে ছিল না। যেমন : 'জাওহার', 'আরাজ' ইত্যাদি দার্শনিক পরিভাষা, যেগুলো পরবর্তী সময়ে অস্তিত্বে এসেছে, বিশেষত আব্বাসি যুগে অনুবাদকেন্দ্রিক জাগরণের মাধ্যমে। শিবলি নুমানির আরেকটি আপত্তি হচ্ছে : দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দের গ্রন্থগুলোতে এই কিতাবের ব্যাপারে কোনো বক্তব্য নেই; বরং পঞ্চম শতাব্দে বাযদাবিই সর্বপ্রথম এটার নাম উল্লেখ করেন। শিবলি নুমানির তৃতীয় সংশয় হলো আবু মুতি বলখিকে ঘিরে। তাঁর ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের তাজরিহ তথা সমালোচনা অত্যন্ত বেশি। ফলে তিনি নির্ভরযোগ্য নন। সুতরাং স্রেফ এমন ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত কোনো গ্রন্থকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। এ কারণে শিবলি নুমানির কথা হচ্ছে, আবু মুতি বলখি নিজে হয়তো এ কিতাব লিখে থাকবেন, যা ধীরে ধীরে ইমাম আজমের নামে প্রচারিত হয়েছে এবং পরবর্তীকালেও এর সংযোজন অব্যাহত থেকেছে। বরং কেবল আল-ফিকহুল আকবার নয়, শায়খ নুমানি মনে করেন, 'আজ ইমাম আজমের কোনো গ্রন্থ আমাদের সামনে নেই।' এর মানে, তিনি কেবল 'আল-ফিকহুল আকবার' নয়, বরং 'আল-ফিকহুল আবসাত', 'আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম', উসমান বাত্তির কাছে ইমাম আজমের চিঠি (আর-রিসালাহ), তাঁর ওসিয়ত সংকলন 'আল-ওয়াসিয়্যাহ' এগুলোর কোনোটা ইমাম আজমের গ্রন্থ হিসেবে মানছেন না।[১৬৫]

---

১৬৩. দেখুন : তারিখুল আদাবিল আরাবি (৩/২২৭-২২৮)।

১৬৪. দেখুন : যুহাল ইসলাম (২/১৯৭-১৯৮)।

১৬৫. দেখুন : সিরাতে নুমান (২/১১৭-১১৯)।

সংশয়ের পর্যালোচনা : উপরে যে সংশয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো নিছক অনুমানভিত্তিক ও ধারণাপ্রসূত। এগুলোর উপর শক্ত কোনো জ্ঞানগত ও তথ্যনির্ভর দলিল-প্রমাণ নেই। কার্ল ব্রুকলম্যান তার বক্তব্যের পক্ষে মজবুত কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেননি। বরং এক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদের ঢালাওভাবে ইসলামি তুরাস অস্বীকারের যে প্রবণতা দেখা যায়, তিনি সে পথেই হেঁটেছেন। আহমদ আমিনের সংশয়ের জবাব সামনে আসছে। শিবলি নুমানি নিজেও স্বীকার করেছেন যে, তিনি যা বলেছেন, সেটা তার ব্যক্তিগত অভিমত। এসব গ্রন্থ তাঁর হাতে আসেনি। কোনো গ্রন্থ না দেখেই সেটাকে অপ্রামাণ্য বলা কিংবা প্রত্যাখ্যান করা কতটুকু যৌক্তিক? একইভাবে সমকালীন হানাফি ধারার বাইরের কিছু আলেমও এসব কিতাবের উপর সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাদের এসব সংশয়ের ভিত্তি একরকম হাস্যকর। কেউ এসব গ্রন্থের মাঝে বিদ্যমান কিছু বাক্যের ব্যাকরণিক ভুলের কারণে ইমামের গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন। কেউ-বা আবার যুক্তি দিয়েছেন—এগুলো ইমাম আজমের গ্রন্থ হলে এগুলোতে বেশি বেশি কুরআনের আয়াত ও হাদিস থাকত ইত্যাদি। অথচ ইলমি মানদণ্ডে এসব সংশয়ের কোনো ওজন নেই। বিপরীতে এসব গ্রন্থ ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর হওয়ার জন্য একাধিক দলিল-প্রমাণ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—

এক. প্রাচীন পাণ্ডুলিপির বিদ্যমানতা :

ইসলামের প্রথম কয়েক শতাব্দের বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ এর সাক্ষী। প্রথম যুগের উলামা কর্তৃক এসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা এগুলোর প্রমাণিকতার পরিচায়ক। যেমন—ইমাম তহাবি (৩২১ হি.) তারঁ আকিদাতে ইমাম আজম এবং তাঁর দুই সঙ্গীর আকিদা লিখেছেন। ইমাম আজম ও তহাবির মাঝে ব্যবধান এক শতাব্দের বেশি; অথচ আকিদাহ তহাবিয়্যাহতে সংকলিত ইমাম আজমের আকিদার উৎস কী সেটা তহাবি স্পষ্ট করেননি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায়, তিনি এসব গ্রন্থকে ইমাম আজমের প্রামাণ্য হিসেবে গণ্য করেছেন এবং এগুলো থেকেই তাঁর আকিদা সংগ্রহ করেছেন। এটা অনুমানভিত্তিক দাবি নয়, বরং আমাদের সামনে বিদ্যমান ইমাম আজমের পাঁচটি গ্রন্থ আর আকিদাহ তহাবিয়্যাহ সামনে রেখে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করলেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাওহিদ ও ঈমানের সংজ্ঞায়ন ও হাকিকত, আল্লাহর যাত ও সিফাত, রিসালাত, কুরআন, এমনকি কিয়ামতের আলামতসমূহের আলোচনার ক্ষেত্রে সচেতন পাঠকের কাছে আকিদাহ তহাবিয়্যাহকে ইমাম আজমের গ্রন্থসমূহের এবং বিশেষত হাম্মাদ বর্ণিত আল-ফিকহুল আকবারের সারসংক্ষেপ ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। হ্যাঁ, সময়ের

ব্যবধান, ধর্মীয় ও সামাজিক পরিস্থিতি, ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির কারণে ইমাম তহাবি এসব গ্রন্থের শব্দ ও বাক্য হুবহু সংরক্ষণ করেননি। কিন্তু তিনি যে উস্তায-মাশায়েখের পাশাপাশি মৌলিকভাবে এগুলোকে প্রমাণিত ও গ্রহণযোগ্য ধরে এগুলোর উপর নির্ভর করেছেন, সেটা সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত সত্য। একইভাবে আবুল লাইস সমরকন্দি (৩৭৩ হি.) আল-ফিকহুল আবসাতের ব্যাখ্যা লিখেছেন, যা ইমাম মাতুরিদির (৩৩৩ হি.) ব্যাখ্যা হিসেবে প্রসিদ্ধ। উক্ত ব্যাখ্যাটি ইমাম মাতুরিদির ধরা হোক কিংবা সমরকন্দির ধরা হোক, এটা আল-ফিকহুল আবসাতের বিশুদ্ধতার প্রমাণ বহন করে। পাশাপাশি পঞ্চম শতাব্দের আগে এসব গ্রন্থের অস্তিত্ব নেই এমন ধারণা নাকচ করে।

দুই. সনদের প্রামাণ্যতা :

এসব গ্রন্থের সনদ নিয়ে কথা বললেও এগুলোর গ্রহণযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। নিম্নে আমরা এগুলোর সনদ উল্লেখপূর্বক এ ব্যাপারে দিক-নির্দেশনামূলক কিছু সংক্ষিপ্ত জরুরি কথা বলছি।

আল-ফিকহুল আকবার : নুসাইর ইবনে ইয়াহইয়া[১৬৬]→ মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল আর রাযি[১৬৭]→ ইসাম ইবনে ইউসুফ বলখি[১৬৮]→ হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা[১৬৯]→ আবু হানিফা।

আল-ফিকহুল আবসাত : এক. আবুল মুঈন মাইমুন নাসাফি→ হুসাইন ইবনে আলি আল-কাশগরি→ নাসরান ইবনে নসর আল-খাতালি→ আলি ইবনে আহমদ আল-ফারেস→ নুসাইর ইবনে ইয়াহইয়া→ আবু মুতি বলখি[১৭০]→ আবু হানিফা।

---

১৬৬. নুসাইর ইবনে ইয়াহইয়া বলখি। আবু সুলাইমান জুযজানির শাগরেদ। ২৬৮ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

১৬৭. মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল রাযি। 'রাই' শহরের কাযি। ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর শীর্ষ পর্যায়ের শাগরেদ। আবু মুতি বলখিরও শাগরেদ। কেউ কেউ তাকে যয়িফ (দুর্বল) বলেছেন। কিন্তু সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি ২৪৮ হিজরিতে ওফাত লাভ করেছেন।

১৬৮. ইসাম ইবনে ইউসুফ বলখি। ইমাম আজমের শাগরেদের শাগরেদ। অর্থাৎ, তিনি হাম্মাদ, আবু মুকাতিল সমরকন্দি, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক-সহ ইমাম আজমের একাধিক ছাত্রের ছাত্র। হানাফিদের ইমাম পর্যায়ের ফকিহ ও মুহাদ্দিস। ২১০ (/২১৫) হিজরিতে ওফাত লাভ করেন। রীতিমতো তাকেও কেউ কেউ যয়িফ বলেছেন। সেটা গ্রহণযোগ্য নয়।

১৬৯. ইমাম আজমের সন্তান ও শাগরেদ হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা। ১৭৬ হিজরিতে ওফাত লাভ করেছেন। তাকেও কেউ কেউ যয়িফ বলেছেন। কিন্তু এ ধরনের বক্তব্য ধর্তব্য নয়।

১৭০. আবু মুতি হাকাম ইবনে আবদুল্লাহ বলখি। ইমাম আজমের শীর্ষস্থানীয় শাগরেদদের একজন। মুহাদ্দিসগণ তাঁর উপর মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছেন। তাঁকে মুরজিয়া-সম্রাট, জাহমি, মিথ্যুক এবং হাদিস জালকারী

দুই. আবুল মুঈন নাসাফি→ ইয়াহইয়া ইবনে মুতাররিফ বলখি→ আবু সালেহ মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন সমরকন্দি→ আবু সাইদ সাদান ইবনে মুহাম্মাদ আল-বুসতি→ আলি ইবনে আহমদ আল-ফারেস→ নুসাইর ইবনে ইয়াহইয়া→ আবু মুতি বলখি→ আবু হানিফা। ইসফারায়েনি (৪৭১ হি.) এটার সনদকে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[১৭১]

আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম : এক. আবু মুহাম্মাদ আল-হারেসি আল-বুখারি→ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ→ হাসান ইবনে সালেহ→ আবু মুকাতিল সমরকন্দি[১৭২]→ আবু হানিফা। **দুই.** আবু মনসুর মাতুরিদি→ আবু বকর জুযজানি[১৭৩]→ আবু সুলাইমান জুযজানি[১৭৪] ও মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল রাযি→ আবু মুতি বলখি ও ইসাম ইবনে ইউসুফ বলখি→ আবু মুকাতিল সমরকন্দি→ আবু হানিফা[১৭৫]।

আখ্যা দিয়েছেন; অথচ যাহাবি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. তাঁকে তাঁর ইলম ও দ্বীনের কারণে সম্মান করতেন। একজন মুরজিয়া-সম্রাট ও জাহমির আবার কীসের ইলম ও দ্বীনদারি? ইবনুল মুবারকের মতো মানুষ তাঁকে কেন সম্মান করবেন? বোঝা গেল, আবু মুতির ব্যাপারে এসব বক্তব্য আর ইমাম আজমের ব্যাপারে তাদের বক্তব্যের মাঝে খুব একটা ফারাক নেই। এ মহান ইমাম ১৯৯ হিজরিতে ওফাত লাভ করেন।

১৭১. দেখুন : আত-তাবসির (১৮৪)।

১৭২. আবু মুকাতিল হাফস ইবনে সালম সমরকন্দি। ইমাম আজমের প্রথম সারির প্রসিদ্ধ শাগরেদদের একজন। ইমামের যুগে সমরকন্দবাসীর ইমাম ছিলেন। ইমামের অন্যান্য শাগরেদের মতো তিনিও হাদিস নকলকারীদের কাছে 'মিথ্যুক' এবং 'হাদিস জালকারী' হিসেবে পরিচিত; বরং কেউ কেউ তাঁকে পাগলের সঙ্গেও তুলনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা নাজায়েয বলেছেন! এগুলোর ব্যাপারে আমাদের সেই বক্তব্য যে বক্তব্য ইমামের ব্যাপারে আমরা বলেছি। বাযযাযি তাকে সমরকন্দের ইমাম বলেছেন। আবু ইয়ালা খলিলি বলেছেন, 'তিনি ইলম ও সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর যুগে তিনি ফাতাওয়া দিতেন। ইলম ও ফিকহের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চ মর্যাদা ছিল। হাদিস সংগ্রহের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন! [আল ইরশাদ : ৩/৯৭৫] এমন একজন ইমামকে তারা 'মিথ্যুক' আখ্যা দিয়েছেন! ২০৮ হিজরিতে তিনি ওফাত লাভ করেন।

১৭৩. আবু বকর জুযজানি ইমাম মাতুরিদির শায়খ এবং ইমাম আজমের তৃতীয় স্তরের শাগরেদ। অর্থাৎ, আবু বকর জুযজানির শায়খ হচ্ছেন আবু সুলাইমান জুযজানি। আবু সুলাইমান জুযজানির শায়খ হচ্ছেন আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.।

১৭৪. আবু সুলাইমান জুযজানি ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর প্রথম সারির শাগরেদ। তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকেরও শাগরেদ।

১৭৫. এটা আল্লামা কাওসারি রহ. উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর শেষাংশ জটিল ও সন্দেহপূর্ণ। খুব সম্ভবত বিশুদ্ধতর হলো : ইসাম ইবনে ইউসুফ→ আবু মুতি বলখি ও আবু মুকাতিল সমরকন্দি→ আবু হানিফা। কারণ, আবু মুতি ও আবু মুকাতিল দুজনই ইমাম আজম রহ.-এর সরাসরি শাগরেদ। বিপরীতে ইসাম দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ, শাগরেদের শাগরেদ। তা ছাড়া, কিছু সনদে সরাসরি আবু মুতি→ আবু হানিফা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং তিনি ও ইসাম

আল-ওয়াসিয়্যাহ : আবুল মুঈন নাসাফি→ আবু তাহের মুহাম্মাদ ইবনুল মাহদি→ ইসহাক ইবনে মনসুর→ আহমদ ইবনে আলি সুলাইমানি→ হাতেম ইবনে আকিল জাওহারি→ মুহাম্মাদ ইবনে সামাআহ[১৭৬]→ আবু ইউসুফ→ আবু হানিফা।

আর-রিসালাহ : আবুল মুঈন নাসাফি→ আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মুতাররিফ বলখি→ আবু সালেহ মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন সমরকন্দি→ আবু সাইদ সাদান ইবনে মুহাম্মাদ আল-বুসতি→ আবুল হাসান আলি ইবনে আহমদ আল-ফারেস→ নুসাইর ইবনে ইয়াহইয়া বলখি→ মুহাম্মাদ ইবনে সামাআহ→ আবু ইউসুফ→ আবু হানিফা।

সনদে থাকা এসব ব্যক্তির প্রত্যেকের জীবনচরিত এবং তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন আলেমের বক্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না আমরা। কারণ, এ গ্রন্থে আমরা ইমাম আজমের আকিদা বর্ণনার ইচ্ছা করেছি। ঐতিহাসিক স্বেচ্ছাচারিতা এবং হানাফি উলামায়ে কেরামের প্রতি তাদের প্রতিপক্ষের জুলুমের ফর্দ বর্ণনার ইচ্ছা নেই আমাদের। তবুও প্রসঙ্গক্রমে পিছনে আমরা ইমাম আজম রহ.-এর উপর প্রতিপক্ষের সীমালঙ্ঘনের কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছি। বিজ্ঞ পাঠক অনুভব করবেন—যদি ইমাম আজমের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য এমন থাকে, তবে তাঁর শাগরেদদের ব্যাপারে কেমন হতে পারে!

ফলে তারা ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, যুফার, হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুই, আবু মুতি বলখি, আবু মুকাতিল সমরকন্দি, ইউসুফ ইবনে খালেদ আস-সামতি, পুত্র হাম্মাদ-সহ তাঁর প্রাথমিক স্তরের ছাত্রগণ, মুহাম্মাদ ইবনে শুজা এবং পৌত্র ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ-সহ তাঁর পরবর্তী স্তরের ছাত্রগণ কাউকে ছাড় দেননি। পার্থক্য এটুকু যে, কাউকে স্রেফ 'দুর্বল' বলেছেন, আর কাউকে সরাসরি 'মিথ্যুক', 'খেয়ানতকারী'-সহ বিভিন্ন গালিগালাজে ডুবিয়ে দিয়েছেন। তারা আবু মুতি বলখিকে জাহমি ও মুরজিয়াদের প্রধান বানিয়েছেন। আবু মুকাতিল সমরকন্দিকে হাদিস জালকারী ও মিথ্যুক বানিয়েছেন। ইসমাইল ইবনে হাম্মাদকে মুতাযিলা ঘোষণা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে শুজাকে মুতাযিলা ও জাহমি আখ্যা

একই স্তরের হবেন এবং আবু মুকাতিল থেকে গ্রহণ করবেন এটা অনেকটা অসম্ভব। বরং ইমাম আবু মুতি ও আবু মুকাতিল দুজন থেকে নিয়েছেন এটার সম্ভাবনা অধিক। আল্লাহ ভালো জানেন।

১৭৬. মুহাম্মাদ ইবনে সামাআহ। ইমাম আজমের দ্বিতীয় স্তরের তথা আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর শাগরেদ। ২৩৩ হিজরিতে ওফাত লাভ করেন।

দিয়েছেন। ইউসুফ ইবনে খালেদ সামতিকে সর্বসম্মতিক্রমে মিথ্যুক বানিয়েছেন। বরং তারা কাউকে কাউকে তো মুতাযিলি ও কাফের সাব্যস্ত করেছেন।[১৭৭]

ইমাম আজম এবং তাঁর শাগরেদ, অন্যকথায়, হানাফি ফকিহদের প্রতি মুহাদ্দিসদের এই বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি যুগের পর যুগ অব্যাহত থেকেছে। আল্লামা ইবনে আবদিল বার (৪৬২ হি.) লিখেন, '...বিপরীতে সকল আহলে হাদিস আবু হানিফা ও তাঁর সঙ্গী-অনুসারীদের শত্রুদের মতো।'[১৭৮] শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি লিখেন, 'আরেক ধরনের সমালোচনা হলো ফিকহি মাসআলার শাখাগত বিশ্লেষণ ও প্রকারভেদ বের করা। এটা ব্যক্তির ইজতিহাদি শক্তি ও দূরদৃষ্টির প্রমাণ। এটা কী করে সমালোচনার কারণ হয়? ...মোটকথা, শত্রুতার ভিত্তিতে কেউ কারও সমালোচনা করলে তাতে সমালোচিত ব্যক্তি দোষী হবেন না, যেমন ভ্রান্ত লোকদের আহলে সুন্নাতের সমালোচনা। একইভাবে কিছু ... ব্যক্তির আমাদের বড় বড় আলেমের সমালোচনা। এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আমরা জানি সেটা গোঁড়ামি ও শত্রুতার দোষে দুষ্ট।'[১৭৯] সদরুল ইসলাম বাযদাবি লিখেন, 'কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আহলে হাদিসদের বক্তব্য—তাঁর হাদিস গ্রহণ করা হবে না, কারণ, সে যয়িফ—ইত্যাদি উন্মুক্তভাবে গ্রহণ করা হবে না। কী কারণে যয়িফ, সেটা নির্ধারণের আগে এমন ব্যক্তির হাদিস বর্জন করা হবে না। কারণ, আহলে হাদিস তথা মুহাদ্দিসদের অভ্যাস হলো একে অন্যের সমালোচনা করা, বিশেষত ফকিহদের ব্যাপারে মন্দ বলা। তারা মনে করেন, ফকিহগণ হাদিস মানেন না। অথচ ফকিহগণ কখনোই অকারণে বিশুদ্ধ হাদিস বর্জন করেন না।'[১৮০]

এই ধারণাপ্রসূত অভিযোগের কারণে আজ সহস্র বছর পরও বর্তমান সময়ে তাদের অনুসারী দাবিদাররা ইমাম আজম এবং তাঁর শাগরেদদের শানে জবান দরাজি অব্যাহত রেখেছে, তাদের জাহেল আখ্যা দিচ্ছে। যফর আহমদ উসমানি

---

১৭৭. বিস্তারিত দেখুন : আল-কামিল, ইবনে আদি (৭/৫৫০-৫৫১)। আহওয়ালুর রিজাল, আবু ইসহাক জুযজানি (১১৭-১২০)। এগুলোর খণ্ডনে দেখুন : ইমাম কাওসারির আল-ইমতা (৬২-৮০, ৮৮-১১০)। যফর আহমদ উসমানির 'আবু হানিফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসুন' (মুকাদ্দিমাতু ই'লায়িস সুনান)। শায়খ আবদুর রশিদ নুমানির 'মাকানাতুল ইমাম আবি হানিফা ফিল হাদিস, তাহকিক : আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.।

১৭৮. আল-ইনতিকা (৩৩১)।

১৭৯. উসুলুস সারাখসি (২/১১)।

১৮০. মারিফাতুল হুজাজিশ শরইয়্যাহ (১৩২)।

রহ. এই দুঃখজনক চিত্র দেখে প্রাচীন আরব কবি নাবেগা যুবইয়ানির স্রেফ একটি পঙ্‌ক্তি দিয়েই নিজের মনোবেদনা উল্লেখ করেন : (ولا عَيبَ فيهِمْ غيرَ أنّ سُيُوفَهُمْ، بِهِنّ فلولٌ مِنْ قِراعِ الكتائبِ) অর্থাৎ, 'দুশমনের মাথা কাটতে কাটতে তাদের তরবারি ভোঁতা হয়ে গেছে। এ ছাড়া তাদের কোনো দোষ নেই।'[১৮১]

ইমামের উল্লিখিত শাগরেদদের প্রত্যেকে আহলে সুন্নাতের বড় বড় আলেম এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। সুতরাং স্বাভাবিক মূলনীতি অনুযায়ী যদি ইমাম আজমের এসব ছাত্রের ব্যাপারে সেসব বক্তব্য গ্রহণ করা হয়, তবে ইমাম আজমের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা হবে। আর যদি ইমাম আজমের ক্ষেত্রে বর্জন করা হয়, তবে তাঁর ছাত্রদের ক্ষেত্রেও বর্জন করা হবে। কিন্তু সেটা না করে যদি ইমাম আজমের সমুন্নত মর্যাদা এবং উম্মাহকেন্দ্রিক স্বীকৃতির কারণে তাঁর ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের সমালোচনা পরিহার করা হয়, বিপরীতে একই ব্যক্তি কর্তৃক একই প্রেক্ষিতে তাঁর ছাত্রদের সমালোচনা গ্রহণ করা হয়, তবে এটা কোনো যুক্তিযুক্ত ও যথাযথ কর্মপদ্ধতি হলো না। অথচ দুঃখজনকভাবে তা-ই ঘটেছে। ফলে প্রতিপক্ষের কথার উপর ভিত্তি করে অনেক হানাফি আলেম ইমাম আজমের শাগরেদদের দুর্বল ভেবেছেন, এসব গ্রন্থের প্রামাণ্যতার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন।[১৮২]

ফলে সনদে বিদ্যমান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের মতামত পড়ার সময় এসব বিষয় মনে রাখা জরুরি। আমরা দাবি করছি না যে, সনদে বিদ্যমান এসব হানাফি আলেম সকলে সত্যবাদিতা, ন্যায়-ইনসাফের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিলেন কিংবা ভুল-বিচ্যুতি থেকে একেবারে নিষ্পাপ ছিলেন। কিন্তু আমরা প্রতিপক্ষের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তাদের 'মিথ্যুক', 'খবিস', 'পরিত্যক্ত', 'মুতাযিলা', 'জাহমিয়্যাহ', 'হাদিস জালকারী', 'সুন্নাহর শত্রু' ইত্যাদি মানতেও প্রস্তুত নই। কারণ, নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাদের 'তাদিল' (সামগ্রিক সত্যনিষ্ঠতা) প্রমাণিত। উপরন্তু আকিদার শাখাগত মাসাইল, সিয়ার, তারাজিম ও তাবাকাত তথা জীবনচরিত ও ইতিহাসের গ্রন্থে আমরা হাদিসের মূলনীতি প্রয়োগের যথার্থতা স্বীকার করতেও রাজি নই। যদি এসব গ্রন্থে হাদিস যাচাই-বাছাইয়ের কঠোর মূলনীতি প্রয়োগ করা হয়, তবে কেবল ইমামের গ্রন্থ নয়, অতীতের অধিকাংশ গ্রন্থই বাতিল ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হবে। উপরন্তু মুহাদ্দিসদের বাইরে জীবনী সংরক্ষরণের প্রচলনও তত বিস্তৃত ছিল না। ফলে জারহ-তাদিলের (হাদিস

---

১৮১. কাওয়ায়িদু ফি উলুমিল হাদিস (৪২৫)।

১৮২. দেখুন : আল-ইমতা (৮৯)। লামাহাতুন নাযার (২২-২৪)।

বর্ণনাকারীদের ভালোমন্দ নিরূপণ) নীতি এখানে প্রয়োগ করতে গেলে অনেককে খুঁজে পাওয়া যাবে না, আবার অনেককে অগ্রহণযোগ্য বলতে হবে। এভাবে এসব গ্রন্থের প্রামাণ্যতা নাকচ হয়ে যাবে। অথচ এসব গ্রন্থ সেসব ইমামের সামগ্রিক আকিদাই বহন করছে। তাই এক্ষেত্রে সনদের চেয়ে বইয়ের মাঝে থাকা বক্তব্যের সাক্ষ্য ও সামঞ্জস্যতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তিন. উলামায়ে কেরামের কাছে গ্রহণযোগ্যতা :

এসব গ্রন্থের প্রামাণ্যতার আরেকটি মজবুত দলিল হলো এগুলোর ব্যাপারে সহস্রাধিক বছরব্যাপী বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্য। হিজরি চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দ থেকেই বিভিন্ন আলেম ও গবেষকের গ্রন্থে আবু হানিফা রহ.-এর প্রতি এসব গ্রন্থ সম্পৃক্ত করা ব্যাপকভাবে চোখে পড়ে। উপরে ইমাম তহাবি, আবু মনসুর মাতুরিদি এবং আবুল লাইস সমরকন্দির ব্যাপারে বলা হয়েছে।

শাইখুল মুতাকাল্লিমিন আবু বকর ইবনে ফওরক (৪০৬) ইমামের 'আল-আলিম ওয়াল-মুতাআল্লিম' পুস্তিকার ব্যাখ্যা লিখেছেন যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের শুরুতে তিনি এটাকে ইমাম আজমের কিতাব বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১৮৩] ইবনুন নাদিম (৪৩৮ হি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-ফিহরিস্ত' (৩৭৭ হি.)-এ ইমাম আজমের দিকে একাধিক গ্রন্থ সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি লিখেন, "আবু হানিফা বেশকিছু গ্রন্থ রেখে গিয়েছেন। তন্মধ্যে 'আল-ফিকহুল আকবার', 'আর-রিসালাহ ইলাল বাত্তি', মুকাতিলের বর্ণনায় 'আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম' এবং 'আর-রাদ্দু আলাল কাদারিয়্যাহ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।"[১৮৪] 'আল ফিহরিস্ত' লেখা হয়েছিল চতুর্থ হিজরিতে। সুতরাং 'পঞ্চম হিজরির আগে এসব গ্রন্থের অস্তিত্ব নেই' এটা আরেকবার নাকচ হলো।

আবদুল কাহের বাগদাদি (৪২৯ হি.) ইমামের বিভিন্ন গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর 'উসুলুদ্দিন' গ্রন্থে লিখেন, "ফকিহদের মাঝে প্রথম মুতাকাল্লিম হলেন আবু হানিফা ও শাফেয়ি। কাদারিয়্যাহদের খণ্ডনে আবু হানিফার একটি গ্রন্থ রয়েছে, যার নাম রেখেছেন 'আল-ফিকহুল আকবার।' তাঁর একটি রিসালাহও রয়েছে, যা তিনি আহলে সুন্নাতের **'সামর্থ্য (ইস্তিতাআহ) কাজ করার সময় আসে'** নীতির সমর্থনে লিখেছেন।"[১৮৫]

---

১৮৩. দেখুন : শরহুল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২৩-২৪)।

১৮৪. দেখুন : আল-ফিহরিস্ত (২৫১)।

১৮৫. দেখুন : উসুলুদ্দিন (৩০৮)। তাকদির অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আবুল মুজাফফর আল-ইসফারায়েনি (৪৭১ হি.) লিখেন, "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ি, মালেক, আওযায়ি, দাউদ, যুহরি, লাইস ইবনে সাদ, আহমদ ইবনে হাম্বল, সুফিয়ান সাওরি, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক হানযালি,... আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, যুফার, আবু সাওর প্রমুখের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। হিজায, শাম, ইরাক, খোরাসান, মা-ওয়ারাউন-নাহারসহ সকল আলেমের আকিদা এটা। এটাই সাহাবা, তাবেয়িন ও তাবে-তাবেয়িনের আকিদা। যে ব্যক্তি যাচাই করতে চায়, সে যেন আবু হানিফা রহ.-এর গ্রন্থগুলো দেখে। যেমন : 'কিতাবুল ইলম' (আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম?), 'আল-ফিকহুল আকবার' [বর্তমানে আল-ফিকহুল আবসাত নামে প্রসিদ্ধ], যেটা আবু হানিফা→ আবু মুতি→ নুসাইর ইবনে ইয়াহইয়া থেকে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে, 'আল-ওয়াসিয়্যাহ' যেটাকে তিনি আবু আমর উসমান আল-বাত্তির কাছে লিখেছেন...।"[১৮৬] যদিও ইসফারায়েনির তথ্যের মাঝে কিছু বিভ্রাট রয়েছে, কিন্তু মৌলিক বিষয় যে প্রমাণিত, আমাদের সেটা দেখানো উদ্দেশ্য।

ফখরুল ইসলাম বাযদাবি (৪৮২ হি.) তাঁর বিখ্যাত 'উসুল'-এর শুরুতে লিখেন, "ইলম দুই প্রকারের। এক. আল্লাহর তাওহিদ ও সিফাতের ইলম। দুই. ফিকহ, শরিয়ত ও হালাল-হারামের ইলম। প্রথম প্রকারের ইলমের ক্ষেত্রে একমাত্র বিশুদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও বিদআত বর্জন করা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথে অবিচল থাকা, যে পথে ছিলেন সাহাবা, তাবেয়িন ও সালাফে সালেহিন। এ পথেই অটল ছিলেন ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ এবং তাদের সকল শাগরেদ। ইমাম আবু হানিফা রহ. ইলমে তাওহিদের ক্ষেত্রে 'আল-ফিকহুল আকবার' নামে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। তাতে তিনি (আল্লাহর) সিফাত 'ইসবাত' করতে বলেছেন। তিনি আরও লিখেছেন, 'আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম', 'রিসালাহ' ইত্যাদি।"[১৮৭]

হাফিজুদ্দিন নাসাফি (৭১০ হি.) ইমাম আজমের 'আল-ফিকহুল আকবার', 'আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম' ও 'আর-রিসালাহ' তিনটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ

---

১৮৬. আত-তাবসির ফিদ-দ্বীন (১৮৪)।

১৮৭. দেখুন : উসুলুল বাযদাবি (৩)।

করেছেন এবং সেগুলো থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন।[১৮৮] আবদুল আযিয বুখারি (৭৩০ হি.) উসুলুল বাযদাবির ব্যাখ্যায় আল-ফিকহুল আকবার ও আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম দুটো গ্রন্থই তাঁর কাছে আছে বলে জানিয়েছেন এবং তিনি এসব গ্রন্থ থেকে একাধিক মাসআলার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১৮৯] মক্কির (৫৬৮) বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, খলিফা মামুনের কাছেও ইমাম আজমের কিছু কিতাব পৌঁছেছিল।[১৯০] শায়খ ইবনে তাইমিয়্যাহও (৭২৮ হি.) 'আল-ফিকহুল আকবার' (আবু মুতির আল-ফিকহুল আবসাত)-কে ইমাম আজমের গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১৯১] ইবনে কুতলুবুগা (৮৭৯ হি.) আবু মুতি বলখিকে 'আল-ফিকহুল আকবার'- (যা মূলত আবসাত) এর বর্ণনাকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১৯২] এভাবে যুগে যুগে বিভিন্ন মাযহাব-মাসলাক নির্বিশেষে মুহাক্কিক আলেমগণ এগুলোকে ইমাম আজমের গ্রন্থ বিবেচনা করেছেন এবং সেগুলো থেকে নিজ নিজ রচনায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

বরং আবুল লাইস সমরকন্দি[১৯৩] (৩৭৩ হি.) থেকে শুরু করে আতা ইবনে আলি জুযজানি (৫৬৫ হি. পূর্ব), আকমালুদ্দিন বাবিরতি (৭৮৬ হি.), ইলিয়াস সিনোবি (৮৯১ হি.), বাহাউদ্দিন যাদাহ রাহমাভি (প্রায় ৯৫২ হি.), আবুল মুনতাহা মাগনিসাভি (১০০০ হি.), মোল্লা আলি কারি (১০১৪ হি.) পর্যন্ত বড় বড় হানাফি মুহাক্কিক এসব কিতাবের ব্যাখ্যা লিখেছেন। এর দ্বারাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা এগুলো এবং বিশেষত আল-ফিকহুল আকবার ও আল-ফিকহুল আবসাত দুটোকেই ইমাম আজম রহ.-এর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কারণ, এমন না হলে তারা এসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখতেন না। ফলে সেই প্রাচীন কাল

---

১৮৮. দেখুন : কাশফুল আসরার শরহুল মানার (১/৭)।

১৮৯. দেখুন : কাশফুল আসরার শরহু উসুলিল বাযদাবি (১/১৭-১৮)।

১৯০. দেখুন : মানাকিব, মক্কি (৩১০-৩১১)।

১৯১. আল-ফাতাওয়া আল-হামাবিয়্যাহ আল-কুবরা (৩১৮)।

১৯২. তাজুত তারাজিম (৩৩১)।

১৯৩. যেমনটা পিছনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থটি ইমাম মাতুরিদির নামে প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু সেটা সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তাতে আশআরিদের বিপক্ষে অনেক খণ্ডন রয়েছে। অথচ মাতুরিদি ও আশআরি দুজন সামসময়িক ছিলেন। দুজন পৃথিবীর দুই প্রান্তে ছিলেন। বোঝা গেল, এটা পরবর্তী সময়ে কারও লেখা। তা ছাড়া, ইমাম মাতুরিদির গ্রন্থতালিকার কোথাও এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের কথা পাওয়া যায় না। বিপরীতে উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আবুল লাইস সমরকন্দির হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

থেকে শুরু করে আধুনিক সময় পর্যন্ত হানাফি আলেমগণ এসব কিতাবকে ইমাম আজমের আকিদার সংকলন হিসেবেই দেখে আসছেন, প্রচার-প্রসার করছেন, শিখছেন এবং মানুষকে শেখাচ্ছেন। বরং আল্লামা মাগনিসাভি স্পষ্টভাবে লিখেন, 'আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থটি, যা ইমাম আজম লিখেছেন, একটি বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য কিতাব।' তিনি আল-ফিকহুল আকবারের পাশাপাশি অন্যান্য গ্রন্থের প্রামাণ্যতাও স্বীকার করেছেন।[১৯৪]

এভাবে যুগের পর যুগ হানাফি, শাফেয়ি ও হাম্বলি-সহ সকল ধারার আলেম এসব গ্রন্থকে ইমাম আজম রহ.-এর গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, মেনে নিয়েছেন, এগুলোর ব্যাখ্যা লিখেছেন এবং চর্চা করেছেন। সমকালীন যুগের আগে কেউ সামগ্রিকভাবে এসব গ্রন্থ ইমাম আজমের বলে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন—এমন কোনো বক্তব্য অধমের চোখে পড়েনি। আধুনিক যুগে এসে কিছু প্রাচ্যবিদ এসব গ্রন্থকে ইমামের বলে মেনে নিতে সংশয় সৃষ্টি ও প্রকাশ করেছেন এবং কিছু মুসলিম আলেম সেটার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। ফলে এসব গ্রন্থের উপর আপত্তি নিতান্তই অধুনা সৃষ্ট, যার ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

হ্যাঁ, তাদের আগে একদল মানুষ এসব গ্রন্থের প্রামাণ্যতা নাকচ করেছেন, কিন্তু তারা আহলে সুন্নাতের কেউ নন, বরং মুতাযিলা সম্প্রদায়। তদুপরি সেটাও ইলমি দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং ইমামের নামে তাদের নিজস্ব মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার হীন উদ্দেশ্যে তারা এই কাজ করে। বাযযাযি (৮২৭ হি.) লিখেন, 'কেউ বলতে পারে আবু হানিফার লেখা কোনো গ্রন্থ নেই। আমরা বলব, এটা মুতাযিলাদের দাবি। তারা ইমামকে তাদের অর্থাৎ, মুতাযিলি মাযহাবের অনুসারী দাবি করত। অথচ ইমামের এসব গ্রন্থে, বিশেষত আল-ফিকহুল আকবার এবং আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিমে, মুতাযিলাদের খণ্ডনে এবং আহলে সুন্নাতের আকিদা প্রতিষ্ঠায় একাধিক বক্তব্য রয়েছে। ফলে তাদের এই মিথ্যা দাবি টিকিয়ে রাখতে তারা এসব গ্রন্থ ইমামের বলে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং আবু হানিফা (আস-সগির) বুখারির বলে প্রচার করে। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। কারণ, আমি শামসুল মিল্লাহ কারদারির নিজ হাতের লেখায় এই দুটো কিতাব দেখেছি এবং তিনি তাতে এ দুটোকে ইমাম আজমের কিতাব বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অসংখ্য মাশায়েখ এ ব্যাপারে একমত।'[১৯৫]

---

১৯৪. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১০২)।
১৯৫. দেখুন : মানাকিব, বাযযাযি (১২২)। ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন, যাবিদি (২/১৮)।

চার. এসব গ্রন্থ ইমাম আজমের আকিদার ঐতিহাসিক দলিল :

আমরা যদি তাদের আপত্তির সঙ্গে একমত হয়ে এই গ্রন্থগুলো সরাসরি ইমাম আজম রহ.-এর লেখা নয় বলে মেনে নিই, তবুও এটা অস্বীকারের উপায় নেই যে, এগুলোতে যেসব আকিদা রয়েছে, সেগুলো সামগ্রিকভাবে ইমাম আজম রহ.-এর আকিদা। অর্থাৎ, হয়তো আমরা বলব, স্বয়ং ইমাম রহ. এসব গ্রন্থ নিজের হাতে লিখেছেন, অথবা বলব, তিনি তাঁর ছাত্রদের ক্লাসে এবং বিভিন্ন মজলিসে এগুলো বলেছেন, লিখিয়েছেন এবং ছাত্ররা কিংবা ছাত্রদের ছাত্ররা পরবর্তীকালে এগুলো সংকলন করেছেন। এই উভয় অবস্থাতেই ফলাফল এক। অর্থাৎ, তাঁর ছাত্ররা কিংবা ছাত্রের ছাত্ররা সংকলন করলেও এগুলোকে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর গ্রন্থ বলা যাবে। কারণ, সে সময়ে রচিত বা সংকলিত অধিকাংশ গ্রন্থের সংকলনের গল্পই এমন। বরং ছাত্ররা সংকলন করার কারণে যদি তাঁর আকিদা বলা না যায়, তবে তো ফিকহের ক্ষেত্রেও ইমাম আজমের ফিকহ এবং হানাফি মাযহাব বলতে কিছু থাকে না। কারণ, তিনি ফিকহ বিষয়েও নিজের হাতে লেখা কোনো গ্রন্থ রেখে যাননি। তাঁর শাগরেদদের লেখা গ্রন্থ এবং তাদের মতামত থেকেই ইমামের মত জানতে পারি আমরা।

উপরন্তু যদি আমরা আক্ষরিক অর্থে তাঁর গ্রন্থ নাও বলতে পারি, তথাপি এগুলোতে বিদ্যমান বিষয়সমূহকে তাঁর আকিদা বলার মাঝে বিন্দুমাত্র সমস্যা নেই। এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কেউ মতভেদ করেছেন বলে আমার জানা নেই। কারণ, তাওহিদ ও সিফাতের ক্ষেত্রে ইমামের দৃষ্টিভঙ্গি, তাকদিরের ক্ষেত্রে তাঁর মতামত এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো ঈমানের সংজ্ঞার্থ, হাকিকত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইমামের প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের বাস্তব ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রেকর্ড এসব গ্রন্থ। এগুলোতে এমন কোনো বক্তব্য নেই যেটা ইমাম আজমের আকিদা হিসেবে উম্মাহর কাছে স্বীকৃত নয়। এগুলোতে এমন কোনো বক্তব্য নেই যা পরবর্তী হানাফি ফুকাহা এবং উলামায়ে কেরাম আবু হানিফার মাযহাব হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। হ্যাঁ, কিছু মাসআলাতে তারা ইমামের বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু সেটা ইমামের আকিদা হিসেবে অস্বীকৃতি জানিয়ে নয়, বরং ইমামের বক্তব্য হিসেবে মেনে নেওয়ার পরেই। উপরন্তু এসব গ্রন্থের পারস্পরিক আলোচ্য বিষয়ের মাঝে মিল-মিছিল বেশ বিস্ময়কর ও ইতিবাচক। অর্থাৎ, প্রায় প্রত্যেকটি মাসআলাতে আলোচ্য পাঁচটি গ্রন্থকে আমরা একে অন্যের পরিপূরক দেখি। ফলে এগুলো যে একই ব্যক্তির আকিদা ও আদর্শ সেটা বুঝতে দূরদর্শী মানুষের কষ্ট হওয়ার কথা

নয়। এমনকি আকিদার বাইরে হানাফি মাযহাবের ফিকহি মুসতানাদ গ্রন্থগুলো, ইমাম আজমের দিকে সম্পৃক্ত হাদিসের মাসানিদগুলো—সবগুলোতে বর্ণিত ইমামের বক্তব্য অত্যন্ত কাছাকাছি। একই উৎস থেকে উৎসারিত।

তা ছাড়া, এগুলোর বাইরের আরও একাধিক প্রাচীন সূত্র ইমামের দিকে সামগ্রিকভাবে এক ও অভিন্ন আকিদাই সম্পৃক্ত করে, যেমন ইমাম তহাবি (৩২১ হি.)-এর 'আকিদাহ তহাবিয়্যাহ'। সায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ উসতাওয়াবি নিশাপুরি (৪৩২ হি.)-এর 'আল-ইতিকাদ'। এগুলো ইমামের প্রায় দেড়-দুইশো বছর পরে লেখা হলেও উভয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু অত্যন্ত কাছাকাছি এবং ইমাম আজমের দিকে নিসবতকৃত উপরের পাঁচটি গ্রন্থের সঙ্গে এগুলোর মৌলিক কোনো সংঘাত তো নেই-ই, উপরন্তু এসব গ্রন্থের মিল-মিছিল দেখলে যে কাউকে বিস্মিত হতে হয়; বরং তহাবিতে বর্ণিত আকিদা এবং 'আল-ইতিকাদে' বর্ণিত ইমাম আজমের শাগরেদদের দিকে নিসবতকৃত বক্তব্যগুলো দেখলে যে কারও বুঝে আসবে, ইমামের পাঁচটি গ্রন্থে বর্ণিত আকিদা সামগ্রিকভাবে সকল হানাফি ইমামের আকিদা ছিল। এগুলো হানাফি আলেমদের মজলিসে মজলিসে চর্চা হতো, ধারণ করা হতো। এগুলোর সঙ্গে যদি মুওয়াফফাক ইবনে আহমদ আল-মক্কি (৫৬৮ হি.)-এর 'মানাকিব'-এর বিস্তারিত ঘটনাগুলো মিলিয়ে পড়া হয়, তবে যে-কেউ উপলব্ধি করবে যে, এসব গ্রন্থে যেসব আকিদা বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষেই ইমাম আজম রহ. থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ আকিদা। তাঁর ছাত্ররা বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পরম্পরায় এসব আকিদা বহন করেছেন, চর্চা করেছেন এবং প্রচার করেছেন। ফলে এগুলোতে বর্ণিত আকিদা ইমাম আজমের কি না সেটা নিয়ে সংশয় প্রকাশ বিলকুল অযৌক্তিক ব্যাপার।

এখানে আরেকটি বিষয় পর্যালোচনার দাবি রাখে। সেটা হলো, ইমাম তহাবির আকিদাগ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে সবাই একমত। খোদ সংশয় প্রকাশকারীরাও ইমাম তহাবির বর্ণিত আকিদাকে ইমাম আজমের আকিদা বলে মানেন। অথচ ইমাম তহাবি তাঁর আকিদার কোনো সনদ উল্লেখ করেননি; তিনি কোত্থেকে ইমাম আজম এবং তাঁর দুই শাগরেদের আকিদা গ্রহণ করেছেন সেটাও স্পষ্ট করেননি; তবুও বিনাবাক্যে তাঁর বর্ণিত বক্তব্যকে ইমাম আজমের আকিদা হিসেবে মেনে নেওয়া হচ্ছে। অথচ তিনি ইমাম আজমের কয়েক স্তরের পরের শাগরেদ। তাহলে তাঁর পুত্র হাম্মাদ এবং প্রথম স্তরের শাগরেদ আবু মুতি বলখি,

আবু মুকাতিল সমরকন্দির বর্ণনা মেনে নিতে এত কষ্ট কেন? এগুলোর সনদকে হাদিসের সনদের মতো নিরীক্ষণ করা হচ্ছে কেন?

মুরতাযা যাবিদি (১২০৫ হি.) লিখেন, "উক্ত পাঁচটি কিতাবের প্রামাণ্যতা নিয়ে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, উম্মাহর আলেমগণ এগুলো কবুল করে নিয়েছেন। ইমাম নিজে এগুলো হাম্মাদ, আবু ইউসুফ, আবু মুতি বলখি, আবু মুকাতিল সমরকন্দি প্রমুখ শাগরেদকে লিখিয়েছেন, তারা নিজেরা সেগুলো সংকলন করেছেন। তাদের থেকে পরবর্তী আলেমগণ তথা ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল রাযি, মুহাম্মাদ ইবনে সামাআহ, নুসাইর ইবনে ইয়াহইয়া, শাদ্দাদ ইবনুল হাকাম প্রমুখ গ্রহণ করেছেন। এভাবে বিশুদ্ধ সনদে সেগুলো ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদি পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে [বলা বাহুল্য, এভাবে ইমামে আহলে সুন্নাত আবু জাফর তহাবি পর্যন্তও পৌঁছেছে]। সুতরাং কেউ যদি এসব গ্রন্থ ইমাম আজমের দিকে সম্পৃক্ত করে, সেটা যেমন সঠিক; কারণ এসব আকিদা তাঁরই, কেউ যদি এগুলোর প্রথম স্তরের সংকলক কিংবা আরও পরবর্তী কারও দিকে সম্পৃক্ত করে, সেটাও সঠিক; কারণ, তারা এগুলো সংকলন করেছেন। মোটকথা, পরবর্তী উম্মাহ এগুলো ইমাম আজমের আকিদা হিসেবে মেনে নিয়েছে। এ কারণে ফখরুল ইসলাম বাযদাবির 'উসুল' এবং এটার বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ, যথা—হুসামুদ্দিন সিগনাকির 'আল-কাফি', কিওয়ামুদ্দিন (আমির কাতিব) ইতকানির 'আশ-শামেল', জালালুদ্দিন কারলানির 'আশ-শাফি', কিওয়ামুদ্দিন সাক্কাকির 'বায়ানুল উসুল', আলাউদ্দিন বুখারির 'কাশফুল আসরার', আকমালুদ্দিন বাবিরতির 'আত-তাকরির' ইত্যাদি সকল গ্রন্থে এসব পুস্তিকার আলোচনা এসেছে। হামাদানির 'খিযানাতুল আকমাল'-এর শেষের দিকে 'আল-ওয়াসিয়্যাহ' পুস্তিকা পুরোটাই উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম নাতেফি 'আল-আজনাস ফি ফুরুয়িল ফিকহিল হানাফি' গ্রন্থে এটা উল্লেখ করেছেন। 'আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম' গ্রন্থের অনেক মাসআলা নাজমুদ্দিন নাসাফি, খাওয়ারযেমি প্রমুখ কৃত ইমামের 'মানাকিব' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আল-ফিকহুল আকবারের কিছু মাসআলা 'আল-মুহিতুল বুরহানি', শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে ইলিয়াসের 'ফাতাওয়া', ইবনুল হুমামের 'আল-মুসায়ারাহ'-তে এসেছে। আল-ফিকহুল আবসাতের কিছু মাসআলা আবুল মুইন নাসাফি তার 'আত-তাবসিরাহ', নুরুদ্দিন সাবুনি তাঁর 'আল-কিফায়াহ', হাফিজুদ্দিন নাসাফি তাঁর 'আল-ইতিমাদ', আবুল আলা সায়েদ তাঁর 'আল-

ইতিকাদ', আবু শুজা নাসেরি তাঁর তহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যা 'আন-নুরুল লামি' ওয়াল-বুরহানুস সাতি', আবুল মাহাসিন কওনভি তাঁর তহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যাতে উল্লেখ করেছেন। আতা ইবনে আলি আল-জুযজানি এর একটি মূল্যবান ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন (শরহুল ফিকহিল আকবার নামে; মূল ব্যাখ্যা আবসাতের)। ...আকমালুদ্দিন বাবিরতি আল-ওয়াসিয়্যাহর ব্যাখ্যা লিখেছেন। এভাবে উক্ত পাঁচটি পুস্তিকার বিভিন্ন অংশ ইমামদের প্রায় ত্রিশটি কিতাবে আলোচিত হয়েছে। উম্মাহর কাছে এগুলোর গ্রহণযোগ্যতার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।"[১৯৬]

আংশিক সংশয়

একদল আলেম এসব গ্রন্থকে সামগ্রিকভাবে ইমাম আজম রহ.-এর গ্রন্থ মনে করেন। তবে তারা মনে করেন—এগুলো হুবহু ইমাম আজমের সংরক্ষিত আকিদা নয়, বরং এতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আমরা এখানে সেসব আলেমের নাম উল্লেখ করব না। স্রেফ সংশয়গুলো উল্লেখ করে সেগুলোর যথার্থতা-অযথার্থতা দেখাব।

তাদের একদল আল-ফিকহুল আকবারের বিভিন্ন বক্তব্য পরবর্তীকালে অনুপ্রবেশকৃত মনে করেন। যেমন—একজন লিখেছেন, (وَقد كَانَ الله تَعَالَى متكلما وَلم يكن كلم مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَقد كَانَ الله تَعَالَى خَالِقًا فِي الْأَزَل وَلم يخلق الْخلق فَلَمَّا كلم الله مُوسَى كَلمه بِكَلَامِهِ الَّذِي هُوَ لَهُ صفة فِي الْأَزَل) অর্থ : **"আল্লাহ মুসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। কিন্তু মুসার সঙ্গে কথা বলার অনেক আগে অনাদিতেও আল্লাহ তায়ালা 'মুতাকাল্লিম' (কালাম গুণসম্পন্ন) ছিলেন, যেমন গোটা সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার আগেও আল্লাহ তায়ালা 'খালিক' (সৃষ্টিকর্তা) ছিলেন। সুতরাং তিনি যখন মুসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তখন তাঁর সেই শাশ্বত 'কালাম' গুণের মাধ্যমে কথা বলেছিলেন।"** —এ কথা ইমাম বলেননি। একইভাবে (وَالله تَعَالَى يتَكَلَّم بِلَا آلَة وَلَا حُرُوف) অর্থ : **'আল্লাহ কথা বলেন উপকরণ ও অক্ষর ছাড়া।'**—এটাও পরবর্তীকালে অনুপ্রবেশকৃত; ইমামের বক্তব্য হতে পারে না। একইভাবে (ولفظنا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوق) অর্থ : 'কুরআনে (পাঠের সময়) আমাদের শব্দ সৃষ্ট'—এটাও পরবর্তীকালে সংযোজিত। একইভাবে (وَالله تَعَالَى يرى فِي الْآخِرَة وَيَرَاهُ الْمُؤمنُونَ وهم فِي الْجنَّة بأعين رؤوسهم بِلَا تَشْبِيه وَلَا كَيْفيَّة وَلَا يكون بَينه وَبَين خلقه مَسَافَة) অর্থ : **'আখেরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে; মুমিনরা জান্নাতে স্বচক্ষে আল্লাহর দিদার**

---

১৯৬. দেখুন : ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন (২/১৮-১৯)।

লাভ করবে, তবে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য বা ধরণ ব্যতিরেকে। তাঁর ও সৃষ্টির মাঝে তখন কোনো দূরত্ব থাকবে না।'—এটাকেও তারা পরবর্তীকালে সংযোজিত মনে করেন।

তাদের এ দাবির পক্ষে দলিল হলো, 'এসব বিষয় সে যুগে প্রচলিত ছিল না, বরং পরবর্তীকালে কালামপন্থিরা এগুলো উদ্ভাবন করেছে এবং ইমামের নামে চালিয়ে দিয়েছে। আকিদাহ তহাবিয়্যাহতে ইমাম তহাবি এগুলো বর্ণনা করেননি। এগুলো ইমামের আকিদা হলে ইমাম তহাবি উল্লেখ করতেন।'

সংশয়ের পর্যালোচনা : এগুলো সঠিক ও যৌক্তিক অভিযোগ নয়। দলিল-প্রমাণবিহীন কেবল অনুমানকে ভিত্তি বানিয়ে ইমাম আজমের কিতাবকে অগ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টা। মূলত তাদের প্রচলিত মতাদর্শের সঙ্গে ইমামের আকিদার সংঘর্ষ তৈরি হওয়াতে এগুলোকে তারা অপ্রমাণিত ও পরবর্তীকালে সংযোজিত বলেছেন। অথচ শক্তিশালী দলিল ব্যতীত এমন দাবি গ্রহণযোগ্য হওয়ার কোনো কারণ নেই।

যেমন—প্রথম বাক্যে তাদের আপত্তির জায়গা হলো, আল্লাহর কালাম সিফাতকে 'আযাল' তথা 'অনাদি' বলা। তারা বিশ্বাস করেন, মুসা আ.-এর সঙ্গে আল্লাহ অক্ষর ও আওয়াজ-সহ কথা বলেছেন, যা তাদের কাছে হাদেস (নবসৃষ্ট)। অথচ ইমাম বলছেন, **"আল্লাহ যখন মুসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তখন তাঁর সেই শাশ্বত 'কালাম' গুণের মাধ্যমে কথা বলেছিলেন।"**[১৯৭] এটা তাদের প্রচলিত আকিদার সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক। একইভাবে ইমামের বক্তব্য **'আল্লাহ কথা বলেন উপকরণ ও অক্ষর ছাড়া।'**[১৯৮]—তাদের আকিদার সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক। ইমামের বক্তব্য **'কুরআনে (পাঠের সময়) আমাদের শব্দগুলো সৃষ্ট।'**[১৯৯]—এটাও তাদের প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কেননা, তারা এগুলোকেও আল্লাহর কালাম মনে করেন। সবশেষে ইমামের বক্তব্য **'আখেরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে; মুমিনরা জান্নাতে স্বচক্ষে আল্লাহর দিদার লাভ করবে, তবে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য ও ধরন ব্যতিরেকে। তাঁর ও সৃষ্টির মাঝে তখন কোনো দূরত্ব**

---

১৯৭. আল-ফিকহুল আকবার (২)।

১৯৮. প্রাগুক্ত (২)।

১৯৯. প্রাগুক্ত (২)।

থাকবে না।'[২০০]—এটাকেও তারা নাকচ করেন। কারণ, তাদের বিশ্বাস, আল্লাহকে সামনাসামনি উপরের দিকে দেখা যাবে। ফলে ইমাম যখন 'দূরত্ব' নাকচ করে দিলেন, তখন তাদের আকিদার সঙ্গে সংঘর্ষ তৈরি হয়ে গেল। কারণ, এর মাধ্যমে 'দিক', 'সামনাসামনি' সবকিছু নাকচ হয়ে গেল, যেগুলোকে তারা সালাফের আকিদা বলে প্রচার করেন এবং বিশ্বাস রাখেন।

ফলে দেখা যাচ্ছে, তাদের এসব আপত্তির মূল কারণ ইলমি বা ঐতিহাসিক নয়, বরং মতাদর্শিক। ইমাম আজমের এসব বক্তব্য তাদের প্রচলিত আকিদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কিন্তু ইমাম আজম রহ. যেহেতু সালাফে সালেহিনের আকিদা রাখতেন, বরং তিনি নিজেই সালাফে সালেহিনের প্রথম সারির বরেণ্য ইমাম, আর এসব আকিদা তাদের মতাদর্শমতে সালাফের আকিদা নয়; অন্যদিকে ইমাম আজমকে সালাফ থেকে বের করাও যাচ্ছে না, তাকে আহলে বিদআতও বলা যাচ্ছে না, এ জন্য তারা এগুলোকে পরবর্তীকালে সংযোজিত বলেছেন। অথচ এগুলো পরবর্তীকালে সংযোজিত নয়। বস্তুত এটা তাদের জন্য একটা বড় মাথাব্যথার কারণ। অন্যকথায়, ইমামকে নিয়ে এ ধারার লোকজন উভয়সংকটে পতিত। কারণ, তাদের 'সালাফ' মুরজিয়া, জাহমিসহ হেন কোনো অভিধা নেই যা ইমামের উপর প্রয়োগ করেননি। অন্যকথায়, তারা ইমামকে সম্পূর্ণ গোমরাহ মনে করতেন, পিছনে যার উদাহরণ দিয়েছি আমরা। এতে স্পষ্ট যে, ইমামের আকিদা তাদের আকিদার মতো ছিল না। কিন্তু তাদের মতাদর্শের পরবর্তী মূল প্রতিষ্ঠাতারা আবার ইমামের ব্যাপারে ইতিবাচক বক্তব্য দিয়েছেন। ইমাম আজমের আকিদা বাকি তিন ইমামের মতো বলেছেন। এই দুই বিপরীতমুখী বক্তব্যই তাদের জটিলতায় ফেলেছে। ইমামকে তারা গোমরাহ বলতে পারছেন না, আবার ইমামের সব আকিদা মেনেও নিতে পারছেন না। ফলে অনন্যোপায় হয়ে যেসব ক্ষেত্রে ইমামের আকিদা তাদের আকিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না, সেগুলোকে 'অপ্রমাণিত' বলছেন, ভিন্নভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করছেন। এই 'অপ্রমাণিত' বলা ভিত্তিহীন দাবি। এগুলো অপ্রমাণিত হলে তাদের সালাফ তো ইমামকে তাদের মতোই বলতেন। জাহমি কেন বলেছেন? মোটকথা, ইমামের প্রতি তারা কেমন দৃষ্টিভঙ্গি রাখবেন সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ইমামের আকিদার ভিতর থেকে কিছু আকিদাকে প্রমাণিত বলবেন, আবার কিছু নাকচ করবেন—এটা হতে পারে না।

---

২০০. প্রাগুক্ত (৬)।

আমাদের দাবির স্বপক্ষে অনেকগুলো প্রমাণ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হলো :

এক. প্রথম প্রমাণ তো হলো সবগুলো পাণ্ডুলিপিতে এসব বক্তব্য বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের জানামতে, এমন কোনো প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নেই যাতে এসব বক্তব্য আসেনি। ফলে এগুলোকে পরবর্তীকালে সংযোজিত বলতে হলে সে ধরনের কোনো গ্রহণযোগ্য প্রাচীন পাণ্ডুলিপি দেখাতে হবে যাতে এসব বক্তব্য নেই।

দুই. এসব বক্তব্য আগপাছের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ। অর্থাৎ, এমন নয় যে, হঠাৎ মাঝখানে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে, ফলে এগুলো প্রসঙ্গবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; বরং প্রত্যেকটি বিষয় সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক এবং ইমামের বক্তব্য ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন—প্রথম বক্তব্যে ইমাম বলেন, (وَقد كَانَ الله تَعَالَى متكلما وَلم يكن كلم مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَقد كَانَ الله تَعَالَى خَالِقًا فِي الْأَزَل وَلم يخلق الْخلق فَلَمَّا كلم الله مُوسَى كَلمه بِكَلَامِهِ الَّذِي هُوَ لَهُ صفة فِي الْأَزَل) অর্থ : **“আল্লাহ মুসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। কিন্তু মুসার সঙ্গে কথা বলার অনেক আগে অনাদিতেও আল্লাহ তায়ালা ‘মুতাকাল্লিম’ (কালাম গুণসম্পন্ন) ছিলেন, যেমন গোটা সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার আগেও আল্লাহ তায়ালা ‘খালিক’ (সৃষ্টিকর্তা) ছিলেন। সুতরাং তিনি যখন মুসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তখন তাঁর সেই শাশ্বত ‘কালাম’ গুণের মাধ্যমে কথা বলেছিলেন।”**—এখানে গভীরভাবে লক্ষ করে দেখুন, কেবল ‘কালাম’-এর ব্যাপারেই ‘আযাল’ (তথা অনাদি) ব্যবহার করা হয়নি, বরং ‘খলক’ তথা সৃষ্টি গুণের ব্যাপারেও একই শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। ইমাম তহাবি রহ. তাঁর আকিদাতে এটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা একটু পরে উল্লেখ করা হচ্ছে। ফলে এটা ইমাম আজমের আকিদা হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

একইভাবে (وَالله تَعَالَى يتَكَلَّم بِلَا آلَة وَلَا حُرُوف) অর্থ : **‘আল্লাহ কথা বলেন উপকরণ ও অক্ষর ছাড়া।’**—এটাও প্রসঙ্গবিহীন নয়। ইমাম বলেন, **‘আল্লাহ তায়ালার সকল সিফাত (গুণ) মাখলুকের সিফাতের (গুণ) চেয়ে ভিন্ন। তিনি জানেন, কিন্তু আমাদের জানার মতো নয়। তিনি শক্তি রাখেন, কিন্তু আমাদের শক্তির মতো নয়। তিনি দেখেন, তবে আমাদের দেখার মতো নয়। তিনি কথা বলেন, তবে আমাদের কথা বলার মতো নয়। তিনি শোনেন, তবে আমাদের শোনার মতো নয়। আমরা বিভিন্ন উপকরণ ও অক্ষরের মাধ্যমে কথা বলে থাকি; তিনি কথা বলেন**

উপকরণ ও অক্ষর ছাড়াই। অক্ষর হলো সৃষ্ট, কিন্তু আল্লাহর কালাম সৃষ্ট নয়।'[২০১] পাঠক, এখানে গভীরভাবে লক্ষ করে দেখুন, পুরো বক্তব্য প্রাসঙ্গিক ও যৌক্তিক। আল্লাহর সকল সিফাত আমাদের সিফাতের চেয়ে ভিন্ন। তাঁর দেখা ও শোনা আমাদের মতো নয়। সুতরাং তাঁর বলাও আমাদের মতো নয়। আমরা উপকরণ ও অক্ষর দিয়ে কথা বলে থাকি; তিনি কথা বলেন এগুলো ছাড়াই। কারণ, তিনি কোনোকিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন। যারা এ বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন, কেন করেছেন? কারণ, এটা তাদের আকিদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাদের মতে, আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো, আল্লাহ অক্ষর ও আওয়াজ-সহ কথা বলেন। তারা যেহেতু ইমাম আজমকে তাদের পরিভাষায় আহলে সুন্নাত মনে করেন, ফলে এগুলো তাঁর আকিদা সেটা নাকচ করা জরুরি হয়ে যায়, নতুবা তাদের নিজেদের আকিদাই নাকচ হয়ে যায়!

একইভাবে ইমামের বক্তব্য, 'কুরআন (পাঠের সময়) আমাদের শব্দ সৃষ্ট।'—এটাও সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক এবং যৌক্তিক। এখানে ইমামের পুরো বাক্য হলো, **'কুরআন আল্লাহ তায়ালার 'কালাম' (বাণী); গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, হৃদয়ে সুরক্ষিত, মুখে পঠিত, নবিজি (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ। কুরআনে (পাঠের সময়) আমাদের শব্দগুলো সৃষ্ট। কুরআন (লেখার সময়) আমাদের লেখাগুলো সৃষ্ট। আমাদের (কুরআনের) পাঠ (তেলাওয়াত) সৃষ্ট; কিন্তু স্বয়ং কুরআন সৃষ্ট নয়।'**[২০২] এখানে অতিরিক্ত এমন কী কথা আছে, যাতে এটা পরবর্তীকালে অনুপ্রবেশকৃত বলে বিশ্বাস করতে হবে? আমরা যখন কুরআন তেলাওয়াত করি, তখন আমাদের আওয়াজ সৃষ্ট। আমরা যখন কুরআন কাগজের উপর কালি দিয়ে লিখি, এই লেখাগুলোও সৃষ্ট। সুতরাং আমরা যখন আমাদের মুখ, জিহ্বা ও কণ্ঠের সাহায্যে কুরআন পড়ি, তখন আমাদের উচ্চারিত শব্দগুলো কেন সৃষ্ট হবে না? হ্যাঁ—যেমনটা ইমাম বলেছেন—এতে কুরআন সৃষ্ট হয়ে যায় না। কারণ, মূল কুরআন আল্লাহর কালাম।

তাদের কারও কারও যুক্তি 'কুরআনে (পাঠের সময়) আমাদের শব্দ সৃষ্ট।'—এসব পরিভাষা ইমাম আহমদ রহ.-এর যুগে মুতাযিলাদের সঙ্গে সৃষ্ট সংঘাতের পরে অস্তিত্বে এসেছে। ফলে বোঝা গেল, এটা ইমাম আজমের আকিদা নয়, বরং

---

২০১. আল-ফিকহুল আকবার (২)।
২০২. প্রাগুক্ত (২)।

পরবর্তীকালে সংযোজিত। কিন্তু এটা অজ্ঞতাপ্রসূত বক্তব্য। কারণ, কুরআনকেন্দ্রিক বিতর্কের জন্ম হয় জাদ ইবনে দিরহাম এবং জাহম ইবনে সাফওয়ানের যুগেই। ফলে এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বিশ্লেষিত ও বিস্তারিত বক্তব্য থাকা মোটেই অসম্ভব নয়; বরং ইমাম আজম রহ. জাহম ইবনে সাফওয়ানের সঙ্গে মুনাযারাও করেছেন, কুরআনকেন্দ্রিক বিভিন্ন ভ্রান্তির খণ্ডন করেছেন, যা আমরা পিছনে দেখেছি এবং সামনেও দেখব। ফলে এগুলো ইমাম আজমের যুগে ছিল না—এমন দাবি সঠিক নয়।

একইভাবে আল্লাহর দিদারের ক্ষেত্রে ইমামের বক্তব্য **'তাঁর ও সৃষ্টির মাঝে তখন কোনো দূরত্ব থাকবে না।'**—এখানেও দূরত্বের বিষয়টি নাকচ করা মোটেও অপ্রাসঙ্গিক নয়; বরং আল-ফিকহুল আকবারের একাধিক জায়গাতে এটাকে নাকচ করা হয়েছে। যেমন—ইমাম অন্যত্র বলেন, **'আল্লাহর নৈকট্য বা দূরত্ব (বস্তুগত) কাছে বা দূরে থাকার ভিত্তিতে নয়; এটা মর্যাদা ও অপমানের ভিত্তিতে। অনুগত বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী, ধরন ব্যতিরেকে। আর অবাধ্য আল্লাহ থেকে দূরবর্তী, ধরন ব্যতিরেকে। একইভাবে জান্নাতে আল্লাহর পাশে থাকা ধরন ব্যতিরেকে। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো ধরন ব্যতিরেকে।'**[২০৩] ফলে তানযিহের সর্বোচ্চ স্তর বজায় রাখতে ইমাম যে সর্বত্র এ ধরনের শব্দ আল্লাহর উপর প্রয়োগ থেকে বিরত থাকেন, সেটা স্পষ্ট। কেবল ইমাম নন, মুতাযিলাদের খণ্ডনে সে যুগে এবং পরবর্তী সময়ে অনেক আলেমই এ ধরনের কুয়ুদ (শর্তযুক্ত শব্দ) ব্যবহার করেছেন।

তিন. এগুলো কেবল আল-ফিকহুল আকবারের বক্তব্য—এমন নয়, বরং ইমামের অন্যান্য গ্রন্থেও কাছাকাছি বক্তব্য রয়েছে, যা সুস্পষ্টভাবেই এগুলো ইমামের বক্তব্য বলে প্রমাণ করে। যেমন—প্রথম বক্তব্য, যেখানে কালামকে 'অনাদি গুণ' বলা হয়েছে, সেটা অন্য সকল সিফাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সৃষ্টি, শ্রবণ, দর্শন—সবগুলো আল্লাহর অনাদি গুণ। এমনকি ইমাম তহাবিও বিভিন্ন সিফাতের ক্ষেত্রে 'আযালি' তথা অনাদি শব্দটা ব্যবহার করেছেন। সুতরাং 'এটা পরবর্তীকালে অনুপ্রবেশকৃত'—এমন কথার যুক্তি নেই। তহাবি বলেন, (مَازَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيماً قَبْلَ خَلْقِهِ، لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَتِهِ، وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا، كَذَلِكَ لا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا، لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الخَلْقِ اسْتَفَادَ اسْمَ الخَالِقِ، وَلا بِإِحْدَاثِهِ البَرِيَّةَ اسْتَفَادَ اسْمَ البَارِيْ) অর্থ : "সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার আগে থেকেই তিনি সকল গুণের অধিকারী। সৃষ্টির

---

২০৩. আল-ফিকহুল আকবার (৭-৮)।

মাধ্যমে তাঁর মাঝে এমন কোনো গুণের সংযোজন ঘটেনি, যা আগে ছিল না। তিনি সর্বদাই নিজের গুণাবলি নিয়ে ছিলেন (আযালি), সর্বদাই তেমন থাকবেন (আবাদি)। তাই সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পর থেকে তাঁর নাম 'খালিক' (সৃষ্টিকর্তা) হয়নি, জগৎকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনায় তাঁর নাম 'বারি' (উদ্ভাবক) হয়নি।"[২০৪]—ইমাম তহাবির এই বক্তব্য আর ইমাম আজমের বক্তব্যের মাঝে সিয়াক (প্রসঙ্গ) ও উসলুব (বর্ণনাপদ্ধতি)-গত কোনো পার্থক্য নেই।

একইভাবে (وَاللهُ تَعَالَى يَتَكَلَّمُ بِلَا آلَةٍ وَلَا حُرُوف) অর্থ : **'আল্লাহ কথা বলেন কোনো উপকরণ ও অক্ষর ছাড়া।'**—এটাও নতুন কোনো বিষয় নয়; বরং অন্যান্য গ্রন্থেও কাছাকাছি এবং একই ধরনের বক্তব্য রয়েছে। যেমন—'আল-ওয়াসিয়্যাহ' গ্রন্থে ইমাম রহ. বলেন, **'আমরা বিশ্বাস করি, কুরআন আল্লাহর কালাম, মাখলুক নয়। এটা তাঁর ওহি এবং তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তাঁর গুণ (সিফাত)। লেখা (الكتابة), অক্ষর (الحرف), শব্দ (الكلمات) ও আয়াত (الآيات)—এগুলো কুরআনের নির্দেশক। মানুষের প্রয়োজনে এগুলো অস্তিত্বে এসেছে। বিপরীতে আল্লাহর কালাম তাঁর সত্তার সঙ্গে বিদ্যমান। সেই কালামের অর্থ বোধগম্য হয় এসব উপকরণের মধ্য দিয়ে।'**[২০৫] পাঠক, এখানে খেয়াল করুন, ইমাম আজম রহ. ওয়াসিয়্যাহ গ্রন্থেও 'অক্ষর'-সহ অন্যান্য মানবিক উপকরণ সুস্পষ্টভাবে নাকচ করেছেন। ফলে এটাকেও পরবর্তীকালে অনুপ্রবেশকৃত বলতে হবে। একইভাবে তিনি এখানে 'কালিমা'-কে নাকচ করেছেন। আর 'কালিমা' মূলত 'লফজ' বা শব্দই। ফলে আল-ফিকহুল আকবারের 'কুরআনে (পাঠের সময়) আমাদের শব্দগুলো সৃষ্ট।'—বক্তব্য আল-ওয়াসিয়্যাহ গ্রন্থের বক্তব্যের মাধ্যমেও প্রমাণিত।[২০৬]

একইভাবে (وَاللهُ تَعَالَى يرى فِي الْآخِرَةِ وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ وهم فِي الْجَنَّةِ بأعين رؤوسهم بِلَا تَشْبِيه وَلَا كَيْفِيَّةٍ وَلَا يكون بَينه وَبَين خلقه مَسَافَة) অর্থ : **'আখেরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে; মুমিনরা জান্নাতে স্বচক্ষে আল্লাহর দিদার লাভ করবে, তবে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য ও ধরন ব্যতিরেকে। তাঁর ও সৃষ্টির মাঝে তখন কোনো দূরত্ব থাকবে না।'**—এটাও কেবল আল-ফিকহুল আকবারের বক্তব্য নয়, অন্যান্য গ্রন্থেও প্রমাণিত। যেমন—

---

২০৪. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (৯-১০)।

২০৫. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৪০-৪২)।

২০৬. এ প্রসঙ্গে দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (৭৩-৭৪)।

আল-ওয়াসিয়্যাহ গ্রন্থে ইমাম আজম রহ. বলেন, **“আমরা বিশ্বাস করি, জান্নাতিরা তাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে। আল্লাহ বলেন,** وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ **অর্থ : ‘সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।’** [কিয়ামাহ : ২২-২৩] **তবে এই দর্শন কোনো ধরন (কাইফিয়্যাহ), সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য (তাশবিহ) ও দিক (জিহাহ) ছাড়া। কারণ, আল্লাহ এসবের ঊর্ধ্বে।”**[২০৭] এখানে খেয়াল করে দেখুন, ইমাম আজম আল্লাহকে দেখার ক্ষেত্রে ‘দিক’ সুস্পষ্টভাবে নাকচ করে দিয়েছেন। আর এর মাধ্যমে ‘দূরত্ব’ (মাসাফাহ) নাকচ হয়ে গেল।[২০৮] বরং ইমাম তহাবিও আকিদাহ তহাবিয়্যাহতে সুস্পষ্টভাবে বলেন, ‘আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের সীমাপরিসীমা ও গণ্ডির ঊর্ধ্বে। তিনি সকল উপাদান, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও উপকরণ থেকে মুক্ত। সৃষ্টির মতো ছয় দিক তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।’[২০৯] এখানেও দিক নাকচ করা হয়েছে। ফলে ইমাম আজমের আল-ফিকহুল আকবারের বক্তব্যকে নাকচ করার কোনো অর্থ নেই; বরং তাদের মাযহাবের সঙ্গে যাক বা না যাক, এটাই ইমামের মাযহাব।

শেষ কথা : প্রশ্ন হলো, তাহলে কি এইসব আপত্তি আমরা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দিচ্ছি? আমরা কি এসব গ্রন্থকে ভুলমুক্ত কিংবা সব ধরনের হস্তক্ষেপ থেকে নিষ্পাপ দাবি করছি? না। সে দাবি করার দুঃসাহস ও যৌক্তিকতা কোনোটাই নেই; বরং বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে মানবিক হস্তক্ষেপ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বীকৃত বিষয়। ‘আকিদাহ তহাবিয়্যাহ’ গ্রন্থ এত প্রসিদ্ধ এবং তুলনামূলক পরবর্তী সময়ে রচিত হওয়া সত্ত্বেও সেটা সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপমুক্ত থাকেনি, যা আমরা আকিদাহ তহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন জায়গাতে দেখিয়েছি। কেবল তহাবি নয়, আশআরি, মাতুরিদি, আহমদ ইবনে হাম্বলসহ সালাফে সালেহিনের বিভিন্ন গ্রন্থে এ ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন কিংবা নিদেনপক্ষে নুসখার ভিন্নতা একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠিত বিষয়। ফলে আল-ফিকহুল আকবারসহ ইমামের গ্রন্থাবলিতে এ ধরনের হস্তক্ষেপ হতেই পারে এবং সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক।

---

২০৭. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৫৮-৫৯)।

২০৮. শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১৪৭)।

২০৯. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১৫)।

যেমন—আল-ফিকহুল আকবারে আল্লাহ তায়ালার সিফাতকে 'যাতিয়্যাহ' (সত্তাগত) ও "ফি'লিয়্যাহ" (কর্মগত) বিভাজন করা।[২১০] এ কথা বলা যায় যে, এমন বিভাজন সে যুগে ছিল না; বরং সালাফে সালেহিন সকল সিফাতের ব্যাপারে স্বাভাবিক কথা বলতেন। একইভাবে ইমাম আজম আল্লাহর কয়েকটি সিফাতের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, (أما الذاتية فالحياة وَالْقُدْرَة وَالْعلم وَالْكَلَام والسمع وَالْبَصَر والإرادة) অর্থ : "তাঁর সত্তাগত গুণাবলি হচ্ছে, 'হায়াত' (জীবন), 'কুদরত' (শক্তি), 'ইলম' (জ্ঞান), 'কালাম' (কথা), 'সাম্‌অ' (শ্রবণ), 'বাসার' (দর্শন) এবং 'ইরাদা' (ইচ্ছা)।"[২১১] এখানে সত্তাগত হিসেবে স্রেফ সাতটা সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে; 'ইত্যাদি' (وغيره) বা এ ধরনের শব্দও ব্যবহার করা হয়নি। বোঝা গেল, এগুলো উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়নি, বরং সত্তাগত সিফাত স্রেফ সাতটা মেনেই সম্ভবত উল্লেখ করা হয়েছে। এবার ইমাম আজমের প্রায় দেড় শতাব্দ পরে লেখা আবুল হাসান আশআরির একটি বক্তব্য দেখুন : (وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل لم يزل بها حياً، وعلماً لم يزل به عالماً، وقدرة لم يزل بها قادراً، وكلاماً لم يزل به متكلماً، وإرادة لم يزل بها مريداً، وسمعاً وبصراً لم يزل به سميعاً بصيراً) অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত আল্লাহর জন্য যেসব সিফাত সাব্যস্ত করার ব্যাপারে একমত তা হলো : আল্লাহ সদা-সর্বদা 'হায়াত' (জীবন), 'ইলম' (জ্ঞান), 'কুদরত' (শক্তি), 'কালাম' (কথা), 'ইরাদা' (ইচ্ছা), 'সাম্‌অ' (শ্রবণ), 'বাসার' (দর্শন) গুণে গুণান্বিত।[২১২] এখানেও সিফাত হিসেবে স্রেফ সাতটাকে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং 'আল-ফিকহুল আকবারের অন্য এক জায়গায় এসেছে: (لم يزل عَالما بِعِلْمِهِ وَالْعلم صفة فِي الْأَزَل، وقادرا بقدرته وَالْقُدْرَة صفة فِي الْأَزَل، ومتكلما بِكَلَامِهِ وَالْكَلَام صفة فِي الْأَزَل...)।[২১৩] এই বাক্য এবং আশআরির বাক্যের মাঝে কোনো সামঞ্জস্য দেখা যায়? দেখা গেলে সেটা কী পরিমাণ? বরং এসব বক্তব্যের মাঝে আন্তঃসম্পর্কের একটা বিপুল মাত্রা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এ কারণেই অনেকে এ বক্তব্য ইমাম আজমের হওয়া নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, যদিও এ কারণে এগুলোকে ইমাম আজমের হওয়া চূড়ান্তভাবে নাকচও করা যায় না; বরং বিপরীতভাবে এগুলোকে

---

২১০. আল-ফিকহুল আকবার (১)।

২১১. প্রাগুক্ত (১)।

২১২. রিসালাহ ইলা আহলিস সাগর (১২১)।

২১৩. আল-ফিকহুল আকবার (১)।

ইমাম আজমের বক্তব্য ধরে পরবর্তী লোকদের মাযহাব ইমাম আজমের মাযহাব থেকে গৃহীত বলা গেলেও যেতে পারে।

একইভাবে আল-ফিকহুল আকবারে ইমাম আজম আল্লাহ তায়ালাকে 'জাওহার' ও 'আরাজ' থেকেও মুক্ত ঘোষণা করেছেন; তাঁর উপর এসব শব্দ প্রয়োগ নিষেধ করেছেন। তিনি লিখেন, **"তিনি 'শাইউন' (বস্তু), কিন্তু অন্যান্য বস্তুর মতো নন। আর 'শাইউন'-এর অর্থ হলো 'জিসম' (দেহ), 'জাওহার' (মৌল), 'আরাজ' (বাহ্যিক রূপ-রং)-বিহীন বিদ্যমান সত্তা। তাঁর কোনো 'হদ' (সীমা) নেই, প্রতিপক্ষ নেই, সমকক্ষ নেই; তাঁর মতো কিছু নেই।"**[২১৪] আল্লাহর শানে 'জাওহার', 'আরাজ' ইত্যাদি বিতর্ক শুরু হয় আরও পরে; আব্বাসি যুগে যখন দর্শনের কিতাবগুলো আরবি হতে থাকে, তখন। ফলে ইমাম আজম এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করবেন বলে মনে হয় না। তাই অসম্ভব নয় যে, এসব শব্দ পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে, যেমনটা শিবলি নুমানিসহ একদল সমকালীন গবেষক বলেছেন। তবে এটাও সুনিশ্চিত কিংবা চূড়ান্ত কথা নয়, বরং অনুমাননির্ভর। কারণ, অনুবাদের কাজগুলো আরও পরে শুরু হলেও মৌখিক প্রচার ও চর্চা ইমামের যুগেই শুরু হয়েছিল। বিশেষত আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে জাদ ও জাহমের এবং তাকদিরের ক্ষেত্রে মাবাদ ও গাইলানের এমন অনেক বক্তব্য রয়েছে, যেগুলো পরবর্তী সময়ে সেই ইমাম আহমদের যুগে মুতাযিলাদের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এর মানে কি সেগুলো সে সময়ের আগে ছিল না? না, কস্মিনকালেও এমন নয়। মোটকথা, ইমাম আজম রহ.-এর যুগে এসব শব্দের আত্মপ্রকাশ ঘটা অসম্ভব নয়। ফলে আল্লাহর উপর এসব শব্দ প্রয়োগে তিনি তখনই নিষেধাজ্ঞা দিতে পারেন। বিশেষত আকিদার পঞ্চপুস্তক ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থে ইমাম আজম কর্তৃক এসব শব্দের ব্যবহার নাকচের বর্ণনা রয়েছে, যা আমরা পিছনে উল্লেখ করেছি।[২১৫]

তর্কের খাতিরে এসব বিষয়কে যদি পরবর্তীকালে সংযোজিত ধরে নেওয়াও হয়, এ কারণে পুরো গ্রন্থকে অস্বীকার করা যাবে? নাহ্। এসব শব্দের সংযোজন-বিয়োজনের কারণে পুরো গ্রন্থ অস্বীকার করা ইনসাফ নয়, যেমনটা কেউ কেউ দাবি করেছেন; বরং আমরা ইমাম আশআরির 'ইবানাহ', তহাবির 'আকিদাহ'

---

২১৪. আল-ফিকহুল আকবার (২)।

২১৫. দেখুন : তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/২৬১-২৬২)। যাম্মুল কালাম ওয়া আহলিহি (৫/২০৭)। শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৩৪-৩৫)।

থেকে শুরু করে সব ঘরানার প্রাচীন গ্রন্থে কিছু-না-কিছু সংযোজন-বিয়োজনের অভিযোগ পাই. খোদ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দের আলেমদের কিতাবেও সংযোজিত হয়েছে, অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে—এ ধরনের অভিযোগ শুনতে পাই। তাহলে কি আমরা তাদের সম্পূর্ণ গ্রন্থ অস্বীকার করি? না, সেটা করার সুযোগ নেই।

ফলে এসব সংযোজন-বিয়োজনের বক্তব্য মেনে নিলেও মৌলিকভাবে এগুলো ইমাম আজম রহ.-এর গ্রন্থ। এগুলোকে সমূলে তাঁর গ্রন্থ হিসেবে অস্বীকারের কোনো জ্ঞানগত কিংবা ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। হ্যাঁ, মতাদর্শগত ভিত্তি আছে। ফলে দুঃখজনকভাবে আমরা দেখি, কিছু ব্যতিক্রম বাদে ইমাম আজম রহ.-এর এসব গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানের সমালোচনা এবং সেগুলোকে ঘিরে সংশয় তৈরির মূল কারণ হলো মতাদর্শিক ক্ষুদ্র ও সীমিত দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব গ্রন্থের বিচার। অর্থাৎ, অধিকাংশ ব্যক্তি, যারা এসব গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের উপর আপত্তি তুলেছেন, তারা বিভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এক জায়গায় তাদের মাঝে ব্যাপক মিল-মিছিল চোখে পড়ে। সেটা হলো—প্রত্যেকে কেবল সেসব বিষয়ের উপরই আপত্তি করেছেন, কেবল সেগুলোকেই অনুপ্রবেশকৃত কিংবা পরবর্তীকালে সংযোজিত বলে মত প্রকাশ করেছেন, যেগুলো তাদের নিজেদের মতাদর্শিক বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কিছু উদাহরণ আমরা পিছনে পেশ করেছি। ফলে এসব আপত্তির ভিত্তি ঐতিহাসিক কিংবা দালিলিক থাকেনি; বরং নিজেদের প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে সংঘর্ষই এসব আপত্তির একমাত্র ভিত্তি! অথচ এটা গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক কোনো ভিত্তি হতে পারে না। এটাকে গ্রহণযোগ্য আপত্তির দলিল মেনে নিলে প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অংশটুকু প্রত্যাখ্যান করবে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খণ্ডনীয় বক্তব্যগুলোকে গ্রহণ করবে। এতে করে একসময় পুরো গ্রন্থ কিংবা সিংহভাগ অংশই প্রত্যাখ্যাত হয়ে পড়বে। এসব গ্রন্থের অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে যাবে।

তাই প্রকৃত বাস্তবতা হলো, ইমাম আজম রহ. প্রথম জীবনে যে একজন তুখোড় মুনাযির এবং ইসলামবিরোধী শক্তির কঠোর প্রতিবাদকারী ছিলেন এ ব্যাপারে তাঁর সকল জীবনীকার একমত। পরবর্তীকালে তিনি 'তর্কশাস্ত্র' পরিত্যাগ করে ফিকহ ও ইজতিহাদে নিমগ্ন হন। কিন্তু দ্বীনের পথে সংগ্রাম কখনোই পরিত্যাগ করেননি, করার সুযোগও ছিল না। কারণ, সর্বত্রই বিভিন্ন নতুন বিদআতের প্রাদুর্ভাব ঘটছিল। এ কারণে ফিকহ ও ইজতিহাদের পাশাপাশি তিনি বিশুদ্ধ আকিদার প্রচার এবং বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামও অব্যাহত রাখেন। আকিদা বিষয়ে

অধিক গুরুত্বদানের ফলেই তিনি এটাকে সবচেয়ে বড় ফিকহ (আল-ফিকহুল আকবার) আখ্যা দেন। ঈমানের পরিচয় ও হাকিকত, কবিরা গুনাহকারীর বিধান, তাকদির-সম্পর্কিত বিভিন্ন সংশয়ের জবাব, কুরআনকেন্দ্রিক বিভ্রান্তি খণ্ডন, মানুষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা ইত্যাদি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান রাখেন। এগুলোই পরবর্তীকালে হয়তো তিনি অথবা তাঁর ছাত্ররা সংকলন করেন। ফলে উপরের পাঁচটি গ্রন্থ—সরাসরি তাঁর মাধ্যমে কিংবা তাঁর শাগরেদদের মাধ্যমে সংকলিত হোক—সামগ্রিকভাবে তাঁর আকিদারই প্রতিচ্ছবি। এসব গ্রন্থের বিষয়বস্তুও মৌলিকভাবে এক ও অভিন্ন। এতে যদি কিছু শব্দ বা ছত্র পরবর্তীকালে বাইরে থেকে সংযোজিত হয়, তাতেও সবগুলো গ্রন্থের সারবত্তা বিকৃত হয় না, ইমামের আকিদাগত তুরাসের মূল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

আমরা এ কারণেই সামগ্রিক ভারসাম্য বজায় রাখতে ইমাম আজমের যেকোনো একটা গ্রন্থকে ব্যাখ্যা করতে যাইনি। একটা গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে আমাদের এই প্রকল্প দাঁড় করাইনি; বরং আমরা ইমাম আজম রহ.-এর পাঁচটি গ্রন্থকেই বেছে নিয়েছি। পাঁচটি গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে ইমাম আজম রহ.-এর আকিদার দুর্গ নির্মাণ করেছি। ফলে আমরা দেখব, পাঁচটি গ্রন্থ মূলত সাংঘর্ষিক নয়, বরং একে অন্যের পরিপূরক। একটার অপূর্ণ আলোচনা অন্যটা পূর্ণ করছে, একটার অস্পষ্টতা অন্যটা দূর করছে। মৌলিক কোনো অন্তর্বিরোধ থেকে এগুলো মুক্ত, যা এটার প্রমাণ যে, সামগ্রিকভাবে এসব গ্রন্থ এক ব্যক্তির আকিদার প্রতিনিধি, হোক তাঁর লেখা কিংবা তার পরের কোনো প্রতিনিধির লেখা। এ কারণে আমরা পাঁচটি গ্রন্থকেই সম্মিলিতভাবে এই গ্রন্থের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেছি। প্রত্যেকটি মাসআলাতে একাধিক গ্রন্থে বর্ণিত ইমামের বক্তব্যগুলো একসঙ্গে তুলে ধরেছি। অতিরিক্ত ভিত্তি হিসেবে রেখেছি ইমাম তহাবির 'আকিদাহ তহাবিয়্যাহ'-কে। ফলে এখানে ইমাম আজমের আকিদার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, আমরা আশা করছি সেটা নিখুঁত হবে, ইমামের প্রতি এবং ইলমের প্রতি ইনসাফ হবে। এটাকে যৌক্তিকভাবে ও যথার্থরূপে 'ইমাম আজমের আকিদা' সংকলন বলা যাবে, ইনশাআল্লাহ।

ঈমান-সম্পর্কিত আলোচনা

ঈমানের সংজ্ঞার্থ ও পরিচয়

ঈমান শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো বিশ্বাস করা, সত্যায়ন করা। ইমাম আজম রহ. বলেন, **'ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন এবং হৃদয় দ্বারা চেনা।'**[২১৬] পরিভাষায় ঈমান হলো, আল্লাহর একত্ববাদ এবং নবি-রাসুলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা-কিছু নিয়ে এসেছেন, সেগুলোকে দৃঢ়ভাবে জানা, সত্যায়ন করা, স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেগুলোর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা।[২১৭]

ইমাম আজম বিভিন্ন গ্রন্থে ঈমানের সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন। 'আল-ফিকহুল আকবারে' এসেছে—'ঈমান হলো এই **মৌখিক স্বীকারোক্তি** দেওয়া : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والقدر خيره وشره من الله تعالى، والحساب والميزان والجنة والنار، وذلك كله حق অর্থাৎ, **'আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসুলগণের উপর, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদিরের ভালোমন্দের উপর, পরকালের হিসাব-নিকাশ, মিযান (দাঁড়িপাল্লা) এবং জান্নাত-জাহান্নামের উপর। আমি বিশ্বাস করি, এগুলো সব সত্য।'**[২১৮]

আল-ফিকহুল আবসাতে এসেছে, ঈমান হলো, **'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই—এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া। আর আল্লাহর ফেরেশতা, তাঁর নাযিলকৃত কিতাব, তাঁর প্রেরিত রাসুল, তাঁর জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামত এবং তাকদিরের ভালোমন্দে সাক্ষ্য দেওয়া। আরও সাক্ষ্য দেওয়া যে, পৃথিবীর কাউকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি, বরং আল্লাহ তাকে যে**

---

২১৬. আল-ওয়াসিয়্যাহ (২৭)।

২১৭. দেখুন : আস-সাহায়িফুল ইলাহিয়্যাহ (৪৫০)।

২১৮. আল-ফিকহুল আকবার (১)।

উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেককে সেদিকেই যেতে হবে। প্রত্যেকে তাকদিরের অধীন।'[২১৯]

ইমাম তহাবি রহ. বলেন, 'ঈমান হলো মুখে স্বীকার করা, অন্তরে সত্যায়ন করা। পরিভাষায় ঈমান বলা হয়—আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, রাসুল, আখেরাত এবং তাকদিরের ভালোমন্দে বিশ্বাস করা।'[২২০]

ঈমানের এই সংজ্ঞায়ন ও রুকনগুলো কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। কারও ব্যক্তিগত ইজতিহাদ ও জ্ঞান-গবেষণার ফলাফল নয়। কারণ, ঈমান হলো সবকিছুর মূল ভিত্তি। ইসলামের ছোট ছোট ইবাদতের কথাও আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ঈমানের কথা বলা হবে না—এটা অসম্ভব। এ কারণে কুরআন-সুন্নাহতে ঈমানের রুকনগুলো সম্পর্কে বিস্তৃত বক্তব্য বিদ্যমান।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ﴾ অর্থ : 'কেবল পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানো পুণ্যের কাজ নয়; বরং পুণ্য হলো সে ব্যক্তির কাজ যে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবিগণে ঈমান রাখে। আল্লাহর ভালোবাসায় আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীদের এবং দাস-মুক্তির জন্য অর্থ দান করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে। আর প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে এবং সংগ্রাম-সমরে ধৈর্য ধারণ করে। তারাই সত্যপরায়ণ আর তারাই মুত্তাকি।' [বাকারা : ১৭৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا﴾ অর্থ : 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করো এবং বিশ্বাস স্থাপন করো তাঁর রাসুল এবং তাঁর কিতাবের উপর যা তিনি

---

২১৯. আল-ফিকহুল আবসাত (৪২)।

২২০. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২১-২২)।

নাযিল করেছেন স্বীয় রাসুলের উপর। ঈমান আনো সে সমস্ত কিতাবের উপর যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতঃপূর্বে। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং কিয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।' [নিসা : ১৩৬]

উপরের আয়াত দুটোতে ঈমানের পাঁচটি রুকন রয়েছে। ষষ্ঠ তথা তাকদির বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এবং তোমরা যা করো তা সৃষ্টি করেছেন।' অন্যত্র বলেন, ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ অর্থ : 'আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনো ইচ্ছা করো না।' [ইনসান : ৩০] আরও বলেন,﴿إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ﴾ অর্থ : 'আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি সুপরিমিতরূপে।' [কামার: ৪৯]

একাধিক হাদিসে ঈমানের সংজ্ঞার্থ ও রুকন উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু হাদিস ইমাম নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন। আবু মুতি তাকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রসিদ্ধ 'হাদিসে জিবরিল' বর্ণনা করেন, যেখানে ফেরেশতা জিবরিল আ. মানুষের রূপ ধারণ করে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে তাঁকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। রাসুল (ﷺ) বলেন, 'ঈমান হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল—এই মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া। আল্লাহর ফেরেশতা, কিতাব, রাসুল, পরকাল এবং তাকদিরের ভালোমন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বাস করা।' অতঃপর জিবরিল আ. তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) জবাবে বলেন, 'নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা, সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লাহর হজ করা এবং ফরয গোসলের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা।' অতঃপর জিবরিল আ. তাঁকে ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'এমনভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। যদি দেখতে না পাও এ বিশ্বাস রাখো যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।'[২২১]

মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ বলেন, আমি কাতাদার কাছে ছিলাম। এমন সময় আবু হানিফা রহ. সেখানে এলেন। কাতাদাকে লক্ষ্য করে বললেন, আবুল খাত্তাব, ঈমানের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী? কাতাদা বললেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করি। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কাছ থেকে যা-কিছু নিয়ে এসেছেন তাতে বিশ্বাস

---

২২১. আল-ফিকহুল আবসাত (৪০-৪১)।

করি। বিশ্বাস করি ফেরেশতা, রাসুলগণ, শেষ দিবস, জান্নাত-জাহান্নামে। তবে (আল্লাহর কাছে পরকালে) উচ্চ মর্যাদা পাব কি না সেটা জানি না। বর্ণনকারী মুহাম্মাদ বলেন, অতঃপর আমরা সেখান থেকে বের হয়ে এলাম। আবু হানিফাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর বক্তব্যের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, **সুন্দর** (অর্থাৎ, সমর্থন করলেন)।[২২২]

ইমাম তহাবি রহ. লিখেছেন, 'ঈমান হলো : আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসুল এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করা আর এ কথা বিশ্বাস করা যে, তাকদিরের ভালোমন্দ, পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে।'[২২৩]

ঈমানের হাকিকত (ঈমান কীভাবে সংঘটিত হয়?)

পিছনে যেমনটা বলেছি, ঈমান অর্থ হলো বিশ্বাস ও সত্যায়ন। তবে ঈমানের হাকিকত কী কিংবা এটা কীভাবে বাস্তবায়িত হবে সেটা নিয়ে রয়েছে বড় মাপের বিভিন্নতা এবং দীর্ঘ বিতর্ক। বড় বিতর্ক রয়েছে আহলে সুন্নাত ও আহলে বিদআতের মাঝে। কিছু ভিন্নতা রয়েছে আহলে সুন্নাতের নানান ধারার মাঝে। আরেকটা বিতর্ক রয়েছে খোদ ইমাম আজম এবং পরবর্তী হানাফি উলামায়ে কেরামের মাঝে। ধারাবাহিকভাবে সবগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে :

জাহমিয়্যাহ ও মুরজিয়াদের মতে ঈমান স্রেফ জানা : ভ্রান্ত জাহমিয়্যাদের মতে ঈমান হলো—আল্লাহ তায়ালা, রাসুল এবং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে যা-কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলো স্রেফ **জানা**। জানার বাইরে মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন ও আত্মসমর্পণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান, ভয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল—এগুলোর কোনোকিছুই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাছে কুফর হলো স্রেফ আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা! ফলে কোনো ব্যক্তির যদি জানা থাকে যে, আল্লাহ বলতে একজন আছেন, এরপর মুখে তাকে অস্বীকার করে, তবুও সে কাফের নয়! চরমপন্থি মুরজিয়াদের (যেমন আবুল হুসাইন সালেহির) মতে, ঈমান হলো স্রেফ আল্লাহকে জানা, আর কুফর হলো তাকে না জানা। ফলে কেউ যদি তিন খোদায় বিশ্বাস করে, তবুও কাফের হবে না। তবে এটুকু যে, কাফের ছাড়া আর কেউ এটা বলে না। তাদের মতে, আল্লাহকে জানাই যথেষ্ট। এটাই তাঁকে

২২২. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (৯৯)।
২২৩. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২২)।

ভালোবাসা, তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা। তাদের মতে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনাই ইবাদত। ফলে নামায কোনো ইবাদত নয়।[২২৪]

জাহমিয়্যাহ ও মুরজিয়াদের উক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জগতে কাফের খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ, এ মূলনীতি অনুযায়ী ইবলিস, ফিরাউন, আবু জাহল, আবু লাহাব—সবাই মুমিন হয়ে যায়। জগতের সকল ধর্মে বিশ্বাসী লোকজন কোনো-না-কোনোরূপে আল্লাহ অথবা একজন স্রষ্টার কথা জানে। ফলে সবাই মুমিন হয়ে পড়ে! এগুলো কুফরি কথা। ইমাম আজম রহ. তাদের খণ্ডনে বলেন, **'কেবল অন্তরের জানার নামই ঈমান নয়। এমন হলে আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা সবাই মুমিন হিসেবে গণ্য হতো। কারণ, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন,** ﴿الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَه كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ﴾ **অর্থ : 'আমি যাদের কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে যেমন চেনে নিজেদের সন্তানকে।' [বাকারা : ১৪৬] অথচ তবুও তারা মুমিন নয়। কারণ, তারা জানলেও স্বীকৃতি দেয় না।'**[২২৫] একইভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا﴾ অর্থ : 'তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে জেনেছিল।' [নামল : ১৪] জানা সত্ত্বেও তারা মুমিন নয়। কারণ, ঈমান স্রেফ জানা নয়, বরং গভীর বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ।

কাররামিয়্যাহদের মতে ঈমান স্রেফ মুখের স্বীকৃতি : কাররামিয়্যাহদের মত জাহমিয়্যাহ ও মুরজিয়াদের ঠিক বিপরীত। তাদের মতে, ঈমান হলো স্রেফ মুখের স্বীকৃতি। অন্তরের সত্যায়ন ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমলও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২২৬] তাদের দলিল হলো তায়ালার বাণী : ﴿قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُوْنَ﴾ অর্থ : 'তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সেই বাণীর প্রতি যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে আর যা ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের সন্তানদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা দেওয়া হয়েছিল মুসা ও ঈসাকে, যা অন্য নবিগণকে তাঁদের

---

২২৪. দেখুন : মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন, আশআরি (১/১১৪-১১৫)।

২২৫. আল-ওয়াসিয়্যাহ, আবু হানিফা (২৮)।

২২৬. দেখুন : শরহুল ওয়াসিয়্যাহ, মুফতি যাদাহ (৩২)। আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/১১৩)। তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১০৭৬)।

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল। আমরা নবিগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই অনুগত।' [বাকারা : ১৩৬] আল্লাহর বাণী : ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ অর্থ : 'রাসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তারা যখন সেটা শোনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত দেখতে পাবেন। এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে : হে আমাদের প্রতি পালক, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরও সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করে নিন।' [মায়িদা : ৮৩] তাদের বক্তব্য হলো, এসব আয়াতে স্রেফ 'বলা' তথা মুখের স্বীকতিকেই ঈমান বলা হয়েছে। মুখের স্বীকৃতি ঈমান না হলে শুধু এটাকে ঈমান বলা হতো না।

এটা গলত ও জঘন্য আকিদা। কারণ, এর মাধ্যমে সকল মুনাফিকও মুমিন গণ্য হবে। পৃথিবীতে মুনাফিক বলতে কিছু থাকবে না। ইমাম আজম রহ. তাদের খণ্ডনে বলেন, **"কেবল মুখের স্বীকৃতি ঈমান নয়। কারণ, এমন হলে মুনাফিকরাও সবাই মুমিন হিসেবে গণ্য হতো। অথচ তারা মুখে স্বীকৃতি দিলেও অন্তরে বিশ্বাস করে না। তাই তারা মুমিন নয়। বরং আল্লাহ তাদের মিথ্যুক অভিহিত করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ﴾ অর্থ : 'আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী'।" [মুনাফিকুন : ১]**[২২৭]

মুখের স্বীকৃতি থাকার পরও মুনাফিকদের আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকার ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ অর্থ : 'মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তাদের জন্য আপনি কখনো কোনো সহায় পাবেন না।' [নিসা : ১৪৫] ফলে মুনাফিকরাও কাফের। তাদের কখনোই ক্ষমা না করার ঘোষণা করে বলেন, ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ অর্থ : 'আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন বা না করেন একই কথা। আপনি সত্তরবার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদের কখনোই ক্ষমা করবেন না। এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।' [তাওবা : ৮০]

---

২২৭. আল-ওয়াসিয়্যাহ, আবু হানিফা (২৭)।

পাশাপাশি কুরআনের সেসব আয়াতও কাররামিয়্যাহদের ভ্রান্ত মাযহাবের খণ্ডন যেখানে অন্তরকে ঈমানের আধার বলা হয়েছে। যেমন—আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ﴾ অর্থ : 'হে রাসুল, যারা কুফরির দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে, তারা যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। তারা সেসব লোক যারা মুখে বলে : ঈমান এনেছি। কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান আনেনি।' [মায়িদা : ৪১] অন্যত্র বলেন, ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ অর্থ : "বেদুইনরা বলে, 'আমরা ঈমান আনলাম।' বলুন! 'তোমরা ঈমান আনোনি', বরং তোমরা বলো, 'আমরা (বাহ্যিকভাবে) আত্মসমর্পণ করেছি।' কারণ, ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।" [হুজুরাত : ১৪] আরও এক স্থানে আল্লাহ বিশ্বাসহীন মুখের স্বীকৃতিকে ঈমান বলা নাকচ করে দিয়ে বলেন, ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾ অর্থ : 'কিছু লোক এমন আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছি, অথচ (প্রকৃতপক্ষে) তারা মুমিন নয়।' [বাকারা : ৮] এখানে উল্লিখিত প্রত্যেকটি আয়াতে মুখের স্বীকৃতিকে অগ্রহণযোগ্য, অনির্ভরযোগ্য ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বোঝা গেল, স্রেফ মুখের স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়, বরং মুখের স্বীকৃতির সঙ্গে যদি অন্তরের বিশ্বাস ও বাস্তবতা না থাকে, তবে সে মুনাফিক গণ্য হবে।

খারেজি ও মুতাযিলাদের বিচ্যুতি : ঈমানের সংজ্ঞার্থের ক্ষেত্রে খারেজি ও মুতাযিলাদের মত সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নাতের মাযহাবের মতোই। মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল তিনের সমন্বয়। কিন্তু আহলে সুন্নাত ও তাদের মাঝে পার্থক্য হলো, তারা সবগুলো বিষয়কে একটি একক মনে করে। ফলে সামান্য নষ্ট হলে পুরোটা নষ্ট গণ্য করে। এ কারণেই তাদের কাছে ঈমানের আরেকটি শর্ত হলো : সকল প্রকারের কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা। কারণ, কবিরা গুনাহ করার অর্থ হলো আমলের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি আসা। আর আমল যেহেতু ঈমানের অঙ্গ এবং ঈমান যেহেতু খারেজিদের কাছে একটি একক, ফলে তাদের মতে কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের। এই ভ্রান্ত মতবাদের উপর ভিত্তি করেই তারা আলি ও মুআবিয়াসহ (রাযি.) অসংখ্য সাহাবিকে কাফের বলেছে, হত্যা করেছে! যুগে যুগে তাদের অনুসারীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। অন্যায়ভাবে তাদের রক্তপাত করেছে, আজও করছে। খারেজিদের বিপরীতে

মুতাযিলারা কবিরা গুনাহকারীকে কাফের না বললেও ইহকালের ব্যাপারে ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি রাখে। মুমিন হিসেবে স্বীকার করে না। পরকালের ব্যাপারে খারেজিদের মতোই চিরস্থায়ী জাহান্নামি বলে।

তাদের বক্তব্যের দলিল হিসেবে তারা বলে—আল্লাহর বাণী : ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾﴾ অর্থ : 'আর যারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যা হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এইগুলি করে, সে শাস্তির মুখোমুখি হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় <u>চিরকাল</u> বসবাস করবে।' [ফুরকান : ৬৮-৬৯] তাদের মতে, এখানে শিরকের ফলাফল যেমন চিরস্থায়ী জাহান্নাম বলা হয়েছে, কবিরা গুনাহের ফলও চিরস্থায়ী জাহান্নাম বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল, কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ঈমানের অংশ। কবিরা গুনাহ ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়।

এটা গলত বক্তব্য। কারণ, এখানে কবিরা গুনাহের শাস্তি চিরস্থায়ী নয়, বরং দীর্ঘ সময় বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।[২২৮] কুরআনের অন্য অনেক আয়াত এর সাক্ষী। বিস্তারিত আলোচনা 'ঈমান ও কবিরা গুনাহ' অধ্যায়ে আসবে।

আহলে সুন্নাতের মাযহাব : আহলে সুন্নাত ঈমান বলতে উপরের সবগুলো বিষয়ের সমষ্টি বোঝেন। ভ্রান্ত ফিরকাগুলো যেমন একেক প্রান্তিকতায় অবস্থান নিয়েছে, একেক ফিরকা একেকটা বিষয়কে ঈমান মনে করেছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সবগুলো বিষয়ের সমন্বিত রূপকে ঈমান মনে করেন এবং এটাই সত্য। অর্থাৎ, ঈমানের উদাহরণ একটি প্রাসাদ, যা কয়েকটি স্তম্ভের উপর দাঁড়ানো। ভ্রান্ত ফিরকাগুলো সবাই একেকটা স্তম্ভ ধরে সেটাকেই ঈমান মনে করেছে। পিছনে তাদের উল্লেখ করা কুরআনের আয়াতগুলোই সেটার প্রমাণ। প্রত্যেকেই কুরআনের আয়াত দিয়ে দলিল দিয়েছে। এর অর্থ হলো, প্রত্যেকে একটা অংশকে সম্পূর্ণ ঈমান মনে করেছে। মুরজিয়া ও জাহমিয়্যাহরা সেসব আয়াত দিয়ে দলিল দিয়েছে, যেগুলোতে ঈমানকে স্রেফ জানা কিংবা অন্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বিপরীতে কাররামিয়্যাহরা সেসব আয়াত উল্লেখ করেছে, যেগুলোতে ঈমানকে কেবল মুখের স্বীকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

---

২২৮. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৪৮)।

খারেজি ও মুতাযিলারা সেসব আয়াত দিয়ে দলিল দিয়েছে, যেগুলোতে কবিরা গুনাহকে ঈমানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ এগুলোর প্রত্যেকটি ঈমানের অংশ, পূর্ণ ঈমান নয়। পূর্ণ ঈমান হলো এই সবগুলো আয়াতের সমষ্টি, সবগুলো স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকা অবকাঠামো।

তাদের ঈমানের সংজ্ঞার্থকে অন্ধের হাতি দেখার সঙ্গেও তুলনা করা যায়, যারা হাতির একেকটা অঙ্গকে সম্পূর্ণ হাতি মনে করছে। অথচ হাতি হলো সবগুলোর সমন্বয়। ফলে আহলে সুন্নাতের কাছে অন্তরের জানা, সত্যায়ন, গভীর বিশ্বাস ও ভরসা, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, রাসুলুল্লাহর (ﷺ) প্রতি মহব্বত, আল্লাহর ভয় ও আশা, মুখে ঈমানের স্বীকৃতি, আল্লাহর যিকির এবং রাসুলুল্লাহর (ﷺ) প্রতি দরুদ-সালাম, নামায-রোযা, তাওয়াক্কুল, ইখলাস, তাযকিয়া-ইহসান এই সবকিছু ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

এটা হলো আহলে সুন্নাতের সামগ্রিক মাযহাব। তবে তাত্ত্বিকভাবে আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন মাযহাবের মাঝেও শাখাগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকিহের সঙ্গে ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. তথা হানাফি এবং আশআরিদের ঈমানের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। আশআরিদের মতে, ঈমান হলো অন্তরের সত্যায়ন। ইমাম আজমের মতে—যা সামনে আসবে—ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি এবং অন্তরের সত্যায়ন। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফের মতে, ঈমান হলো অন্তরের সত্যায়ন, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল সবগুলো।

বিভিন্ন ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মতবিরোধের বিপরীতে এখানে আহলে সুন্নাতের মতপার্থক্যের ফারাক হচ্ছে : বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলো ঈমানকে এই তিনটি বিষয়ের সমষ্টি না বলে একেক সম্প্রদায় একেকটা গ্রহণ করেছে। ফলে এক্ষেত্রে তারা মৌলিক বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে, এমন ধরনের বিভ্রান্তি যে ক্ষেত্রে ঈমান ও কুফরের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। ফলে তাদের কারও সংজ্ঞা অনুযায়ী মুমিন, কাফের, মুশরিক ও মুনাফিক—সব সমান হয়ে যায়। আবার কারও সংজ্ঞা অনুযায়ী মুমিন কাফের হয়ে যায়। কিন্তু আহলে সুন্নাতের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য শাব্দিক ও তাত্ত্বিক; মৌলিক নয়। ফলে তাদের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য থাকলেও তাতে কাফের মুমিন হয় না কিংবা মুমিন কাফের হয় না।

আহলে সুন্নাতের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য : আহলে সুন্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমাম ঈমান বলতে অন্তরের সত্যায়ন, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল—তিনটি বিষয়ের সমন্বয় বোঝেন। মালেক, শাফেয়ি, আওযায়ি, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ প্রমুখের মতো ফকিহ ও মুহাদ্দিস এমনকি মুতাকাল্লিমিন এবং সুফিয়ায়ে কেরামের মধ্য থেকে হারেস মুহাসেবি, আবুল আব্বাস কালানেসি প্রমুখ এই মত রাখেন। তাদের মতে ঈমান অন্তরের সত্যায়ন, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল সবগুলো।[২২৯]

মুহাম্মাদ ইবনে নসর মারওয়াযি তাঁর 'তাজিমু কাদরিস সালাত' গ্রন্থে বড় বড় ইমাম থেকে উক্ত সংজ্ঞার্থ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাযযাক তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে একই সংজ্ঞা সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস, আওযায়ি, ইবনে জুরাইজ, মা'মার ইবনে রাশেদসহ বিভিন্ন ফকিহ ও মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা করেছেন। লালাকায়ি তাঁর 'শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ' গ্রন্থে এ বক্তব্য শাফেয়ি, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ, আবু উবাইদ (কাসেম ইবনে সাল্লাম)-সহ অন্যান্য ইমাম থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকেম 'মানাকিবে শাফেয়ি' গ্রন্থে রবি ইবনে সুলাইমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন; শাফেয়ি বলেন, 'ঈমান হলো স্বীকৃতি ও আমল। বাড়ে ও কমে।'[২৩০]

যেমনটা বলা হয়েছে, কেবল ফুকাহা ও মুহাদ্দিসিন নন, বরং সালাফের যুগের তাসাওউফের শায়খগণও ঈমানের সংজ্ঞার্থের ক্ষেত্রে জমহুরের মত রাখতেন। ফুযাইল ইবনে ইয়াযকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে ঈমান হলো : মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের গ্রহণ (কবুল) এবং আমল।'[২৩১]

কিন্তু ইমাম আজম এটাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমাম থেকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি আমল তথা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলকে (প্রথমত) ঈমানের সংজ্ঞার্থের বাইরে রাখেন। আল-ওয়াসিয়্যাহতে ইমাম আজম রহ. ঈমানকে তিনটি বিষয়ের সমষ্টি বলেছেন। তাঁর মতে ঈমান হলো, **মুখের স্বীকারোক্তি (ইকরার), অন্তরের সত্যায়ন (তাসদিক) এবং হৃদয়ের জানা (মারিফাত)।**[২৩২] মারিফাত দ্বারা এখানে স্রেফ জানা

---

২২৯. দেখুন : তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১০৭৫)। শরহুল ওয়াসিয়্যাহ, মুফতি যাদাহ (৩৩)।

২৩০. দেখুন : ফাতহুল বারি (১/৪৬-৪৭)।

২৩১. আস-সুন্নাহ, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ (২৭৫)।

২৩২. আল-ওয়াসিয়্যাহ, আবু হানিফা (২৭)।

উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা তাসদিক (অন্তরের সত্যায়ন) উদ্দেশ্য। ফলে ইমামের কাছে ঈমান হলো অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকৃতি। এ জন্য ইমাম তহাবি রহ. ঈমানের সংজ্ঞার্থে লিখেছেন, 'ঈমান হলো : মুখে স্বীকার করা, অন্তরে সত্যায়ন করা।'[২৩৩]

দেখা গেল, ঈমানের হাকিকত নির্ধারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নাত এবং ইমাম আজমের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে; কিন্তু এই পার্থক্য তাত্ত্বিক। অর্থাৎ, যদিও সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে ইমাম আজম রহ. ঈমান থেকে আমলকে আলাদা করেন, কিন্তু প্রায়োগিকভাবে তিনি ঈমানকে বিশ্বাস ও কাজ সবগুলোর সমন্বিত রূপ মনে করেন। আবু মুকাতিল সমরকন্দি 'আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম' গ্রন্থে ইমাম থেকে বর্ণনা করেন, ঈমান হলো, **'সত্যায়ন করা (তাসদিক), জানা (মারিফাত), ইয়াকিন রাখা, স্বীকৃতি দেওয়া (ইকরার) এবং আত্মসমর্পণ করা (ইসলাম)।'**[২৩৪] খেয়াল করে দেখুন, এখানে ইমাম ঈমান বলতে অন্তরের সত্যায়ন, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল—সবগুলোকে বোঝেন। কারণ, তিনি ঈমানের অর্থের মাঝে 'ইসলাম'-কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর ইসলাম হলো বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল। যেমন—নামায, রোযা ইত্যাদি। ফলে তাত্ত্বিকভাবে তিনি আমলকে আলাদা করলেও প্রায়োগিকভাবে ঈমান বলতে অন্তরের সত্যায়ন, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল—সবগুলোকেই বোঝেন। এতে তাঁর বক্তব্যের মাঝে আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের বক্তব্যের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকল না। ইমাম বলেন, **"যদিও এগুলোর নাম ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু মূলকথা এক (أسماء مختلفة ومعناها واحد), আর তা হলো ঈমান। যেমন মানুষকে 'রাজুল' (ব্যক্তি), 'ইনসান' (মানুষ), 'ফুলান' (জনৈক) বিভিন্ন নামে বোঝানো যায়, ঈমানকেও বিভিন্ন নামে বোঝানো হয়।"**[২৩৫]

ইমাম আজম ঈমান ও ইসলাম (তথা আমল)-এর সম্পর্ক স্পষ্ট করে বলেন, **'ইসলাম ছাড়া ঈমান হয় না, আবার ঈমান ছাড়া ইসলাম পাওয়া যায় না। উভয়ে পিঠ ও পেটের মতো।'**[২৩৬] নিশাপুরির বর্ণনায় এ ব্যাপারে ইমামের দৃষ্টিভঙ্গি আরও বেশি স্পষ্ট হয়। তিনি লিখেন, হাম্মাদ ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

২৩৩. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২১)।
২৩৪. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৩)।
২৩৫. প্রাগুক্ত (১৪)।
২৩৬. আল-ফিকহুল আকবার (৬)।

আমি আবু হানিফা রহ.-এর সঙ্গে মসজিদুল হারামে ছিলাম। তখন একব্যক্তি এসে তাকে ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, 'দুটো এক'।(২৩৭) ফলে কার্যত জমহুর আহলে সুন্নাত এবং ইমাম আজমের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। 'ঈমান' ও 'ইসলাম', 'ঈমান' ও 'আমল'-এর সম্পর্ক নিয়ে সামনে আরও বিস্তারিত আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

ঈমানের জন্য কি মুখের স্বীকৃতি (ইকরার) জরুরি?

ইমাম আজম রহ.-এর কাছে ঈমান অন্তরের সত্যায়ন, মুখের স্বীকৃতিসহ একাধিক অনুষঙ্গ নিয়ে গঠিত হলেও মূল **'ঈমান হৃদয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে কোনো ব্যক্তি যদি মুখে ঈমান আনে, কিন্তু হৃদয়ে ঈমান না আনে, তবে সে আল্লাহর কাছে মুমিন গণ্য হবে না। বিপরীতে যে ব্যক্তি হৃদয়ে বিশ্বাস করে, কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ না করে, আল্লাহর কাছে সে মুমিন গণ্য হবে।'**[২৩৮] ইমাম আরও বলেন, **'ঈমানের মূল জায়গা অন্তর। এর শাখা-প্রশাখা শরীরে বিস্তৃত।'**[২৩৯]

এখানে দুটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি—এক. আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়া, দুই. মানুষের কাছে গৃহীত হওয়া। ইমাম আজম রহ. মনে করেন, আল্লাহর কাছে ঈমানকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য মূলত অন্তরের সত্যায়নই যথেষ্ট। কারণ, তিনি অন্তর্যামী। ফলে কেউ যদি অন্তরে অন্তরে তাঁর কাছে নিজেকে সঁপে দেয়, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে সে তাঁর কাছে মুমিন গণ্য হবে। মুখে প্রকাশ করা কিংবা সর্বত্র জানান দেওয়া শর্ত নয়। কিন্তু আমরা মানুষ তো সেটা জানতে পারব না। কারণ, আমাদের কারও হৃদয়ের ভিতরের কথা জানার সুযোগ নেই। তাই আমরা কেবল বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে ফয়সালা করব—মুখে স্বীকৃতি দিলে তাকে মুমিন গণ্য করব; মুখে স্বীকৃতি না দিলে মুমিন গণ্য করব না।

ইমাম বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা মুমিন ও কাফের সাব্যস্ত করেন অন্তরের অবস্থার ভিত্তিতে। কারণ, তিনি অন্তর্যামী। কিন্তু আমরা মানুষেরা মানুষকে মুমিন ও কাফের সাব্যস্ত করব বাহ্যিক স্বীকারোক্তি, মিথ্যাচার, পোশাক-আশাক ও ইবাদত দেখে। উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি অপরিচিত কোনো এলাকায় গিয়ে একদল মানুষকে মসজিদে কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করতে দেখি, তবে আমরা তাদের মুসলিম বলব; অথচ হতে পারে তারা ইহুদি বা খ্রিষ্টান! কিন্তু এ কারণে আল্লাহ**

---

২৩৭. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১০৪)।

২৩৮. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১০)।

২৩৯. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৭)।

আমাদের পাকড়াও করবেন না। কারণ, মানুষের অন্তরের খবর রাখা আমাদের দায়িত্ব নয়। আমাদের কেবল বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে কাউকে মুমিন কিংবা কাফের বলা, ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্তরের খবর রাখবেন আল্লাহ তায়ালা।'[২৪০]

মুখের স্বীকৃতি যেভাবে বাদ পড়ে যায় : উপরের আলোচনা দ্বারা বাহ্যিকভাবে মনে হয়, ইমাম আজমের কাছে মূল ঈমান হলো অন্তরের সত্যায়ন। মুখের স্বীকৃতি কেবল বাহ্যিক বিচারের জন্য, মানুষকে জানানোর জন্য। ফলে এটা ঈমানের মৌলিক বিষয় (রুকন) নয়। এটাকে এভাবেই বুঝেছেন পরবর্তী যুগের অনেক হানাফি আলেম। তারা বলেছেন, ইমামের মাযহাব হলো—মুখের স্বীকৃতি সর্বাবস্থায় কেবলই বাহ্যিক বিধিবিধান প্রয়োগের জন্য। এটা ঈমানের রুকন নয়, বরং শর্ত। এটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকলেও বড় জটিলতা ছিল না। কিন্তু বড় জটিলতা হলো, কেউ কেউ আরও সামনে এগিয়ে একপর্যায়ে স্বীকৃতিকে ঈমানের সংজ্ঞার্থ থেকে খারিজ করে দেন। ঈমানের আলোচনায় মৌখিক স্বীকৃতির বিষয়টি পুরোপুরি গায়েব করে দেন, যা ইমাম আজমের বিশুদ্ধ মত নয়। বরং এটা পরবর্তী সময়ের আশআরি মাযহাবের মত।

ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদি (৩৩৩ হি.) 'আত-তাওহিদ'-এ বলেন, 'একদল লোক (কাররামিয়্যাহ) দাবি করেছে—ঈমান কেবল মুখের স্বীকৃতি; অন্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নেই। কিন্তু আমরা বলি, ঈমানের মূল পাত্র হলো অন্তর। ...অন্তরে ঈমান থাকা অবস্থায় মুখের কুফরকে আল্লাহ কুফর বলেননি। বোঝা গেল, ঈমানের মূল জায়গা অন্তর। ...কেউ বলতে পারে—হাদিসে যে শাহাদাহ দেওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কথা বলা হয়েছে, সেটার ব্যাখ্যা কী? আসলে এর মাধ্যমে এটা বোঝায় না যে, শাহাদাহটাই ঈমান কিংবা ঈমান অন্তরের বিষয় নয়; বরং এটা (শাহাদাহ তথা বাহ্যিক স্বীকৃতি) ঈমানের নির্দেশক ও পরিচায়ক। ফলে পার্থিব বিধিবিধানের ক্ষেত্রে আমাদের এটা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। পৃথিবীর সব কাজেই এমন করতে হয়—বাহ্যিক অবস্থা দেখে ফয়সালা করতে হয়। ভিতরের বাস্তবতা সেটার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এমনটা জরুরি নয়...।'[২৪১] ইমাম মাতুরিদি তাঁর তাফসিরের বিভিন্ন জায়গাতেও কাছাকাছি, বরং আরও স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন—তিনি সুরা মায়িদার ৪১ নং আয়াতের তাফসিরে

---

২৪০. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২২)।

২৪১. আত-তাওহিদ, মাতুরিদি (২৬৮-২৭০)।

লিখেন, 'এর দ্বারা বোঝা যায়, মুখের স্বীকৃতি ঈমানের শর্ত নয়; বরং ঈমান হলো অন্তরের সত্যায়ন। মুখ দ্বারা স্রেফ অন্তরের সত্যায়নটা প্রকাশ করা হয়।'[২৪২] তিনি অন্যত্র লিখেন, 'ঈমান স্রেফ সত্যায়ন; অন্যকিছু নয়।'[২৪৩] মাইমুন নাসাফি (৫০৮ হি.) বলেন, 'আবু মনসুর আল-মাতুরিদির কাছে ঈমান হচ্ছে স্রেফ সত্যায়ন (الإيمان مجرد التصديق)।'[২৪৪] তাঁর অনুসরণে আবু সালামাহ সমরকন্দিও লিখেন, 'ঈমান হলো সত্যায়ন।'[২৪৫]

নাসাফি বলেন, 'ঈমান হলো অন্তরের সত্যায়ন। এটাই আবু মনসুর মাতুরিদির মত। আবু হানিফা থেকেও এটা বর্ণিত।'[২৪৬] নাসাফি তাঁর 'আত-তামহিদ'-এ লিখেন, 'ঈমানের শাব্দিক অর্থ সত্যায়ন করা। এই শাব্দিক অর্থ তথা অন্তরের সত্যায়নই ঈমানের হাকিকত। এটুকুই বান্দার উপর ওয়াজিব। সুতরাং কেউ যদি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যা-কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলোকে সত্যায়ন করে, তবে আল্লাহর কাছে সে মুমিন গণ্য হবে। তবে মুখের স্বীকৃতি হচ্ছে মানুষকে জানানোর জন্য, (ব্যক্তির উপর) ইসলামের বিধিবিধান প্রয়োগের জন্য।'[২৪৭] জামালুদ্দিন আহমদ গযনবিও একই কথা লিখেছেন।[২৪৮]

নুরুদ্দিন সাবুনি (৫৮০ হি.) লিখেন, 'আমাদের মুহাক্কিকদের মাযহাব হলো, ঈমান স্রেফ অন্তরের সত্যায়ন। মুখের স্বীকৃতি দুনিয়ার বিধিবিধানের জন্য। ফলে কেউ অন্তরে সত্যায়নের পরে মুখে স্বীকৃতি না দিলেও আল্লাহর কাছে মুমিন গণ্য হবে। ...এটা ইমাম আবু হানিফা এবং আবু মনসুর মাতুরিদির বক্তব্য। ফলে মূল ঈমান হলো অন্তরের সত্যায়ন। মুখের স্বীকৃতি কিংবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ, যেহেতু অন্তরের সত্যায়ন বাইরের কারও জানার সুযোগ নেই, তাই এর আলামতস্বরূপ কাজ করবে মুখের স্বীকৃতি। দুনিয়ার বিধিবিধান সে আলোকে নির্ধারিত হবে।'[২৪৯]

---

২৪২. তাফসিরে মাতুরিদি (তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ) (৩/৫২০)।

২৪৩. তাফসিরে মাতুরিদি (৪/৫৩৩)।

২৪৪. দেখুন : বাহরুল কালাম, নাসাফি (১৫১-১৫২)। তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/১৫৪)।

২৪৫. দেখুন : জুমাল মিন উসুলিদ্দিন (১৪-১৫)।

২৪৬. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১০৭৭)। কিন্তু এটা বিশেষ প্রেক্ষিতে আবু হানিফা রহ.-এর মত হলেও মাযহাব নয়, যা আমরা আগে দেখিয়েছি, সামনেও দেখব ইনশাআল্লাহ।

২৪৭. আত-তামহিদ ফি উসুলিদ্দিন (১৪৬-১৪৭)।

২৪৮. দেখুন : উসুলুদ্দিন, গযনবি (২৫২)।

২৪৯. দেখুন : আল-কিফায়াহ, সাবুনি (৩৫৩-৩৫৪)। আল-বিদায়াহ মিনাল কিফায়াহ (১৫২)

মাহমুদ ইবনে যায়েদ লামিশি (৫২২ হি.) লিখেন, 'অধিকাংশ আহলে সুন্নাতের কাছে ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি এবং অন্তরের সত্যায়ন দুটোর সমন্বয়। ফলে একদিকে অন্তরের সত্যায়ন করতে হবে, অন্যদিকে ঈমানের বিধান প্রয়োগের জন্য মুখে স্বীকৃতি দিতে হবে। বিপরীতে আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণিত আছে, ঈমান কেবল অন্তরের সত্যায়ন। মুখের স্বীকৃতি রুকন নয়, বরং ঈমানের নির্দেশক। এটা আবুল হাসান আশআরি এবং আবু মনসুর মাতুরিদিসহ একদল মুতাকাল্লিমের বক্তব্য।'[২৫০]

আবু বারাকাত নাসাফি (৭১০ হি.) 'আল-ইতিমাদ'-এ লিখেন, 'ঈমান হচ্ছে তাসদিক তথা অন্তরের সত্যায়ন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল (ﷺ) যা-কিছু তাঁর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন সেগুলো সত্যায়ন করবে, আল্লাহর কাছে সে মুমিন গণ্য হবে। মুখের স্বীকৃতি ইসলামের বিধিবিধান প্রয়োগের জন্য। এটাই ইমাম আবু হানিফার মত। এটাকেই গ্রহণ করেছেন শায়খ আবু মনসুর আল-মাতুরিদি এবং আশআরির বিশুদ্ধ মতও এটাই।'[২৫১]

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (৮৫৫ হি.) বলেন, 'মুখের স্বীকৃতি ঈমানের রুকন নাকি স্রেফ দুনিয়ার বিধিবিধান প্রয়োগের শর্ত, এটা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কারও কারও মতে এটা শর্ত। ফলে যদি কেউ আল্লাহ ও রাসুলকে অন্তরে স্বীকার করে, তবে সে আল্লাহর কাছে মুমিন গণ্য হবে, মুখে স্বীকৃতি না দিলেও চলবে। নাসাফি থেকে বর্ণিত, এটাই ইমাম আবু হানিফা, আশআরি ও মাতুরিদির মত। বিপরীতে কারও কারও মত হলো, মুখের স্বীকৃতি রুকন। হ্যাঁ, অন্তরের সত্যায়নের মতো মূল রুকন নয়, বরং অতিরিক্ত রুকন। এ কারণে বাধ্যবাধকতা বা অক্ষমতার সময় এক্ষেত্রে ছাড় থাকবে। ফখরুল ইসলাম বাযদাবি বলেন, ফকিহদের কাছে এটা (অতিরিক্ত) রুকন। আর মুতাকাল্লিমিনের কাছে এটা দুনিয়ার বিধিবিধান প্রয়োগের শর্ত।'[২৫২]

ইমাম আজমের মাযহাব নির্ধারণ : কিন্তু বিষয়টি এত সরল নয়। অর্থাৎ, ইমাম আজম রহ.-এর বক্তব্য দ্বারা—তিনি মুখের স্বীকৃতিকে ঈমানের রুকন মনে করতেন না, স্রেফ বাহ্যিক বিধিবিধান প্রয়োগের শর্ত বলতেন—সেটা

---

২৫০. দেখুন : আত-তামহিদ, লামিশি (১২৬-১২৭)।
২৫১. আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (৩৭০)।
২৫২. উমদাতুল কারি, আইনি (১/১০৩)।

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা যায় না। কারণ, তিনি ঈমানের পরিচয়দানে সর্বত্রই মুখের স্বীকৃতিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। স্রেফ 'তাসদিক' তথা সত্যায়নকে তিনি কোথাও ঈমান বলেননি।

আল-ফিকহুল আকবারের শুরুতেই ইমাম বলেন, 'তাওহিদ ও আকিদার মূল বিষয় হলো মুখে স্বীকৃতি দেওয়া যে (يجب أن يقول), আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসুলগণের উপর, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদিরের ভালোমন্দের উপর, পরকালের হিসাব-নিকাশ, মিযান (আমলের দাঁড়িপাল্লা) এবং জান্নাত-জাহান্নামের উপর। আমি বিশ্বাস করি এগুলো সব সত্য।'[২৫৩] এখানে ইমাম ঈমানকে মুখে স্বীকৃতি দিতে বলেছেন, 'স্রেফ অন্তরে বিশ্বাস করবে' এমন বলেননি। আল-ফিকহুল আকবারের অন্যত্র আরও স্পষ্ট করে বলেন, **'ঈমান হলো স্বীকৃতি ও সত্যায়ন (الإقرار والتصديق)।'**[২৫৪]

সায়েদ নিশাপুরি ওয়াকি ইবনুল জাররাহ থেকে বর্ণনা করেন, আবু হানিফা রহ. বলেছেন, কেবল জানাশোনার (মারিফাত) মাধ্যমে কেউ মুমিন হতে পারবে না, বরং (হৃদয়ের) জানার পাশাপাশি মুখেও স্বীকৃতি দিতে হবে। **যখন জানার পাশাপাশি মুখে স্বীকৃতি দেবে, তখনই মুমিন হবে** (لا يكون مؤمنا بالمعرفة، حتى يعرف ويقر بلسانه، فإذا عرف وأقر بلسانه فهو مؤمن)।[২৫৫]

আল-ফিকহুল আবসাতে আবু মুতি বলখি ঈমান সম্পর্কে জানতে চাইলে ইমাম আজম বলেন, **'ঈমান হলো—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই—এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া। আর আল্লাহর ফেরেশতা, তাঁর নাযিলকৃত কিতাব, তাঁর প্রেরিত রাসুল, তাঁর জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামত এবং তাকদিরের ভালোমন্দে সাক্ষ্য দেওয়া। আরও সাক্ষ্য দেওয়া যে, পৃথিবীর কাউকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি; বরং আল্লাহ তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেককে সেদিকেই যেতে হবে। প্রত্যেকে তাকদিরের অধীন।'**[২৫৬]

---

২৫৩. আল-ফিকহুল আকবার (১)।

২৫৪. প্রাগুক্ত (৬)।

২৫৫. আল-ইতিকাদ (১০২-১০৩)।

২৫৬. আল-ফিকহুল আবসাত (৪২)।

একইভাবে ইমাম নিজস্ব রেওয়ায়াতে হাদিসে জিবরিল বর্ণনা করেন। সেখানে জিবরিলের প্রশ্নের উত্তরে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঈমান হচ্ছে, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল—এই মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া।'[২৫৭] আর সাক্ষ্য হচ্ছে মুখের স্বীকৃতি। আবু মুতি তা-ই বুঝেছেন। ফলে তিনি ইমামকে বলেন, যদি এগুলো বিশ্বাস করে এবং স্বীকৃতি দেয়, তবে সে মুমিন? ইমাম বলেন, **'হ্যাঁ। কারণ, যখন এগুলোর স্বীকৃতি দিলো, তখন সে সামগ্রিক ইসলামের স্বীকৃতি দিলো। তাই সে মুমিন** (فإذا استيقن بهذا وأقر به فهو مؤمن؟ قال نعم، إذا أقر بهذا فقد أقر بجملة الإسلام وهو مؤمن)।'[২৫৮]

আবু মুতি তাকে আরও জিজ্ঞাসা করেন, যদি কেউ শিরকের ভূখণ্ডে বসে ইসলামের সামগ্রিক বিষয়কে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু ফরয বিধিবিধান ও শরিয়ত সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান না থাকে, আল্লাহর কিতাব ও শরিয়তের কোনোকিছুতে স্বীকৃতি না থাকে, তবে আল্লাহকে স্বীকার করে, তাঁর প্রতি ঈমানকে স্বীকার করে এবং এই অবস্থায় মারা যায়, সে কি মুমিন? ইমাম বললেন, **'হ্যাঁ। যদি শরিয়ত সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকে এবং কোনো আমল না থাকে, কিন্তু ঈমানের স্বীকৃতি থাকে, তবে সে মুমিন।'**[২৫৯] এখানে প্রত্যেকটি জায়গাতে 'মুখের স্বীকৃতি' (الإقرار) বলা হয়েছে। স্রেফ অন্তরের সত্যায়ন (التصديق) শব্দটা উল্লেখ করাই হয়নি। ফলে ইমাম ঈমান বলতে কেবল অন্তরের সত্যায়নকে বুঝতেন, মুখের স্বীকৃতিকে অতিরিক্ত শর্ত বলতেন—এটা দলিলবিহীন বক্তব্য। শিরকের ভূখণ্ডে তার উপর কে ইসলামের আইন প্রয়োগ করবে? তবুও সেখানে ইমাম 'স্বীকৃতি'র কথা বলেছেন। বোঝা গেল, এটা কেবল বাহ্যিক বিধান প্রয়োগের শর্ত নয়, বরং ঈমানের মৌলিক অঙ্গ (রুকন)।

ইমাম আজম তাঁর জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তে কৃত ওসিয়তও শুরু করেছেন ঈমানের পরিচয় দিয়ে। সেখানেও একই কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'ঈমান হলো **মুখের স্বীকৃতি**, অন্তরের সত্যায়ন (الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان)।'[২৬০] এখানে দেখুন, ইমাম মুখের স্বীকৃতিকে সত্যায়নের আগে নিয়ে এসেছেন। বরং

---

২৫৭. প্রাগুক্ত (৪০-৪১)।
২৫৮. আল-ফিকহুল আবসাত (৪১)।
২৫৯. দেখুন : আল-ফিকহুল আবসাত (৪২)।
২৬০. আল-ওয়াসিয়্যাহ (২৭)।

আল-ওয়াসিয়্যাহতে ইমাম আজম ঈমানের প্রত্যেকটি বিষয় আলোচনার আগে 'আমরা স্বীকৃতি দিই' (نقر) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ফলে এটা ঈমানের হাকিকত নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর মাযহাব বোঝার এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। যদি মুখের স্বীকৃতিকে তিনি ঈমানের রুকন মনে না করতেন, তবে 'আমরা সত্যায়ন করি' (نصدق) কিংবা 'বিশ্বাস করি' (نؤمن) এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করলেই পারতেন। এর পরেও যেসব আলেম ঈমান স্রেফ সত্যায়নের প্রবক্তা, তারা এগুলোকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন।[২৬১]

ঈমানের জন্য মুখের স্বীকৃতি আবশ্যক : মোটকথা, ইমাম আজমের একাধিক গ্রন্থের অগণিত বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত যে, তাঁর কাছে ঈমান মানে অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকৃতি দুটোই। বরং মুখের স্বীকৃতির অধিক গুরুত্ব বোঝাতে তিনি এটাকে সর্বত্র অন্তরের সত্যায়নের আগে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে এই আলোচনার শুরুর দিকে উদ্ধৃত ইমামের বক্তব্য—**'ঈমান হৃদয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে কোনো ব্যক্তি যদি মুখে ঈমান আনে কিন্তু হৃদয়ে ঈমান না আনে, তবে সে আল্লাহর কাছে মুমিন হিসেবে গণ্য হবে না। বিপরীতে যে ব্যক্তি হৃদয়ে বিশ্বাস করে কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ না করে, আল্লাহর কাছে সে মুমিন বলে গণ্য হবে।'**—এর ব্যাখ্যা কী? এর দ্বারা তো স্পষ্টভাবে বোঝা যায় মুখের স্বীকৃতি মূল ঈমানের জন্য নিষ্প্রয়োজন।

আমরা বলব—হ্যাঁ, এখানকার বক্তব্য দ্বারা তা-ই বোঝা যায়। কিন্তু এই একটা বক্তব্য দ্বারাই 'ইমাম মৌখিক স্বীকৃতিকে ঈমানের রুকন মনে করতেন না।'—এ ধরনের দাবি করা যায় না। কারণ, অন্যান্য বক্তব্য দেখলে বুঝে আসবে, এটা স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। বরং তিনি 'আমল' ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয় সেটা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে, মুখে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়াও মুমিন হওয়ার পথ রয়েছে। অর্থাৎ, যেভাবে আমল ছাড়া ঈমান সংঘটিত হয়, একইভাবে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়াও ঈমান সংঘটিত হবে। কিন্তু সেটা সর্বাবস্থায় নয়, বরং বিশেষ প্রয়োজন-সাপেক্ষে—স্বীকৃতির পথে প্রতিবন্ধকতা থাকা অবস্থাতে। যেমন—কেউ স্বীকৃতি দেওয়ার আগেই মারা গেল। অথবা অসুস্থতা কিংবা অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য ওজরের কারণে মুখে স্বীকৃতি দিতে পারল না। তার জন্য কেবল অন্তরের সত্যায়ন দ্বারাই ঈমান সংঘটিত হয়ে যাবে। মানুষের কাছে কাফের থাকলেও আল্লাহর কাছে মুমিন গণ্য হবে। কারণ, তিনি অন্তর্যামী। এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের কারও দ্বিমত নেই।

---

২৬১. দেখুন : শরহুল ওয়াসিয়্যাহ, বাবিরতি (৫১-৫৩)।

কিন্তু সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মুখের স্বীকৃতি পরিত্যাগ করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সকল ইমামের মতো ইমাম আজমের মতেও আল্লাহর কাছেও মুমিন গণ্য হবে না। কারণ, সে ঈমানের রুকন ভঙ্গ করেছে। আমাদের দাবির দলিল খোদ ইমামের বক্তব্য। তিনি বলেন (আবু ইউসুফের বর্ণনা অনুযায়ী) : (وإن عرف الله وصدق به، ومات قبل أن يقر بلسانه <u>مع إمكانه</u> فهو كافر، لأن الله تعالى جعل الإيمان في كتابه بجارحة القلب واللسان) অর্থাৎ, **'এটা হলো তাদের ক্ষেত্রে যাদের মুখে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব না হয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তির পক্ষে মুখে স্বীকৃতি দেওয়া <u>সম্ভব হওয়ার পরও</u> যদি মুখে স্বীকৃতি না দেয়, তবে তার অন্তরের ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে মৃত্যুবরণ করলে কাফের হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে। কেননা, ঈমান অন্তরের বিশ্বাস এবং <u>মুখের স্বীকারোক্তি</u> দুটোই।** ইমাম এক্ষেত্রে কিছু দলিল পেশ করে বলেন, আল্লাহ বলেছেন, ﴿قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ (١٣٦) فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١٣٧)﴾ অর্থ : 'তোমরা <u>বলো,</u> আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মুসা, ঈসা, অন্যান্য নবিকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে সবকিছুর উপর। আমরা তাদের মাঝে ভেদাভেদ করি না। আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী। অতএব, তারা যদি ঈমান আনে তোমাদের ঈমান আনার মতো, তবে তারা সুপথ পাবে।' [বাকারা : ১৩৬-১৩৭] আরও বলেন, ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ﴾ অর্থ : 'তাদের উপর তাকওয়ার <u>কালিমা</u> (মুখের স্বীকৃতি) অপরিহার্য করে দিলেন।' [ফাতাহ : ২৬] আরও বলেন, ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ অর্থ : 'তারা অন্যায় ও অহংকারবশত (আমার) নিদর্শনাবলিকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের <u>অন্তর এগুলো সত্য বলে চিনেছিল।</u>' [নামল : ১৪] অন্যত্র বলেন, ﴿اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ﴾ অর্থ : 'আমি যাদের কিতাব দান করেছি, তারা তাকে <u>চেনে যেমন চেনে</u> নিজেদের সন্তানকে।' [বাকারা : ১৪৬] <u>অন্তরের বিশ্বাস ও চেনা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাদের মুমিন বলেননি</u> (কারণ, তারা সত্যায়ন ও স্বীকৃতি দেয়নি)। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা <u>বলো</u>, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাহলে সফলকাম হবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি <u>বলবে</u> লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।' ফলে কেবল জানলেই হবে না, মুখে স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি।[২৬২]

উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদিসগুলোতে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ঈমানকে মুখেও 'স্বীকৃতি দিতে' বলা হচ্ছে। বোঝা গেল, মুখের স্বীকৃতি স্রেফ বাহ্যিক বিধিবিধানের জন্য শর্ত নয়, বরং এটা ঈমানের রুকন। আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যও অন্তরের সত্যায়নের পাশাপাশি মুখের স্বীকৃতি প্রয়োজন। কারণ, তিনি নিজেই এটাকে প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। হ্যাঁ, কেউ বিশেষ পরিস্থিতিতে মুখে স্বীকৃতি না দিতে পারলে তখন অন্তরের ঈমান আল্লাহর কাছে মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ, যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ﴾ অর্থ : 'কেউ ঈমান আনার পরে আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত করলে তার উপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হবে এবং তার জন্য আছে মহা শাস্তি। তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফর করতে বাধ্য করা হয় এবং তার চিত্ত ঈমানে অবিচল থাকে।' [নাহল : ১০৬] কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া স্বীকৃতি ছেড়ে দিলে ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। ফলে মুখের স্বীকৃতি ইমাম আজমের কাছে ঈমানের রুকন; কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনো কখনো তাতে 'রুখসত' (ছাড়) দেওয়ার সুযোগ আছে।

ফলে ইমামের মাযহাব স্পষ্ট। বিশেষ প্রয়োজনে মুখের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় মুখের স্বীকৃতি রুকন গণ্য হবে এবং মুখের স্বীকৃতি ছাড়া আল্লাহর কাছেও ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। জাহম ইবনে সাফওয়ানের সঙ্গে ইমামের আলোচনার মাঝেও এটার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পিছনে আমরা সবিস্তারে এটা উল্লেখ করেছি। সেখানে দেখেছি, জাহম ইমামকে জিজ্ঞাসা করেন, মুখের স্বীকৃতি ছাড়া কেবল অন্তরের জানাশোনা (মারিফাত) দ্বারা কেউ মুমিন হবে কি না? ইমাম তার জবাবে বলেন, **'যদি অন্তরের জানা মুখে স্বীকার না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে কাফের।'** জাহম প্রশ্ন করেন, আল্লাহর সকল সিফাত জানার পরেও মুমিন হবে না কীভাবে? ইমাম আজম তখন তার সামনে কুরআন ও সুন্নাহর একাধিক দলিল উপস্থাপন করেন, যেখানে মুখের স্বীকৃতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ইমাম বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা কুরআনে**

২৬২. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৩১-৩২)।

ঈমানকে হৃদয় ও মুখ দুটোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ۝٨٣ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّٰلِحِينَ ۝٨٤ فَأَثَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۝٨٥﴾ অর্থ : 'আর তারা রাসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন শোনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত দেখতে পাবেন। এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরও সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করে নিন। আল্লাহ এবং আমাদের কাছে আগত সত্যে আমাদের ঈমান না আনার কী কারণ থাকতে পারে যখন আমরা প্রত্যাশা করি, আল্লাহ আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের তালিকাভুক্ত করুন? সুতরাং তাদের এ কথার কারণে আল্লাহ তাদের এমন সব উদ্যান দান করবেন যার তলদেশে নহর প্রবহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান।' [মায়িদা : ৮৩-৮৫] ফলে জান্নাতে যাওয়ার জন্য অন্তরের জানা এবং মুখের স্বীকৃতি দুটোই জরুরি। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, ﴿قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾ অর্থ : 'তোমরা বলে দাও যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সেই বাণীর প্রতি যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে আর যা ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের সন্তানের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা দেওয়া হয়েছিল মুসা ও ঈসাকে, যা অন্যান্য নবিকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল। আমরা নবিগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই অনুগত। অতএব, তারা যদি ঈমান আনে যেভাবে তোমরা ঈমান এনেছ, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।' [বাকারা : ১৩৬-১৩৭]

ইমাম আরও বলেন—আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেন, 'তোমরা বলো লা ইলাহা ইলাল্লাহ, তাহলে সফলতা লাভ করবে।' ফলে মুখের স্বীকৃতি ছাড়া কেবল অন্তরে জানলে কেউ মুমিন হবে না। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "জাহান্নাম থেকে সে ব্যক্তি বের হয়ে আসবে যে বলত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', আর যার অন্তরে

দানাপরিমাণ ঈমান থাকবে।” রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এটা বলেননি যে, আল্লাহকে চিনত; **বরং ঈমান যদি স্বীকৃতির পরিবর্তে কেবল জানার নামই হতো, তবে ঈমান প্রত্যাখানকারী প্রত্যেককে মুমিন বলা হতো।** এই যুক্তিতে ইবলিসও মুমিন হতো। কেননা, সে আল্লাহকে চেনে ও জানে। তাকে স্রষ্টা, রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা হিসেবে চেনে। ...বরং এতে সকল কাফের মুখে অস্বীকার করা সত্ত্বেও মুমিন হয়ে যেত। আল্লাহ বলেন, ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ অর্থ : ‘তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলিকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে নিশ্চিত জেনেছিল।’ [নামল : ১৪] এখানে তাদের অন্তরের নিশ্চিত জানা (ইয়াকিন) সত্ত্বেও তাদের মুমিন বলা হয়নি। কারণ, তারা মুখে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ অর্থ : ‘তারা আল্লাহর নেয়ামত চেনার পরও অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।’ [নাহল : ৮৩] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ অর্থ : “আপনি জিজ্ঞাসা করুন, কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন? শোনা ও দেখা কার কর্তৃত্বাধীন? জীবিতকে মৃত থেকে কে বের করেন, আর মৃতকে জীবিত থেকে কে বের করেন? এবং সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন তারা বলবে, ‘আল্লাহ’। বলো, তবুও কি তোমরা (তাকে) ভয় পাবে না?” [ইউনুস : ৩১] **এখানেও দেখো, কেবল অন্তরের জানাশোনা কোনো কাজে আসেনি। মুখে অস্বীকার করার কারণে অন্তরে নবিজিকে নিজেদের সন্তানের মতো চিনেও তারা মুমিন হতে পারেনি।**[২৬৩]

এটা কেবল ইমাম আজমের নয়, জমহুর আহলে সুন্নাতের ইমামদের বক্তব্যও এক ও অভিন্ন। ইমাম বুখারি বলেন, ‘আমি হিজায, মক্কা, মদিনা, কুফা, ওয়াসেত, ইরাক, বাগদাদ, শাম ও মিশরের হাজারের অধিক আলেমের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাদের কয়েকজন হলেন মক্কি ইবনে ইবরাহিম, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, কুতাইবা ইবনে সাইদ, শিহাব ইবনে মা’মার, মুহাম্মাদ আল-ফিরয়াবি, ইয়াহইয়া ইবনে কাসির, আবু সালেহ, নুআইম ইবনে হাম্মাদ, হুমাইদি, মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ, ইবরাহিম ইবনুল মুনযির, যাহহাক ইবনে মাখলাদ, হিশাম ইবনে

---

২৬৩. দেখুন : মানাকিব, মক্কি (১২৪-১২৬)। মানাকিব, বাযযাযি (২০১-২০২)।

আবদুল মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম, ইসহাক ইবনে ইবরাহিম হানযালি... (আরও অনেক নাম উল্লেখ করে বলেন), তাদের কাউকে এই বিষয়ে আমি মতভেদ করতে দেখিনি যে, দ্বীন (তথা ঈমান) হলো মুখের স্বীকারোক্তি ও আমল (অন্তরের সত্যায়ন এবং বাহ্যিক আমল) (الدين قول وعمل)।'[২৬৪]

মুহাক্কিক হানাফি ইমামগণের মতামত : প্রথম যুগের হানাফি ইমামদের মতামতও জমহুর আহলে সুন্নাত এবং ইমাম আজমের মতামতের মতোই। বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রেখে এ সম্পর্কে হানাফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিছু ইমামের বক্তব্য আমরা নিচে তুলে ধরছি :

- ইবরাহিম ইবনে তাহমান (১৬৩ হি.) বলেন, 'ঈমান হলো গোপনে ও প্রকাশ্যে সত্যায়ন করা।' উল্লেখ্য, প্রকাশ্যে সত্যায়ন হলো স্বীকৃতি। ইমামের শাগরেদ হাফস ইবনে আবদুর রহমান (১৯৯ হি.) বলেন, 'আমাদের কাছে ঈমান হলো স্বীকৃতি ও সত্যায়ন।' ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল আর-রাযি (২৪৮ হি.) বলেন, 'ঈমান হলো স্বীকৃতি ও সত্যায়ন।' ইমাম মাতুরিদির শায়খ নুসাইর ইবনে ইয়াহইয়া বলখি (২৬৮ হি.) বলেন, 'ঈমান হলো অন্তরে স্বীকৃতি দেওয়া, মুখে সেটার সত্যায়ন করা' (إقرار بالقلب وتصديق باللسان)। ইমাম আজমের শাগরেদ হাফস ইবনে আবদুর রহমানের ছাত্র আহমদ ইবনে হরব (২৩৪ হি.) বলেন, 'ঈমান হলো সত্যায়ন ও স্বীকৃতি। ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি নেই। আমল হচ্ছে শরিয়ত।' হাফস ইবনে আবদুর রহমানের আরেক ছাত্র আইয়ুব নিশাপুরি (২৫১ হি.) বলেন, 'আমাদের কাছে ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন। আমল হচ্ছে শরিয়ত। ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি নেই; আমলের হ্রাসবৃদ্ধি আছে।'[২৬৫] এখানে দেখা যাচ্ছে স্বয়ং ইমাম আজম, তাঁর সরাসরি শাগরেদগণ, তাঁর শাগরেদগণের শাগরেদ সকলের মতে, ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন। প্রথম যুগের কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত করেননি।

- অতঃপর এলেন আহলে সুন্নাতের আকিদার ইমাম আবু জাফর তহাবি। ঈমানের পরিচয়ে তিনি বলেন, 'ঈমান হলো : মুখে স্বীকার করা, অন্তরে সত্যায়ন

২৬৪. উসুলু ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালাকায়ি (১/১৯৩)।
২৬৫. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১০৬-১০৮)।

করা' (الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان)।[২৬৬] এখানে ইমাম তহাবি মুখের স্বীকারোক্তিকে বরং অন্তরের সত্যায়নের আগে এনেছেন। এর মাধ্যমে তিনি যেন ঈমানকে স্রেফ 'সত্যায়ন' মনে করার ধারণার খণ্ডন করলেন আর ইমাম আজম এবং তাঁর শীর্ষ দুই শাগরেদ আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের আকিদা যে ঈমান দুটোর সমন্বয়ে সেটা প্রমাণ করলেন।

- আবু হাফস বুখারি লিখেন, 'আহলে সুন্নাতের বৈশিষ্ট্য হলো এই আকিদা রাখা যে, ঈমান দুটো অঙ্গের মাধ্যমে সংঘটিত হয় : এক. অন্তর (সত্যায়ন), দুই. মুখ (স্বীকৃতি)। সুতরাং কেউ অন্তরে আল্লাহকে জানা সত্ত্বেও যদি মুখে স্বীকৃতি না দেয়, তবে সে কাফের। আবার কেউ মুখে স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও যদি অন্তরে বিশ্বাস না করে, তবে সে মুনাফিক। হ্যাঁ, যদি কোনো ওজরের কারণে মুখে স্বীকৃতি দিতে না পারে, সেটা ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু ওজর ছাড়া স্বীকৃতি না দিলে সে আল্লাহর কাছেও কাফের গণ্য হবে।'[২৬৭] এটা কেবল আবু হাফস নয়, আহলে সমরকন্দের বিপরীতে বুখারার সকল মাশায়েখের মত।

- আবুল লাইস সমরকন্দি (৩৭৫ হি.) বলেন, 'ঈমান হলো মুখের স্বীকারোক্তি এবং অন্তরের সত্যায়ন। সুতরাং কেউ যখন অন্তর দিয়ে সত্যায়ন করবে এবং মুখে স্বীকার করবে, সে মুমিন গণ্য হবে। কিন্তু কেউ যদি অন্তরে সত্যায়ন করে, কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মুখে স্বীকার না করে, তবে সে মুমিন গণ্য হবে না (وإذا صدقه بقلبه ولم يقرّ بلسانه وهو في الإمكان من الإقرار فإنه لا يصير مؤمنا)। একইভাবে কেউ যদি মুখে স্বীকার করে কিন্তু অন্তরে সত্যায়ন না করে, তবে সেও মুমিন গণ্য হবে না।'[২৬৮]

- মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখি (৪১৯ হি.) বলেন, 'ঈমান হলো মুখে স্বীকৃতি দেওয়া, অন্তরে সত্যায়ন করা—আল্লাহ তায়ালা এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর সকল সিফাত মেনে নেওয়া। আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, নবি-রাসুল, পরকাল, পুনরুত্থান, তাকদিরের ভালোমন্দ, জান্নাত-জাহান্নাম এবং আল্লাহর সকল বিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।' বলখি আরও লিখেন, 'ঈমান

---

২৬৬. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২১)।

২৬৭. আস-সাওয়াদুল আজম (৫,৭, ৩৮-৩৯)।

২৬৮. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার (আবসাত), সমরকন্দি (১৪-১৫)।

দুটো অঙ্গের ভিত্তিতে সংঘটিত হয় : এক. অন্তর, দুই. মুখ... ফলে যে ব্যক্তি বলবে ঈমান মুখের নয়, স্রেফ অন্তরের বিষয়, সে খবিস জাহমি' (ومن قال بأن الإيمان بالقلب دون اللسان فهو جهمي خبيث)।[২৬৯]

- আবু শাকুর সালেমি (৪৬০ হি.) বলেন, (ঈমানের সংজ্ঞার্থের ক্ষেত্রে) 'সবচেয়ে বিশুদ্ধ কথা হলো—মুখের স্বীকৃতি এবং অন্তরের সত্যায়ন ঈমানের রুকন। এটা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বক্তব্য' (والأصح أن نقول إن ركن الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالقلب وهو قول أبي حنيفة)।[২৭০]

- শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি (৪৮৩ হি.) বলেন, 'ঈমানের ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো অন্তরের সত্যায়ন। এটা কোনো অবস্থাতেই ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। এমনকি ঈমান ছাড়তে কেউ বাধ্য করলেও অন্তরের সত্যায়ন পরিত্যাগ করা যাবে না (কারণ, অন্তরের সত্যায়ন পরিত্যাগে কাউকে বাধ্য করা যায় না)। সুতরাং এমন অবস্থাতেও যদি কেউ অন্তরের সত্যায়ন পরিত্যাগ করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। অন্তরের সত্যায়নের সঙ্গে মুখের স্বীকৃতিও ঈমানের একটি রুকন। এটা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই (والإقرار باللسان ركن فيه مع التصديق بالقلب في أحكام الدنيا والآخرة جميعا)। অর্থাৎ, অন্তরের সত্যায়ন সত্ত্বেও যদি মুখের স্বীকৃতি পরিত্যাগ করা হয়, তবে মানুষের দৃষ্টিতে যেমন কাফের হবে, আল্লাহর কাছেও কাফের গণ্য হবে।'[২৭১]

- ফখরুল ইসলাম বাযদাবি (৪৮২ হি.) একই কথা লিখেছেন, 'ঈমানের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় রয়েছে : এক. অন্তরের সত্যায়ন। এটা কখনোই ছাড়ার সুযোগ নেই। সুতরাং অন্তরের সত্যায়ন না থাকলে কুফর অনিবার্য। দুই. মুখের স্বীকৃতি। এটা সংযুক্ত রুকন। ওজরের কারণে এক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে। ফলে কেউ যদি বাধ্য হয়ে মুখের স্বীকৃতি না দেয়, তবে সেটা কুফর হবে না। কেননা, মুখ সত্যায়নের কেন্দ্র নয়। তবে বাধ্য হওয়া ছাড়া মুখের স্বীকৃতি পরিত্যাগ অন্তরের সত্যায়নের অনুপস্থিতি বোঝায়। সুতরাং প্রথমটার পরে এটাও রুকন হিসেবে সাব্যস্ত হবে। তাই যে ব্যক্তি অন্তরে সত্যায়ন করবে কিন্তু কোনো ওজর ব্যতীত মুখের স্বীকৃতি

---

২৬৯. আল-ইতিকাদ, বলখি (৯৮)।
২৭০. আত-তামহিদ, সালেমি (১০২)।
২৭১. উসুলুস সারাখসি (২/২৯০)।

বর্জন করবে, সে মুমিন হবে না (فمن صدق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن مؤمنا)। হ্যাঁ, কেউ যদি মুখের স্বীকৃতি দেওয়ার সময় না পায় কিন্তু অন্তরে সত্যায়ন থাকে, তবে সে মুমিন গণ্য হবে।'[২৭২]

■ সদরুল ইসলাম বাযদাবি (৪৯৩ হি.) একই কথা লিখেছেন। তাঁর কথা সারমর্ম হলো : 'ঈমানের শাব্দিক অর্থ সত্যায়ন। কিন্তু শরিয়তে ঈমান বলতে অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের সত্যায়ন দুটোই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ অর্থ : 'তাঁর মতো কিছু নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।' [শুরা : ১১] সুতরাং আমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর সকল গুণে বিশ্বাস করি। আমরা নবিদেরকে তাঁদের নবুওতের ক্ষেত্রে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা-কিছু নিয়ে এসেছেন, সেগুলোতে সত্যায়ন করি। ইসলামের সকল রুকনে বিশ্বাস রাখি। এ সবকিছু (মুখে) স্বীকার করি। ফলে ঈমানের অর্থ দাঁড়ায় : মুখের স্বীকৃতি এবং অন্তরের সত্যায়ন।'[২৭৩] তিনি অন্যত্র বলেন, 'আহলে সুন্নাতের কাছে ঈমান অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকৃতি। দুটোর প্রত্যেকটিই ভিত্তি (রুকন)। হ্যাঁ, যদি কোনো অক্ষমতা থাকে, যেমন বোবা থাকে কিংবা মুখে কুফরের উপর বাধ্য করা হয়, তবুও মুমিন থাকবে।'[২৭৪]

■ আবু ইসহাক সাফফার (৫৩৪ হি.) ঈমানের হাকিকতের ক্ষেত্রে ইমাম রহ.-এর বিশুদ্ধ মাযহাব অত্যন্ত জোরালোভাবে এবং একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি ঈমানকে কেবল 'সত্যায়ন' বলা আশআরিদের মাযহাব হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং সেটার খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন, 'ঈমান আনার জন্য অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকৃতি জরুরি। এটা ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য। ইমাম আবু আবদুল্লাহ এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের বর্ণনাতেও আবু হানিফা থেকে এটা প্রমাণিত। জাহম ইবনে সাফওয়ানের বিরুদ্ধে ইমাম আজমের মুনাযারা থেকেও এটা প্রমাণিত। আমি আমার দাদা আবু নসর সাফফারের লেখা দেখেছি : 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, সালাফের ফুকাহা সকলের মাযহাব ছিল—ঈমান

---

২৭২. উসুলুল বাযদাবি (৩৪)।
২৭৩. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৪৮)।
২৭৪. প্রাগুক্ত (১৫১)।

অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকৃতি।'[২৭৫] অতঃপর লেখক এ ব্যাপারে কুরআন থেকে বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেন।

- আবু হাফস উমর নাসাফি (৫৩৭ হি.) তাঁর বিখ্যাত আকায়েদ গ্রন্থেও ঈমানের সংজ্ঞায় অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকৃতি দুটোই উল্লেখ করেছেন।[২৭৬]

- আল্লামা কাসানি (৫৮৭ হি.) লিখেন, 'অন্তরের সত্যায়ন ঈমানের মৌলিক শর্ত। ফলে এটা ছাড়া কেউ মুখে স্বীকৃতি দিলে মুমিন হবে না। কিন্তু মুখের স্বীকৃতি রুকন কি না এ ব্যাপারে আলেমগণ মতবিরোধ করেছেন। অধিকাংশ মাশায়েখের কাছে (অন্তরের সত্যায়নের মতো) এটাও রুকন। কেউ কেউ এটাকে রুকন হিসেবে মানেননি। ...যথা—ইমাম মাতুরিদি এবং একদল মুতাকাল্লিম।'[২৭৭]

- আবুল মুনতাহা মাগনিসাভি (১০০০ হি) লিখেন, 'মুখের স্বীকৃতি ঈমানের রুকন। কারণ ঈমানের মূল কথা হলো স্বীকৃতি ও সত্যায়ন দু'টোই' (الإقرار ركن في الإيمان، لأن أصل الإيمان الإقرار والتصديق)।[২৭৮]

- মোল্লা আলি কারি (১০১৪ হি.) লিখেছেন, 'ঈমান হলো অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকৃতি। তবে এক্ষেত্রে তাসদিক তথা সত্যায়নটা হলো মূল রুকন—কখনো ছেড়ে দেওয়া যাবে না। বিপরীতে স্বীকৃতি হলো শর্ত অথবা সংযুক্ত রুকন—বাধ্যবাধকতা কিংবা ওজর থাকলে ছেড়ে দেওয়া যায়। ফলে যদি ওজর ছাড়া স্বীকৃতি না দেয়, তবে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি ওজর থাকে, তবে কাফের হবে না। ...শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি সকল ক্ষেত্রে স্বীকৃতিকে ঈমানের রুকন বলেন। বিপরীতে আবদুল্লাহ নাসাফি স্বীকৃতিকে স্রেফ দুনিয়ার বিধিবিধান প্রয়োগের শর্ত বলেন। এটা আশআরিদের কাছে গ্রহণযোগ্য বক্তব্য। আবু মনসুর মাতুরিদির মতও এটাই।'[২৭৯] আলি কারির বক্তব্যে ইমাম সারাখসির প্রভাব সুস্পষ্ট এবং তিনি এটাকেই অগ্রাধিকার দেন। পিছনে আমরা মাতুরিদি ও নাসাফির বক্তব্য উল্লেখ করেছি।

---

২৭৫. তালখিসুল আদিল্লাহ (৭০০-৭০২)।
২৭৬. দেখুন : শরহুল আকায়েদ (২৯১)।
২৭৭. আল মুতামাদ ফিল মুতাকাদ, (১২)।
২৭৮. শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১০৪)।
২৭৯. শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৮৫-৮৬)।

■ মোল্লা হুসাইন ইবনে ইস্কান্দার হানাফি (১০৮৪ হি.) লিখেন, 'ঈমানের শাব্দিক অর্থ সত্যায়ন। আর শরিয়তের পরিভাষায় ঈমান হলো, মুখে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তরে সেটা সত্যায়ন করা' (الإيمان شرعا إقرار باللسان وتصديق بالقلب بوحدانية الله)।[২৮০]

■ আবু সাইদ খাদেমি (১১৭৬ হি.) লিখেন, 'ঈমান সত্যায়ন ও স্বীকৃতির সমন্বয়। এটাই ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব।'[২৮১]

■ বরং নাসাফি যিনি তাঁর 'তামহিদ' ও 'তাবসিরাহ'-তে ঈমানকে স্রেফ অন্তরের সত্যায়নের কথা বলেছেন, তিনিই 'বাহরুল কালাম'-এ ভিন্ন আলোচনা করেছেন আর সেটাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য এবং তাঁর সর্বশেষ সিদ্ধান্তের দলিল। তিনি লিখেন, 'অধিকাংশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কাছে ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি এবং অন্তরের সত্যায়ন (الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب عند أكثر أهل السنة والجماعة)। শাফেয়ি রহ.-এর কাছে ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল। কাররামিয়্যাহদের মতে, ঈমান হলো স্রেফ স্বীকৃতি; অন্তরের সত্যায়ন নয়। আবু মনসুর মাতুরিদির কাছে ঈমান হলো স্রেফ সত্যায়ন (مجرد التصديق)।'[২৮২]

উপরের বক্তব্যে—খোদ নাসাফির কথা অনুযায়ী—ইমাম আজম এবং ইমাম মাতুরিদির বক্তব্যের অসামঞ্জস্যতা স্পষ্ট। মূলত এখান থেকেই বিবর্তনের সূচনা ঘটে, যা পরবর্তীকালে আরও বিস্তৃত হয়। ফলে মুখের স্বীকৃতিকে কখনো স্রেফ শর্ত বলা হয়; আর অধিকাংশ সময় ঈমানের সংজ্ঞার্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে ঈমানকে কেবল সত্যায়ন বলা হয়। অথচ এটা স্রেফ ইজতিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সালাফে সালেহিনের কারও থেকে 'ঈমান কেবল সত্যায়ন।'—এমন বক্তব্য প্রমাণিত নয়।

আলাউদ্দিন বুখারি (৭৩০ হি.) উসলুল বাযদাবির ব্যাখ্যাতে ইমাম আজমসহ হানাফি মাযহাবের প্রথম যুগের ইমামদের বক্তব্য এবং পরবর্তী যুগের আলেমদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন, 'আমাদের মুহাক্কিকদের

---

২৮০. আল-জাওহারাতুল মুনিফাহ ফি শরহি ওয়াসিয়্যাতিল ইমাম আবি হানিফা, হুসাইন ইবনে ইস্কান্দার হানাফি (৫২)।

২৮১. শরহুল ওয়াসিয়্যাহ (১৫৬)।

২৮২. বাহরুল কালাম, নাসাফি (৫৮, ৬৫, ১৫১-১৫২)।

মাযহাব হচ্ছে—ঈমান মূলত অন্তরের সত্যায়ন। মুখের স্বীকৃতি হলো পৃথিবীর বিধিবিধান প্রয়োগের শর্ত। ফলে কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মুখে স্বীকৃতি না দিলেও কেবল অন্তরে সত্যায়ন করলেই আল্লাহর কাছে মুমিন গণ্য হবে। হ্যাঁ, পৃথিবীর নিয়মে মুমিন গণ্য হবে না। ...বিপরীতে আমাদের অনেক আলেমদের মত হলো, ঈমান হচ্ছে অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকৃতি দুটোই। তবে পার্থক্য হলো, অন্তরের সত্যায়ন মূল রুকন, আর মুখের স্বীকৃতি অতিরিক্ত রুকন। প্রথমটাতে কোনো অবস্থাতেই ছাড়ের সুযোগ নেই। দ্বিতীয়টা বাধ্যবাধকতার পরিস্থিতিতে ছাড়ের সুযোগ আছে। ফলে তাদের মতে, কেউ যদি অন্তরে সত্যায়ন করে, কিন্তু কোনো ওজর ব্যতীত মুখে স্বীকৃতি না দেয়, তবে আল্লাহর কাছে মুমিন গণ্য হবে না এবং তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। এটা শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি এবং অনেক ফকিহের মত। এক্ষেত্রে তাদের দলিল হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন বাহ্যিক আয়াত। যেমন—রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদিস : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর। সর্বপ্রথম হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেওয়া। আর সে সাক্ষ্যই হলো মুখের স্বীকৃতি।[২৮৩]

এরপর আলাউদ্দিন বুখারি বিভিন্ন দলিলের মাধ্যমে পরবর্তী যুগের আলেমদের মতামতকে অগ্রাধিকার দেন। কেবল তিনি নন, অসংখ্য মুতাআখখিরিন তথা পরবর্তী যুগের হানাফি ফকিহদের বক্তব্য এটা। আলাউদ্দিন উসমান্দি লিখেন, 'মূল ঈমান হলো অন্তরের সত্যায়ন। মুখের স্বীকৃতি মানুষকে জানানোর জন্য, বাহ্যিক বিধান প্রয়োগের জন্য।'[২৮৪]

হাসকাফি লিখেন, 'ঈমান কেবল অন্তরের সত্যায়ন, নাকি মুখেরও স্বীকৃতি? বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। অধিকাংশ হানাফির মত হলো, এটা অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকৃতি দুটোই। কিন্তু মুহাক্কিকদের মত হলো, এটা স্রেফ অন্তরের সত্যায়ন। মুখের স্বীকৃতি দুনিয়ার বিধিবিধান প্রয়োগের শর্ত।'[২৮৫] হাসকাফি মুহাক্কিক বলতে সম্ভবত পরবর্তী সময়ের মুতাকাল্লিমদের উদ্দেশ্য নিয়েছেন। নতুবা ইমাম আজম থেকে শুরু করে আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, ইবরাহিম ইবনে তাহমান, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল রাযি, আবু হাফস বুখারি, আবু জাফর তহাবি, আবুল

---

২৮৩. কাশফুল আসরার, আলাউদ্দিন আবদুল আযিয বুখারি (১/১৮৫)।
২৮৪. দেখুন : লুবাবুল কালাম, উসমান্দি (পাণ্ডুলিপি : ৭৫-৭৬)।
২৮৫. রদ্দুল মুহতার (৪/২২১)।

লাইস সমরকন্দি, মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখি, আবু শাকুর সালেমি, শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি, ফখরুল ইসলাম এবং সদরুল বাযদাবি-সহ প্রথম যুগের সকল হানাফি ফকিহের মত এক ও অভিন্ন, যা আমরা পিছনে দেখিয়েছি। তারা মুহাক্কিক না হলে আর কে মুহাক্কিক হবেন? এজন্য তাফতাযানি লিখেন, 'ঈমানের আরেকটি অর্থ হলো, অন্তর ও মুখের কর্মের সমন্বয়। অর্থাৎ, অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকৃতি। এটাই অসংখ্য মুহাক্কিকের মত। আবু হানিফা রহ. থেকে এটাই বর্ণিত।'[২৮৬] স্রেফ প্রথম যুগের নয়, পরবর্তী যুগের মুহাক্কিকদের মতামতও তা-ই যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে এটাই হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত।

মতপার্থক্যের ফলাফল : প্রশ্ন হতে পারে, এই পার্থক্যের ফলাফল কী? উত্তরে বলা যেতে পারে, একদিক থেকে ফলাফল আছে, অন্যদিক থেকে নেই। যেদিক থেকে ফলাফল নেই সেটা হলো : উভয় মত অনুযায়ী, কেউ মুখে ঈমানের স্বীকৃতি দিলেই তাকে মুমিন মানতে হবে। ভিতরে সে মুনাফিক হলেও বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী ফয়সালা করে আমাদেরকে তার জানাযা ও কাফন-দাফন করতে হবে। কারণ, ভিতরের অবস্থা আমাদের জানা নেই, যেমনটা ইমাম আজম রহ. নিজেই বলেছেন, **'আমরা মানুষেরা মানুষকে মুমিন ও কাফের সাব্যস্ত করব বাহ্যিক স্বীকারোক্তি, মিথ্যাচার, পোশাক-আশাক ও ইবাদত দেখে। ...কারণ, মানুষের অন্তরের খবর রাখা আমাদের দায়িত্ব নয়। আমাদের কেবল বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করেই কাউকে মুমিন কিংবা কাফের বলা, ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্তরের খবর রাখবেন আল্লাহ তায়ালা।'**[২৮৭] বিপরীতে (কোনো ওজর ছাড়া) মুখের স্বীকৃতি পরিত্যাগ করলে উভয়ের মত অনুযায়ীই দুনিয়ার ক্ষেত্রে তার সঙ্গে কাফেরের আচরণ করা হবে। ফলে এক্ষেত্রেও মতভেদের কোনো ফলাফল নেই। রইল অন্তরের সত্যায়ন এবং আল্লাহর কাছে মুমিন থাকার বিষয়টা। এটা সকল ক্ষেত্রেই আমাদের অজ্ঞাত। মুখে স্বীকৃতি দিলেও ভিতরে মুনাফিক হয়ে জাহান্নামে যেতে পারে; আবার (ওজর কিংবা সামর্থ্যের অভাবে) মুখে স্বীকৃতি না দিয়েও ভিতরের সত্যায়নের কারণে জান্নাতে যেতে পারে। ফলে এটা আল্লাহর কাছে থাকবে। কে অন্তরে সত্যায়ন করে আল্লাহর কাছে মুমিন গণ্য হলো, আর কে সত্যায়ন না করে আল্লাহর কাছে মুনাফিক গণ্য হলো, সেটা আমাদের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ফলে ইমাম আজম এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের কথা মানলেও

---

২৮৬. শরহুল মাকাসিদ (২/২৪৮)।

২৮৭. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২২)।

আমাদের বাহ্যিক অবস্থা তথা মুখের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আবার ইমাম মাতুরিদি এবং তাঁর মতের অনুসারী আলেমদের কথা মানলেও মুখের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। অন্তরের বিষয়টা উভয় অবস্থাতে আল্লাহর কাছেই সমর্পিত থাকছে। এ হিসেবে তাদের মতপার্থক্যের ফলাফল নেই। ইমাম আজম রহ. এটা স্পষ্ট করেন আবু মুকাতিল সমরকন্দির প্রশ্নের জবাবে। তিনি লিখেন, **'সত্যায়নের ক্ষেত্রে মানুষ তিন প্রকারের : একদল আল্লাহকে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা-কিছু এসেছে সবকিছু মুখে এবং অন্তরে উভয়ভাবেই সত্যায়ন করে। তারা আল্লাহ এবং মানুষ সবার কাছেই মুমিন হিসেবে গণ্য। আরেক দল মুখে সত্যায়ন করে, কিন্তু অন্তরে প্রত্যাখ্যান করে। তারা আল্লাহর কাছে কাফের, কিন্তু মানুষের কাছ মুমিন হিসেবে গণ্য। কারণ, মানুষ তাদের অন্তরের খবর জানে না। আর সেটা জানা জরুরিও না। মানুষের কাজ বাহ্যিক অবস্থা দেখে ফয়সালা করা। আরেক দল অন্তরে সত্যায়ন করে, কিন্তু তাকিয়্যাহ (তথা ওজরের কারণে) মুখে প্রত্যাখ্যান করে। এরা আল্লাহর কাছে মুমিন হিসেবে গণ্য, কিন্তু বাহ্যিক কুফরির কারণে মানুষের কাছে কাফের হিসেবে গণ্য।'**[২৮৮]

কিন্তু দিয়ানাতান (অর্থাৎ আখেরাতকেন্দ্রিক) ফলাফল আছে। একজন মানুষ যখন জানবে মুখের স্বীকৃতি রুকন—এটা ছাড়া ঈমান আল্লাহর কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে না, তখন সে ঈমান আনার সময় যেভাবেই হোক মুখের স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করবে। বিপরীতে যখন সে ধরে নেবে মুখের স্বীকৃতি দেওয়া ঈমানের রুকন নয়, আখেরাতের দিক থেকে এটা দেওয়া না-দেওয়া সমান, তখন সে হয়তো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করবে না। এভাবে (প্রথম মত বিশুদ্ধ হওয়ার ফলে) সে পরকালে ঈমান ও মুক্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারে। বরং স্বীকৃতির অভাবে পৃথিবীতেও বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে। এটা কখনো কখনো পার্থিব ক্ষেত্রেও প্রভাবক হতে পারে। বাহ্যিক স্বীকৃতিকে ঈমানের কেবল শর্ত মনে করে পরিত্যাগ করাতে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জানাযা, দোয়া এবং মুসলমানদের দাফন থেকে বঞ্চিত হতে পারে। বিয়ে-শাদির ক্ষেত্রে নানা সংকটের সম্মুখীন হতে পারে। ফলে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক স্বীকৃতি না দেওয়া মূলত জীবনের নানা জটিলতা ও সংকটকে জিইয়ে রাখা, যা শেষ পর্যন্ত আখেরাতকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

---

২৮৮. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৩)।

তা ছাড়া, এই মতপার্থক্যের আরেকটি মারাত্মক ক্ষতি হলো সালাফের সম্মিলিত মাযহাব পরিত্যক্ত হয়ে খালাফের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যেমন আমরা পিছনে দেখেছি আহলে সুন্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের মতে, ঈমান অন্তরের সত্যায়ন, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের সমন্বিত রূপ। তিনটিই গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে ইমাম আজম রহ. যদিও তাত্ত্বিকভাবে আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না (প্রায়োগিকভাবে করেন), কিন্তু মুখের স্বীকৃতিকে তিনি কখনোই নাকচ করেননি। ফলে তিনি আল-ফিকহুল আকবার, আল-ফিকহুল আবসাত এবং আল-ওয়াসিয়্যাহ—সবগুলো গ্রন্থে ঈমানের সংজ্ঞার্থে মুখের স্বীকৃতির কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। বরং প্রত্যেকটি জায়গায় তিনি মুখের স্বীকৃতিতে অন্তরের সত্যায়নের আগে উল্লেখ করেছেন যাতে কেউ এটাকে ছোট মনে না করে। অতঃপর ইমামের সরাসরি ছাত্রগণ, ছাত্রগণের ছাত্র সকলে একই পথে একই মতে ছিলেন। কেউ এ ব্যাপারে ইমামের বক্তব্যের বিরোধিতা করেননি। এরপর আসেন ইমাম তহাবি। তিনিও তাঁর ওস্তাদগণের অনুসরণে সুস্পষ্ট ভাষায় ঈমানকে মুখের স্বীকৃতি আর অন্তরের সত্যায়ন বলেছেন এবং তিনিও ইমামের অনুসরণে মুখের স্বীকৃতিকে আগে রেখেছেন। পরবর্তীকালে সমরকন্দি, সারাখসি ও বাযদাবির মতো মুহাক্কিকগণ একই পথে হেঁটেছেন। এই বিশাল জামাত এবং প্রথম যুগের সম্মানিত ইমামগণের মতের বিপরীতে ক্ষুদ্র একদল হানাফি মুতাকাল্লিম ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তাদের মধ্যে যারা মুখের স্বীকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা অন্তরের সত্যায়নের পরে নিয়ে গিয়েছেন। আরেক দল মুখের স্বীকৃতিকে সম্পূর্ণ উহ্য করে ফেলেছেন। ঈমান বলতে স্রেফ 'সত্যায়ন' (তাসদিক) বলেছেন। অথচ এটা ইমাম আজমসহ সালাফের সকলের মাযহাবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ফলে মতপার্থক্যের ফলাফল স্পষ্ট।

মোটকথা, মুখের স্বীকৃতিকে রুকন বলা হোক কিংবা শর্ত বলা হোক সেটা গৌণ বিষয়, জরুরি হলো এটাকে সর্বাবস্থায় ঈমানের সংজ্ঞার্থের অন্তর্ভুক্ত করা। ঈমানকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে ইমাম আজমের বক্তব্য সুরক্ষিত রাখা এবং এর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকা।

মুসলিম হওয়ার জন্য কালিমা পড়া জরুরি কি না?

ঈমানের সংজ্ঞার্থের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য উল্লেখের পর একটি জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। সেটা হলো : একজন অমুসলিম যখন মুসলিম

হতে চাইবে, তার ইসলাম গ্রহণের প্রক্রিয়া কী হবে? তাকে মুখে কী সাক্ষ্য দিতে হবে এবং কীভাবে দিতে হবে?

এক্ষেত্রে ইমাম আজমের সরাসরি কোনো বক্তব্য নেই। তবে ফুকাহায়ে আহনাফের লম্বা আলোচনা রয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি মনে রাখতে পারলে পুরো বিষয়টা ক্ষুদ্রাকারে বোঝা সহজ। সেটা হলো : সকলের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সাক্ষ্য এক নয়। বরং ব্যক্তির অবস্থাভেদে, অস্বীকৃতি ও অবিশ্বাসের মাত্রাভেদে সাক্ষ্যদান এবং তার পূর্ব বিভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্নতার ঘোষণার উপর নির্ভরশীল হবে।

নাস্তিক্যবাদ থেকে মুসলিম হওয়া : কেউ যদি আল্লাহ ও রাসুল দুজনকেই অস্বীকার করে, যথা—নাস্তিক, তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' তথা সম্পূর্ণ কালিমার শাহাদাহ (সাক্ষ্য) দিতে হবে, কিংবা কালিমার প্রথমাংশ অথবা শেষাংষের সাক্ষ্য দিলেও যথেষ্ট হবে। কারণ, সে তাওহিদ ও রিসালাত দুটোকেই অস্বীকার করে। ফলে যেকোনো একটার স্বীকৃতির মাধ্যমে বোঝা যাবে অন্যটারও স্বীকৃতি দিয়েছে।

পৌত্তলিকতা থেকে মুসলিম হওয়া : যদি কেউ আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে কিন্তু তার তাওহিদকে অস্বীকার করে, যথা—পৌত্তলিক ও অগ্নিপূজারী সম্প্রদায়, তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্য দিলে মুসলিম হয়ে যাবে। রিসালাতের সাক্ষ্য 'যিমনান' (তাওহিদের সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে) আদায় হয়ে যাবে। কারণ, এমন ব্যক্তি যখন তাওহিদের সাক্ষ্য দিলো, বোঝা গেল, রিসালাতের সাক্ষ্যও রয়েছে তার কাছে।

নবুওত অস্বীকার থেকে মুসলিম হওয়া : যারা আল্লাহকে স্বীকার করে এবং তাওহিদে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু নবুওতকে অস্বীকার করে, তাদের মুসলিম হওয়ার জন্য 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' তথা নবিজির নবুওত ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিতে হবে।

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মুসলিম হওয়া : যারা মোটাদাগে আল্লাহর একত্ববাদ, নবিদের নবুওত ও রিসালাতে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু আমাদের রাসুল (ﷺ)-কে অস্বীকার করে, যথা—ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়, তাদের স্রেফ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' সাক্ষ্য দিলেই হবে না, বরং নিজেদের ভ্রান্ত ধর্ম থেকে মুক্ত থাকার ঘোষণা করতে হবে। কেননা, তাদের অনেকে আল্লাহকে মানে,

রাসুলুল্লাহর (ﷺ) রিসালাতও সত্য মনে করে। কিন্তু তাদের ধারণা—তিনি কেবল আরবদের নবি। ফলে এমন ধারণা বর্জন করতে হবে। এ কারণে ইমাম আজম রহ. থেকে বর্ণিত আছে, **"যদি কোনো ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান বলে, 'আমি মুসলিম', তবে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে মুসলিম বলা হবে না। বরং জিজ্ঞাসা করতে হবে, তোমার উদ্দেশ্য কী? যদি বলে 'আমার উদ্দেশ্য ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করা', তবে সে মুসলিম। আর যদি উদ্দেশ্য থাকে তার নিজের ধর্মকে আল্লাহর মনোনীত ইসলাম ঘোষণা করা, তবে সে মুসলিম নয়।"** তবে এই জিজ্ঞাসাবাদ পার্থিব বিধিবিধান প্রয়োগের জন্য। নতুবা কেউ যদি নিজেকে মুসলিম ঘোষণা করে, এটুকুই যথেষ্ট। তার অন্তরের হিসাব আল্লাহ তায়ালার উপর থাকবে।

এটা মুখের ঘোষণার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক মূলনীতি। সাধারণভাবে কালিমা শাহাদাহ পড়েই ইসলামে প্রবেশ করা যায়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে মুখে শাহাদাহ ছাড়াও ইসলামে প্রবেশ করা সম্ভব। অর্থাৎ, এমন কোনো কাজের মাধ্যমেও মুসলিম হওয়া যায় যেটা শাহাদাহর প্রমাণ। যেমন—কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমানদের জামাতের নামাযে শরিক হয়, তবে তাকে মুসলিম গণ্য করা হবে। কারণ, নামাযে বারবার তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিতে হয়। পাশাপাশি নামায আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর মনোনীত দ্বীনের ভিত্তি। ফলে সে মুসলিম না হলে জামাতে নামায পড়ত না। নামায পড়াই প্রমাণ করে, সে মুসলিম। হয়তো কোনো অক্ষমতার কারণে মুখে স্বীকৃতি দিতে পারছে না। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদিসও এ কথার সাক্ষী। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের জানাযায় শরিক হবে, আমাদের কিবলার দিকে ফিরে নামায পড়বে, আমাদের যবাই করা পশু খাবে, তার জন্য তোমরা ঈমানের সাক্ষ্য দেবে।'[২৮৯]

ঈমান ও ইসলামের আন্তঃসম্পর্ক

ঈমান শব্দের শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস করা, সত্যায়ন করা। অপরদিকে ইসলাম অর্থ হলো আত্মসমর্পণ করা, আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করা। অন্যকথায়, ইসলাম অর্থ হলো—আল্লাহর সকল বিধান, হালাল-হারাম, ফরয-ওয়াজিবের প্রতি সন্তুষ্ট ও অনুগত থাকা; আল্লাহর শরিয়তের উপর কোনো আপত্তি না থাকা। এ হিসেবে ইসলাম ও ঈমানের মাঝে পার্থক্য আছে। একইভাবে ঈমানের জায়গা

২৮৯. দেখুন : বাদায়েউস সানায়ে, কাসানি (৭/১০৩-১০৪)। রদ্দুল মুহতার (৪/২২৬-২২৯)। হাদিসটি দেখুন : বুখারি (কিতাবুস সালাত : ৩৯১)।

হলো হৃদয়। মুখ সেটার মুখপাত্র। অন্যদিকে ইসলামের জায়গা মানুষের হৃদয়, মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবকিছু। এ হিসেবেও দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ অর্থ : 'বেদুইনরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম। বলুন, তোমরা ঈমান আনোনি; বরং তোমরা বলো, আমরা (বাহ্যিক) আত্মসমর্পণ করেছি। কারণ, ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।' [হুজুরাত : ১৪] প্রসিদ্ধ হাদিসে জিবরিলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিবরাইল আ. ঈমান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, ঈমান হলো আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসুল, পরকাল এবং তাকদিরের ভালোমন্দে বিশ্বাস করা। ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলে রাসুল বললেন, ইসলাম হলো, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসুল।'—এ সাক্ষ্য দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লাহর হজ করা।[২১০]

এসব আয়াত ও হাদিসের ভিত্তিতে ভ্রান্ত মুতাযিলা ও রাফেযি সম্প্রদায় মনে করে ঈমান ও ইসলাম আলাদা। ফলে তাদের কাছে কবিরা গুনাহকারী মুসলিম, কিন্তু মুমিন নয়। তাই কেউ যদি দরিদ্র 'মুমিনদের' সদকা দেওয়ার ওসিয়ত করে, তবে—তাদের মতে—কবিরা গুনাহকারী কিংবা আহলে সুন্নাতের লোকজন অন্তর্ভুক্ত হবে না। তারা সদকা পাবে না! কেবল শিয়া ও মুতাযিলারা পাবে। বিপরীতে যদি দরিদ্র মুসলমানদের সদকা দেওয়ার ওসিয়ত করে, তবে আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত সবাই পাবে।[২১১]

এটা গলত বক্তব্য। কারণ, উপরের আয়াত ও হাদিসে ঈমান ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য বোঝা গেলেও এবং তাত্ত্বিকভাবে পার্থক্য থাকলেও কার্যত ও মৌলিক পার্থক্য নেই। আল্লাহ তায়ালার বাণী : ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۝﴾ অর্থ : 'সে জনপদে যারা মুমিন ছিল, আমি তাদের উদ্ধার করেছিলাম। তবে সেখানে একটি ঘর ব্যতীত আর কোনো মুসলিম আমি পাইনি।' [যারিয়াত : ৩৫-৩৬] এখানে একটি ঘর তথা লুত আ. এবং তাঁর

২১০. মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ৮)। বুখারি (কিতাবুল ঈমান : ৫০)।
২১১. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৫৭)।

পরিবারকে একবার মুমিন আবার তাদেরকেই মুসলিম বলা হয়েছে। বোঝা গেল, মুসলিম ও মুমিন অভিন্ন বিষয়।

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা মুসা আ.-এর ভাষায় বলেন, ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوۡمِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيۡهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسۡلِمِينَ﴾ অর্থ : 'মুসা বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকো, তবে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর করো যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো।' [ইউনুস : ৮৪] এখানেও মুমিন ও মুসলিম ভিন্ন অর্থে বোঝালেও মৌলিকভাবে এক বলা হয়েছে। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿يَمُنُّونَ عَلَيۡكَ أَنۡ أَسۡلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسۡلَٰمَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيۡكُمۡ أَنۡ هَدَىٰكُمۡ لِلۡإِيمَٰنِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾ অর্থ : 'তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনার উপকার করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমার উপকার করোনি; বরং আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদের অনুগ্রহ করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকো।'[হুজুরাত : ১৭] এখানেও ঈমান ও ইসলামকে সমার্থক বানানো হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ (١٣٦)﴾ অর্থ : 'তোমরা বলে দাও যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সেই বাণীর প্রতি যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে, আর যা ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের সন্তানদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা দেওয়া হয়েছিল মুসা ও ঈসাকে, যা অন্যান্য নবিকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল। আমরা নবিগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই অনুগত (মুসলিম)।' [বাকারা : ১৩৬] এখানেও যারা মুমিন, তারাই মুসলিম।

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষকে কেবল দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ فَمِنكُمۡ كَافِرٞ وَمِنكُم مُّؤۡمِنٞۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ অর্থ : 'তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের কেউ কাফের হয়েছে, কেউ মুমিন। তোমরা যা করো আল্লাহ সব দেখেন।' [তাগাবুন : ২] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُواْ مُسۡلِمِينَ﴾ অর্থ : 'যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে, আর যারা মুসলিম।' [যুখরুফ : ৬৯] আরও বলেন, ﴿وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِي ٱلۡعُمۡيِ عَن ضَلَٰلَتِهِمۡۖ إِن تُسۡمِعُ إِلَّا مَن يُؤۡمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُم مُّسۡلِمُونَ﴾ অর্থ : 'আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে সুপথে আনতে পারবেন না। আপনি শোনাতে পারবেন

কেবল তাদের যারা আমার নিদর্শনাবলিতে বিশ্বাস করে। আর তারাই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)।' [নামল : ৮১]

সুতরাং মৌলিকভাবে ঈমান ও ইসলাম একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে—যেমনটা ইমাম বলেছেন—**'ইসলাম ছাড়া ঈমান হয় না, আবার ঈমান ছাড়া ইসলাম পাওয়া যায় না। উভয়ে যেন একই (মুদ্রার) এপিঠ-ওপিঠ।'**[২৯২] কারণ, ঈমান হলো অন্তরে আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও উলুহিয়্যাহর সত্যায়ন করা এবং মুখে সেটার স্বীকৃতি দেওয়া। কেউ যখন এটা করবে, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সে আল্লাহর বিধিবিধানের প্রতি আত্মসমর্পিত এবং তাঁর শরিয়তের সামনে নতশির হয়ে যাবে। আবার কেউ আল্লাহর বিধানের প্রতি তখনই নতশির ও শ্রদ্ধাশীল হয়, যখন তার মনে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, সত্যায়ন ও স্বীকৃতি থাকে। ফলে মুসলিম হওয়া ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না, মুমিন হওয়া ছাড়া মুসলিম হওয়া যায় না।

এটা কেবল ইমাম আজম নয়, সালাফের অনেক বড় বড় ইমামেরও বক্তব্য। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইমাম বুখারি। তিনি ঈমান ও ইসলামকে সমার্থক মনে করতেন। ইমাম আজমের মতো তাঁরও বক্তব্য হলো, ঈমান ও ইসলামের সমন্বয়ে দ্বীন গঠিত। হাদিসে জিবরিল, আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল-সংক্রান্ত বর্ণনাসহ বিভিন্ন হাদিসে ঈমান ও ইসলামের সমার্থক হওয়া এবং একটার জায়গায় অন্যটার ব্যবহার লক্ষণীয়। অর্থাৎ, হাদিসে জিবরিলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বিশ্বাস-সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে ঈমান এবং আমলসংক্রান্ত বিষয়গুলোকে ইসলাম বললেও আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দলকে ঈমানের কথা বলার সময় নামায, রোযা, যাকাত ও গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর পথে দেওয়াকেও ঈমানের সংজ্ঞার্থে উল্লেখ করেছেন।[২৯৩] আর এটা বোঝা সহজ। কারণ, মুহাদ্দিসদের কাছে আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর ইসলাম হলো আমলের নাম। ফলে ঈমান ও ইসলামকে সমার্থক বলাই স্বাভাবিক। কেবল বুখারি নন, মালেক, শাফেয়ি, মুহাম্মাদ ইবনে নসর আল-মারওয়াযি, ইবনে মানদাহ, ইবনে আবি শাইবাসহ আহলে সুন্নাতের অসংখ্য বড় বড় ইমাম থেকে দুটোর সমার্থক হওয়ার বক্তব্য প্রমাণিত।[২৯৪]

---

২৯২. আল-ফিকহুল আকবার (৬)।

২৯৩. বুখারি (কিতাবুল ঈমান : ৫৩)।

২৯৪. দেখুন : আত-তামহিদ, ইবনে আবদিল বার (৫/২৪৭)। ফাতহুল বারি (১/১১৫)।

ইমাম আজম রহ. এবং সালাফের অনুসরণে সকল হানাফি আলেম এক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তাদের সকলের মতে, ঈমান ও ইসলামের মাঝে মৌলিক পার্থক্য নেই। দুটো একই বস্তু। ভিন্ন ভিন্ন নাম, কিন্তু মৌলিকভাবে সমার্থক কাছাকাছি শব্দ। প্রত্যেক মুমিন মুসলিম, আবার প্রত্যেক মুসলিম মুমিন। কারণ, আল্লাহর একত্ববাদের পূর্ণ সাক্ষ্য, আল্লাহর নির্দেশ ও বিধিবিধানের প্রতি আনুগত্য, আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব—এ সবকিছু দুটোর মাঝে অন্তর্ভুক্ত।[২৯৫]

মাতুরিদি লিখেন, "আমাদের মতে উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রেখে ঈমান ও ইসলাম এক। হ্যাঁ, মুখের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটোর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন কাফেরকে 'মুসলিম' বললে তারা মেনে নেয় না, কিন্তু 'বিশ্বাসী' (মুমিন) বললে মেনে নেয়। স্বাভাবিক ইসলাম বললে দ্বীন বোঝায়, ঈমান বললে সেটা বোঝায় না। এ জন্য 'দার'-এর প্রকরণে 'দারুল ইসলাম' বলা হয়, 'দারুল ঈমান নয়'। কিন্তু উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, ঈমান হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ, কর্তৃত্ব, ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া, তাঁর লা শরিক ইলাহত্বকে মেনে নেওয়া; ইসলামও হলো তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্পিত হওয়া। ফলে দুটোর উদ্দেশ্য ও গন্তব্য এক।"[২৯৬]

মোটকথা, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর উম্মত হওয়ার জন্য মুমিন ও মুসলিম দুটোই হতে হবে। কেউ ইসলাম পরিত্যাগ করে মুমিন হতে পারবে না; আবার কেউ ঈমান পরিত্যাগ করে মুসলিম হতে পারবে না। যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহকে বিশ্বাস ও আমল দুটোর মাধ্যমেই গ্রহণ করবে, সে মুমিন ও মুসলিম দুটোই। ইমাম আজম বলেন, **"যদিও এগুলোর নাম ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু মূলকথা এক (أسماء مختلفة ومعناها واحد), আর তা হলো ঈমান। মানুষকে যেমন 'রাজুল', 'ইনসান', ফুলান' বিভিন্ন নামে বোঝানো যায়, ঈমানকেও বিভিন্ন নামে বোঝানো হয়।"**[২৯৭] মাতুরিদি লিখেন, "বাস্তব ফলাফলের ক্ষেত্রে দুটোর মাঝে পার্থক্য নেই। 'ইনসান' (মানুষ), 'ইবনে আদম' (আদম সন্তান), 'রাজুল' (লোক), 'ফুলান' (জনৈক ব্যক্তি)-এর সম্পর্ক যেমন, 'ঈমান' ও 'ইসলাম'-এর সম্পর্ক তেমন। বাহ্যিক অর্থে পার্থক্য আছে, মূল

---

২৯৫. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১০৯৫)।

২৯৬. আত-তাওহিদ (২৮৪)।

২৯৭. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৪)।

উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে অভিন্ন। একটি পাওয়া গেলে অন্যটিও পাওয়া যায়। একটি না থাকলে অন্যটিও থাকে না।”[২৯৮]

এ ব্যাপারে অধমের বক্তব্য হলো—ঈমান ও ইসলাম দুটো শাব্দিকভাবে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র শব্দ। অর্থাৎ, শাব্দিকভাবে দুটোর অস্তিত্ব ভিন্ন। অর্থের ক্ষেত্রেও মৌলিকভাবে দুটোর অর্থ ভিন্ন। ফলে এ দুটোর ভিন্নতা অনস্বীকার্য। তবে শরিয়তে এ দুটোকে কোথাও ভিন্নার্থে, আবার কোথাও সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَ اِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ অর্থ : ‘বেদুইনরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম। বলুন, তোমরা ঈমান আনোনি; বরং তোমরা বলো, আমরা (বাহ্যিক) আত্মসমর্পণ (ইসলাম গ্রহণ) করেছি। কারণ, ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।’ [হুজুরাত : ১৪] এখানে ঈমান ও ইসলামকে আলাদা করা হয়েছে। অথচ অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝﴾ অর্থ : ‘সে জনপদে যারা মুমিন ছিল আমি তাদের উদ্ধার করেছিলাম। সেখানে একটি ঘর ব্যতীত আর কোনো মুসলিম আমি পাইনি।’ [যারিয়াত : ৩৫-৩৬] এখানে দুটোকে এক ও অভিন্ন বলা হয়েছে। একইভাবে ‘হাদিসে জিবরিলে’ দুটোকে আলাদা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ ‘আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দলের’ হাদিসে দুটোকে এক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, দুটো পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একটি অপরটির পরিপূরক। দুটোর সমন্বয়ে দ্বীন। ফলে প্রসঙ্গ দেখে এর অর্থ নির্ধারিত হবে। মূল অর্থের দিকে তাকালে দুটোকে আলাদা বলতে হবে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে দ্বীনের সকল বিষয় বোঝানোর জন্য একটাকে ব্যবহার করলে অন্যটাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, ইমাম আজম রহ. এবং হানাফি আলেমদের ঈমান ও ইসলামকে সমার্থক বলা জমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের সঙ্গে ঈমানের সংজ্ঞার্থে তাদের মৌলিক মতপার্থক্য না থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। অর্থাৎ, জমহুরের কাছে আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর বাহ্যিক আমলকে কুরআন-সুন্নাহতে ইসলাম বলা হয়েছে। সুতরাং যখন ঈমান ও ইসলামকে সমার্থক বলা হলো, তখন তারাও আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন প্রমাণিত হলো। এভাবে তাদের মাঝে আর জমহুরের মাঝে মৌলিক বিরোধ থাকল না।

---

[২৯৮] দেখুন : আত-তাওহিদ (২৮৫)। উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২২৮)।

ঈমান ও আমল

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মাযহাব

আহলে সুন্নাতের সকল ইমামের মতে, ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি ও আমল দুটোর নাম। অর্থাৎ, একজন মুমিন-মুসলিম কেবল মুখে কালিমা পড়বে, সেটা জীবনে বাস্তবায়ন করবে না- এমন হতে পারে না। ইসলাম ধর্ম কেবল তাত্ত্বিকতার নাম নয়; বিশ্বাস ও কাজের সমন্বিত নাম। কিন্তু প্রশ্ন হলো—'ঈমান' অর্থ যেহেতু বিশ্বাস, আর বিশ্বাসটা সাধারণত অন্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সুতরাং ঈমানের তাত্ত্বিক সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে আমলের অবস্থান কী? অন্যকথায়, আমল ঈমানের সংজ্ঞার্থের অন্তর্ভুক্ত কি না।

পিছনে এ ব্যাপারে সংক্ষেপে কিছু কথা বলা হয়েছে। সেটা হলো, জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ফকিহ ও মুহাদ্দিস মনে করেন আমল ঈমানের সংজ্ঞার্থের অন্তর্ভুক্ত। বিপরীতে ইমাম আজম রহ. মনে করেন আমল জরুরি, কিন্তু সেটা ঈমানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে ইমাম আজম এবং অন্য ইমামদের মাঝে তাত্ত্বিক ও পারিভাষিক দিক থেকে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে, যদিও উভয় বক্তব্যের মাঝে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। নিচে আমরা এটা আরও বিস্তারিত বর্ণনা করছি।

ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত, ইমাম মালেককে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : 'ঈমান হলো (মুখের) কথা ও (অন্তর ও অঙ্গের) কাজ (قول وعمل)। এ ধরনের একই বক্তব্য সালাফের বিভিন্ন ইমাম থেকে বর্ণিত।'[২৯৯]

আশহাব ইবনে আবদুল আযিয থেকে বর্ণিত, (নবিজির যুগে) মুসলমানগণ ষোলো মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায়ের নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى

---

২৯৯. আল-ইনতিকা, ইবনে আবদিল বার (৬৯)।

عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ অর্থ : 'এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থি জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও আর রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন। (হে রাসুল) আপনি এ যাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করছিলেন, একে আমি এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি কে রাসুলের অনুসরণ করে আর কে ফিরে যায়। আল্লাহ যাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন, তারা ব্যতীত অপরের নিকট তা নিশ্চয়ই কঠিন। আল্লাহ এরূপ নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম করুণাময়।' [বাকারা : ১৪৩] আয়াতে 'ঈমান নষ্ট না করা' বলতে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে তোমাদের পড়া নামাযগুলো নষ্ট করবেন না বোঝানো হয়েছে। মালেক বলেন, 'এ প্রসঙ্গে আমার মুরজিয়াদের বক্তব্য মনে পড়ে, তারা বলে, নামায ঈমানের অংশ নয়।'[৩০০]

রবি (ইবনে সুলাইমান) বলেন, আমি শাফেয়িকে বলতে শুনেছি, "ঈমান হলো : (মুখের) কথা, কাজ (আমল) এবং অন্তরের বিশ্বাস। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে আমল তথা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সাহাবাদের নামাযকে 'আমল' হিসেবে অভিহিত করেছেন। [বাকারা : ১৪৩] সুতরাং ঈমান হলো কথা, কাজ ও বিশ্বাস।"[৩০১] ইমাম আহমদ রহ. বলেন, 'ঈমান হলো (মুখের) কথা, আমল এবং (অন্তরের) বিশুদ্ধ নিয়ত।'[৩০২]

এটা কেবল তিন ইমামের বক্তব্য নয়; জমহুর আহলে সুন্নাতের ইমামদের বক্তব্যও এক ও অভিন্ন। ইমাম বুখারি বলেন : 'আমি হিজায, মক্কা, মদিনা, কুফা, ওয়াসেত, ইরাক, বাগদাদ, শাম এবং মিশরের হাজারের অধিক আলেমের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাদের কয়েকজন হলেন মক্কি ইবনে ইবরাহিম, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, কুতাইবা ইবনে সাইদ, শিহাব ইবনে মা'মার, মুহাম্মাদ আল-ফিরয়াবি, ইয়াহইয়া ইবনে কাসির, আবু সালেহ, নুআইম ইবনে হাম্মাদ, হুমাইদি, মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ, ইবরাহিম ইবনুল মুনযির, যাহহাক ইবনে মাখলাদ, হিশাম ইবনে আবদুল মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আবু উবাইদ

---

৩০০. প্রাগুক্ত (৭১)।
৩০১. প্রাগুক্ত (১৩৫)।
৩০২. আস-সুন্নাহ, খাল্লাল (৩/৫৮০)।

কাসেম ইবনে সাল্লাম, ইসহাক ইবনে ইবরাহিম হানযালি... (আরও অনেক নাম উল্লেখ করে বলেন) তাদের কাউকে এই বিষয়ে আমি মতভেদ করতে দেখিনি যে, দ্বীন (তথা ঈমান) হলো মুখের স্বীকারোক্তি ও আমল (অন্তরের সত্যায়ন এবং বাহ্যিক আমল) (الدين قول وعمل)।'[৩০৩]

তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসের বাহ্যিক অর্থ ধরে দলিল দেন, যেসব আয়াত ও হাদিসে বিভিন্ন প্রকারের আমলকে ঈমান বলা হয়েছে। যেমন—আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ এরূপ নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করে দেবেন।' [বাকারা : ১৪৩] এখানে 'নামায'-কে ঈমান শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ① إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ③ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ④﴾ অর্থ : 'তারা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসুলের; সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করো। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। (মুমিন তারা) যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে, আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। যারা নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।' [আনফাল : ১-৪] এখানে ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ অর্থ : 'মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রাসুলের সাথে সমষ্টিগত কোনো কাজে শরিক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত

---

৩০৩. উসুলু ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালাকায়ি (১/১৯৩)।

চলে যায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব, তারা আপনার কাছে তাদের কোনো কাজের অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।' [নুর : ৬২] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ অর্থ : 'মুমিন তারা যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের উপর ঈমান এনেছে অতঃপর কোনো সন্দেহ করেনি। আর তাদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী।' [হুজুরাত : ১৫] শেষ দুটো আয়াতেও বিভিন্ন কাজ, জিহাদ ইত্যাদিকে ঈমান এবং মুমিনের কাজ বলা হয়েছে। এসবের আলোকে আলেমগণ বলেন—বোঝা গেল, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন হাদিসেও 'আমল'-কে ঈমান বা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে বোঝা যায়। যেমন—প্রসিদ্ধ হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। সর্বোত্তম শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। লজ্জা ঈমানের অংশ।"[৩০৪] প্রসিদ্ধ আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল-সম্পর্কিত হাদিসে এসেছে, তারা ইসলাম গ্রহণের পরে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের বললেন, 'তোমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। তোমরা কি জানো এক আল্লাহর উপর ঈমান কী?' তারা বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ভালো জানেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসুল—এ সাক্ষ্য দেওয়া, নামায আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা এবং গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ দান করা।'[৩০৫] এখানে খোদ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ঈমানকে বিশ্বাস ও আমল দুটোর মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ফলে আমল যে ঈমানের অংশ সেটা বলা বাহুল্য।

ইমাম আজমের মাযহাব

তাত্ত্বিকভাবে ইমাম আজম রহ. আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। কারণ, তাঁর কাছে ঈমান হলো অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকৃতির সঙ্গে

---

৩০৪. মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ৩৫)। আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৬৭৬)।
৩০৫. বুখারি (কিতাবুল ঈমান : ৫৩)। সহিহ ইবনে হিব্বান (কিতাবুল ঈমান : ১৭২)।

সম্পৃক্ত। ইমাম তাঁর ওসিয়তে বলেন, **'ঈমান আমল নয়, আমলও ঈমান নয়। এর স্বপক্ষে দলিল হলো—অনেক সময় আল্লাহ বান্দাকে বিভিন্ন আমল থেকে অব্যাহতি দেন, কিন্তু ঈমান থেকে দেন না। উদাহরণস্বরূপ হায়েয-নেফাসরত নারীদের আল্লাহ নামায-রোযা থেকে অব্যাহতি দেন। কিন্তু এটা বলা জায়েয হবে না যে, আল্লাহ তাদের ঈমান থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন কিংবা ঈমান পরিত্যাগ করতে বলেছেন। শরিয়ত তাকে বলে, তুমি নামায ছেড়ে দাও। কিন্তু এটা বলে না যে, তুমি ঈমান ছেড়ে দাও। শরিয়ত তাকে বলে, তুমি রোযা ছেড়ে দাও এবং পরে কাযা করো। এটা বলে না যে, ঈমান ছেড়ে দাও এবং পরে কাযা করো। ফকিরের উপর যাকাত আবশ্যক নয়। কিন্তু এটা বলা জায়েয নেই যে, ফকিরের উপর ঈমান আবশ্যক নয়।'**[৩০৬]

একইভাবে আমল বাড়ে-কমে, অথচ ঈমান বাড়ে-কমে না। যেমন—যেসব বিষয়ে ঈমান আনা জরুরি, সেসব বিষয়ে জীবনের প্রথম দিন থেকে শুরু করে শেষ দিন পর্যন্ত ঈমান রাখতে হয়। কোনো কমবেশ হয় না। অথচ আমলের ক্ষেত্রে কমবেশ হয়। যেমন—কেউ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, কেউ এগুলো পড়ার ক্ষেত্রে ত্রুটি করে। সুতরাং কেউ যদি কম নামায পড়ে, তার গুনাহ হবে, কিন্তু আদায়কৃত নামাযগুলো বাতিল হয়ে যাবে না। একইভাবে কেউ যদি রমযানের অর্ধেক রোযা রাখে, তার বড় গুনাহ হবে, কিন্তু রোযা বাতিল হবে না। ফলে আমল কমে যাওয়া স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ঈমান কমার সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা নেই। কারণ, ঈমানের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে ঈমান এনে অন্য বিষয় ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। বোঝা গেল, আমল ঈমানের চেয়ে ভিন্ন বিষয়।[৩০৭]

উসমান বাত্তির কাছে লেখা চিঠিতে ইমাম বলেন, **"...আল্লাহর রাসুল (ﷺ)-এর আগমনের আগে মানুষ মুশরিক ছিল। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এসে তাদের ইসলামের দিকে ডাকেন, কালিমায়ে শাহাদাতের দিকে ডাকেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা-কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলোতে বিশ্বাস করার দিকে ডাকেন। যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়, তারা শিরক থেকে মুক্ত হয়ে মুমিন হিসেবে পরিচিতি পায়। তাদের সম্পদ ও প্রাণ সুরক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু যারা তাঁর ডাকে সাড়া না দেয়, তারা বেঈমান ও কাফের হিসেবে পরিচিতি পায়। তাদের সম্পদ ও প্রাণ হালাল হয়ে যায়। হ্যাঁ, কিন্তু**

৩০৬. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৩৩-৩৪)।

৩০৭. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১৫০-১৫১)।

কিছু ক্ষেত্রে (যেমন আহলে কিতাব) আল্লাহ 'জিযিয়া'র বিকল্প সুযোগও উন্মুক্ত রাখেন। অতঃপর সত্যায়নকারীদের উপর আল্লাহ বিভিন্ন ফরয ইবাদত ধার্য করেন। সেগুলো ঈমানের পরে আমল হিসেবে পরিগণিত হয়, যেমনটা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ অর্থ : 'যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে।' [বাকারা : ৮২] তিনি অন্যত্র বলেছেন, ﴿وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا﴾ অর্থ : 'আর যে আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে।' [তাগাবুন : ৯] কুরআনে এমন আয়াত অসংখ্য। এভাবে তারা আমলের আগেই মুমিন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। যদি আমলকেও ঈমান বলা হয়, তবে এসব ইবাদত আসার আগে তারা মুমিন অভিধা পেতেন না। মোটকথা, সত্যায়ন (ঈমান) ও আমলের রূপরেখা ভিন্ন। কেউ আমল নষ্ট করলে তার ঈমানও নষ্ট হয়ে যাবে এমন নয়। কারণ, ঈমান আনার সময় আমল ছিলই না, আমল ছাড়াও ঈমান ছিল। তা ছাড়া, আমলে বিচ্যুতির কারণে যদি ঈমানেও বিচ্যুতি অনিবার্য হয়, তবে কেউ আমলে ত্রুটি করলেই ঈমান থেকে বেরিয়ে কাফের ও মুশরিক হয়ে যাওয়ার কথা, অথচ সেটা কেউ বলবে না। কারণ, ঈমানের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে কোনো স্তরভেদ নেই। হ্যাঁ, আমলের ক্ষেত্রে স্তরভেদ রয়েছে। ঈমানের ক্ষেত্রে কমবেশ নেই। ফরয ইবাদতের ক্ষেত্রে কমবেশ রয়েছে। পৃথিবীর সকল রাসুল এবং সকল মানুষের দ্বীন একটাই। আমরা বলি জালেম মুমিন, পাপী মুমিন, বিচ্যুত মুমিন, অবাধ্য মুমিন, অসৎ মুমিন ইত্যাদি। অথচ পাপ, বিচ্যুতি, অবাধ্যতা, অসততা—সবগুলোই অপরাধ, আমল বিনষ্টকারী। আমল আর ঈমান যদি এক হতো, তবে এসব অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদের তো মুমিনই বলা হতো না।"[৩০৮]

ইমাম আজম অন্যত্র বলেন, **'যদি কেউ তাওহিদ থেকে দূরের কোনো শিরকের ভূখণ্ডে থেকেও আল্লাহর উপর ঈমান রাখে, ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো স্বীকার করে, কিন্তু শরিয়তের কোনো বিধান তার জানা না থাকে, তবুও সে মুমিন হিসেবে গণ্য হবে।'**[৩০৯] এখানে লক্ষণীয়, এই ব্যক্তির আকিদা ছাড়া আর কিছু জানা নেই, কোনো আমল নেই, তবুও সে মুমিন। যদি আমল ঈমানের মৌলিক অংশ হতো, তাহলে আমলবিহীন এই ব্যক্তিকে মুমিন বলা যেত না। এক্ষেত্রে ইমামের সঙ্গে জমহুর একমত। ফলে দেখা যায়, সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে যদিও তারা আমলকে

---

৩০৮. রিসালাতু আবি হানিফা ইলা উসমান আল-বাত্তি (৩৪-৩৮)।
৩০৯. আল-ফিকহুল আবসাত (৪২)।

ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেন, তথাপি কার্যত তারা আমলকে ঈমান থেকে ভিন্ন সত্তাই মনে করেন এবং এটা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথও নেই।

ইমাম আজম আরেকভাবে তাঁর মাযহাবের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, **'শরিয়ত দ্বীনের পরের স্তরে। কেউ ঈমান এনে দ্বীন গ্রহণ করার পরেই শরিয়তের বিধিবিধান তাঁর উপর প্রযোজ্য হয়। আল্লাহ বলেন,** قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلٰوة **অর্থ : 'আপনি আমার মুমিন বান্দাদের নামায পড়তে বলুন।' [ইবরাহিম : ৩১] আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন,** يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى **অর্থ : 'হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর নিহতের ক্ষেত্রে কিসাস অপরিহার্য করা হয়েছে।' [বাকারা : ১৭৮] এসব আয়াতে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা ইবাদত করার আগেই মুমিন হিসেবে সম্বোধন করছেন। যদি এসব ফরয ইবাদত ঈমান গণ্য হতো, তবে এগুলো করার আগে তাদের মুমিন বলা হতো না। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,** وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ **অর্থ : যে ব্যক্তি আখেরাত প্রত্যাশা করে এবং তার জন্য চেষ্টা করে, এই অবস্থায় যে সে মুমিন...। [ইসরা : ১৯] এখানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ঈমান ও আমলের ভিতরে পার্থক্য করেছেন। পরকালের জন্য বিভিন্ন চেষ্টা-প্রচেষ্টা তথা আমলকে ঈমান থেকে আলাদা করেছেন। তা ছাড়া, মুমিনরা আল্লাহর উপর ঈমান আনার কারণেই নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত দেয়। বিপরীতটা নয়। অর্থাৎ, নামায পড়ার কারণে, রোযা রাখার কারণেই আল্লাহর উপর ঈমান আনে না। বরং প্রথমে ঈমান আনে, এর পর ফরয বিধিবিধান মানে। তাহলে আমল ঈমানের ফলাফল হিসেবে সামনে এলো, ঈমান আমলের ফলাফল নয়। যেমন—কারও উপর ঋণ থাকলে প্রথমে ঋণের কথা স্বীকার করে, এর পর ঋণ আদায় করে। স্বীকার করার আগে আদায় করে না। কারণ, স্বীকার না করলে আদায় করার প্রশ্নও উঠত না। একইভাবে কেউ কারও গোলাম হলে প্রথমে গোলামির কথা স্বীকার করে। এর পর তার আনুগত্য করে এবং তার জন্য কাজ করে। কিন্তু কারও জন্য কাজ করলেই তার গোলাম হয়ে যায় না। অথচ গোলামির স্বীকৃতি দিলে কাজ না করলেও গোলাম গণ্য হয়।'**[৩১০]

পরবর্তী সকল হানাফি আলেম ইমামের পথেই হেঁটেছেন। ফলে তারাও আমলকে তাত্ত্বিকভাবে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করে সংজ্ঞায়িত করেননি। আবু হাফস বুখারি লিখেন, 'ঈমান আমল থেকে আলাদা, আমল ঈমান থেকে আলাদা। ফলে

---

৩১০. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১২-১৩)।

পুণ্যবান ও অপুণ্যবান দুজনের (মৌলিক) ঈমান এক, আমল ভিন্ন। সকল নবির ঈমান ছিল এক, শরিয়ত তথা আমল ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এতে বোঝা যায়, আমল ঈমান থেকে ভিন্ন। কারণ, নবিদের আমল তথা বিধিবিধান ভিন্ন ভিন্ন বা কমবেশি বলা যায়, কিন্তু ঈমান কমবেশি এটা বলা যায় না...। জান্নাতেও মুমিনদের (দুনিয়ায় বিদ্যমান) আমল (যথা নামায-রোযা, হজ-যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি) থাকবে না। কিন্তু তাদের ঈমান থাকবে না—এটা বলার সুযোগ নেই। বোঝা গেল, আমল ঈমানের চেয়ে ভিন্ন বস্তু।'[৩১১] মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখি লিখেন, '(মৌলিকভাবে) পুণ্যবান ও পাপী দুজনের ঈমান এক।'[৩১২]

অধমের পর্যবেক্ষণ : বিভিন্ন মাসআলার মতো এখানেও ইমাম আজম রহ. আর বাকি তিন ইমাম ও জমহুর মুহাদ্দিসদের মধ্যকার মতপার্থক্য মৌলিক নয়, বরং শাব্দিক ও পারিভাষিক। আর এটাই স্বাভাবিক। ঈমানের মতো মৌলিক বিষয় এবং দ্বীনের ভিত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের ইমামদের মাঝে কোনো মৌলিক পার্থক্য থাকবে এটা অচিন্তনীয়। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে বিভিন্ন ফিরকা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। যেমন—জাহমিয়্যাদের মতে ঈমান হলো স্রেফ জানার নাম। জানার বাইরে মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন ও আত্মসমর্পণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান, ভয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল—এগুলোর কোনোকিছুই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের মতে, কুফর হলো স্রেফ আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা! এটা জঘন্য আকিদা। কারণ, এর মাধ্যমে জগতের অধিকাংশ কাফের মুমিন হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, কেউ আল্লাহ বলতে একজন আছেন এটুকু জানলেই মুমিন হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস কিংবা আমল তাদের কাছে একেবারেই নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন। ভ্রান্ত কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায় মনে করে, ঈমান হলো স্রেফ মুখের স্বীকৃতি। অন্তরের সত্যায়ন ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়, আমল তো নয়ই। এটাও জঘন্য আকিদা। এর মাধ্যমে মুনাফিকরাও মুমিন হয়ে যাচ্ছে। অথচ মুনাফিকরা কুরআন-সুন্নাহমতে জঘন্য পর্যায়ের কাফের। তাদের অবস্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا﴾ অর্থ :

---

৩১১. আস-সাওয়াদুল আজম (৫, ৪১-৪২)।

৩১২. আল-ইতিকাদ, বলখি (১০৭)।

'মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তাদের জন্য আপনি কখনো কোনো সহায় পাবেন না।'[৩১৩] [নিসা : ১৪৫]

এভাবে আমলকে ঈমানের সংজ্ঞার্থের বহির্ভূত ধরার ক্ষেত্রে জাহমিয়্যাহ ও কাররামিয়্যাহ, অন্যকথায় বৃহত্তর মুরজিয়াদের সঙ্গে হানাফি মাযহাবের বাহ্যিক সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু এ সাদৃশ্য সত্ত্বেও তারা কখনোই এসব গোমরাহ ফিরকার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিংবা তাদের আকিদা আর গোমরাহ ফিরকাগুলোর আকিদা এক নয়। কারণ, তারা আমলকে মৌলিকভাবেই ঈমান থেকে খারিজ করে দেয়। বিপরীতে ইমাম আজম এবং হানাফি উলামায়ে কেরাম আমলকে ঈমানের সংজ্ঞার্থ থেকে বাইরে রাখেন, মূল ঈমানের বাইরে রাখেন না। বরং, যেমনটা আমরা পিছনে দেখেছি, তাদের মতে ঈমান ও ইসলাম এক। আর জমহুরও এ ব্যাপারে একমত যে, ঈমান হলো বিশ্বাসগত বিষয়, ইসলাম হলো বাহ্যিক আমলগত বিষয়। ফলে আংশিক সাদৃশ্যের কারণে হানাফিদের এসব গোমরাহ ফিরকার মতো মনে করা ভ্রান্তি, ঠিক যেমন আংশিক সাদৃশ্যের কারণে জমহুর মুহাদ্দিসিনকে খারেজি ও মুতাযিলাদের মতো মনে করা ভ্রান্তি। কারণ, ঈমানের সংজ্ঞার্থের ক্ষেত্রে খারেজি ও মুতাযিলাদের মতাদর্শ মুহাদ্দিসিনের মতাদর্শসদৃশ। তাদের মতে মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল তিনটিই ঈমান। তিন ইমাম এবং মুহাদ্দিসদের মতেও ঈমান তিনটির সমন্বয়। কিন্তু তাদের আর গোমরাহ ফিরকাগুলোর মাঝে পার্থক্য হলো, এসব ফিরকা সবগুলো বিষয়কে একটি একক মনে করে। ফলে সামান্য নষ্ট হলে পুরোটা নষ্ট ধরে। এ কারণে তারা ঈমান শুদ্ধ হওয়ার জন্য কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার শর্ত দেয়। কারণ, কবিরা গুনাহ করার অর্থ হলো আমলের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি আসা। আর আমল যেহেতু ঈমানের অঙ্গ এবং ঈমান যেহেতু তাদের কাছে একটি একক, ফলে খারেজিদের মতে কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের। অথচ আহলে সুন্নাত এমন ব্যক্তিকে কাফের বলেন না। বোঝা গেল, আংশিক সাদৃশ্যের কারণে তাদের এক ভাবার সুযোগ নেই।

মোটকথা, ঈমানকে সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত কি না এ বিষয়ে ইমাম আজম এবং জমহুর ফুকাহা-মুহাদ্দিসদের মাঝে যে মতপার্থক্য, সেটা নিতান্তই শাব্দিক ও পারিভাষিক। এমন কোনো মৌলিক পার্থক্য নয়, যার ফলে ঈমানের ক্ষেত্রে কিংবা আমলের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য দেখা দেয় কিংবা বিচ্যুতি

---

৩১৩. দেখুন : মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন (১/১১৪-১১৫)। শরহুল ওয়াসিয়্যাহ, মুফতি যাদাহ (৩২)। আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/১১৩)। তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১০৭৬)।

আসে। হানাফি উলামায়ে কেরাম এবং বাকি তিন মাযহাবের উলামায়ে কেরাম সকলে আমলের প্রতি সমান যত্নবান, সম্পূর্ণ একমত। তাদের কেউ কবিরা গুনাহকারীকে এবং আমল পরিত্যাগকারীকে কাফের না বলার ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ একমত। সুতরাং প্রকৃত অর্থেও তাদের সকলের বক্তব্য সঠিক। ঈমানকে শ্রেফ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার কারণে সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে পার্থক্য তৈরি হয়েছে। ফলাফলে কোনো পার্থক্য নেই। বরং ইমাম আজমের বিভিন্ন বক্তব্যও খোদ জমহুরের বক্তব্যের মতো—সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন। 'আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম' গ্রন্থে ইমাম বলেন, ঈমান হলো, **'সত্যায়ন করা (তাসদিক), জানা (মারিফাত), ইয়াকিন রাখা, মুখে স্বীকার করা (ইকরার) করা এবং আত্মসমর্পণ করা (ইসলাম)।'**[৩১৪] এখানে ইমাম আজম ঈমানের অর্থের মাঝে 'ইসলাম'-কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর ইসলাম হলো বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল। যেমন—নামায, রোযা ইত্যাদি। ফলে তাত্ত্বিকভাবে তিনি আমলকে আলাদা করলেও প্রায়োগিকভাবে ঈমান বলতে অন্তরের সত্যায়ন, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল তিনটির সমন্বিত রূপ মনে করেন। এতে তাঁর বক্তব্যের মাঝে আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের বক্তব্যের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত, আবু হানিফা রহ. বলেন, **ঈমান হলো 'কথা'** (তথা হৃদয়ের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকৃতি), **আর আমল হলো ঈমানের জন্য আবশ্যক বিষয়** (الإيمان قول والعمل موظف عليه)।"[৩১৫]

উপরন্তু সংজ্ঞার্থের বিভিন্নতার বিষয়টির ক্ষেত্রেও আমরা যদি গভীরে যাই, তবে দেখব, ইমাম আজম রহ.-এর বক্তব্য অধিক যৌক্তিক। আমলকে ঈমানের সংজ্ঞায়নের অন্তর্ভুক্ত না করাই মৌলিক, অন্তর্ভুক্ত করা নতিজা ও ফলাফলভিত্তিক। কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন নস এ কথার প্রমাণ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সকল নবি-রাসুলকে দ্বীন কায়েম করতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖۤ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰۤى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ﴾ অর্থ : 'তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন সেই দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নুহকে। আর যা আমি ওহি করেছি আপনাকে এবং যার

৩১৪. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৩)।
৩১৫. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১০৫)।

নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং এতে মতভেদ করো না। আপনি মুশরিকদের যার প্রতি আহ্বান করছেন, সেটা এদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন।' [শুরা : ১৩]

উপরের আয়াতে দ্বীন বলতে ইসলাম ধর্ম উদ্দেশ্য। আর আমরা জানি, প্রত্যেক নবি-রাসুলের ধর্ম ইসলাম হলেও তাদের শরিয়ত ভিন্ন ভিন্ন ছিল। শরিয়তে মুহাম্মাদি আসার পর তাদের সেসব শরিয়তের অনেককিছু রহিত হয়ে গেছে। বরং কুরআনেরও বিভিন্ন বিধান রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় রহিত হয়ে গিয়েছে। এক ফরযের জায়গায় অন্য বিষয় ফরয হয়েছে। যদি আমলকেও ঈমান বলতে হয়, তাহলে কোনো নবির উম্মতের ঈমান কম আর কোনো নবির উম্মতের ঈমান বেশি বলতে হবে। ঈমানের কিছু অংশ রহিত হয়ে নতুন অংশ জন্মানোর কথা বলতে হবে। অথচ ঈমান এক। জগতের সকল নবি-রাসুলের ঈমানের প্রতি দাওয়াতের মূল কথা এক। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নবুওতের প্রথম যুগে মানুষকে ঈমানের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিধিবিধান অবতীর্ণ হয়েছে। তাহলে বলতে হবে, তিনি অপূর্ণ দ্বীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। তা ছাড়া, তিনি হাদিসে বলেছেন, 'আমি মানুষের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...। যখন তারা এটা বলবে, তখন তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে। তাদের হিসাব থাকবে আল্লাহর উপর।'[৩১৬] এখানেও আমল ছাড়া কেবল সাক্ষ্যকেই ঈমান সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহর রাসুল আরও বলেন, "তোমরা বলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সফল হয়ে যাবে।"[৩১৭] এখানেও মুখের বলার সঙ্গে সাফল্য সংযুক্ত করেছেন; আমলের সঙ্গে নয়। তা ছাড়া, আল্লাহর রাসুল সবাইকে আমলের আগে ঈমানের নির্দেশ দিতেন। যদি আমলকে ঈমানের মূল বিষয় ধরা হয়, তবে নওমুসলিমকে 'ত্রুটিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী' বলতে হবে, অথচ তার ঈমানে কোনো ত্রুটি নেই।

একটি সংশয় নিরসন : প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে বিভিন্ন হাদিসে আমলকে ঈমানের অংশ কেন বলা হয়েছে? বিভিন্নভাবে এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে :

---

৩১৬. বুখারি (কিতাবুল ঈমান : ২৫)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ২০)।
৩১৭. মুসতাদরাকে হাকেম (কিতাবুল ঈমান : ৩৯)। ইবনে হিব্বান (কিতাবুত তারিখ : ৬৫৬২)। দারাকুতনি (কিতাবুল বুয়ু : ২৯৭৬)।

এক. ঈমানের শাখাগত বিষয় এবং নতিজা হিসেবে বলা হয়েছে, মৌলিক অংশ হিসেবে নয়। এ জন্য সেগুলোর নামও দেওয়া হয়েছে 'ঈমানের শাখা', মূল নয়। আবুল ইউসর বাযদাবি লিখেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, ঈমানের শাব্দিক অর্থ সত্যায়ন। পরিভাষায় ঈমান হলো অন্তরের সত্যায়ন, মুখের স্বীকৃতি। অর্থাৎ, অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ ছাড়া উলুহিয়্যাতের উপযুক্ত কেউ নেই। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমরা আল্লাহর সকল সিফাতে বিশ্বাস রাখি। নবিগণ তাঁর পক্ষ থেকে যা-কিছু নিয়ে এসেছেন, সেগুলোতে ঈমান রাখি। ইসলামের সকল রুকনে বিশ্বাস রাখি। মুখে সেগুলোর স্বীকৃতি দিই। ফলে ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন। মুরজিয়াদের মতে ঈমান স্রেফ জানা। কাররামিয়্যাহদের মতে স্রেফ মুখের স্বীকৃতি। আশআরির নিকট স্রেফ অন্তরের সত্যায়ন। বিপরীতে শাফেয়ি এবং একদল মুহাদ্দিসের কাছে আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। ফলে তাদের কাছে ঈমানের সংজ্ঞা হলো কথা ও কাজ (আমল)। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তারা আমল ছাড়া ঈমানকে বিশুদ্ধ গণ্য করেছেন। আমল ছেড়ে দেওয়ার কারণে কাউকে কাফের বলেননি। ফলে তাদের বক্তব্যের মর্মার্থ যেন : আমল ঈমানের ফলাফলস্বরূপ এর অন্তর্ভুক্ত। **এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত (তথা হানাফিদেরও) বক্তব্য।**'[৩১৮] ফলে দুটোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

দুই. বিপরীত অবস্থা তথা কুফরের সঙ্গে তুলনা করে; অর্থাৎ, সত্যায়ন ছাড়া যা-কিছু রয়েছে, যেমন—আল্লাহর বিভিন্ন আনুগত্য, ইবাদত—এগুলো 'কুফরের বিপরীত ঈমান' এই অর্থে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু স্বাভাবিক ও সামগ্রিক অর্থে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।[৩১৯]

ঈমান ভয় ও আশার মাঝে

ঈমানের অবস্থান ভয় ও আশার মাঝে। একজন মুমিনের জন্য আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভর করে পরিণতি সম্পর্কে একেবারে গা-ছাড়া ও নির্ভয় হয়ে যাওয়া বৈধ নয়। কারণ, তার জানা নেই শেষ পরিণতি কী অবস্থার উপর হবে—ঈমান নাকি কুফর অবস্থায় মৃত্যু হবে। এ জন্য এ ব্যাপারে সবসময় আল্লাহকে ভয়

---

৩১৮. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৪৮-১৪৯)।

৩১৯. দেখুন : জুমাল মিন উসুলিদ্দিন (২৭)।

করা উচিত। ইমাম আজম বলেন, **'অনেক মানুষ মৃত্যুর সময় ঈমানহারা হয়ে মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি শেষ পরিণতির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় না করবে, সে মুরজিয়া-জাবরিয়্যাহদের অন্তর্ভুক্ত।'**[৩২০]

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা ঈমানের এই হাকিকত (বাস্তবতা) প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন ﴿أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾ অর্থ : 'তারা কি আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে ভয় করে না? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয় না।' [আরাফ : ৯৯] একইভাবে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়াও বৈধ নয়। এটা খারেজিদের মাযহাব। ফলে জগতের সকল গুনাহ করার পরও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। কারণ, আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্যকে কুফর বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইয়াকুব আ.-এর ভাষায় বলেন, ﴿يَٰبَنِىَّ ٱذْهَبُوا۟ فَتَحَسَّسُوا۟ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا۟يْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَا۟يْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ অর্থ : '(ইয়াকুব বলেন) হে আমার পুত্রগণ, তোমরা যাও ইউসুফ আর তার সহোদরের অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কারণ, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে কেউই নিরাশ হয় না, কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত।' [ইউসুফ : ৮৭] আরও বলেন, ﴿قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ অর্থ : 'আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' [যুমার : ৫৩] সুতরাং গুনাহ করার পর কোনো ব্যক্তি তাওবা ছাড়া মারা গেলেও আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, অথবা গুনাহ অনুযায়ী শাস্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ফলে নিরাশ হওয়ার সুযোগ নেই।

ইমামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইবাদতের মর্ম কী? তিনি বললেন, **'ইবাদত হলো আনুগত্য, আশা, ভয়, আল্লাহর রবুবিয়্যাতের স্বীকারোক্তি—সবগুলোর সমন্বিত নাম। ফলে বান্দা যখন আল্লাহর আনুগত্য করে, তাতে আল্লাহর প্রতি তার ঈমান, ভয় ও আশা তিনটি বিষয়ই থাকে। এই তিনটি বিষয়কে নিয়েই ইবাদত। ফলে ভয় ও আশা ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারে না। হ্যাঁ, আল্লাহর প্রতি কারও ভয় বেশি হয়, আর কারও কম হয়; কিন্তু একেবারে নির্ভয় হলে মুমিন হওয়া যায় না।**

---

৩২০. আস-সাওয়াদুল আজম (৫৪-৫৫)।

সুতরাং কোনো মানুষ যদি পুণ্যের আশা কিংবা শাস্তির ভয়ে অন্য কোনো মানুষের আনুগত্য করে, তবে সে যেন তার ইবাদত করল। কিন্তু ভয় ও আশা ছাড়া স্রেফ আনুগত্য ইবাদত হবে না। কারণ, স্রেফ আনুগত্যকে ইবাদত বলা হলে দুনিয়ার সবাইকেই আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতকারী বলতে হবে।'[৩২১]

কুরআনে ভয় ও আশার মাঝে অবস্থান নবি-রাসুল এবং খাঁটি মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ অর্থ : 'যে ব্যক্তি রাতের বেলা সিজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদতে মগ্ন থাকে, আখেরাতকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান যে তা করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।' [যুমার : ৯] তিনি আরও বলেন, ﴿تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾ অর্থ : '(রাতে) তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায়। তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় ও আশা সহকারে ডাকে। আর আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।' [সাজদা: ১৬]

এই ভয় ও আশার ভারসাম্য তৈরি হবে আমলের মধ্য দিয়ে। আমলবিহীন ভয়ের মাঝে থাকা অর্থহীন। আবার আমলহীন আশার মাঝে থাকাও প্রবঞ্চনা। বরং আল্লাহর প্রতি আশা নিয়ে ভালো কাজ করে যেতে হবে। তাঁর ভয়ে মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। মন্দ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে ভয় ও আশা দুটোর মাধ্যমে তাওবা করতে হবে। ইমাম গাযালি বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সুস্থ থাকে, ততক্ষণ ভয় বেশি থাকা উচিত। আর যখন অসুস্থ হয়ে যায় (অথবা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যায়), তখন আশা বেশি থাকা উচিত।'[৩২২] সম্ভবত এদিকেই ইঙ্গিত করে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে।'[৩২৩] অর্থাৎ, বার্ধক্য অবস্থায় আমলের ক্ষেত্রে মানুষের সাধারণত ত্রুটিবিচ্যুতি তৈরি হয়, তাই তখন যথাসাধ্য ইবাদত করে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা, তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশা নিয়ে মৃত্যুবরণ করা উচিত।

---

৩২১. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২৮)।

৩২২. আল-আরাফুশ শাযি, কাশ্মীরি (২/৩০৬)।

৩২৩. মুসলিম (কিতাবুল জান্নাহ : ২৮৭৭)। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল (মুসনাদে জাবের ইবনে আবদিল্লাহ : ১৪৩৪১)।

ইমাম আজম বলেন, “তবে আশা কিংবা ভয়ে আনুগত্য করলেই ঢালাওভাবে ইবাদত করেছে এমন বলা যাবে না। বরং এটা দুটি স্তরে বিভক্ত। যদি কেউ আশা বা ভয়ে অন্যের আনুগত্য করে এই বিশ্বাস নিয়ে যে, আল্লাহ ছাড়া সে ব্যক্তি তাকে উপকার-অপকার করতে সক্ষম, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। বিপরীতে কেউ যদি এই বিশ্বাসে অন্যকে ভয় করে বা অন্য কারও কাছে আশা করে যে, উপকার-অপকারের মূল মালিক আল্লাহ তায়ালা, তবে আল্লাহর অনুমতিতে সে ব্যক্তির হাতে এগুলো ঘটতে পারে কিংবা সে তার উপকার-অপকারের কারণ হতে পারে, তবে এমন ভয় ও আশাকে কুফর বলা যাবে না। কেননা, পিতা তার সন্তানের উপকার প্রত্যাশা করে। ঘোড়ার মালিক ঘোড়ার কাছ থেকে উপকার প্রত্যাশা করে। মানুষ তার প্রতিবেশীর সদাচরণের আকাঙ্ক্ষা করে, শাসকের কাছ থেকে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে। এগুলো কুফর নয়। কারণ, আল্লাহ এগুলোকে পার্থিব জগতের কার্যকারণ ও উপকরণ হিসেবে তৈরি করেছেন। নবিদের জীবনেও আমরা এমন ঘটনা দেখতে পাই। যেমন—আল্লাহ তায়ালা মুসা আ.-কে নবি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন; নিজের সঙ্গে কথা বলার জন্য মনোনীত করেছেন; তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। এতকিছু সত্ত্বেও মুসা আ. বলেছেন, ﴿فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ﴾ অর্থ : 'আমার আশঙ্কা হয় তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।' [শুআরা : ১৪] একইভাবে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা থেকে পালিয়ে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এগুলো কুফর নয়। কারণ, এসব ভয় মূলত সাময়িক ও শর্তসাপেক্ষ। কিন্তু মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় করে শর্তহীনভাবে, সদা-সর্বদা, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে।”[৩২৪]

ঈমান ভয় ও আশার নাম। তাই প্রত্যেকে আল্লাহর আনুগত্য এবং গুনাহ পরিত্যাগের ভিত্তিতে ভয় ও আশার কাছাকাছি অবস্থান করে। ইমামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হত্যাকারী এবং নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি একবার দৃষ্টিপাতকারী দুজন কি সমান? ইমাম বললেন, 'না, কখনোই নয়। হ্যাঁ, দুটোই গুনাহ, কিন্তু দুই গুনাহের স্তর ও পরিণাম এক নয়। অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী হত্যাকারীর চেয়ে ক্ষমার বেশি কাছাকাছি। কারণ, প্রথমজনের অপরাধ দ্বিতীয়জনের অপরাধের চেয়ে লঘু, যদিও দুটোই অপরাধ। এর উদাহরণ সেই দুই ব্যক্তির মতো যাদের একজন সমুদ্রে নেমেছে আরেকজন ছোট্ট নদীতে নেমেছে। দুজনই ডুবে যেতে পারে। তবে সমুদ্রে নামা ব্যক্তির ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা নদীতে নামা ব্যক্তির ডুবে যাওয়ার আশঙ্কার

৩২৪. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২৮-২৯)।

চেয়ে অনেক বেশি। একইভাবে নদীতে নামা ব্যক্তির সমুদ্রে নামা ব্যক্তির চেয়ে নিরাপদে কূলে ফেরার আশা বেশি। এভাবেই আমি লঘু গুনাহকারীর ব্যাপারে বড় গুনাহকারীর চেয়ে ক্ষমার অধিক আশাবাদী, যদিও দুজনের জন্যই আমি ক্ষমার আশা করি, দুজনের ব্যাপারেই শাস্তির ভয় করি।'[৩২৫]

মোটকথা, ঈমান ভয় ও আশা দুটোর মাঝামাঝি থাকে। খারেজি ও মুরজিয়া সম্প্রদায়গুলো এখানেই বিভ্রান্ত হয়েছে। খারেজিরা ভয়ের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে, আর মুরজিয়ারা আশার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে। ভ্রান্ত সুফিরাও দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে—একদল আশাকে প্রাধান্য দিয়ে নামায-রোযাসহ সকল ইবাদত নাকচ করে দিয়েছে, আরেক দল ভয়কে প্রাধান্য দিয়ে দুনিয়া ও ঘর-সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্যের জীবন বেছে নিয়েছে। দুটোই প্রান্তিকতা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অবস্থান হলো ভয় ও আশার মাঝামাঝি, দুটো নিয়ে। কারণ, ভয়বিহীন আশা আত্মতুষ্টি, আত্মতৃপ্তি। অপরদিকে আশাবিহীন ভয় হতাশা এবং আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্য। এ দুটোর একটাও বৈধ নয়। রুকনুদ্দিন সমরকন্দি বলেন, 'ঈমানের অত্যাবশ্যক অঙ্গ হলো আল্লাহর ভয়, তাঁর প্রতি আশা। ঈমান আশা ও হতাশার মাঝামাঝি।'[৩২৬]

---

৩২৫. প্রাগুক্ত (১৭)।

৩২৬. আল-আকিদাহ আর-রুকনিয়্যাহ (৪৭)।

ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি

এ বিষয়টা মূলত ঈমানের সংজ্ঞার্থের মতপার্থক্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, যারা ঈমানকে আমল গণ্য করেছেন, তাদের কাছে ঈমান বাড়ে ও কমে। কারণ, আমল বাড়ে ও কমে। আর যারা সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে আমলকে ঈমান গণ্য করেননি, বরং ঈমানকে স্রেফ অন্তরের বিশ্বাস এবং মুখের স্বীকৃতি বলেছেন, তাদের কাছে ঈমান বাড়ে না, কমেও না। কারণ, স্বীকৃতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সকলকে অভিন্ন জিনিসে বিশ্বাস রাখতে হয়। এখানে কমা-বাড়ার সুযোগ নেই।

মোটকথা, ঈমানের সংজ্ঞায়ন, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত কি না, সেক্ষেত্রে যে মতভেদ আমরা পিছনে দেখেছি একই মতভেদ এখানেও বিদ্যমান। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমাম যেহেতু আমলকে ঈমানের সংজ্ঞার্থভুক্ত করেন, ফলে এখানে দেখব, তারা ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধির কথা বলবেন। আর ইমাম আজম এবং হানাফি উলামায়ে কেরাম যেহেতু সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলেন না, ফলে এখানে দেখব, তারা মূল ঈমান হ্রাসবৃদ্ধির কথা বলেন না; বরং ঈমানের শক্তি ও নুর হ্রাসবৃদ্ধির কথা বলেন। প্রথমে আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উভয় দলের বক্তব্য উল্লেখ করব। অতঃপর তাদের মাঝে মতপার্থক্য স্রেফ শাব্দিক নাকি আসলেই মৌলিক সেটা দেখার চেষ্টা করব।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ ও মুহাদ্দিসের মাযহাব

আহলে সুন্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের কাছে ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি ও আমল দুটোর নাম। অন্যকথায়, তাদের কাছে আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আমল যেহেতু বাড়ে ও কমে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঈমানের ক্ষেত্রেও তাদের মাযহাব হলো ঈমান বাড়ে ও কমে। এটা বিভিন্ন সাহাবির বক্তব্য হিসেবেও পাওয়া যায়। মুজাহিদ রহ. সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবুদ দারদা ও আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলেন, 'ঈমান বাড়ে ও কমে।'[৩২৭]

---

৩২৭. ইবনে মাজা (আবওয়াবুস সুন্নাহ : ৭৪, ৭৫)।

আবদুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম বলেন : আমি ইবনে জুরাইজ, সুফিয়ান সাওরি, মা'মার ইবনে রাশেদ, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ এবং মালেক ইবনে আনাস সবাইকে বলতে শুনেছি : 'ঈমান হলো কথা ও কাজ; বাড়ে ও কমে।'[৩২৮] আবদুল্লাহ ইবনে নাফে' থেকে বর্ণিত, ইমাম মালেক বলতেন, 'ঈমান হলো কথা ও কাজ; বাড়ে ও কমে।'[৩২৯]

রবি বলেন, আমি শাফেয়িকে বলতে শুনেছি, 'ঈমান বাড়ে ও কমে।'[৩৩০] শাফেয়ি বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা কুরআনে অন্তর, চোখ, কান, হাত ও পা-সহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যেসব ইবাদতের কথা বলেছেন, সেগুলোকে তিনি ঈমান আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্রতা ও নামাযকে ঈমান আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং যারা এসব ইবাদত পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে, তারা পূর্ণ ঈমানদার গণ্য হবে। আর যারা এগুলো ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেবে, তাদের ঈমান অসম্পূর্ণ গণ্য হবে। বোঝা গেল, ঈমান বাড়ে ও কমে। কারণ, ঈমানে যদি হ্রাসবৃদ্ধি না থাকত, তবে সকল মানুষ সমান হয়ে যেত। সবার মর্যাদা এক হয়ে যেত। পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব বাতিল গণ্য হতো। কিন্তু এটা সঠিক নয়। বরং মানুষ তিনভাবে বিভক্ত। যারা ঈমান (ও আমলের) সব হক আদায় করে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। যাদের ঈমান যত বেশি থাকবে, জান্নাতে তাদের মর্যাদা তত বেশি হবে। আর যাদের ঈমানে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকবে, আল্লাহ তাদের জাহান্নামের শাস্তি দেবেন।'[৩৩১]

ইমাম আহমদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈমান হলো কথা ও কাজ; বাড়ে ও কমে।'[৩৩২] সুলাইমান ইবনুল আশআস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম আহমদ বলেছেন, 'নামায, যাকাত, হজ, সৎকাজ—এগুলো সব ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর অবাধ্যতা ঈমানকে কমিয়ে দেয়।'[৩৩৩] পুত্র আবদুল্লাহর বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আহমদ বলেন, 'ঈমান বাড়ে ও কমে। যখন কেউ ব্যভিচার করে অথবা মদপান করে, তার ঈমান কমে যায়।'[৩৩৪]

---

৩২৮. আল-ইনতিকা, ইবনে আবদিল বার (৭১)।
৩২৯. হিলইয়াতুল আউলিয়া, আস্ফাহানি (৬/৩২৭)।
৩৩০. আল-ইনতিকা (১৩৫)।
৩৩১. মানাকিবুশ শাফেয়ি, বাইহাকি (১/৩৯১-৩৯৩)।
৩৩২. মানাকিবে আহমদ, ইবনুল জাওযি (২২৩)।
৩৩৩. আস-সুন্নাহ, রিওয়াইয়াতু খাল্লাল (৩/৫৮৪)।
৩৩৪. আস-সুন্নাহ, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ (২৬৫-২৬৬)।

আবু ইসহাক সাফফার লিখেন, 'মালেক, আওযায়ি, শাফেয়ি, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ, আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ ফকিহ ও মুহাদ্দিসের মতে, ঈমান হলো অন্তরের সত্যায়ন, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল। ফলে তাদের কাছে ফরয ও নফল আমলের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়, গুনাহের মাধ্যমে হ্রাস পায়। আবুল হাসান আশআরির কাছে ঈমান অন্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; অন্যকথায়, সত্যায়ন ও জানা। তার মতে, ভালো কাজের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়, কিন্তু গুনাহের কারণে হ্রাস পায় না।'[৩৩৫]

ইমাম নববি আবদুর রাযযাক থেকে বর্ণনা করেন, 'আমি আমার সকল মাশায়েখ তথা সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস, উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর, আওযায়ি, মা'মার ইবনে রাশেদ, ইবনে জুরাইজ, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ সকলকে বলতে শুনেছি—ঈমান হলো কথা ও কাজ; বাড়ে ও কমে। আর এটা ইবনে মাসউদ, হুযাইফা, নাখায়ি, হাসান বসরি, আতা, তাউস, মুজাহিদ এবং আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকেরও বক্তব্য।'[৩৩৬]

তারা সকলে কুরআন কারিম ও সুন্নাহর বিভিন্ন বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। যেমন—আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ অর্থ : 'যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয়, তাদের কেউ কেউ বলে, এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল? যারা মুমিন, এটা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা আনন্দিত হয়।' [তাওবা : ১২৪] অন্যত্র বলেন, ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ অর্থ : 'তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন, তাদের ঈমানের সঙ্গে আরও ঈমান বৃদ্ধি পায়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' [ফাতাহ : ৪] আরেক জায়গায় বলেন, ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ অর্থ : 'যখন তাদের আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের

---

৩৩৫. তালবিসুল আদিল্লাহ (৭২২-৭২৩, ৭২৪)।

৩৩৬. শরহে মুসলিম, নববি (১/১৪৬)।

উপরই নির্ভর করে।' [আনফাল : ২] আরেক জায়গায় বলেন, ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ﴾ অর্থ : "আমি জাহান্নামের প্রহরী হিসেবে কেবল ফেরেশতাদের মনোনীত করেছি। কাফেরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি তাদের এই সংখ্যা (তথা উনিশ) উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবিদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়, মুমিনদের ঈমান বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীগণ ও কিতাবিগণ সন্দেহ পোষণ না করে। এটার ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফেররা বলবে, 'আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছেন?' এইভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখান। আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।" [মুদ্দাসসির : ৩১] এখানকার সবগুলো আয়াতে ঈমান বাড়ার কথা বলা হয়েছে। কুরআনের কোথাও সরাসরি ঈমান কমার কথা বলা হয়নি। তবে—তাদের মতে—যে বস্তু বাড়ে বোঝা যায়, সেটা কমেও। এমন যুক্তিতে তারা ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস দুটোর কথাই বলেছেন।

ইমাম আজমের মাযহাব

ইমাম আজম রহ. মনে করেন, **'ঈমান হলো (মুখে) স্বীকার ও (অন্তরে) সত্যায়ন করা। বিশ্বাসকৃত বিষয় হিসেবে আকাশ ও পৃথিবীর কারও ঈমান বাড়ে বা কমে না। তবে ইয়াকিন ও সত্যায়নের ক্ষেত্রে বাড়ে-কমে। ঈমান ও তাওহিদের ক্ষেত্রে সকল মুমিন বরাবর। আমলের ক্ষেত্রে স্তরভেদ হয়।'**[৩৩৭]

কারণ, যেসব বিষয়ে ঈমান আনা জরুরি জাহেল-আলেম, বৃদ্ধ-যুবক, নারী-পুরুষ সবাইকে সেসব বিষয়ে ঈমান আনতে হয়। কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে কমবেশি ও সকলের মাঝে তারতম্য স্পষ্ট। এ কারণে ইমাম আজমের মতে, **'ঈমানের ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। কেননা, ঈমান কমতে হলে কুফর বাড়তে হবে, ঈমান বাড়তে হলে কুফর কমতে হবে। ফলে একই সময়ে এক ব্যক্তির মাঝে ঈমান ও কুফর দুটোই বিদ্যমান থাকতে হবে। অথচ এটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।** সুতরাং ঈমানের

---

৩৩৭. আল-ফিকহুল আকবার (৬)।

হ্রাসবৃদ্ধিও সম্ভব নয়।'[৩৩৮] ইমাম আরও বলেন, **'সকল মুমিন আল্লাহর মারিফাত (পরিচয়), ইয়াকিন (বিশ্বাস), তাওয়াক্কুল (ভরসা), মহব্বত, সন্তুষ্টি, ভীতি, আশা এবং সেসবের প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে সমান। তাদের মাঝে স্তরভেদ হচ্ছে সেগুলোর ঈমান-পরবর্তী (আমলের) ক্ষেত্রে।'**[৩৩৯]

ইমাম আজমের মতো সকল হানাফি আলেমের মতে, ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। কারণ, ঈমান হলো অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকৃতি। আর সত্যায়ন ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি নেই। সবাইকে সমান বিষয় সত্যায়ন করতে হয়। মুমিন হওয়ার জন্য সবাইকে একই বিষয়ের স্বীকৃতি দিতে হয়। ফলে ঈমানের মাঝে হ্রাসবৃদ্ধি নেই। হ্যাঁ, সত্যায়ন, মারিফাত, ইয়াকিন, তাওয়াক্কুল, মহব্বত, সন্তুষ্টি, ভয়, আশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্তরভেদ রয়েছে; এগুলো কমবেশি হয়।[৩৪০]

ইমাম আজমের কথার মর্ম : তবে এর অর্থ এই নয় যে, হানাফিদের কাছে ঈমান মোটেই বাড়ে-কমে না; বরং এটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। অর্থাৎ, যে জিনিসগুলোর উপর ঈমান আনতে হয়, সে হিসেবে ঈমানে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। যেমন—ঈমানের ছয়টি রুকন। নবি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলেরই এগুলোতে বিশ্বাস করতে হয়। একজন ফেরেশতা যেমন বলেন, আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, ফেরেশতার উপর, কিতাবের উপর, রাসুলগণের উপর, পরকালের উপর, তাকদিরের ভালোমন্দের উপর, তেমনই একজন সাধারণ মানুষ কিংবা জিনকেও একই ঘোষণা করতে হয়। সবাইকে বলতে হয়, আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা-কিছু এসেছে সবকিছুর উপর। আমি ঈমান আনলাম রাসুলুল্লাহর উপর এবং রাসুলুল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সবকিছুর উপর। এক্ষেত্রে যদি কিছু মানে আর কিছু অস্বীকার করে, তবে সে মুমিন গণ্য হবে না। যেমন—কেউ আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাবের উপর ঈমান আনল, কিন্তু পরকালে ঈমান আনল না, তবে এমন ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। আবার কেউ আল্লাহ ও রাসুলের উপর ঈমান আনল, কিন্তু অন্য কোনো বিষয়ে ঈমান আনল না, তবে সেও কাফের হয়ে যাবে। ফলে এখানে ঈমানে কমবেশি করা সম্ভব নয়।

---

৩৩৮. আল-ওয়াসিয়্যাহ (২৯-৩০)।

৩৩৯. আল-ফিকহুল আকবার (৬)।

৩৪০. দেখুন : আস-সাওয়াদুল আজম(৫)। ইতিকাদ, বলখি (৯৯)। তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১০৮৭)। বাহরুল কালাম (১৫৬)। জামেউল মুতুন (২৩)।

কিন্তু ইয়াকিনের স্তর এবং সত্যায়নের দৃঢ়তার ক্ষেত্রে কমবেশি হয়। ফলে এদিক থেকে ঈমান বাড়ে-কমে বলা যায়।[৩৪১]

শামসুদ্দিন সমরকন্দি লিখেন, 'বাস্তব কথা হলো, ঈমান বাড়ে ও কমে, সেটা আমলের অর্থে ধরা হোক অথবা সত্যায়নের অর্থে। কারণ, সত্যায়ন তথা বিশ্বাসটাও কখনো দুর্বল হয় কখনো শক্তিশালী হয়।'[৩৪২]

এই অর্থেই বুঝতে হবে আবু বকর রাযি.-এর ঈমানের ব্যাপারে বর্ণিত উমর রাযি.-এর বক্তব্য। উমর বলেন, 'যদি আবু বকরের ঈমান গোটা জগদ্বাসীর ঈমানের সঙ্গে ওজন করা হয়, তবে তাঁর ঈমান ভারি হবে।'[৩৪৩] এটা আধ্যাত্মিকতা, ঈমানের শক্তি, ইয়াকিনের দৃঢ়তা, মারিফাতের আলো। আবু বকর রাযি. সেসব বিষয়েই বিশ্বাস রাখতেন, যেগুলোতে সব মানুষ বিশ্বাস রাখে; অথচ তাঁর ঈমানের শক্তি ও জ্যোতি, তাঁর ইয়াকিনের স্বচ্ছতা ও দৃঢ়তার ধারেকাছেও নেই কেউ। ফলে ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি বলা হোক কিংবা ঈমানি শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি বলা হোক, ফলাফল সমান। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি হাদিস দ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অধিকতর পছন্দনীয়। তবে দুজনের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে।'[৩৪৪] এখানে রাসুল (ﷺ) মুমিনকে দুর্বল ও শক্তিশালী শব্দে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ, তাদের আমল ও বিশ্বাসের মাত্রায় পার্থক্য রয়েছে। বিশ্বাসকৃত বিষয়ের ক্ষেত্রে দুজনই অভিন্ন মুমিন।

প্রথম পক্ষের খণ্ডন : সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম কুরআনের আয়াত- ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ অর্থ : 'তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন, তাদের ঈমানের সঙ্গে আরও ঈমান বৃদ্ধি পায়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' [ফাতাহ : ৪]- দিয়ে ঈমান বৃদ্ধির দলিল দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস, আলি, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, হাসান বসরি প্রমুখ থেকে এখানে ঈমানকে 'ইয়াকিন' অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউ এটাকে 'সত্যায়ন' অর্থে

---

৩৪১. এ ব্যাপারে হানাফি আলেমদের স্বীকৃতি দেখুন : আস-সাওয়াদুল আজম (৪৮-৪৯)। শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১৪৯)।

৩৪২. আস-সাহায়িফুল ইলাহিয়্যাহ (৪৫৫)।

৩৪৩. আস-সুন্নাহ, খাল্লাল (৪/৪৪)।

৩৪৪. মুসলিম (কিতাবুল কদর : ২৬৬৪)। সুনানে ইবনে মাজা (আবওয়াবুস সুন্নাহ : ৭৯)।

ব্যাখ্যা করেছেন। আর ইয়াকিন ও সত্যায়নের ক্ষেত্রে বেশকম হয়, ঈমানের ক্ষেত্রে হয় না।

তা ছাড়া, কুরআনের সবকিছু আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ এ আয়াতের শাব্দিক অর্থ 'যে জনপদে আমরা ছিলাম সে জনপদকে জিজ্ঞাসা করুন।' কিন্তু আমরা অর্থ নিচ্ছি 'জনপদবাসীকে জিজ্ঞাসা করুন'। একইভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী : ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ এর শাব্দিক অর্থ : 'তোমরা কি যিনি আকাশে আছেন তাঁর থেকে নিরাপদ হয়ে গেছ?' [মুলক : ১৬] এখানে বাহ্যিক অর্থে বোঝা যায়, আল্লাহ আকাশের মাঝে আছেন। অথচ আল্লাহ আকাশের মাঝে অবস্থান থেকে পবিত্র। একইভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী : ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا﴾ এর শাব্দিক অর্থ হলো : 'আমি তাদের উপর আকাশকে মুষলধারে পাঠিয়েছি।' [আনআম : ৬] অথচ প্রকৃত অর্থ হলো, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করা, আকাশ পাঠানো নয়। আল্লাহ তায়ালার বাণী : ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ এর শাব্দিক অর্থ হলো : 'মাথা জ্বলে সাদা হয়ে গেছে।' [মারইয়াম : ৪] অথচ বাস্তব অর্থ হলো, বার্ধক্যে মাথার চুল শুভ্র হয়েছে। একইভাবে কুরআনে বর্ণিত 'ঈমান বৃদ্ধির' উদ্দিষ্ট মর্ম হলো ঈমানের জ্যোতি ও শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া।

কেউ বলতে পারেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একটি হাদিসে বলেছেন, 'যার অন্তরে এক দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।' অর্থাৎ, তাতে চিরস্থায়ী হবে না। এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, ঈমান কম হয়। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করব, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তথা কালিমার নিচে ঈমান আছে কি না? সে যদি বলে, না। আমরা বলব, কালিমা বড় নাকি একটি দানা বড়? অথচ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যদি কালিমাকে একটি পাল্লায় রাখা হয় আর সাত আকাশ ও সাত যমিন এক পাল্লায় রাখা হয়, তবে কালিমা ভারী হয়ে যাবে।' তাহলে বোঝা গেল, এখানে এক দানা বলতে আক্ষরিক পরিমাণ বোঝানো হয়নি। বরং একেবারে আমলহীন ও ন্যূনতম ঈমান বোঝানো হয়েছে।[৩৪৫]

ইমাম রাযি বলেন, "মূল সত্যায়নের ক্ষেত্রে ঈমান বাড়ে-কমে না। কিন্তু ইয়াকিনের ক্ষেত্রে বাড়ে-কমে। কেননা, ইয়াকিনের ক্ষেত্রে ঈমানের স্তরভেদ স্বীকৃত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ

---

৩৪৫. দেখুন : আস-সাওয়াদুল আজম (৫০)।

﴿بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ অর্থ : যখন ইবরাহিম বললেন, হে আমার প্রতিপালক, কীভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন আমাকে দেখান। আল্লাহ বললেন, 'তুমি কি বিশ্বাস করো না?' তিনি বললেন, হ্যাঁ, করি; তবে এটা কেবল আমার চিত্তের প্রশান্তির জন্য।" [বাকারা : ২৬০] এখানে স্পষ্ট যে, 'ইলমুল ইয়াকিন' (জেনে বিশ্বাস)-এর স্তরের চেয়ে 'আইনুল ইয়াকিন' (দেখে বিশ্বাস) আরও ঊর্ধ্বে (ফলে ইয়াকিনের ক্ষেত্রে ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে; মূল ঈমানে নয়)।"[৩৪৬]

অধমের পর্যবেক্ষণ

বাস্তবতা হলো, এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকিহের সঙ্গে ইমাম আজম এবং হানাফি আলেমদের বিরোধ তাত্ত্বিক, মৌলিক নয়। অর্থাৎ, মৌলিকভাবে তাদের কাছেও মূল ঈমান বাড়ে না, বাড়ে আমলের নুর ও শক্তি। কারণ, ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো, যেগুলোতে বিশ্বাস করা ঈমানের জন্য অপরিহার্য, সেগুলোর কোনো একটাতেও যদি কেউ বিশ্বাস পরিত্যাগ করে, তবে তারাও এ কথা বলবেন না যে, তার ঈমান কমে যাবে। বরং বলবেন, সে কাফের হয়ে যাবে। আবার মুমিনদের কেউ এমন কোনো বিষয়ে বিশ্বাস রাখে না যাতে অন্য মুমিনরা না রাখে। উদাহরণস্বরূপ, যেসব মুহাদ্দিস ও ফকিহ ঈমান বৃদ্ধির প্রবক্তা, তারা এমন কোনো বিশেষ বিষয়ে ঈমান রাখেন না ইমাম আজম কিংবা তাঁর অনুসারীরা যাতে ঈমান না রাখেন! বরং প্রত্যেকেই সমান ও অভিন্ন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখেন, স্বীকৃতি দেন। ফলে মূলত ঈমানের ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে ঈমানের নুর ও শক্তিতে। নবি-রাসুল, ওলি-আউলিয়া ও পুণ্যবানদের ঈমানে যে শক্তি ও নুর থাকে, সাধারণ মানুষ কিংবা গুনাহগারদের ঈমানে সে নুর ও শক্তি থাকে না! হিজরি সপ্তম শতাব্দের হানাফি আলেম রুকনুদ্দিন সমরকন্দি (৭০১ হি.) লিখেন, 'মাহিয়্যাতুল ঈমান' তথা মূল ঈমান বাড়ে বা কমে না। কিন্তু ঈমানের গুণাবলি ও নুর বাড়ে-কমে।[৩৪৭]

বস্তুত সালাফের যেসব ইমাম ঈমান বাড়া ও কমার কথা বলেছেন, সেটা মূলত নস তথা কুরআন-সুন্নাহর বাহ্যিক ও আক্ষরিক বক্তব্যের প্রতি সম্মান দেখিয়ে। অর্থাৎ, কুরআন-সুন্নাহতে যেহেতু বাড়া ও কমার কথা বোঝা যায়, এ জন্য তারা বলেছেন। নতুবা মূল মর্মের ক্ষেত্রে তাদের মাযহাব আর ইমাম আজমের মাযহাবের

---

৩৪৬. শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৭৭)।
৩৪৭. আল-আকিদাতুর রুকনিয়্যাহ (পাণ্ডুলিপি) (২)।

মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ, মূল ঈমানের ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি নেই। এ কারণে সালাফের ইমামদের কেউ কেউ বরং কুরআনে যতটুকু এসেছে এর বাইরেও যেতে চাননি। যেমন—ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত, তিনি ইমাম মালেককে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈমান কি বাড়ে? মালেক বললেন, 'কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ ঈমান বাড়ার কথা বলেছেন।' ইবনে ওয়াহাব বললেন, কমে? ইমাম বললেন, 'এ বিষয়ে কথা বলা বাদ দাও।'[৩৪৮] অর্থাৎ, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা ঈমান বাড়ার কথা বলেছেন, এ কারণে মালেক ঈমান বাড়ার কথা বলেছেন। বিপরীতে আল্লাহ তায়ালা যেহেতু কমার কথা বলেননি, কেউ কেউ বাড়ার উপর ভিত্তি করে কমার কথা বললেও ইমাম মালেক সেটা করতে চাননি। কুরআনে যেহেতু এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, তাই তিনি চুপ থাকতে বলেছেন। এই ছিল আমাদের সালাফের কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ। তবে অন্যান্য বর্ণনাতে—যেমনটা পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে—বোঝা যায়, তিনি বিভিন্ন হাদিস এবং সাহাবাদের বক্তব্য দেখে কমার কথাও বলতেন।

ঈমানের এই হ্রাসবৃদ্ধির হাকিকত সাহাবিদের বক্তব্য থেকেও বোঝা সম্ভব। যেমন—ইবনে আবি শাইবা রাসুলুল্লাহর সাহাবি উমাইর ইবনে হাবিব ইবনে খুমাশাহ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, 'ঈমান বাড়ে ও কমে।' তাকে বলা হলো, কীভাবে? তিনি বললেন, 'যখন আল্লাহকে স্মরণ করি, তাকে ভয় করি, সেটা ঈমান বৃদ্ধি; আর যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাই, তাকে ভুলে যাই, সেটা ঈমানের কমতি।'[৩৪৯]

এখানে দেখুন, ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত আমলের সঙ্গেই সম্পৃক্ত করা হলো। আর হানাফি ইমামগণও আমলের হ্রাসবৃদ্ধির কথা বলেন। এ জন্য ইবনে জারির তাবারি লিখেন, 'যারা ঈমান কমা ও বাড়ার কথা বলেছেন তারা মূলত জানা (মারিফাত), স্বীকৃতি (কওল) ও আমলের প্রতি লক্ষ রেখে বলেছেন। কারণ, মানুষ আমলের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভক্ত। ফলে যে আল্লাহর যত অনুগত, তার ঈমান তত বেশি। যে আল্লাহর যত কম অনুগত, তার ঈমান তত কম।'[৩৫০] উক্ত বক্তব্যে স্পষ্ট যে, শেষ পর্যন্ত তারা (অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের)

---

৩৪৮. আল-ইনতিকা, ইবনে আবদিল বার (৬৯)।

৩৪৯. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (কিতাবুল ঈমান : ৩০৯৬৩)।

৩৫০. দেখুন : আত-তাবসির ফি মাআলিমিদ দ্বীন (১৯৫)।

আমলের দিকে লক্ষ করেই ঈমান হ্রাসবৃদ্ধির কথা বলেছেন। এটা ইমাম আজম এবং হানাফি আলেমদেরও মাযহাব। ফলে অন্য আলেমদের সঙ্গে ইমাম আজমের মতপার্থক্য মৌলিক নয়, বরং শাব্দিক। হযরত রশিদ আহমদ গঙ্গুহি রহ.-সহ আকাবিরে দেওবন্দের মত এটাই।[৩৫১]

আমাদের ঈমান কি ফেরেশতাদের ঈমানের মতো?

ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর এই গভীর বক্তব্য অনেকে বুঝতে না পেরে বাহ্যিক অবস্থার উপর ফয়সালা দিয়েছেন। তারা এটাকে ভ্রান্ত মুরজিয়াদের মতাদর্শ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাদের কথা, আবু হানিফার দাবি, 'আমাদের ঈমান ফেরেশতাদের ঈমানের মতো।' এটা মুরজিয়াদের বক্তব্য! এই সন্দেহের কারণ হলো, তারা কেবল বাহ্যিকভাবে ইমামের বক্তব্য বিচার করেছেন, গভীরে যাননি। অথচ ইমাম নিজেই এ সংশয়ের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, **'আমাদের ঈমান নবিদের ঈমানের মতো। কারণ, তারা যেসব বিষয়ে ঈমান এনেছেন, আমরাও সেসব বিষয়ে ঈমান এনেছি। এরপর রইল সওয়াবের কথা। ঈমানের সওয়াব এবং সকল ইবাদতের সওয়াবের ক্ষেত্রে তারা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেননা, তারা নবুওতপ্রাপ্ত। পাশাপাশি তাদের চালচলন, কথাবার্তা, ইবাদত-বন্দেগি সবকিছু আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সবকিছুতে তারা আমাদের চেয়ে মর্যাদাবান।'**[৩৫২]

প্রশ্ন হতে পারে, আমাদের ঈমান ফেরেশতাদের ঈমানের মতো হলে ফেরেশতারা আমাদের চেয়ে আল্লাহর অধিক অনুগত কেন? তা ছাড়া, আমাদের কেউ ভুল করে ফেললে তাকে আমরা দুর্বল ঈমানের লোক বলি কেন? এর মাধ্যমে কি প্রমাণিত হয় না যে, ফেরেশতাদের ঈমান আমাদের ঈমানের চেয়ে শক্তিশালী? ইমাম বলেন, **'যারা এসব কথা বলে, তারা ঈমান ও ইয়াকিনের সংজ্ঞার্থ সম্পর্কে বেখবর। ইয়াকিন হচ্ছে কোনো বিষয়ে সন্দেহাতীত বিশ্বাস রাখা। শাহাদাতপন্থি কোনো মুসলমানই আল্লাহ তায়ালা, তাঁর কিতাব কিংবা তাঁর প্রেরিত নবি-রাসুলের মাঝে সন্দেহ করে না, যদিও আমলের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি হয়ে থাকে। বিষয়টি আমাদের নিজেদের সঙ্গে তুলনা করেও দেখতে পারি। অনেক সময় আমাদের পদস্খলন ঘটে। আমরা ভয় পেয়ে যাই। দুশমনের সামনে আমরা ঘাবড়ে**

---

৩৫১. ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া (১০৫)।

৩৫২. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৬)।

যাই। কিন্তু এর অর্থ কি আমরা আল্লাহ ও রাসুলের ক্ষেত্রে সন্দেহ করি? না। সুতরাং অন্যদের ক্ষেত্রেও একই ধারণা রাখতে হবে।'[৩৫৩]

ইমামকে প্রশ্ন করা হলো, আমাদের ঈমান ও ইয়াকিন ফেরেশতাদের ঈমান ও ইয়াকিনের মতো হয় কী করে, অথচ তারা আমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করে? ইমাম বলেন, 'হ্যাঁ, এটা সম্ভব। এর উদাহরণ দুজন সাঁতারুর মতো। সাঁতারের কলাকৌশল সমানভাবে রপ্ত তাদের। একটা প্রচণ্ড স্রোতঃস্বিনী নদীর পাশে গেল দুজনে। একজনে নদীতে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিলো। আরেকজন ভয় পেল কিংবা ইতস্তত করল। দুজনের জানা সমান। কিন্তু কাজের গতি ভিন্ন। অথবা অন্য একটি উদাহরণ দেখুন। দুই ব্যক্তি। দুজনে একই রোগে আক্রান্ত। ঔষধ তিতা। একজনে দ্রুত পান করল, আরেকজন ধীরে করল।'[৩৫৪]

ইমাম আরও বলেন, 'আমল ঈমানের অংশ নয়। আমলের ক্ষেত্রে ফেরেশতারা আমাদের চেয়ে ঊর্ধ্বে হলেও ঈমানের দিক থেকে সমান। কীভাবে? কারণ আল্লাহর তাওহিদ, রবুবিয়্যাত, কুদরতসহ তাঁর পক্ষ থেকে আসা যেসকল বিষয়ে ফেরেশতারা ঈমান এনেছেন, আমরাও ঠিক সেসব বিষয়েই ঈমান এনেছি। নবি-রাসুলগণও ঠিক সেসব বিষয়ই সত্যায়ন করেছেন। এ কারণেই আমরা বলেছি যে, আমাদের ঈমান ফেরেশতাদের ঈমানের মতো। কারণ, তারা যেসব বিষয়ে ঈমান এনেছেন, আমরাও সেসব বিষয়ে ঈমান এনেছি।'[৩৫৫]

আমাদের ঈমান এবং ফেরেশতাদের ঈমানের উদাহরণও তেমন। মূল বিষয় দুজনের কাছেই সমান। দুজনেই সমান ও অভিন্ন বিষয়ের উপর ঈমান রাখি। কিন্তু সেটার প্রকাশ, প্রভাব, ফলাফল, শক্তি, স্তর, মান সবকিছু ভিন্ন। এভাবে বুঝলে আর ইমামের কথার উপর আপত্তি থাকে না। তথাপি এ ধরনের কথা না বলা উচিত। কারণ, তাতে ভুল বোঝার আশঙ্কা থাকে। এ জন্য ইমাম থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেন, 'আমার ঈমান ফেরেশতা জিবরিলের ঈমানের মতো।'—এই কথা বলা আমি অপছন্দ করি। বরং বলবে, জিবরিল যেসব বিষয়ে ঈমান রাখেন আমিও সেসব বিষয়ে ঈমান রাখি।[৩৫৬]

---

৩৫৩. প্রাগুক্ত (১৫)।

৩৫৪. প্রাগুক্ত (১৫)।

৩৫৫. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৪)। আল-ফিকহুল আবসাত (৪৬)।

৩৫৬. দেখুন : খোলাসাসূত্রে রদ্দুল মুহতার, ইবনে আবিদিন (৩/২৭৪)।

উপরের আলোচনাতে স্পষ্ট যে, ইমাম আজম 'আমার ঈমান ফেরেশতাদের ঈমানের মতো।'—এমন কথা বলা অপছন্দ করতেন। যদিও কোনো কোনো বর্ণনায় তাঁর থেকে এমন বক্তব্য পাওয়া যায় যেমনটা 'আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিমে'র উদ্ধৃতিতে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি ইমাম আজম থেকে এ ধরনের বক্তব্য চূড়ান্ত প্রমাণিত মেনে নেওয়া হয়, তথাপি এটা উপর্যুক্ত অর্থে বাস্তবসম্মত বক্তব্য এবং তাতে কোনো জটিলতা নেই। কারণ, এমন অর্থ সম্পূর্ণ সঠিক। তথাপি ইমাম আজমের প্রতিপক্ষের লোকেরা এটাকে তাঁর সমালোচনার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং এ বক্তব্যের কারণে তাঁকে মুরজিয়া আখ্যা দিয়ে তাঁর কঠোর সমালোচনা করে। আহলে সুন্নাতের অনেক ইমামও প্রতিপক্ষের প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে ইমামের সমালোচনা করেন। অথচ ইমামের প্রকৃত ও বিস্তারিত বক্তব্য যদি তারা জানতেন, দেখতেন ইমামের বক্তব্য হুবহু আহলে সুন্নাতের বক্তব্য। এ ধরনের বক্তব্যের জন্য তাকে মুরজিয়া বলা অন্যায়। আমরা সামনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দেখব, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা ইমাম মালেক রহ.-কে রহম করুন। তিনি কানকথার উপর ভিত্তি করে ইমাম আজমকে গোমরাহ বলেননি; বরং তিনি বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য মানুষের কাছ থেকে ইমামের বক্তব্য শুনতে চাইতেন। যেমন—ইমামের পৌত্র উমর ইবনে হাম্মাদকে ইমাম মালেক রহ. বলেন, আমি শুনেছি আবু হানিফা বলতেন, তার ঈমান জিবরিলের ঈমানের মতো। উমর বলেন, 'আপনার কাছে বাতিল সংবাদ পৌঁছেছে। বরং তিনি বলতেন, আল্লাহ তায়ালা জিবরিলকে রাসুল হিসেবে নবিজির কাছে পাঠিয়েছেন। তার আগে অন্য সকল নবির কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং রিসালাতের সত্যায়নের প্রতি দাওয়াত দিতে বলেছেন। সকল নবি এবং তাদের অনুসারীদের ঈমানের বিষয়গুলো ছিল এক, কেবল শরিয়ত ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এ জন্য আমি বলি না, তাঁর ঈমান আমার ঈমানের মতো নয়। কারণ, সেটা বললে ঈমান একাধিক হয়ে যাবে। অথচ নবিগণ একই ঈমানের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। তাদের শরিয়ত ভিন্ন ভিন্ন ছিল...।' এ কথা শুনে মালেক মুচকি হাসলেন, কিন্তু কিছু বললেন না।[৩৫৭] খুব সম্ভবত মালেক এ যুক্তির সঙ্গে একমত হতে পারেননি। সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু ইমাম আজমকে উক্ত বক্তব্যের কারণে মুরজিয়া কিংবা বিচ্যুত বলা যে বিচ্যুতি, সেটা উক্ত কথোপকথনে স্পষ্ট।

---

৩৫৭. দেখুন : আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১১৩-১১৪)।

আবু হাফস বুখারি এ ধরনের বক্তব্যের ব্যবহারের বৈধতা দেখিয়ে বলেন, 'আমাদের ঈমান, জিবরাইল ও মিকাইলসহ ফেরেশতাদের ঈমান এবং সকল নবি-রাসুলের ঈমান এক। কেননা, আমরা ঈমানের যা যা সাক্ষ্য দিই, ফেরেশতারাও সেসব বিষয় সাক্ষ্য দেন, বেশি কিছু সাক্ষ্য দেন না। সুতরাং যে বলবে ফেরেশতারা আমাদের চেয়ে বেশি কিছু সাক্ষ্য দেন, সে বিদআতি। একইভাবে মানুষ ফেরেশতাদের চেয়ে কম কিছুর সাক্ষ্য দেবে, সেটাও অসম্ভব। যেহেতু মানুষ ও ফেরেশতা উভয়ের সত্যায়িত বিষয় এক ও অভিন্ন, বোঝা গেল, মৌলিকভাবে দুজনের ঈমান সমান। হ্যাঁ, আমলের ক্ষেত্রে ফেরেশতারা আমাদের ঊর্ধ্বে।'[৩৫৮]

ইমাম তহাবি রহ. বলেন, 'ঈমান একটি একক। মূল ঈমানের ক্ষেত্রে সকল মুমিন অভিন্ন স্তরে। তবে তাদের মাঝে স্তরভেদ ঘটে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সর্বাবস্থায় উত্তম পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে। সকল মুমিন দয়াময় আল্লাহর বন্ধু। আর তাদের মাঝে সে সর্বোত্তম যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি অনুগত, সবচেয়ে বেশি কুরআনের কাছে সমর্পিত।'[৩৫৯]

সদরুল ইসলাম বাযদাবি বলেন, 'এক দৃষ্টিতে ঈমান বাড়ে বা কমে না। আরেক দৃষ্টিতে বাড়ে-কমে। অর্থাৎ, মৌলিক ঈমানের ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি নেই। সবাইকে সমান বিষয়ে বিশ্বাস রাখতে এবং স্বীকৃতি দিতে হয়। ফলে ঈমানের মূল সত্তায় হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। হ্রাসবৃদ্ধি হয় ঈমানের গুণাবলিতে। ফলে কারও ঈমান অন্যদের ঈমানের চেয়ে অধিকতর পূর্ণ থাকে। এক্ষেত্রেই মুমিনদের মাঝে স্তরভেদ ঘটে। এ জন্য ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, 'আমার ঈমান ফেরেশতাদের ঈমান সদৃশ; ফেরেশতাদের ঈমানের সমান নয়।'[৩৬০]

---

৩৫৮. আস-সাওয়াদুল আজম (৪২)।
৩৫৯. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২২)।
৩৬০. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৫৬)।

ঈমান ও ইস্তিসনা

ইস্তিসনার পরিচয়

আরবি শব্দ 'ইস্তিসনা' (الاستثناء)-এর অর্থ হলো, 'ইনশাআল্লাহ' বলা। ঈমানের ক্ষেত্রে 'ইস্তিসনা' অর্থ হলো, 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ' বলা। যেমন—কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি মুমিন কি না? তখন উত্তরে স্রেফ 'আমি মুমিন' বলা হবে, নাকি 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ' বলা হবে?

স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকালে এটাকে আজ একটা সাধারণ মাসআলা মনে হবে। 'আপনি মুমিন কি না'—এ প্রশ্নের জবাবে স্রেফ 'আমি মুমিন' বলা কিংবা আরেকটু বিনয়ের সঙ্গে 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ' বলা দুটোকেই সঠিক মনে হবে। বাস্তবেও তাই। কিন্তু ফেতনার যুগে এই সাধারণ বিষয়টি নিয়েও প্রচুর তর্কবিতর্ক হয়েছে। যুগের পর যুগ এটা নিয়ে আলেমগণ কথা বলেছেন। আকিদাবিষয়ক গ্রন্থগুলোতে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আজও এটা নিয়ে তর্কবিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। ফলে আলোচনা পূর্ণতাদানের লক্ষ্যে আমরাও এখানে বিষয়টি নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা লিখব, ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন আসতে পারে, এমন একটি 'অবান্তর' বিষয় নিয়ে এত বিতর্ক কেন হলো? সংক্ষেপে এর উত্তর হলো—এটা আহলে সুন্নাতের ইমামগণ নিজেরা শুরু করেননি, বরং মুরজিয়ারা এই বিদআত আবিষ্কার করে এবং আহলে সুন্নাতকে এর মাঝে ঢুকিয়ে দেয়। তারা মূলত এটা করেছিল তাদের ভ্রান্ত মাযহাবকে সত্য প্রমাণ করতে। নিদেনপক্ষে আহলে সুন্নাতের মুখ থেকে জোর করে হলেও স্বীকৃতি নিতে। আরেকটু ব্যাখ্যা দেয়া যাক:

মুরজিয়াদের মতে, ঈমান হলো স্রেফ সত্যায়নের নাম। আমলের কোনো অংশ নেই তাতে। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকটা মুমিনের মাঝে আমলের ত্রুটিবিচ্যুতি ও ঘাটতি থাকে। ফলে কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি মুমিন? সে যদি বলে, 'আমি মুমিন', তবে সে একরকম স্বীকার করে নিল যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

নয়। কারণ, তার আমলে ত্রুটি আছে। কিন্তু সেই ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নিজেকে মুমিন পরিচয় দেওয়ার অর্থ হলো আমলকে ঈমানের অংশ মনে না করা! আর যদি বলে, 'আমি মুমিন নই', তবে তো সে কাফের হয়ে যাবে। এভাবে আহলে সুন্নাতকে তারা একটা অর্থহীন বিতর্কের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এ কারণে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলসহ সালাফের অন্য আলেমগণ এ বিষয়ে কথা বলা অপছন্দ করতেন। কেউ তাদের এমন প্রশ্ন করলে জবাব দিতে চাইতেন না।

উলামায়ে কেরামের মাযহাব

সূচনা যেভাবেই হোক, ধীরে ধীরে এই বিতর্ক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মুরজিয়া ও জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় 'ইনশাআল্লাহ' বলাকে হারাম মনে করে। বিপরীতে কুল্লাবিয়্যাহ সম্প্রদায় 'ইনশাআল্লাহ' বলা আবশ্যক (ওয়াজিব) করে দেয়। দুঃখজনক বিষয় হলো, পরবর্তী সময়ে খোদ আহলে সুন্নাতের ইমামগণ নিজেরা পারস্পরিক মতভেদে জড়িয়ে পড়েন। একদল বলেন, 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ', আরেক দল ইনশাআল্লাহ ছাড়া স্রেফ 'আমি মুমিন' বলাকে উত্তম মনে করেন। এই অর্থহীন বিতর্কের অনেক কুফল ছিল। অন্যতম হলো, আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ধারার মাঝে দূরত্ব তৈরি হওয়া, উম্মাহর ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হওয়া। আজও তা সমান তবিয়তে এবং সমান কুফল নিয়ে বহাল রয়েছে।

মোটকথা, একদল ফকিহ ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে ঈমানের ক্ষেত্রে ইস্তিসনা তথা 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ' বলা বৈধ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি ইয়াহইয়াহ ইবনে সাইদকে বলতে শুনেছি, 'আমরা সকল আলেমকে ইস্তিসনা করতে দেখেছি'।"[৩৬১] আলকামাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি মুমিন? তিনি বললেন, 'আশা করি, ইনশাআল্লাহ।'[৩৬২] আবুল হাসান আশআরিও ইস্তিসনার পক্ষে ছিলেন।[৩৬৩]

ইমাম আজমের মাযহাব

বিপরীতে ইমাম আজমসহ একদল আলেমের মত হলো এক্ষেত্রে 'ইনশাআল্লাহ' পরিত্যাগ করা। ইমাম রহ. মনে করেন প্রত্যেকে বলবে, **'আমি অবশ্যই মুমিন।' ঈমান নিয়ে সন্দেহ করবে না। কারও আমলে ত্রুটি থাকলেও সে**

---

৩৬১. আশ-শরিয়াহ, আজুররি (২/৬৬০)।

৩৬২. আল-ঈমান, আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম (৩৮)।

৩৬৩. দেখুন : আর-রাওযাতুল বাহিয়্যাহ, আবু আযবাহ (৬)।

অবশ্যই মুমিন। কারণ, ঈমানের ক্ষেত্রে তার কোনো সন্দেহ নেই। এ কারণে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন হারেসা রাযি.-কে প্রশ্ন করলেন, কীভাবে সকাল করেছ? তিনি বললেন, অবশ্যই মুমিন হিসেবে...। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, যদি কারও এমন ব্যক্তি দেখতে মন চায় যার অন্তঃকরণকে আল্লাহর নুর পূর্ণ করে দিয়েছেন, সে যেন হারেসাকে দেখে।[৩৬৪]

ইমাম আজম বলেন, "কুফরের মাঝে যেমন কোনো সন্দেহের জায়গা নেই, ঈমানের মাঝেও তেমন সন্দেহের জায়গা নেই। বরং যে মুমিন, সে প্রকৃত অর্থেই নিঃসন্দেহে মুমিন। আবার যে কাফের, সে প্রকৃত অর্থেই নিঃসন্দেহে কাফের, যেমনটা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন, ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ অর্থ : 'তারাই প্রকৃত মুমিন।' [আনফাল : ৭৪] আবার তিনি বলেন, ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ অর্থ : 'তারাই প্রকৃত কাফের।' [নিসা : ১৫১] ফলে তাওহিদ ও রাসুলুল্লাহর রিসালাতের অনুসারীদের মাঝে যারা গুনাহগার, তারা (গুনাহ সত্ত্বেও) নিঃসন্দেহে মুমিন। তারা সন্দেহাতীতভাবেই কুফর থেকে মুক্ত।"[৩৬৫]

ইমাম আজম বলেন, "যদি কেউ বলে, 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ', তবে তাকে বলা হবে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ অর্থ : 'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবির প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ, তোমরা নবির জন্য রহমতের দোয়া করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো।' [আহযাব : ৫৬] সুতরাং তুমি যদি মুমিন হয়ে থাকো, তবে তাঁর উপর সালাম পাঠ করো। আর যদি মুমিন না হয়ে থাকো, তবে সালাম পাঠের দরকার নেই। একইভাবে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ অর্থ : 'হে মুমিনগণ, জুমার দিনে যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে দ্রুত ছুটে যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা অনুভব করো।' [জুমুআহ : ৯] সুতরাং তুমি যদি মুমিন হয়ে থাকো, তবে আযানের ডাকে সাড়া দাও। আর যদি মুমিন না হয়ে থাকো, তবে সাড়া দেওয়ার দরকার নেই।"[৩৬৬]

---

৩৬৪. আল-ফিকহুল আবসাত (৪৬)। আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১১০)।

৩৬৫. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৩১)।

৩৬৬. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৬)।

কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের একটি দল ইমাম আজমের কাছে এসে বলল, আপনি কি মুমিন? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' তারা বলল, আপনি কি আল্লাহর কাছেও মুমিন (মানে আপনি যে নিশ্চিত মুমিন সেটা জানলেন কী করে)? তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমার জানার থাকা কথা জানতে চাইছ, নাকি আল্লাহর কাছে যেটা আছে সেটা?' তারা বলল, আপনার যেটা জানা সেটা বলুন, আল্লাহরটা নয়। তিনি বললেন, **'আমি যেটা জানি সেটা হলো, আমি মুমিন। আল্লাহর কাছে কী আছে সেটা আমার জানা দরকার নেই।**'(৩৬৭) ইমামের উদ্দেশ্য, প্রত্যেকের উচিত ঈমান এনে নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ পালন করে যাওয়া। আল্লাহর কাছে তাঁর ব্যাপারে কী লেখা আছে এবং তার পরিণতির ব্যাপারে আল্লাহর কী সিদ্ধান্ত, সেটা যেহেতু কারও জানা নেই, সুতরাং এমন বিষয়ের পিছনে পড়া অর্থহীন। ফলে নিজের ঈমান নিয়ে অযথা সন্দেহ করাও অমূলক।

সকল হানাফি আলেমের মত ইমাম আজমের মতোই। এ ব্যাপারে তাদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। ফলে তাদের মতে, 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ।'—এ ধরনের কথা বিশুদ্ধ নয়; বরং 'আমি মুমিন' অথবা 'আমি অবশ্যই মুমিন।'—এভাবে বলতে হবে।[৩৬৮] উক্ত মতের সমর্থনে তারা একাধিক দলিল পেশ করেন:

এক. ঈমানের মাঝে কোনো সন্দেহ-সংশয় বৈধ নয়। ঈমান হলো সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতির নাম, আর 'ইনশাআল্লাহ' সেই দৃঢ়তার প্রতিবন্ধক। কারণ, 'ইনশাআল্লাহ' বলা বর্তমানে চূড়ান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা বোঝায়। এটা ভবিষ্যতের প্রতি ঈঙ্গিতবাহী। আল্লাহর ইচ্ছা আছে কি নেই সেটা বান্দার জানার উপায় নেই। তা ছাড়া, এটা বান্দার দায়িত্বও নয়। বান্দার দায়িত্ব হচ্ছে নিজের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ও সন্দেহাতীত ঘোষণা করা। ইমাম মাতুরিদি বলেন, "আমাদের মূলনীতি হলো সন্দেহাতীতভাবে ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়া, 'ইস্তিসনা' পরিত্যাগ করা। কেননা, ঈমান পূর্ণ হওয়ার জন্য যেসব বিষয়ে বিশ্বাস রাখা জরুরি, সেখান থেকে কোনো জিনিস আলাদা (ইস্তিসনা) করলে ঈমান পূর্ণই হয় না। ফলে ঈমানের ক্ষেত্রে ইস্তিসনার উদাহরণ হবে এমন বলা যে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, ইনশাআল্লাহ', অথবা 'মুহাম্মাদ আল্লাহর

---

৩৬৭. আল-ইনতিকা (৩১৬)।

৩৬৮. দেখুন : আল-ইতিকাদ, বলখি (৯৮)। জুমাল মিন উসুলিদ্দিন (২৭)। তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১০৯৩)।

রাসুল, ইনশাআল্লাহ।' অথচ এটা কেউ বলবে না। ফলে 'ইস্তিসনা' না করা আহলে সুন্নাতের আকিদা। বিপরীত আকিদা রাখে মুতাযিলা, খাওয়ারেজ ও হাশাবিয়্যাহ সম্প্রদায়। তারা ঈমানের ক্ষেত্রে ইস্তিসনা করে।"[৩৬৯]

দুই. কুরআন দ্বারাও ঈমানের ক্ষেত্রে 'ইস্তিসনা' পরিত্যাগ সাব্যস্ত হয়। কারণ, কুরআনের কোথাও আমরা ঈমানের ক্ষেত্রে ইস্তিসনা (তথা ইনশাআল্লাহ) বলার প্রমাণ পাই না। আল্লাহ তায়ালা যখন ইবরাহিম আ.-কে বললেন, ﴿إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ অর্থাৎ, 'তুমি আত্মসমর্পণ করো। তিনি বললেন, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।' [বাকারা : ১৩১] তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি। একইভাবে ফিরাউনের যাদুকরদের ঈমান আনার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ অর্থাৎ, 'তারা বলল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার উপর ঈমান আনলাম।' [আরাফ : ১২১] এখানেও 'ইনশাআল্লাহ' নেই। আল্লাহ অন্যত্র মুমিনদের ব্যাপারে বলেন, ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ অর্থ : 'যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন; তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।' [আনফাল : ৭৪] কাফেরদের ব্যাপারেও বলেন, ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ অর্থ : 'এরাই প্রকৃত কাফের এবং কাফেরদের জন্য আমি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।' [নিসা : ১৫১] বিপরীতে মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেন, ﴿مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا﴾ অর্থ : 'তারা দোটানায় দোদুল্যমান—না এদের দিকে, না ওদের দিকে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন আপনি তার জন্য কখনো কোনো পথ পাবেন না।' [নিসা : ১৪৩] চতুর্থ কোনো পর্যায় নেই। সুতরাং ঈমানের ক্ষেত্রে ইস্তিসনা (ইনশাআল্লাহ বলা) যাবে না। হ্যাঁ, জাগতিক বিষয়ে ইনশাআল্লাহ বলা যাবে, কিন্তু ঈমানের ক্ষেত্রে নয়। কারণ, ঈমানের ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ-দোদুল্যমানতা বৈধ নয়। এটা নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করতে হয়।[৩৭০]

তিন. খোদ সাহাবাদের মানহাজ হলো ঈমানের ক্ষেত্রে 'ইস্তিসনা' তথা ইনশাআল্লাহ বলা পরিত্যাগ করা। সাহাবাগণ যেটা করেননি, সেটা করা

---

৩৬৯. বিস্তারিত দেখুন : আত-তাওহিদ (২৮০-২৮১)।
৩৭০. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, সমরকন্দি (২২-২৩)।

নিষ্প্রয়োজন; বরং সেটা পরিত্যাজ্য, যেমন ইবনে আব্বাস রাযি.-এর ঘটনা। একব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে এসে বলল, ইবনে আব্বাস, আমি কি বলব, 'আমি সত্যিই মুমিন', নাকি বলব, 'আমি মুমিন, ইনশাআল্লাহ'? ইবনে আব্বাস তাকে বললেন, তুমি কি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের কাছ থেকে যা-কিছু এসেছে তাতে বিশ্বাস রাখো? সে বলল, হ্যাঁ। ইবনে আব্বাস বলেন, তাহলে বলবে, 'আমি সত্যিই মুমিন।' আবু হাফস বলেন, "এটাই যৌক্তিক। কেউ যদি তার দাসকে বলে, তুমি স্বাধীন ইনশাআল্লাহ, কিংবা কেনাবেচার সময় বলে, আমি ক্রেতা বা বিক্রেতা ইনশাআল্লাহ, তবে তাদের কোনো চুক্তি শুদ্ধ হবে না। একইভাবে যদি বলে, 'আমি মুমিন, ইনশাআল্লাহ', তবে ঈমান শুদ্ধ হবে না।"[৩৭১]

ইমাম আজম সূত্রে ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তিনি একবার একটি বকরি যবাই দেওয়ার জন্য রাস্তায় বের হলেন। এক ব্যক্তিকে দেখে (যবাইয়ে সহায়তা চাওয়ার উদ্দেশ্যে) বললেন, 'তুমি কি মুমিন?' সে বলল, 'ইনশাআল্লাহ।' ইবনে উমর বললেন, 'যে তার ঈমানে সন্দেহ করে, তাকে দিয়ে যবাই দেওয়া যাবে না।' একটু পরে আরেক লোক এলে তাকে বলেন, 'তুমি কি মুমিন?' সে বলে, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে যবাইয়ের অনুমতি দেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, ইবনে উমর ঈমানের ক্ষেত্রে 'ইনশাআল্লাহ' বলাকে সন্দেহ হিসেবে দেখতেন। সাফফার বলেন, 'সালাফের এই সুস্পষ্ট মাযহাবের কারণে যে ব্যক্তি ঈমানের ক্ষেত্রে 'ইনশাআল্লাহ' বলত, ইমাম আজম রহ. তার পিছনে নামায পড়তেন না। সুফিয়ান সাওরি প্রথমে ইস্তিসনার কথা বললেও পরবর্তীকালে এ মত থেকে ইমামের মতে ফিরে আসেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলতেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের ক্ষেত্রে সন্দেহ করবে (অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ বলবে), সে মুমিন নয়।'[৩৭২]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনিও প্রথমে 'আমি মুমিন, ইনশাআল্লাহ' বলতেন। পরবর্তীকালে ঈমানের ক্ষেত্রে 'ইনশাআল্লাহ' বলা পরিত্যাগ করেন। তাকে একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—ভিতরে ও বাইরে মুমিন, ভিতরে ও বাইরে কাফের, বাইরে মুমিন ভিতরে কাফের (তথা মুনাফিক)—এ কথা আপনি জানেন কি? ইবনে মাসউদ বললেন, 'হ্যাঁ, জানি।' লোকটি তাকে বলল, আমি আল্লাহর

---

৩৭১. আস-সাওয়াদুল আজম (২, ৬-৭)।
৩৭২. তালখিসুল আদিল্লাহ (৭১৮-৭২১)।

নামে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কোন দলে? তিনি বললেন, 'আমি ভিতরে ও বাইরে মুমিনদের দলে। আমি মুমিন (أنا مؤمن)।'[৩৭৩]

সাইদ ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত, উমর রাযি.-এর কাছে এ মর্মে সংবাদ গেল যে, শামের একব্যক্তি নিজেকে বলে, 'আমি মুমিন' (ইনশাআল্লাহ বলা ছাড়া)। উমর তাকে মদিনায় হাজির করার নির্দেশ দেন। উমরের সামনে এলে উমর তাকে বলেন, তুমি কি নিজেকে মুমিন দাবি করো? লোকটি বলল, হ্যাঁ। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে তো মানুষ স্রেফ তিন গ্রুপে বিভক্ত ছিল। মুমিন, কাফের ও মুনাফিক। আল্লাহর শপথ! আমি কাফের নই, আমি মুনাফিকও নই। উমর জবাব শুনে খুশি হয়ে বললেন, 'তোমার হাতটা বাড়িয়ে দাও।'[৩৭৪]

তাবেয়ি ইবরাহিম আত-তাইমি (৯২ হি.) বলেন, "কেউ যদি বলে, 'আমি মুমিন' (ইনশাআল্লাহ ছাড়া), তবে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, সে যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তাকে সত্য বলার জন্য শাস্তি দেবেন না নিশ্চয়ই। আর যদি মিথ্যা হয়ে থাকে, তবে কুফরের চেয়ে তো আর বেশি মারাত্মক না।"[৩৭৫]

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তোমরা বিভ্রান্ত ও তর্কপ্রিয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিতর্ক করো না। চারটি বিষয় মনে রাখতে পারলে তোমরা এই উম্মতের প্রথম প্রজন্ম যে পথে ছিল সে পথে থাকতে পারবে : (এক.) তাকদিরের ভালোমন্দ সবকিছুতে বিশ্বাস রাখবে। (দুই.) গুনাহের কারণে কোনো মুসলিমকে কাফের বলবে না। (তিন.) নিজেদের ঈমানের মাঝে সন্দেহ করবে না (অর্থাৎ, 'আমি মুমিন, ইনশাআল্লাহ' বলবে না)। (চার.) আল্লাহর রাসুলের কোনো সাহাবির সমালোচনা করবে না।"[৩৭৬]

ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.) তাঁর সহিহতে বলেন, অতীতের ক্ষেত্রে 'ইস্তিসনা' (তথা ইনশাআল্লাহ) বলার সুযোগ নেই। ভবিষ্যতের কিছু ক্ষেত্রে 'ইনশাআল্লাহ' বলা বৈধ, কিছু ক্ষেত্রে বৈধ নয়; বরং সেসব ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বললে মানুষ কাফের হয়ে যাবে। যেমন—কাউকে জিজ্ঞাসা করা হলো : তুমি কি আল্লাহ, ফেরেশতা, নবি-রাসুল, কিতাব, জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাসী? তখন জবাবে বলতে

---

৩৭৩. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (কিতাবুল ঈমান ওয়ার রুইয়া : ৩০৯৬৮)।
৩৭৪. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (কিতাবুল ঈমান ওয়ার রুইয়া : ৩১০৫২)।
৩৭৫. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (কিতাবুল ঈমান ওয়ার রুইয়া : ৩০৯৬৯)।
৩৭৬. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১২৪)।

হবে : 'হ্যাঁ, আমি অবশ্যই বিশ্বাসী।' যদি বলে, 'ইনশাআল্লাহ, আমি বিশ্বাসী', তবে সেটা কুফর গণ্য হবে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তুমি কি সেসব বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, সকল অর্থহীন কাজ থেকে দূরে থাকে?' তখন সে জবাবে বলতে পারে, 'ইনশাআল্লাহ, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।' যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি কি জান্নাতি? তখন জবাবে বলতে পারে, 'ইনশাআল্লাহ, আমি জান্নাতি।' ইবনে হিব্বানের উক্ত বক্তব্য মূলত ইমাম আজম রহ.-এর মাযহাবই। ফলে ইবনে হিব্বানও মনে করতেন, ঈমানের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলা সন্দেহের মতো, যা বৈধ নয়। বিপরীতে ভবিষ্যৎ পরিণতির ব্যাপারে 'ইনশাআল্লাহ' বলা বৈধ।[৩৭৭]

অধমের পর্যবেক্ষণ

একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নাতের ইমামগণ আর অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা রহ., আবু ইউসুফ, ইবরাহিম আত-তাইমি, ইবনে হিব্বান রহ. এবং অন্য সকল হানাফি ইমামের বক্তব্যের মাঝের 'ইস্তিসনা'-কেন্দ্রিক এই মতপার্থক্যের ফলাফল কী?

বাস্তব কথা হলো, এটাও একটা তাত্ত্বিক মতপার্থক্য। ফলে আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ধারার বক্তব্যের মাঝে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। কারণ, ঈমানের ক্ষেত্রে 'ইস্তিসনা' আহলে সুন্নাতের অন্যান্য ইমামের মতো হানাফি ইমামগণও নাকচ করেননি। তাদের মতে, যদি কেউ বলে, 'আমি আগামীকাল মুমিন হব, ইনশাআল্লাহ', অথবা 'আমি মুমিন অবস্থায় মারা যাব, ইনশাআল্লাহ', অথবা 'আল্লাহর কাছে আমার ঈমান কবুল হবে, ইনশাআল্লাহ।'—এটা কেবল বৈধই নয়, বরং উত্তম। কারণ, 'ইনশাআল্লাহ'টা তখন মূল ঈমানের ক্ষেত্রে নয়; বরং ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকার ক্ষেত্রে হচ্ছে। এটা আহলে সুন্নাতের অন্য ইমামগণের বক্তব্যেরও সারবত্তা। ফলে এক্ষেত্রে কোনো বিরোধ থাকল না।[৩৭৮]

বিভিন্ন আলেম এই মতবিরোধ মৌলিক না হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আবু হাফস লিখেন, "কেউ যদি বলে, 'আমি মুমিন, ইনশাআল্লাহ'কে কোন অর্থে নিচ্ছে সেটা দেখতে হবে। সে যদি বলে, 'গতকাল আমি মুমিন ছিলাম, ইনশাআল্লাহ।'—এটা অর্থহীন বক্তব্য। আর যদি বলে,

---

৩৭৭. সহিহ ইবনে হিব্বান (কিতাবুত তাহারাত : ১০৪৬ নং হাদিস সংশ্লিষ্ট আলোচনা)।
৩৭৮. দেখুন : আল-জাওহারাতুল মুনিফাহ, মোল্লা হুসাইন হানাফি (৫৬)।

‘বর্তমানে মুমিন আছি, ইনশাআল্লাহ’, তবে এটা সন্দেহ। আর যদি ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে বলে, ‘আগামীকালও মুমিন থাকব, ইনশাআল্লাহ’, তবে এ ধরনের ইনশাআল্লাহ বৈধ হবে।”[৩৭৯]

আবু ইসহাক সাফফার লিখেন, “ঈমানের ক্ষেত্রে ‘ইনশাআল্লাহ’ বলা যাবে না; বরং পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে মুমিন ঘোষণা করতে হবে। হ্যাঁ, যদি কেউ ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে শেষ পরিণতি বিবেচনায় ‘ইনশাআল্লাহ’ বলে, সেটা বৈধ হবে।”[৩৮০]

আবু শাকুর সালেমি লিখেন, ‘ইমাম আবু হানিফার বিশুদ্ধ মাযহাব হলো, মানুষ ও ফেরেশতাদের দিক বিবেচনায় ইনশাআল্লাহ বলা যাবে না। কিন্তু লাওহে মাহফুজ এবং আল্লাহর জ্ঞানে কী বিদ্যমান সেটা অজ্ঞাত থাকার কারণে ইনশাআল্লাহ বলা যাবে।’[৩৮১]

কামাল ইবনুল হুমাম বলেন, “কোনো মুসলিম সন্দেহবশত ‘ইনশাআল্লাহ, আমি মুমিন’—এমন বলতে পারে না। বরং মৃত্যুর অবস্থার দিকে তাকিয়ে ‘ইনশাআল্লাহ’ বলতে পারে।”[৩৮২]

আলি কারি লিখেন, ‘যদি কেউ সন্দেহবশত ‘আমি মুমিন, ইনশাআল্লাহ’ বলে, তবে সে নিশ্চিত কাফের। আর যদি আল্লাহর প্রতি আদব দেখিয়ে, সবকিছু আল্লাহর হাতে সমর্পণ করে, ভবিষ্যতে কী হবে সে ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে অথবা আল্লাহর নামের বরকত নিতে কিংবা আত্মতুষ্টি ও নিজের ব্যাপারে নিজে বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দেওয়া থেকে মুক্ত থাকাসহ বিভিন্ন কারণে ‘ইনশাআল্লাহ’ বলে, তবে সমস্যা নেই। কিন্তু তবুও না বলাই ভালো। কারণ, তাতে—তাদের মতে—সন্দেহের অবকাশ থাকে। এ কারণে ‘তামহিদ’ ও ‘কিফায়াহ’ গ্রন্থকার এ ধরনের বক্তব্যকে কুফর বলেছেন। অনেকে হারাম বলেছেন। তাদের যুক্তি—‘আমি জীবিত, ইনশাআল্লাহ’, ‘আমি পুরুষ, ইনশাআল্লাহ।’—এ ধরনের বক্তব্য যেমন অর্থহীন, ‘আমি মুমিন, ইনশাআল্লাহ’ বলাও অর্থহীন। তাই ঈমানের ক্ষেত্রে অর্থহীন বক্তব্য পরিহার করা আবশ্যক। তবে তাদের কেউ কেউ এটাও বলেছেন,

---

৩৭৯. আস-সাওয়াদুল আজম (২, ৬-৭)।

৩৮০. তালখিসুল আদিল্লাহ (৭১৮-৭২১)।

৩৮১. আত-তামহিদ (১১৩)।

৩৮২. ফাতহুল কাদির (১/৪৩৬; ৩/২৩১)।

এখানে কুফরের কোনো কারণ নেই। বরং অনেক সালাফ-সাহাবা-তাবেয়িন এভাবে বলা বৈধ বলেছেন। ইমাম শাফেয়ি এবং তাঁর শাগরেদদের থেকে এমন বর্ণনা পাওয়া যায়। কারণ, একদিকে যেমন বিনয়ের কারণে এটা বলা যায়, অন্যদিকে ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ভিত্তিতেও বলা যায়।[৩৮৩]

ফলে দেখা যাচ্ছে, হানাফি উলামায়ে কেরামের কাছে যদিও স্বাভাবিকভাবে 'আমি মুমিন, ইনশাআল্লাহ'—এ ধরনের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু তারা এটাকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করেন না। সন্দেহমূলক হলে নাকচ করেন। বিপরীতে (আল্লাহ নামের) বরকত গ্রহণ বা শেষ পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা অন্যান্য প্রেক্ষিতে তাদের মতেও 'ইনশাআল্লাহ' বলা 'উত্তম' না হলেও বৈধ ও অনুমোদিত। বরং হানাফিদের কেউ কেউ 'ইনশাআল্লাহ' বলা উত্তমও বলেন। জামালুদ্দিন গযনবি লিখেন, "যদি কেউ—আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ—বলতে 'আমি মুমিন অবস্থায় মারা যাব, ইনশাআল্লাহ' বলে, তবে তার ঈমান গ্রহণযোগ্য, বরং এটা অধিকতর সুন্দর। কেননা, শেষ পরিণতির ব্যাপারে প্রত্যেক মুমিনকে ভয় ও আশার মাঝে থাকা উচিত। আর এটা জানা নেই যে, শেষ পরিণতি ঈমান নাকি কুফরের উপর হবে। এদিকে লক্ষ করে 'ইনশাআল্লাহ' বলা বরং জরুরি।"[৩৮৪] যেমনটা পিছনে বলা হয়েছে, অন্যান্য ইমাম ও মুহাদ্দিসের মতামতও তা-ই। তারাও মূলত 'ইনশাআল্লাহ' বলেন আত্মতুষ্টি থেকে দূরে থাকতে, শেষ পরিণতির প্রতি লক্ষ করে। সন্দেহমূলক 'ইনশাআল্লাহ' বলা তাদের কাছেও নিষিদ্ধ।

ইমাম আজমের পৌত্র উমর ইবনে হাম্মাদ ইমাম মালেক রহ.-কে বলেন, ইমাম আজম ঈমানের ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহের পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং সন্দেহ করাকে বিচ্যুতি মনে করতেন। মালেক বললেন, 'কোন ধরনের সন্দেহ?' উমর বললেন, একদল লোক আছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনে। এর পর বিভিন্ন গুনাহ করার পরে ভাবে সম্ভবত তারা ঈমান থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। তাই যখন কেউ তাদের জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি মুমিন? তারা বলে, ইনশাআল্লাহ। তিনি এটাকে অপছন্দ করতেন।[৩৮৫]

---

৩৮৩. শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (১২৭)।
৩৮৪. উসুলুদ্দিন, গযনবি (২৬৪)।
৩৮৫. দেখুন : আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১১৩-১১৪)।

উক্ত বক্তব্যে স্পষ্ট যে, ইমাম 'ইনশাআল্লাহ' বলাকে নিষেধ করতেন মূলত সন্দেহ বিদ্যমানতার দৃষ্টিকোণ থেকে। সন্দেহ না থাকলে তার মতেও ইনশাআল্লাহ বলাতে কোনো অসুবিধা নেই। এভাবে শাব্দিক অর্থে অন্যান্য আলেমের সঙ্গে ইমামের মতপার্থক্য থাকলেও মৌলিক কোনো মতভেদ নেই। মূল উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে উভয় মাসলাকের বক্তব্য এক ও অভিন্ন। এ জন্য আওযায়ি বলতেন, "যে ব্যক্তি বলবে, 'আমি মুমিন', সেটা ভালো। আবার যে ব্যক্তি বলবে, 'আমি মুমিন, ইনশাআল্লাহ', সেটাও ভালো।"[৩৮৬]

৩৮৬. আল-ঈমান, আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম (৩৮)।

ঈমান ও ইরজা

ইরজার পরিচয় : আরবি 'ইরজা' (الإرجاء) শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো : বিলম্বিত করা, স্থগিত রাখা, মুলতবি করা, নিরপেক্ষ থাকা ইত্যাদি। পরিভাষায় 'ইরজা' ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রয়োগ হয়। যেমন—উসমান রাযি.-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে আলি রাযি.-এর সময়ে সৃষ্ট জটিলতায় কোনো পক্ষে না গিয়ে নিরপেক্ষ থাকা, অথবা আলি ও উসমানের বিষয় আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেওয়া, অথবা কবিরা গুনাহকারীর ব্যাপারে জান্নাতি বা জাহান্নামি সিদ্ধান্ত না দিয়ে তার পরিণতি পরকালে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পিত করা, অথবা আমলকে ঈমান থেকে বিলম্বিত করা, অন্যকথায়, আমলকে ঈমানের অংশ মনে না করা—এই প্রত্যেকটা বিষয়ের উপর 'ইরজা' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। তবে প্রসিদ্ধ অর্থে ইসলামের ইতিহাসে 'ইরজা' বলা হয় 'আমল বর্জন করে কেবল মুখে ঈমানের স্বীকৃতি'কে।

সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে ইরজার মাঝে একাধিক প্রকারভেদ পাওয়া গেলেও ইসলামের ইতিহাসে 'মুরজিয়া' শব্দটি সাধারণত নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, যারা স্রেফ মুখের স্বীকৃতিকে ঈমান মনে করে, আমলের কোনো ধার ধারে না, এ ধরনের বিভ্রান্ত সম্প্রদায়কেই মূলত 'মুরজিয়া' বলা হয়। এর বাইরে কবিরা গুনাহকারীর পরিণতি আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া, সাহাবাদের মাঝে সৃষ্ট জটিলতাকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া, কিংবা ঈমানের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে আমলকে স্বতন্ত্র রেখে ঈমানের অতিরিক্ত অথচ আবশ্যক অঙ্গ গণ্য করা, যা ইমাম আজম এবং হানাফি আলেমদের মাযহাব, এগুলো শাব্দিকভাবে 'ইরজা' হলেও প্রায়োগিকভাবে ইরজা নয়। কারণ, এসব মতবাদের অনুসারী সকলেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত। তাদের প্রত্যেকের মতে, ভালো আমল মুমিনের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। মন্দ আমল বা গুনাহ মুমিনের ঈমানকে ক্ষতি করে। আল্লাহর অবাধ্যতা মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। বিপরীতে ভ্রান্ত মুরজিয়ারা মনে করে, স্রেফ ঈমানই যথেষ্ট, আমলের কোনো প্রয়োজন নেই। গুনাহ মুমিনের কোনো ক্ষতি করে না।

সালাফের দৃষ্টিতে মুরজিয়া

সালাফের পরিভাষায় মুরজিয়া হলো—যারা মনে করে, আল্লাহ তায়ালা, রাসুল এবং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে যা-কিছু নিয়ে এসেছেন, সেগুলো স্রেফ জানা। জানার বাইরে মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন ও আত্মসমর্পণ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান, ভয়, ভরসা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল—এগুলোর কোনোকিছুই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। একইভাবে তাদের কাছে কুফর হলো স্রেফ আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা! ফলে কোনো ব্যক্তির যদি জানা থাকে যে, আল্লাহ বলতে একজন আছেন, এর পর মুখে তাকে অস্বীকার করে, তবুও সে কাফের নয়! আশআরি লিখেন : 'চরমপন্থি মুরজিয়াদের মতে—ঈমান হলো স্রেফ আল্লাহকে জানা, আর কুফর হলো তাকে না জানা। ফলে কেউ যদি তিন খোদায় বিশ্বাস করে, তবুও কাফের হবে না। তবে এটুকু যে, কাফের ছাড়া আর কেউ এটা বলে না। তাদের মতে, আল্লাহকে জানাই যথেষ্ট। এটাই তাকে ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা। তাদের মতে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনাই ইবাদত। ফলে নামায কোনো ইবাদত নয়।'[৩৮৭] এরা মূলত জাহমিয়্যাহ নামে পরিচিত। অর্থাৎ, জাহমিয়্যাহরাই ঈমানের ক্ষেত্রে চরমপন্থি মুরজিয়া।

ইবনে হাযাম লিখেন, 'চরমপন্থি মুরজিয়ারা দুটো ফিরকায় বিভক্ত। এক. যাদের মতে, ঈমান স্রেফ মুখের স্বীকৃতি। ফলে কেউ অন্তরে কুফরি সত্ত্বেও মুখে ঈমানের দাবি করলে মুমিন গণ্য হবে এবং জান্নাতে যাবে (এরা কাররামিয়্যাহ নামে পরিচিত মুরজিয়াদের একটি গ্রুপ)...! দুই. যারা বলে—ঈমান স্রেফ অন্তরের সত্যায়ন। ফলে কেউ যদি অন্তরে সত্যায়ন করার পরে মুখে কোনো কারণ ব্যতীত শুধু শুধু (অন্যকথায় জোরজবরদস্তি ছাড়াও) কুফরি করে, মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়, ইহুদি বা নাসারাদের দলে যোগ দেয়, ক্রুশ পূজা করে, ত্রিত্ববাদের ঘোষণা করে (অর্থাৎ, যত কুফর ও শিরক করুক), সে মারা গেলে পূর্ণ ঈমানদার হিসেবে মারা যাবে! পরকালে জান্নাতি হবে। এটা জাহম ইবনে সাফওয়ানের বক্তব্য' (এরা জাহমিয়্যাহ ও চরমপন্থি মুরজিয়া নামে পরিচিত)।[৩৮৮]

ভ্রান্ত মুরজিয়াদের বিরুদ্ধে আহলে সুন্নাতের ইমামগণ শুরু থেকেই সতর্ক ও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ. বলেন, 'আজকের

---

৩৮৭. মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন (১/১১৪-১১৫)।

৩৮৮. আল-ফাসল (৪/১৫৪-১৫৫)।

মুরজিয়া হলো—যারা বলে, ঈমান স্রেফ মুখের স্বীকৃতি; আমলের কোনো অংশ নেই তাতে। তোমরা তাদের সঙ্গে বসো না। তাদের সঙ্গে পানাহার করো না। তাদের সঙ্গে নামায পড়ো না। তাদের উপর জানাযা পড়ো না।'[৩৮৯]

মুরজিয়াদের বিরুদ্ধে ইমাম আজমের সংগ্রাম

ইমাম আজমের সময় ইরজা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি এবং বিভিন্ন বিচ্যুতি প্রকাশ পেলে আহলে সুন্নাতের অন্যান্য ইমামের মতো তিনিও এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। বরং তিনি ছিলেন এই সংগ্রামের প্রথম সারিতে। এই গ্রন্থের শুরুর দিকে এ ধরনের কিছু সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ইরজার খণ্ডনে ইমাম বিভিন্ন সময় বিস্তৃত বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থগুলো সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ঈমান ও ইরজা নিয়ে তাতে লম্বা আলোচনা রয়েছে, যাতে ইমাম ভ্রান্ত খারেজি এবং মুরজিয়া-জাহমিয়্যাহ দুই চরমপন্থার মাঝে আহলে সুন্নাতের ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

খারেজি ও মুরজিয়া উভয়ের খণ্ডনে ইমাম বলেন, **'মুমিনের পিছনে—চাই সে পুণ্যবান হোক কিংবা পাপী হোক—নামায আদায় করা জায়েয। তবে আমরা এ কথা বলি না যে, পাপ মুমিনের কোনো ক্ষতি করে না। এটাও বলি না যে, সে একেবারেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আবার এটাও বলি না যে, সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হিসেবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, হোক সেটা ফাসেক অবস্থায়ও। মুরজিয়াদের মতো এটাও বলি না যে, তাঁর পুণ্যসমূহ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে আর তার পাপসমূহ মার্জিত হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা বলি : যে ব্যক্তি সব ধরনের শর্ত মেনে ত্রুটিমুক্ত কোনো নেক আমল করবে, কুফর ও ধর্মত্যাগ থেকে দূরাবস্থান করে মুমিন অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তার আমল নষ্ট করবেন না; বরং কবুল করে নেবেন এবং তাকে প্রতিদান দেবেন। আর যে ব্যক্তি শিরক ও কুফর ছাড়া অন্য কোনো গুনাহ করে, এর পর তাওবা না করেই ফাসেক মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে আল্লাহর এখতিয়ারাধীন থাকবে—চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেবেন, চাইলে জাহান্নামের শাস্তি দেবেন। তবে চিরস্থায়ী শাস্তি দেবেন না।'**[৩৯০] এটা আহলে সুন্নাতের সকল ইমামের আকিদা।

---

৩৮৯. তাহযিবুল আসার (মুসনাদে ইবনে আব্বাস ২/৬৫৯)।

৩৯০. আল-ফিকহুল আকবার (৫)।

ইমাম আজম আল-ওয়াসিয়্যাহ গ্রন্থেও মুরজিয়াদের বিচ্যুতি খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন, **“কেবল জানার নামই ঈমান নয়। এমন হলে আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা সবাই মুমিন গণ্য হতো। কারণ, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন,** ﴿الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ﴾ **অর্থ: ‘যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা আপনাকে সেভাবে চেনে যেভাবে চেনে নিজের সন্তানদের।’ [বাকারা : ১৪৬] তবুও তারা মুমিন নয়। কারণ, তারা চিনলে ও জানলেও স্বীকৃতি দেয় না।”**[৩৯১]

ইমাম আরও বলেন, **“কেবল জানা যথেষ্ট নয়, মুখে স্বীকার করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘তোমরা বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাহলে সফলকাম হবে।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।’ ফলে কেবল জানলেই হবে না, মুখে স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি।”**[৩৯২]

তহাবি রহ. বলেন, ‘আমরা সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য আল্লাহর কাছে আশা করি তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন। স্বীয় অনুগ্রহে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। কিন্তু আমরা তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত-নিরাপদ হয়ে যাই না। কারও ব্যাপারে জান্নাতের সাক্ষ্য দিই না। আর গুনাহগার মুমিনদের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি, কিন্তু নিরাশ করি না। (ভবিষ্যৎ পরিণতি থেকে) নিশ্চিন্তভাব কিংবা নিরাশা দুটোর কোনোটাই মিল্লাতে ইসলামিয়্যাতে সমর্থিত নয়। কিবলার অনুসারীদের হকের পথ হচ্ছে এই দুটোর মাঝামাঝি।’[৩৯৩]

ইমামের চোখে ইরজার উৎস ও প্রকৃতি

ইরজার ইতিহাস ও সূত্রপাত কোত্থেকে? এ ব্যাপারে ইমাম আজমের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যা রয়েছে। তিনি মনে করেন, **“ইরজার সূচনা হয়েছিল ফেরেশতাদের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা যখন ফেরেশতাদের সামনে বিভিন্ন সৃষ্টি রেখে সেগুলোর নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ফেরেশতারা না জেনে আন্দাজে জবাব দেওয়ার সাহস করলেন না। কারণ, তাতে অনধিকার চর্চা হবে। ফলে তারা**

---

৩৯১. আল-ওয়াসিয়্যাহ (২৭-২৮)।

৩৯২. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৩১-৩২)।

৩৯৩. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২১)।

নীরবতা অবলম্বন করে বললেন, ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ অর্থ : 'আপনি মহা পবিত্র। নিশ্চয়ই আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন সেগুলো ছাড়া আমরা আর কিছু জানি না।' [বাকারা : ৩২] সুতরাং ফেরেশতাদের এই কর্মপন্থা ছিল সঠিক কর্মপন্থা। তারা ওই ব্যক্তির মতো ছিলেন না যাকে তার অজানা একটা বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো আর সে না জেনেই যা ইচ্ছা বলে গেল। এই লোক যদি ভুল বলে, তাহলে সে অপরাধী বিবেচিত হবে। যদি সৌভাগ্যক্রমে সঠিকটা বলতে পারে, তবুও ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত হবে না। কারণ, সে অনধিকার চর্চা করেছে। না জেনে কথা বলেছে। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা নবিজি (ﷺ)-এর উদ্দেশে বলেছেন, ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ অর্থ : 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সেটার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয় এগুলোর প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।' [ইসরা : ৩৬] যেখানে রাসুল (ﷺ)-কেও না জেনে কেবল ধারণার বশবর্তী হয়ে কারও ব্যাপারে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে সাধারণ মানুষের ব্যাপারে কী-বা বলার থাকে?"[৩৯৪]

ইমাম আরও বলেন, "ইরজার ব্যাখ্যা হলো : ধরো তুমি একটা কওমের মাঝে ছিলে। তখন তারা হক ও সত্যের উপর ছিল। এর পর ওই অবস্থায় তাদের কাছ থেকে চলে গেলে। একটা সময় তোমার কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, তারা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তখন তুমি তাদের কাছে গেলে। গিয়ে দেখলে এখনও তারা সেই হকের উপরই আছে। এ অবস্থাতেই নিজেদের একদল আরেক দলকে হত্যা করেছে। তাদের তুমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে। উভয় দলের লোকেরাই তোমাকে বলল যে, তারা মজলুম। কিন্তু তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে তৃতীয় পক্ষের কোনো প্রমাণ নেই। হয়তো নিজেও তাদের খুনাখুনি দেখলে, কিন্তু যে জালেম আর কে মজলুম সেটা বোঝার কোনো সুযোগ পেলে না। তাদের দুই দলের পরস্পরের বিরুদ্ধে দেওয়া সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। এখন তুমি কী করবে? তখন তোমার এটা চিন্তা করতে হবে যে, তাদের দুই দলের উভয়েই সঠিক হতে পারে না। হয়তো দুই দলেরই ভুল আছে। অথবা একদল সঠিক, অন্যদল বেঠিক। এই ক্ষেত্রে তুমি 'ইরজা'র আশ্রয় নেবে। তুমি বলবে, যারা গুনাহ করেছে তারা জাহান্নামিও নয় আবার জান্নাতিও নয়। কারণ, মানুষ তিন ধরনের। এক. নবি-রাসুলগণ এবং তারা জান্নাতি। দুই. নবি-রাসুলগণ যাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তারা। এই দুই দলের বিপরীতে মুশরিকদের অবস্থান এবং তারা সকলে

---

৩৯৪. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২২-২৩)।

জাহান্নামি। তিন. সাধারণ মুমিনগণ, যাদের ব্যাপারে জান্নাত বা জাহান্নাম কোনোটা সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না। তবে আমরা তাদের ব্যাপারে ভালোর প্রত্যাশা করব, মন্দের আশঙ্কা করব। আমরা তাদের ব্যাপারে সেটা বলব যেটা আল্লাহ বলেছেন : ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ অর্থ : 'আর কোনো কোনো লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ এবং অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।' [তাওবা : ১০২] সুতরাং আমরা তাদের ব্যাপারে ক্ষমার আশা করব। কারণ, আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি শিরক ব্যতীত বাকি সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।"[৩১৫]

উপরের আলোচনাতে স্পষ্ট যে, ইরজার ব্যাপারে ইমামের দৃষ্টিভঙ্গি আর সকল সালাফের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত আকিদা। এটার সঙ্গে গোমরাহ ফিরকা মুরজিয়া ও জাহমিয়্যাহদের কোনো সম্পর্ক নেই।

ইমাম আজমকে মুরজিয়া বলা এক ঐতিহাসিক ও মতাদর্শিক সংকট

দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, যিনি সারা জীবন মুরজিয়াদের ভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেন, শেষ পর্যন্ত তাকেই 'মুরজিয়া' অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হলো। এটা তাঁর জীবদ্দশাতেই ঘটেছিল। বিষয়ের গুরুতরতার প্রতি লক্ষ রেখে এবার আমরা একটু সেদিকে দৃষ্টি দেবো। এই অভিযোগের কারণ, উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা তলিয়ে দেখব।

প্রথমেই যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হলো, ইমামকে মুরজিয়া বলার পিছনে সবার যুক্তি ও উদ্দেশ্য এক ছিল না। বরং বলা যায়, ইমামের উপর মুরজিয়া অভিযোগটি সর্বসাকুল্যে তিনটি দিক থেকে এসেছে।

এক. আহলে সুন্নাতের আলেমগণের পক্ষ থেকে। তারা তাঁর বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ ধরে তাকে মুরজিয়া বলেছেন। অর্থাৎ, ইমাম আজম রহ. যেহেতু আমলকে ঈমান গণ্য করেন না, ঈমানের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে তিনি আমলকে তাত্ত্বিকভাবে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না, বরং আলাদা (ইরজা) করেন। ফলে শাব্দিকভাবে তাঁর মতকে 'ইরজা' এবং তাকে 'মুরজিয়া' বলা যেতে পারে। খুব সম্ভবত এ অর্থেই কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইমাম আজমের উপর 'মুরজিয়া' শব্দ

---

৩১৫. প্রাগুক্ত (২৩)।

প্রয়োগ করেছেন। ইমাম তাঁর মতাদর্শ স্পষ্ট করাতে তারা তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করেছেন এবং ইমামকে মুরজিয়া ডাকা বন্ধ করেছেন।

দুই. ভ্রান্ত মুরজিয়ারা তাদের নিজস্ব মতাদর্শ বিকানোর উদ্দেশ্যে ইমামের নাম ব্যবহার করে তাকে মুরজিয়া বলত। এরা আবার বিপরীতমুখী শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণি হলো চরমপন্থি খারেজি। ইমাম আজম রহ. তাদের মতো কবিরা গুনাহকারীকে কাফের না বলায় তারা ইমামকে মুরজিয়া বলে অপবাদ দেয়। আরেক শ্রেণি হলো মুরজিয়া-জাহমিয়্যাহ। তারা ইমামের নাম ব্যবহার করে তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ইমামকে মুরজিয়া আখ্যা দেয়। শাহরাস্তানি এই দুই গ্রুপের ব্যাপারে লিখেন, 'আশ্চর্যের বিষয় হলো, (মুরজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত গাসসানিয়্যাহ দলের নেতা) গাসসান আবু হানিফা থেকে তার মতাদর্শসদৃশ মতামত বর্ণনা করত এবং তাকে মুরজিয়া বলত। এটা তাঁর উপর মিথ্যাচার। তাকে মুরজিয়া বলার আরেকটি রহস্য আছে। তা হলো, তাঁর যুগে যারাই মুতাযিলা ও খারেজিদের বিরোধিতা করত, তারা তাকে মুরজিয়া হিসেবে আখ্যা দিত। ফলে সম্ভবত তারাই তাকে মুরজিয়া আখ্যা দিয়েছে।'[৩৯৬]

তিন. পরবর্তী সময়ের একদল আহলে হাদিস তথা মুহাদ্দিসগণ, যাদের সঙ্গে ইমামের মতাদর্শিক দূরত্ব ছিল। ফলে তারা ইমাম আজমকে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। কখনো তাঁকে ভুল বুঝেছেন। তাঁর বক্তব্য না বুঝে তাঁর সমালোচনা করেছেন। আবার কখনো তাকে লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিয়েছেন। অর্থাৎ, তাদের নিজেদের মতাদর্শের বিপরীত হওয়ায় ইমামের বিভিন্ন বক্তব্যকে তারা স্রেফ ভুল বলেই ক্ষান্ত হননি; বরং কাফের, মুশরিক, বিদআতি, জাহমিসহ এমন কোনো অভিধা নেই যা তাঁর উপর প্রয়োগ করেননি। তাকে মুরজিয়া বলাও এই সিলসিলার নতিজা। আবার কখনো হিংসা ও ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে তাঁর উপর ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করেছেন। আল্লাহ তাদের সবাইকে ক্ষমা করুন।

ইমাম আজম তাঁর জীবদ্দশাতেই যখন তাকে মুরজিয়া আখ্যা দেওয়ার ঘটনা শুনতে পান, সেটা থেকে নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেন। ইমামের আকিদাসংক্রান্ত কিতাবগুলোর বিভিন্ন জায়গায় ইরজাসম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনার খুব সম্ভবত অন্যতম কারণ নিজেকে মুরজিয়া অপবাদ থেকে মুক্ত করা। বরং তিনি এ ব্যাপারে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে বিভিন্ন আলেমকে চিঠিও লিখেছেন। এ ধরনের একটি

---

৩৯৬. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, শাহরাস্তানি (১/১৪১)।

ঐতিহাসিক চিঠি হলো বসরার বিখ্যাত মুজতাহিদ আলেম উসমান আল-বাত্তির কাছে লেখা। এ চিঠিতে ইমাম তাঁর উপর আরোপিত মুরজিয়া অপবাদ খণ্ডন করেছেন। তিনি তাতে এ-সম্পর্কিত তাঁর যেসব আকিদা লিখেছেন, সেগুলো মূলত সকল সাহাবি ও তাবেয়ির আকিদা। বিষয়টির চূড়ান্ত গুরুত্বের দিকে লক্ষ করে সেই ঐতিহাসিক চিঠিটির সারমর্ম আমরা পাঠকের জন্য নিচে তুলে ধরছি :

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। এক আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনাকে আল্লাহর ভয় ও আনুগত্যের ওসিয়ত করছি। আপনার চিঠি আমার কাছে পৌঁছেছে। আপনি লিখেছেন, আপনার কাছে নাকি সংবাদ পৌছেছে যে, আমি মুরজিয়া। কুরআন ও রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সুন্নাহর বাইরে মুক্তির কোনো পথ নেই। এর বাইরে যা-কিছু আছে সব ভ্রষ্টতা ও বিদআত। তাই আমার বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করুন। মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে সতর্ক থাকুন। আমি আল্লাহর কাছে আমার নিজের জন্য এবং আপনার জন্য রহমত ও তৌফিক কামনা করছি।”

“পরকথা : আল্লাহর রাসুল (ﷺ)-এর আগমনের আগে মানুষ মুশরিক ছিল। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এসে তাদের ইসলামের দিকে ডাকেন, কালিমায়ে শাহাদাতের দিকে ডাকেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা-কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলোতে বিশ্বাস করার দিকে ডাকেন। যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়, তারা শিরক থেকে মুক্ত মুমিন হিসেবে পরিচিতি পায়। তাদের সম্পদ ও প্রাণ সুরক্ষিত হয়ে যায়। যারা তাঁর ডাকে সাড়া না দেয়, তারা বেঈমান ও কাফের হিসেবে পরিচিতি পায়। তাদের সম্পদ ও প্রাণ অরক্ষিত হয়ে যায়। হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে (যেমন আহলে কিতাবের জন্য) আল্লাহ জিযিয়ার বিকল্প সুযোগও উন্মুক্ত রাখেন। অতঃপর সত্যায়নকারীদের উপর আল্লাহ বিভিন্ন ফরয ইবাদত ধার্য করেন। সেগুলো ঈমানের পরে আমল হিসেবে পরিগণিত হয়, যেমনটা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ﴾ অর্থ : ‘যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে।’ [বাকারা : ৮২] তিনি অন্যত্র বলেছেন, ﴿وَمَن يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ অর্থ : ‘আর যে আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং নেক আমল করে।’ [তাগাবুন : ৯] কুরআনে এমন আয়াত অসংখ্য। এভাবে তারা আমলের আগেই মুমিন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। যদি আমলকেও ঈমান বলা হয়, তবে এসব ইবাদত আসার আগে তারা মুমিন অভিধা পেতেন না।”

“মোটকথা, সত্যায়ন (ঈমান) ও আমলের হাকিকত ভিন্ন। কেউ আমল নষ্ট করলে তার ঈমানও নষ্ট হয়ে যাবে এমন নয়। কারণ, ঈমান আনার সময় আমল

ছিলই না। আমল ছাড়াও ঈমান ছিল। তা ছাড়া, আমলে বিচ্যুতির কারণে যদি ঈমানেও বিচ্যুতি অনিবার্য হয়, তবে কেউ আমলে ত্রুটি করলেই ঈমান থেকে বেরিয়ে কাফের বা মুশরিক হয়ে যাওয়ার কথা; অথচ সেটা কেউ বলবে না। কারণ, ঈমানের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে কোনো স্তরভেদ নেই। হ্যাঁ, আমলের ক্ষেত্রে স্তরভেদ রয়েছে। ঈমানের ক্ষেত্রে কমবেশ নেই। হ্যাঁ, ফরয ইবাদতের ক্ষেত্রে কমবেশ রয়েছে। পৃথিবীর সকল রাসুল এবং সকল মানুষের দ্বীন একটাই। আমরা বলি, জালেম মুমিন, পাপী মুমিন, বিচ্যুত মুমিন, অবাধ্য মুমিন এবং অসৎ মুমিন ইত্যাদি। অথচ পাপ, বিচ্যুতি, অবাধ্যতা, অসততা সবগুলোই অপরাধ, আমল বিনষ্টকারী। আমল আর ঈমান যদি এক হতো, তবে এসব অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদের তো মুমিনই বলা হতো না।”

“খুলাফায়ে রাশেদিন, যেমন: উমর ও আলি, আমিরুল মুমিনিন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সকল মুমিনই কি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইবাদতের উপর ছিল? একইভাবে আলি রাযি. যখন শামের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, তাদের মুমিন হিসেবে সম্বোধন করেছেন। তারা যদি পূর্ণাঙ্গ (আমলসহ) মুমিনই হতো, তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন? একইভাবে রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সাহাবাগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছেন। পৃথিবীতে হত্যা ও হানাহানির চেয়ে মারাত্মক কোনো অপরাধ আছে? তাদের উভয় দলই কি সঠিক ছিল? ছিল না। তবুও তাদের উভয় দলই মুমিন ছিল। কারণ, ঈমান এগুলোর উর্ধ্বে।”

“সুতরাং আমার বক্তব্য হলো, আহলে কিবলার সকলে মুমিন। ফরয ইবাদতের ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতির কারণে আমি কাউকে ঈমান থেকে বের করে দিই না। যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে সকল ফরয বিধান মেনে চলবে, সে আমাদের কাছে ‘জান্নাতের অধিকারী’ হিসেবে বিবেচিত হবে। যে ব্যক্তি ঈমান ও আমল দুটোই ছেড়ে দেবে, সে জাহান্নামের অধিবাসী কাফের বিবেচিত হবে। আর যে ঈমানকে ঠিক রেখে ফরযের ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি করবে, সে আমাদের কাছে গুনাহগার মুমিন হিসেবে গণ্য হবে। পরকালে সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থাকবে—চাইলে তিনি শাস্তি দেবেন, চাইলে বিনা শাস্তিতে ক্ষমা করে দেবেন।”

চিঠির শেষে ইমাম তাঁর মুরজিয়া হওয়াকে গোমরাহ ফিরকাগুলোর পক্ষ থেকে অপবাদ হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন, **“এক সম্প্রদায় ইনসাফের সঙ্গে কথা বলেছে; কিন্তু বিদআতিরা তাদের মুরজিয়া আখ্যা দিয়েছে, অথচ তারা মুরজিয়া নয়; বরং**

তারা ইনসাফের পতাকাবাহী আহলে সুন্নাত। বিদ্বেষবশত সেসব সম্প্রদায় তাদের এই অপবাদ দিয়েছে।"[৩৯৭]

এই ঐতিহাসিক চিঠির মাধ্যমে স্পষ্ট যে, ইমাম সব ধরনের 'ইরজা' থেকে মুক্ত। কোনো অর্থেই তাকে 'মুরজিয়া' তিনি পছন্দ করতেন না। আর আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে তাকে 'মুরজিয়া' বলার ঘটনা সম্ভবত পরবর্তী সময়ে ঘটেছে। তাঁর জীবদ্দশায় সর্বপ্রথম তাঁর উপর ইরজার অপবাদ দিয়েছে ভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলো, যেমনটা ইমাম নিজে বলেছেন, **'এক সম্প্রদায় ইনসাফের সঙ্গে কথা বলেছে; কিন্তু বিদআতিরা তাদের মুরজিয়া আখ্যা দিয়েছে।'** ফলে সম্ভবত আহলে সুন্নাতের মুহাদ্দিসিন এবং অন্য ফকিহদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ সত্ত্বেও তারা ইনসাফের সঙ্গে নিয়েছেন। তাঁকে মুরজিয়া আখ্যা দেননি।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, ইমামের সমকালীন মানুষরা তাকে ইনসাফ করতে পারলেও, নিজের পক্ষ থেকে এত স্পষ্টভাবে ওয়াজাহাত করা সত্ত্বেও আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত একদল আলেম মতাদর্শিক এবং ব্যক্তিগত বিভিন্ন কারণে ইনসাফের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেননি। তারা তাঁকে মুরজিয়া বলা অব্যাহত রেখেছেন। ইমাম বুখারি তাঁর 'আত-তারিখুল কাবির'-এ সনদ যাচাই ছাড়া লিখেন, 'তিনি মুরজিয়া ছিলেন।'[৩৯৮] ইমাম মুসলিম তাঁর 'কিতাবুত তাময়িয' গ্রন্থে শক্তিশালী সনদ ছাড়াই ইমাম আজমকে 'মুরজিয়া' সাব্যস্ত করেন এবং ক্ষুব্ধভাবে তাঁর সমালোচনা করেন।[৩৯৯] ইমাম ইবনে হিব্বান লিখেন, 'তিনি ইরজা (তথা মুরজিয়া মাযহাব)-এর দিকে দাওয়াত দিতেন।'[৪০০] এভাবে এসব ইমাম তাদের হাদিসের গ্রন্থগুলোতে বিশুদ্ধতার সর্বোচ্চ মাত্রা সংরক্ষণের চেষ্টা করলেও ইমাম আজমের সমালোচনার ক্ষেত্রে সনদ কিংবা বিশুদ্ধতার প্রতি ন্যূনতম লক্ষ রাখেননি। ফলে সত্য-মিথ্যা বর্ণনা তুলে ধরেছেন নির্বিচারে।

এসব অভিযোগের একটি জবাব এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, তাত্ত্বিক সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে ইমাম আজম রহ.-এর সঙ্গে তাদের মতপার্থক্য থাকার কারণে শাব্দিক অর্থের দিকে লক্ষ করে তারা তাকে মুরজিয়া বলেছেন। যদি এমন ব্যাখ্যা

---

৩৯৭. রিসালাতু আবি হানিফা ইলা উসমান আল-বাত্তি (৩৪-৩৮)।

৩৯৮. দেখুন : আত-তারিখুল কাবির (৮/৮১)।

৩৯৯. দেখুন : কিতাবুত তাময়িয (২৩)। মুসলিমের সমালোচনার জবাব দেখুন শায়খ আবদুর রশিদ নুমানির 'ইমাম ইবনু মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান' গ্রন্থে (১৩৪-১৪৮)।

৪০০. দেখুন : আল-মাজরুহিন (১১২৫ নং জীবনী)।

করা হয়, তবে সেটাকে অন্যায় বলার সুযোগ নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলো, তাদের কেউ কেউ ইতিবাচক অর্থে নয়, বরং নেতিবাচক তথা বিদআতি অর্থেই ইমামকে মুরজিয়া বলেছেন! ফলে এক্ষেত্রে ইনসাফ ধরে রাখতে পারেননি। বরং ইমামের মতকে জাহমিয়্যাহ ও কাররামিয়্যাহদের মতো বিদআতি মতাদর্শ আখ্যা দিয়ে তাকেও পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছেন! ইমাম আজমের নামে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ যাচাই-বাছাই ছাড়া তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যেমন—ইবনে হিব্বান ইমামের বক্তব্যকে 'বিদআত' আখ্যা দিয়ে তাকে বিদআতের দিকে আহ্বানকারী বলেছেন।[৪০১] আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন। ইমাম আজম এ ধরনের অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

ইমাম আবুল হাসান আশআরিও (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন) ইমাম আজমের উপর একাধিক ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করেছেন। অন্ততপক্ষে সেগুলো নিজ গ্রন্থে মন্তব্যহীনভাবে উল্লেখ করেছেন যা তার সম্মতির পরিচায়ক হিসেবে দেখা যেতে পারে। তিনি ইমামের উপর 'কুরআন মাখলুক' (সৃষ্ট) বলার অভিযোগ করেছেন, যেমনটা সামনে দেখব। তিনি ইমামের উপর 'ইরজা'র অভিযোগও দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা বর্ণনার মাঝে ফারাক করেননি। হকপন্থিদের 'ইরজা' এবং বাতিল 'ইরজা'র মাঝে পার্থক্য করেননি। আশআরি লিখেন, '(মুরজিয়াদের) নবম ফিরকা হলো আবু হানিফা এবং তাঁর সঙ্গীরা। তাদের ধারণা, ঈমান হলো আল্লাহকে চেনা এবং মুখে স্বীকৃতি দেওয়া। একইভাবে রাসুলকে চেনা এবং তিনি যা-কিছু নিয়ে এসেছেন সংক্ষেপে সেগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া। উমর ইবনে আবু উসমান আবু হানিফাকে মক্কায় জিজ্ঞাসা করেন, সে ব্যক্তির বিধান কী যে বিশ্বাস করে আল্লাহ শূকর হারাম করেছেন, কিন্তু সেটা পরিচিত শূকর কি না সে জানে না! তিনি বললেন, সে মুমিন! উমর জিজ্ঞাসা করেন, সে ব্যক্তির বিধান কী যে বিশ্বাস করে আল্লাহ কাবার হজ ফরয করেছেন, কিন্তু সে মক্কার কাবার ব্যাপারে নিশ্চিত নয়, বরং অন্য কোথাও কাবা হতে পারে। আবু হানিফা বললেন, সেও মুমিন! উমর জিজ্ঞাসা করলেন, যদি কেউ বলে, আমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আল্লাহর রাসুল মানি, কিন্তু তিনি আফ্রিকানও হতে পারেন! আবু হানিফা বললেন, সেও মুমিন।[৪০২]

---

৪০১. পূর্বোক্ত সূত্র দেখুন।

৪০২. মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন, আশআরি (১/১১৯)। খতিবও তারিখে বাগদাদে উক্ত বক্তব্য নকল করেছেন (১৫/৫০৭)। কিন্তু এটা মিথ্যা বর্ণনা। কারণ, এমন ব্যক্তি কখনোই মুমিন নয়। গ্রন্থের শুরুতে এ ব্যাপারে আলোচনা দেখুন।

আমরা পিছনে দেখেছি, আবু হানিফা ও হানাফিদের কাছে ঈমান কেবল চেনা নয়, বরং অন্তরে সত্যায়ন করা এবং মুখে স্বীকৃতি দেওয়া দুটোই। পাশাপাশি আমল তাত্ত্বিকভাবে ঈমানের অংশ না হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য ফল। এ সম্পর্কিত বক্তব্যে ইমামের আকিদার গ্রন্থগুলো ভরপুর। উপরন্তু উপরের ঘটনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ নেই। নির্ভরযোগ্য সনদ নেই। বরং সনদ দ্বারা প্রমাণিত হলেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এসব বাজে কথা ইমাম আবু হানিফা এবং হানাফি মাযহাবের উসুল (তথা মূলনীতির) সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ইমামের মাযহাব অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফের। বরং ইবনে আবিল আওয়াম বর্ণনা করেন, আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কাবা ছাড়া অন্য কোনো দিকে ফিরে নামায পড়ে, ঘটনাক্রমে সেটা কাবার দিকে হয়ে গেলেও উক্ত ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।[৪০৩] কারণ, সে ইচ্ছাকৃতভাবে কাবাকে কিবলা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে কাবা সম্পর্কে জানা অথচ কোন কাবা উদ্দেশ্য সেটা না জানা—মুরজিয়াদের এমন বক্তব্য থেকে ইমাম আজম পবিত্র।

বরং বেদনাদায়ক ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো, পরবর্তীকালে সময় যত গিয়েছে, ইমামের উপর আহলে সুন্নাতের অন্তর্গত তাঁর প্রতিপক্ষের আক্রমণ তত বেড়েছে। বরং তারা ইমামকে স্রেফ মুরজিয়া বলেই ক্ষান্ত হননি, এটার 'ইলযাম' (দাবি) দাঁড় করিয়ে তাঁর ব্যাপারে এমন অনেক বিষয় বর্ণনা করেছেন, যা শুনলে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। তাঁর মুখে এমন অনেক বক্তব্য চালিয়ে দিয়েছেন, যা ইমাম তো দূরের কথা, কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ বলতে পারে না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছেন আবু বকর খতিবে বাগদাদি তার 'তারিখে বাগদাদ' এবং ইমাম আহমদ পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর 'আস-সুন্নাহ' গ্রন্থে। তাদের সঙ্গে আছেন ইবনে হিব্বান এবং ইবনে আদি প্রমুখ। তারা বিভিন্ন লোকের বরাতে ইমাম আজমের নামে শত শত পৃষ্ঠা কুৎসা লিখেছেন। তাঁর উপর এমন জঘন্য অপবাদ আরোপ করেছেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত কেউ কারও নামে করেনি! এগুলোতে এসেছে, ইমাম নাকি বলেছেন, যদি কেউ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জুতা-স্যান্ডেলের পূজা করে, তাতেও সমস্যা নেই।[৪০৪] আরও

---

৪০৩. ফাযায়িলু আবি হানিফা (৩৬৯)।
৪০৪. খতিবে বাগদাদি (১৫/৫০৯)।

এসেছে, ইমাম নাকি বলেছেন, যদি কেউ তাঁর বাবাকে হত্যা করে তার খুলির মাঝে মদ পান করে, মাকে বিবাহ করে নেয়, তবুও নাকি ইমাম তাকে মুমিন বলেন।[৪০৫] অন্যত্র তাঁর নামে বলা হয়েছে, তিনি নাকি বলেছেন, যদি কেউ অন্তর দ্বারা আল্লাহকে চেনে, কিন্তু জুতার পূজা করে, তবুও সে মুমিন।[৪০৬] আরেকজনের মতে, তিনি বলেছেন, আবু বকরের ঈমান আর ইবলিসের ঈমান এক।[৪০৭]

নাউযুবিল্লাহ! ইমামকে মুরজিয়া সাজাতে এভাবে একশ্রেণির লোক কতটা নিচে নেমেছিল সেটা এসব বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমেয়। তাদের কাছে ইমামের 'অপরাধ' ছিল তিনি আমলকে ঈমানের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করতেন না। ফলে পৃথিবীর সব কুৎসিত ও কুফরি কাজ করেও তার মাযহাব অনুযায়ী কেউ মুমিন থাকবে—সেটা প্রমাণের জন্য এবং নিজেদের মাযহাবকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে তারা ইমামের নামে এসব মিথ্যাচার করেছেন। অথচ ইমামের মাযহাব না থাকলে আমলের ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতিতে লিপ্ত পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিমকে কাফের বলতে হতো।[৪০৮] যে মানুষটার রাতের সিজদার কান্নার আওয়াজ শুনে আশপাশের প্রতিবেশীদের মায়া হতো,[৪০৯] তাঁর নামে এমন জঘন্য মতাদর্শ প্রচার কারও বিবেকে বাধল না!

প্রশ্ন হতে পারে, যদি তাত্ত্বিক অর্থের দিকে তাকিয়ে ইমামকে মুরজিয়া বলা হয়, তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে? অর্থাৎ, ইমাম যেহেতু আমলকে ঈমানের সংজ্ঞার্থের বাইরে রাখেন, সে অর্থে মুরজিয়া ধরে নিলেই তো হয়। তাহলে তো মুহাদ্দিসদের সমালোচনা করার প্রয়োজন হয় না। আমরা বলব, একদল আলেম সেটা করেছেন। যেমন—ইমাম মাতুরিদি বলেন, "ইরজার একটি অর্থ কবিরা গুনাহকারীর ফয়সালা আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, আবার চাইলে শাস্তি দিতে পারেন। আল্লাহ বলেন, ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ অর্থ:

৪০৫. প্রাগুক্ত (১৫/৫১০)।

৪০৬. প্রাগুক্ত (১৫/৫১০)।

৪০৭. আল-মুনতাযাম, ইবনুল জাওযি (৮/১৩৩)।

৪০৮. এসব মিথ্যাচার ও প্রলাপের ইলমি খণ্ডন পড়ুন আবু মুজাফফর ঈসা (আল-মালিকুল মুআজজাম)-এর 'আর-রাদ্দু আলা আবি বকর খতিব আল-বাগদাদি', আবদুল হাই লাখনৌভির 'আর-রাফউ ওয়াত-তাকমিল' এবং আল্লামা কাওসারির 'তানিবুল খতিব' গ্রন্থে।

৪০৯. আল-খাইরাতুল হিসান (১৬)।

'তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করব আর তোমাদের সম্মানজনক স্থানে দাখিল করব।' [নিসা : ৩১] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ অর্থ : 'আমি এমন লোকদের সুকর্ম কবুল করি এবং মন্দকর্ম মার্জনা করি। তারা জান্নাতিদের তালিকাভুক্ত, সেই সত্য ওয়াদার কারণে যা তাদের দেওয়া হতো।' [আহকাফ: ১৬] অন্যত্র বলেন, ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ অর্থ : 'আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজ মিটিয়ে দেবো এবং তাদের কর্মের চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেবো।' [আনকাবুত : ৭] মাতুরিদির মতে, এটা সঠিক 'ইরজা'। এটার সমর্থন আবশ্যক।"[৪১০] তাফতাযানি লিখেন, 'কবিরা গুনাহের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মত হচ্ছে, সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে। চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন, চাইলে ক্ষমা করতে পারেন। আর এটা হচ্ছে হকপন্থিদের মাযহাব, যাকে ইরজা বলা হয়। অর্থাৎ ,কবিরা গুনাহকারীর ফয়সালা আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া। আর এ কারণে ইমাম আবু হানিফাকে মুরজিয়া বলা হয়েছে। অপরদিকে বাতিল মুরজিয়া হলো, যারা মনে করে, গুনাহের কারণে কোনো শাস্তিই হবে না। শাস্তি স্রেফ কাফের ও মুশরিকদের জন্য। অথচ এটা সুস্পষ্ট শৈথিল্য ও বিচ্যুতি।' [৪১১] ন্যায়নিষ্ঠ আলেম যাহাবি রহ. লিখেন, (শাব্দিক) 'ইরজা একদল শ্রেষ্ঠ আলেমের মাযহাব। সুতরাং কেউ এটা বললে তার উপর আক্রমণ না করা চাই।'[৪১২]

কিন্তু **অধমের মতে**, ভালো কিংবা মন্দ কোনো উদ্দেশ্যেই ইমাম আজমকে মুরজিয়া না বলা আবশ্যক। কারণ, তিনি নিজেই নিজের জন্য এমন শব্দ পছন্দ করতেন না, সেটা যে উদ্দেশ্যেই হোক, যেমনটা পিছনে উসমান আল-বাত্তির কাছে লেখা ইমামের চিঠিতে স্পষ্ট হয়েছে। একইভাবে ইবনে আবিল আওয়াম বর্ণনা করেন, একদিন একব্যক্তি মাতাল অবস্থায় ইমাম আজমকে মুরজিয়া বলে। তখন ইমাম তাকে বললেন, **"তোমার মতো লোকের জন্য আমি ঈমান সাব্যস্ত না করলে আমাকে মুরজিয়া বলার সুযোগ পেতে না। 'ইরজা' বিদআত না হলে তোমার**

৪১০. আত-তাওহিদ (২৭৫)।
৪১১. শরহুল মাকাসিদ (২/২৩৮)।
৪১২. মিযানুল ইতিদাল (৪/৩২০)।

কথায় আমি পাত্তা দিতাম না।"[৪১৩] বোঝা গেল, ইমাম আজমকে যেকোনো অর্থেই মুরজিয়া বলা হোক খোদ তিনি পছন্দ করতেন না। ফলে তাঁকে এ ধরনের অভিধায় অভিহিত করা অন্যায়।

অনেকে আবার ইমামের উপর 'অনুগ্রহ'-পূর্বক বলেন, ইমাম আজম রহ. প্রথমে মুরজিয়াদের বক্তব্য দিলেও পরবর্তী সময়ে সেটা থেকে আহলে সুন্নাতের বক্তব্যে প্রত্যাবর্তন (রুজু) করেছেন। অর্থাৎ, প্রথমে তিনি আমলকে ঈমানের চেয়ে ভিন্ন বললেও পরবর্তী সময়ে আমলকেও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। সুতরাং তিনি আর মুরজিয়া থাকছেন না।[৪১৪] এটা ভালোর আবরণে মন্দচর্চা। এতে কেবল ইমাম আজমকে রক্ষার নাম করে তাঁর প্রথম স্তরের বড় বড় শাগরেদসহ গোটা হানাফি মাযহাবকে কৌশলে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। অথচ 'রুজু'র যে আখ্যান বলা হয়, সেটার সৃষ্টিকর্তা ইমাম আজমের প্রায় আটশত বছর পরের লোক। ইমাম আজমের প্রাথমিক স্তরের শাগরেদদের সকল বক্তব্য ছেড়ে আটশো বছর পরের লোকের বক্তব্য গ্রহণের কোনো যৌক্তিকতা নেই। উপরন্তু প্রত্যাবর্তনের কাহিনি রচয়িতাদের সালাফরাও উপরের বক্তব্যের কারণে ইমামের নিন্দা করেছেন। তিনি যদি রুজু করেই থাকেন, এর পরেও তাকে নিন্দা করা কি তাহলে আমরা ভিত্তিহীন এবং হিংসাপ্রসূত ছিল ধরে নেব? এটা তো সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা। বাস্তব কথা হলো, ইমাম রুজু করেননি এবং রুজু করার প্রয়োজনও নেই। কারণ, আমরা উপরে স্পষ্ট করেছি যে, ইমাম আজম যে অর্থে আমলকে ঈমান থেকে ভিন্ন ধরেন, সেটা শতভাগ যৌক্তিক, সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ। বিপরীত আলেমগণ যে অর্থে আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলেন, সেটাও সে দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক। ফলে তাদের মাঝের পার্থক্য স্রেফ শাব্দিক এবং স্বাভাবিক। এটাকে এই পর্যায়েই রাখতে হবে। এটা নিয়ে অতিরঞ্জন করে এর উপর ভিত্তি করে ইমাম আজমকে 'মুরজিয়া' বলা অনুচিত। আবার তাঁকে রক্ষা করতে রুজুর কাহিনি বানানোও অনুচিত এবং অপ্রয়োজনীয়।

ইমামকে কীভাবে মুরজিয়া বলা বৈধ হবে, অথচ তাঁর আকিদা পুরোটাই মুরজিয়াদের আকিদার বিপরীত? তিনি মুরজিয়াদের বিরুদ্ধে রীতিমতো সংগ্রাম করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের খণ্ডন করেছেন। পরবর্তী হানাফি উলামায়ে কেরাম সে পথেই চলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখি স্পষ্টভাবে বলেন, "যে ব্যক্তি

---

৪১৩. ফাযায়িলু আবি হানিফা (১৩২)।

৪১৪. দেখুন : শরহুত তহাবিয়্যাহ, ইবনে আবিল ইয (৩৩৭)।

বলবে, 'ঈমানের সঙ্গে পাপ কোনো ক্ষতি করে না, মুমিনদের উপর শরিয়তের বিধিবিধান (নামায-রোযা ইত্যাদি) ফরয নয়, সুতরাং সেগুলো এবং যেকোনো আমল ছেড়ে দেওয়া ঈমানের জন্য ক্ষতিকর নয়', এমন ব্যক্তি মুরজিয়া।"[৪১৫] স্পষ্টই যে, এই আকিদা থেকে ইমাম আজম এবং তাঁর অনুসারী হানাফি উলামায়ে কেরাম সম্পূর্ণ পবিত্র।

বরং শাব্দিক অর্থে তাকে মুরজিয়া বলা হলে অনেক সাহাবিকেও মুরজিয়া বলতে হবে। উপরন্তু কবিরা গুনাহকারীর পরিণতি আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়ার কারণে গোটা আহলে সুন্নাতের সবাইকে মুরজিয়া বলতে হবে। অথচ সেটা কেউ বলেন না। কারণ, 'মুরজিয়া' নামটি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর নাম ও নিদর্শন হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছে। একইভাবে ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে কারও কোনোকিছুতে সাদৃশ্য পাওয়া গেলেই তার উপর সেসব নাম প্রয়োগ করা বৈধ হলে ঈমানের সংজ্ঞার্থের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসের সঙ্গে খারেজি ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য থাকার কারণে মুহাদ্দিসদেরও খারেজি ও মুতাযিলা বলতে হবে, অথচ সেটা কখনো বলা হয়নি। কোনো হানাফি আলেম মুহাদ্দিসদের উপরিউক্ত কারণে খারেজি বা মুতাযিলা বলেন না। কারণ, খারেজি ও মুতাযিলা দুটো স্বতন্ত্র বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। সুতরাং শাব্দিক সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ রেখেও আহলে সুন্নাতের কাউকে খারেজি বা মুতাযিলা বলা যাবে না। তাহলে মুরজিয়া ও জাহমিয়্যাহদের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামকারী এই ইমামকে মুরজিয়া বলা ইনসাফ হবে কীসের ভিত্তিতে? এটা মোটেই ইনসাফ হবে না।

এক্ষেত্রে প্রথম যুগের ইমামগণ আদর্শ হতে পারেন। তারা যখন মুরজিয়াদের খণ্ডন করেছেন, সেটা ছিল বিভ্রান্ত মুরজিয়া। ইমাম আজমকে তারা মুরজিয়া বানিয়ে আঘাতের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেননি। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, 'রাফেযি, কাদারি ও মুরজিয়ার পিছনে নামায পড়ো না।' তাকে তাদের পরিচয় দিতে বললে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি বলে, **ঈমান (শুধু) কথা, সে মুরজিয়া**। যে ব্যক্তি বলে, আবু বকর ও উমর ইমাম (খলিফা) নন, সে রাফেযি। আর যে বলে, মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন, সে কাদারি।'[৪১৬] এখানে লক্ষ করুন, ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে, মুরজিয়া স্রেফ যে ব্যক্তি ঈমানকে মুখের স্বীকৃতির মাঝে সীমাবদ্ধ করে। তারা মূলত কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায়। এর সঙ্গে ইমাম আজম রহ.-এর মাযহাবের

---

৪১৫. আল-ইতিকাদ, বলখি (১০৮)।
৪১৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা (১০/৩১)।

কোনো সম্পৃক্ততা নেই। কারণ, তিনি ঈমানকে অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকৃতির সমন্বয় বলতেন। পাশাপাশি আমলকে ইমানের জন্য আবশ্যক বলতেন।

ইমাম আহমদ রহ.-কে যখন মুরজিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বলেন, 'যারা মনে করে ঈমান (স্রেফ) কথা।'[৪১৭] এখানেও মুরজিয়া বলতে বিভ্রান্ত মুরজিয়া (কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায়) উদ্দেশ্য, ইমাম আজম নন। কারণ, তিনি স্রেফ কথাকে ঈমান বলেন না। অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকৃতি দুটোর সমন্বয়কে ঈমান বলেন।

ইমাম আজমের পৌত্র উমর ইবনে হাম্মাদকে ইমাম মালেক রহ. বলেন, আমি শুনেছি, আবু হানিফা বলতেন, 'তার ঈমান জিবরিলের ঈমানের মতো।' উমর বলেন, আপনার কাছে বাতিল সংবাদ পৌঁছেছে। বরং তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তায়ালা জিবরিলকে রাসুল হিসেবে নবিজির কাছে পাঠিয়েছেন। তার আগে অন্য সকল নবির কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং রিসালাতের সত্যায়নের প্রতি দাওয়াত দিতে বলেছেন। সকল নবি এবং তাদের অনুসারীদের ঈমানের বিষয়গুলো ছিল এক, কেবল শরিয়ত ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এ জন্য আমি বলি না, তার ঈমান আমার ঈমানের মতো নয়। কারণ, সেটা বললে ঈমান একাধিক হয়ে যাবে। অথচ নবিগণ একই ঈমানের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। তাদের শরিয়ত ভিন্ন ভিন্ন ছিল।' ...এ কথা শুনে মালেক মুচকি হাসলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।[৪১৮]

এভাবে বিশুদ্ধ সূত্রে চার ইমামের মাঝে এক ইমামের প্রতি বাকি তিন ইমাম থেকে 'ইরজা' সম্পৃক্ত করা কিংবা তাকে মুরজিয়া বলার কোনো বক্তব্য নেই। যদি তারা তাঁকে উদ্দেশ্য নিয়েও থাকেন, তবুও নামোল্লেখ করে তাকে ছোট করার চেষ্টা করেননি, তাঁর শানে মন্দ কথা বলেননি, তাঁকে বিভ্রান্ত আখ্যা দেননি; বরং তারা প্রত্যেকেই ইমাম আজম রহ.-এর ব্যাপারে ইতিবাচক কথা বলেছেন, তাঁর প্রশংসা করেছেন। পরবর্তী সময়ে একদিকে ইমাম আজম রহ.-এর ব্যাপারে বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর অপপ্রচার, অপরদিকে ভুল বোঝাবুঝি, মতাদর্শিক পার্থক্য, হিংসা-বিদ্বেষ এবং অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে একদল মুহাদ্দিস ইমামকে মুরজিয়া বলে আখ্যা দেন। ফলে এ ধরনের বক্তব্য বস্তুনিষ্ঠ নয়। এক্ষেত্রে তারা অনুসরণীয়ও নন।

---

৪১৭. আস-সুন্নাহ, খাল্লাল (৩/৫৬৬)।

৪১৮. দেখুন : আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১১৩-১১৪)।

আবদুল কাদের জিলানি ইমাম আজমকে মুরজিয়া বলেননি

প্রশ্ন হতে পারে, শায়খ আবদুল কাদের জিলানি 'আল-গুনইয়া' গ্রন্থে আবু হানিফা রহ.-কে মুরজিয়া বলেছেন। সুতরাং তাকে মুরজিয়া বলা ভুল হবে কেন? প্রথমে আমরা শায়খের বক্তব্য দেখব, এরপর সেটার উপর আমাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরব।

শায়খ জিলানি আল-গুনইয়াতে মুরজিয়াদের বিভিন্ন ফিরকার ব্যাপারে আলোচনার সময় বলেন, (মুরজিয়াদের) 'আরেকটি ফিরকা হলো হানাফিয়্যাহ। আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবেতের শিষ্য-অনুসারীরা। তাদের মতে, ঈমান হলো স্রেফ জানা (মারেফাত) এবং আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা-কিছু নিয়ে এসেছেন সেটার সামগ্রিক স্বীকৃতি দেওয়া' (الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله وبما جاء من عنده جملة)।[৪১৯]

উপরের বক্তব্যটি বারাহুতি নামক অখ্যাত-অজ্ঞাত এক ব্যক্তির 'আশ-শাজারাহ' নামক কিতাব থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ উক্ত লেখক এবং এমন বইয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এমন অজ্ঞাত লেখক ও লেখার উপর নির্ভর করে এ ধরনের স্পর্শকাতর একটি বক্তব্য দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত? তাই অধমের ধারণা, শায়খ আবদুল কাদের জিলানি রহ. এ ধরনের বক্তব্য দেননি; বরং এটা তার বক্তব্য বিকৃত করে পরবর্তীকালে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। এ কারণে আমাদের হাতে বিদ্যমান আল-গুনইয়ার কোনো কোনো নুসখাতে আলোচ্য জায়গার পুরো বক্তব্যটা থাকলেও কেবল হানাফিদের জায়গায় 'গাসসানিয়্যাহ' নামটি রয়েছে আর আবু হানিফার জায়গায় 'গাসসান কুফি'র নাম রয়েছে।[৪২০] এটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ, গাসসানিয়্যাহদের মুরজিয়া হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং উপর্যুক্ত আকিদা তাদেরই আকিদা, ইমাম আজমের নয়। ইমাম আজম কখনোই ঈমানকে স্রেফ মারিফাত (জানা) বলেননি।

তর্কের খাতিরে যদি এটা শায়খ জিলানির বক্তব্য হিসেবে মেনে নেওয়াও হয়, তবে এর একটি জোরালো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই যে, গাসসানিয়্যাহরা যেহেতু ইমাম আজমের অনুসারী 'হানাফি' দাবিদার ছিল এবং তারা এসব ভ্রান্ত আকিদা ইমামের নামে প্রচার করত, এ জন্য জিলানি রহ. তাদের 'হানাফি' শব্দে ব্যক্ত করেছেন;

---

৪১৯. দেখুন : আল-গুনইয়াহ, জিলানি (৮০) [আল-মাতবাআতুল মিসরিয়্যাহ]।
৪২০. দেখুন : আল-গুনইয়াহ, জিলানি (১/১৮৬) [দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ]।

ইমাম আবু হানিফা কিংবা সাধারণ হানাফিরা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, খোদ জিলানি রহ. উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গাতে ইমামদের মতভেদ নিয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিন ইমামের পাশাপাশি ইমাম আজমের নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর শানে বিভিন্ন জায়গায় 'ইমাম আজম' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যদি তিনি ইমামকে ভ্রান্ত মুরজিয়া মনে করতেন, তবে তাঁর ব্যাপারে সম্মানসূচক 'ইমাম আজম' শব্দ ব্যবহার করতেন না। ফলে উক্ত নুসখার বর্ণনা সঠিক ধরা হলেও তিনি এখানে ইমাম আজমের সমালোচনা করেননি, বরং হানাফি পরিচয় দেওয়া একদল ভ্রান্ত মুরজিয়ার সমালোচনা করেছেন।

ঈমান ও কবিরা গুনাহ

কবিরা ও সগিরা গুনাহের পরিচয়

উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য আলেমদের মতে গুনাহ দুই ভাগে বিভক্ত। এক. সগিরা তথা ছোট গুনাহ; দুই. কবিরা তথা বড় গুনাহ। এটা মুসলিম উম্মাহর মুহাক্কিক আলেমদের প্রতিষ্ঠিত বক্তব্য। কিন্তু এই দুটোর সংজ্ঞার্থ যেহেতু কুরআন-সুন্নাহতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, ফলে উম্মাহর মাঝে এ দুটোর সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।

একদল আলেম মনে করেন, আল্লাহর কোনো নির্দেশ লঙ্ঘন করাই কবিরা গুনাহ। আরেক দল বলেন, যেকোনো গুনাহের উপর বাড়াবাড়ি করা এবং একাধিকবার করাই কবিরা গুনাহ। আর যে গুনাহ করার পরে সাথে সাথে তাওবা-ইস্তিগফার করা হয়, সেটা সগিরা হয়ে যায়। তারা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি হাদিস দ্বারা দলিল দেওয়ার চেষ্টা করেন যেখানে তিনি বলেছেন, 'বারবার করলে কোনো গুনাহ সগিরা থাকে না, ইস্তিগফার করলে কোনো কবিরা থাকে না।' কিন্তু এটা তাদের মতের পক্ষে দলিল নয়। প্রথমত এটা মারফু হিসেবে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়; বরং ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বক্তব্য হিসেবে প্রমাণিত[৪২১]। দ্বিতীয়ত এর মাধ্যমে কবিরা ও সগিরা গুনাহের অস্তিত্ব ও প্রকৃতিকে নাকচ করা হয় না। বাড়াবাড়ি করলে সগিরার পাপ কবিরাতে রূপান্তরিত হয় এবং ইস্তিগফার করলে কবিরা গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন—এগুলো সত্য, কিন্তু তাতে সগিরা ও কবিরা নামক দুই প্রকারের গুনাহের প্রকৃতির অস্তিত্ব নাকচ হয়ে যায় না।

এ জন্য আহলে সুন্নাত বলেন, সগিরা ও কবিরা দুই প্রকারের গুনাহ। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَوُضِعَ الْكِتَٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ অর্থ : 'আর উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং

৪২১. শুআবুল ঈমান, বাইহাকী (৯/৪০৬)।

এতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদের দেখবেন আতঙ্কগ্রস্ত এবং এরা বলবে, হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! তা তো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয় না, বরং সবকিছু হিসেব রেখেছে। এরা এদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে; আপনার প্রতিপালক কারও উপর জুলুম করেন না।' [কাহাফ : ৪৯] আরও বলেন, ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ অর্থ : 'তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে, তার মধ্যে যা গুরুতর (কবিরা) তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের পাপগুলো মোচন করব আর তোমাদের সম্মানজনক স্থানে দাখিল করব।'[৪২২] [নিসা : ৩১] উপরের আয়াতগুলোতে সগিরা ও কবিরা নামে দুই প্রকারের গুনাহের অস্তিত্ব থাকা সুস্পষ্ট।

আরেক দল মনে করেন, কবিরা ও সগিরা গুনাহ আপেক্ষিক। অর্থাৎ, স্বতন্ত্রভাবে কবিরা (বড়) বা সগিরা (ছোট) বলার সুযোগ নেই। বরং অন্যের সঙ্গে তুলনায় কবিরা-সগিরা নির্ধারিত হবে। ফলে অনেক গুনাহ সে গুনাহের চেয়ে ছোট গুনাহের তুলনায় কবিরা বিবেচিত হবে। আবার বড় গুনাহের তুলনায় সগিরা বিবেচিত হবে। যেমন—বেগানা নারীকে যৌন উত্তেজনাসহ স্পর্শ করার বিধান। এটা ব্যভিচারের তুলনায় সগিরা গুনাহ, কিন্তু উত্তেজনাসহ তাকানোর তুলনায় কবিরা গুনাহ।[৪২৩] কিন্তু এই মতামতও সঠিক নয়। নারীকে যৌন উত্তেজনা সহকারে স্পর্শ করা হারাম ও কবিরা গুনাহ, সগিরা নয়। বরং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এটাকেও প্রকারান্তরে 'ব্যভিচার' (যিনা) আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'চোখ ব্যভিচার করে; চোখের ব্যভিচার হলো তাকানো। হাত ব্যভিচার করে; হাতের ব্যভিচার হলো স্পর্শ। মুখ ব্যভিচার করে; মুখের ব্যভিচার হলো কথা।'[৪২৪] তাই এটাও একপ্রকারের ব্যভিচার ও কবিরা গুনাহ। কিন্তু বাস্তব ব্যভিচার হলো কবিরা গুনাহের মাঝে জঘন্য প্রকারের গুনাহ (ফাহিশা)। একটাকে ছোট বলতে গিয়ে কবিরা গুনাহের সীমা থেকে বের করে দেওয়া যাবে না। সদরুশ শরিয়াহ বলেন, 'কবিরা গুনাহ দুই প্রকারের। এক. ফাহিশা তথা অশ্লীল কাজ। যেমন—সমকামিতা, বাবার স্ত্রীকে বিয়ে করা ইত্যাদি। দুই. সে সকল গুনাহ কুরআন-সুন্নাহতে যে ব্যাপারে দুনিয়া ও

---

৪২২. দেখুন : আল-কিফায়াহ, সাবুনি (৩৩৯-৩৪০)। শরহুল আকায়েদ, তাফতাযানি (২৬৩)।
৪২৩. আল-কিফায়াহ, সাবুনি (৩৪০-৩৪১)।
৪২৪. শরহু মুশকিলিল আসার, তহাবি (৯৮)।

আখেরাতে শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে।'[৪২৫] 'ফাহেশা' হলো : কবিরা গুনাহের মাঝে আরও বড় ধরনের অনৈতিক ও অন্যায় গুনাহ। যেমন—হত্যা করা, ব্যভিচার করা, সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া, চুরি করা, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, যাদু করা, যুদ্ধ থেকে পলায়ন করা, পরনিন্দা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের মাল ভক্ষণ করা, জুলুম করা, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।[৪২৬]

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট যে, কবিরা ও সগিরা নামক দুই প্রকারের গুনাহের অস্তিত্ব অনিবার্য সত্য। যারা এটাকে নাকচ করেন তাদের বক্তব্য সঠিক নয়। তবে কবিরা ও সগিরা গুনাহের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য, এক্ষেত্রে সবচেয়ে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে বিজ্ঞ সাহাবি ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে। তাঁর থেকে বর্ণিত : 'কবিরা গুনাহ হলো, আল্লাহ তায়ালা যে গুনাহের কারণে জাহান্নামের শাস্তির হুমকি দিয়েছেন; নিজের অসন্তুষ্টি, অভিশাপ ইত্যাদির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।' কেউ কেউ এগুলোর সঙ্গে সেসব গুনাহকেও কবিরা হিসেবে যুক্ত করেছেন, যেগুলোর জন্য শরিয়তে নির্ধারিত শাস্তি (হদ) রয়েছে। আর সগিরা হলো এগুলোর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের সাধারণ গুনাহ, শরিয়তে যে জন্য কোনো শাস্তি নেই, আল্লাহ তায়ালা যেসব গুনাহের কারণে অসন্তুষ্টি কিংবা পরকালে শাস্তির হুমকি দেননি। কবিরা ও সগিরা গুনাহের বিদ্যমান সংজ্ঞার্থগুলোর মাঝে এটাই বেশি পূর্ণাঙ্গ।[৪২৭]

কবিরা গুনাহের সংখ্যা

কবিরা ও সগিরার সংজ্ঞার্থ নিয়ে যেহেতু মতবিরোধ রয়েছে, ফলে স্বাভাবিকভাবে সংখ্যা নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। কারও মতে, কবিরা গুনাহ চারটা যা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত : 'আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, মিথ্যা শপথ করা।' কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে—'মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।'[৪২৮] তবে বিভিন্ন বর্ণনায় এগুলোকে 'সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ' বলা হয়েছে। সুতরাং কবিরা গুনাহ

---

৪২৫. শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১৪০)।

৪২৬. আল-ফিকহুল আকবার, আলি কারি (৫৪)।

৪২৭. দেখুন : শরহে মুসলিম, নববি (২/৮৫)।

৪২৮. বুখারি (কিতাবুশ শাহাদাত : ২৬৫৩)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ৮৭)।

কেবল এই চারটা এমন নয়। আবু হুরাইরা রাযি.-এর হাদিসে সাতটা বিষয়কে ধ্বংসাত্মক বলা হয়েছে। সেগুলো হলো : আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধের দিন পলায়ন করা, সচ্চরিত্র নিষ্কলঙ্ক মুমিন নারীকে অপবাদ দেওয়া।[৪২৯] এগুলোও বড় পর্যায়ের কবিরা গুনাহ যাকে 'ফাহেশা'ও বলা হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কবিরা গুনাহ কেবল এই সাতটার মাঝে সীমাবদ্ধ। বরং যেসব গুনাহের অনিষ্ট এগুলোর সমপর্যায়ের হবে, সেগুলোও কবিরা গুনাহ বিবেচিত হবে।[৪৩০]

মোটকথা, কবিরা গুনাহের সংখ্যা নির্ধারিত নয়, বরং উপরের সংজ্ঞার্থের ভিত্তিতে কবিরা ও সগিরার সংখ্যা নির্ধারিত হবে। কোনো কোনো আলেম কবিরা গুনাহকে ৭০টা পর্যন্ত গণনা করেছেন। কেউ আরও কম বা বেশি। তবে সংখ্যার বিষয়টা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ নয়, ফলে আমরা সেটাকে এখানে উল্লেখ করছি না। আমাদের জন্য যেটুকু জানা আবশ্যক তা হলো—কবিরা হোক সগিরা হোক, কোনো গুনাহকেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। বরং মানুষ যেন সগিরাকে ছোট মনে না করে, কবিরা হয়ে যাওয়ার ভয়ে যেন সকল প্রকারের গুনাহ থেকে দূরে থাকে, এ জন্য হয়তো আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল কবিরা ও সগিরা গুনাহের মাঝে সুস্পষ্ট কোনো সীমারেখা টেনে দেননি। যেমন—লাইলাতুল কদরকে তিনি গোপন রেখেছেন যাতে মানুষ রমযানের সকল রাতে কদরের সন্ধানে ইবাদত করে। একইভাবে তিনি জুমার দিন দোয়া কবুলের সময়টুকু গোপন রেখেছেন যাতে মানুষ পুরো সময়টা দোয়ার মধ্য দিয়ে কাটায়। সেভাবে তিনি কবিরা ও সগিরা গুনাহের পার্থক্যও গোপন রেখেছেন যাতে মানুষ কবিরা হওয়ার আশঙ্কায় কবিরা ও সগিরা সব ধরনের গুনাহ থেকে দূরে থাকে। ফলে একজন মুসলিমের কবিরা নাকি সগিরা এই পার্থক্য খোঁজার চেয়ে সকল ধরনের গুনাহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা উচিত। কারণ, গুনাহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা না হলে, গুনাহকে হালকা মনে করলে, তার জন্য চূড়ান্ত পরিণামে সগিরা ও কবিরা গুনাহের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না। এটা উমর ও ইবনে আব্বাসসহ বিভিন্ন সাহাবির বক্তব্য। তারা বলেছেন, 'ইস্তিগফারের সঙ্গে কোনো গুনাহ কবিরা থাকে না। আর বারবার করলে কোনো গুনাহ সগিরা থাকে না।' অর্থাৎ, ইস্তিগফার করলে আল্লাহ যেহেতু সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন, সুতরাং কবিরা গুনাহও ক্ষমা হয়ে যায়।

---

৪২৯. বুখারি (কিতাবুল ওয়াসায়া : ২৭৬৬)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ৮৯)।
৪৩০. দেখুন : শরহুল আকায়েদ, তাফতাযানি (২৬৩)।

বিপরীতে সগিরা গুনাহের জন্য যদিও ইস্তিগফার ও তাওবা দরকার নেই, কিন্তু সগিরা গুনাহ বারবার করতে থাকলে সেটা কবিরাতে পরিণত হয়ে যায়। কারণ, তখন সেটা ব্যক্তির দ্বীনের প্রতি গাফলতি ও অবজ্ঞার মানসিকতা তুলে ধরে, যা কবিরা গুনাহ। ফলে সংজ্ঞার্থের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো গুনাহের প্রতি মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্তরের অবস্থা। এটার উপর ভিত্তি করেই তার আমলের পাল্লায় সগিরা ও কবিরা গুনাহ বিদ্যমান থাকবে। নফসের ধোঁকায় পড়ে কবিরা গুনাহ করার পরও আল্লাহর প্রতি ভয়, লজ্জা, অন্তরের মনস্তাপ ইত্যাদি কারণে কবিরা সগিরাতে রূপান্তরিত হয়ে যায় কিংবা একেবারে নাই হয়ে যায়। আবার অন্তরের গাফলতি, অবজ্ঞা এবং বারবার অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়ার দরুন সগিরা কবিরাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির বিধান

কবিরা গুনাহে লিপ্ত মুসলিমের বিধান কী—এ ব্যাপারে মুসলিম জাতি তিন ভাগে বিভক্ত। **এক.** কবিরা গুনাহে লিপ্ত হলে কোনো সমস্যা নেই, শাস্তি নেই। এটা ভ্রান্ত চরমপন্থি মুরজিয়াদের বক্তব্য। **দুই.** কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির শাস্তি নিশ্চিত এবং চিরস্থায়ী জাহান্নাম। এটা ভ্রান্ত খারেজি ও মুতাযিলাদের বক্তব্য। **তিন.** ক্ষমা অথবা শাস্তি দুটোর একটারও নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না। এমন ব্যক্তি তাওবা করলে ক্ষমা পাবে। তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থাকবে—চাইলে তিনি সাময়িক শাস্তি দেবেন, আর চাইলে ক্ষমা করে দেবেন। এটা ইমাম আজম আবু হানিফাসহ আহলে সুন্নাতের সকল আলেমের বক্তব্য এবং একমাত্র সঠিক বক্তব্য। নিচে আমরা প্রত্যেকটি মাযহাব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

খারেজিদের মাযহাব

খারেজিদের মতে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ধরনের কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়, তবে সে কাফের হয়ে যাবে, তার ঈমান চলে যাবে। বরং তাদের কিছু মত দেখলে বোঝা যায়, কেবল কবিরা গুনাহ নয়, আল্লাহর যেকোনো নির্দেশের অবাধ্য হলে, হোক সেটা কবিরা কিংবা সগিরা, এমন ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে।[৪৩১] তারা মনে করে, পবিত্র কুরআনের এ বাণী তাদের দলিল : ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ অর্থ : 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা

---

৪৩১. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, সমরকন্দি (৫)। আত-তামহিদ, নাসাফি (১৩৪)।

করবে, তার শাস্তি হবে জাহান্নাম; সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হন। তাকে লানত করেন। তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত করেন।' [নিসা : ৯৩] তাদের যুক্তি হলো, আল্লাহ তায়ালা এখানে হত্যাকারী তথা কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে চিরতরে জাহান্নামে নিক্ষেপের কথা বলেছেন। আর এটা হচ্ছে কাফেরদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি। বোঝা গেল, কবিরা গুনাহকারী কাফের।

আবুল লাইস সমরকন্দি তাদের খণ্ডনে বলেন, এটা গলত বক্তব্য, বিদআতি তাফসির। কারণ, **এক**. কুরআনের আয়াতের এমন তাফসির সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন তথা উম্মাহর কেউ করেননি; বরং তাদের সকলের ঐকমত্যে এখানে হত্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হালাল মনে করা। অর্থাৎ, যদি কেউ হত্যাকে হালাল মনে করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। হালাল মনে না করে হত্যা করলে কাফের হবে না। ইবনে আব্বাস রাযি.-এর মত এটাই। **দুই**. আয়াতের আরেকটা অর্থ হলো, এখানে 'চিরস্থায়ী' বলতে দীর্ঘ সময় বোঝানো হয়েছে। হত্যার শাস্তির ভয়াবহতা বোঝাতে এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। চিরস্থায়ী বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। কুরআনের এ ধরনের বর্ণনাপদ্ধতি বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। **তিন**. তা ছাড়া, কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দেখলে স্পষ্ট হয় যে, খোদ কুরআনেও কবিরা গুনাহকারীকে কাফের না বলে ফাসেক বলা হয়েছে। যেমন—আল্লাহ তায়ালা একটি আয়াতে ইরশাদ করেন : ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾ অর্থ : 'হে মুমিনগণ, যদি কোনো ফাসেক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে সেটা যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হয়ে নাও।' [হুজুরাত : ৬] এখানে ফাসেক (পাপী) বলতে মিথ্যাবাদী বোঝানো হয়েছে। অন্যকথায়, মিথ্যাবাদীকে ফাসেক বলা হয়েছে। যদি মিথ্যা বলা কুফর হতো, তবে ফাসেক না বলে কাফের বলা হতো। **চার**. সাহাবি মায়েয ইবনে মালেক রাযি. ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার পরে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে স্বীকারোক্তি দেন। কবিরা গুনাহ যদি কুফর হতো, তবে নবিজি তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করতেন অথবা তাকে ঈমানে ফিরে আসতে বলতেন; অথচ এমন কিছু ঘটেনি।[৪৩২]

ইমাম মাতুরিদি বলেন, "আল্লাহ তায়ালা কুরআনে রাসুলুল্লাহকে নিজের জন্য এবং মুমিনদের জন্য ইস্তিগফার করতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ অর্থ : 'সুতরাং

৪৩২. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, সমরকন্দি (৬)।

(হে রাসুল) জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।' [মুহাম্মাদ : ১৯] আবার অন্যদিকে তাকে এবং মুমিনদেরকে মুশরিকদের জন্য ইস্তিগফার করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ﴾ অর্থ : 'আত্মীয়স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবি ও মুমিনদের জন্য সংগত নয় যখন সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা নিশ্চিতই জাহান্নামি।' [তাওবা : ১১৩] বোঝা গেল, গুনাহগার হওয়া সত্ত্বেও মুমিনরা মুমিনই থাকে। তাদের উপর 'কুফর' শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। এসব আয়াত খারেজি ও মুতাযিলা উভয় সম্প্রদায়ের খণ্ডন।"[৪৩৩]

তারা আরও বিভিন্ন আয়াত দিয়ে দলিল দেয়। যেমন—আল্লাহর বাণী: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ অর্থ: 'যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তো তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। তারা অচিরেই দোযখের জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।' [নিসা : ১০] তাদের বক্তব্য হলো, এখানে জাহান্নামে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বের হওয়ার কথা বলা হয়নি! বোঝা গেল, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে! একইভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী : ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ অর্থ : 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসুলের অবাধ্য হবে এবং আল্লাহর সীমা অতিক্রম করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সে তথায় চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।' [নিসা : ১৪] এখানে তো জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকা স্পষ্ট। সুতরাং কোনো ব্যক্তি মুমিন থাকার পরে যদি কবিরা গুনাহ করে, তাহলে সে স্থায়ীরূপে জাহান্নামে থাকবে।

আহলে সুন্নাতের বক্তব্য হলো, কোনো বিষয়ে কুরআনের কোনো একটি আয়াত দেখেই হুট করে স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না; বরং অন্যান্য আয়াত থেকে সেটার তাফসির গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ অর্থ : 'মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো যাতে সফলকাম হও।' [নুর : ৩১] আরও বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا

৪৩৩. আত-তাওহিদ (২৩৬-২৩৭)।

(تَوْبَةً نَّصُوحًا) অর্থ : 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটি তাওবা করো, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলি মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের দাখিল করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবহমান।' [তাহরিম : ৮] এসব আয়াতে একসঙ্গে তাদের মুমিন হিসেবে সম্বোধন করছেন, আবার তাওবা করতেও বলছেন। বোঝা গেল, গুনাহ কুফর নয়। কবিরা গুনাহের কারণে মানুষ ঈমান থেকে বের হয় না। কবিরা গুনাহের মাধ্যমে কেউ কাফের হয় না। তা ছাড়া, এসব আয়াতে কোথাও চিরস্থায়ী হওয়ার কথা নেই, বরং সর্বোচ্চ 'খুলুদ'-এর কথা আছে। আর 'খুলুদ' লম্বা সময়ের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। চিরস্থায়ী হওয়া জরুরি নয়।[৪৩৪]

হত্যার শাস্তির ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো, যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ভুলে হত্যা করে ফেলবে, তাকে 'দিয়ত' (রক্তপণ) ও কাফফারা দিতে হবে। আর যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তবে তাকেও 'কিসাস'-স্বরূপ হত্যা করা হবে। কিন্তু তাতে সে কাফের হবে না। যদি তাওবা করে মারা যায়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি তাওবা ছাড়া মারা যায়, তবে আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থাকবে—চাইলে তিনি তাকে নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেবেন, আর চাইলে ইনসাফপূর্বক অপরাধ অনুপাতে শাস্তি দেবেন। অতঃপর তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাত দান করবেন। এটাই সঠিক কথা। সুতরাং কেউ যদি বলে, হত্যাকারী চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, সে বিদআতি ও বিভ্রান্ত। কেননা, মুমিনকে হত্যার মাধ্যমে কোনো মুমিন কাফের হয় না। আর জাহান্নামে কাফের ছাড়া অন্য কেউ স্থায়ীরূপে থাকবে না।[৪৩৫]

মুতাযিলা ও কাদারিয়্যাহদের মাযহাব

মুতাযিলা ও কাদারিয়্যাহদের মতে, কবিরা গুনাহকারী ঈমান থেকে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু কুফরের মাঝে প্রবেশ করবে না; বরং ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি অবস্থান করবে। তাদের কেউ কেউ এমন ব্যক্তিকে মুনাফিকও সাব্যস্ত করেছে। যদি মৃত্যুর আগে তাওবা করে ঈমানে প্রবেশ করে, তবে বেঁচে যাবে। আর যদি তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে, তবে পরকালে চিরস্থায়ীরূপে জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহর জন্য তাকে ক্ষমা করা বৈধ হবে না! তবে তাদের শাস্তি অবাধ্য মুমিনদের

---

৪৩৪. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৩৮)।

৪৩৫. দেখুন : আস-সাওয়াদুল আজম (১৩)।

মতো হবে; কাফেরদের মতো শাস্তি হবে না। এক্ষেত্রে তারা সেসব দলিল দিয়ে তাদের মাযহাব প্রমাণিত করার চেষ্টা করে, খারেজিরা যেগুলো তাদের মাযহাবের দলিল হিসেবে পেশ করে।[৪৩৬]

তারা বলে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ অর্থ : 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসুলের অবাধ্য হবে এবং আল্লাহর সীমা অতিক্রম করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সে তথায় চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।' [নিসা : ১৪] নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি পরিত্যাগ করা মূলত আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করা। আর এগুলো ছেড়ে দেওয়া কবিরা গুনাহ। সুতরাং বোঝা গেল, কবিরা গুনাহকারী পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে!

তারা আরও একটি আয়াত দিয়ে দলিল দেয় : ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ অর্থ : 'যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য আছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।' [তহা : ৭৪) এখানে অপরাধী বলতে ব্যাপক। কাফেরের সঙ্গে কবিরা গুনাহকারীও অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এখানে তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের ঘোষণা করা হয়েছে।

সেসব দলিলই তাদের খণ্ডন খারেজিদের খণ্ডনে যেসব দলিল উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, পার্থিব জীবনের বিধানের ক্ষেত্রে তাদের ও খারেজিদের মাঝে সামান্য ব্যবধান থাকলেও পরকালীন পরিণতির ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের বক্তব্য এক ও অভিন্ন। আর আয়াতে 'মরবেও না বাঁচবেও না বলে' চিরস্থায়ী জাহান্নামি বোঝানো হয়নি, বরং এটা দুঃসহ জীবনের বেদনার ব্যাপারে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, জান্নাত কিংবা জাহান্নামের কেউ কখনো মরবে না এটা তো স্পষ্ট। 'বাঁচবে না' অর্থ হলো, জাহান্নামের প্রচণ্ড শাস্তির মাঝে বেঁচে থেকেও বেঁচে না থাকার মতো থাকবে। এটা এমন জীবন যাকে বেঁচে থাকা বলে না।

মুরজিয়াদের মাযহাব

মুরজিয়াদের মতে, ঈমান আনার পরে যত গুনাহই করুক, কোনো ক্ষতি নেই, ঠিক যেমন কুফর করার পরে নেক আমল করলে কোনো লাভ নেই। ফলে যতই

---

৪৩৬. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, সমরকন্দি (৬)। উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৩৫)। আত-তামহিদ, নাসাফি (১৩৪)। আল-কিফায়াহ, সাবুনি (৩২৫)।

কবিরা গুনাহ করুক, তাদের মতে, শাহাদাত পড়া থাকলে সে ব্যক্তি কামেল মুত্তাকি ও পুণ্যবান বিবেচিত হবে। আখেরাতে তার কোনো শাস্তি নেই।[৪৩৭]

মুরজিয়ারা এক্ষেত্রে কুরআনের সেসব আয়াত দিয়ে দলিল দেয়, যেখানে কুফরের বিপরীতে ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের উল্লেখযোগ্য কিছু দলিল হলো :

আল্লাহর বাণী : ﴿قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ অর্থ : 'আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' [যুমার : ৫৩] এখানে আল্লাহ তায়ালা তাওবার শর্ত দেননি; বরং এমনিতেই সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলেছেন। বোঝা গেল, তাওবা করলে যেমন গুনাহ ক্ষমা হয়, তাওবা না করলেও ক্ষমা হয়ে যায়!

আল্লাহর বাণী : ﴿ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَٰٓقُّونَ فِيهِمْۚ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ অর্থ : 'অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন : আমার অংশীদাররা কোথায় যাদের ব্যাপারে তোমরা বিতর্ক করতে? যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল তারা বলবে : নিশ্চয়ই আজকের দিনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি কাফেরদের জন্য।' [নাহল : ২৭] যেহেতু লাঞ্ছনাকে কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, আর লাঞ্ছনা মানে এখানে জাহান্নামে প্রবেশ করা—যেমনটা আল্লাহ বলেন, ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক, যাকে আপনি দোযখে নিক্ষেপ করলেন, তাকে তো আপনি নিশ্চয়ই লাঞ্ছিত করলেন, আর জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।' [আলে ইমরান : ১৯২] বোঝা গেল, মুমিন যত গুনাহই করুক, কোনো অসুবিধা নেই।

আল্লাহর বাণী : ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ﴾ অর্থ : সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে আর কতক মুখ কালো হবে। যাদের মুখ কালো হবে তাদের বলা হবে, 'ঈমান আনয়নের পর কি তোমরা কুফরি করেছিলে? যেহেতু কুফরি করতে, সুতরাং

৪৩৭. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, সমরকন্দি (৬)। আল-কিফায়াহ (৩২৫)।

তোমরা শাস্তি ভোগ করো।' [আলে ইমরান : ১০৬] এখানে শাস্তিযোগ্য কেবল তাদেরই বলা হয়েছে, যারা ঈমানের পরে কুফর করবে তথা মুরতাদ হয়ে যাবে। কিন্তু গুনাহ করলে কোনো সমস্যা নেই।

খণ্ডন : বস্তুত এগুলো সব অসার যুক্তি। কুরআনের মূল রুহ ও মেযাজকে এড়িয়ে আংশিক ও কর্তিত উপস্থাপন। এভাবে পৃথিবীর যেকোনো মতবাদকে কুরআন থেকে বিশুদ্ধ প্রমাণিত করা যাবে। আর বাতিল ও বিদআতপন্থিরা মূলত সে কাজটাই করে, যেমনটা আমরা প্রথমে খারেজি, মুতাযিলা ও কাদারিয়্যাহ তিনটি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই দেখেছি।

প্রথম আয়াতে তাওবার কথা উল্লেখ করা হয়নি ঠিকই, কিন্তু ওটা মূলত তাওবাকে নাকচ নয়; বরং তাওবার সুফল হিসেবেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ, গুনাহ করার পর খারেজি কিংবা মুতাযিলাদের মতো হতাশ হয়ে যাওয়ার কিছু নেই। তাওবা করলেই আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাওবাও করা লাগবে না—এ ধরনের তাফসির মুসলিম উম্মাহর কোনো নির্ভরযোগ্য আলেম করেননি। হ্যাঁ, তাওবা ছাড়া মারা গেলে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে—চাইলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন, চাইলে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু তাওবা করা না-করা বরাবর—এমন জঘন্য কথা ইসলামি শরিয়াহতে নেই। কাযি সদর বাযদাবি বলেন, 'আল্লাহ এখানে ক্ষমার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ক্ষমা কি শাস্তির আগে করবেন নাকি শাস্তি দিয়ে ক্ষমা করবেন, সেটা বলেননি। অন্যান্য আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, (তাওবা ছাড়া মারা গেলে) তিনি শাস্তি দিয়ে ক্ষমা করবেন। সুতরাং এ আয়াত তাদের দলিল নয়।'[৪৩৮]

দ্বিতীয় আয়াতও তাদের দলিল নয়। কারণ, দ্বিতীয় আয়াতে যদিও কাফেরদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু গুনাহগার মুমিনদের শাস্তি দেওয়া হবে না—এমন কোনো কথা বলা হয়নি। বরং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে গুনাহের কারণে মুমিনদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

বস্তুত খারেজি ও মুরজিয়া উভয় দলের মতাদর্শ বিভ্রান্তির উপর দণ্ডায়মান। এক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ থেকে আলাদাভাবে দলিল দেওয়ার দরকার নেই। বরং তাদের এক পক্ষের দলিল সহজেই অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ, খারেজি ও মুরজিয়া সম্প্রদায় কবিরা গুনাহের বিধানের ক্ষেত্রে দুই প্রান্তিকতায় অবস্থিত। ফলে খারেজিদের বিরুদ্ধে মুরজিয়াদের পেশকৃত দলিলগুলো উল্লেখ

৪৩৮. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৪৩)।

করলেই তাদের খণ্ডন হয়ে যায়। আবার মুরজিয়াদের বিরুদ্ধে খারেজিদের দলিলগুলো উল্লেখ করলেই তাদের খণ্ডন হয়ে যায়। তথাপি ইমাম আজম রহ.-এর মুখে তাদের আরও খণ্ডন সামনে আসছে।

ইমাম আজম তথা আহলে সুন্নাতের মাযহাব

ইমাম আজমসহ সকল আহলে সুন্নাতের অবস্থান হলো দুটোর মাঝামাঝি। কবিরা গুনাহকারীকে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামি বলেন না। আবার কবিরা গুনাহকারীর পরিণতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তও হয়ে যান না, বরং ভয় ও আশার মাঝে থাকেন। অর্থাৎ, কোনো মুসলমান হালাল মনে করা কিংবা অবজ্ঞাবশত নয়, বরং প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে যদি কোনো কবিরা গুনাহ করে ফেলে, অতঃপর তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে, তবে তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামি বলা যাবে না; বরং সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থাকবে—চাইলে তিনি নিজ অনুগ্রহে কিংবা শাফায়াতকারীদের শাফায়াতে তাকে সরাসরি ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাত দান করবেন, অথবা তার কর্মফলস্বরূপ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। যতদিন ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেবেন। অতঃপর নিজ অনুগ্রহে কিংবা শাফায়াতের মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাত দান করবেন। মোটকথা, কবিরা গুনাহের শাস্তি কখনোই চিরস্থায়ী জাহান্নাম নয়। আর সগিরা গুনাহ অন্যান্য পুণ্য ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। তিনি বলেন, ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾ অর্থ : 'নিশ্চয়ই পুণ্য পাপকে মিটিয়ে দেয়।' [হুদ : ১১৪][৪৩৯]

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে মুমিন সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ﴾ অর্থ : 'হে মুমিনগণ, তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাকো তখন নামাযের কাছেও যেয়ো না, যতক্ষণ না যা মুখে বলো সেটা বুঝতে পারো।' [নিসা : ৪৩] মদ্যপান কবিরা গুনাহ। অথচ মদ্যপানকারীকে এখানে মুমিন বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ অর্থ : 'মুসলিমদের দুটি দল আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্যদলের উপর বাড়াবাড়ি

---

৪৩৯. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৩৫)। আত-তামহিদ, নাসাফি (১৩৬-১৩৭)। আত-তামহিদ, লামিশি (১২১)।

করে, তবে যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যে যাবৎ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং যদি ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করে দাও এবং ইনসাফ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।' [হুজুরাত : ৯] মুমিনদের আন্তঃকলহ কবিরা গুনাহ। অথচ এখানে দুই দলকেই মুমিন বলা হয়েছে। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ﴾ অর্থ : 'হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর নিহতের ক্ষেত্রে কিসাস অপরিহার্য করা হয়েছে।' [বাকারা : ১৭৮] মানুষ হত্যা করা মারাত্মক পর্যায়ের কবিরা গুনাহ। অথচ আল্লাহ এখানে হত্যাকারীদেরও মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করে মুমিন সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾ অর্থ : 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটি তাওবা করো, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলি মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবহমান।' [তাহরিম : ৮] এখানে তাওবার জন্য মুমিন বলে ডেকেছেন। তাওবা তো সাধারণত গুনাহগারদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে আল্লাহ কবিরা গুনাহকারীকেই মুমিন বলে সম্বোধন করেছেন। যদি গুনাহের মাধ্যমে মানুষ কাফের হয়ে যেত, তবে তাদের মুমিন বলে সম্বোধন করতেন না।[৪৪০]

এ জন্য ইমাম আজম বলেন, **'তাওহিদ এবং রাসুলুল্লাহর রিসালাতের অনুসারীদের মাঝে যারা গুনাহগার, তারা (গুনাহ সত্ত্বেও) নিঃসন্দেহে মুমিন। তারা সন্দেহাতীতভাবেই কুফর থেকে মুক্ত।'**[৪৪১] তিনি আরও বলেন, **"শিরক ছাড়া আহলে কিবলা কোনো মুমিনের অন্য কোনো অপরাধের ব্যাপারে এ কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তাকে শাস্তি দেবেন। কারণ, শিরক ছাড়া আল্লাহ যেকোনো গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। হ্যাঁ, আমরা জানি না আল্লাহ কোনটা ক্ষমা করবেন, কোনটা করবেন না। আল্লাহ বলেন,** ﴿إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَنُدۡخِلۡكُم مُّدۡخَلٗا كَرِيمٗا﴾ **অর্থ : 'যা তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সেসব বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারো, তবে আমি তোমাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেবো এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের**

---

৪৪০. আস-সাওয়াদুল আজম (১)।
৪৪১. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৩১)।

প্রবেশ করাব।' [নিসা : ৩১] তবে আল্লাহ চাইলে শিরক ছাড়া সকল গুনাহই ক্ষমা করে দিতে পারেন। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا﴾ অর্থ : 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে লোক তাঁর সাথে শরিক করে। এ ছাড়া তিনি যার জন্য চান সবকিছু ক্ষমা করেন।' [নিসা : ৪৮] উক্ত আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, আল্লাহ যার জন্য চাইবেন শিরক ছাড়া তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তবে কার জন্য চাইবেন আর কার জন্য চাইবেন না, সেটা আমাদের জানা নেই।"[৪৪২] ফলে কবিরা গুনাহকারীর ব্যাপারে সুনিশ্চিত কোনো ফয়সালা দেওয়ার সুযোগ নেই।

আল-ফিকহুল আকবারে ইমাম বলেন, **"যে ব্যক্তি সব ধরনের শর্ত মেনে ত্রুটিমুক্ত কোনো নেক আমল করবে, কুফর ও ধর্মত্যাগ থেকে দূরাবস্থান করে মুমিন অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তার সে আমলকে নষ্ট করবেন না; বরং কবুল করে নেবেন এবং তাকে প্রতিদান দেবেন। আর যে ব্যক্তি শিরক ও কুফর ছাড়া অন্য কোনো গুনাহ করে, এর পর তাওবা না করেই ফাসেক মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে আল্লাহর এখতিয়ারাধীন থাকবে—চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেবেন, চাইলে জাহান্নামের শাস্তি দেবেন। তবে চিরস্থায়ী শাস্তি দেবেন না।"**[৪৪৩]

ইমামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কিছু (খারেজি) লোক নবি কারিম (ﷺ) থেকে এ মর্মে হাদিস বর্ণনা করে যে, যখন কোনো মুমিন যিনা করে, তখন তার মাথা থেকে ঈমান এমনভাবে বেরিয়ে যায় যেমন জামা খোলার সময় মাথা থেকে বেরিয়ে যায়। অতঃপর যখন তাওবা করে, তখন ঈমানও আবার ফিরে আসে।' আপনি কি এ কথায় বিশ্বাস করেন, নাকি সন্দেহ করেন? যদি বিশ্বাস করেন, তবে এটা তো খারেজিদের বক্তব্য; আর যদি সন্দেহ করেন, তবে খারেজিদের ব্যাপারে অকারণে আপনি সন্দেহ করলেন এবং ইনসাফের পথ থেকে সরে গেলেন। আর যদি এটাকে মিথ্যা বলেন, তবে আপনি নবিজির হাদিসকে মিথ্যা বললেন। কারণ, তারা এটা নবিজি থেকে বর্ণনা করে। ইমাম বললেন, **"তারা মিথ্যা বলেছে। আমি তাদের মিথ্যাপ্রতিপন্ন করছি। এর দ্বারা অবশ্যই নবিজিকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা হচ্ছে না। নবিজি (ﷺ)-কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা হবে তখন যখন কেউ বলবে, 'আমি**

---

৪৪২. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৬)।

৪৪৩. আল-ফিকহুল আকবার (৫)।

নবিজিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছি।' কিন্তু কেউ যদি বলে, 'আমি নবিজি (ﷺ) যা যা বলেছেন সবকিছু সত্য বলে মানি, ঈমান রাখি; কিন্তু নবিজি (ﷺ) কুরআনের বিরোধিতা করতে পারেন না, অন্যায় কথা বলতে পারেন না', তবে তার এ কথা মূলত নবিজি ও কুরআনকে সত্যায়ন করাই, তিনি কুরআনের বিরুদ্ধে বলতে পারেন না এ স্বীকৃতি দেওয়াই। কারণ, নবিজি (ﷺ) যদি মিথ্যা বলতেন, নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিতেন, তবে আল্লাহ তাকে এক মুহূর্তের জন্য ছাড় দিতেন না। তাঁর শাহরগ কেটে দিতেন, যেমনটা তিনি কুরআনে বলেছেন, ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝﴾ অর্থ : 'তিনি যদি আমার নামে কোনো কথা রচনা করতেন, তবে আমি তাঁর দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম । অতঃপর কেটে দিতাম তাঁর গলা। তোমাদের কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারতে না।' [হাক্কাহ : ৪৪-৪৭] সুতরাং আল্লাহর নবি কুরআনের বিরোধিতা করতে পারেন না। কুরআনের বিরোধিতাকারী নবি হতে পারে না। উপরে তারা যে কথা বলেছে, সেটা কুরআনের সুস্পষ্ট বিরোধী। কারণ, কুরআন বলছে, ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ অর্থ : 'ব্যভিচারী পুরুষ এবং ব্যভিচারিণী নারী।' [নুর : ২] তাদের ব্যাপারে এটা বলেনি যে, তারা মুমিন নয়। কুরআন আরও বলছে, ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ﴾ অর্থ : 'তোমাদের মধ্য থেকে যে দুইজন এতে লিপ্ত হয়েছে।' [নিসা : ১৬] এখানে مِنكُمْ তথা 'তোমাদের মধ্য থেকে' দ্বারা ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান উদ্দেশ্য নয়, বরং মুসলমানগণ উদ্দেশ্য। সুতরাং কুরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো হাদিস বর্ণনাকারীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা নবিজিকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা নয়, বরং নবিজির নামে যে মিথ্যা বলে, তাকে প্রতিহত করা। এক্ষেত্রে অপরাধী নবিজি নন, বরং যে নবির নামে মিথ্যা বলে, সে অপরাধী। নবিজি (ﷺ) যা বলেছেন, সেটা আমরা শুনে থাকি আর না শুনে থাকি, সবকিছু আমাদের শিরোধার্য। তাতে আমরা ঈমান রাখি। সত্য বলে স্বীকৃতি দিই।"[৪৪৪]

'গুনাহ কুফর' খারেজি-মুতাযিলাদের খণ্ডনে ইমাম কুরআনে বর্ণিত নবিদের ঘটনাবলি দিয়েও দলিল দিয়েছেন। তিনি বলেন, **"যেমন আল্লাহ তায়ালা ইউনুস আ. সম্পর্কে বলেছেন,** ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ **অর্থ : 'আর স্মরণ করুন মৎসওয়ালার কথা। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন আর মনে করেছিলেন যে,**

---

৪৪৪. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৯)।

আমি তাঁকে ধরতে পারব না। পরে তিনি অন্ধকারের মধ্যে ডাকলেন, 'আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; আপনি পবিত্র, আমি জালেম।' [আম্বিয়া : ৮৭] এখানে ইউনুস আ.-কে জালেম মুমিন বলা হয়েছে; কাফের বা মুনাফিক বলা হয়নি। একইভাবে ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা যখন তাদের পিতা ইয়াকুবের কাছে আল্লাহর সমীপে ইস্তিগফার করতে বললেন, ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ অর্থ : 'তারা বলল, হে পিতা, আমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। নিঃসন্দেহে আমরা অপরাধী ছিলাম।' [ইউসুফ : ৯৭] উক্ত আয়াত দিয়েও বোঝা যায়, তারা গুনাহগার ছিলেন; কাফের নয়। একইভাবে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়ে বলেন, ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ অর্থ : 'যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন আর আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন এবং আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।' [ফাতাহ : ২] এখানেও আল্লাহ ত্রুটির কথা বলেছেন, কুফরের কথা নয়। একইভাবে মুসা আ. যখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন, এর মাধ্যমে তিনি গুনাহগার হয়েছিলেন, কাফের নন।"[৪৪৫]

আল-ফিকহুল আবসাতে ইমাম রহ. বলেন, "আমাদের আকিদা হচ্ছে, গুনাহের কারণে কোনো আহলে কিবলাকে আমরা কাফের বলব না। গুনাহের ফলে কারও ঈমানকে আমরা নাকচ করব না। আমরা সৎকাজের আদেশ দেবো, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করব।"[৪৪৬] ইমাম আরও বলেন, "অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, চুরি করা, ডাকাতি করা, অন্যায়-অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া, ব্যভিচার করা, মদ্যপান করা কুফর নয়; ফিসক (পাপাচার)। সুতরাং কোনো মুমিন ব্যক্তি এসবে জড়িয়ে পড়লে সে পাপী ও অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে, কাফের নয়। আল্লাহ চাইলে তাকে এ পাপের জন্য জাহান্নামের শাস্তি দিতে পারেন। পরে ঈমানের কারণে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন।"[৪৪৭]

ইমাম আরও বলেন, "যে ব্যক্তি শ্রেফ ঈমান আনে, কিন্তু নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, ইসলামের অন্য কোনো আমল করে না, সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে

---

৪৪৫. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৫-৫৬)। এটা ইলযামী (খণ্ডনমূলক বক্তব্য)। নতুবা নবিগণ সকল গুনাহ থেকে পবিত্র। নবিগণের 'ইসমত' সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৪৪৬. আল-ফিকহুল আবসাত (৪০)।

৪৪৭. প্রাগুক্ত (৪৭)।

থাকবে—চাইলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন, চাইলে অনুগ্রহ করবেন। কারণ, যতক্ষণ না কেউ আল্লাহর কিতাবের কোনোকিছু অস্বীকার করে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন গণ্য হবে।"[৪৪৮]

কবিরা গুনাহের ব্যাপারে ইমাম আজম রহ. ও সালাফের এই মানহাজ নিজেদের মনগড়া নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. থেকে গৃহীত। কুরআনের কিছু আয়াত পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার এ ব্যাপারে আমরা কিছু হাদিস এবং সাহাবাদের বক্তব্য উল্লেখ করব যেগুলো ইমাম আজম রহ. নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো :

ওয়াসেল ইবনে হিব্বান থেকে আবু যর রাযি. সূত্রে তিনি বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' আবু যর বলেন, আমি বললাম চুরি-ব্যভিচার ইত্যাদি করা সত্ত্বেও? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'**

তিনি জাবের রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, জাবের রাযি. রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললেন, **হে আল্লাহর রাসুল, এমন কি কোনো গুনাহ আছে যা কুফরের পর্যায়ে? রাসুল বললেন, 'না। তবে শিরক।'**[৪৪৯]

তিনি (হারেস ইবনে আবদুর রহমান আবু মুসলিম খাওলানি সূত্রে) মুআজ বিন জাবাল রাযি.-এর বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, **'মুআজ রাযি. যখন (শামের) হিমস শহরে আসেন, তখন কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে, জনৈক ব্যক্তি নামায পড়ে, রোযা রাখে, বাইতুল্লাহর হজ করে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, গোলাম আযাদ করে, যাকাত প্রদান করে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ব্যাপারে সন্দেহ রাখে, তার বিধান কী? তিনি বললেন, তার স্থান জাহান্নাম। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আর যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, হজ করে না, যাকাত আদায় করে না, কিন্তু সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান রাখে, তার বিধান কী? তিনি বললেন, আমি তার ব্যাপারে আশা করি, আবার ভয়ও করি।'**[৪৫০]

---

৪৪৮. প্রাগুক্ত (৪৭)।

৪৪৯. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৪৩)।

৪৫০. আল-ফিকহুল আবসাত (৪৭)।

ইমাম রহ. মুআয রাযি. থেকে আরও বর্ণনা করেন, **'যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহ করবে, তার সকল আমল বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কেউ ঈমান আনে কিন্তু অন্যায় করে, তবে তার জন্য আল্লাহর ক্ষমার আশা করা হবে এবং শাস্তির ভয় করা হবে।'**[৪৫১]

উসমান বাত্তির কাছে লেখা চিঠিতে ইমাম বলেন, **'মোটকথা, সত্যায়ন (ঈমান) ও আমলের স্বরূপ ভিন্ন। কেউ আমল নষ্ট করলে তার ঈমানও নষ্ট হয়ে যাবে এমন নয়। ...আমরা বলি জালেম মুমিন, পাপী মুমিন, বিচ্যুত মুমিন, অবাধ্য মুমিন, অসৎ মুমিন ইত্যাদি।'** কবিরা গুনাহকারী গুনাহের পরেও মুমিন থাকে এটা প্রমাণ করতে ইমাম যুক্তি দেখান : **'খুলাফায়ে রাশেদিন, যেমন উমর ও আলি, আমিরুল মুমিনিন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সকল মুমিনই কি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইবাদতের উপর ছিল? একইভাবে আলি রাযি. যখন শামের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, তাদের মুমিন হিসেবে সম্বোধন করেছেন। তারা যদি পূর্ণাঙ্গ (আমলসহ) মুমিনই হতো, তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন? একইভাবে রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সাহাবাগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে বিগ্রহে জড়িয়ে পড়েছেন। পৃথিবীতে হত্যা ও হানাহানির চেয়ে মারাত্মক কোনো অপরাধ আছে? তাদের উভয় দলই কি সঠিক ছিল? ছিল না। তবুও তাদের উভয় দলই মুমিন ছিল। ...সুতরাং আমার বক্তব্য হলো, আহলে কিবলার সকলে মুমিন। ফরয ইবাদতের ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতির কারণে আমি কাউকে ঈমান থেকে বের করে দিই না। যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে সকল ফরয বিধান মেনে চলবে, সে আমাদের কাছে 'জান্নাতের অধিকারী' বিবেচিত হবে। যে ব্যক্তি ঈমান ও আমল দুটোই ছেড়ে দেবে, সে জাহান্নামের অধিবাসী কাফের বিবেচিত হবে। আর যে ঈমানকে ঠিক রেখে ফরযের ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি করবে, সে আমাদের কাছে গুনাহগার মুমিন গণ্য হবে। পরকালে সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থাকবে—চাইলে তিনি শাস্তি দেবেন, চাইলে বিনা শাস্তিতে ক্ষমা করে দেবেন।'**[৪৫২] এভাবে ইমাম আজম ইতিহাস ও যুক্তির মাধ্যমেও খারেজিদের ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডন করেন।

ইমাম আজম রহ.-এর পৌত্র উমর ইবনে হাম্মাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদিনাতে মালেক ইবনে আনাস রহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কিছুদিন তাঁর

---

৪৫১. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৬)।

৪৫২. রিসালাতু আবি হানিফা ইলা উসমান আল-বাত্তি (৩৭-৩৮)।

সঙ্গে অবস্থান করি, তাঁর সান্নিধ্যে থাকি, তাঁর নৈকট্য অর্জন করি। বিদায় নেওয়ার সময় তাঁকে আমি বলি, আমার আশঙ্কা হিংসুক ও বিদ্বেষভরা লোকজন আবু হানিফার ব্যাপারে আপনাকে এমনকিছু বলে থাকবে যেমন তিনি ছিলেন না। এ কারণে আমি নিজে তাঁর কিছু বক্তব্য আপনাকে শোনাতে চাই। যদি আপনি সেগুলো সঠিক মনে করেন, তবে আমি সে মোতাবেক আমল করব। আর যদি আপনার কাছে সেগুলোর চেয়ে উত্তম কিছু থাকে, তবে সেগুলো গ্রহণ করব। মালেক বললেন, বলো। আমি তাঁকে বললাম, আবু হানিফা বলতেন, 'আমি গুনাহের কারণে কোনো আহলে কিবলাকে কাফের বলি না।' মালেক বললেন, তিনি ঠিক বলেছেন। আমি বললাম তিনি আরও বলতেন, 'যদি কেউ কবিরা গুনাহ করে, তবুও আমি তাকে কাফের বলি না।' মালেক বললেন, ঠিক বলেছেন। আমি বললাম, তিনি আরও বলতেন, 'যদি কেউ ইচ্ছাকৃত ও অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, তবুও আমি তাকে কাফের বলি না।' মালেক বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন। আমি বললাম, এটাই তাঁর বক্তব্য। সুতরাং কেউ যদি এর বিপরীত কিছু আপনাকে বলে, তবে আপনি সেটা সত্যায়ন করবেন না।[৪৫৩] সুতরাং প্রমাণিত হলো, এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা, মালেকসহ আহলে সুন্নাতের সকল আলেমের আকিদা এক ও অভিন্ন।

ইমাম আজমের অনুসরণে ইমাম তহাবি রহ. বলেন, 'মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মতের মাঝে কবিরা গুনাহকারীরা তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু তাওহিদের উপর মৃত্যু হওয়ায় জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না, বরং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা অবস্থায় মৃত্যুর ফলে তারা আল্লাহর এখতিয়ারাধীন থাকবে—চাইলে তিনি তাদের নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেবেন যেমনটা তিনি বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা তাঁর সঙ্গে কৃত শিরককে ক্ষমা করবেন না, শিরক ছাড়া বাকি সবকিছু ক্ষমা করে দেবেন।' চাইলে তিনি ইনসাফপূর্বক তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এর পর নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর বাধ্য বান্দাদের সুপারিশে সেখান থেকে বের করে জান্নাতে পাঠাবেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর মারিফাতপ্রাপ্ত বান্দাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে তারা তাদের মতো হতে পারে না যারা তাকে চেনে না, তার হেদায়াত থেকে বিমুখ হয়েছে এবং তাঁর বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত থেকেছে।"[৪৫৪]

---

৪৫৩. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১১৩-১১৪)।
৪৫৪. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২২-২৩)।

মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখি বলেন, 'কবিরা গুনাহকারী ফিসক তথা পাপাচারিতা সত্ত্বেও মুমিন গণ্য হবে। তাকে ঈমান থেকে বের করে দেয়া যাবে না (এটা খারেজিরা দেয়)। আবার ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি রাখা যাবে না, যেমনটা মুতাযিলাদের বক্তব্য।'[৪৫৫]

'পাপ' সম্পর্কে ইমাম আজমের দুটো বিস্ময়কর দিক-নির্দেশনা

পাপীকে অভিশাপ না দেওয়া

ইমামকে প্রশ্ন করা হলো, 'কবিরা গুনাহকারীর জন্য ইস্তিগফার করা উত্তম, নাকি তার উপর লানত করা উত্তম? নাকি দুটোর ভিতরে যেটা খুশি করা যাবে?' ইমাম বলেন, **"শিরক ছাড়া গুনাহ দুই প্রকার। একটা হলো আল্লাহ-সম্পর্কিত গুনাহ (আল্লাহর হক), আরেকটা হলো বান্দা-সম্পর্কিত গুনাহ (বান্দার হক)। উভয় ক্ষেত্রেই লানতের চেয়ে ইস্তিগফারের দোয়া করা উত্তম। তবে লানত করলেও গুনাহ হবে না। সুতরাং যদি কেউ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো গুনাহ করে (উদাহরণস্বরূপ : হক নষ্ট করা), কিন্তু সে ওটা ক্ষমা করে দেয়, লানত না করে, তবে সেটা তো উত্তম। যদি আল্লাহ-সম্পর্কিত কোনো গুনাহ করে এবং সেটা শিরক না হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও কালিমার সম্মানের দিকে তাকিয়ে তার জন্য ইস্তিগফারের দোয়া করা উত্তম। তবে যদি ধ্বংসের দোয়া করা করা হয়, যেমন—'হে আল্লাহ, তাকে তার গুনাহের কারণে ধ্বংস করে দিন', তাতে পাপ হবে না। তবে গুনাহ ছাড়া এভাবে ধ্বংসের দোয়া করলে উলটো বদদোয়াকারীর পাপ হবে। সারকথা হচ্ছে, উভয়ক্ষেত্রেই বদদোয়া না দিয়ে ইস্তিগফার ও দোয়া উত্তম। কারণ, একদিকে সে মুমিন, অপরদিকে কারও জানা নেই যে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন কি না। কারণ, সেটা যদি জানাই থাকত (যেমন কাফেরকে আল্লাহ শাস্তি দেবেন), সে ক্ষেত্রে দোয়া করা তো নিষিদ্ধ। কারণ, কাফিরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অর্থ হলো আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা। একইভাবে মুমিনের জন্য শাস্তির দোয়া করাও আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা। কারণ, আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন কি না সেটা সুস্পষ্ট জানা নেই। হতে পারে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার ফয়সালা করেছেন, অথচ মানুষ তাকে শাস্তি দেওয়ার দোয়া করছে! কারণ, কালিমার চেয়ে বড় পুণ্যের কাজ আর কিছু হতে পারে না। সাত আকাশ, সাত জমিন এবং এগুলোর মাঝের জায়গার তুলনায় একটা ডিমের পরিমাণ যেমন, কালিমার তুলনায় সকল**

৪৫৫. আল-ইতিকাদ, বলখি (১০৫)।

ফরয ইবাদতের পরিমাণ তারচেয়েও নগণ্য। বিপরীতে সকল গুনাহের মাঝে শিরক সবচেয়ে জঘন্য। আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিলেও শিরক ক্ষমা করবেন না। তিনি কুরআনে এটাকে সবচেয়ে বড় জুলুম আখ্যা দিয়েছেন : ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [লুকমান : ১৩]। সুতরাং কোনো ব্যক্তি কালিমা পড়ার পরে গুনাহ করে ফেললেও শিরক থেকে বেঁচে থাকার কারণে এবং কালিমার মর্যাদার দিকে তাকিয়ে তার জন্য অভিশাপের পরিবর্তে দোয়া করা উচিত।"[৪৫৬]

পাপীমাত্রই আল্লাহর দুশমন নয়

ইমাম আজম রহ.-কে প্রশ্ন করা হলো, কবিরা গুনাহকারী কি আল্লাহর দুশমন বলে বিবেচিত হবে? ইমাম বললেন, **"যদি তাওহিদ পরিত্যাগ না করে, তবে সব ধরনের কবিরা গুনাহ করার পরেও মানুষ আল্লাহর দুশমন হিসেবে বিবেচিত হবে না। কেননা, দুশমন দুশমনের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, ক্ষতি করার চেষ্টা করে। অথচ মুমিন ব্যক্তি বড় কোনো গুনাহ করে ফেললেও আল্লাহ তায়ালাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। এর প্রমাণ হলো, যদি তাকে বলা হয় যে, হয়তো সে আল্লাহর উপর অন্তর থেকে মিথ্যা অপবাদ দেবে, নতুবা তাকে আগুনে ফেলা হবে। সে আগুনে ঝাঁপ দিতেই রাজি হবে।"**[৪৫৭]

ইমামের এই বক্তব্য মানুষের প্রকৃতি পাঠের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি দানের প্রমাণ। সাধারণ মানুষ আল্লাহ ও বিশ্বাসী মানুষের মাঝে সম্পর্কের এ বিরল ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধন আবিষ্কার করতে পারে না। কারণ, খোলা চোখে এ বন্ধন দেখা যায় না। মানবজীবনের গভীরে গেলে চোখে পড়ে। সহজে বললে এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এমন : মানুষ প্রত্যেক গুনাহের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে বিরোধিতার ইচ্ছা করে না। বরং অনেক সময় শাহওয়াত তথা প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করার জন্য মানুষ গুনাহ করে ফেলে। ফলে সে আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধিতার উদ্দেশ্যে গুনাহ করে না, নফসের খাহিশাত মেটাতে গুনাহ করে। অন্যকথায়, তার গুনাহটা কর্মের, বিশ্বাসের নয়। সে আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করে, তাকে মেনে চলে, কিন্তু প্রবৃত্তির প্রতারণার ফলে প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দেয় এবং গুনাহ করে ফেলে। এ কারণে আহলে সুন্নাতের মতে, কোনো মুমিনকে আল্লাহর দুশমন বলা উচিত নয়। বরং গুনাহ সত্ত্বেও সে আল্লাহকে ভালোবাসে,

---

৪৫৬. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৭-১৮)।
৪৫৭. প্রাগুক্ত (১৮)।

আল্লাহর দ্বীনের জন্য তার প্রাণ কাঁদে, সে নিজের জানের বিনিময়ে আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা করতে প্রস্তুত থাকে। কুরআনে আমরা দেখি, গুনাহ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ মহব্বতকে গ্রহণ করছেন এবং গুনাহ ক্ষমার ঘোষণা করছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ অর্থ : '(হে রাসুল!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন; তোমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, দয়াময়।' [আলে ইমরান : ৩১] এ আয়াতে গুনাহ সত্ত্বেও আল্লাহকে ভালোবাসা এবং তাঁর ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব বলা হয়েছে। খোদ রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন ও কর্ম দ্বারাও এর প্রমাণ মেলে। একজন সাহাবিকে মদ্যপান করার দরুন কয়েকবার শাস্তি দেওয়া হয়। একবার শাস্তির জন্য তাকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে নিয়ে আসা হলে কোনো কোনো সাহাবি তাকে ভর্ৎসনা করেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) শুনে বলেন, 'তোমরা তাকে অভিশাপ দিয়ো না। সে আল্লাহ ও রাসুলকে ভালোবাসে।'[৪৫৮] অর্থাৎ, মদ্যপান তার রোগ। কিন্তু অন্তরে সে আল্লাহ ও রাসুলকে ভালোবাসে! বোঝা গেল, গুনাহ ও আল্লাহর ভালোবাসা একসঙ্গে বিদ্যমান থাকা উত্তম না হলেও অসম্ভব নয়। এটা আমাদের বাস্তব জীবনেও অনুভব করব। অনেক মানুষকে দেখব, যারা শয়তান ও প্রবৃত্তির প্ররোচনায় নানান গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। তথাপি আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল এবং ইসলামকে তারা হৃদয় থেকে ভালোবাসে।

প্রশ্ন হতে পারে, যদি আল্লাহকে ভালোই বাসে, তবে তাঁর অবাধ্য হয় কী করে? ইমাম বললেন, **'হ্যাঁ, ভালোবাসার পরেও কারও অবাধ্য হওয়া সম্ভব। সন্তান পিতাকে ভালোবাসে। কিন্তু মাঝে মাঝে পিতার অবাধ্য হয়। তেমনই মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হলেও আল্লাহই তার কাছের সবার চেয়ে প্রিয় থাকেন। অবাধ্যতা সংঘটিত হয় প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে।'**[৪৫৯]

---

৪৫৮. মুসনাদে বাযযার (মুসনাদু উমর ইবনুল খাত্তাব : ২৬৯)। মুসান্নাফে আবদির রাযযাক (কিতাবুত তালাক : ১৩৫৫২)।

৪৫৯. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২৪-২৫)।

প্রশ্ন হয়, শাস্তি হবে জেনেও মানুষ অপরাধ করে কীভাবে? ইমাম বললেন, **'শাস্তি হবে জেনেও দুটি কারণে মানুষ অপরাধ করে—হয়তো আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশা করে, নতুবা মৃত্যুর আগে তাওবা করবে এমন চিন্তা করে।'**[৪৬০]

মদ্যপানকারীর চল্লিশ দিনের নামায কবুল না হওয়ার রহস্য

একটি হাদিসে এসেছে—মদ্যপানকারীর চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না। হাদিসটি একাধিক সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে।[৪৬১] আবু মুকাতিল সমরকন্দি ইমামকে প্রশ্ন করেন, বলা হয়ে থাকে—যে ব্যক্তি মদ পান করবে, তার চল্লিশ দিনের আমল কবুল করা হবে না। এর কারণ কী? গুনাহ কীভাবে আমলকে এভাবে ধ্বংস করে দেয়? ইমাম প্রথমে বলেন, **'এটার কোনো ব্যাখ্যা আমার জানা নেই।'** ইমামের বিনয় ও স্পষ্টভাষিতা দেখুন! হতে পারে হাদিসটি ইমাম আজম রহ.-এর কাছে না পৌঁছে থাকবে। এটা মোটেই অসম্ভব নয়। কোনো মুহাদ্দিস বা ফকিহের রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সকল হাদিস জানা থাকবে এটা জরুরি নয়। এটা তাদের শানের জন্য মানহানিকর এমনও নয়। খোদ সাহাবাদেরও অনেক হাদিস জানা ছিল না। এটা নিতান্তই স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু অকপটে সেটা স্বীকার করতে পারা সচরাচর ঘটনা ও স্বাভাবিক নয়। এর জন্য নিষ্ঠা, বিনয় ও অন্তরের স্বচ্ছতা জরুরি।

কিন্তু এখানে যে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ এবং ইমাম আজম রহ.-এর দূরদর্শিতা ও বিস্ময়কর জ্ঞানগত গভীরতার প্রমাণ সেটা হলো, তিনি এটাকে আপাতদৃষ্টিতে ইনসাফবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করেননি। তিনি বলেননি, 'এটা বিশুদ্ধ কথা নয়। কারণ, একবার মদ্যপান করা হয়ে গেলে সেজন্য চল্লিশ দিন তার নামায কবুল করা হবে না—এটা সঠিক নয়। বরং মদ্যপান মদ্যপানের জায়গাতে, নামায নামাযের জায়গাতে।' বরং তিনি উক্ত বক্তব্যকে অশুদ্ধ না বলে গুনাহের শাস্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার ইনসাফপূর্ণ শাশ্বত নীতি ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম বলেন, **'এটার কোনো ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। কিন্তু এ কথাকে আমি নাকচও করছি না। যতক্ষণ এটার আল্লাহর ইনসাফবিরোধী কোনো ব্যাখ্যা না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটাকে মিথ্যাপ্রতিপন্নও করব না। কারণ, আল্লাহর ইনসাফ হলো বান্দাকে তার গুনাহের কারণে হয়তো শাস্তি দেবেন অথবা ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু যে গুনাহ**

---

৪৬০. প্রাগুক্ত (১৯)।

৪৬১. তিরমিযি (আবওয়াবুল আশরিবাহ : ১৮৬২)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুল আশরিবাহ : ৩৩৭৭)। সুনানে নাসায়ি (কিতাবুল আশরিবাহ : ৫৬৮০)। মুসতাদরাকে হাকেম (কিতাবুল ইমামাহ : ৯৫১)।

সে করেইনি সেটার কারণে তাকে শাস্তি দেবেন না। আর নেক আমল ও বদ আমলের আলাদা আলাদা হিসাব রয়েছে। অর্থাৎ, বান্দা যতটুকু নেক আমল করবে আল্লাহ সেটার হিসাব রাখবেন। যতটুকু মন্দ আমল করে সেটাও লিখে রাখবেন। যেমন—এক ব্যক্তি যাকাতবাবদ পঞ্চাশ দিরহাম আদায় করল, অথচ তার যাকাত ছিল আরও বেশি। তখন আল্লাহ সেই পঞ্চাশ দিরহাম হিসাব করে রাখবেন। বাকি সম্পত্তির জন্য তাকে জবাবদিহির মুখোমুখি করবেন। একই কথা নামায, রোযা, হজ সবকিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এগুলোর সওয়াব আল্লাহ লিখে রাখবেন। গুনাহের জায়গায় গুনাহও লিখবেন। এ কারণে আল্লাহ ইরশাদ করেন : ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত চাপিয়ে দেন না। প্রত্যেকে যা (ভালো) করবে তার প্রতিদান পাবে। আর যা (মন্দ) করবে সেটা তার উপর বর্তাবে।' [বাকারা : ২৮৬]

'আল্লাহ আরও বলেন, ﴿أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ﴾ অর্থ : 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নারী-পুরুষ কারও আমলকে নষ্ট করব না।' [আলে ইমরান : ১৯৫] অন্য এক আয়াতে বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ অর্থ : 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আমি কোনো পুণ্যবানের প্রতিদানকে নষ্ট করব না।' [কাহফ : ৩০] মানুষের প্রতিদান হবে আমলের ভিত্তিতে সে মর্মে আল্লাহ বলেন, ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ অর্থ : 'আজ তোমাদের কর্মের বিনিময় দেওয়া হবে তোমাদের।' [জাসিয়া : ২৮] অন্যত্র বলেন, ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ অর্থ : 'আজ কাউকে বিন্দু পরিমাণ জুলুম করা হবে না। তোমাদের তো স্রেফ তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।' [ইয়াসিন : ৫৪] কিয়ামতের দিন আল্লাহ সকলের প্রতি পূর্ণ ইনসাফ করবেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ অর্থ : 'আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের তুলাদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।' [আম্বিয়া : ৪৭] আল্লাহ বান্দার প্রত্যেক কাজের বিনিময় দেবেন। ভালোমন্দ, ছোট-বড় কোনোকিছুই বাদ দেবেন না। তিনি বলেন, ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝﴾ অর্থ : 'যে ব্যক্তি এককণা পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে এককণা পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে।' [যালযালাহ : ৭-৮]

উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা গুনাহের শাস্তির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। বান্দার গুনাহের চেয়ে অধিক শস্তি প্রদান করেন না। ফলে কেউ যদি মদ্যপান করে, চল্লিশ দিন তার নামায কবুল না হওয়া জুলুম নয়, বরং এটাই ইনসাফ। কারণ, শাস্তির পরিমাণ তিনি আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। এর পর যদি কেউ সে পাপে লিপ্ত হয়, দায়ভারও তার বহন করতে হবে। যেমন— বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি হলো 'রজম' তথা প্রস্তর মেরে হত্যা। কতটুকু সময় সে হারাম উপভোগে মত্ত ছিল সেটা দেখার বিষয় নয়, বরং এ ধরনের জঘন্য অন্যায়ের শাস্তি হলো প্রাণবধ। সুতরাং এটা জেনেও যে এ ধরনের পাপে নিমজ্জিত হবে, তার এ শাস্তি গ্রহণ করতে হবে এবং মোটেই জুলুম হবে না। একই কথা মদ্যপানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে, চল্লিশ দিন তার নামায পড়ার প্রয়োজন নেই কিংবা নামায পড়তে পারবে না, বরং সেটা আরও জঘন্য গুনাহ হবে। বরং নামায পড়তে হবে। শাস্তির কারণে সে নামাযের পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। এটা হচ্ছে তাওবা না করা অবস্থায়। কিন্তু যদি কেউ মদ্যপান করার পরে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে তাওবা ও ইস্তিগফার করে, তবে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। চাইলে তিনি তার নামাযগুলোও কবুল করবেন।

ঈমান ও আকল

ঈমান ও আকলের সম্পর্ক

ঈমান ও আকলের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একাধিক সম্প্রদায় বিচ্যুতির শিকার হয়েছে, অনেকে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির শিকার হয়েছে। বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে মুতাযিলা সম্প্রদায়। আকলকে উপরে তুলতে তুলতে তারা এর পূজা করা শুরু করেছে। কুরআন-সুন্নাহ ও শরিয়াহর বিকল্প মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে আকলের ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য হলো, আকল যেটা ভালো বলবে সেটাই চূড়ান্ত ভালো ও ওয়াজিব; আকল যেটাকে মন্দ বলবে সেটা নিশ্চিত মন্দ ও হারাম। অর্থাৎ, শরিয়ত যদি না থাকত, তবুও আকলের ভিত্তিতে হালাল-হারাম বোঝা যেত, মানা আবশ্যক হতো। অথচ এটা কিছু ক্ষেত্রে বাস্তব হলেও সর্বক্ষেত্রে নয়। আকল সর্বত্র হালাল-হারাম ও ভালোমন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম নয়। কিন্তু তারা আকলের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে সেটাকেই মুখ্য আর শরিয়তকে গৌণ বানিয়ে দিয়েছে। বরং শরিয়তকেও আকলের মানদণ্ডে গ্রহণ করেছে। যা আকলসিদ্ধ মনে করেছে সেটাকে গ্রহণ করেছে, যা আকলবিরোধী মনে হয়েছে সেটার প্রতি বিশ্বাস বর্জন করেছে! এটাই ছিল তাদের বিভ্রান্তির মূল কারণ।

একই কারণে তারা ঈমানের ভিত্তি বানিয়েছে আকলকে। তাদের মতে, যার আকল রয়েছে, চাই ছোট হোক বড় হোক, তার ঈমান আনতে হবে। ফলে ছোট বাচ্চারও যদি আকল থাকে, মুতাযিলাদের মতে, তার উপর ঈমান আনা আবশ্যক। বরং তাদের মতে, যদি কারও কাছে নবিদের দাওয়াত না পৌঁছয় এবং সে ঈমান ও কুফর একটাও গ্রহণ না করে মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে, তবুও সে জাহান্নামি! কারণ, আকল থাকার কারণে আল্লাহ ও নবি-রাসুলের উপর ঈমান আনা আবশ্যক ছিল! অথচ এটা গলত কথা। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন, ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ অর্থ : 'আমি রাসুল পাঠানোর আগ পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না।' [ইসরা : ১৫]

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বিপরীত প্রান্তে অবস্থান করছেন আশআরি আলেমগণ। তাদের মতের সারকথা হলো, আকলের কোনো মূল্য নেই, সবকিছুই শরিয়াহর

ভিত্তিতে হবে। অর্থাৎ, হালাল-হারাম নির্ধারণে আকলের কোনো ভূমিকা নেই। একটা পর্যায় পর্যন্ত এটা বাস্তবসম্মত ও সঠিক কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের কেউ কেউ এতটাই বাড়াবাড়ি করেছেন যে, তাদের মতে কোনো বাচ্চা ঈমান আনলে তার ঈমানই শুদ্ধ হবে না। কারণ, বাচ্চা আকলের মাধ্যমে ঈমান এনেছে, শরিয়ত তাকে ঈমানের নির্দেশ দেয়নি (বালেগ হওয়ার পূর্বে মুকাল্লাফ নয় এই মূলনীতি অনুসারে)! আর যে ব্যক্তির কাছে দাওয়াত পৌঁছয়নি, তার ব্যাপারে আশআরি আলেমদের বক্তব্য হলো, যদি সে ঈমান ও কুফর দুটোর একটাও গ্রহণ না করে (গাফেল) থাকে, তবে সে মাযুর গণ্য হবে। তাদের কারও মতে, যদি দাওয়াত না পৌঁছয়, সে অবস্থায় শিরক করলেও মাযুর হবে।[৪৬২]

এক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো, আকল আল্লাহ তায়ালার বড় একটি নেয়ামত। কিন্তু এটা শরিয়ত ছাড়াই হালাল-হারাম সাব্যস্ত করতে পারে না, যেমনটা প্রথম দল মনে করে। আবার এটা অর্থহীনও নয়, যেমনটা দ্বিতীয় দল মনে করে। ফলে শিশুর উপর ঈমান ওয়াজিব না হলেও সে যদি ঈমান আনে, তবে সেটা বিশুদ্ধ। একইভাবে বড় ব্যক্তির কাছে যদি দাওয়াত না পৌঁছয়, তবে কেবল আকলের কারণে তার উপর ঈমান ওয়াজিব হবে না, যেমনটা মুতাযিলারা মনে করে। ফলে যদি সে ঈমান ও কুফর দুটো থেকেই গাফেল থাকে, তবে মাযুর গণ্য হবে (আহলে ফাতরাহ হিসেবে)। কিন্তু যদি শিরকে জড়িয়ে পড়ে, তবে মাযুর গণ্য হবে না, যেমনটা একদল আশআরি মনে করে; বরং শিরক ও কুফরের কারণে জাহান্নামে যাবে। কারণ, আকলকে যদি তাওহিদের প্রণোদক না মানা হয়, এটা নিদেনপক্ষে শিরকের প্রতিবন্ধক। ফলে তাওহিদ গ্রহণ না করলেও মাযুর গণ্য হবে। কিন্তু শিরকে জড়ালে মাযুর গণ্য হবে না।[৪৬৩]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ﴾ অর্থ : 'যদি আমি এদের ইতঃপূর্বে কোনো শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে এরা বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে একজন রাসুল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে তো আমরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার পূর্বেই আপনার আয়াতসমূহ মেনে চলতাম।' [তহা : ১৩৪] অন্য আয়াতে বলেন, ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ অর্থ : 'আমি রাসুল

---

৪৬২. দেখুন : কাশফুল আসরার (৪/৩২৪-৩৩০)। দেখুন : আল-কিফায়াহ, সাবুনি (৩৪৬-৩৪৭)। আর রাওযাতুল বাহিয়্যাহ (৩৪-৩৫)।

৪৬৩. দেখুন : কাশফুল আসরার (৪/৩৩০)।

পাঠানোর আগ পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না।' [ইসরা : ১৫] এখানে আল্লাহ তায়ালার বক্তব্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। ভিন্নভাবে এটা ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। যেহেতু আল্লাহ নিজেই বলছেন রাসুল পাঠানো ছাড়া তিনি শাস্তি দেন না, তাহলে স্রেফ আকলকে ভিত্তি বানিয়ে রাসুল পাঠানো ছাড়াও শাস্তিযোগ্য বলা সঠিক নয়; বরং কুরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বক্তব্য। আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন, ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝٨ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝٩﴾ অর্থ: 'ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোনো সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তাদের তার প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করবে : তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আগমন করেনি? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল। কিন্তু আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম : আল্লাহ তায়ালা কোনোকিছু নাযিল করেননি। তোমরা মহা বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ।' [মুলক : ৮-৯] এখানেও স্পষ্ট যে, জাহান্নামের ফেরেশতারাও জানেন, নবি-রাসুল পাঠানো ছাড়া কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না।

নবি-রাসুল না এলেও কি ঈমান আনা আবশ্যক হতো?

লক্ষণীয় হলো, এক্ষেত্রে খোদ ইমাম আজমের এমন কিছু বক্তব্য রয়েছে, যা উন্মুক্তভাবে গ্রহণ করা দুরূহ, যা পরবর্তীকালে হানাফি উলামায়ে কেরাম এবং আহলে সুন্নাতের অন্যান্য ধারার মাঝে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি করেছে, বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি করেছে। প্রথমে আমরা ইমাম আজমের বক্তব্য দেখে সেগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জটিলতা নিরসনের চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আজম রহ. মনে করতেন, **"আল্লাহর উপর ঈমান আনার জন্য নবি-রাসুল পাঠানো জরুরি নয়, বরং মানুষের বিবেক দ্বারাই সেটা সম্ভব। ফলে আল্লাহ যদি কোনো নবি-রাসুল না পাঠাতেন, তবুও বিবেকের কারণে মানুষের উপর তাঁর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব হতো। হ্যাঁ, শরিয়তের বিধিবিধান জানা অপরিহার্য হতো না। কিন্তু আকাশ ও যমিনে বিদ্যমান এত এত নিদর্শন থাকার পরও কেউ যদি এগুলোর সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকৃতি না দেয়, তবে নবি-রাসুল না পাঠানো সত্ত্বেও সে রেহাই পাবে না।"**[৪৬৪]

---

৪৬৪. দেখুন : কারখির 'মুখতাসার'-এর উদ্ধৃতিতে উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২১৪)। আল-উসুলুল মুনিফাহ, বায়াযি (১২)। হাকেম শহিদের আল-মুনতাকার উদ্ধৃতিতে আলি কারি, শরহুল ফিকহিল আকবার (১২৬)।

সাবুনিসহ অন্য হানাফি উলামায়ে কেরাম হাকেম শহিদের 'আল-মুনতাকা'[৪৬৫] গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, আবু হানিফা রহ. বলেছেন, 'অজ্ঞতার কারণে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। কারণ, আকাশ ও যমিনে এবং মানুষের নিজের ও অন্যান্য সৃষ্টির মাঝে সৃষ্টিকর্তার যেসব নিদর্শন রয়েছে ঈমানের জন্য সেগুলোই যথেষ্ট।' আল্লাহ তায়ালার বাণী এর প্রমাণ : ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ অর্থ : 'তাদের রাসুলগণ তাদের বলেছিলেন : আল্লাহ সম্পর্কে কি কোনো সন্দেহ আছে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা? তিনি তোমাদের আহ্বান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করার জন্য এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেওয়ার জন্য। তারা বলল : তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ! তোমরা আমাদের সেসব উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও যেসবের উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব, তোমরা কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করো।' [ইবরাহিম : ১০] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ অর্থ : 'আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! বলুন : আলহামদুলিল্লাহ! তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ লোকই জ্ঞান রাখে না।' [লুকমান : ২৫] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'প্রত্যেক নবজাতক ইসলামের ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, নাসারা ও অগ্নিপূজারী বানায়।' এটাই আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাশায়েখের মত। ইমাম আবু মনসুর আল-মাতুরিদি বিবেকবান ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে বলেছেন, তার উপর আল্লাহকে জানা ওয়াজিব।'[৪৬৬]

নাসাফি লিখেন, 'প্রত্যেক বিবেকবান (আকেল) ব্যক্তির জন্য ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মতো আকল দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ বের করা আবশ্যক। ...সুতরাং যার কাছে ওহি পৌঁছবে না (ঈমান না আনলে), তাকেও

---

৪৬৫. তিনি মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ মারওয়াযি সুলামি। বুখারার কাযি। বিখ্যাত হানাফি ফকিহ ও মুহাদ্দিস ইমাম। ৩৩৪ হিজরিতে শহিদি মৃত্যু বরণ করেন। এজন্য 'হাকেম শহিদ' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলো 'আল-কাফি', 'আল-মুনতাকা' ইত্যাদি, যা হানাফি মাযহাবের মৌলিক গ্রন্থগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

৪৬৬. দেখুন : আল-কিফায়াহ (৩৪৮)। শরহুল ওয়াসিয়্যাহ, বাবিরতি (৫৫)।

মাযুর মনে করা হবে না।'[৪৬৭] রুকনুদ্দিন সমরকন্দিও আবু হানিফার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'আকেল ও বালেগ ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে (ওহি ছাড়াও) অজ্ঞ থাকলে তাকে মাযুর ধরা হবে না।'[৪৬৮]

উপরের বক্তব্যগুলোর অর্থ হলো, প্রত্যেক বিবেকবান মানুষের জন্য ঈমান আনা আবশ্যক, চাই তাঁর কাছে দাওয়াত পৌঁছুক কিংবা না পৌঁছুক! নবি আসুক কিংবা না আসুক! অর্থাৎ, কেউ যদি এমন কোনো ভূখণ্ডে এমন কোনো সময়ে থাকে যার কাছে ইসলামের কোনো দাওয়াত পৌঁছয় না, চাই সেটা আগের যুগে হোক কিংবা বর্তমান যুগে হোক, ইসলাম কিংবা ইসলামের নবি সম্পর্কে জানার জন্য কোনো মাধ্যমই যার কাছে বিদ্যমান না থাকে, কিন্তু সে মানসিকভাবে সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকবান হয়, তবে তার জন্য ঈমান আনা জরুরি, আল্লাহকে বিশ্বাস করা জরুরি। যদি সে ঈমান না আনে, তবে পরকালে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। নবি না আসা কিংবা দাওয়াত না পৌঁছাকে ওজর হিসেবে গ্রহণ করা হবে না! কারণ, আল্লাহ তাকে বিবেক দিয়েছেন। আসমান ও যমিনের সর্বত্র আল্লাহ নিজের অস্তিত্বের অসংখ্য নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। ফলে নবি আসা কিংবা দাওয়াত পৌঁছা শরিয়তের তফসিলি বিধিবিধানের সঙ্গে সম্পৃক্ত, মূল ঈমানের সঙ্গে নয়।

পাঠক, নিশ্চয়ই খেয়াল করবেন, এখানে হানাফি আলেমদের বক্তব্য প্রথম পক্ষ তথা মুতাযিলাদের বক্তব্যের সঙ্গে ব্যাপক সাদৃশ্য রাখে। তারা আকলকে স্বতন্ত্রভাবে ঈমান অপরিহার্যকারী মনে করে। ইমাম আজমের বক্তব্যের ফলাফলও তাই। বরং কাযি সদর বাযদাবি আরও স্পষ্ট করে লিখেন, 'এক্ষেত্রে আবু মনসুর মাতুরিদির বক্তব্য (ইমাম আজমের অনুসরণে) মুতাযিলাদের বক্তব্যের মতো এক ও অভিন্ন। সমরকন্দের অধিকাংশ আলেম এবং ইরাকে আমাদের (হানাফি) একদল আলেমের বক্তব্যও তা-ই।'[৪৬৯]

তাহলে মুতাযিলা আর ইমাম আজম এবং তাঁর অনুসারী হানাফি আলেমদের বক্তব্যের মাঝে ফারাক কী? কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং বিভিন্ন হাদিসে যেখানে 'আহলে ফাতরাহ' (দাওয়াত পৌঁছয়নি) এমন লোকদের শাস্তি না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাখ্যা কী?

৪৬৭. বাহরুল কালাম (৬৫, ৮২)।

৪৬৮. আল-আকিদাহ আর রুকনিয়্যাহ (৪৫)।

৪৬৯. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২১৪)।

প্রথম কথা হলো, এ বিষয়ে মুতাযিলা ও হানাফি আলেমগণ, বিশেষত ইমাম আজম রহ.-এর বক্তব্য সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হলেও এক নয়। বরং দুটোর মাঝে কিছু উসুলি (মৌলিক) পার্থক্য রয়েছে, যে পার্থক্যের কারণে মুতাযিলাদের কথা ভ্রান্ত, কিন্তু ইমাম আজমের কথা সঠিক। নিচে পয়েন্ট আকারে পার্থক্যগুলো স্পষ্ট করা হচ্ছে :

এক. আকলকে জ্ঞানের উপকরণ গণ্য করা। মুতাযিলারা আকলকেই স্বাধীনভাবে ঈমানের আবশ্যক মনে করে। আর ইমাম (আবু হানিফা) বলেন, মূল আবশ্যকতা আল্লাহর পক্ষ থেকে। কিন্তু সেটা জানা যাবে আকলের মাধ্যমে। অর্থাৎ, আকলের মাধ্যমে ঈমান আবশ্যক নয়। মূল আবশ্যককারী (موجب) আল্লাহ তায়ালা (রাসুল পাঠানোর মাধ্যমে)। আকল সেটা উপলব্ধিকারী, শরিয়তের আবশ্যকতা বাস্তবায়নকারী। অন্যকথায়, আকল হলো ভালোমন্দ চেনার একটি উপকরণ। এটা মৌলিকভাবে কোনো জিনিস অপরিহার্য করে না; কিন্তু মাধ্যম হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।[৪৭০]

দুই. নবিদের আগমনের পরে আবশ্যক বলা। অর্থাৎ, আকলের মাধ্যমে ঈমান আনা ওয়াজিব। কিন্তু নবি-রাসুল না এলে সে আকল গাফেল থাকে। দুনিয়ায় নিমজ্জিত এবং আখেরাত থেকে বেঘোর-বেখবর থাকে। নবি-রাসুল এসে যখন তাকে সজাগ করেন, তখন সে আল্লাহ ও আখেরাত নিয়ে ভাবতে থাকে। জগতের পরতে পরতে আল্লাহর নানান নিদর্শন তার বিবেকের চোখে ধরা পড়ে। ফলে 'নবি-রাসুল ছাড়াই আকলের মাধ্যমে ঈমান ওয়াজিব'—এটাও নবি-রাসুল পাঠানোর পরেই; আগে নয়।[৪৭১]

তিন. ঔচিত্য অর্থে গ্রহণ করা। অর্থাৎ, ইমাম রহ.-এর বক্তব্য এখানে বাহ্যিক অর্থের উপর গ্রহণ করা যাবে না, বরং তিনি এটা নাস্তিক্যবাদ এবং আল্লাহতে অবিশ্বাসীদের খণ্ডনে বলেছেন। অর্থাৎ, আমরা যে কেবল কুরআন ও নবির দাওয়াতে বিশ্বাস করে মুমিন হয়েছি এমন নয়, ঈমান অন্ধ বিশ্বাসের ফলাফল নয়। বরং আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে এত পরিমাণ নিদর্শন রেখেছেন, তিনি আমাদের এত গভীর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিবেক দিয়েছেন, যার ফলে কুরআন ও নবি না এলেও আল্লাহতে বিশ্বাস করা কঠিন কিছু নয়। বরং এটুকু ঈমান আনা আবশ্যক হওয়া

---

৪৭০. দেখুন : কাশফুল আসরার (৪/৩৩০)। আল-বিদায়াহ মিনাল কিফায়াহ (১৫০)। শরহুল ওয়াসিয়্যাহ, মুফতি যাদাহ (৭০)। ইশারাতুল মারাম (৭৫)।
৪৭১. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২১৭)।

উচিত। কিন্তু আল্লাহর স্বাভাবিক নীতি ও অনুগ্রহ হলো, তিনি নবি পাঠানো ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেন না। কারণ, এমন হলে মানুষ আল্লাহর বিরুদ্ধে জুলুমের অভিযোগ করবে। অথচ আল্লাহ জুলুম থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাই তিনি নবি-রাসুল পাঠানোর মাধ্যমে মানুষের অজুহাতের পথ বন্ধ করে দেন (অর্থাৎ হুজ্জত কায়েম করেন), অতঃপর যারা অবাধ্য তাদের শাস্তি দেন। এ বক্তব্য আমাদের মনগড়া ব্যাখ্যা নয়। বুখারার অসংখ্য আলেমের বক্তব্য এটা। কামাল ইবনুল হুমাম রহ. ইবনে আইনিদ দাওলার উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন, **'আবশ্যক হওয়া উচিত।'**[৪৭২]

আরেকটু তাফসিল করে এভাবে বলা যায়, আকলের মাধ্যমে ঈমান আনা ওয়াজিব এবং কুফর হারাম—এ কথার অর্থ শরয়ি ওয়াজিব ও হারাম নয়। ফলে এর মাধ্যমে পুরস্কার ও তিরস্কারের উপযুক্ত হবে না কেউ। কেননা, পুরস্কার ও তিরস্কার (সওয়াব ও ইকাব) নির্ধারিত হয় শরিয়তের ভিত্তিতে। আকলের মাধ্যমে সেটা জানা সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে আকলের মাধ্যমে ঈমান ওয়াজিব হওয়ার অর্থ হলো, সুস্থ আকলের মাঝে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর উপর ঈমান আনা, বিশ্বের স্রষ্টার তাওহিদের স্বীকৃতি দেওয়ার একটা সুপ্ত প্রণোদনা থাকে। একইভাবে কুফর হারাম হওয়ার অর্থ হলো, এই মহাবিশ্বের বড় বড় নিদর্শন দেখার পরে আল্লাহকে অস্বীকার করা, এগুলোর স্রষ্টা ও পালনকর্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কিংবা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করার প্রতি সুস্থ মানুষের বিবেকের মাঝে একটা সুপ্ত বিকর্ষণ থাকে। বিবেক নষ্ট না হয়ে থাকলে প্রত্যেকটা সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ এটা অনুভব করার কথা। ফলে শরিয়ত না এলেই যে ঈমান ও কুফর, হালাল ও হারাম সমান—এমন নয়। বরং কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত—একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সেটা বোঝার ক্ষমতা আল্লাহ মানুষের মাঝে প্রাকৃতিকভাবেই দিয়ে রেখেছেন। এটাকে 'ফিতরত' বলা হয়। নবিদের দাওয়াত সেই কাজটাকেই সহজ করে দেয়। বিপরীতে মুতাযিলারা মনে করে, সব ধরনের ভালোমন্দ আকল অনুভব করতে পারে। শরিয়ত নিষ্প্রয়োজন। এখানেই তাদের চিন্তাধারা আর ইমাম আজমের পার্থক্য।

হাফিজুদ্দিন নাসাফি বলেন, 'আমাদের (হানাফিদের) আর মুতাযিলাদের বক্তব্যের মাঝে পার্থক্য হলো, মুতাযিলারা আকলকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ঈমান আবশ্যককারী মনে করে। বিপরীতে আমাদের কাছে, আকল একটি মাধ্যম। মূল

৪৭২. আত-তাহরির ফি উসুলিল ফিকহ (২২৫)।

আবশ্যককারী আল্লাহ তায়ালা। আকল সেটা জানার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যদিও আবু হানিফা বলেছেন, 'আসমান-যমিন ও সৃষ্টির মাঝে এত নিদর্শন বিদ্যমান থাকার কারণে আল্লাহ সম্পর্কে কেউ গাফেল থাকলে মাযুর ধরা হবে না।' তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে, 'যদি আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুল না পাঠাতেন, তবুও আকলের মাধ্যমে সৃষ্টির উপর তাকে জানা আবশ্যক ছিল।' এটা আমাদের অনেক মাশায়েখের বক্তব্য। ...কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, নবি-রাসুল না পাঠানো হলেও স্রেফ আকলের মাধ্যমে ঈমান আনা জরুরি হবে। ঈমান পরিত্যাগ করলে শাস্তির উপুক্ত হবে—আমরা এমন বলি না। বরং আমরা বলি, পুরস্কার ও তিরস্কার শরিয়ত ও নবি-রাসুল পাঠানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু আকল সে কাজটা সহজ করে দেয়, এগিয়ে দেয়। আকলের কাছে ঈমান আনা ও না আনা, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস সমান নয়; বরং বিশ্বাস আকলের কাছে প্রশংসনীয়, অবিশ্বাস নিন্দনীয়। কেবল ঈমান নয়, সত্যের প্রতি অনুরাগ, মিথ্যার প্রতি ঘৃণা ও বিরাগসহ এসব ফিতরতি ব্যাপার মানুষের আকলের গভীরে প্রোথিত। শরিয়ত আসার আগেই মানুষ এগুলো অনুভব করতে পারে।'[৪৭৩]

সুতরাং দেখা গেল, হানাফিদের বক্তব্য আর আহলে সুন্নাতের অন্য আলেমদের বক্তব্যের মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ধারার লোকজন যেটাকে 'ফিতরত' (স্বভাবজাত) দিয়ে ব্যাখ্যা করেন, হানাফি আলেমগণ সেটাকে একরকম 'আকল' (বিবেকবোধ) দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যেকের কথার সারমর্ম হলো, আল্লাহ মানুষের মাঝে এমন প্রকৃতি দিয়ে রেখেছেন, যদি তা বিকৃতির শিকার না হয়, তবে ইসলামের দাওয়াত না পেলেও আল্লাহর দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। একইভাবে আল্লাহ মানুষের মাঝে এমন বিবেক দিয়ে রেখেছেন, যদি সেটা বিকৃতির শিকার না হয়, তবে নবি-রাসুল না এলেও সৃষ্টির নির্দশনাবলি দেখে একজন সৃষ্টিকর্তা ও উপাস্যের উপস্থিতি স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু এগুলো যেহেতু পূর্ণাঙ্গতা দেয় না, ফিতরত কিংবা বিবেকের মাধ্যমে আল্লাহকে সম্যক উপলব্ধি করা যায় না, তাওহিদ ও শিরক, আল্লাহর সকল গুণ ইত্যাদি সম্পর্কে ইয়াকিনি জ্ঞান লাভ হয় না, এ জন্য আল্লাহ এগুলোর ভিত্তিতে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করবেন না। নবি-রাসুল না পাঠিয়ে, দাওয়াত না পৌঁছিয়ে কাউকে শাস্তি দেবেন না। ফলে ফিতরত ও আকলের বিদ্যমানতা সহায়ক হবে, মূল আবশ্যককারী হবে না।

---

৪৭৩. আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (৩৬২-৩৬৭)।

ঈমানের ক্ষেত্রে কি তাকলিদ বৈধ?

উপরের মাসআলাটি আরেকটি মাসআলার দিকে নিয়ে যায়। সেটা হলো, ঈমানের ক্ষেত্রে কি অন্যকে অনুসরণ করা যাবে, নাকি নিজের আকলের মাধ্যমে দলিল-প্রমাণ খুঁজে এর পর বিশ্বাস করতে হবে? বিষয়টি যতটা সরল মনে হয় ততটা সরল থাকেনি। এটা নিয়ে উম্মাহর মাঝে লম্বা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ফলে এ ব্যাপারে কিছু কথা বলা জরুরি মনে করছি।

তাকলিদের পরিচয় : 'তাকলিদ' (التقليد) শব্দের অর্থ হলো অনুসরণ করা, অনুকরণ করা; কারও প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখে নিজেকে তাঁর প্রতি সঁপে দেওয়া। অজ্ঞতা ও অক্ষমতা কিংবা অন্য কোনো কারণে নিজে দলিল-প্রমাণ না খুঁজে অন্যের দলিল-প্রমাণের উপর ভরসা রেখে তাকে অনুসরণ করার নাম তাকলিদ। ঈমানের ক্ষেত্রে তাকলিদ হলো আল্লাহ, ফেরেশতা, পরকাল ইত্যাদির মতো ঈমানের মৌলিক রুকনগুলো দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে না জেনে বিশ্বাস করা। অন্যকথায়, দলিল-প্রমাণবিহীন বিশ্বাসকে ঈমানের ক্ষেত্রে তাকলিদ কিংবা মুকাল্লিদের ঈমান বলা হয়। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। একজন অমুসলিমকে বলা হলো, ইসলাম সত্য ধর্ম। সুতরাং আপনি বলুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।' সে বলল। এক্ষেত্রে কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই সে ঈমান আনল। তাকে যদি আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে বলা হয়, কিংবা কুরআন আল্লাহর অবতীর্ণ সত্য গ্রন্থ—এর দলিল চাওয়া হয়, সে কিন্তু দিতে পারবে না। তবুও সে নিজেকে মুমিন বলে দাবি করছে। এমন লোককে বলা হয় 'মুকাল্লিদ।'

প্রশ্ন হলো, এমন ব্যক্তির ঈমান গ্রহণযোগ্য কি না। এমন ব্যক্তি মুমিন হবে কি না? ঈমানের জন্য দলিল-প্রমাণ জরুরি, নাকি অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসই যথেষ্ট? অন্যের অনুসরণপূর্বক ঈমান আনা হলে সেটা গৃহীত হবে কি না? নাকি দলিল-প্রমাণ না থাকার কারণে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসকে 'সন্দেহ' বিবেচনা করে প্রত্যাখ্যান করা হবে?

বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। আহলে সুন্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের কাছে ঈমানের জন্য অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসই যথেষ্ট। সেটা দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে হোক, কিংবা কারও তাকলিদ বা অনুসরণপূর্বক হোক, সেটা মুখ্য নয়। ফলে আলেম হোক কিংবা জাহেল হোক, অনুসরণীয় হোক কিংবা অনুসারী হোক, প্রত্যেক মুমিনের ঈমান গ্রহণযোগ্য। বিপরীতে একদল মুতাকাল্লিম মনে করেন, ঈমানের ক্ষেত্রে তাকলিদ বৈধ নয়। ফলে যদি কেউ দলিল-প্রমাণ না জেনে স্রেফ অন্যদের

'হাঁ'-তে 'হাঁ' মিলিয়ে, অন্ধ অনুসরণে ঈমান আনে, তবে এমন ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্ধ মুকাল্লিদ মুমিন বিবেচিত হবে না!

উভয় পক্ষের মাঝে কোন পক্ষের কথা বিশুদ্ধ? বাস্তব কথা হলো, উভয় পক্ষের কথাই বিশুদ্ধ হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কারণ, উপরের মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে 'তাকলিদ'-এর স্তরভেদ নির্ধারণের কারণে। 'তাকলিদ' বলতে ঠিক কোন পর্যায়ের তাকলিদ, আর দলিল-প্রমাণ বলতে ঠিক কোন পর্যায়ের দলিল-প্রমাণ, সেটা নির্ধারণে জটিলতার কারণে বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রেও জটিলতা তৈরি হয়েছে। নতুবা উভয় পক্ষের বক্তব্যের মাঝে মৌলিক কোনো মতবিরোধ নেই। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা ইমাম আজমের বক্তব্যসহ দু-পক্ষের মতামতের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা বিশ্লেষণের চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

মুতাকাল্লিমিন (কালামপন্থি) আলেমদের মত : আকলের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত বুদ্ধিজীবী মুতাযিলাদের মতে, মুকাল্লিদের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে ঈমানের ক্ষেত্রে মুকাল্লিদ মুমিন নয়, কাফের। তাদের মতে, ঈমানের প্রত্যেকটি মাসআলা যদি কেউ দলিলভিত্তিক না জানে এবং যেকোনো সময় মনে সৃষ্ট সংশয় দূর করার ক্ষমতা না রাখে, তবে তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না।[৪৭৪]

ইমাম আবুল হাসান আশআরি ও আশআরিদের মত নির্ধারণে একটু জটিলতা ও মতপার্থক্য রয়েছে। কারও মতে, তাদের আর মুতাযিলাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। লামিশি লিখেন, 'আশআরির প্রসিদ্ধ মাযহাবমতে মুকাল্লিদের ইমান বিশুদ্ধ নয়।'[৪৭৫] আরেক দল আলেম এটা অস্বীকার করেছেন এবং এ বক্তব্যকে তাঁর উপর অপবাদ বলেছেন। এক্ষেত্রে বাস্তব কথা হলো, আশআরি মাযহাব বিবর্তনের শিকার হয়েছে। তাদের একদলের মতে, মুকাল্লিদের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদের আর মুতাযিলাদের বক্তব্যের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু আবুল হাসান আশআরিসহ মুহাক্কিক আশআরি আলেমদের মতে দলিল-প্রমাণবিহীন ঈমান একেবারে প্রত্যাখ্যাত কিংবা মুকাল্লিদ কাফের—এমন নয়, বরং মুকাল্লিদ মুমিন। কিন্তু দলিল-প্রমাণ না থাকার কারণে সে গুনাহগার হবে

৪৭৪. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/১৬০)। হিদায়াতুল মুরিদ, লাক্কানি (১/১৯৭-২০৩)।
৪৭৫. দেখুন : আত-তামহিদ, লামিশি (১৩৭)।

এবং আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থাকবে—তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দেবেন, চাইলে ক্ষমা করে দেবেন।[৪৭৬]

তাফতাযানি লিখেন, 'ইজমালি দলিলের মাধ্যমে তাকলিদের বাইরে এসে আল্লাহকে চেনা ফরজে আইন। প্রত্যেকের উপর ফরয। আর তফসিলি দলিল যার মাধ্যমে সন্দেহ-সংশয় দূর করা সম্ভব হয়, বিরুদ্ধবাদীদের খণ্ডন করা যায়, মানুষকে পথ দেখানো যায়—এটা ফরজে কিফায়া।'[৪৭৭] আবুল হাসান আশআরি, আবু বকর বাকেল্লানি, আবু ইসহাক ইসফারায়েনি, ইমামুল হারামাইন জুয়াইনিসহ সকলের মত এটা। লাক্কানির শরহুল জাওহারাহ, সানুসির উম্মুল বারাহিন সর্বত্র এটা লেখা আছে।[৪৭৮]

হানাফিদের মাঝে ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদির মতে, 'জগতের প্রত্যেক মানুষ বিভিন্ন দ্বীন ও মতাদর্শের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকে নিজেকে হক দাবি করে, অন্যেরটা বাতিল বলে। সুতরাং বোঝা গেল, এক্ষেত্রে অন্যের অনুসরণ (তাকলিদ) গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, প্রত্যেকেই তাকলিদ করে নিজেরটা হক বলবে। তাই এক্ষেত্রে নিজেরটা হক এবং অন্যেরটা বাতিল বলতে সামঈ ও আকলি (শরিয়ত ও যুক্তিনির্ভর) দলিল-প্রমাণ প্রয়োজন।'[৪৭৯] উক্ত বক্তব্য তিনি 'কিতাবুত তাওহিদ'-এ দিয়েছেন। এ বক্তব্য দ্বারা মনে হয়, তিনিও মুতাযিলা এবং একদল আশআরির মতো ঈমান দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে গ্রহণের শর্ত করেন, অন্যের অনুকরণে ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তাঁর আরও কিছু বক্তব্য পাওয়া যায়, যা একরকম সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের সমার্থক। একটু পরে সেগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে।

ইমাম আজম এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ-মুহাদ্দিসের মত : ইমাম আজম রহ.-এর মতে ঈমানের ক্ষেত্রে তাকলিদ বৈধ। এটা কেবল ইমাম আজম নন, সুফিয়ান সাওরি, মালেক, আওযায়ি, শাফেয়ি, আহমদ ইবনে হাম্বলসহ মুসলিম উম্মাহর সকল ফকিহ ও মুহাদ্দিসের মত। তাদের মতে, ঈমান গ্রহণের জন্য বিশ্বাস ও সাক্ষ্যই যথেষ্ট, হোক সেটা তাকলিদভিত্তিক। ফিতরত ও আকলের দাবিও এটা।

৪৭৬. আর রাওযাতুল বাহিয়্যাহ (২১)।
৪৭৭. শরহুল মাকাসিদ (১/৪৬)।
৪৭৮. দেখুন : নাজমুল ফারায়েদ (৪০)।
৪৭৯. আত-তাওহিদ, মাতুরিদি (৬)।

কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ﴾ অর্থ : 'বলো আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা-কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর, আর যা-কিছু দেওয়া হয়েছে মুসা ও ঈসা এবং অন্য নবি-রাসুলগণকে তাঁদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারও মধ্যে পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত।' [আলে ইমরান : ৮৪] এখানে স্রেফ ঈমান আনার শর্ত করা হয়েছে, কোনো দলিল-প্রমাণ তালাশ করতে বলা হয়নি।

শুধু এ আয়াত নয়, কুরআন কারিমের সকল আয়াত স্রেফ ঈমান ও বিশ্বাসের নির্দেশ দিয়েছে, দলিল-প্রমাণকে ঈমানের শর্ত করা হয়নি। হ্যাঁ, দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, আসমান ও যমিনের নিদর্শনাবলি, মানুষের নিজেদের দেহের মাঝে বিদ্যমান নিদর্শনাবলি দেখার এবং এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলো ঈমান মজবুত ও দৃঢ় করার জন্য, মানসিক তৃপ্তিলাভের জন্য। এগুলোকে ঈমান কবুলের শর্ত করা হয়নি। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "আমি মানুষের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয়, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ', আর নামায কায়েম এবং যাকাত প্রদান করে। যখন তারা এটুকু করবে, তাদের জানমাল নিরাপদ হয়ে যাবে। আর তাদের হিসাব থাকবে আল্লাহর উপর।"[৪৮০] উক্ত হাদিসে কেবল সাক্ষ্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। দলিলসহ সবিস্তারে জানার কথা বলা হয়নি। তা ছাড়া, পৃথিবীর সবার জন্য ঈমানের পক্ষে দলিল-প্রমাণ জানা সম্ভবও নয়। কেউ সত্যকে যেকোনো পদ্ধতিতে জানুক, তাকে সত্য সম্পর্কে জ্ঞাতই বলা হবে। সুতরাং ঈমান আনাটাই মুখ্য ও যথেষ্ট। দলিল-প্রমাণ আছে কি না সেটা মুখ্য নয়।

ইমাম আজম বলেন, "**কেউ যদি বলে, আল্লাহ নামায, রোযা ও যাকাত ফরয করেছেন কি না আমার জানা নেই, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, কুরআনে আল্লাহ নামায কায়েম এবং যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ অর্থ : 'আর তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো।' [বাকারা : ৪৩] অন্যত্র বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ অর্থ :**

৪৮০. বুখারি (কিতাবুল ঈমান : ২৫)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ২০)।

'হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে।' [বাকারা : ১৮৩] [এগুলো ইসলামের মূল বিষয়। সুতরাং ইচ্ছাকৃত কেউ এগুলো সম্পর্কে গাফেল থাকলে সে কাফের হয়ে যাবে।] **হ্যাঁ, যদি কেউ বলে, আমি এগুলোতে ঈমান রাখি, কিন্তু এগুলোর ব্যাখ্যা জানি না, তবে সে কাফের হবে না। কেননা, মূল কুরআনে সে ঈমান রাখে, কেবল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিচ্যুতির শিকার।"**[৪৮১] ইমামের আজমের কথায় স্পষ্ট যে, নামায-রোযার বিষয়গুলো এ ব্যক্তি নিজে দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে জানেনি, সেভাবে জানলে 'ব্যাখ্যা জানি না' বলত না। তবুও ইমাম তার ঈমান গ্রহণযোগ্য বলেছেন। কারণ, ইমাম আজমের মতে মুকাল্লিদের ঈমান গ্রহণযোগ্য, দলিল-প্রমাণ আবশ্যক নয়।

ইমাম আরও স্পষ্ট করে বলেন, **"কেউ যদি ইসলামের কোনো বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে তাকে কাফের বলা হবে না। যেমন—ইসলাম ও মুসলিমের কেন্দ্রভূমি থেকে দূরে কেউ যদি শিরকে নিমজ্জিত কোনো ভূখণ্ডে থাকে, সে কারণে তার কাছে ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছয় এবং ইসলামি শরিয়াহর ফরয ও ওয়াজিব বিধিবিধান সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান না থাকে, কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে তার বিশ্বাস থাকে আর এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তবে সে ব্যক্তি মুমিন গণ্য হবে।"**[৪৮২] ইমাম আরও বিস্তারিত বলেন, **"মানুষ মুমিন গণ্য হয় আল্লাহকে চেনা ও স্বীকার করার মাধ্যমে। একইভাবে কাফের হয় আল্লাহকে অস্বীকার করার মাধ্যমে। ফলে কেউ যখন আল্লাহকে প্রতিপালক (রব) ও উপাস্য (ইলাহ) হিসেবে স্বীকার করবে, তাওহিদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে, আল্লাহর কাছ থেকে আগত সবকিছু মেনে নেবে। তার জন্য ঈমান কিংবা কুফরের সংজ্ঞার্থ জানা থাকা জরুরি নয়। কারণ, সে জানে ঈমান ভালো আর কুফর মন্দ; ঈমান কল্যাণ আর কুফর অকল্যাণ। ফলে এটুকু জানা ও মানাই যথেষ্ট। যেমন—কেউ মধু ও মাকাল ফল দুটোই মুখে দিয়ে পরীক্ষা করে মধুর মিষ্টতা আর মাকালের তিক্ততা অনুভব করল। তার জন্য মধু কিংবা মাকালের নাম বা সংজ্ঞার্থ জানা জরুরি নয়। তার ব্যাপারে এ কথাও বলা যাবে না যে, সে মিষ্টতা বা তিক্ততা চেনে না। বেশির চেয়ে বেশি এটুকু বলা যাবে যে, সে এগুলোর সংজ্ঞার্থ জানে না। একই কথা ঈমান ও কুফরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—যখন কেউ জানবে যে, ঈমান ভালো আর কুফর মন্দ, এটুকু জেনে**

---

৪৮১. আল-ফিকহুল আবসাত (৪১-৪২)।

৪৮২. প্রাগুক্ত (৪১-৪২)।

মানলেই যথেষ্ট হবে। আলাদা করে ঈমান ও কুফরের সংজ্ঞার্থ জানার দরকার নেই। কেউ এই সংজ্ঞার্থ না জানলেই তাকে আল্লাহ অস্বীকারকারী বলা যাবে না।"[৪৮৩]

ফলে আল্লাহকে চেনা ও স্বীকার করার মাধ্যমেই ঈমান সংঘটিত হয়। সেটার জন্য ঈমানের সংজ্ঞার্থ জানা এবং দলিল থাকা জরুরি নয়, বরং কারও অনুসরণ করার মাধ্যমেও ঈমান সংঘটিত হতে পারে। ইমাম আজম রহ.-এর বক্তব্যের অনুসরণে ইমাম মাতুরিদিকেও আমরা একই বক্তব্য দিতে দেখি। লাক্কানি জাওহারার ব্যাখ্যায় বলেন, আবু মনসুর মাতুরিদি বলেন, আমাদের উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, সাধারণ মানুষ মুমিন, আল্লাহর মারিফাতের অধিকারী। তারাও জান্নাতের উপযুক্ত, যেমনটা হাদিসে এসেছে এবং এর উপর ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে। হ্যাঁ, কেউ কেউ আকিদার ক্ষেত্রে আকলি তথা বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা ও দলিলের কথা বলেছেন। কিন্তু সেটা প্রাকৃতিকভাবেই হয়ে যায়। কারণ, মানুষের ফিতরত সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদ, তাঁর অবিনশ্বরতা এবং সৃষ্টির নশ্বরতা এগুলোর উপর গঠিত। ফলে তারা মুখে মুতাকাল্লিমদের ভাষায় সেটা প্রকাশ করতে না পারলেও এ বিশ্বাস তাদের অন্তরের গভীরে প্রোথিত। আর এটা স্পষ্ট যে, এটা মুখে প্রকাশ করা জরুরি নয়।[৪৮৪]

ইমাম আজমের অনুসরণে হানাফি আলেমগণ 'মুকাল্লিদের ঈমান সঠিক' বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। ফলে এক্ষেত্রে তারা মুতাযিলা ও আশআরিদের বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ ও মুহাদ্দিসের সঙ্গে একমত। কাযি সদর বাযদাবি বলেন, 'আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো—মুকাল্লিদ প্রকৃত অর্থেই মুমিন। ফলে কেউ যদি ইসলামের সকল মৌলিক রুকন অন্তরে সত্যায়ন করে এবং মুখে স্বীকৃতি দেয়, তবে সে মুমিন। এর জন্য দলিল-প্রমাণ দরকার নেই।'[৪৮৫] সাবুনিও মুকাল্লিদের ঈমানকে সহিহ বলে মত দিয়েছেন এবং এটাকে ইমাম আবু হানিফা, মালেক, আওযায়ি, শাফেয়ি, আহমদ ইবনে হাম্বল, আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ আল-কাত্তান, হারেস মুহাসেবি, আবদুল্লাহ আল-মক্কির মত বলে স্বীকার করেছেন।[৪৮৬]

---

৪৮৩. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২৯)।
৪৮৪. হিদায়াতুল মুরিদ, লাক্কানি (১/২০২)।
৪৮৫. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৫৫)।
৪৮৬. দেখুন : আল-কিফায়াহ (৩৫৭-৩৫৯)।

সিরাজুদ্দিন উশি লিখেন, 'মুকাল্লিদের ঈমান বিশুদ্ধ। ফলে কেউ যদি দলিল-প্রমাণ ছাড়াও ঈমান আনে সে মুমিন গণ্য হবে।'[৪৮৭]

আবু ইসহাক সাফফার এ বিষয়ে অনেক সুন্দর কথা লিখেছেন। তিনি লিখেন, 'সত্যকে যেকোনো পদ্ধতিতে জানলেই হলো। এর জন্য দলিল জরুরি নয়। এটাই ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর শাগরেদদের মত। এটাই সাহাবা ও তাবেয়িনসহ গোটা সালাফে সালেহিনের মানহাজ। কারণ, দলিল ছাড়া জানা কোনো জিনিস দলিলসহ জানার দ্বারা বদলে যায় না। সুতরাং দলিল ছাড়া জানলেও যা থাকে দলিলসহ জানলেও তা-ই থাকে। এটা হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন—ইমাম আজম রহ. বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহর রাসুল বলেন, 'তোমরা বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাহলে সফল হয়ে যাবে।' অন্য হাদিসে তিনি বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আমি মানুষের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...।' এখানে কেবল স্বীকৃতিকেই ঈমান বলা হয়েছে। দলিলসহ সবিস্তারে জানার কথা বলা হয়নি। সুতরাং কেউ সত্যকে যেকোনো পদ্ধতিতে জানুক, তাকে সত্য সম্পর্কে জ্ঞাতই বলা হবে।"[৪৮৮]

মুতাকাল্লিমদের বক্তব্যের পর্যালোচনা : প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে মুতাযিলা ও আশআরি উলামায়ে কেরাম 'মুকাল্লিদের ঈমান'-এর সমালোচনা এবং দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে আল্লাহকে জানার যে শর্ত করেছেন, অন্যকথায়, তারা মুকাল্লিদের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য দলিল-প্রমাণের যে শর্ত করেছেন, সেটা কি সর্বতোভাবেই ভুল ও বিচ্যুতি?

মুতাযিলাদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবেই ভুল। তারা কেবল উক্ত মাসআলায় নয়, ঈমানের অধিকাংশ মাসআলাতেই আকলকে নকল (তথা যুক্তিকে কুরআন-সুন্নাহর) আগে রাখতে গিয়ে কোনো-না-কোনো বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। ফলে এটাও তাদের বিভ্রান্তি। ঈমানের জন্য অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও আত্মসমর্পণই যথেষ্ট। অন্য কারও অনুসরণে ঈমান আনাই যথেষ্ট। এমন ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়, এমন মুমিন কাফের—এ ধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। কারণ, এমন বক্তব্য সাধারণ মানুষকে প্রকারান্তরে কাফের বানিয়ে ফেলে। এটা রিসালাত ও নবুওতের ক্ষেত্রে আল্লাহর হিকমত (তথা প্রজ্ঞার) সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

---

৪৮৭. ফাতাওয়া সিরাজিয়্যাহ (৩০৭)।

৪৮৮. তালখিসুল আদিল্লাহ (৩৭-৩৮)। মুসনাদে আবি হানিফা, হারেসির বর্ণনা (২৮)।

স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে আল্লাহ তায়ালা মানুষের কাছে ইসলাম পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি ইসলাম পেশ ও গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঈমান সংঘটিত না হয়, তবে তাঁর মিশনের উদ্দেশ্যই পূর্ণ হবে না। হ্যাঁ, দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে আল্লাহকে চেনার মূল্য নিঃসন্দেহে কেবল অনুসরণমূলক (তাকলিদি) ঈমানের চেয়ে অনেক বেশি দামি। তাই বলে সাধারণ মুমিনদের ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তাদের কাফের বলার সুযোগ নেই। রাসুলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবায়ে কেরাম, খুলাফায়ে রাশেদিন এবং মুসলমানদের ইমামের কেউ এটা করেননি। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হন, যাদের কাছে দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না। তারা আল্লাহর রাসুলের রিসালাতকে স্বীকৃতি দেয়, মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে, পরকালে ঈমান আনে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের ঈমান কবুল করে নেন। একইভাবে আবু বকর (রা.) দলিল-প্রমাণ ছাড়াই মুরতাদদের ইসলাম কবুল করেন। উমর রাযি.-এর যুগে যেসব বিজিত এলাকার মানুষজন মুসলিম হয়, তাদেরও উমর রাযি. দলিল-প্রমাণের শর্ত ছাড়াই গ্রহণ করেছেন। তিনি তাদের বলেননি, আগে ঈমানের দলিল শেখো, এর পর ঈমান কবুল করা হবে। কিংবা তাদের ঈমানের দলিল-প্রমাণ শেখানোর জন্য কোনো লোক নিয়োগ দেননি। আমাদের সালাফে সালেহিন, বুযর্গানে দ্বীন ও মুবাল্লিগিনে ইসলাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে কালিমার দাওয়াত দিয়েছেন। সমাজের খেটে খাওয়া, অক্ষরজ্ঞান-বর্জিত, দীনহীন মানুষরা দলে দলে তাদের হাতে হাত রেখে কালিমা পড়ে ঈমানে দাখিল হয়েছে, তাদের কারও কাছে যুক্তিনির্ভর দলিল-প্রমাণ চাওয়া হয়নি, চাওয়া হলেও তারা জবাব দিতে পারত না। বোঝা গেল, বিশ্বাসটাই যথেষ্ট। বরং এভাবে ঈমানকে যথেষ্ট না বলে যদি দলিল-প্রমাণের উপর নির্ভশরীল বলা হয়, তবে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পুরো নবুওতি জীবনকে গলত বলতে হবে, দলিল-প্রমাণ ছাড়া মানুষকে মুমিন সাব্যস্ত করাকে ভুল বলতে হবে। এটা তো সুস্পষ্ট বিচ্যুতি।

প্রশ্ন হলো, তাহলে আশআরি উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে কী বক্তব্য? তাদের ব্যাপারেও কি মুতাযিলাদের ব্যাপারে লেখা উপরের কথাগুলো প্রযোজ্য? বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। মুতাকাল্লিমদের মধ্য থেকে একদল আলেম মুতাযিলাদের পথ অনুসরণ করেছেন। তারাও আকলের ব্যাপারে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়ে আকলকেই সবকিছুর মূল ধরেছেন। কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে তর্কশাস্ত্রকে আকিদার ভিত্তি বানিয়ে ফেলেছেন। ফলে কালামশাস্ত্রের আলোকে দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে কেউ

ইমান না আনলে তার ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাকে কাফের বলেছেন। তাদের ব্যাপারে উপরের কথাই প্রযোজ্য।

এ কারণে খোদ মুহাক্কিক আশআরিগণ তাদের সমালোচনা করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার আসকালানি ফাতহুল বারিতে সিমনানি থেকে বর্ণনা করেন, 'এটা মুতাযিলাদের মতাদর্শ। দুঃখজনকভাবে আমাদের মাযহাবে রয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।'[৪৮৯] হুজ্জাতুল ইসলাম গাযালি এই মতাদর্শের সমালোচনা করে লিখেছেন, 'এক সম্প্রদায় বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করেছে। তারা মুসলিম আমজনতাকে কাফের সাব্যস্ত করেছে। তাদের ধারণা, যে ব্যক্তি তাদের লেখা দলিলসহ আকিদা শিখবে না, সে কাফের! এভাবে তারা আল্লাহর বিস্তৃত রহমতকে সংকীর্ণ করে ফেলেছে। আল্লাহর জান্নাতকে কেবল একদল ক্ষুদ্র মুতাকাল্লিমের জন্য সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে।'[৪৯০] ইমামুল হারামাইন জুয়াইনি লিখেন, 'আহলে সুন্নাতের সাধারণ মানুষের ঈমান বিশুদ্ধ। এর জন্য দলিল-প্রমাণ দরকার নেই। কেবল সাধারণ মানুষ কেন, যারা ইমাম হিসেবে পরিচিত, তাদের জিজ্ঞাসা করা হলেও একটি মাসআলার দলিল দিতে গিয়ে পেরেশান হয়ে পড়বে। বোঝা গেল, সাধারণ মানুষের আকিদা দলিল-প্রমাণভিত্তিক নয়, বরং হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত বিশ্বাস। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর স্বরূপ জানার নির্দেশ দেননি। এ কারণেই আমাদের সালাফে সালেহিন দলিলের পিছনে পড়েননি। বরং মজবুত বিশ্বাস, শাহাদাত (সাক্ষ্য) ও আমলই যথেষ্ট ছিল (অর্থাৎ ঈমানের তিনটি রুকন : অন্তরের সত্যায়ন, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল)। যে ব্যক্তি এই আকিদার উপর অটল থাকবে, সে মুক্তি পাবে, সাফল্য লাভ করবে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যার সর্বশেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কারণ, পৃথিবীতে গবেষণা করতে পারে এমন মানুষ কম। সাধারণভাবে বিশ্বাসী মানুষ বেশি।'[৪৯১]

মুতাযিলা-প্রভাবিত মুতাকাল্লিমদের বিপরীতে আহলে সুন্নাতের মুতাকাল্লিমগণের বক্তব্য মুতাযিলাদের বক্তব্য থেকে ভিন্ন। তাদের বক্তব্য আর মুতাযিলাদের বক্তব্যের মাঝে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। অনেকে সেটা ধরতে

---

৪৮৯. দেখুন : ফাতহুল বারি (১/৭০-৭১)।

৪৯০. প্রাগুক্ত (১৩/৩৪৯)।

৪৯১. আল-আকিদাহ নিযামিয়্যাহ, জুয়াইনি (২৬৭-২৬৮)।

না পারার কারণে তাদেরও মুতাযিলাদের সঙ্গে একত্রে ফেলে বিচার করেছেন; অথচ এটা সঠিক নয়।

সে পার্থক্য হলো দলিল-প্রমাণের ধরন ও প্রকৃতি। মুতাযিলারা মুকাল্লিদের ঈমানকে একবাক্যে নাকচ করে দেয়। কালামি ও ফালসাফি স্টাইলে দলিল-প্রমাণের শর্ত করে। বিপরীতে আহলে সুন্নাতের মুতাকাল্লিমগণ শাস্ত্রীয় দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে ঈমান আনার শর্ত করেন না, বরং আল্লাহ যে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, সেটার ন্যূনতম ব্যবহারপূর্বক যেসব বিষয়ে ঈমান আনছে, সেগুলোকে ন্যূনতম পর্যায়ে পরখ করা, সত্য ও মিথ্যার সর্বনিম্ন পার্থক্য ধরতে পারার শর্ত করেন, আমরা যেটাকে 'ফিতরতি' প্রমাণ হিসেবে আখ্যা দিতে পারি, যেটুকু পার্থক্য ছাড়া মানুষকে 'বুদ্ধিমান' এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায় না।[৪৯২]

সুবকি বলেন, 'আশআরিদের মতেও মুকাল্লিদের ঈমান বিশুদ্ধ। তারা এক্ষেত্রে যে দলিল-প্রমাণ এবং যুক্তিসহ চিন্তাভাবনার শর্ত দেন, সেটা ঈমান আনার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়ে যায়।'[৪৯৩] অর্থাৎ, একজন মানুষ কালিমা পড়ার সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অনুভব করে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। পৃথিবীতে দুজন সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক থাকা সম্ভব নয়। এই যে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভব এবং সুস্থ বিবেকের সাক্ষ্য, এটুকুই দলিল-প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। এমন ব্যক্তির শাহাদাত ও ঈমান গ্রহণযোগ্য। কিন্তু কেউ যদি কালিমা পড়ার সময় কী পড়ছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, তাওহিদের সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তাওহিদের মর্ম ও তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই না থাকে, ইসলাম অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা নাকি ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতোই একটা ধর্ম—এ ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র জানাশোনা কিংবা আগ্রহ না থাকে, এক কথায়, ইসলাম সম্পর্কে তাঁর হৃদয় ও মন বিলকুল গাফেল ও ভ্রুক্ষেপহীন থাকে, এমন ব্যক্তির ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

জামালুদ্দিন খাব্বাযি (৬৯২ হি.) লিখেন, 'হ্যাঁ, দলিল-প্রমাণ বলতে যদি ফিতরতি জ্ঞান ও প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের অনুভব উদ্দেশ্য হয়, তবে

---

৪৯২. দেখুন : হিদায়াতুল মুরিদ (১/২০১)। আত-তামহিদ, আবু শাকুর সালেমি (১০২)।
৪৯৩. আস-সাইফুল মাশহুর (৪১)।

সেটা ঠিক আছে।’[৪৯৪] বায়াযি (১০৯৮ হি.) লিখেন, ‘প্রত্যেকের জন্য দলিল-প্রমাণের স্তর তার অবস্থার প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হবে। সবার জন্য মুতাকাল্লিমদের দলিল জানা জরুরি নয়।’[৪৯৫] অর্থাৎ, যারা আলেম, তারা অন্য কারও তাকলিদ করে ভ্রুক্ষেপহীনভাবে ঈমান আনবেন না, বরং তারা জেনেবুঝে ঈমান আনবেন। বিপরীতে সাধারণ মানুষ ফিতরতিভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব ও হক্কানিয়্যাতের অনুভব থেকে ঈমান আনবে। তাদের জন্য দলিল-প্রমাণ জানা জরুরি নয়।

কামাল ইবনুল হুমাম লিখেন, ‘বিশুদ্ধ মত হলো, ঈমান সঠিক হওয়ার জন্য দলিল-প্রমাণ জানা জরুরি নয়। কারণ, সাধারণ মানুষের কাছেও দলিল-প্রমাণ থাকে। বাজার-ঘাটে কথা বলার সময় তারাও কত ধরনের দলিল পেশ করতে পারে। স্রেফ তাকলিদ কেউ করে না। তাই দলিল-প্রমাণ পরিত্যাগের কারণে কাউকে গুনাহগার বলা যাবে না।’[৪৯৬] আবু শাকুর সালেমি লিখেন, “কেউ যদি এটুকু জানে যে, তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি আসমান-যমিনেরও প্রতিপালক—এটুকুতেই ‘নজর’ (পর্যবেক্ষণ) প্রমাণিত হবে এবং সে ‘তাকলিদ’-এর সীমারেখা থেকে বাইরে চলে যাবে। অর্থাৎ, কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার সৃষ্টিকর্তা কে এবং সে জবাবে বলে, ‘আল্লাহ’ অথবা ‘আসমান ও যমিনের সৃষ্টিকর্তা’, এটুকুইতেই তার ঈমান বিশুদ্ধ হবে। বিপরীতে ‘মুকাল্লিদের ঈমান শুদ্ধ নয়’—এ কথার অর্থ হলো, সে ব্যক্তির ঈমান শুদ্ধ নয় যে এটুকুও জানে না যে, আল্লাহ তার ও আসমান-যমিনের সৃষ্টিকর্তা।”[৪৯৭]

উক্ত বক্তব্যের মাঝে আর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের বক্তব্যের মাঝে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। কারণ, যিনি কালিমা পড়ছেন, তার স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এতটুকু জানা হয়ে যায়। আর যে কী পড়ছে সেটাই জানে না, এমন ব্যক্তির ঈমান কারও মতেই বিশুদ্ধ নয়। এটা যৌক্তিকও নয়। ঈমানের নামে তামাশা এটা। একব্যক্তি পরিবারসূত্রে মুসলমান। সে ইসলামের কিছুই বোঝে না, কিছুই জানে না। আল্লাহর উপর কেন বিশ্বাস রাখে—এ ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই। তার বাপ-দাদা রাখত, এ জন্য সেও রাখে। আহলে সুন্নাতের মুতাকাল্লিমগণ মূলত এ ধরনের

---

৪৯৪. আল-হাদি ফি উসুলিদ্দিন (২৭৪, ২৭৯-২৮০)।

৪৯৫. ইশারাতুল মারাম (৮৪)।

৪৯৬. আল-মুসায়ারাহ (১৭৭)।

৪৯৭. দেখুন : আত-তামহিদ, আবু শাকুর সালেমি (১০০-১০১)।

তাকলিদেরই সমালোচনা করেছেন। আর এমন তাকলিদ কেবল মুতাকাল্লিমিন নয়; সকল আলেমদের কাছে প্রত্যাখ্যাত ও নিন্দাযোগ্য। ফলে গভীরে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ ও মুহাদ্দিস আর আহলে সুন্নাতের মুতাকাল্লিমদের মাঝে মৌলিক কোনো মতবিরোধ চোখে পড়বে না।

মোটকথা, উক্ত বক্তব্য আর সালাফের বক্তব্যের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, এটুকু জ্ঞান প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক এবং তা কালিমার মাঝেই বিদ্যমান। কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ল, অথচ আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকর্তা কিংবা তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এটা জানল না, তাহলে সে কী পড়ল? এমন ব্যক্তি কীসের ভিত্তিতে মুমিন গণ্য হবে? তার মাঝে আর একজন কাফেরের মাঝে ফারাক কী? তাই ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কে তফসিলি জ্ঞান আবশ্যক নয়। নির্দিষ্ট শব্দে ইসলাম ও ঈমানের সংজ্ঞায়নও আবশ্যক নয়। কিন্তু ইসলাম সত্য অন্যান্য ধর্ম মিথ্যা, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বরং একমাত্র সত্য ও আল্লাহর মনোনীত দ্বীন—এটুকু বিশ্বাস যেকোনো কালিমা পাঠকারীর থাকতে হবে। মুখে প্রকাশ করতে পারা জরুরি নয়। ইমাম আজম থেকেও এটা বর্ণিত আছে।

মুকাল্লিদ কি গুনাহগার?

মুকাল্লিদের ঈমান বিশুদ্ধ—এটাই মুসলমানদের সকল ধারার গ্রহণযোগ্য মত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, দলিল-প্রমাণ পরিত্যাগের কারণে সে গুনাহগার হবে কি? আশআরি ধারার আলেমগণ মনে করেন, সে গুনাহগার হবে। অধিকাংশ হানাফি মুতাকাল্লিম তাদের অনুসরণে মনে করেন, মুকাল্লিদের ঈমান বিশুদ্ধ হলেও সে দলিল পরিত্যাগের কারণে গুনাহগার হবে।[৪৯৮]

মাইমুন নাসাফি বলেন, 'কেউ অন্তরে সত্যায়ন করলেই মুমিন গণ্য হবে। সেটা দলিলভিত্তিক হোক কিংবা দলিলবিহীন হোক। ফলে মুকাল্লিদের ঈমান বিশুদ্ধ। তাঁর ঈবাদত সঠিক। পরকালে সে জান্নাতি।' তবে নাসাফি দলিল-প্রমাণ পরিত্যাগের কারণে তাকে গুনাহগার ও অবাধ্য সাব্যস্ত করেন। এটাকে তিনি ইমাম আজমসহ চার ইমামের মাযহাব বলেন।[৪৯৯] সাবুনি লিখেন, 'ইমাম আবু হানিফা,

---

৪৯৮. দেখুন : শরহুল মাকাসিদ, তাফতাযানি (২/২৬৫)। লুবাবুল কালাম (৩৮)। জামেউল মুতুন, গুমুশখানভি (২৮)। শরহুল ফিকহিল আকবার, বাহাউদ্দিন যাদাহ (৩১-৩২)।

৪৯৯. দেখুন : তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/১৫৪-১৫৫, ১৫৭-১৫৮)।

সুফিয়ান সাওরি, মালেক, আওযায়ি এবং অধিকাংশ ফকিহ ও মুহিদ্দিসের বক্তব্য হলো, মুকাল্লিদের ঈমান বিশুদ্ধ। হ্যাঁ, (যদি কোনো যৌক্তিক কারণ ব্যতীত) ঈমানের দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে সে অবাধ্য গণ্য হবে। এটাই সঠিক বক্তব্য।'[৫০০] রুকনুদ্দিন সমরকন্দি বলেন, 'বিশুদ্ধ মাযহাব অনুযায়ী মুকাল্লিদের ঈমান বিশুদ্ধ। তবে দলিল পরিত্যাগ করলে গুনাহগার হবে।'[৫০১] হাফিজুদ্দিন নাসাফিও মুকাল্লিদের ঈমান বিশুদ্ধ স্বীকার করার পরে দলিল পরিত্যাগ করার কারণে গুনাহগার আখ্যা দিয়েছেন, তাকে 'ফাসিকুল মিল্লাহ' (পাপী মুসলিম) বলেছেন। শেষে এটাকে আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরি, মালেক, শাফেয়ি, আওযায়ি, আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখের মাযহাব বলেছেন।[৫০২]

যদি তারা এসব ইমামের মাযহাব বলতে স্রেফ 'মুকাল্লিদের ঈমান বিশুদ্ধ' অংশটুকু বোঝান, তবে তাদের বক্তব্য সঠিক। কিন্তু তারা যদি 'মুকাল্লিদ গুনাহগার' অংশটুকু বোঝান, তবে এমন দাবি সঠিক নয়, বরং ভিত্তিহীন পরিগণিত হবে। ইমাম আজম, শাফেয়ি, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বলরা কখনো মুকাল্লিদকে গুনাহগার বলেননি। ইমাম আজম থেকেও এ ধরনের কোনো বক্তব্য নেই। হ্যাঁ, যদি কারও সুযোগ থাকে, তবে তাওহিদের দলিলগুলো জেনে নেওয়াই উত্তম, যাতে সন্দেহের মুখে পা ফসকে না যায়। কিন্তু মুকাল্লিদকে কালামি দলিল পরিত্যাগের কারণে গুনাহগার বলা মুতাযিলা এবং মুতাযিলা-প্রভাবিত পরবর্তী সময়ের একদল মুতাকাল্লিমের বক্তব্য। সালাফে সালেহিন এ ধরনের কোনো আকিদা রাখতেন না। প্রথম যুগের হানাফি আলেমগণও এমন বক্তব্য দেননি, যা পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে।

কাযি সদরুল ইসলাম বাযদাবি বলেন, 'আহলে সুন্নাতের বক্তব্য হলো—মুকাল্লিদ প্রকৃত অর্থেই মুমিন। মুতাযিলাদের কাছে সে মুমিন নয়। আশআরিদের প্রতিষ্ঠিত মত অনুযায়ীও সে মুমিন। এটাই উম্মাহর অধিকাংশ মানুষের আকিদা। সাহাবায়ে কেরামের মতাদর্শ। এর বিরোধিতা করা গোমরাহি ও বিদআত। যুক্তিও তা-ই বলে। পথ চলার উদ্দেশ্য হলো গন্তব্যে পৌঁছানো। যদি কেউ গাইড নিয়ে (মুকাল্লিদ) মক্কায় পৌঁছয়, আর যদি কেউ গাইড ছাড়া (গাইরে মুকাল্লিদ) মক্কায়

---

৫০০. আল-বিদায়াহ মিনাল কিফায়াহ (১৫৪)।

৫০১. আল-আকিদাহ আর- রুকনিয়্যাহ (পাণ্ডুলিপি) (২, ৪৫-৪৬)।

৫০২. দেখুন : আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (৩৮৫)।

পৌঁছয়, দুজনেই মক্কায় পৌঁছেছে ধর্তব্য হবে। দুজনেই গন্তব্যে পৌঁছেছে। কারও সহায়তায় পৌঁছল নাকি সহায়তা ছাড়া, সেটা মুখ্য নয়।'[৫০৩]

গাযালি লিখেন, 'আল্লাহর উপর ঈমান রাখা, আল্লাহ ও রাসুলকে সত্যায়ন করা, হকের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, ইবাদতে মগ্ন থাকাই যথেষ্ট। কেননা, নবিজি (ﷺ) যখন দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, তখন মানুষের কাছ থেকে সত্যায়ন (তথা ঈমান) ছাড়া আর কিছু চাননি। এই ঈমান কারও তাকলিদ করে নাকি দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে, আল্লাহর রাসুল সে পার্থক্য খোঁজেননি। বরং যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে-ই মুমিন। এরচেয়ে বেশি কোনোকিছু নিয়ে তাকে উত্ত্যক্ত না করা চাই। দলিল খুঁজতে গেলে অনেক সময় তাদের মনের মাঝে উলটো বিভিন্ন সংশয়-সন্দেহ তৈরি হতে পারে—এমন আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম এসবের মাঝে প্রবেশ করেননি; দাওয়াত ও ইবাদতের মাঝে সময় কাটিয়েছেন। দ্বীন ও দুনিয়ায় মানুষের কী করে কল্যাণ হবে, সবাইকে সে পথে ডেকেছেন।'[৫০৪]

কাসানি লিখেছেন, 'মুকাল্লিদের ঈমান বিশুদ্ধ। দৃঢ়ভাবে ঈমান আনলেই সে ঈমান তার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য উপকারী হবে। এর জন্য আকলি দলিল নিষ্প্রয়োজন।'[৫০৫] খোদ হানাফি মুতাকাল্লিমিনের মাঝে জামালুদ্দিন গযনবি (৫৯৩ হি.) লিখেন, 'মুকাল্লিদের ঈমান বিশুদ্ধ। ফলে কেউ যদি আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর চিরন্তনতা ও তাওহিদকে স্বীকার করে, তাঁর সকল গুণাবলি, নবি-রাসুল, আসমানি কিতাব ইত্যাদির প্রতি অনড় ও সন্দেহাতীত বিশ্বাস রাখে, তবে সে মুমিন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় জাহানে তার ঈমান বিশুদ্ধ। আলাদা করে আকলি দলিল-প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন।'[৫০৬]

অধমের পর্যবেক্ষণ : সামগ্রিকভাবে মুকাল্লিদের ঈমান শুদ্ধ-অশুদ্ধ এবং মুকাল্লিদ গুনাহগার কিংবা গুনাহগার নয়—এ বিষয়ে সালাফে সালেহিন ও মুতাকাল্লিমদের মতপার্থক্য অধমের মতে শাব্দিক, তাত্ত্বিক, সংজ্ঞায়ন ও স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে জটিলতাভিত্তিক। মৌলিক ও বাস্তবিক কোনো মতপার্থক্য নয়।

---

৫০৩. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৫৫)।
৫০৪. আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ (১৯)।
৫০৫. আল মুতামাদ ফিল মুতাকাদ (১৪)।
৫০৬. উসুলুদ্দিন (২৫৯-২৬০)।

অর্থাৎ, অধিকাংশ মুতাকাল্লিম তাকলিদের পরিবর্তে ঈমানের জন্য পর্যবেক্ষণ (নজর) এবং যৌক্তিক পর্যালোচনার (ইসতিদলাল) যে শর্ত করেছেন, সেটা বাস্তবায়নের জন্য আলাদাভাবে কালাম কিংবা মানতিক শেখা নিষ্প্রয়োজন। বরং প্রত্যেক সচেতন ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী কালিমা পাঠকারীর ভিতরে সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যমান থাকে। শাহাদাহ দানের মাঝেই সেই ন্যূনতম পর্যবেক্ষণ উপস্থিত থাকে। ফলে প্রত্যেক মুমিনই সে ভিত্তিতে 'গাইরে মুকাল্লিদ' হয়ে থাকে এবং তার ঈমান বিশুদ্ধ হয়। এভাবে প্রত্যেকেই গুনাহ থেকেও বেঁচে যায়। কারণ, ফিতরতিভাবে কেউই 'মুকাল্লিদ' থাকে না। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি ঈমানের প্রতি একেবারেই ভ্রুক্ষেপ করে না, কিংবা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সন্দেহের দোলাচলে দুলতে থাকে, এমন ব্যক্তির পদস্খলনের আশঙ্কা অস্বীকার করার সুযোগ নেই এবং তাকে ত্রুটিপূর্ণ মুমিন বলাও অযৌক্তিক নয়।

আল্লাহর উপর ঈমান (তাওহিদ)

তাওহিদের পরিচয় ও তাৎপর্য

আরবি শব্দ ‘তাওহিদ’ (التوحيد)-এর বাংলা অর্থ হলো একত্ববাদ। অর্থাৎ, আল্লাহকে এক জানা, এক মানা। পরিভাষায় আলেমগণ তাওহিদকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ইমাম আজম রহ. থেকে তাওহিদের সুস্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা বিবৃত হয়নি; বরং সাহাবা ও তাবেয়িন কারও থেকেই তাওহিদের সেসব সংজ্ঞা বিবৃত হয়নি যেসব পরবর্তীকালে অস্তিত্বে এসেছে। কারণ, তারা তাওহিদ বলতে আল্লাহর সামগ্রিক একত্ববাদ বুঝতেন। এ জন্য আলাদা সংজ্ঞায়নের প্রয়োজন হয়নি। পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হলে সংজ্ঞায়নের প্রয়োজন সামনে আসে।

সিরাজুদ্দিন গযনবি তাওহিদের সংজ্ঞায় লিখেন, ‘আল্লাহর ক্ষেত্রে অংশীদার, হিস্‌সাদার ও সদৃশ নাকচ করা। ফলে কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ এক, সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এক; তাঁর সঙ্গে কেউ অংশীদার নেই। সত্তার ক্ষেত্রে আল্লাহ এক; তাঁর সত্তার মাঝে কোনো বিভাজন নেই। গুণাবলির ক্ষেত্রে তিনি এক; তাঁর গুণের সঙ্গে সৃষ্টির কোনো সাদৃশ্য নেই।’[৫০৭] তাওহিদের সংজ্ঞায় আল্লামা আবুল মুনতাহা মাগনিসাভি বলেন, “মানুষের চিন্তাচেতনা, বিবেক-বোধ ও কল্পনা-জল্পনায় যা-কিছু উদিত হয়, আল্লাহকে সে সবকিছু থেকে পবিত্র ঘোষণা করা। ‘আল্লাহ এক’-এর অর্থ হলো, তাঁর মতো কেউ নেই। তাঁর সৃদশ কিছু নেই। তাঁর সত্তা ও গুণে কেউ শরিক নেই।”[৫০৮]

কিন্তু উপরের সংজ্ঞাগুলোতে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। এগুলোতে তাওহিদের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ‘উলুহিয়্যাত’ তথা এক আল্লাহর ইবাদত করার কথা উল্লেখ করা হয়নি। এ জন্য এগুলোর চেয়ে তাফতাযানির সংজ্ঞা আরও পরিপূর্ণ। তিনি লিখেন, ‘তাওহিদ বলা হয়—আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে কাউকে শরিক

---

৫০৭. শরহুত তহাবিয়্যাহ, গযনবি (৩৩)।

৫০৮. শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১০৩)।

সাব্যস্ত না করা। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা গোটা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক; তিনিই একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত এবং তিনিই একমাত্র চিরন্তন সত্তা—এ মর্মে স্বীকৃতি দেওয়া।'[৫০৯]

অন্য শব্দে আরেকটু বিশ্লেষিতভাবে তাওহিদকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়: 'আল্লাহ তায়ালার সত্তা, তাঁর সকল সুন্দরতম নাম, তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলি এবং সকল কর্মে তাকে শরিকহীন ও সদৃশহীন ঘোষণা করা; একমাত্র তাঁকেই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা (খালিক), প্রতিপালক (রব) ও মালিক সাক্ষ্য দেওয়া; কেবল তাঁকেই একমাত্র ইলাহ (উপাস্য) স্বীকৃতি দেওয়া এবং কেবল তাঁরই ইবাদত করা; জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবল তাঁকেই বিধানদাতা (হাকিম) মেনে নিয়ে তাঁর সকল নির্দেশ ও বিধিবিধান মেনে চলা; কোনোকিছুতে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত না করা।'

তাওহিদ জগতের শ্রেষ্ঠ উপহার, পৃথিবীর অস্তিত্বের মূল কথা, মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাওহিদের অধিকারী ব্যক্তি প্রকৃত ধনী, সবচেয়ে ধনী। তাওহিদ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি জগতের সবচেয়ে নিঃস্ব ও সর্বহারা। পৃথিবীতে মানুষের কাজ একটাই—তাওহিদ বাস্তবায়ন করা; তাওহিদের বিপরীত বস্তু কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ইমাম আজম রহ. বলেন, **"তাওহিদ মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার। সুতরাং সকল মানুষ কেবল তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করবে না—এটা তাঁর হক। যখন তারা এটা করবে, তখন আল্লাহর উপর (তাঁর প্রতিশ্রুতির ফলস্বরূপ) মানুষের হক হচ্ছে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন, তাদের পুরস্কৃত করবেন। কারণ, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, তিনি মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট আর ইবলিসের উপর অসন্তুষ্ট। আল্লাহ বলেন,** ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ **অর্থ : 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করছিল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের আসন্ন বিজয় উপহার দিলেন।'[৫১০] [ফাতাহ : ১৮]**

---

৫০৯. শরহুল মাকাসিদ, তাফতাযানি (২/৬৪)।
৫১০. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৭)।

ইমাম আজম আরও বলেন, **"শাহাদাহ (তথা তাওহিদের) সাক্ষ্য দেওয়ার চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ পুণ্য আর নেই। সাত আকাশ সাত জমিন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা-কিছু আছে তার সামনে একটি ডিম্ব যত ক্ষুদ্র, আল্লাহর তায়ালার নির্দেশিত সকল আমল ও ইবাদত এই শাহাদাহর সামনে তারচেয়েও বেশি ক্ষুদ্র।"**[৫১১]

কুরআন কারিমের সারকথাই তাওহিদ। কুরআনের আয়াতগুলো বিভিন্নভাবে বিভক্ত হলেও বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলেও এর সারবত্তা হলো তাওহিদ। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে সরাসরি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর বিভিন্ন কর্ম, নাম ও গুণাবলি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো তো সুস্পষ্ট তাওহিদ। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন। আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছুর দাসত্ব করতে বারণ করেছেন। এটাও তাওহিদ। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ করেছেন, এগুলো মূলত তাওহিদ থেকে উৎসারিত দায়িত্ব এবং তাওহিদকে পূর্ণাঙ্গকারী। কুরআনে পরকালে আল্লাহ কর্তৃক তাওহিদপন্থিদের সম্মাননা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এগুলো তাওহিদের ফলাফল। আর যেসব আয়াতে কাফের-মুশরিকদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, সেটা মূলত তাওহিদ থেকে বিচ্যুতির পরিণতি। এভাবে পুরো কুরআন কারিম তাওহিদের পরিচয়, তাওহিদের গুরুত্ব, তাওহিদের গুরুদায়িত্ব, তাওহিদপন্থিদের প্রশংসা এবং তাওহিদের শত্রুদের নিন্দাবাদে ভরপুর।

তাওহিদের প্রকারভেদ

তাওহিদ কত প্রকার? এটা বর্তমান সময়ে ইসলামি আকিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যতম বহুল প্রচলিত প্রশ্ন। যে-কেউ ইসলামি আকিদা নিয়ে পড়াশোনা করতে গেলে কিংবা কথা বলতে গেলে তাওহিদের পরিচয় ও প্রকারভেদ দিয়ে শুরু করেন। ফলে এ ব্যাপারে ইমাম আজমসহ সালাফে সালেহিনের মানহাজ তথা কর্মপদ্ধতি নিয়ে কিছু বিষয় আলোচনা জরুরি মনে করছি।

প্রথমেই একটা বিষয় পরিষ্কার করে নিতে হবে। সেটা হলো, কুরআন-সুন্নাহতে তাওহিদের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কোনো প্রকারভেদ নেই। সাহাবায়ে কেরাম তাওহিদের কোনো প্রকারভেদ করেননি, তাবেয়ি তাবে-তাবেয়িরাও করেননি। এ কারণে ইমাম আজম রহ. থেকেও তাওহিদের সুনির্দিষ্ট কোনো প্রকারভেদ পাওয়া

---

৫১১. আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৮)।

যায় না। কারণ, তাওহিদ একটাই। এর বিভিন্ন প্রকাশ ও উদ্ভাস রয়েছে। সবগুলো প্রকাশ মিলে একক তাওহিদ বাস্তবায়িত হয়। আমরা যদি কুরআনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, আমরা দেখব, কুরআনে তাওহিদের একাধিক প্রকাশ ও প্রকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়।

'রবুবিয়্যাহ' তথা পৃথিবীর সৃষ্টি ও পরিচালনা-সংক্রান্ত তাওহিদ। 'রব' বলতে আল্লাহ পৃথিবীর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা, পরিচালক, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, একমাত্র অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রণকর্তা, একমাত্র আদেশ ও বিধানদাতা। অন্যকথায়, বিশ্বের সবকিছুর সবকিছু আল্লাহ তায়ালা। এ এমন এক চিরন্তন বাস্তবতা, যা মানুষ সহজাত সুস্থ বিবেকবোধের মাধ্যমেও অনুভব করতে পারে। কুরআনের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ অর্থ: 'সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি জগৎসমূহের পালনকর্তা।' [ফাতিহা : ১] আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ অর্থ : 'তাদের রাসুলগণ তাদের বলেছিলেন : আল্লাহ সম্পর্কে কি কোনো সন্দেহ আছে যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা? তিনি তোমাদের আহ্বান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করার জন্য এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেওয়ার জন্য। তারা বলল : তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ! তোমরা আমাদের সেসব উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, যেসবের উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব, তোমরা কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করো।' [ইবরাহিম : ১০]

জীবন, মৃত্যু, পৃথিবী পরিচালনা ও দেখভাল সবকিছু আল্লাহর হাতে। আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ অর্থ : 'আপনি জিজ্ঞাসা করুন, কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন? শোনা ও দেখা কার কর্তৃত্বাধীন? জীবিতকে মৃত থেকে কে বের করেন, আর মৃতকে জীবিত থেকে কে বের করেন? এবং সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা বলবে, আল্লাহ। বলুন, তবুও কি তোমরা (তাকে) ভয় পাবে না?' [ইউনুস : ৩১] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ

كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصۡرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ﴾ অর্থ : 'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে যা মানুষের হিত সাধন করে তাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে আল্লাহ আকাশ থেকে যে বারি বর্ষণের মাধ্যমে ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন, তাতে আর তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে বায়ুর দিক পরিবর্তনে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।' [বাকারা : ১৬৪] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٖ تَرَوۡنَهَاۖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ يُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمۡ تُوقِنُونَ﴾ অর্থ: 'আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছ। এর পর তিনি আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন। সূর্য ও চন্দ্রকে তাঁর আজ্ঞাধীন করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারো।' [রাদ : ২]

পৃথিবীর সবকিছু একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি ঘোষণা করে মানুষের প্রতি আল্লাহ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, ﴿خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ اَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ অর্থ : 'তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছ। তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে এটা তোমাদের নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু। এবং আমিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে এতে উদ্‌গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ। এটা আল্লাহর সৃষ্টি! তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। সীমালঙ্ঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।' [লুকমান : ১০-১১]

তিনিই একমাত্র জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। জীবিতকরণ ও মৃত্যু দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আর কেউ শরিক নেই। আল্লাহ বলেন, ﴿هُوَ ٱلَّذِي يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۖ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ অর্থ : "তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। যখন তিনি কোনো কাজের আদেশ করেন, তখন শুধু বলেন, 'হয়ে যাও', আর তা হয়ে যায়।" [গাফের : ৬৮] উপকার ও অপকারের একমাত্র কর্তা তিনি। আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে বলতে বলেন, ﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ

وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ অর্থ : 'আপনি বলুন, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভালোমন্দের উপরও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম, আর কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা বই আর কিছু নই।' [আরাফ : ১৮৮]

'উলুহিয়্যাহ' তথা আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য স্বীকৃতি দেওয়া-সংক্রান্ত তাওহিদ। অন্যকথায়, একমাত্র তাঁর দাসত্ব এবং তাঁর ইবাদত করা। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ অর্থ : 'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত করো যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা এবং আকাশকে ছাদ করেছেন আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না।' [বাকারা : ২১-২২] পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া আর যা-কিছুর পূজা করা হয়, সেগুলো পূজার উপযুক্ত নয়, বরং একমাত্র আল্লাহ উপাসনার উপযুক্ত। তিনি বলেন, ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ অর্থ: 'আর তারা তাকে ছেড়ে এমন সব মাবুদ গ্রহণ করে নিয়েছে, যারা কোনোকিছু সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি। তারা তাদের নিজেদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না। আর না আছে কারও মৃত্যু ও জীবন দান কিংবা কাউকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা।' [ফুরকান : ৩] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾﴾ অর্থ : 'তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়মাধীন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ

তোমাদের প্রতিপালক। রাজত্ব তাঁরই। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকো, তারা তো খর্জূর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শোনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুত সর্বজ্ঞ (আল্লাহর) মতো তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।' [ফাতির : ১৩-১৪]

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে একমাত্র তাঁর ইবাদত এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, ﴿وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ অর্থ : 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং তাঁরই নিকট সমস্ত কিছুর প্রত্যাবর্তন। সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর উপর নির্ভর করো। তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।' [হুদ : ১২৩] আরও বলেন, ﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ অর্থ : 'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক করো না। পিতা-মাতা, নিকটত্মীয়, এতিম-মিসকিন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথি, মুসাফির এবং নিজেদের দাস-দাসীর প্রতি সদ্‌ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক-উদ্ধতকে পছন্দ করেন না। [নিসা : ৩৬]

'আফআল' তথা আল্লাহর কর্মসমূহে তাকে একক ও অদ্বিতীয় ঘোষণা করা-সংক্রান্ত তাওহিদ। অর্থাৎ পিছনে রবুবিয়্যাহ-সংক্রান্ত যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোও আল্লাহর কর্ম। কিন্তু এগুলোর বাইরেও আল্লাহর এমন কিছু 'কর্মগত' বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলোর ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টি তাঁর সঙ্গে অংশীদার নেই, সদৃশ নেই। যেমন—কুরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা শোনেন, দেখেন, কথা বলেন। তিনি 'ক্রুদ্ধ' হন, 'সন্তুষ্ট' হন, 'ইস্তিওয়া' করেন', 'অবতরণ' করেন, 'আগমন' করেন, 'ভালোবাসেন', 'অপছন্দ' করেন ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ﴾ অর্থ : 'তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।' [বায়্যিনাহ : ৮] আরও

বলেন, ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ অর্থ : "তারা বের হতে ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সে জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত। কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহ অপছন্দ করেছেন। ফলে তিনি তাদের বিরত রাখেন এবং তাদের বলা হলো, 'যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে বসে থাকো।'" [তাওবা : ৪৬] অন্যত্র বলেন, ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ অর্থ : 'আর তোমরা ইনসাফ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।' [হুজুরাত : ৯] এগুলো যদিও শাব্দিক অর্থে মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে, কিন্তু মৌলিকভাবে কোনো সাদৃশ্য নেই। বরং এসব কর্মে আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও অনন্য।

আল্লাহর **'আসমা'** তথা নামসমূহের ক্ষেত্রে তাকে একক ঘোষণা করা, অন্য কাউকে এসব নামের প্রকৃত মর্মের অধিকারী মনে না করা। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ অর্থ : 'তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী যা-কিছু রয়েছে, তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই বন্দেগি করো এবং তাতে অবিচল থাকো। তুমি কি তাঁর সমনাম কাউকে জানো?' [মারইয়াম : ৬৫] আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ অর্থ : 'আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। কাজেই তোমরা তাঁকে সেসব নামে ডাকো। আর যারা তাঁর নামসমূহের ক্ষেত্রে বিকৃত-বক্র পথ অবলম্বন করে, তাদের বর্জন করো; তাদের কৃতকর্মের ফল তাদের দেওয়া হবে।' [আরাফ : ১৮০]

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নিজের বিভিন্ন নাম ঘোষণা করেছেন, যেগুলোর ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আর কেউ শরিক নেই। আল্লাহ বলেন, ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ অর্থ : 'তিনিই প্রথম (আউয়াল)। তিনিই শেষ (আখির)। তিনিই প্রকাশিত (যাহির) তিনিই গুপ্ত (বাতিন)। তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।' [হাদিদ : ৩] সুরা হাশরে আল্লাহ তাঁর বিভিন্ন সুন্দর নাম উল্লেখ করেন এভাবে : ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾ অর্থ : 'তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাত। তিনি দয়াময় (রহমান), পরম দয়ালু (রহিম)। তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি

(মালিক), তিনিই পবিত্র (কুদ্দুস), শান্তিদাতা (সালাম), নিরাপত্তাদাতা (মুমিন), তিনিই রক্ষাকর্তা (মুহাইমিন), তিনিই পরাক্রমশালী (আযিয), তিনি প্রবল ও অসহায়ের সহায় (জাব্বার), তিনিই অতীব মহিমান্বিত (মুতাকাব্বির)। তারা তাঁর সঙ্গে যা-কিছু শরিক স্থির করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ। তিনি সৃষ্টিকর্তা (খালিক), অস্তিত্বদাতা (বারি), রূপদাতা (মুসাওয়ির)। তাঁরই সকল সুন্দর নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় [হাশর : ২২-২৪]

আল্লাহর **'সিফাত'** তথা গুণাবলির ক্ষেত্রে তাঁকে অনন্য ও দৃষ্টান্তহীন বিশ্বাস করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ অর্থ : 'তাঁর মতো কিছু নেই।' [শুরা : ১১] কুরআন কারিমে আল্লাহ তায়ালার এমন অসংখ্য গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ছাড়া আর কেউ যেগুলোর অধিকারী নয়। আল্লাহ তায়ালা 'আয়াতুল কুরসিতে' বলেন, ﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, নিয়ন্ত্রক ও রক্ষাকর্তা (কাইয়ুম)। তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সমস্ত তাঁরই। কে আছে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পশ্চাতে যা-কিছু আছে, সবকিছু সম্পর্কে তিনি অবগত। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর 'কুরসি' আকাশ ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করে আছে। এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সবার উর্ধ্বে, সবার শ্রেষ্ঠ।' [বাকারা : ২৫৫]

জগতের সকল সংকট ও সমস্যার ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁকেই সমাধানস্থল এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেবল তাঁকেই **'হাকিম'** তথা বিধানদাতা মেনে নেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ অর্থ : 'বিধান কেবল আল্লাহরই।' [ইউসুফ : ৪০] আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য সকল বিধানকে আল্লাহ 'জাহেলিয়াত' আখ্যা দিয়ে বলেন, ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ অর্থ : 'তারা কি জাহেলি বিধিবিধান কামনা করে? বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা কে উত্তম বিধায়ক হতে পারে?' [মায়িদা : ৫০] মানুষের মতভেদপূর্ণ সকল বিষয়েও সকল সমাধানদাতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি বলেন, ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ

﴿إِلَى ٱللَّهِ﴾ অর্থ : 'তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো, তার ফয়সালা আল্লাহর নিকট।' [শুরা : ১০] আল্লাহ যেহেতু পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং একমাত্র তাঁর নির্দেশই চলবে পৃথিবীতে। তিনি বলেন, ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ﴾ অর্থ : 'সৃষ্টি ও নির্দেশ (বিধান) তাঁরই।' [আরাফ : ৫৪] আল্লাহর বিধান রেখে অন্য কোনো বিধান যারা পৃথিবীতে প্রয়োগ করবে, আল্লাহ তাদের জালেম, ফাসেক ও কাফের আখ্যা দিয়ে বলেন, ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ অর্থ : 'আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা কাফের।' [মায়িদা : ৪৪] আরও বলেন, ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ অর্থ : 'আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালেম।' [মায়িদা : ৪৫] আরও বলেন, ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾ অর্থ : 'আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা ফাসেক।' [মায়িদা : ৪৭]

এভাবে কুরআনে তাওহিদের একাধিক বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, যা আল্লাহর 'যাত' (সত্তাগত), 'আফআল (কর্মগত), 'আসমা' (নামগত), 'সিফাত' (গুণগত), 'রবুবিয়্যাহ' (সৃষ্টি ও পরিচালনাসংক্রান্ত), 'উলুহিয়্যাহ' (ইবাদত সংক্রান্ত), 'হাকিমিয়্যাহ' (বিধানসংক্রান্ত) সবগুলো ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা করে। তবে আমরা যদি এই সবগুলোকে আরও সংক্ষিপ্ত ও সম্মিলিতভাবে উপস্থাপন করতে যাই, তবে সেটা দুই প্রকারে সীমাবদ্ধ করতে পারি, যেমনটা ইমাম আজমসহ সালাফে সালেহিন করেছেন। এক. রবুবিয়্যাহ, যাতে আল্লাহর পৃথিবী সৃষ্টি, পরিচালনা, তাঁর একক সত্তা, কর্ম, নাম, গুণাবলি সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। দুই. উলুহিয়্যাহ, যাতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং একমাত্র তাঁকে বিধানদাতা হিসেবে মেনে নেওয়া অন্তর্ভুক্ত। **ফলে রবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহ তাওহিদের সকল প্রকাশ ও উদ্ভাসের সারকথা। অন্যান্য সকল প্রকার এই দুটোর অন্তর্ভুক্ত।**

সালাফে সালেহিনের কাছে তাওহিদ কত প্রকার? ইমাম আজম রহ.-এর আকিদা যেহেতু সালাফে সালেহিনের আকিদা, তিনি যেহেতু কুরআন-সুন্নাহ এবং সাহাবাদের আকিদার বিশ্বস্ত ভাষ্যকার, এ জন্য আমরা দেখব, তিনিও তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সবগুলো তাওহিদ সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করেছেন। কুরআন-সুন্নাহর বাইরে গিয়ে কোনো বিশেষ প্রকারভেদের মাঝে তাওহিদকে সীমাবদ্ধ করেননি। আল-ফিকহুল আকবারে তাওহিদ সম্পর্কে ইমাম রহ. বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা**

এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনো বস্তুর মতো নন। আর তাঁর সৃষ্টির কোনো বস্তুও তাঁর মতো নয়।'[৫১২] এটা মূলত কুরআনের সুরা ইখলাসের ব্যাখ্যা। আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ অর্থ : 'আপনি বলুন, আল্লাহ এক। তিনি অমুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। [ইখলাস: ১-৪] ইমাম আজম তাঁর আল-ফিকহুল আবসাতেও 'রবুবিয়্যাত' ও 'উলুহিয়্যাত'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাওহিদকে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রকারে আবদ্ধ করেননি।[৫১৩]

সালাফে সালেহিনের এই নীতি পরের শতাব্দগুলোতেও অব্যাহত থাকে। ফলে আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দে এসেও ইমাম তহাবি রহ.-কে দেখতে পাই একই মানহাজের উপর অবিচল রয়েছেন। ইমাম তহাবি তাঁর আকিদাহ গ্রন্থে তাওহিদের পরিচয় এবং বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেও তাওহিদকে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রকারভেদের মাঝে সীমাবদ্ধ করেননি। তহাবি লিখেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর মতো কিছুই নেই। কোনোকিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি সর্বদাই ছিলেন, তাঁর কোনো শুরু নেই। তিনি সর্বদাই থাকবেন, তাঁর কোনো শেষ নেই। তাঁর কোনো ক্ষয় নেই, লয় নেই। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না। কোনো কল্পনাশক্তি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে না। বোধ-বুদ্ধি তাঁকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে না। সৃষ্টির কোনোকিছুই তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না। তিনি সদা জীবিত, তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি সদা বিদ্যমান রক্ষাকর্তা, নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি রিযিকদাতা; রিযিকদানে কোনো কষ্ট-ক্লান্তি নেই তাঁর। তিনি মৃত্যুদানকারী, নির্ভয়ে মৃত্যু দান করেন। তিনি পুনরুত্থানকারী, বিনাক্লেশে সৃষ্টিকে পুনরুত্থিত করেন।'[৫১৪]

ইমাম তহাবি রহ. আরও বলেন, "সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার আগ থেকেই তিনি সকল গুণের অধিকারী। সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর মাঝে এমন কোনো গুণের সংযোজন ঘটেনি, যা আগে ছিল না। তিনি সর্বদাই নিজের গুণাবলি নিয়ে ছিলেন, সর্বদাই

---

৫১২. আল-ফিকহুল আকবার (১)।

৫১৩. দেখুন : আল-ফিকহুল আবসাত (৫১)।

৫১৪. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (৭-৯)।

তেমন থাকবেন। তাই সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পর থেকে তাঁর নাম 'খালিক' হয়নি, জগৎকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনায় তাঁর নাম 'বারি' হয়নি। প্রতিপালিত (সৃষ্টি) ছাড়াই তিনি প্রতিপালক, সৃষ্টিজগৎ ছাড়াই তিনি সৃষ্টিকর্তা। তিনি মৃতকে জীবনদানকারী; জীবনদানের আগেই তিনি এই নামের অধিকারী ছিলেন। তদ্রূপ সৃষ্টি করার আগেই তিনি সৃষ্টিকর্তা নামের অধিকারী ছিলেন। কারণ, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাশালী। সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী। সব বিষয় তাঁর জন্য সহজ। তিনি কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর মতো কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু দেখেন।"[৫১৫]

ইমাম তহাবির বক্তব্যে সামান্য মনোযোগ দিলেই স্পষ্টভাবে দেখা যাবে, তিনি এখানে আল্লাহর রবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত, তাঁর কর্ম, ইচ্ছা, ফয়সালা, নাম, গুণ—এক কথায়, আল্লাহ-সম্পর্কিত তাওহিদের সক দিককেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিশেষ কোনো প্রকারের মাঝে সীমাবদ্ধ করেননি। সালাফের সকল ইমাম একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আমরা যদি কুরআনের প্রাচীনতম তাফসিরগ্রন্থ তাফসিরে তাবারিতে দৃষ্টিপাত করি, সেখানেও ইমাম তাবারিকে দেখব আল্লাহর রবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতকে একসঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে উল্লেখ করেছেন। সুনির্দিষ্ট কোনো প্রকারভেদ করেননি।

আলি কারি আল-ফিকহুল আকবারের ব্যাখ্যায় লিখেন, 'তাওহিদুর রবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহর চূড়ান্ত ফলাফল হলো আল্লাহর উবুদিয়্যাহ তথা দাসত্বের বাস্তবায়ন। আল্লাহকে চেনার পরে এটাই বান্দার সর্বপ্রথম দায়িত্ব। তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ মেনে নিলে রবুবিয়্যাহ মেনে নেওয়া আবশ্যক। কারণ, ইবাদত কেবল তাঁর জন্যই করা হয় যার ব্যাপারে প্রভুত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিপরীতে রবুবিয়্যাহ মেনে নেওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় উলুহিয়্যাহ বাস্তবায়িত হয় না। কারণ, (শয়তানের ধোঁকা বা বিভিন্ন কারণে) মানুষ আল্লাহকে চেনা সত্ত্বেও অনেক সময় অন্য কিছুর পূজা করে! যেমন—আল্লাহ বলেন, ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ অর্থ : 'জেনে রাখো, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, তারা বলে যে, আমরা তাদের উপাসনা শুধু এ জন্যই করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।' [যুমার: ৩] অর্থাৎ, আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য জানার পরও তারা মূর্তিপূজাকে ওসিলাস্বরূপ গ্রহণ করে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছে। অন্যত্র

---

৫১৫. প্রাগুক্ত (৯-১০)।

আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ অর্থ : 'যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আসমান ও যমিন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ডাকো তারা কি সে ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত ব্যাহত করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীগণ তাঁরই উপর ভরসা করে।' [যুমার : ৩৮] মোটকথা, কুরআনের অধিকাংশ সুরা ও আয়াত উভয় প্রকারের তাওহিদকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই দুই প্রকারের তাওহিদের বর্ণনা ও শানের বাস্তবায়ন।[৫১৬] এভাবে মোল্লা আলি কারি শেষ যুগে এসেও ইমাম আবু হানিফা তথা সালাফে সালেহিনের মূলনীতিতে অবিচল থেকেছেন। তাওহিদকে রবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহর বাইরে কোনো বিশেষ প্রকারে সীমাবদ্ধ করা থেকে বিরত থেকেছেন।

তাওহিদের প্রকারভেদের ক্ষেত্রে খালাফের অতিরঞ্জন : কিন্তু খালাফ তথা পরবর্তী সময়ে মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন ধারার আলেমগণ তাওহিদের প্রকারভেদের ক্ষেত্রে এই 'তাওকিফ' (কুরআন-সুন্নাহ নির্ভরতা)-এর উপর অবিচল থাকেননি, সালাফে সালেহিনের মানহাজ ধরে রাখতে পারেননি। বরং তারা কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফের বক্তব্যের বাইরে গিয়ে ইজতিহাদের মাধ্যমে তাওহিদের বেশ কিছু প্রকার নির্ধারণ করেছেন। কেউ তিন প্রকার, কেউ-বা দুই প্রকার, আবার কেউ চার প্রকার।

প্রশ্ন হতে পারে, যদি এক্ষেত্রে তারা কুরআন-সুন্নাহ ইজতিহাদ করে এসব প্রকার বের করে থাকেন এবং এগুলো ইসলামি আকিদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়, তাহলে জটিলতার তো কিছু নেই। হ্যাঁ, এ কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত হওয়া সম্ভব। যেহেতু বিষয়গুলো ইজতিহাদি এবং শরিয়াহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, তাই তাওহিদকে সহজভাবে বোঝার জন্য উদ্ভাবিত এই প্রকারভেদগুলোতে বড় ধরনের কোনো জটিলতা থাকার কথা ছিল না। কিন্তু জটিলতা তৈরি হয়ে গিয়েছে অন্য একাধিক কারণে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হলো :

---

৫১৬. শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৮-৯)।

এক. যন্নি (ধারণামূলক) প্রকারভেদকে কাতয়ি (চূড়ান্ত ও সুনিশ্চিত)-এর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। ফলে প্রত্যেক ধারা নিজেদের প্রকারভেদকে চূড়ান্ত ও অনিবার্য গণ্য করেছে, অন্যদের প্রকারভেদের সমালোচনা করেছে। প্রত্যেকে নিজেদের প্রকারভেদকে কুরআনের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এবং সালাফে সালেহিনের মানহাজের একমাত্র সঠিক প্রতিনিধি দাবি করেছে; অন্যদেরটা বিভিন্ন যুক্তিতে বাতিল করে দিয়েছে। ফলাফল হলো, এমন একটা বিষয় যা কুরআন-সুন্নাহতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি, সালাফে সালেহিন যে ব্যাপারে কথা বলেননি, একসময় সেটাই মুসলিম উম্মাহর ভেদাভেদের হাতিয়ার হয়ে গেল।

দুই. তাওহিদকেন্দ্রিক ভারসাম্যহীনতা। এই প্রকারভেদ থেকে তৈরি হওয়া আরেকটি বড় জটিলতা হলো তাওহিদকেন্দ্রিক ভারসাম্যহীনতা, বিশেষত কুরআনি তাওহিদের গুরুত্বপূর্ণ দুই প্রকার 'রবুবিয়্যাহ' ও 'উলুহিয়্যাহ'র মাঝে ভারসাম্য বিধানের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হওয়া। কুরআনে রবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহ তাওহিদের অবিচ্ছেদ্য দুই ভিত্তি। ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে কুরআন যেখানে রবুবিয়্যাহর কথা বলেছে, সেখানেই উলুহিয়্যাহ রয়েছে; যেখানে উলুহিয়্যাহর কথা বলেছে, সেখানেই রবুবিয়্যাহ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ অর্থ : 'তবে কে তিনি যিনি অসহায়-আর্তের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদাপদ দূরীভূত করেন, আর পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো <u>ইলাহ</u> আছে কি? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।' [নামল : ৬২] এখানে দেখুন কীভাবে আল্লাহর রবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহকে অবিচ্ছেদ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি রব তিনিই ইলাহ হওয়ার উপযুক্ত। যিনি প্রকৃত ইলাহ তিনি প্রকৃত রবও। আল্লাহ বলেন, ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾﴾ অর্থ : 'তারা কি (আল্লাহর সঙ্গে) এমন কিছু শরিক করে, যা কোনোকিছু সৃষ্টি করতে পারে না? বরং খোদ তারাই সৃষ্টি। আর না তাদের সাহায্য করতে পারে, বরং নিজেদের সাহায্যও করতে পারে না।' [আরাফ : ১৯১-১৯২] এখানে রবের সঙ্গে শিরককে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। কারণ, যিনি রব তিনিই ইলাহ। একজনকে প্রকৃত অর্থে রব মেনে অন্যজনকে ইলাহ বানানো নির্বুদ্ধিতা ও অসুস্থতা। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ

تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ অর্থ : “বলুন, ‘তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ যদি দিবসকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ আছে, যে তোমাদের জন্য রাত্রি এনে দেবে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো? তবুও কি তোমরা চোখ মেলে দেখবে না।’” [কাসাস : ৭২] এখানে ‘ইলাহ’-কে মূলত ‘রব’-এর জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। রবের গুণাবলি ইলাহের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ, রব ও ইলাহ অবিচ্ছেদ্য, ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রথম যুগের ইমামগণ কুরআনের আয়াতগুলোকে এই ভারসাম্যপূর্ণ মানহাজেই ব্যাখ্যা করেছেন। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ইমাম তাবারির (৩১০ হি.) তাফসির। এ গ্রন্থে রবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহকে অঙ্গাঙ্গিভাবে পেশ করা হয়েছে। যেমন—ইমাম তাবারি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ [বাকারা : ১৬৩]-এর তাফসির প্রসঙ্গে বলেন, ‘এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ প্রদান যে, তিনি ছাড়া বিশ্বজগতের আর কোনো প্রতিপালক নেই। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই।’[৫১৭] আরেক আয়াতে তিনি আল্লাহর সামনে সৃষ্টির নতশির হওয়ার বর্ণনা (আলে ইমরান : ৮৩) দিতে গিয়ে বলেন, ‘আকাশ ও যমিনের সবাই তাঁকে মাবুদ বলে স্বীকার করে, তাঁকে একমাত্র রব মেনে তাঁর সামনে মাথা নত করে।’[৫১৮] কুরআনের আয়াত: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ অর্থ : ‘আর তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো। তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক করো না।’ [নিসা : ৩৬]-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম তাবারি লিখেন, ‘তোমরা আল্লাহর রবুবিয়্যাহ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে কাউকে শরিক করো না।’[৫১৯] তাবারি আল্লাহ তায়ালার বাণী : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ অর্থ : ‘আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতোই মানুষ। আমার কাছে ওহি আসে যে, তোমাদের ইলাহ একজন ইলাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর রবের সাক্ষাৎ প্রত্যাশ্যা করে, সে যেন পুণ্য করে, আর তাঁর রবের ইবাদতের সঙ্গে কাউকে শরিক না করে।’ [কাহাফ : ১১০]-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ‘যেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করে। একমাত্র তাঁর জন্য রবুবিয়্যাহ সাব্যস্ত করে।’[৫২০] এগুলো স্রেফ

৫১৭. তাফসিরে তাবারি (২/৭৪৬)।
৫১৮. প্রাগুক্ত (৫/৫৪৯)।
৫১৯. প্রাগুক্ত (৭/৫)।
৫২০. প্রাগুক্ত (১৫/৪৩৯)।

উদাহরণ। নতুবা পুরো তাফসিরে তাবারি একই কর্মপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত—'রবুবিয়্যাহ' ও 'উলুহিয়্যাহ' দুটোর অবিচ্ছেদ্যতা ও ভারসাম্যের দলিল।

এটাই কুরআনের মর্মকথা, সকল সালাফের কর্মপন্থা। এ কারণে ইমাম আবু হানিফা থেকে শুরু করে তহাবি পর্যন্ত—যেমনটা পিছনে দেখানো হয়েছে—সবাই সামগ্রিক তাওহিদের কথা বলেছেন, যেখানে তাওহিদকে প্রকারভেদের মারপ্যাঁচে ফেলে অঙ্গহানি করা হয়নি। সকল দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ একত্ববাদের বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত প্রকারভেদের জটিলতায় তাওহিদের এই ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। একদল উলুহিয়্যাহকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে রবুবিয়্যাহকে গৌণ করে দিয়েছেন; আরেক দল রবুবিয়্যাহকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে উলুহিয়্যাহকে গৌণ করে ফেলেছেন। অথচ দুটো মিলেই তাওহিদ। দুটো তাওহিদের অবিচ্ছেদ্য ভিত্তি।

তিন. তাওহিদের পরবর্তী প্রকারভেদ থেকে সৃষ্ট সবচেয়ে বড় জটিলতা এবং সবচেয়ে ভয়ংকর ফলাফল হলো—তাওহিদের মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি। এ এমন এক বিচ্যুতি, সালাফে সালেহিনের যুগে সম্ভবত কেউ কল্পনাও করেননি। এ প্রকারভেদ তাওহিদের এমন অর্থ এনে দিয়েছে, যে অর্থ সালাফের কেউ করেননি; এমন সমীকরণ টেনেছে, যা ইসলাম ও কুরআনি মেযাজের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

সে বিচ্যুতি হলো রবুবিয়্যাহর মর্মের বিকৃতিসাধন, কাফের-মুশরিকদের মুওয়াহহিদ তথা তাওহিদবাদী সাব্যস্তকরণ। অর্থাৎ, তাওহিদের বিভিন্ন প্রকারভেদ করতে গিয়ে একদল লোক তাওহিদুর রবুবিয়্যাহ বলতে আল্লাহকে স্রেফ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা (এবং ক্ষেত্রবিশেষে পালনকর্তা) বুঝেছে। ফলে তারা ঘোষণা করেছে, মক্কার মুশরিকরা তাওহিদুর রবুবিয়্যাহতে বিশ্বাসী ছিল। কেবল মক্কার মুশরিকরা নয়, বরং দুনিয়ার অধিকাংশ মুশরিকই তাওহিদুর রবুবিয়্যাহতে বিশ্বাসী। রবুবিয়্যাহ অস্বীকারকারী লোক পৃথিবীতে নগণ্য। নবিগণ রবুবিয়্যাহ প্রতিষ্ঠার জন্য আসেননি, বরং তারা স্রেফ উলুহিয়্যাহ প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছেন। রবুবিয়্যাহর বিশেষ কোনো মূল্য নেই, উলুহিয়্যাহই আসল ইত্যাদি।

অথচ এগুলো তাওহিদের মর্মের বিকৃতি। 'রবুবিয়্যাহ' মানে আল্লাহ স্রেফ সৃষ্টিকর্তা নন। তাওহিদুর রবুবিয়্যাহ মানে: সৃষ্টি, রিযিক, প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, জীবন ও মৃত্যুদান, যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণকরণ, উপকার-

অপকারের ক্ষমতা, জগৎ পরিচালনা, ইহকাল ও পরকালের মালিকানা, গোটা সৃষ্টির উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য, আল্লাহর লা-শরিক সত্তা, নামসমূহ ও গুণাবলি সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। ফলে কেউ যদি স্রেফ বলে, 'আল্লাহ বলতে একজন আছেন', অথবা 'সৃষ্টিকর্তা আছেন', অথবা শুধু 'উপরওয়ালা আছেন' ইত্যাদি, তাতেই সে একত্ববাদী হয়ে যাবে—এমনটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। বরং সর্বোচ্চ বলা যায়, সে তাওহিদের একটা ক্ষুদ্রতম অংশে বিশ্বাস করে।

কিন্তু তারা তাওহিদের প্রকারভেদ নির্ধারণ এবং প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করতে গিয়ে ভয়ানক বিকৃতির শিকার হয়েছেন। একদিকে জগতের অধিকাংশ কাফেরকে একত্ববাদী বানিয়ে ফেলেছেন, অপরদিকে মুসলমানদের চোখে রবুবিয়্যাহকে গুরুত্বহীন করে দিয়েছেন। রবুবিয়্যাহকে মুক্তির সনদ হওয়ার ক্ষেত্রে অকার্যকর ও অর্থহীন ঘোষণা করেছেন! অথচ রবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহ দুটোর সম্মিলিত রূপই সকল নবির দাওয়াতের সারকথা। ইহকাল ও পরকালের সাফল্য দুটোর উপর সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত। কুরআনের মাধ্যমে আমরা জেনেছি, আমাদের রুহের জগতে আল্লাহ প্রশ্ন করেছিলেন। আল্লাহ বলেন : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ﴾ অর্থ : "আর যখন আপনার রব বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন এবং নিজের উপর তাদের প্রতিজ্ঞা করালেন, 'আমি কি তোমাদের <u>রব</u> নই?' তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। 'আবার না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু করো যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।'" [আরাফ : ১৭২] এখানে শধু 'রব' উল্লেখ করার অর্থ এটা নয় যে, তিনি কেবল প্রভু হওয়ার ওয়াদা নিয়েছেন, বরং তিনি একইভাবে মাবুদ হওয়ারও অঙ্গীকার নিয়েছেন। কিন্তু রবুবিয়্যাহ যেহেতু উলুহিয়্যাহকেও অন্তর্ভুক্ত করে, এ জন্য আলাদাভাবে 'ইলাহ' কি না সে প্রশ্ন করা হয়নি। একইভাবে কবরের তিনটি প্রশ্নের একটির ব্যাপারে হাদিসে বলা হয়েছে, 'তোমার <u>রব</u> কে?'[৫২১] 'তোমার ইলাহ কে?' বলা হয়নি। তাহলে কি এটা বলা যাবে যে, উলুহিয়্যাহ নিষ্প্রয়োজন? না, মোটেই এমন নয়। বরং 'তোমার রব কে' প্রশ্নের মাঝে 'তোমার ইলাহ কে' এমন অর্থও বিদ্যমান। বরং হাদিসের একাধিক বর্ণনায় 'তোমার রব কে' এটা

---

৫২১. মুসলিম (কিতাবুল জান্নাহ : ২৮৭১)। আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৭৫৩)।

'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই' শব্দে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৫২২] ফলে কুরআন-সুন্নাহর যত জায়গাতে 'রব' বলা হয়েছে, সর্বত্র 'ইলাহ'ও অন্তর্ভুক্ত; আবার যত জায়গাতে 'ইলাহ' বলা হয়েছে, সর্বত্র 'রব' অন্তর্ভুক্ত। কাফের-মুশরিকরা কোনো প্রকারের তাওহিদেই বিশ্বাসী নয়।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে মক্কার মুশরিকরা যে আল্লাহকে জানত ও চিনত এর ব্যাখা কী? ইমাম আজম জবাবে বলেন, **'তারা যদিও বলত আমাদের রব, কিন্তু তারা এ কথার তাৎপর্য বুঝত না। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেন,** ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ **অর্থ : 'আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছেন আকাসমূহ এবং পৃথিবী? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ তায়ালা। আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাদের অধিকাংশই জানে না।।' [লুকমান : ২৫] এখানে আল্লাহর বাণী 'তাদের অধিকাংশই জানে না'-এর মর্ম হলো, তারা যদিও মুখে বলে আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু এটা তারা না বুঝেই বলে। এক্ষেত্রে তাদের উদাহরণ হলো জন্মান্ধ বাচ্চার মতো, যে দিন ও রাতের ব্যাপারে শোনে, লাল ও হলুদ রঙের নাম জানে, কিন্তু এর রূপরেখা সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। কাফেরদের অবস্থাও ঠিক তা-ই। তারা মুমিনদের কাছ থেকে আল্লাহর নাম শুনে নিজেরাও মুখে বলে, কিন্তু আল্লাহকে তারা বিলকুল চেনে না। আর এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,** ﴿إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ﴾ **অর্থ: 'তোমাদের ইলাহ একক ইলাহ। যারা পরজীবনে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা দাম্ভিক।'[৫২৩] [নাহল : ২২]**

ইমাম আজম তাঁর শেষ জীবনের ওসিয়তেও উপরের বিচ্যুতিকে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন, **"কেবল জানার নামই ঈমান নয়। এমন হলে আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা সবাই মুমিন হিসেবে গণ্য হতো। কারণ, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন,** ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ **অর্থ : 'যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা আপনাকে সেভাবে চেনে যেভাবে নিজের**

---

৫২২. বুখারি (কিতাবুল জানায়িয : ১৩৬৯)। মুসলিম (২৮৭১)।

৫২৩. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (৩১)।

সন্তানদের চেনে।' [বাকারা : ১৪৬] তবুও তারা মুমিন নয়। কারণ, তারা জানলেও স্বীকৃতি দেয় না।"[৫২৪]

ফলে রাসুলকে কেবল চেনা-জানার কারণে যদি কাউকে রাসুলে বিশ্বাসী বলা না যায়, তবে তাওহিদের কোনো অংশ সম্পর্কে অবগত কাউকে তাওহিদে বিশ্বাসী কিংবা তাওহিদ স্বীকারকারী বলা যায় কীভাবে? বরং স্রেফ জানার নাম ঈমান তো চরমপন্থি মুরজিয়াদের মাযহাব। সেটাকে আহলে সুন্নাতের মাযহাব নামে প্রচার করা ভয়ংকর ভুল।

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ

ফিতরত আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষী : আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে ফিতরতের উপর সৃষ্টি করেছেন। 'ফিতরত' শব্দের অর্থ হলো 'বিশেষ স্বভাব-প্রকৃতি'র উপর মানুষের সৃষ্টি। এটা মানুষের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ। ফলে মানুষের প্রকৃতি বিকৃতির শিকার না হলে ভালোর প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ থাকে, মন্দের প্রতি বিকর্ষণ থাকে। ঈমানের প্রতি অনুরাগ থাকে, কুফরের প্রতি বিরাগ থাকে।[৫২৫]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًاۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَاۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ অর্থ : 'সুতরাং তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি (ফিতরত) যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' [রুম : ৩০] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'প্রত্যেক নবজাতক ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়।'[৫২৬] এখানে হাদিসের অর্থ এটা নয় যে, প্রত্যেক শিশু ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে, বরং প্রত্যেকে সুস্থ ও সুনির্মল প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহতে ঈমানের প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মাতা-পিতা মুমিন হলে সেও ধীরে ধীরে মুমিন হিসেবে গড়ে ওঠে, আর মাতা-পিতা কাফের হলে তাদের

---

৫২৪. আল-ওয়াসিয়্যাহ, আবু হানিফা (২৭-২৮)

৫২৫. দেখুন : আল-মুফরাদাত ফি গরিবিল কুরআন, রাগেব আস্ফাহানি (৬৪০)।

৫২৬. বুখারি (কিতাবুল জানায়েয : ১৩৮৫)। মুসলিম (কিতাবুল কদর : ২৬৫৮)। আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৭১৪)।

এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাবে সেই শিশুর 'ফিতরত' বিকৃতির শিকার হয়। একসময় সে অন্য ধর্মের অনুসারী হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন আসতে পারে, যদি প্রতিটি শিশু শেষ পর্যন্ত মাতা-পিতার অনুসারীই হয়, তাহলে ফিতরত থাকার উপকারিতা কী? জবাব হলো, ফিতরতের উপর সৃষ্টি মানুষের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহ যদি মানুষকে সরাসরি ঈমান বা কুফরের উপর সৃষ্টি করতেন, তবে সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার মাঝে তাঁর পরীক্ষার 'হিকমত' বিদ্যমান থাকত না। জগতের সকল মানুষ যদি মুমিন হয়ে জন্ম নিত, তবে নবি-রাসুল পাঠানো এবং কিতাব পাঠানোর অর্থ থাকত না; সত্য-মিথ্যার সংগ্রাম থাকত না; তাওহিদ ও শিরকের সংঘাত থাকত না; ঈমানের জন্য পরীক্ষা দিতে হতো না। ফলে চূড়ান্তভাবে জান্নাত পাওয়ারও উপযোগিতা থাকত না। কারণ, ঈমানটা তার অর্জন নয়, আল্লাহর দান পরিগণিত হতো। একইভাবে জগতের সকল মানুষ যদি কাফের হয়ে জন্ম নিত, তবে জাহান্নামের উপযুক্তও হতো না। কারণ, কুফরটা তার অর্জন নয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেওয়া। ফলে সেটা আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের হুজ্জত (দলিল) গণ্য হতো।

আর যদি আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কুফর ও মন্দের প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ দিয়ে সৃষ্টি করতেন, তবে পৃথিবী মানবতাশূন্য হয়ে পড়ত, পাশবিক আচরণে পূর্ণ হয়ে যেত। মানুষের প্রতি মানুষের দরদ থাকত না, মানবিকতা থাকত না। ভালো, সত্য, ইনসাফ ও আমানতের প্রতি মানুষের স্বভাবজাত দুর্বলতা থাকত না। পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ত। শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়াই মানুষ জাহান্নামের পথে ছুটে যেত। ফলে এটা এক ধরনের 'জাবর' তথা অন্যায়ের প্রতি বাধ্যকরণের পর্যায়ে পড়ত।

বাকি থাকল ভালোমন্দ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যমুক্ত একেবারে 'নিরপেক্ষ' ও 'সাদা ফলকের' মতো তৈরি করা; অথবা ভালোর প্রতি, সত্যের প্রতি আকর্ষণ দিয়ে সৃষ্টি করা। দুটোর প্রত্যেকটাই আল্লাহর ইনসাফপূর্ণ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু মানুষের জন্য দুটো সমান ছিল না। কারণ, নিরপেক্ষভাবে তৈরি করলে সত্য ও ভালোর পথে চলা মানুষের জন্য কঠিন হয়ে যেত। ন্যায় ও ইনসাফ বোঝা মানুষের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ত। তাই আল্লাহ মানুষকে সত্যের কাছাকাছি রাখতে, সত্য গ্রহণের পথ সহজ করতে, ইনসাফ ও অনুগ্রহের মাঝে সমন্বয় বিধান করতে মানুষকে 'ফিতরত' তথা ঈমান ও কল্যাণের প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এটা আল্লাহর করুণা, আবার ইনসাফের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক নয়।

ইমাম আজম রহ. বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানকে তাঁর (আদমের) পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেছেন। তাদের জ্ঞান দান করেছেন। তাদের সম্বোধন করে ঈমানের নির্দেশ দিয়েছেন। কুফরি থেকে বারণ করেছেন। তখন তারা আল্লাহর রবুবিয়্যাহকে স্বীকার করে নিয়েছিল। আর এভাবেই তারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল। পরবর্তীকালে আদম সন্তান সেই ফিতরত (ঈমানের প্রস্তুতির) উপরই জন্মলাভ করে। সুতরাং পরে যে কুফরি করল, সে মূলত (তার প্রতিশ্রুতি) বদলে ফেলল। আর যে ঈমান আনল এবং সত্যায়ন করল, সে (প্রতিশ্রুতির উপর) অটল ও অবিচল রইল। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কাউকে কুফর বা ঈমানের উপর বাধ্য করেননি। কিংবা কাউকে মুমিন বা কাফের হিসেবে সৃষ্টি করেননি। বরং সবাইকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ হিসেবে।'[৫২৭] অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে মুমিন কিংবা কাফের অবস্থায় সৃষ্টি করেননি। কিন্তু স্বাভাবিক ফিতরতের উপর থাকলে মানুষ মুমিন হয়। আর যদি ফিতরত বিকৃতির শিকার হয়, তখন সে মানুষ ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

আকল (বিবেক-বোধ) আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষী : ঈমানের প্রতি এই প্রকৃতিসিদ্ধ আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীতে এসে শয়তানের ধোঁকা, প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনা, মাতা-পিতা, পরিবার ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে মানুষের ফিতরত নষ্ট হয়ে যায়। ঈমান ছেড়ে মানুষ কুফরের পথে হাঁটতে থাকতে। তাওহিদ ছেড়ে শিরক ও ইলহাদ তথা নাস্তিক্যবাদের ফাঁদে ফেঁসে যায়। এটা থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ মানুষকে আরেকটি বস্তু দান করেছেন, ফিতরতের চেয়ে যা অতিরিক্ত অথচ ফিতরতের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সেটা হলো মানুষের 'আকল' বা বিবেক-বুদ্ধি। বিকৃতির শিকার না হলে এর মাধ্যমেও মানুষ ভালোমন্দ, সত্য-মিথ্যা, আলো-আঁধার পার্থক্য করার ক্ষেত্রে সহায়তা পেয়ে থাকে। আকলের মাধ্যমে মানুষ ঈমানের দিশা পেতে পারে, কুফর বর্জন করতে পারে। কিন্তু এটাও যেহেতু পারিপার্শ্বিক প্রভাবে বিকৃতির শিকার হয়, আবার অবিকৃত থাকলেও এর মাধ্যমে যেহেতু ঈমান ও কুফরের, ভালো ও মন্দের মাঝে সামগ্রিক পার্থক্য করতে পারলেও চূড়ান্ত পার্থক্য করা যায় না, জীবনের প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর তফসিলি বিধান (শরিয়ত) জানা যায় না, এ জন্য আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুল প্রেরণ করেন। আসমানি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। আর এভাবে মানুষের উপর আল্লাহর হুজ্জত পরিপূর্ণ হয়। এতকিছুর পরও যখন কেউ কুফরের উপর থাকে, তার জন্য ইনসাফপূর্ণভাবেই শাস্তি অনিবার্য হয়।

---

৫২৭. আল-ফিকহুল আকবার (৩-৪)।

ঈমান ও কুফর জানার ক্ষেত্রে আকলের ভূমিকা অপরিসীম। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাঁর অস্তিত্বের উপর আকলি দলিল দিয়েছেন। আল্লাহকে অনুভবের জন্য, কুফর বর্জনের জন্য মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা করতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾﴾ অর্থ : 'তারা কি এমনি এমনি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা? নাকি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো অবিশ্বাসী।' [তুর : ৩৫-৩৬] আরও বলেন, ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ أَمَّن يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ءَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾﴾ অর্থ : 'বলো তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেছেন পানি; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তাতে বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? বরং তারা সত্যবিচ্যুত সম্প্রদায়। বলো তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদনদী প্রবাহিত করেছেন আর তাকে স্থির রাখার জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। বলো তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন আর পৃথিবীতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই স্মরণ করো। বলো তো কে তোমাদের জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং কে তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরিক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। বলো তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান

করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো।' [নামল : ৬০-৬৪] অন্যত্র আল্লাহ মানুষের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, ﴿وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ অর্থ : 'তিনি আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেটা দেখছ। তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে এটা তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকারের জীবজন্তু। আমিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে এতে উদ্গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ। এটা আল্লাহর সৃষ্টি! তিনি ব্যতীত অন্যরা কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও! সীমালঙ্ঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।' [লুকমান: ১০-১১]

এই কুরআনি হেদায়াত অনুসরণ করে ইমাম আজমও আকল তথা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষত নাস্তিক ও অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে তিনি আকলি তথা বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল-প্রমাণের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন, অভিজ্ঞ ছিলেন। বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে তিনি অসংখ্যবার বিভিন্ন নাস্তিক-অবিশ্বাসীকে পরাজিত করেছেন। ঈমানের পথে এনেছেন। এটা সে যুগেও যেমন বাস্তবসম্মত ছিল, আজকের যুগেও বাস্তবসম্মত। সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর বিস্ময়কর নিদর্শনাবলি, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রমাণিত তথ্য-উপাত্ত (ফ্যাক্ট) বিশ্লেষণের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করা, নাস্তিক্যবাদের উপর ঈমানের যৌক্তিকতা তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি কাজ; ইসলামের দাওয়াতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ইমাম আজম রহ. বলেন, **'আল্লাহর উপর ঈমান আনার জন্য নবি-রাসুল পাঠানো জরুরি নয়, বরং মানুষের বিবেক দ্বারাই সেটা সম্ভব। ফলে আল্লাহ যদি কোনো নবি-রাসুল না পাঠাতেন, তবুও বিবেকের কারণে মানুষের উপর তাঁর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব হতো। হ্যাঁ, শরিয়তের বিধিবিধান জানা অপরিহার্য হতো না। কিন্তু আকাশ ও যমিনে বিদ্যমান এত এত নিদর্শন থাকার পরও কেউ যদি এগুলোর সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকৃতি না দিত, তবে নবি-রাসুল না পাঠানো সত্ত্বেও সে রেহাই পেত না।'**[৫২৮]

---

৫২৮. আল-উসুলুল মুনিফাহ (১২)। এ বক্তব্যের মর্ম ও ব্যাখ্যা পিছনে আলোচনা করা হয়েছে।

কেবল কুরআন সুন্নাহ নয়, যুক্তির আলোকে ইমাম আজম রহ. আল্লাহর অস্তিত্বের আবশ্যকতা সাব্যস্ত করতেন এবং সন্দেহবাদীদের খণ্ডন করতেন। আবু ইউসুফ রহ.-এর বর্ণনায় এসেছে, ইমাম বলেন, **'উত্তাল তরঙ্গোদুবেল ও ঝোড়ো সমুদ্রে মালবোঝাই এক জাহাজ কি নাবিক ছাড়া সোজা পথে চলতে পারে? পৃথিবীর যেকোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ বলবে, এটা সম্ভব নয়। নাবিক ছাড়া ঝোড়ো হাওয়ায় মাতাল সমুদ্রে জাহাজ নিজ পথে চলতে পারবে না, ডানে বামে বেঁকে যাবে। ইমাম বলেন, তাহলে এটা কী করে সম্ভব যে, এই পৃথিবীর সবকিছু একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া চলবে? এখানে নিত্যনতুন আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়। দুনিয়ার রূপ বদলায়। নানা বৈচিত্র্যের এই পৃথিবী কী করে একজন সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা ছাড়া টিকে থাকতে পারে? একটি শিশু মায়ের পেট থেকে কোনো তারকা কিংবা প্রকৃতির শক্তিতে বের হয়ে আসে না, বরং পরম প্রজ্ঞাময় সৃষ্টিকর্তার আদেশ ও নির্ধারণে বের হয়ে আসে। পৃথিবীর এত রূপ ও বৈচিত্র্য এত পরিবর্তন এমনিতেই হয় না। এর জন্য একজন পরিবর্তনকারী দরকার। আর তিনিই হলেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা। উন্মুক্ত খাঁখাঁ শূন্য প্রান্তরে হঠাৎ একদিন একটি বিশাল গগনচুম্বী অট্টালিকা দেখলে যেমন বোঝা যায় এটা কেউ বানিয়েছে, এই পৃথিবীর সবকিছুই বুঝিয়ে দেয় এগুলোরও একজন স্রষ্টা রয়েছেন।'**[৫২৯]

বর্ণিত আছে, একদল লোক ইমাম আজমের সঙ্গে আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক করতে চাইল। ইমাম তাদের বলেন, 'বিতর্ক শুরুর আগে তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও : দজলা নদীতে একটি জাহাজ এলো। নিজে নিজেই খাদ্যশস্যে পূর্ণ হলো। অতঃপর নিজে নিজেই গন্তব্যে যাত্রা করল। কারও সাহায্য ও পরিচালনা ছাড়াই জাহাজটি এসব কাজ নিজে নিজে করল। এটা কী করে সম্ভব?' তারা বলল, এটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। ইমাম বললেন, 'যদি একটা জাহাজের বেলায় এটা সম্ভব না হয়, এত বিশাল পৃথিবীর ব্যাপারে কী করে সম্ভব?'[৫৩০]

কামালুদ্দিন বায়াযি আবু মুহাম্মাদ হারেসির 'আল-কাশফ', আতা জুযজানির 'শরহুল ফিকহিল আবসাত', বাযযাযির 'আল-মানাকিবুস সুগরা' ও সারিমুদ্দিন মিসরির 'নাজমুল জুমান' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'ইমাম আজম রহ. আল্লাহর অস্তিত্বের আরেকটি যুক্তি দেন এভাবে—পৃথিবীতে বিদ্যমান 'জাওহার' (মৌল)

---

৫২৯. আল-উসুলুল মুনিফাহ (১২)।

৫৩০. শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৮)।

ও 'আরাজ' (অমৌল; রূপ-রং)সহ সকল বস্তু এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় নিত্য পরিবর্তনশীল। অথচ প্রত্যেকটি পরিবর্তনের জন্য একজন পরিবর্তনকারী আবশ্যক। আর পৃথিবীর সেই পরিবর্তনকারী হলেন পৃথিবীর স্রষ্টা।'[৫৩১]

বায়াযি আবু শাকুর সালেমির উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, 'ইমাম আজম রহ. আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে আরও একটি যুক্তি দিয়েছেন গর্ভস্থ ভ্রূণের মাধ্যমে। ইমামের মতে, মায়ের গর্ভে একটি ভ্রূণের পূর্ণ অবয়ব লাভ এবং পরবর্তীকালে সুন্দর আকৃতিতে পৃথিবীতে তার আগমন তারকা কিংবা প্রকৃতির প্রভাবে হতে পারে না। বরং এর পিছনে একজন সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিনৈপুণ্য রয়েছে।'[৫৩২]

এটা ছিল সে যুগের আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের তরিকা, যা বর্তমান সময়েও প্রযোজ্য। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টিতে এত বিস্ময়কর নিদর্শন দেখাচ্ছে, যা সন্দেহাতীতভাবে একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। এলোপাতাড়ি কিংবা হঠাৎ বিস্ফোরণের ফল স্রেফ বিশৃঙ্খলা। অথচ গোটা মহাবিশ্বের ভাঁজে ভাঁজে এক অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও নিপুণতার সমুজ্জ্বল ছাপ সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ অর্থ : 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ডরূপে সৃষ্টি করি। অতঃপর রক্তকে মাংসপিণ্ডরূপে সৃষ্টি করি। অতঃপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করি। অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করি। অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করাই। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মহা কল্যাণময়।' [মুমিনুন : ১২-১৪] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) হাদিসে বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেককে মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত (সৃষ্টির উপাদানরূপে) সংগৃহীত করা হয়। অতঃপর তা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। অতঃপর মাংসপিণ্ডে। এরপর আল্লাহ তার কাছে চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে একজন ফেরেশতা পাঠান। ফেরেশতা তার আমল, জীবনকাল, রিযিক এবং সে

---

৫৩১. ইশারাতুল মারাম (৯৩)।

৫৩২. প্রাগুক্ত (৯২)।

সৌভাগ্যবান হবে নাকি দুর্ভাগা, সেটা লিখে রাখেন। অতঃপর তার মাঝে রুহ ফুঁকে দেওয়া হয়।'[৫৩৩]

ইমাম আল্লাহর অস্তিত্বের আরও একটি প্রমাণ দিচ্ছেন, **"পৃথিবীতে আল্লাহ অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন মানুষের কাছে তাঁকে চেনানোর জন্য, তাঁর সঙ্গে মেলানোর জন্য। । ফলে পৃথিবীতে এসে তারা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, নবি-রাসুলের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে চেনেনি, বরং আল্লাহর মাধ্যমে নবি রাসুল চিনেছে। কারণ, যখন নবি-রাসুলগণ এসে মানুষের কাছে আল্লাহর কথা তুলে ধরেন, তখন তাদের কথা সত্য নাকি মিথ্যা সেটা মানুষের বোঝার সাধ্য ছিল না। আল্লাহই মানুষের হৃদয়ে নবিদের প্রতি ঈমান ও সত্যায়ন ঢেলে দিয়েছেন, ফলে মানুষ ঈমান এনেছে। আল্লাহ বলেন,** ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ **অর্থ : 'আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকে হেদায়াত দিতে পারবেন না, বরং আল্লাহ তায়ালাই যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দেন। কে হেদায়াত পাবে সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।'" [কাসাস : ৫৬]**[৫৩৪]

এভাবে ইমাম আল্লাহ এবং মানুষের মাঝে এমন একটা সম্পর্ক তুলে ধরেছেন, যা বিরল ও গভীর, যে সম্পর্কের সূচনা সৃষ্টির সূচনা ও রুহের জগৎ থেকে। এ সম্পর্কের মূল কথা হলো, মানুষ যত দূরেই যাক, যত বদলাক, আল্লাহকে সে ভুলতে পারবে না। আল্লাহকে সে অস্বীকার করতে পারবে না। নবি-রাসুলগণ না আসুক, মানুষের কাছে কুরআন কিংবা কোনো আসমানি কিতাব অবতীর্ণ না হোক, কোনো দাওয়াত না পৌঁছাক, তবুও সে আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারবে না।

আল্লাহ ও মানুষের মাঝে ইমাম যে সম্পর্কের কথা বলেছেন, সে সম্পর্ক অনেকের বোধগম্য না হওয়ার কারণে ইমামের কথার বিরোধিতা করেছে। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, ইমামের কথা বোঝার জন্য সামান্য কোশেশ করলে তারা বিরোধিতা করত না। কারণ, খোদ কুরআন ইমামের কথার সাক্ষী। আল্লাহ বলেন, ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ অর্থ : 'তাদের রাসুলগণ তাদের বলেছিলেন :

---

৫৩৩. বুখারি (কিতাবুত তাওহিদ : ৭৪৫২)। মুসলিম (কিতাবুল কদর : ২৬৪৩)।

৫৩৪. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (৩১-৩২)।

আল্লাহ সম্পর্কে কি কোনো সন্দেহ আছে যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা? তিনি তোমাদের আহ্বান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করার জন্য এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেওয়ার জন্য। তারা বলল : তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ! তোমরা আমাদের সেসব উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও যার উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব, তোমরা কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করো।' [ইবরাহিম : ১০] অর্থাৎ, আসমান ও যমিন এমনিতে সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে না। এই সুন্দর ও সুশৃঙ্খল জগৎ এমনিতেই চলতে পারে না। মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বস্তুর একজন সৃষ্টিকর্তা প্রয়োজন হয়, এমনিতেই অস্তিত্বে আসে না। সেখানে এ বিশাল মহাবিশ্ব এমনিতেই সৃষ্টি হয়ে গেছে? এমনিতেই চলছে? কখনোই নয়। সুতরাং এ সবকিছু আল্লাহর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ। অন্যকথায়, আল্লাহর অস্তিত্ব বোঝার জন্য সুস্থ বিবেকই যথেষ্ট; কুরআন-হাদিস, নবি-রাসুল ছাড়াই এটা বোঝা যায়।

নাস্তিকদের সঙ্গে ইমামের বিতর্ক : ইমাম বিভিন্ন সময় নাস্তিকদের সঙ্গে বিতর্ক করতেন। যুক্তির মাধ্যমে তাদের পরাস্ত করতেন। এমন একটি ঘটনা সমরকন্দি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, একবার ইমাম আবু হানিফা রহ. এক নাস্তিক (দাহরি) লোকের সাথে বিতর্কে বসলেন। নাস্তিক বলল, পৃথিবীতে যাবতীয় বস্তুর পরিবর্তন স্রষ্টার কারণে নয়, বরং এর চারটি মৌল প্রকৃতি তথা আর্দ্রতা, শুষ্কতা, শীতলতা ও তাপের কারণে হয়। যখন এই চারটি মৌল পদার্থ বরাবর ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে, তখন সেই ব্যক্তি বা বস্তুও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে। যখন একটি পদার্থ অন্যগুলোর উপর বিজয়ী হয় (ছাড়িয়ে যায়), তখন ভারসাম্য নষ্ট হয়। ইমাম আবু হানিফা রহ. বললেন, 'স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে গিয়ে তোমার এ কথার মাধ্যমে নিজেই স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুটোকেই প্রমাণ করে দিলে। কারণ, তুমি স্বীকার করলে, একটি পদার্থ অন্যগুলোর উপর বিজয়ী হয়। অন্যগুলো পরাজিত হয়। এর মানে, পৃথিবীতে জয়ী ও পরাজিতের অস্তিত্ব আছে। একইভাবে গোটা পৃথিবীর উপর একজন জয়ী আছেন। আর তিনি হলেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। এ কথা শুনে নাস্তিক ঈমান গ্রহণ করল।[৫৩৫]

বরং নাস্তিক্যবাদ ও নাস্তিকদের (দাহরিয়্যিনের) বিরুদ্ধে তাঁর অব্যাহত সংগ্রামের কারণে তিনি তাদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। তারা তাঁকে হত্যার সুযোগ খুঁজতে থাকে। ঘটনাক্রমে একদিন ইমাম তাঁর মসজিদে একা ছিলেন। তখন একদল

---

৫৩৫. শরহুল ফিকহিল আকবার, সমরকন্দি (৪৪)।

দাহরিয়্যিন তাঁর উপর তরবারি ও ছুরি নিয়ে আক্রমণ করে। তারা তাঁকে হত্যার উপক্রম করে। তখন ইমাম তাদের বলেন, 'একটু সবর করো! আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যা মন চায় করো।' তারা বলল, কী প্রশ্ন? তিনি বললেন, 'সে ব্যক্তির ব্যাপারে তোমাদের কী বক্তব্য যে বলে, আমি তরঙ্গোদ্‌বেল সমুদ্রে একটি মালবোঝাই জাহাজ দেখেছি যেটা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ও ঝোড়ো হাওয়ার মাঝেও ডানে-বামে না গিয়ে সোজা ধীর-স্থিরভাবে চলছে। অথচ তাতে কোনো মাঝিমাল্লা নেই। পাল-মাস্তুল নেই। এই কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?' তারা বলল, কখনো নয়। এটা কোনো যৌক্তিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক কথা নয়। ইমাম বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! মাঝিমাল্লাবিহীন একটি নৌকা যদি সমুদ্রে সোজাভাবে চলতে না পারে, তবে এই বিশাল পৃথিবী, পৃথিবীতে বিদ্যমান এত রং ও রূপ, এত সৃষ্টি ও বৈচিত্র্য—এগুলো সব কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এমনিতেই অস্তিত্বে চলে এসেছে? কোনো রক্ষাকর্তা ছাড়া এমনিতেই বিদ্যমান রয়েছে?' ইমামের কথা হামলাকারীদের মনে দারুণ প্রভাব ফেলল। তারা সকলে কাঁদতে কাঁদতে ইমামকে বলল, আপনি সত্য বলেছেন। অতঃপর তারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে ইমামের হাতে তাদের গোমরাহি থেকে তাওবা করল।[৫৩৬]

আল্লাহর আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলি)

মহান আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য সুন্দর নামের অধিকারী। তিনি বলেন, ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ অর্থ : 'আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। কাজেই তোমরা তাঁকে সেসব নামে ডাকো।' [আরাফ : ১৮০] হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলো আত্মস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৫৩৭]

আর ভাষার ক্ষেত্রে যেহেতু মূল হলো 'তাওকিফ' তথা আল্লাহপ্রদত্ত, যেমনটা তিনি বলেছেন— ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ

---

৫৩৬. মানাকিব, মক্কি (১৫১)।

৫৩৭) বুখারি (কিতাবুশ শুরুত : ২৭৩৬)। মুসলিম (কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া ওয়াত তাওবা : ২৬৭৭)। যদিও এখানে আল্লাহর নামের সংখ্যা নিরানব্বইটি বলা হয়েছে। তথাপি এর দ্বারা নিরানব্বইয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, বিভিন্ন হাদিস দেখলে বোঝা যায়, আল্লাহর আরও অনেক নাম আছে যা তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন, সৃষ্টিকে জানাননি। ফলে আল্লাহর নামের প্রকৃত সংখ্যা কত তা আমরা জানি না। [দেখুন : তালবিসুল আদিল্লাহ ৩৭০]।

هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ অর্থ : "তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর সেই সমুদয় ফেরেশতাদের সামনে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'" [বাকারা : ৩১] এ কারণে আহলে সুন্নাতের মতে, আল্লাহর তায়ালার নামগুলো 'তাওকিফিয়্যাহ'; অর্থাৎ, আল্লাহ নিজের উপর প্রয়োগ করেননি অথবা রাসুল (ﷺ) বলেননি এমন কোনো নাম মানুষের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য নির্ধারণ করা বৈধ নয়।[৫৩৮]

ফলে সমার্থক হলেও কুরআন-সুন্নাহতে আসেনি এমন নাম আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন 'জাওয়াদ' (দাতা) ও 'আলেম' (জ্ঞানী) আল্লাহর নাম। কিন্তু এর পরিবর্তে 'সাখি' (দাতা), 'ফাযিল' (জ্ঞানী) ব্যবহার করা যাবে না। একইভাবে 'রহিম' (দয়ালু) আল্লাহর নাম। কিন্তু এর জায়গায় 'শফিক' (দয়ালু) ব্যবহার করা যাবে না। মোটকথা, অর্থ ঠিক থাকলেই আল্লাহর নাম সাব্যস্ত করা যাবে না, কিংবা এক নামের জায়গায় সমার্থক শব্দকে নাম বানানো যাবে না। কুরআনে ব্যবহৃত আল্লাহর গুণবাচক শব্দ অভিধানে খুঁজে সেসব অর্থ আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা যাবে না। পুরো ব্যাপারটা শতভাগ কুরআন-সুন্নাহর উপর নির্ভরশীল থাকবে।[৫৩৯]

আল্লাহর নামসমূহের সঙ্গে সৃষ্টির নামের কোনো তুলনা নেই। বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও অর্থের গভীরতা ও বাস্তবতার সঙ্গে সৃষ্টির সাদৃশ্য নেই। ফলে আল্লাহর নামগুলোর আল্লাহর ক্ষেত্রে যে অর্থ থাকবে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে সে অর্থ থাকবে না। যেমন—আল্লাহর নাম 'খালিক' তথা সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা। আল্লাহর নাম 'রহিম' তথা দয়ালু, 'কারিম' তথা মেহেরবান, 'আলিম' তথা জ্ঞানী। এসব নাম সৃষ্টির উপরও প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে এগুলোর যে গভীর ও মৌলিক অর্থ থাকে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেটা কখনোই বিশ্বাস রাখা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا﴾ অর্থ : 'তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী যা-কিছু রয়েছে তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই বন্দেগি করো এবং তাতে অবিচল থাকো। তুমি কি তাঁর সমনাম কাউকে জানো।' [মারইয়াম : ৬৫] অথচ বাস্তবে দেখা যায়, তাঁর নামের মতো নাম অনেক মানুষেরও আছে। ফলে আয়াতের মর্ম হলো, যদিও মানুষ সেসব

---

৫৩৮) দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২২৬)। তালখিসুল আদিল্লাহ (৩৭১)।
৫৩৯) দেখুন : আস-সাহায়িফুল ইলাহিয়্যাহ (৩৯৯)।

নাম ধারণ করে, কিন্তু সেটা রূপক অর্থে। সেসব নাম পূর্ণাঙ্গ অর্থে ধারণ করার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তায়ালা। তাঁর শানেই সেগুলো শোভনীয়।[৫৪০]

একইভাবে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য **সুন্দর গুণের** অধিকারী। সেগুলোকে সাতটি কিংবা কোনো বিশেষ সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা সঠিক নয়। বরং যাবতীয় সকল জামাল ও কামাল তথা সৌন্দর্য ও পূর্ণাঙ্গতার আধার তিনি। তাঁর সত্তার মতো তাঁর গুণাবলিও চিরন্তন, চিরস্থায়ী। তিনি শুরু থেকেই এসব গুণে গুণান্বিত। সবসময় গুণান্বিত থাকবেন। সৃষ্টির কোনোকিছু যেমন তাঁর সত্তার সাদৃশ্য রাখে না, তেমনই সৃষ্টির কোনো গুণ তাঁর গুণের সাদৃশ্য রাখে না। আল্লাহর গুণকে সৃষ্টির গুণের সঙ্গে সাদৃশ্য করা কুফর। তেমনই কুরআন ও সুন্নাহতে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত আল্লাহর গুণগুলো অস্বীকার করাও কুফর।

মুসলমানদের বিভিন্ন ফিরকা এক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়েছে। কারামেতাহ, জাহমিয়্যাহ এবং একদল ফালাসিফাহ (দার্শনিক) আল্লাহর সকল সিফাতকে অস্বীকার করেছে। এর মূল কারণ সাদৃশ্যের আশঙ্কা। আল্লাহকে সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা দেওয়া হবে—এই ভয়ে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব, জীবন, জ্ঞান, সর্বশক্তি সবকিছু অস্বীকার করেছে। একদল ফালাসিফাহ ও বাতেনিদের দাবি, আল্লাহকে কোনো নাম দেওয়া যাবে না। তাঁর উপর কোনো সিফাত প্রয়োগ করা যাবে না। তিনি বিদ্যমান নাকি বিদ্যমান নন, তিনি শক্তিশালী কিংবা শক্তিশালী নন—কিছুই বলা যাবে না। একদল মুতাযিলা আরেক নতুন ব্যাখ্যা হাজির করেছে। তারা বলেছে, আল্লাহর উপর কোনো সিফাত প্রয়োগ করা যাবে না, কিন্তু বিপরীতটা নাকচ করা হবে। অর্থাৎ, তারা বলে, আল্লাহ জীবিত। কিন্তু তাদের কাছে এর অর্থ মৃত্যুকে নাকচ করা (সরাসরি জীবন সাব্যস্ত করা নয়)। তারা বলে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। কিন্তু এর অর্থ স্রেফ অক্ষমতাকে নাকচ করা (সরাসরি 'শক্তি' গুণ সাব্যস্ত করা নয়)। আল্লাহর নাম ও গুণাবলিকেন্দ্রিক এসব বিভ্রান্তির কারণেই আমাদের ইমামগণ এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন; এক্ষেত্রে সৃষ্ট বিচ্যুতি খণ্ডন করেছেন।[৫৪১]

আল-ফিকহুল আকবারে ইমাম আজম রহ. বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি।**

---

৫৪০. তালবিসুল আদিল্লাহ (৩৪১-৩৪২)।

৫৪১. দেখুন : লুবাবুল কালাম, উসমান্দি (পাণ্ডুলিপি : ৪৮)।

কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনো বস্তুর মতো নন। তাঁর সৃষ্টির কোনো বস্তুও তাঁর মতো নয়।'[৫৪২] এটা মূলত কুরআনের সুরা ইখলাসের ব্যাখ্যা। আল্লাহ বলেন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ অর্থ : 'আপনি বলুন আল্লাহ এক। তিনি অমুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।' [ইখলাস : ১-৪]

ইমামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহকে মানি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তাঁর সন্তান আছে। তখন কী হবে? ইমাম বললেন : **'সুবহানাল্লাহ! এটা কীভাবে সম্ভব? এগুলো তো সব বেহুদা প্রশ্ন। মৃত ব্যক্তির কি স্বপ্নদোষ হয়? যদি মৃত ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হয় এমন বলা না যায়, তবে কোনো একত্ববাদীর পক্ষে এটা বলা সম্ভব নয় যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে।'**[৫৪৩] উদাহরণটা মূলত বিষয়টির কদর্যতা বোঝাতে আনা হয়েছে। আল্লাহর সন্তান রয়েছে—এমন কদর্য কথা আর হয় না।

আমরা যদি সিফাতের ক্ষেত্রে ইমামের মানহাজের দিকে তাকাই, তবে দেখব, সেটা সালাফে সালেহিনের মানহাজ। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িন যে আকিদার উপর ছিলেন, ইমাম আজম রহ. একজন তাবেয়ি হিসেবে সেই আকিদার উপরই ছিলেন। তারা আল্লাহর সিফাতগুলোকে সাব্যস্ত করার নামে আল্লাহকে মানুষের মতো কল্পনা করেননি, যেমনটা করেছে মুজাসসিমাহ (দেহবাদী) ও মুশাব্বিহাহ (সাদৃশ্যবাদী) সম্প্রদায়। আবার সরাসরি কিংবা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সেগুলো নাকচও করে দেননি, যেমন করেছে মুতাযিলা ও জাহমিয়্যাহরা; বরং কুরআন সুন্নাহতে যেভাবে এসেছে সেভাবেই রেখে দিয়েছেন। ইমাম বলেন, **'আমরা আল্লাহকে সেভাবে চিনি যেভাবে তাঁকে চেনা উচিত, যাবতীয় গুণসহ যেভাবে তিনি নিজেকে স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন।'**[৫৪৪]

আল্লাহর সিফাতের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো—এগুলো চিরন্তন, অনাদি (আযালি), পরবর্তীকালে তৈরি হওয়া নয়। ইমাম বলেন, **'আল্লাহ তায়ালার গুণসমূহ চিরন্তন। পরবর্তীকালে অস্তিত্বে এসেছে এমন নয়, সৃষ্টও নয়।**

---

৫৪২. আল-ফিকহুল আকবার (১)।

৫৪৩. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২১)।

৫৪৪. আল-ফিকহুল আকবার (৬)।

সুতরাং যে বলবে, আল্লাহর গুণসমূহ সৃষ্ট, কিংবা পরবর্তীকালে অস্তিত্বে এসেছে, কিংবা এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করবে অথবা সন্দেহ করবে, সে যেন আল্লাহ তায়ালাকেই অস্বীকার (কুফর) করল।'[৫৪৫]

কারণ আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির মতো নন। সৃষ্টির গুণ অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। একসময় থাকে না, পরে আসে। আবার একসময় থাকে, পরে থাকে না। এর কারণ মানুষ নিজেও ক্ষণস্থায়ী, দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ। বিপরীতে আল্লাহ তায়ালা চিরন্তন, পরিপূর্ণ। কোনো অপূর্ণতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ফলে তিনিই যেহেতু শুরু, ফলে তাঁর সিফাতগুলোও আযালি তথা শুরু থেকেই তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান। নামগুলোও তা-ই। তাঁর নাম ও গুণাবলির কোনোকিছুই পরবর্তীকালে অস্তিত্বে আসেনি। কারণ, পরবর্তীকালে অস্তিত্বে এলে এর অর্থ হবে, সেটা অস্তিত্ব আসার আগে তিনি অপূর্ণ ছিলেন। অথচ আল্লাহ সব ধরনের অপূর্ণতার ঊর্ধ্বে। তাই তাঁর সকল নাম ও গুণ তাঁর সত্তার মতোই চিরন্তন, অনাদি ও অনন্ত।

আবু সালামাহ সমরকন্দি লিখেন, 'আল্লাহ তায়ালা এক। তিনি অনাদিতে যেসব গুণে নিজেকে অভিষিক্ত করেছেন, সেগুলোতে বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। সেগুলোকে নাকচ করা যাবে না। তিনি আগে যেমন ছিলেন, পরেও তেমনই থাকবেন। তিনি সকল সাদৃশ্য ও তুলনার ঊর্ধ্বে। সত্তা ও সিফাত কোনোকিছুতে তিনি সৃষ্টির মতো নন, সৃষ্টি তাঁর মতো নয়। তাকে বুঝ-বুদ্ধি, কল্পনা-জল্পনা ধারণ করতে পারে না। তাঁর মতো কিছু নেই। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।'[৫৪৬]

ইমাম আজম বলেন, **"আল্লাহ তায়ালা তাঁর নামসমূহ এবং তাঁর সত্তাগত ও কর্মগত গুণাবলিতে সতত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর কোনো নাম বা গুণ পরবর্তীকালে অস্তিত্বে আসেনি। তাঁর সত্তাগত গুণাবলি হচ্ছে : 'হায়াত' (জীবন), 'কুদরত' (শক্তি), 'ইলম' (জ্ঞান), 'কালাম' (বাণী), 'সামঅ' (শ্রবণ), 'বাসার' (দর্শন) এবং 'ইরাদা' (ইচ্ছা)। আর তাঁর কর্মগত গুণাবলি হচ্ছে : 'তাখলিক' (সৃষ্টি করা), 'তারযিক' (রিযিক দেওয়া), 'ইনশা' (সূচনা করা), 'ইবদা' (উদ্ভাবন করা) ও 'সুনউ' (তৈরি করা) ইত্যাদি।"**[৫৪৭] এসব সিফাতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো :

---

৫৪৫. প্রাগুক্ত (১-২)।

৫৪৬. জুমাল মিন উসুলিদ্দিন (১৪-১৫)।

৫৪৭. আল-ফিকহুল আকবার (১)।

○ **'হায়াত'** (জীবন) হলো আল্লাহর অনাদি ও অনন্ত শাশ্বত একটি সিফাত। তিনি সর্বদা এ গুণে গুণান্বিত ছিলেন ও থাকবেন। কারণ, তাঁর কোনো শুরু নেই, শেষ নেই। তাঁর ধ্বংস নেই, লয় নেই, ক্ষয় নেই। এমন কোনো সময় ছিল না যখন তিনি ছিলেন না। এমন কোনো সময় আসবে না যখন তিনি থাকবেন না। বরং তিনি সময়ের ঊর্ধ্বে। সময় তাঁর সৃষ্টি মাত্র। তিনি চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী। আল্লাহ তায়ালা আয়াতুল কুরসিতে বলেন, ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব। সদা বিদ্যমান রক্ষাকর্তা (কাইয়ুম)।' [বাকারা : ২৫৫] আরও বলেন, ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব। পূর্ণ নিয়ন্ত্রক রক্ষাকর্তা।' [আলে ইমরান : ২] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ অর্থ : 'আর আপনি ভরসা করুন সেই চিরঞ্জীব সত্তার উপর যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না।' [ফুরকান : ৫৮]

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, আল্লাহ জীবনের অধিকারী, চিরঞ্জীব। কিন্তু তাঁর রুহ আছে—এ কথা বলা যাবে না। কারণ, রুহ নিজে একটি সৃষ্টি, আল্লাহর নির্দেশ। জীবিত প্রাণীকুল এর মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ সবকিছুর অমুখাপেক্ষী। ফলে তাঁকে 'রুহানি' (রুহবিশিষ্ট) বলা যাবে না। কুরআন-সুন্নাহতে আল্লাহর শানে এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করা হয়নি।[৫৪৮] কাসানি লিখেন, 'আল্লাহ রুহ ছাড়াই জীবিত।'[৫৪৯]

○ **'কুদরত'** (শক্তি-সামর্থ্য) আল্লাহ তায়ালার একটি চিরন্তন সিফাত। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। সর্বশক্তিমান। তিনি যখন কিছু করেন, তখন তাঁর চিরন্তন 'কুদরত'-এর মাধ্যমে করেন। সৃষ্টির মতো তাঁর মাঝে নতুন কোনো গুণ সৃষ্টি হয় না। তাঁর কিছু করতে কোনো উপায়-উপকরণ দরকার হয় না। বিপরীতে আমরা সবকিছু করতে পারি না। যেগুলো করতে পারি, সেগুলোর ক্ষেত্রেও বিভিন্ন উপায়-উপকরণের প্রতি আমরা মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾ অর্থ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।' [বাকারা : ২০] অন্যত্র বলেন, ﴿قُلۡ هُوَ ٱلۡقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبۡعَثَ عَلَيۡكُمۡ عَذَابٗا مِّن فَوۡقِكُمۡ أَوۡ مِن تَحۡتِ أَرۡجُلِكُمۡ

---

৫৪৮. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২৩২)। তালখিসুল আদিল্লাহ (২৬১)।
৫৪৯. আল-মুতামাদ ফিল মুতাকাদ (৬)।

﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ অর্থ : 'বলুন, তিনি (আল্লাহ) সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান, তোমাদের উপর কোনো শাস্তি উপর দিক থেকে, অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন, অথবা তোমাদের দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখি করে দেবেন এবং এককে অন্যের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। দেখুন আমি কীভাবে বিভিন্ন পন্থায় স্বীয় নিদর্শনাবলি বর্ণনা করছি যাতে তারা বুঝতে সক্ষম হয়।' [আনআম : ৬৫] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ অর্থ : (তারা থাকবে) 'উপযুক্ত আসনে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহর সান্নিধ্যে।' [কামার : ৫৫]

ইমাম তহাবি বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা দোয়া কবুল করেন। প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তিনিই সবকিছুর মালিক। কেউ তাঁর মালিক নন। এক মুহূর্তও তাঁর অমুখাপেক্ষী হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি নিজেকে এক মুহূর্তও আল্লাহ থেকে অমুখাপেক্ষী ভাববে, সে কাফের এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'[৫৫০]

○ **'ইলম'** (জ্ঞান) আল্লাহ তায়ালার অবিনশ্বর সিফাত (গুণ)। তিনি সবকিছু জানেন। গোটা বিশ্বচরাচরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের তফসিলি জ্ঞান রাখেন। গোপন ও প্রকাশ্য, বিদ্যমান ও অবিদ্যমান, সম্ভব ও অসম্ভব—সবকিছু সম্পর্কে সবিস্তার জানেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে। এরপর শুক্রবিন্দু হতে। এরপর তোমাদের করেছেন যুগল! আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তার আয়ু হ্রাস করা হয় না কিন্তু তা সবকিছু রয়েছে 'কিতাবে।' নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য সহজ।' [ফাতির : ১১] আরও বলেন, ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ অর্থ : 'তিনি (আল্লাহ) তাদের সামনে ও পশ্চাতে যা-কিছু আছে সবকিছু সম্পর্কে অবগত। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যাতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না।' [বাকারা : ২৫৫] অন্যত্র আল্লাহ তাঁর জ্ঞানের অসীমতা বিস্ময়ভাবে তুলে ধরেন এভাবে, ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ অর্থ : 'অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই কাছে। তিনি

৫৫০. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৮)।

ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা-কিছু আছে, তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণা অঙ্কুরিত হয় না বা আর্দ্র কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।' [আনআম : ৫৯] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ অর্থ : 'কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন মাতৃগর্ভে কী আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী কামাই করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ। সর্ব বিষয়ে অবহিত।' [লুকমান : ৩৪]

ইমাম বলেন, **"আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান পরিপূর্ণ এবং সবকিছু পরিবেষ্টনকারী। আল্লাহ তায়ালা অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্বহীন অবস্থায় জানেন। অস্তিত্বে আনলে সেটা কীরূপ হবে তাও তিনি জানেন। আল্লাহ তায়ালা অস্তিত্বময় বস্তুকে অস্তিত্বে থাকা অবস্থাতে জানেন। সেটা বিলুপ্ত হয়ে গেলে কীরূপ হবে তাও তিনি জানেন। আল্লাহ তায়ালা দণ্ডায়মান বস্তুকে দণ্ডায়মান অবস্থাতে দণ্ডায়মান হিসেবে জানেন। যখন সেটা বসবে, তখন তিনি সেটাকে উপবিষ্ট অবস্থাতেই উপবিষ্ট হিসেবে জানেন। তাঁর জ্ঞানে কোনো পরিবর্তন নেই। তাঁর জ্ঞানের নতুনত্বের প্রয়োজন নেই। পরিবর্তন ও বিবর্তন সংঘটিত হয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে।"**[৫৫১]

ইমাম আজম আরও বলেন, **"কিরামান কাতেবিনকেও আল্লাহ তায়ালা বাহ্যিক বিষয়গুলো লিখে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদেরও অন্তরের খবর রাখার ক্ষমতা নেই। কারণ, অন্তরের খবর কেবল আল্লাহ জানেন। আর জানেন ওহিপ্রাপ্ত রাসুল। সুতরাং যদি কেউ ওহি ছাড়া অন্তরের খবর জানার দাবি করে, সে যেন আল্লাহর ইলমে ভাগ বসাতে চাইল। এটা বিশাল অপরাধ। পরিণামে কুফর ও জাহান্নাম ছাড়া উপায় নেই।"**[৫৫২]

ইমাম তহাবি বলেন, 'তিনি নিজ পূর্ণজ্ঞানে সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। সবার ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সবার জন্ম-মৃত্যু সুনির্দিষ্ট করেছেন। সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করার আগে তাদের কোনোকিছুই তাঁর কাছে গোপন ছিল না। সৃষ্টির আগেই তিনি

---

৫৫১. আল-ফিকহুল আকবার (৩)।
৫৫২. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২২)।

জানতেন তারা কী করবে। তিনি তাদের তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন।'[৫৫৩]

○ **'কালাম'** আল্লাহ তায়ালার একটি চিরন্তন সত্তাগত গুণ। আল্লাহ তায়ালা শুরু থেকেই কথা বলেন। কিন্তু তাঁর কথা সৃষ্টির কথার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না। আল্লাহর কালাম গুণ ওহি ও বিবেক উভয়টি দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, ﴿وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا﴾ অর্থ : 'আল্লাহ তায়ালা মুসা আ.-এর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন।' [নিসা : ১৬৪] আরও বলেন, ﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَا اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ﴾ অর্থ : 'আর যারা কিছু জানে না তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন? কিংবা কোনো নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন? এইভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও অনুরূপ কথা বলত। তাদের অন্তর একইরকম। আমি সত্যিকার বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি।' [বাকারা : ১১৮] আরও বলেন, ﴿اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾ অর্থ : 'তোমরা কি এ আশা করো যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল আল্লাহর কালাম (বাণী) শ্রবণ করে; এরপর তারা তা হৃদয়ঙ্গম করার পরও জেনেশুনে সেটা বিকৃত করে।' [বাকারা : ৭৫]

○ **'সাম্‌অ'** তথা শ্রবণ আল্লাহ তায়ালার একটি চিরন্তন গুণ। তিনি সেই চিরন্তন গুণের মাধ্যমে সকল আওয়াজ ও কথা শোনেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ …… ﴾ অর্থ : 'তাঁর মতো কিছু নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।' [শুরা : ১১] তিনি সৃষ্টির দূরে ও ঊর্ধ্বে থেকেও তাদের সকল কথা শোনেন। আল্লাহ বলেন, ﴿لَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا۟ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾ অর্থ : "যারা বলে, 'আল্লাহ ফকির আর আমরা ধনী', তাদের কথা আল্লাহ শুনেছেন। তাদের কথা এবং যেসব নবিকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, তা আমি লিখে রাখব এবং বলব, 'ভোগ করো দহন-যন্ত্রণা।'" [আলে ইমরান : ১৮১] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى﴾ অর্থ : 'আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সে নারীর কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সঙ্গে বাদানুবাদ করছিল এবং আল্লাহর

---

৫৫৩. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১০-১১)।

নিকটও ফরিয়াদ করছিল। আল্লাহ আপনাদের কথোপকথন শোনেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' [মুজাদালাহ : ১] মুসা ও হারুন আ.-কে ফিরাউনের কাছে পাঠানোর সময় অভয় দিয়ে আল্লাহ বলেন, ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ অর্থ : 'তিনি (আল্লাহ) বললেন, তোমরা ভয় পেয়ো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। আমি শুনছি ও দেখছি।' [তহা : ৪৬]

○ **'বাসার'** তথা দর্শনও আল্লাহর চিরন্তন গুণ। তিনি সেই চিরন্তন গুণের মাধ্যমে সকল আকার-আকৃতি ও রং-রূপ দেখতে পান। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾﴾ অর্থ : 'তিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি (নামাযে) দণ্ডায়মান হন; আর দেখেন সিজদাকারীদের সঙ্গে আপনার ওঠাবসা।' [শুআরা : ২১৮-২১৯] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ অর্থ : 'আপনি বলুন, তোমরা আমল করতে থাকো। আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন এবং তার রাসুল ও মুমিনগণও (দেখবেন)। অতঃপর তোমাদের সেই সত্তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তারপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদের অবহিত করবেন।' [তাওবা : ১০৫]

নাযযাম, কাবিসহ মুতাযিলাদের একটি দল আল্লাহর 'শ্রবণ' ও 'দর্শন' গুণকে অস্বীকারে করেছে। তাদের মতে, তিনি দেখেন না, শোনেন না! তবে আবু আলি জুব্বায়ি, আবু হাশিম, আবুল হুযাইল প্রমুখ আল্লাহর জন্য এ দুটো গুণ সাব্যস্ত করে। আহলে সুন্নাতের মতে, আল্লাহর শ্রবণ ও দর্শন কুরআনে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।[৫৫৪]

○ **'ইরাদা'** আল্লাহর একটি সত্তাগত চিরন্তন গুণ (সিফাতে যাতিয়্যাহ)। ফলে তিনি ইচ্ছা তা-ই করেন, তা-ই নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন, ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ অর্থ : 'তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।' [বুরূজ: ১৬] তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয়। যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। গোটা পৃথিবীতে, ইহকালে ও পরকালে ছোট কিংবা বড় কোনো বিষয় তার ইচ্ছা ব্যতীত সংঘটিত হবে না। কেউ তাঁর ইচ্ছার বাইরে উপকার কিংবা অপকার করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ অর্থ : 'তোমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত ইচ্ছা

---

৫৫৪. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (৪৩)।

করো না।' [তাকভির : ২৯] জয়-পরাজয়, কল্যাণ-অকল্যাণ, হ্রাসবৃদ্ধি—সবকিছু তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ অর্থ : 'যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমিন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ডাকো, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে।' [যুমার : ৩৮] তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই করতে সক্ষম। তাঁর ইচ্ছা প্রতিহত করার ক্ষমতা কারও নেই। তাঁর নির্দেশের উপর আপত্তির অধিকার কারও নেই। তাঁর তৌফিক ও চাওয়া ছাড়া কেউ ভালো কাজ করতে পারে না। তাঁর সাহায্য ও ইচ্ছা ছাড়া কেউ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, মানুষ বাধ্য। কারণ, আল্লাহ মানুষকে বাধ্য করেননি। বাধ্য করলে পরকালে তাকে পুরস্কার কিংবা তিরস্কারের বিশেষ কোনো অর্থ থাকে না। কুরআনেও আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ অর্থ : 'তোমরা যা ইচ্ছা করো। নিশ্চয়ই তোমরা যা করছ তিনি তা দেখছেন।' [ফুস্‌সিলাত : ৪০] সুতরাং বোঝা যায়, মানুষ বাধ্য নয়। তার ইচ্ছামতো কাজের স্বাধীনতা রয়েছে।

ইমামের বক্তব্যে উল্লিখিত আল্লাহর তিনটি কর্মগত সিফাত তথা 'তাখলিক', 'ইনশা', 'সুনউ' সমার্থক শব্দ। সবগুলোর অর্থ সামগ্রিকভাবে সৃষ্টি করা। অর্থাৎ, বিদ্যমান ছাঁচে কিছু তৈরি করা, যদিও এগুলোর মাঝেও কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন—'তাখলিক' হলো সাধারণভাবে সৃষ্টি করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক।' [যুমার : ৬২] 'সুনউ' বলা হয় সুনিপুণ ও সুপরিকল্পিত সৃষ্টি। আল্লাহ বলেন, ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ অর্থ : 'তুমি পর্বতমালা দেখে এগুলোকে অচল

মনে করছ। অথচ এরা হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় সঞ্চরমাণ। এটা আল্লাহরই সৃষ্টিনিপুণতা, যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুসংহত। তোমরা যা করো, সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।' [নামল : ৮৮] আর 'ইনশা' হলো সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা। আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ অর্থ : 'বলুন, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।' [মুলক : ২৩] এ সবগুলোর বিপরীতে হলো 'ইবদা।' ইবদা হলো সম্পূর্ণ নতুনরূপে উদ্ভাবন করা। আল্লাহ বলেন, ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ অর্থ : "আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর উদ্ভাবক। যখন তিনি কোনোকিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু বলেন, 'হও'! আর তা হয়ে যায়।" [বাকারা : ১১৭]

সত্তাগত সিফাত ও কর্মগত সিফাতের মাঝে পার্থক্য কী?

হানাফি উলামায়ে কেরাম এই দুই প্রকারের সিফাত সহজে বোঝার জন্য কিছু মূলনীতি তৈরি করেছেন। তারা লিখেন, যে সিফাতের বিপরীত সিফাতটিও আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা যায়, সেটা কর্মগত সিফাত। আর যে সিফাতের বিপরীতটা আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা যায় না, সেটা সত্তাগত সিফাত। উদাহরণস্বরূপ সৃষ্টি করা, বিপরীত হলো ধ্বংস করা। সন্তুষ্ট হওয়া, বিপরীতটা হলো অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হওয়া। দয়া করা, বিপরীতটা হলো শাস্তি দেওয়া। সবগুলোই আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা যায়। ফলে এগুলো সত্তাগত নয়; কর্মগত সিফাত। বিপরীতে জীবন, ইজ্জত (সম্মান) ও জ্ঞান। এগুলোর বিপরীত হলো মৃত্যু, অসম্মান ও মূর্খতা, যা আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং জীবন, সম্মান ও জ্ঞান সত্তাগত সিফাত।

উলামায়ে কেরাম আরও লিখেন, আল্লাহর সত্তাগত ও কর্মগত সিফাতের মাঝে আরেকটি পার্থক্য হলো, সত্তাগত সিফাত দিয়ে শপথ (কসম) করলে সেটা বিশুদ্ধ হবে। কারণ, এর বিপরীত নেই। যেমন—আল্লাহর ইজ্জত তথা সম্মানের মাধ্যমে শপথ করা বৈধ। কিন্তু কর্মগত সিফাত দিয়ে শপথ বিশুদ্ধ নয়। যেমন—আল্লাহর ক্রোধের নামে শপথ করলে সেটা শপথ হবে না। কারণ, ক্রোধের বিপরীতে আল্লাহর রহমত রয়েছে।[৫৫৫]

---

৫৫৫. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১০৮)। আলি কারি (২০)।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলির মর্যাদার তারতম্য

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সিফাতের মাঝে প্রকারভেদ করা গেলেও এগুলো আল্লাহর সিফাত হওয়ার ক্ষেত্রে মূলত সবই সমান। এ কারণে ইমাম বলেন, **"আল্লাহর সকল নাম ও গুণ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে সমান। এগুলোর ভিতরে কোনো পার্থক্য নেই।"**[৫৫৬] ইমামের এ বক্তব্য সিফাত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, এগুলো আল্লাহর নাম ও তাঁর গুণ এ হিসেবে সবগুলো সমান। কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে এসব নামের মাঝে তারতম্য রয়েছে।

বিশেষত 'আল্লাহ' নামটি তাঁর সকল নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। খোদ ইমাম আজম রহ. থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর এ নামটি অনন্য, দৃষ্টান্তহীন। এটা সর্বশ্রেষ্ঠ নাম, অর্থগতভাবে এবং শাব্দিকভাবেও। ফলে, তাঁর মতে, এ শব্দটি নিজেই পরিপূর্ণ। অন্য কোনো শব্দ থেকে এটা উদ্ভূত হয়নি, 'রহমান' যেমন 'রহমত' থেকে উদ্ভূত, 'রব' যেমন 'রবুবিয়্যাহ' থেকে নির্গত; 'আল্লাহ' নামটি নিজেই পরিপূর্ণ। ফলে ঈমান আনার ক্ষেত্রেও 'আল্লাহ' নামটি জানা ও বলাই যথেষ্ট। আর কোনো নামের প্রয়োজন নেই। 'আল্লাহ' নামের অর্থ : উপাস্য, মাবুদ, ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত ইত্যাদি।[৫৫৭]

গাযালি রহ. লিখেন, 'আল্লাহ' নামটি আল্লাহর নিরানব্বই নামের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, এটা আল্লাহর সকল গুণের নির্দেশক। আল্লাহর অন্য নামগুলো ভিন্ন ভিন্ন গুণ, অর্থ ও মর্যাদা বহন করে। যেমন 'আলিম' নামটি জ্ঞানের কথা বোঝায়, 'কাদির' নামটি শক্তির নির্দেশক ইত্যাদি। বিপরীতে এ নামটি তাঁর সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আধার। তা ছাড়া, এটা একমাত্র তাঁর জন্যই নির্ধারিত। ফলে 'আলিম', 'কাদির', 'রহিম' ইত্যাদি সৃষ্টির উপর প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু 'আল্লাহ' নামটি শাব্দিক বা রূপক কোনো অর্থেই কোনোভাবেই তিনি ছাড়া আর কারও উপর প্রয়োগ করা যায় না।[৫৫৮]

সিফাত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম তথা সালাফের মানহাজ

আল্লাহর সিফাতকে সংখ্যাবদ্ধ না করা : কুরআন-সুন্নাহতে আল্লাহর নাম ও গুণাবলির কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। বরং কুরআনে আল্লাহর

---

৫৫৬. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।

৫৫৭. দেখুন : তালবিসুল আদিল্লাহ (৩৮২, ৩৯৮)। আল-আকিদাহ আর রুকনিয়্যাহ (১৩)।

৫৫৮. দেখুন : আল-মাকসিদুল আসনা ফি শরহি মাআনি আসমায়িল্লাহিল হুসনা (৬১)।

অসংখ্য সুন্দর নামের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ অর্থ : 'আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। কাজেই তোমরা তাঁকে সেসব নামে ডাকো।' [আরাফ : ১৮০] যদিও হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলো আত্মস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৫৫৯] তথাপি এর দ্বারা এটাকে নিরানব্বইয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, বিভিন্ন হাদিস দেখলে বোঝা যায়, আল্লাহর আরও অনেক নাম আছে যা তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন, সৃষ্টিকে জানাননি। ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি বেদনা-ভারাক্রান্ত অবস্থায় নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে, আল্লাহ তার দুঃখ-বেদনা দূর করে দেবেন। দোয়াটি হলো : (اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ بَصَرِي ، وَجِلَاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي) অর্থ : 'হে আল্লাহ, আমি আপনার বান্দা। আপনার বান্দা ও বান্দির সন্তান। আমার সবকিছু আপনার হাতে। আপনার নির্দেশের নিয়ন্ত্রণাধীন আমি। আপনার ইনসাফপ্রাপ্ত। আমি আপনার সকল নামের উসিলায়—যেসব নাম আপনি আপনার জন্য রেখেছেন, অথবা কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন, অথবা সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছেন, অথবা গায়েবের জগতে আপনার কাছে রেখে দিয়েছেন—আপনি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত, আমার চোখের আলো, আমার দুঃখের উপশম এবং আমার পেরেশানির প্রতিষেধক করুন।' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের কি এই দোয়াটা শেখা উচিত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যে ব্যক্তিই এই দোয়াটির কথা শুনবে, তার এটা মুখস্থ করা উচিত হবে।[৫৬০] মোটকথা, আল্লাহর নামের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা আমাদের জানা নেই। ফলে তাঁর জন্য সুনির্দিষ্ট সংখ্যার নাম দাবি করা সঠিক নয়।

একই কথা আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এবং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) হাদিসে আল্লাহর অসংখ্য সিফাতের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা কিংবা রাসুল (ﷺ) অথবা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, সালাফে সালেহিন

---

৫৫৯. বুখারি (কিতাবুশ শুরুত : ২৭৩৬)। মুসলিম (কিতাবুয যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াত তাওবা : ২৬৭৭)।

৫৬০. ইবনে হিব্বান (কিতাবুর রাকায়েক : ৯৭২)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবদিল্লাহ ইবনে মাসউদ : ৪৪০৪)।

আল্লাহর এসব সিফাতকে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার মাঝে সীমাবদ্ধ করেননি। এমনকি ইমাম আজমও আল্লাহর সিফাতকে কোনো নির্দিষ্টি সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করেননি। পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত আল্লাহর অসংখ্য সিফাতের আলোচনাও যেহেতু একসঙ্গে আনা কঠিন, এ জন্য তিনি তাঁর আকিদার কিতাবগুলোতে উদাহরণস্বরূপ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিফাত উল্লেখ করেছেন, সেটাও সংখ্যার মাঝে সীমাবদ্ধকরণ ব্যতীত। ইমামের বিভিন্ন গ্রন্থে আমরা প্রায় বিশটির মতো সিফাত পেয়েছি। সেগুলো হলো আল্লাহর 'হায়াত' (জীবন), 'কুদরত' (শক্তি), 'ইলম' (জ্ঞান), 'কালাম' (বাণী), 'সাম্‌অ' (শ্রবণ), 'বাসার' (দর্শন), 'ইরাদা' (ইচ্ছা), 'তাখলিক' (সৃষ্টি করা), 'তারযিক' (রিযিক দেওয়া), 'ইনশা' (সূচনা করা), 'ইবদা' (উদ্ভাবন করা) ও 'সুনউ' (তৈরি করা), আল্লাহর 'ইয়াদ' (হাত), 'ওয়াজহ' (চেহারা), 'নফস' (আত্মা), 'ইস্তিওয়া' (অধিষ্ঠান), 'নুযুল' (অবতরণ), 'গযব' (ক্রোধ), 'রিযা' (সন্তুষ্টি) ও 'মুহাব্বত' (ভালোবাসা)। কিন্তু এর মানে এটা নয় যে, আল্লাহর সিফাত এই বিশটিতে সীমাবদ্ধ। বরং সেগুলোর প্রকৃত সংখ্যা আমাদের অজ্ঞাত। এগুলো স্রেফ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো উল্লেখ করার পরে ইমাম নিজেও বলেছেন, (وَغير ذَٰلِك من صِفَات الْفِعْل) অর্থাৎ 'অন্যান্য কর্মগত আরও যত সিফাত রয়েছে।'[৫৬১] ইমাম তহাবি রহ. আকিদাহ তহাবিয়্যাহতে আরও একাধিক সিফাত উল্লেখ করেছেন। তাই আল্লাহর সিফাতকে সাতটি বা আটটি কিংবা যেকোনো সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা সালাফের মানহাজ থেকে বিচ্যুতি গণ্য হবে। নাসাফি লিখেন, 'আল্লাহর এমন অনেক সিফাত ও আসমা (গুণ ও নাম) থাকতে পারে, যা আমাদের জানা নেই।'[৫৬২] আবু শাকুর সালেমি লিখেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো, আল্লাহর সিফাতকে সংখ্যাবদ্ধ করা যাবে না।'[৫৬৩] আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ বুখারি (৮৪১ হি.) লিখেন, 'সালাফের কাছে আল্লাহর সাতটি সিফাতের বাইরেও অন্যান্য সিফাত রয়েছে।'[৫৬৪]

কুরআন-সুন্নাহর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা : সিফাতের ক্ষেত্রে ইমাম আজমসহ সকল সালাফে সালেহিনের কর্মপন্থা ছিল কুরআন এবং বিশুদ্ধ সুন্নাহর মাঝে সীমাবদ্ধ

---

৫৬১. আল-ফিকহুল আকবার (১)।

৫৬২. আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (১৭৮)।

৫৬৩. আত-তামহিদ (৫৯)।

৫৬৪. মুলজিমাতুল মুজাসসিমাহ (৬৬)।

থাকা, নিজেদের পক্ষ থেকে কোনোকিছু সংযোজন-বিয়োজন না করা। ইমাম বলেন, **"কারও জন্য তার নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর ব্যাপারে কিছু বলা বৈধ নয়। বরং মানুষের কর্তব্য হলো, আল্লাহর জন্য সেগুলোই সাব্যস্ত করা, যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর ব্যাপারে মনগড়া কোনো বক্তব্য না দেওয়া। বড় মহান বরকতময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা।"**[৫৬৫] ইমাম আরও বলেন, **"কুরআন যা নিয়ে এসেছে এবং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যা-কিছুর দাওয়াত দিয়েছেন, সেটা ছাড়া আর কিছু (বলার) সুযোগ নেই। সাহাবায়ে কেরাম এর উপরই ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষ বিচ্ছিন্ন-বিভক্ত হয়ে যায়। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া সবকিছু নব-আবিষ্কৃত, বিদআত।"**[৫৬৬] ইমামকে আল্লাহর সিফাত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, **"আল্লাহ তায়ালা কুরআনে যা-কিছু বলেছেন এবং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে যা-কিছু বর্ণিত, আমি তা-ই বলি।"**[৫৬৭]

আল্লাহর উপর মনগড়া কিছু প্রয়োগ না করা : তাই কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য এবং সালাফের অনুসরণ ছাড়া সিফাত সাব্যস্তের নামে আল্লাহর উপর এমন কোনো শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না, যা কুরআন-সুন্নাহতে নেই কিংবা সালাফ করেননি। ইমাম বলেন, **"তিনি 'শাইউন' (বস্তু), কিন্তু অন্যান্য বস্তুর মতো নন। আর 'শাইউন'-এর অর্থ হলো 'জিসম' (দেহ), 'জাওহার' (মৌল), 'আরাজ' (বাহ্যিক রূপ-রং)-বিহীন বিদ্যমান সত্তা। তাঁর কোনো 'হদ' (সীমা) নেই, প্রতিপক্ষ নেই, সমকক্ষ নেই। তাঁর মতো কিছু নেই।"**[৫৬৮]

পরবর্তী হানাফি ইমামগণও ইমাম আজমের অনুসরণে আল্লাহর উপর 'জিসম', 'জাওহার', 'আরাজ', 'হদ', 'সুরত' (আকার-আকৃতি) ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ কঠোরভাবে নাকচ করেছেন।[৫৬৯]

---

৫৬৫. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (৮৯)। আল-উসুলুল মুনিফাহ (১৫)।

৫৬৬. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (৯১)।

৫৬৭. প্রাগুক্ত (৯২)।

৫৬৮. আল-ফিকহুল আকবার (২)।

৫৬৯. দেখুন : লুবাবুল কালাম, উসমান্দি (পাণ্ডুলিপি : ৪৬)। উসুলুদ্দিন, আহমদ গযনবি (৬৭)। আত-তামহিদ, লামিশি (৫৫)। আল-হাদি ইলা উসুলিদ্দিন, খাব্বাযি (৪১-৪৩)। আদ-দুররুল আযহার শরহুল ফিকহিল আকবার, আবদুল কাদের সিলেটি (১২)।

- আবু হাফস বুখারি বলেন, "যে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহর 'হাত', 'জিহ্বা', 'জিসম' ইত্যাদি (তথা সৃষ্টির মতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) রয়েছে, সে কাফের।"[৫৭০]

- মুহাম্মাদ ইবুনল ফযল বলখি বলেন, "কেউ যদি বলে, আল্লাহ জিসম (দেহবিশিষ্ট), কিন্তু অন্যান্য জিসমের মতো নন, তবে সে (ভ্রান্ত) কাররামিয়্যাহদের অন্তর্ভুক্ত।"[৫৭১]

- আবু মনসুর মাতুরিদি বলেন, "'জিসম'-এর দুটো অর্থ আছে। এক. এমন বস্তু যার দিক আছে, শেষ আছে, গঠন ও অবয়ব আছে। এ অর্থে 'জিসম' আল্লাহর উপর প্রয়োগ বৈধ নয়। কারণ, এগুলো সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য; আল্লাহ এসব থেকে পবিত্র। তাঁর মতো কিছু নেই। এ কারণে কুরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহর উপর এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করা হয়নি। এটা তাঁর নাম কিংবা গুণের অংশ নয়। সুতরাং আল্লাহর উপর এটা প্রয়োগের সুযোগ নেই। দুই. এটার কোনো স্বরূপ (মাহিয়্যাত) থাকবে না। স্রেফ আল্লাহর উপর 'ইতিবাচক' অর্থে প্রয়োগ করা হবে। এটাও আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা বৈধ নয়।"[৫৭২] তিনি অন্যত্র আরও স্পষ্ট করে বলেন, "'জিসম' হলো প্রত্যেক সীমাবদ্ধ বস্তুর নাম। বিপরীতে 'শাইউন' হলো স্রেফ (অস্তিত্ব) সাব্যস্তকরণ। কারণ, 'লা-শাইউন' মানে অস্তিত্বহীন। ফলে আল্লাহকে 'লা-শাইউন' বললে তিনি অনস্তিত্ব হয়ে যান।" (অথচ 'লা-জিসম' বললে অস্তিত্ব নাকচ হয় না)।[৫৭৩]

- আবু সালামা সমরকন্দি বলেন, "আল্লাহ সকল কল্পনা-জল্পনা (তাসাওউর)-এর ঊর্ধ্বে। আর কল্পনা (তাসাওউর) করতে যেহেতু 'সুরত' লাগে, সুতরাং আল্লাহ সুরত (তথা আকার-আকৃতি) ও জিসম (শরীরের) ঊর্ধ্বে।"[৫৭৪]

- লামিশি লিখেন, "আল্লাহর উপর যেভাবে 'জিসম' শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না, একইভাবে তাঁর উপর 'সুরত' (আকার-আকৃতি) শব্দও প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ শারীরিক অবকাঠামো ব্যতীত সুরতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।"[৫৭৫]

---

৫৭০. আস-সাওয়াদুল আজম (৩৯)।

৫৭১. আল-ইতিকাদ, বলখি (১০৬)।

৫৭২. আত-তাওহিদ (৩৩)। আত-তামহিদ, লামিশি (৫৬)।

৫৭৩. আত-তাওহিদ (৭৮)। আত-তামহিদ, নাসাফি (৩৩)।

৫৭৪. জুমাল মিন উসুলিদ্দিন (১৯-২০)।

৫৭৫. আত-তামহিদ (৬০)।

▪ খাব্বাযি বলেন, "আল্লাহর উপর 'জিসম', 'সুরত' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা বৈধ নয়।"[৫৭৬]

▪ বাযদাবি বলেন, 'আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো, আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর মতো কিছু নেই। তিনি শরীর (জিসম) নন, জাওহার নন...।'[৫৭৭]

▪ রুকনুদ্দিন সমরকন্দি লিখেন, "আল্লাহর উপর 'জাওহার', জিসম' এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ বৈধ নয়। আল্লাহকে তাঁর বলা ব্যতীত কোনো নাম দেওয়া বৈধ নয়। ফলে আল্লাহ সবচেয়ে বড় চিকিৎসক হলেও তাকে 'তবিব' (ডাক্তার) বলা যায় না, সবচেয়ে বড় জ্ঞানী সত্ত্বেও তাঁকে 'ফকিহ' বলা যায় না।"[৫৭৮]

▪ আবুল মুঈন নাসাফি লিখেন, "ইহুদি, রাফেজা, কারামিয়্যাহ, হিশামিয়্যাহ এবং একদল হাম্বলি আল্লাহর জন্য 'জিসম' সাব্যস্ত করে। তারা এর মাধ্যমে আল্লাহকে বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত অবকাঠামো মনে করে। এটা বিচ্যুতি। কেননা, এ ধরনের জিসম সৃষ্টির গুণ। আল্লাহ তায়ালা এর ঊর্ধ্বে। হ্যাঁ, যদি কেউ 'জিসম' বলে সত্তা বোঝায়, সেটা ঠিক আছে। তথাপি এ ধরনের শব্দ আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা বৈধ নয়। তাই সেটাও ভুল গণ্য হবে। কারণ, এই যুক্তিতে কেউ আল্লাহকে 'পুরুষ' বলে বলবে, 'আমি সত্তা উদ্দেশ্য নিয়েছি'! আল্লাহ সকল রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে অবগত। এই যুক্তিতে কেউ তাকে 'ডাক্তার' বলবে। আল্লাহ দ্বীন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত, এই যুক্তিতে কেউ তাকে 'ফকিহ' বলবে। অথচ আমরা এসব বলতে পারি না। কারণ, আল্লাহর শানে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর উপর নির্ভর করা আবশ্যক।"[৫৭৯]

▪ নুরুদ্দিন সাবুনি লিখেন, "আল্লাহর উপর 'জিসম' (দেহ) বা 'সুরত' (আকার-আকৃতি) এ ধরনের কথা বলা অসম্ভব। ইহুদি, চরমপন্থি রাফেজা, মুশাব্বিহাহ ও কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায় আল্লাহকে 'জিসম' মনে করেছে। (শিয়া

---

৫৭৬. আল-হাদিস ফি উসুলিদ্দিন (৪৫-৪৬)।

৫৭৭. উসুলুদ্দিন (২৫০-২৫১)।

৫৭৮. আল-আকিদাহ আর রুকনিয়্যাহ (পাণ্ডুলিপি) (৫)।

৫৭৯. আত-তামহিদ (২৭-২৯)। পিছনে আমরা বলেছি, ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের অনুসারী একদল আলেম পরবর্তীকালে দেহবাদে লিপ্ত হয়েছেন। এখানে তারা উদ্দেশ্য। ইমাম আহমদ তাদের বিদআত থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

নেতা) হিশাম ইবনুল হাকাম এবং তার অনুসারীরা আল্লাহকে 'আকার-আকৃতি'-সম্পন্ন বলেছে। কিন্তু আমাদের কথা হলো, আল্লাহর উপর 'জাওহার', 'জিসম' এ ধরনের কোনো শব্দ প্রয়োগ করা বৈধ নয়। ...তাদের কেউ কেউ 'আল্লাহর জিসম কিন্তু অন্যান্য জিসমের মতো নয়' এ ধরনের কথা বলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেটাও সঠিক নয়। কারণ, তিনি 'জিসম'ই নন; অন্যান্য জিসমের কথা তো অপ্রাসঙ্গিক। বিপরীতে আল্লাহর উপর 'শাইউন', 'নফস' এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করা বৈধ। কারণ, আল্লাহ নিজে করেছেন।"[৫৮০]

- কাসানি লিখেন, 'আল্লাহর কোনো আকার-আকৃতি (সুরত) নেই। মানুষের কল্পনা-জল্পনাতে যত আকার-আকৃতি আছে, সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহর সঙ্গে সৃষ্টির কোনো সাদৃশ্য নেই।'[৫৮১]

- আবু হাফস উমর নাসাফি (৫৩৭ হি.) লিখেন, "আল্লাহ 'জাওহার' নন, 'আরাজ' নন। আকার-আকৃতিবিশিষ্ট নন। তাফতাযানি এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, জাওহার জায়গায় সীমাবদ্ধ এবং শরীরী। আল্লাহ এর উর্ধ্বে। আল্লাহ 'আরাজ' নন। কারণ, 'আরাজ' নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; অন্যের অস্তিত্বের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ 'মুসাওয়ার' তথা আকার-আকৃতিবিশিষ্ট নন; কারণ, এটা শরীরের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ দিক কিংবা সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নন।"[৫৮২]

- কামাল ইবনুল হুমাম লিখেন, "আল্লাহ জাওহার নন। কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ নন। জিসম নন। আল্লাহর জিসিম (শরীর) আছে, কিন্তু অন্যদের জিসমের মতো নয়—এমন কথা বলাও গলত। আল্লাহর জন্য 'আরাজ' (রূপ-রং-আকার-আকৃতি) ইত্যাদি সাব্যস্ত করাও ভুল। কেননা, কুরআন-সুন্নাহতে আল্লাহর উপর এসব শব্দ প্রয়োগ করা হয়নি। আল্লাহ কোনো দিকে নন; কেননা দিকসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি। প্রথমে ছিল না, পরে অস্তিত্বে এসেছে। অথচ আল্লাহ সবসময় ছিলেন।"[৫৮৩] ইবনুল হুমাম ফাতহুল কাদিরে লিখেন, "যদি কেউ বলে, আল্লাহর মানুষের মতো হাত ও পা আছে, তবে সে অভিশপ্ত কাফের। আর যদি

---

৫৮০. আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ (৭১-৭৪)। আল-বিদায়াহ মিনাল কিফায়াহ (৪৪)।

৫৮১. আল-মুতামাদ ফিল মুতাকাদ (৮)।

৫৮২. শরহুল আকায়েদ (১১৫-১২০)।

৫৮৩. আল-মুসায়ারাহ (১৩-১৭)।

বলে, তাঁর (জিসম) দেহ আছে কিন্তু অন্যান্য দেহের মতো নয়, তবে সে বিদআতি। কেননা, আল্লাহর উপর এমন শব্দ প্রয়োগ করা যায় না।”[৫৮৪]

- মাগনিসাভি লিখেন, “গোটা সৃষ্টিজগতের কোনো বস্তু তাঁর সাদৃশ্য রাখে না। তিনি ‘জিসম’ (দেহ) নন। ফলে তাকে মাপা যায় না, অনুমান করা যায় না। কল্পনার পাতায় আঁকা যায় না। ভাগ করা যায় না। তিনি ‘জাওহার’ নন। ফলে তার উপর ‘আরাজ’ তথা রং-রূপ আরোপ করা যায় না। তিনি ‘রং-রূপ’ নন। ফলে কোনো মৌলের মাঝে প্রবেশ করেন না। এককথায়, সৃষ্টিজগতের কোনোকিছু তাঁর সাদৃশ্য রাখে না। অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রাখে না। গুণাবলির ক্ষেত্রেও না।”[৫৮৫]

- সাফফার লিখেন, “আল্লাহ তায়ালা গোটা সৃষ্টি থেকে আলাদা। তিনি সদা বিদ্যমান। সবসময় ছিলেন, সবসময় থাকবেন। তিনি অনাদি, অনন্ত। তাঁর শুরু নেই, শেষ নেই। কোনো কল্পনা-জল্পনা তাঁর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তিনি সকল আকার-আকৃতি, গঠন, পরিমাণ, অবকাঠামো, ধরন থেকে ঊর্ধ্বে। ফলে তিনি কেমন? তিনি কীভাবে? তিনি কত? (তাঁকে কোনো স্থানে কল্পনা করে) তিনি কোথায়? তাঁর আকৃতি কেমন?—এ ধরনের কথা বলা যাবে না।”[৫৮৬]

আল্লাহর উপর ‘শাইউন’ শব্দ প্রয়োগ : প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহর উপর মনগড়া কোনো শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না বলে খোদ ইমামই আল্লাহর উপর ‘শাইউন’ (বস্তু) শব্দ প্রয়োগ করলেন। এটা কি বৈধ?

আমরা বলব, আল্লাহকে ‘শাইউন’ বলার অর্থ হলো, তিনি সত্তা ও গুণাবলিসহ বিদ্যমান। কিন্তু তাঁর সত্তা কিংবা গুণাবলি সৃষ্টির কোনো বস্তুর মতো নয়। এটা আল্লাহর উপর মনগড়া শব্দ প্রয়োগ নয়, বরং সৃষ্টি থেকে সাদৃশ্য নাকচ করতে স্বয়ং আল্লাহ এটা প্রয়োগ করেছেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ অর্থ : ‘তাঁর মতো কোনো বস্তু (শাইউন) নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।’ [শুরা : ১১] আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ অর্থ : ‘আপনি জিজ্ঞেস করুন সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে (শাইউন)? বলে দিন, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী।’ [আনআম : ১৯][৫৮৭]

---

৫৮৪. ফাতহুল কাদির (১/৩৫০)।

৫৮৫. শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১০৭)।

৫৮৬. তালখিসুল আদিল্লাহ (১৫৫)।

৫৮৭. দেখুন : তালখিসুল আদিল্লাহ (৩৭৩)। বাহরুল কালাম (১০০)।

মাতুরিদি বলেন, “কেউ বলতে পারে, আল্লাহর উপর ‘জিসম’ শব্দ প্রয়োগ অবৈধ হলে ‘শাইউন’ প্রয়োগ কেন অবৈধ হবে না? অথবা ‘আল্লাহ বস্তু কিন্তু অন্যান্য বস্তুর মতো নন’ এমন বলা গেলে ‘আল্লাহ শরীর কিন্তু অন্যান্য শরীরের মতো নন’ এটুকু বলতে কী সমস্যা? আমরা বলব, ‘জিসম’ আর ‘শাইউন’ এক বিষয় নয়। জিসমের (তথা শরীরের) জন্য যা আবশ্যক, ‘শাইউন’ (তথা বস্তু বা বিষয়ের) জন্য তা আবশ্যক নয়। কারণ, ‘শাইউন’ হলেই সেটার ‘জিসম’ থাকতে হবে এটা জরুরি নয়। অনেক ‘শাইউন’ (যেমন গুণ)-এর ‘জিসম’ তথা শরীর নেই। (উদাহরণস্বরূপ আমরা বললাম, আল্লাহর দিদার এমন একটা ‘বিষয়’ [শাইউন] যা এই পৃথিবীতে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। এখানে দিদার শব্দের উপর ‘শাইউন’ প্রয়োগ করা হলো, অথচ এটার জিসম বা শরীর নেই)। সুতরাং আল্লাহর উপর ‘শাইউন’ শব্দ প্রয়োগ করা গেলেও ‘জিসম’ প্রয়োগ করা যাবে না। এ কারণে কুরআনে আল্লাহর উপর ‘শাইউন’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ অর্থ : ‘তাঁর মতো কোনো বস্তু (শাইউন) নেই।’ [শুরা : ১১] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ অর্থ : ‘আপনি জিজ্ঞেস করুন সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে? বলে দিন, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী।’ [আনআম : ১৯] বোঝা গেল, আল্লাহর উপর এটা প্রয়োগ করা বৈধ।”[৫৮৮]

আবুল ইউসর বাযদাবি লিখেন, “কাররামিয়্যাহরা আল্লাহর উপর ‘জিসম’ শব্দ প্রয়োগ করে। তারা বলে, আল্লাহ জিসম, কিন্তু অন্যান্য জিসমের মতো নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের... মতে আল্লাহ জিসম নন। কারণ, জিসমের মাঝে এমন কিছু বিদ্যমান, যা আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়। তা ছাড়া, আল্লাহ কুরআনে কিংবা রাসুলুল্লাহ সুন্নাহতে আল্লাহর জন্য জিসম সাব্যস্ত করেননি। ফলে তাঁর উপর এটা প্রয়োগ করা যাবে না। বিপরীতে আহলে সুন্নাতের মতে, আল্লাহর উপর ‘শাইউন’ শব্দ প্রয়োগ করা যাবে, ‘নফস’ শব্দ প্রয়োগ করা যাবে। কারণ, আল্লাহ তাঁর নিজের উপর ‘নফস’ শব্দ প্রয়োগ করেছেন [মায়িদা : ১১৬]। আল্লাহ নিজের উপর ‘শাইউন’ শব্দ প্রয়োগ করেছেন [শুরা : ১১]।”[৫৮৯]

‘শাইউন’ শব্দটি আরবিতে ‘মাফউল’ তথা ক্রিয়ার কর্ম হিসেবে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনই ‘ফায়েল’ তথা কর্তা হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ‘মাফউল’

---

৫৮৮. আত-তাওহিদ (৩৪-৩৫)।

৫৮৯. উসুলুদ্দিন (৩৪-৩৬)।

হিসেবে ব্যবহারের উদাহরণ, যেমন : আল্লাহ তায়ালার বাণী, ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।' [বাকারা : ২৮৪] এ অর্থে 'শাইউন' শব্দের প্রয়োগ আল্লাহর উপর বৈধ নয়। 'ফায়েল' অর্থে ব্যবহারের উদাহরণ, যেমন : আল্লাহ তায়ালার বাণী, ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ অর্থ : 'আপনি জিজ্ঞেস করুন, সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে কোন বস্তু সর্ববৃহৎ? বলে দিন, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী।' [আনআম : ১৯] এ অর্থে আল্লাহর উপর 'শাইউন' শব্দের প্রয়োগ বৈধ। আবার কখনো কখনো 'শাইউন' শব্দটি সাধারণ বিদ্যমানতার উপর প্রয়োগ করা হয়। আল্লাহর ক্ষেত্রে এই বিদ্যমানতা চিরন্তন, অবিনশ্বর, অপরিহার্য। ফলে তাঁর ক্ষেত্রে এটার ব্যবহার অধিক যথাযথ।[৫৯০]

উপরন্তু ইমাম আজম কর্তৃক আল্লাহর উপর 'শাইউন' শব্দ স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োগ এবং আকিদার গ্রন্থগুলোতে আলোচনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য আছে। সেটা হলো জাহম ইবনে সাফওয়ানের খণ্ডন। অর্থাৎ, জাহম বলত, আল্লাহর উপর 'শাইউন' শব্দের প্রয়োগ বৈধ নয়।[৫৯১] জাহম যেহেতু সব ধরনের সিফাত অস্বীকার করত, ফলে সেগুলোর সঙ্গে 'শাইউন'ও অস্বীকারের ফলে আদতে আল্লাহ অস্তিত্বহীন হয়ে যান। জাহমের এই বিভ্রান্তি খণ্ডনে ইমাম বলেন, আল্লাহ নিজের উপর শাইউন শব্দ প্রয়োগ করেছেন, আর এটা তাঁর উপর প্রয়োগ অবৈধ নয়। বরং এটা অস্বীকারের মাধ্যমে অন্যান্য সিফাত অস্বীকারের পথ উন্মুক্ত করা অবৈধ। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর উপর এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন।

আল্লাহর ব্যাপারে 'জাওহার' ও 'আরাজ' নাকচ করার রহস্য : যদি আল্লাহর উপর মনগড়া শব্দ প্রয়োগ নিষিদ্ধ হয়, তবে ইমাম আজম এখানে 'জাওহার' ও 'আরাজ' ইত্যাদি নিয়ে কেন কথা বললেন? কেন আল্লাহর ব্যাপারে এগুলো নাকচ করলেন? অথচ এগুলো কুরআন-সুন্নাহর শব্দ নয়, সালাফ এগুলো বলেননি!

উত্তর হলো, এগুলো আকিদা 'তাকরির' তথা বর্ণনা ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আনেননি, বরং বিভ্রান্তি খণ্ডনের জন্য এনেছেন। আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম আজমের মানহাজ হলো, কুরআন ও সুন্নাহতে যতটুকু এসেছে, ততটুকু বলা। মনগড়া শব্দ

---

৫৯০. শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৩৪)।
৫৯১. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/৩১৫)।

ব্যবহার পরিত্যাগ করা। এটা সাধারণ ক্ষেত্রে। কিন্তু বিপরীতে যখন বিভ্রান্ত লোকেরা আকিদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ছড়াবে, আল্লাহর উপর মনগড়া শব্দ প্রয়োগ করবে, তখন সেটার প্রতিবাদ ও খণ্ডন আবশ্যক হবে। ইমাম আজম সেটাই করেছেন। অর্থাৎ, যখন খ্রিষ্টান ও কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায় আল্লাহর উপর 'জিসম', 'জাওহার', 'আরাজ' এসব শব্দ প্রয়োগ করতে লাগল, অথচ জিসম তথা দেহ হলো বিভিন্ন উপাদানে গঠিত এবং কোনো এক স্থানে সীমাবদ্ধ, যা থেকে আল্লাহ মুক্ত। একইভাবে জিসম নবসৃষ্ট, অথচ আল্লাহ চিরন্তন, অনাদি, অনন্ত। 'জাওহার'ও (মৌল) কোনো জায়গায় সীমাবদ্ধ এবং জিসমের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর 'আরাজ' (বাহ্যিক রূপ-রং) হলো জিসম ও জাওহারে বিদ্যমান অনিত্য গুণাবলি, যেমন : রং, স্বাদ, ঘ্রাণ ইত্যাদি, যা স্থায়ী নয়; অথচ আল্লাহর যাত ও সিফাত চিরন্তন ও চিরস্থায়ী।[৫৯২] এভাবে তারা যখন আল্লাহর উপর এসব মনগড়া শব্দ প্রয়োগ করতে লাগল, তখন ইমাম এগুলো নাকচ করলেন, তাদের খণ্ডন করলেন।

ইমাম আজমকে 'জিসম' ও 'আরাজ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, **'আমর ইবনে উবাইদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। সে মুসলমানদের উপর এটা নিয়ে বিতর্কের দরজা উন্মুক্ত করেছে।'**[৫৯৩] অর্থাৎ, এগুলো নিয়ে কথা বলাই নিষিদ্ধ। কিন্তু যখন তারা অন্যায় কথা বলা শুরু করল, তখন তাদের খণ্ডন না করে উপায় নেই। নতুবা তাঁর এবং আহলে সুন্নাতের স্বাভাবিক নীতি হলো, যেমনটা হারাভি নিজস্ব সূত্রে নুহ আল-জামি থেকে বর্ণনা করেন, আমি আবু হানিফাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জিসম', 'আরাজ' ইত্যাদি নিয়ে মানুষ যেসব নতুন কথা শুরু করেছে, সে ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী? তিনি বললেন, **"এগুলো দার্শনিকদের কথা। 'আসার' তথা সুন্নাহ ও সালাফের অনুসরণ করো। প্রত্যেক নবসৃষ্ট বিষয় থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, সেগুলো বিদআত।"**[৫৯৪]

তাশবিহ ও তাতিলের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ মানহাজ : সিফাতের ক্ষেত্রে আবু হানিফা রহ. এবং সালাফে সালেহিনের মানহাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, তাশবিহ (সাদৃশ্য) ও তাতিল (নাকচ)-এর মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ মানহাজ। ফলে তারা কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত সিফাতগুলোকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করলেও সেগুলো

---

৫৯২. উসুলুদ্দিন, গযনবি (৬৮-৬৯)।

৫৯৩. দেখুন : তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/২৬১-২৬২)। শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৩৪-৩৫)।

৫৯৪. যাম্মুল কালাম ওয়া আহলিহি (৫/২০৭)।

সাব্যস্তের নামে বাড়াবাড়ি করে আল্লাহকে সৃষ্টিসদৃশ বানিয়ে দেননি, যেমনটা দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদীরা করেছে। আবার তারা সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহর সাদৃশ্যের ভয়ে সিফাতকে নাকচ করেননি, যেমনটা জাহমিয়্যাহ ও মুতাযিলারা করেছে। বরং তারা এর বাস্তবতা ও মৌলিকত্বের উপর বিশ্বাস রাখেন। কিন্তু নিগূঢ় মর্ম, ধরন ও স্বরূপ আল্লাহর কাছে সঁপে দেন। অন্যকথায়, তারা সিফাতকে যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দেন। এগুলোতে বিশ্বাস রাখেন, গ্রহণ করেন। কিন্তু এগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি অপছন্দ করেন। এটাই সালাফে সালেহিনের প্রতিষ্ঠিত মানহাজ। ইমাম আজম রহ. থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন : **"আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো 'তাশবিহ' ও 'তাতিল'-মুক্ত বিশুদ্ধ তাওহিদ।"**[৫৯৫]

তিরমিযি আল্লাহর সিফাতসংক্রান্ত হাদিসের আলোচনায় বলেন, "সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবন আনাস, ইবনুল মুবারক, ইবনে উয়াইনাহ, ওয়াকিসহ এ ব্যাপারে সকল ইমামের মাযহাব হলো : এসব হাদিস বর্ণনা করা হবে। আমরা এগুলোতে ঈমান রাখব। কিন্তু 'কীভাবে' এমন প্রশ্ন করা যাবে না। সকল মুহাদ্দিসের মতামতও তা-ই—এসব হাদিস যেভাবে এসেছে সেভাবে বর্ণনা করা হবে। এগুলোর উপর ঈমান আনতে হবে। কিন্তু এগুলো ব্যাখ্যা করা যাবে না। অনুমান করা যাবে না। 'কীভাবে' এমন প্রশ্ন করা যাবে না।"[৫৯৬]

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা নিজের ব্যাপারে কুরআনে যা বলেছেন, সেগুলো পড়াই তার তাফসির। আরবি কিংবা ফারসিতে সেগুলোর ব্যাখ্যা করা কারও জন্য বৈধ নয়।'[৫৯৭]

ইমাম আজম রহ. বলেন, **'আল্লাহ তায়ালার সকল সিফাত (গুণ) মাখলুকের সিফাতের (গুণ) চেয়ে ভিন্ন। তিনি জানেন; কিন্তু আমাদের জানার মতো নয়। তিনি শক্তি রাখেন; কিন্তু আমাদের শক্তির মতো নয়। তিনি দেখেন; তবে আমাদের দেখার মতো নয়। তিনি কথা বলেন; তবে আমাদের কথা বলার মতো নয়। তিনি শোনেন; তবে আমাদের শোনার মতো নয়।'**[৫৯৮]

---

৫৯৫. তালখিসুল আদিল্লাহ (৩৯৯-৪০০)।

৫৯৬. তিরমিযি (আবওয়াবু সিফাতিল জান্নাহ : ২৫৫৭ হাদিসসংক্রান্ত আলোচনা)।

৫৯৭. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৭০)।

৫৯৮. আল-ফিকহুল আকবার (২)।

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার (সত্তাগত ও কর্মগত) সকল গুণ সৃষ্টি থেকে আলাদা। **'তিনি জানেন; কিন্তু আমাদের জানার মতো নয়।'** কারণ, আমাদের জ্ঞান নবসৃষ্ট; ধারণা, অনুমান ও কল্পনানির্ভর; উপার্জিত। অপরদিকে আল্লাহর জ্ঞান চিরন্তন; মহাসত্য ও চূড়ান্ত। সবকিছু তাঁর সামনে উদ্ভাসিত। **'তিনি শক্তি রাখেন; কিন্তু আমাদের শক্তির মতো নয়।'** কারণ, আল্লাহর শক্তি চিরন্তন, স্থায়ী। আমাদেরটা নবসৃষ্ট, অস্থায়ী। আমাদের ক্ষমতা সীমিত। তাও বিভিন্ন উপায়-উপকরণ, সহায়-সাহায্য ও যন্ত্রপাতিনির্ভর। আল্লাহর ক্ষমতা এ সবকিছুর ঊর্ধ্বে। সকল উপায়-উপকরণ ও সাহায্যসহযোগিতার অমুখাপেক্ষী। **'তিনি দেখেন; তবে আমাদের দেখার মতো নয়।'** কারণ, আমাদের দেখতে হলে উপকরণ লাগে, অনুকূল পরিস্থিতি লাগে। উপরন্তু আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। অথচ আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন। তাঁর দেখতে কোনো উপকরণ লাগে না, স্থান-কালের আনুকূল্য লাগে না। দিক ও মখোমুখি হওয়া লাগে না। **'তিনি কথা বলেন; তবে আমাদের কথা বলার মতো নয়।'** এক্ষেত্রে পার্থক্য স্বয়ং ইমাম আজম নিজেই উল্লেখ করেছেন। এভাবে যখন প্রত্যেকটা সিফাতকে বোঝা হবে, তখন বিতর্ক হয় না। বিচ্যুতি আসে না। সাদৃশ্যের ভয়ে তাবিল (রূপক ব্যাখ্যা) কিংবা তাহরিফ (বিকৃতিসাধন) করতে হয় না।

সাদৃশ্যের কথা চিন্তা করতে গেলে এমন অনেক সিফাতই মানুষের সঙ্গে মিলে যায়। তাই বলে সেগুলো অস্বীকার কিংবা তাবিল করা যাবে? না, করা যাবে না। কারণ, সাদৃশ্যটা স্রেফ শাব্দিক; মৌলিক সাদৃশ্য নয়। তাই সাদৃশ্যের অজুহাতে সিফাতগুলো নাকচ করা যাবে না, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল বলেননি এমন কোনো শব্দে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বরং যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দিতে হবে।

ইমাম সিফাতের ক্ষেত্রে জাহমিয়্যাহদের বিকৃতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। জারুদ ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হানিফা রহ.-কে বলতে শুনেছি, **"জাহম সব সিফাতকে অস্বীকার করেছে। ফলে একপর্যায়ে আল্লাহকে 'কিছু না' (لا شيء) বানিয়ে দিয়েছে! কুরআনের উপর রাগ দেখিয়েছে** (তাতে আল্লাহর সিফাত থাকার কারণে)! জারুদ ইমামকে বললেন, এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী? তিনি বললেন, **'আল্লাহ তায়ালা কুরআনে যা-কিছু বলেছেন এবং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে যা-কিছু বর্ণিত, আমি তা-ই বলি।'"**[৫৯৯]

---

৫৯৯. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (৯২)।

তাশবিহ ও তাতিলের মাঝে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় ইমাম বলেন, 'সৃষ্টির কোনো বৈশিষ্ট্য (তথা সিফাত)-কে আল্লাহর উপর আরোপ করা যাবে না। তাঁকে সৃষ্টির কোনো বিশেষণে বিশেষিত করা যাবে না। **তাঁর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তাঁর দুটো সিফাত।** কোনো ধরন বা স্বরূপ ছাড়াই সেটা বিশ্বাস করতে হবে। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা। আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন এবং সন্তুষ্ট হন। **তাঁর ক্রোধকে শাস্তি এবং সন্তুষ্টিকে পুরস্কার ইত্যাদি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না।** বরং তিনি নিজের ব্যাপারে যা বলেছেন আমরাও তা-ই বলব। তিনি অমুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি চিরঞ্জীব। চিরজাগ্রত তত্ত্বাবধায়ক। তিনি সবকিছু শোনেন। সবকিছু দেখেন। সবকিছু জানেন। **বান্দার হাতের উপর আল্লাহর হাত (ইয়াদ) রয়েছে। কিন্তু সেগুলো সৃষ্টির হাতের মতো নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়। কারণ, তিনি সকল হাতের সৃষ্টিকর্তা। একইভাবে তাঁর চেহারাও (ওয়াজহ) সৃষ্টির কোনো চেহারার মতো নয়। কারণ, তিনিই সকল চেহারার সৃষ্টিকর্তা। তাঁর নফস সৃষ্টির কোনো নফসের মতো নয়। কারণ, তিনি সকল নফসের সৃষ্টিকর্তা।** তাঁর মতো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা। সর্বদ্রষ্টা।'[৬০০]

ইমাম রহ. আল-ফিকহুল আকবারেও বিষয়টির প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, **"আল্লাহ তায়ালার 'ইয়াদ' (হাত), 'ওয়াজহ' (চেহারা) এবং 'নফস' (সত্তা) রয়েছে, যেভাবে কুরআনে এসেছে সেভাবে। এটা বলা যাবে না যে, তাঁর 'ইয়াদ' (হাত) তাঁর কুদরত ও নেয়ামত। কারণ, এভাবে বললে তাঁর সিফাতকে বাতিল করে দেওয়া হয়। আর এটা কাদারিয়া ও মুতাযিলাদের বক্তব্য। বরং 'ইয়াদ' (হাত) তাঁর একটি সিফাত, ধরন নেই। 'গাযাব' (ক্রোধ) ও 'রিযা' (সন্তুষ্টি) আল্লাহর দুটি সিফাত, ধরন নেই।"**[৬০১] ইমাম তহাবি রহ. বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা রাগ করেন। তিনি সন্তুষ্ট হন; কিন্তু তাঁর রাগ ও সন্তুষ্টি সৃষ্টিজীবের মতো নয়।'[৬০২] নিচে আমরা ইমাম আজম-বর্ণিত কিছু সিফাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও জরুরি আলোচনা পেশ করছি :

'ইয়াদ' তথা হাতের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡ﴾ অর্থ : 'যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ

---

৬০০. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৬-৫৭)। ইতিকাদ, নিশাপুরি (৯০)।
৬০১. আল-ফিকহুল আকবার (৩)।
৬০২. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (৫)।

করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।' [ফাতাহ : ১০] অন্য আয়াতে বলেন, ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ অর্থ : 'তিনি বললেন, হে ইবলিস, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কীসে বাধা দিলো?' [সাদ : ৭৫] আরেক আয়াতে বলেন, ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ অর্থ : 'অতএব, পবিত্র তিনি যাঁর হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' [ইয়াসিন : ৮৩] আল্লাহ তায়ালার 'ইয়াদ' (হাত) দেহ নয়, দেহের অংশ নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়। এর প্রকৃত রূপরেখা, নিগূঢ় মর্ম তিনিই ভালো জানেন।

'ওয়াজহ' তথা মুখ/চেহারার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ অর্থ : 'আল্লাহর 'চেহারা' ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল।' [কাসাস : ৮৮] আরেক আয়াতে বলেন, ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ অর্থ : "পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহর 'মুখ।'" [বাকারা : ১১৫] অন্য আয়াতে বলেন, ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ অর্থ : "অবশিষ্ট থাকবেন কেবল আপনার মহিমাময়, মহানুভব পালনকর্তার 'মুখ।'" [রহমান : ২৭] আল্লাহর 'ওয়াজহ' (মুখ) দেহ নয়, দেহের অংশ নয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়। এর প্রকৃত রূপরেখা, নিগূঢ় মর্ম তিনিই ভালো জানেন।

'নফস' : কেউ কেউ আল্লাহর উপর 'নফস' (আত্মা/নিজ/সত্তা) শব্দের প্রয়োগের ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। বাস্তবতা হলো, কুরআনের একাধিক আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষ্যে বলেন, ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ অর্থ : 'আপনি জানেন আমার নফসের মাঝে কী আছে। কিন্তু আমি জানি না আপনার নফসের মাঝে কী আছে।' [মায়িদাহ : ১১৬] আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ অর্থ : 'আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করছেন।' [আলে ইমরান : ২৮] আরেক আয়াতে বলেন, ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ অর্থ : 'তোমাদের প্রতিপালক নিজের উপর রহমতকে অবধারিত করে নিয়েছেন।' [আনআম : ৫৪] রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। আল্লাহর রাসুল বলেন, 'আপনি তেমন যেমন আপনার নিজের প্রশংসা করেছেন' (أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)।[৬০৩]

---

৬০৩. মুসলিম (কিতাবুস সালাত : ৪৮৬)। তিরমিযি (আবওয়াবুদ দাওয়াত : ৩৫৬৬)।

'রিযা' বা সন্তুষ্টি সিফাতের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, ﴿لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল।' [ফাতাহ : ১৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।' [বায়্যিনাহ : ৮] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার ক্রোধ থেকে সন্তুষ্টির আশ্রয় চাচ্ছি।'[৬০৪]

'গযব' বা ক্রোধ সিফাতের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ অর্থ : 'হে মুমিনগণ, আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রুদ্ধ, তোমরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না।' [মুমতাহিনাহ : ১৩] এ অর্থে আরেকটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেটা হলো 'সাখাত।' অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ অর্থ : 'আপনি তাদের অনেককে দেখবেন কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য সামনে যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। এ কারণে তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তারা চিরকাল শাস্তিতে থাকবে।' [মায়িদা : ৮০] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একটি হাদিসে বলেছেন, '...আজকে আমার প্রভু এতটা ক্রুদ্ধ হয়েছেন, যতটা পূর্বে কখনো হননি, পরেও কখনো হবেন না।'[৬০৫]

'ইস্তিওয়া' সম্পর্কে ইমাম বলেন, **"আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন। কিন্তু তিনি আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। আরশের উপর 'অবস্থানকারী' (ইসতিকরার) নন; বরং তিনি কোনো প্রয়োজন ছাড়াই আরশ ও আরশের বাইরে অন্য সকল বস্তুর রক্ষাকর্তা...।'**(৬০৬) কুরআনে কারিমের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা ইস্তিওয়া প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ অর্থ : "রহমান আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন।" আরও বিভিন্ন জায়গাতে এসেছে, 'অতঃপর আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন। [আরাফ : ৫৪;

---

৬০৪. মুসলিম (কিতাবুস সালাত : ৪৮৬)। ইবনে মাজা (বাবু ইকামাতিস সালাত : ১১৭৯)।
৬০৫. বুখারি (কিতাবু তাফসিরিল কুরআন : ৪৭১২)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৯৪)।
৬০৬. আল-ওয়াসিয়্যাহ (পাণ্ডুলিপি) (৩)।

ইউনুস : ৩০; রাদ : ২; সাজদাহ : ৪; হাদিদ : ৪] ইমাম আজম ও সালাফে সালেহিন রহ. ইস্তিওয়া ব্যাপারটা কীভাবে গ্রহণ করতেন সেটা সামনে আসছে।

ইমাম আজম থেকে **'নুযুল'** সাব্যস্তও প্রমাণিত। বাইহাকি লিখেন, ইমাম রহ.-কে 'নুযুল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, **'তিনি নুযুল করেন, ধরনহীন'** (ينزل بلا كيف)।[৬০৭] ইসমাইল সাবুনি (৪৪৯ হি.) তাঁর শায়খ আবু মনসুর ইবনে হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন, আবু হানিফা রহ.-কে 'নুযুল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, **'তিনি ধরনহীন নুযুল করেন।'** ইবনুল মুবারক রহ.-কে 'নুযুল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহ নুযুল করেন যেভাবে ইচ্ছা।'[৬০৮] ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "'রুইয়াহ' (আল্লাহর দিদার) ও 'নুযুল'-সংক্রান্ত হাদিসগুলো যেভাবে এসেছে আমরা সেভাবে বর্ণনা করব। এগুলোর অর্থ খুঁজতে যাব না" (لا نكشف معاني الأخبار التي جاءت في الرؤية والنزول، فنرويها كما جاءت ورويت)।[৬০৯]

বরং তাবিল নাকচ এবং সর্বোচ্চ তানযিহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইমাম আজম রহ. আল্লাহর কিছু সিফাতের অনুবাদ করতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, **"উলামায়ে কেরাম ফারসি ভাষায় আল্লাহর যেসব সিফাতের উল্লেখ করেছেন, সেগুলো বলা বৈধ। ব্যতিক্রম 'ইয়াদ' (হাত)। ফারসিতে এটার অনুবাদ করা যাবে না। ফলে 'বরুয়ে খোদা' (আল্লাহর চেহারা) বলা যাবে। সাদৃশ্য ও ধরন বর্ণনা ব্যতিরেকে।**[৬১০]

'ইয়াদ' কি আসলেই অনুবাদ করা যাবে না? প্রশ্ন হলো, বাস্তবেই কি 'ইয়াদ' শব্দ ফারসি তথা অনারবি ভাষায় অনুবাদ করা যায় না? অন্যকথায়, আমরা আল্লাহর 'ওয়াজহ'-কে 'চেহারা', 'কাদাম'-কে 'পা', 'নফস'-কে 'সত্তা' হিসেবে অনুবাদ করতে পারলেও 'ইয়াদ'-কে 'হাত' হিসেবে অনুবাদ করতে পারব না?

বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বিভিন্ন আলেম বিভিন্নভাবে উত্তর দিয়েছেন। হাফিজুদ্দিন নাসাফি বলেন, 'ওয়াজহ', 'ইয়াদ', 'আইন'... ইত্যাদির কোনোটাই

---

৬০৭. আল-আসমা ওয়াস সিফাত (৩/৬১৬)।

৬০৮. আকিদাতুস সালাফ, সাবুনি (১৯৬, ২২২-২২৩)।

৬০৯. আল-আজনাস, নাতেফি (৪৪৪)।

৬১০. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।

তাবিল ব্যতীত ফারসি (তথা অনারবি ভাষায় অনুবাদ করে) আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা বৈধ নয়।[৬১১] কিন্তু উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ, অন্য ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করতে গেলে শাব্দিক অর্থ অনুবাদের বিকল্প নেই।

আলি কারি বলেন, 'ইয়াদ' তাবিল না করার ব্যাপারে সালাফ একমত হয়েছেন। যেহেতু ইমাম মনে করতেন, যদি অন্যান্য সিফাতের মতো এটাকেও অন্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়, তবে তানযিহ লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে, তাশবিহ ও তাবিল ঢুকে যেতে পারে, তাই তিনি এটাকে অনুবাদ করতেও নিষেধ করেছেন।[৬১২] সালাফ ইয়াদের তাবিল করতে নিষেধ করেছেন—এটা সঠিক বক্তব্য। কিন্তু তানযিহ লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা স্রেফ ইয়াদের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য সিফাতের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। ফলে সেগুলোর অনুবাদও অবৈধ হওয়ার কথা।

বায়াযি লিখেছেন, ফারসিতে 'ইয়াদ' রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় না, স্রেফ অঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'ওয়াজহ'সহ অন্যান্য শব্দ রূপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ জন্য তিনি 'ইয়াদ' অনুবাদ করতে নিষেধ করেছেন।[৬১৩] এটাও বাস্তবানুগ বক্তব্য নয়। ফারসিসহ অন্যান্য ভাষায় 'হাত' রূপক অর্থে আরবির মতোই ব্যবহৃত হয়, স্রেফ অঙ্গের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

আবুল ইউসর বাযদাবি বলেন, 'ইয়াদ', 'আইন' এসব সিফাত অনারবি ভাষায় প্রয়োগ করা যাবে কি না? আহলে সুন্নাতের একদল আলেমের মতে, অঙ্গ না ভাবার শর্তে প্রয়োগ করা বৈধ। আরেক দল সতর্কতাবশত অবৈধ বলেছেন। (আমার কাছে) এটাই বিশুদ্ধ।[৬১৪] কিন্তু উক্ত বক্তব্যের উপর আপত্তি করা যায়। কারণ, আরবিতে 'ইয়াদ' বলে যদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয় এমন বলতে হয় (যেটা আহলে সুন্নাতের সবাই বলেন, খোদ বাযদাবিও বলেছেন), এটাকে বাংলায় স্রেফ 'ইয়াদ'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'হাত' হিসেবে অনুবাদ করে 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়' এমন সতর্কবাণী যোগ করে দিলেই হয়। ফলে আরবিতে যদি এটা বলা যায়, বাংলাসহ অন্যান্য ভাষায়ও অনুবাদ করতে পারা উচিত।

অধমের মতে, এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কথা হলো, 'ইয়াদ'-কে 'হাত' বলার দ্বারা কেউ আল্লাহর ক্ষেত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মনে করতে পারে এমন আশঙ্কা থাকলে তো

---

৬১১. আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (৪৭৩)।
৬১২. শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৯৩)। আদ-দুররুল আযহার (৫৯)।
৬১৩. ইশারাতুল মারাম (১৯১)।
৬১৪. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (৩৯)।

প্রথমেই সেটা পরিত্যাজ্য। এমন আশঙ্কা থাকলে কেবল 'ইয়াদ' নয়, 'ওয়াজহ'-এর অনুবাদও নিষিদ্ধ। তবুও ইমাম স্বতন্ত্রভাবে 'ইয়াদ'-এর অনুবাদ নিষিদ্ধ করেছেন। খুব সম্ভবত এর একটি কারণ এমন হবে যে, ইমাম 'ইয়াদ'-এর ফারসি বা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হওয়ার পরে কিছু বিচ্যুতি (তাশবিহ/তাজসিম) দেখে থাকবেন। আরেকটা কারণ হতে পারে—যেমনটা আমরা পিছনে দেখেছি, সামনেও দেখব—বিভিন্ন সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফে সালেহিন থেকে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ, সকল সিফাতে সকল সালাফের কর্মপদ্ধতি এক ছিল না। বিভিন্ন সিফাত তারা অর্থসহ ইসবাত (অর্থ সাব্যস্ত) করেছেন। অনেকে সিফাত তাফবিজ (অর্থ ও ধরন দুটোই আল্লাহর কাছে সমর্পণ) করেছেন। আবার কোনো কোনো সিফাত তাবিল (রূপকার্থে ব্যাখ্যা) করেছেন। কিন্তু 'ইয়াদ'-এর ক্ষেত্রে সালাফে সালেহিন সবার বক্তব্য এক—এটাকে যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দিতে হবে। কেউ এটার কোনো তাবিল করেননি। ফলে সর্বোচ্চ তানযিহ (বিশুদ্ধ তাওহিদ) বাস্তবায়নের জন্য ইমাম এটার অনুবাদও নিষেধ করে দেন, যাতে তাশবিহ বা তাবিলের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। একই কথা অনেক আলেম 'ইস্তিওয়া', 'নুযুল' ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বলেছেন। উদ্দেশ্য কুরআনি শব্দের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা, সর্বোচ্চ তানযিহ বাস্তবায়ন করা। কারণ, সালাফ এসব সিফাত ভিন্ন ভাষায় উচ্চারণ করেননি। প্রয়োজন ছাড়া সেটা দরকারও নেই।

ফলে ইমাম আজম 'ইয়াদ'-এর অনুবাদ নিষেধ করেছেন বিশেষ প্রেক্ষাপটে, শর্তসাপেক্ষে। তাঁর বক্তব্য উন্মুক্ত ধরা যাবে না। কেউ আরবি ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় 'ইয়াদ'-এর অনুবাদ করলেই সেটা নিষিদ্ধ হবে এমন বোঝা যাবে না। বরং তাশবিহ-তাতিল নাকচ করে যেকোনো ভাষায় আল্লাহর সিফাতগুলোর অনুবাদ বৈধ। তবে উত্তম হলো কুরআনি শব্দের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা।

আল্লাহর নৈকট্য ও দূরত্বের তাৎপর্য: ইমাম আজম রহ. বলেন, **'আল্লাহর নৈকট্য বা দূরত্ব (বস্তুগত) কাছে বা দূরে থাকার ভিত্তিতে নয়, এটা মর্যাদা ও অপমানের ভিত্তিতে। অনুগত বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী, ধরন বর্ণনা ব্যতিরেকে। অবাধ্য আল্লাহ থেকে দূরবর্তী, ধরন বর্ণনা ব্যতিরেকে। একইভাবে জান্নাতে আল্লাহর পাশে থাকা ধরন ব্যতিরেকে। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো ধরন ব্যতিরেকে।'**[৬১৫] ইমামের অনুসরণে মাতুরিদি বলেন, 'আল্লাহর নৈকট্য দূরত্ব ও জায়গার পরিমাপভিত্তিক নয়। কারণ, সেটা সীমারেখা ও স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

৬১৫. আল-ফিকহুল আকবার (৭-৮)।

অথচ আল্লাহ তখন ছিলেন যখন স্থান ছিল না। তিনি এখনও তেমন আছেন। তিনি স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে। সকল স্থান, কাল, সীমারেখা তাঁর সৃষ্টি।'[৬১৬]

এখানেও ইমাম আজম রহ.-এর তানযিহের মানহাজ সুস্পষ্ট। তিনি এগুলোর 'বাহ্যিক' অর্থ গ্রহণের কথা বলে হিসসি/আক্ষরিক অর্থের উপর প্রয়োগ করেননি। মানুষ নৈকট্য ও দূরত্বের বিষয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেভাবে বোঝে, সেভাবে তিনি বোঝেননি। কেবল তিনি নন; সালাফের সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহর 'নৈকট্য' ও 'দূরত্ব' স্থানগত কিংবা দেহগত নয়; বরং জ্ঞান, ক্ষমতা, তত্ত্বাবধান, সওয়াব, অনুগ্রহ, মর্যাদা এমন নানা অর্থে প্রযোজ্য। মালেক, সুফিয়ান সাওরি, আহমদ ইবনে হাম্বল, তাবারি, ইবনুল জাওযি, বাগাভি, ইবনে আব্দিল বার, যাহাবি থেকে এসব অর্থ বর্ণিত হয়েছে।[৬১৭]

একদল লোক আল্লাহর নৈকট্য ও দূরত্বকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। ফলে তারা মনে করেন, 'আল্লাহ আরশের উপর অবস্থান করছেন। যে যত উপরের দিকে উঠবে, সে দৈহিকভাবে তত আল্লাহর কাছে যেতে পারবে। ফলে ফেরেশতাগণ আল্লাহর সবচেয়ে কাছে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মিরাজের রাতে যখন ঊর্ধ্বজগতে গিয়েছিলেন, তখন আল্লাহর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন।' এমন আকিদা সঠিক নয়। কারণ, এ ধরনের বক্তব্য গ্রহণ করলে আল্লাহর শানে অনেক অশোভন বিষয় প্রয়োগ করতে হয়, যা বৈধ নয়। প্রসিদ্ধ হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন : 'ফরয ইবাদতের চেয়ে অন্য কিছুর মাধ্যমে বান্দা আমার কাছাকাছি আসতে পারে না। তবে বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার কাছে আসতে থাকে, একপর্যায়ে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি।'[৬১৮] এখানে খেয়াল করুন, কেউ নফল ইবাদত করলে উপরের দিকে উঠে যায় এমন নয়। বরং ইবাদতকারী ব্যক্তি কিংবা ইবাদত থেকে গাফেল ব্যক্তি উভয়েই একই পৃথিবীতে একই দূরত্বে থাকে। বোঝা গেল, নৈকট্য-দূরত্ব অর্থ আক্ষরিক নয়।

আরেকটি হাদিসে এসেছে, 'বান্দা সিজদা অবস্থায় আল্লাহর সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে। সুতরাং তোমরা সে সময়ে বেশি দোয়া করো।'[৬১৯] অন্য হাদিসে

---

৬১৬. আত-তাওহিদ (৭৯)।

৬১৭. দেখুন: তাফসিরে তাবারি (২১/৪২২)। আল-আরবাঈন, যাহাবি (৬৫)।

৬১৮. বুখারি (কিতাবুর রিকাক : ৬৫০২)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আয়েশা : ২৬৮৩৪)।

৬১৯. মুসলিম (কিতাবুস সালাত : ৪৮২)। আবু দাউদ (কিতাবুস সালাত : ৮৭৫)।

এসেছে, 'বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক বিঘত এগিয়ে যাই। সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে এলে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। সে আমার দিকে হেঁটে এলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।'[৬২০] এখানেও এক বিঘত এবং এক হাত এগিয়ে আসা, দৌড়ানো ইত্যাদি শব্দ মহান আল্লাহর উপর আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করা হবে না। কারণ, তিনি সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। বরং এগুলো আধ্যাত্মিক নৈকট্য, বান্দার প্রতি আল্লাহর মনোযোগ ও অনুগ্রহ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মোটকথা, আল্লাহর নৈকট্য ও দূরত্ব আক্ষরিক ও শারীরিক অর্থে নয়। কারণ, ইমাম আজমসহ সালাফ এগুলোর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেননি। আবার এসব শব্দ সর্বত্র উন্মুক্ত তাবিলও করা যাবে না। কারণ বিভিন্ন হাদিসে আল্লাহর 'নৈকট্য' অত্যন্ত নিগূঢ় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যার তাৎপর্য উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। উদাহরণত হাদিসে এসেছে, 'শেষ রাতে আল্লাহ বান্দার সবচেয়ে কাছাকাছি চলে আসেন',[৬২১] আরেক হাদিসে এসেছে, 'আরাফার দিন তিনি বান্দাদের কাছে চলে আসেন',[৬২২] অন্য হাদিসে এসেছে, 'তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়িয়ে যেন সামনের দিকে থুতু না ফেলে। কারণ নামাযের সময় আল্লাহ সামনের দিকে থাকেন'![৬২৩] আরেক হাদিসে এসেছে, 'কিয়ামতের দিন মুমিনকে আল্লাহর কাছে আনা হবে...'।[৬২৪] এসব হাদিসে আল্লাহর নৈকট্যকে পূর্বোক্ত নির্দিষ্ট কোনো (রূপক) অর্থে প্রয়োগ করা কঠিন। বরং এগুলো নিগূঢ় মর্ম তিনিই ভালো জানেন। এজন্য ইমাম আশআরি রহ. লিখেছেন, 'আল্লাহ বান্দার কাছাকাছি আসেন যেভাবে ইচ্ছা করেন। ধরন ব্যতিরেকে' (بلا كيف)।[৬২৫] ইমাম আজমেরও একই বক্তব্য। তাঁর ব্যবহৃত 'ধরন ব্যতিরেকে' (بلا كيف) শব্দটা এর গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

সালাফে সালেহিন কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। সুতরাং তারা যেখানে যেটা করেছেন, সেটাই করতে হবে। তারা যেটা করেননি, সেটা করা যাবে না। 'ইসবাত' ও 'তাবিল'-এর মাঝে সালাফের এই বিরল

---

৬২০. বুখারি (কিতাবুত তাওহিদ : ৭৫৩৬)। মুসলিম (কিতাবুয যিকর : ২৬৭৫)।

৬২১. তিরমিযি (আবওয়াবুদ দাওয়াত : ৩৫৭৯)। নাসায়ি (কিতাবুল মাওয়াকিত : ৭/৫৭১)।

৬২২. মুসলিম (কিতাবুল হজ্জ : ১৩৪৮)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুল মানাসিক : ৩০১৪)।

৬২৩. বুখারি (কিতাবুস সালাত : ৪০৬)। মুসলিম (কিতাবুল মাসাজিদ : ৫৪৭)

৬২৪. বুখারি (কিতাবু তাফসিরিল কুরআন : ৪৬৮৫)। মুসলিম (কিতাবুত তাওবা : ২৭৬৮)।

৬২৫. আল-ইবানাহ, আশআরি (৩০)।

ভারসাম্য খালাফের মাঝে সমান মাত্রায় বজায় থাকেনি। এটাই সিফাতকেন্দ্রিক আকিদার ক্ষেত্রে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ। এবার আমরা সেদিকে মনোযোগ দেবো।

সিফাতের ক্ষেত্রে খালাফ তথা পরবর্তীদের বিচ্যুতি

সিফাতের ক্ষেত্রে ইমামের মাযহাব সুস্পষ্ট। এর সারমর্ম হলো : এগুলোকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য দেওয়া যাবে না। আবার কল্পিত সাদৃশ্যের দোহাই দিয়ে অস্বীকারও করা যাবে না। ইমাম আজম রহ. এই দুই প্রান্তিকতা এবং এগুলোর পতাকাবাহী তথা জাহম ইবনে সাফওয়ান ও মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের কঠোর সমালোচনা করেছেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, ইমাম বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা জাহম ইবনে সাফওয়ান ও মুকাতিল ইবনে সুলাইমানকে ধ্বংস করে দিন। প্রথমটা অস্বীকারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে, দ্বিতীয়টা সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে।'**[৬২৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইমাম বলেন, **'মুকাতিল সিফাত সাব্যস্তের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে আল্লাহকে সৃষ্টির মতো বানিয়ে দিয়েছে।'**[৬২৭] যাহাবির বর্ণনামতে, ইমাম আজম বলেছেন, **'প্রাচ্য থেকে আমাদের কাছে দুটো নিকৃষ্ট মতবাদ এসেছে—এক. সিফাত অস্বীকারকারী জাহম, দুই. সাদৃশ্যবাদী মুকাতিল।'**[৬২৮] অন্য বর্ণনায় বলেন,

---

৬২৬. ফাযায়িলু আবি হানিফা (১২৪। আল-জাওয়াহিরুল মুযিআহ (১/৩১)।

৬২৭. মিযানুল ইতিদাল (৪/৩৭৫)।

৬২৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা (৭/২০২)। (মিযানুল ইতিদাল (৪/৩৭৫)। মুকাতিল ইবনে সুলাইমান ইমাম আজমের সামসময়িক ছিলেন। মুজাহিদ, আতা, নাফে' প্রমুখ তাবেয়িদের ছাত্র ছিলেন। তাফসিরের ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন সংকটের শিকার হন। ইমাম আজম মনে করতেন, মুকাতিল আল্লাহর সিফাত সাব্যস্তের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে তাশবিহ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর তাফসিরে এমন কোনো বক্তব্য বিদ্যমান নেই। ফলে পরবর্তী অনেকে মুকাতিলের ওপর এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অথচ এমন অস্বীকার খোদ ভিত্তিহীন। কারণ, ইমাম আজম মুকাতিলের ব্যাপারে উপরের বক্তব্য অনুমানমূলক কিংবা কানকথা শুনে দেননি, তিনি তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন। ফলে মুকাতিল অবশ্যই এমন কিছু বলে থাকবেন। কেবল ইমাম আজম নন, মুকাতিলের ব্যাপারে এ ধরনের বক্তব্য অনেকেই দিয়েছেন। আবুল হাসান আশআরি বলেন, মুকাতিল মনে করতেন, 'আল্লাহর দেহ (জিসম) আছে। দেখতে তিনি মানুষের আকৃতিতে। রক্ত-মাংস-চুল ও হাড়ে গঠিত। তাঁর হাত, পা, জিহ্বা, মাথা ও দুই চোখ আছে। তদপুরি তিনি অন্য কারও মতো নন; কেউ তাঁর মতো নয়।' (মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন : ১৬৬) ইবনে হিব্বান বলেন, 'মুকাতিল কুরআনের যেসব বর্ণনা আহলে কিতাবদের গ্রন্থের সঙ্গে মেলে, সেগুলোর জ্ঞান ইহুদি-নাসারাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতেন। তিনি আল্লাহকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য দিতেন।' এসব বর্ণনার সত্যতা খোদ মুকাতিলের বক্তব্যেই পাওয়া যায়। তিনি ইবনে আব্বাসের নামে হাদিস বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন আরশের উপর তাঁর

‘আমরা জাহমের মতো আল্লাহর সিফাত থেকে পলায়ন করি না; আবার মুকাতিল আল্লাহর ব্যাপারে যা বলেছে তা বলি না।’[৬২৯] ফলে ইমামের মাযহাব এই দুটোর মাঝামাঝি। এটাই আহলে সুন্নাতের মাযহাব।

ইমামের অনুসরণে তহাবি বলেন, ‘দ্বীনের ক্ষেত্রে সে ব্যক্তিই নিরাপদে থাকে, যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং যা জানে না (সে ব্যাপারে কথা বলা পরিত্যাগ করে) যিনি জানেন তাঁর জন্যই ছেড়ে দেয়।’ অন্যত্র বলেন, ‘আল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয় বোঝার একমাত্র বিশুদ্ধ পন্থা হচ্ছে, অপব্যাখ্যা (তাবিল) বর্জন এবং আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের উপরই দাঁড়িয়ে আছে সকল রাসুলের দ্বীন, নবির শরিয়ত এবং মুসলমানের দ্বীনদারি। সুতরাং যে ব্যক্তি এসব ক্ষেত্রে অস্বীকার কিংবা (সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার) সাদৃশ্যকরণ থেকে বেঁচে না থাকবে, তার পদস্খলন ঘটবে এবং বিশুদ্ধ তাওহিদ (তানযিহ) পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। কারণ, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের একত্ববাদের গুণে গুণান্বিত, অদ্বিতীয়ের বিশেষণে বিশেষিত, সৃষ্টির কেউ সেসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়।’ অন্যত্র ইমাম তহাবি বলেন, ‘আত্মসমর্পণ এবং বশ্যতা স্বীকার ব্যতীত ইসলামে কারও অবস্থান অবিচল হতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন বিষয় জানতে যাবে যেগুলো জানা তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং এক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করে তুষ্ট থাকবে না, সে নির্ভেজাল তাওহিদ, সুনির্মল জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে। কুফর ও ঈমান, সত্যায়ন ও মিথ্যায়ন, স্বীকার ও অস্বীকৃতির দোলাচলে দোদুল্যমান থাকবে। সন্দেহ নিয়ে পথভ্রষ্টের মতো উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে; না হবে সত্যায়নকারী মুমিন, না মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাফের।’[৬৩০]

সঙ্গে বসাবেন। রাসুল তাঁর হাঁটুর স্পর্শ পাবেন! (মিযানুল ইতিদাল, যাহাবি : ৪৭৬)। আবুল ইউসর বাযদাবি বলেন, ‘কাররামিয়্যাহ, মুকাতিল ইবনে সুলাইমান ও হিশাম ইবনুল হাকাম মনে করত, আল্লাহ শরীরবিশিষ্ট, মানবরূপী, রক্ত ও মাংসের সমন্বয়ে গঠিত।’ (উসুলুদ্দিন : ৩৩) নাসাফিও মুকাতিল ইবনে সুলাইমানকে তাজসিম ও তাশবিহের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। [তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/২৭৩)] যাহাবি বলেন, ‘জাহম ও মুকাতিল ফাসেক ছিল। একজন সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে, আরেকজন সিফাত নাকচের ক্ষেত্রে।’ [মানাকিবুল ইমাম আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি : ৩৫] এগুলো মুকাতিলের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ইমামদের অভিযোগ। ফলে বিনা দলিলে প্রত্যাখ্যান করা দুরূহ। আল্লাহ ভালো জানেন।

৬২৯. আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ (১০৭)।

৬৩০. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১৩,১৪,১৫)।

কিন্তু পরবর্তী লোকেরা এই জায়গাতে থাকেনি। তারা নানান সিফাতের ক্ষেত্রে নানা বিচ্যুতির শিকার হয়েছে। সেসব বিচ্যুতির বিস্তৃত ফিরিস্তি এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এ জন্য আমরা এখানে মোটা দাগে আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত দুটো ভিন্নমুখী প্রান্তিকতা নিয়ে আলোচনা করব।

ইসবাতের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন

এটা ঘটেছে হানাফি মাযহাবের বাইরে। যারা মনে করেন, সিফাতের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ.সহ সালাফের মানহাজ হচ্ছে 'ইসবাত' (তথা অর্থ সাব্যস্ত করে ধরন আল্লাহর কাছে সোপর্দ) করা। এটা বাস্তব কথা। একাধিক সিফাতের একাধিক ইসবাত সালাফ থেকে প্রমাণিত। কিন্তু তারা ইসবাতের ক্ষেত্রে গুলু তথা অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছেন। ইসবাত করতে গিয়ে আল্লাহর উপর এমন অনেক মনগড়া শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যা খোদ সালাফে সালেহিন করেননি। অর্থাৎ, তাদের মূল মানহাজ ঠিক আছে। কিন্তু গুলু তথা অতিরঞ্জনের ফলে তাতে নানারকম বিচ্যুতি এসেছে। নিচে আমরা তাদের অতিরঞ্জনের কয়েকটি উদাহরণ দেবো :

আল্লাহর উপর মনগড়া শব্দ প্রয়োগ : তারা আল্লাহর 'ইস্তিওয়া'-কে বসা (জুলুস) দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। আরশকে আল্লাহর 'স্থান' (মাকান) বানিয়েছেন। আল্লাহর জন্য 'উপর দিক' (জিহাহ) ও 'সীমারেখা' (হদ) সাব্যস্ত করেছেন। আবার সেগুলো কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তারা যতটা তাবিলের আশ্রয় নিয়েছেন, ততটা তাবিল মুতাকাল্লিমগণও করেননি। একজন লিখেছেন, 'আল-হাইয়ুল কাইয়ুম (আল্লাহ তায়ালা) যা ইচ্ছা তা-ই করেন। তিনি যখন ইচ্ছা নড়াচড়া করেন। যখন ইচ্ছা নিচে নামেন, উপরে ওঠেন! ধরেন, ছাড়েন। তিনি যখন ইচ্ছা দাঁড়ান, বসেন! কেননা, জীবিত ও মৃতের মাঝে পার্থক্য হলো নড়াচড়া। প্রত্যেক জীবিত বস্তুর জন্য নড়াচড়া আবশ্যক। প্রত্যেক মৃত বস্তুর জন্য নড়াচড়া অসম্ভব!' এগুলো মোটেই বিশুদ্ধ কথা নয়। কুরআন-সুন্নাহর কথা নয়।

তারা লিখেছেন, 'আল্লাহর জন্য সীমা (হদ), প্রান্ত (গায়াহ) ও শেষ (নিহায়াহ) নাকচ করা জাহম ইবনে সফওয়ানের সকল গোমরাহির মূল ভিত্তি। ...আল্লাহর জন্য সীমা-পরিসীমা নাকচ করা মূলত তাকে অস্তিত্বহীন করে দেওয়া। তাই আল্লাহর সীমা (হদ) রয়েছে! তাঁর স্থানেরও সীমা রয়েছে! তিনি আকাশের উপর তাঁর আরশের উপর। এই দুটো সীমা।'

কেবল এটুকু নয়; বরং যারা আল্লাহর উপর এই বিদআতি শব্দ প্রয়োগ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, তারা তাদের দেশ থেকে বের করে দিয়েছেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে হিব্বান রহ. যখন আল্লাহর উপর 'হদ' শব্দ প্রয়োগে অস্বীকৃতি জানান, তখন তারা তাঁকে সিজিস্তান থেকে বের করে দেন। তাদের মতে, 'ইবনে হিব্বানের ইলম থাকলেও দ্বীনদারি নেই। কারণ, সে আল্লাহর জন্য 'সীমা' অস্বীকার করে।' এভাবে তারা নিজেদের তথাকথিত বিশুদ্ধ আকিদার অনুসারী দাবি করে আহলে সুন্নাতের একজন ইমামকে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের কারণে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে।

অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোথাও আল্লাহর জন্য 'হদ' সাব্যস্ত করেননি। তা ছাড়া, এটা সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য, আল্লাহ সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে উর্ধ্বে। শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার আসকালানি ও ইমাম যাহাবি রহ.-কে আল্লাহ রহম করুন। তারা বিশুদ্ধ আকিদার নামে এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে লিখেছেন। ইবনে হাজার লিখেন, 'এখানে ইবনে হিব্বান হকের উপর ছিলেন। কিন্তু গোঁড়ামির কারণে তারা তাঁর সঙ্গে এই আচরণ করেছে।'[৬৩১] যাহাবি লিখেন, 'লোকদের এই কাজ (অর্থাৎ ইবনে হিব্বানের বিরোধিতা) একটি বিদআত ছিল। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের বাইরে গিয়ে এমন বিষয়ের ঘাঁটাঘাঁটি ছিল, যা তিনি অনুমতি দেননি। কুরআন-সুন্নাহতে এটাকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়নি বা নাকচও করা হয়নি। সুতরাং হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী এ ব্যাপারে মাথা না ঘামানো কর্তব্য। **আল্লাহ তায়ালা 'হদযুক্ত' (তথা সীমাবদ্ধ) হওয়ার উর্ধ্বে। তিনি নিজের উপর প্রয়োগ করেননি তাঁর উপর এমন কিছু প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ।'**[৬৩২]

আল্লাহকে উপরে সাব্যস্ত করতে গিয়ে তারা তাঁকে একটি নির্দিষ্ট জায়গা ও সীমারেখায় কল্পনা করেছেন। ফলে তারা বলেছেন, 'মানুষ যত উপরে উঠবে, আল্লাহর তত কাছে যাবে। ফেরেশতারা আল্লাহর সবচেয়ে কাছে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মিরাজের রাতে যখন উর্ধ্বজগতে গিয়েছিলেন, তখন আল্লাহর কাছে গিয়েছিলেন।' অথচ ইমাম আজম রহ. নিজে উক্ত আকিদার খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, **'আল্লাহর নৈকট্য বা দূরত্ব (বস্তুগত) কাছে বা দূরে থাকার ভিত্তিতে নয়। এটা মর্যাদা ও অপমানের ভিত্তিতে। অনুগত বান্দা আল্লাহর**

---

৬৩১. লিসানুল মিযান (৭/৪৬)।

৬৩২. সিয়ারু আলামিন নুবালা (১৬/৯৭)।

নিকটবর্তী, ধরন বর্ণনা ব্যতিরেকে। আর অবাধ্য আল্লাহ থেকে দূরবর্তী, ধরন বর্ণনা ব্যতিরেকে।'[৬৩৩]

কিন্তু তাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন লিখেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে আরশের উপরে বিশ্বাস করবে, সে পাহাড়ের চূড়া পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আল্লাহর অধিকতর কাছাকাছি সেটাও বিশ্বাস করে। কারণ, পাহাড়ের চূড়া সেটার পাদদেশ থেকে আল্লাহর অধিক কাছাকাছি। ...মিনারের আগা গোড়ার চেয়ে আল্লাহর অধিক কাছাকাছি! বরং যে বস্তু আকাশের যত কাছাকাছি থাকবে, সেটা আল্লাহরও তত কাছাকাছি থাকবে।' এগুলো পরবর্তী লোকদের মনগড়া আকিদা। সালাফের আকিদার সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা নেই।

সালাফের নামে অসত্য প্রচার : বাড়াবাড়ির চরম বাজে দৃষ্টান্ত হলো—এসব ভ্রান্ত আকিদাকে সালাফের আকিদা হিসেবে প্রচার করা। একজন আল্লাহর নড়াচড়া সম্পর্কে লিখেন, "...এই বক্তব্যের ইমামগণ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি (আল্লাহ) নড়াচড়া করেন। এটা আহলে সুন্নাতের ইমাম, যেমন—আহমদ ইবনে হাম্বল, সাইদ ইবনে মনসুর, ইসহাক ইবনে ইবরাহিম প্রমুখের আকিদা। উসমান ইবনে সাইদ দারেমিও এটাকে আহলে সুন্নাতের আকিদা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর জন্য 'নড়াচড়া' অস্বীকারকে জাহমিয়্যাহদের বক্তব্য হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক জীবিত বস্তু নড়াচড়া করে। যা নড়াচড়া করে না সেটা জীবিত নয়। ...নড়াচড়া আল্লাহর কামালিয়্যাত।"

কেউ কেউ আল্লাহর হাত দিয়ে স্পর্শ করার কথাও বলেছেন। আল্লাহর জন্য পিঠ সাব্যস্ত করে সেটা দিয়ে হেলান দেওয়ার কথাও লিখেছেন এবং সালাফের নামে চালিয়ে দিয়েছেন! আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে তারা বর্ণনা করেছেন—আল্লাহ তায়ালা যখন মুসার জন্য তাওরাত লিখলেন, তখন তিনি একটি পাথরের সঙ্গে হেলান দিয়ে লিখেছেন।

আহমদ ইবনে হাম্বল কিংবা সালাফে সালেহিনের নামে এখানে যা বলা হলো, সেগুলো ভিত্তিহীন দাবি। ঠিক আরও বড় ভিত্তিহীন দাবি নড়াচড়াকে আল্লাহর কামালিয়্যাত (পূর্ণতা) বলে দাবি করা। এগুলো কখনোই কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ আকিদা এবং সালাফের আকিদা নয়; বরং দেহবাদীদের আকিদা। আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন জীবিত ও মৃত বস্তুর সঙ্গে তুলনা করার দুঃসাহস। জীবন ও মৃত্যু

৬৩৩. আল-ফিকহুল আকবার (৭-৮)।

বিষয়টা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি চিরঞ্জীব, সদা বিদ্যমান। তিনি মৃত্যুহীন। তাঁর জীবন আমাদের জীবনের মতো সৃষ্ট নয়। তাঁর মতো কিছু নেই। তাহলে আমাদের নড়াচড়া করতে হলে তাঁর কেন করতে হবে? সবচেয়ে বড় কথা, সালাফে সালেহিনের আকিদা হলো : আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলো সাব্যস্ত করা এবং সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকা, মনগড়া কোনোকিছু আল্লাহর উপর প্রয়োগ না করা। তাহলে নড়াচড়া, দাঁড়ানো, বসা—এগুলো আল্লাহর উপর প্রয়োগ করার চেয়ে বড় জুলুম আর কী হতে পারে?

আরেকজন লিখেছেন, "আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—তিনি আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন। আর বসা ছাড়া ইস্তিওয়া হয় নাকি?" আমরা উলটো প্রশ্ন করব, ইস্তিওয়া কেন বসা হবে? তাহলে আল্লাহ তায়ালা বসা শব্দই ব্যবহার করতেন। তা ছাড়া, আপনাদের মূলনীতি হলো, আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন এর বাইরে না যাওয়া। আল্লাহ তো তাঁর জন্য 'বসা' সাব্যস্ত করেননি। তাহলে এটা কি আল্লাহর উপর অনধিকার চর্চা নয়?

বরং আরও জটিলতা হলো ভুলকে সঠিক সাব্যস্ত করা, বিচ্যুতির সাফাই গাওয়া, সঠিকটাকে ভুল বলা। 'সালাফ সালাফ' জপে সালাফের বক্তব্য নিজেদের মনোমতো না হলে ছুড়ে ফেলা, আঘাত করা। যেমন—পিছনে আমরা দেখেছি—ইবনে হিব্বান রহ. যখন আল্লাহকে সীমাবদ্ধ রাখার আকিদার সমালোচনা করলেন, তারা তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলো। উলটো এর মাধ্যমে সহিহ আকিদার জয় হয়েছে বলে গর্বও করল। একইভাবে ইমাম আজম রহ.-এর আকিদা হলো—যেমনটা পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে—তিনি আল্লাহর জন্য 'দিক' সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দিয়েছেন। কিন্তু তারা যেহেতু আল্লাহকে মাথার উপরে কল্পনা করেন, এ জন্য তারা 'দিক' সাব্যস্ত করেন। 'দিক' নাকচকে হারাম ও বাতিল মনে করেন!

অথচ এটা বিভ্রান্তি। আহলে সুন্নাতের আকিদা নয়। কারণ, দিক আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু। আর সৃষ্টি স্রষ্টাকে ধারণ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা সকল দিক ও সীমা-পরিসীমার ঊর্ধ্বে। একইভাবে আমরা পিছনে বলে এসেছি কীভাবে ইমাম আজম আল্লাহকে জিসম থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। তাঁর অনুসরণে সকল আলেম করেছেন। অথচ তারা শত শত বছর পরে এসে দাবি করছেন—সালাফে সালেহিন আল্লাহর উপর জিসম প্রয়োগ করেননি, নিষেধও করেননি। তাহলে ইমাম আজম

এবং অন্য আলেমগণ কী করলেন? ইমাম আজম কি সালাফ নন? উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটা অতিরঞ্জন ইমাম আজমসহ অন্যান্য সালাফের আকিদার বিপরীত। তারা সালাফের নামে যেটা প্রচার করেছেন, সেটা আরও কয়েকশো বছর পরের কিছু লোকের আকিদা, যাদের বিরুদ্ধে দেহবাদের শক্ত অভিযোগ রয়েছে।

ইস্তিওয়াকেন্দ্রিক অতিরঞ্জন : ইসবাত তথা সিফাত সাব্যস্তের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের আরেকটি বড় উদাহরণ হলো আল্লাহর ইস্তিওয়াকেন্দ্রিক অতিরঞ্জন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে আরশের 'উপর' তাঁর 'ইস্তিওয়া'র কথা জানিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ﴾ অর্থ : 'রহমান আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন।' [তহা : ৫] আরও বলেন, ﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۚ﴾ অর্থ : 'অতঃপর তিনি আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন।' [ফুরকান : ৫৯] কুরআনের একাধিক আয়াতে 'ইস্তিওয়া'র কথা এসেছে। এক্ষেত্রে ভ্রান্ত রাফেজা, কাররামিয়্যাহ ও মুজাস্‌সিমাহ সম্প্রদায় বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে। বাড়াবাড়ি নিয়ে আবার নিজেদের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। তারা আরশকে খাট কিংবা সিংহাসন তথা স্থান কল্পনা করে আল্লাহকে এর উপর উপবিষ্ট ও অবস্থানকারী বানিয়ে দিয়েছে। কেউ বলেছে, 'আল্লাহ খাটের সঙ্গে মিশে থাকেন।' কেউ বলেছে, 'মিশে থাকেন না।' কেউ পাঁচ দিকে আল্লাহর সীমা কল্পনা করেছে। কেউ বলেছে, 'আল্লাহ সেখানে অবস্থানের পর আরশের চারদিকে কিছু জায়গা খালি থাকে।' কেউ বলেছে, 'আল্লাহর সাইজ আরশের সাইজের মতো। ফলে তিনি আরশে বসলে কোনো জায়গা খালি থাকে না।' কেউ বলেছে, 'আল্লাহ আরশে বসে তাঁর পা দুটো রেখেছেন কুরসির উপরে!'

তারা আরও লিখেছেন, "আল্লাহ আরশের উপরে। ফেরেশতারা যখন আরশ বহন করেন, তখন প্রথমে সেটা ওঠাতে পারেন না। তারা হাঁটু গেড়ে বসে যান। অতঃপর 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়ার পরে ওঠাতে সক্ষম হন। ...বরং আল্লাহ যদি চাইতেন একটি মশার পিঠেও অবস্থান নিতে পারতেন! তাহলে সাত আকাশ ও সাত যমিনের চেয়ে বড় ও বিশাল আরশের উপর কেন অবস্থান নিতে পারবেন না? বরং তিনি আরশের উপরে। আরশ তাকে বহন করছে।" দেখুন, সহিহ আকিদার নামে এই লোকগুলো আল্লাহকে মশার পিঠে তুলে দিতেও দ্বিধা করেনি। অথচ হৃদয়ে আল্লাহর ইজ্জত (সম্মান) ও হাইবত (সম্ভ্রম) আছে এমন কোনো লোক এ ধরনের কথা কখনোই বলতে পারে না। সহিহ আকিদার সঙ্গে এসবের দূরতম সম্পর্ক নেই।

তারা আরও লিখেছেন, "আল্লাহ তাঁর আরশের উপরে, সৃষ্টি থেকে সুস্পষ্ট দূরত্বে (بفرجة بينة) বিদ্যমান। সৃষ্টির মাঝে আর তাঁর মাঝে সাত আকাশ রয়েছে...। আল্লাহ আরশের উপরে রয়েছেন। সুতরাং তিনি একটা স্থানে রয়েছেন, একটা স্থলে রয়েছেন (أنه في موضع دون موضع، ومكان دون مكان)! কিন্তু জুমার দিন তিনি ইল্লিয়্যিন থেকে কুরসিতে নেমে আসেন...। কিয়ামতের দিন তিনি যমিনে ভ্রমণ করতে থাকবেন। ...শেষ পর্যন্ত পুলসিরাতের নিচে থাকা একটি ব্রিজের উপর অবস্থান করবেন। মানুষ তাঁর উপর দিয়ে পুলসিরাত পার হবে!" নাউযুবিল্লাহ। অথচ বাস্তব কথা হলো, আল্লাহ তায়ালা স্থান ও স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত সৃষ্টির সকল বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র।

জাল ও দুর্বল হাদিসের ব্যবহার : আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে দুর্বল ও জাল বর্ণনা গ্রহণ। ফলে তারা জাল বর্ণনার উপর ভিত্তি করে আল্লাহর শানে এমন শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যার মাঝে আর দেহবাদের মাঝে ফারাক নেই। তারা হাদিস পেশ করেন, 'আল্লাহ আরশের উপর বসেন। ফলে আরশে শুধু চার আঙুল জায়গা ফাঁকা থাকে। হাওদার উপর ভারী মানুষ উঠলে যেমন কটকট আওয়াজ হয়, (আল্লাহ আরশে উঠলে) এমন কটকট আওয়াজ হয়!' এ ধরনের বর্ণনা তারা উমর ইবনুল খাত্তাবের মতো মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। উমর রাযি. পরবর্তী লোকদের দেহবাদ থেকে পবিত্র।

একই পদ্ধতিতে কেউ কেউ বিশুদ্ধ আকিদার নামে আল্লাহকে আটটি পাহাড়ি ছাগলের পিঠে বসিয়ে দিয়েছেন। তাদের মতে, 'এই ছাগলগুলো আসলে ফেরেশতা। তারা আল্লাহর আরশ বহন করছে। আল্লাহর আরশের উপর বসা আছেন।' ফেরেশতারা সবকিছু বাদ দিয়ে ছাগলের রূপ ধারণ করতে গেলেন! বরং কেউ কেউ (স্বপ্নে) আল্লাহকে এক সবুজ বাগানে একটি স্বর্ণের সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখেছেন। চারজন ফেরেশতা সিংহাসনটি বহন করছিল। একজন মানুষের আকৃতিতে, আরেকজন সিংহরূপে, আরেকজন ষাঁড়ের সুরতে, চতুর্থ ফেরেশতা ইগলের আকৃতিতে।' এগুলো অসত্য বর্ণনা। আসমানের ফেরেশতারা যেন ছাগল, ষাঁড় আর জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে সুন্দর কোনো আকৃতিই খুঁজে পাননি।[৬৩৪]

---

৬৩৪. আলোচ্য অধ্যায়ে বর্ণিত বক্তব্যগুলোর সকল উৎস ও সূত্র স্বেচ্ছায় সরিয়ে ফেলা হলো। কারণ বিচ্যুতির জায়গাগুলো চিহ্নিত করা আমাদের উদ্দেশ্য; কোনো ব্যক্তি বা মতাদর্শকে টার্গেট করা উদ্দেশ্য নয়। তথাপি এগুলো

অতিরঞ্জন নিরসন

সিফাত সাব্যস্তের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন এবং আল্লাহর উপর মনগড়া শব্দ প্রয়োগের কিছু কারণ ও যুক্তি আছে। সেই অসার যুক্তি ও কারণগুলো এড়িয়ে চলতে পারলেই এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। যেমন :

এক. আল্লাহর সিফাতগুলোর 'লাওয়াযিম' তথা সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবশ্যকতা খোঁজা যাবে না। এটা করলে বিশুদ্ধ 'ইসবাত' বজায় থাকবে না। যেমন : আল্লাহর শোনা সত্য। কিন্তু সেটার জন্য কান খোঁজা যাবে না। আল্লাহর দেখা সত্য। কিন্তু সেটার জন্য তিনি চোখের মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সেটার জন্য তিনি মস্তিষ্কের মুখোপেক্ষী নন। আল্লাহ ভালোবাসেন। কিন্তু সেটার জন্য তিনি হৃদয়ের মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ কথা বলেন। কিন্তু সেটার জন্য তিনি মানুষের কথা বলার বিভিন্ন উপকরণ, যেমন জিহ্বা, অক্ষর ইত্যাদির মুখাপেক্ষী নন।

একইভাবে আল্লাহর হাত (ইয়াদ), চেহারা (ওয়াজহ) সত্য। এগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে হবে। এগুলো সাব্যস্ত করতে গিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, রক্ত-মাংস—খোঁজা যাবে না। আল্লাহর উপর জিসম (শরীর), সুরত (আকার-আকৃতি) এ জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তাতে তানযিহের পরিবর্তে তাশবিহ হয়ে যাবে। একইভাবে আল্লাহর দিদার সত্য। আরশের উপর তাঁর ইস্তিওয়া সত্য। 'নুযুল' ও 'মাজি'সহ অন্য সকল সিফাত সত্য। কিন্তু সেগুলো সাব্যস্ত করতে গিয়ে আল্লাহর জন্য কোনো দিক (জিহাহ), সীমা-পরিসীমা (হুদুদ), স্থান (মাকান) ইত্যাদি সাব্যস্ত করা যাবে না। ভৌগোলিক দূরত্ব ও নৈকট্য সাব্যস্ত করা যাবে না। সেটা করতে গেলে আল্লাহকে সৃষ্টির মতো কল্পনা করা হবে। ফলে ইসবাত বা তানযিহের পরিবর্তে উক্ত কাজ তাশবিহ হয়ে যাবে।

দুই. কুরআন-সুন্নাহতে যে সিফাত যেমন এসেছে, সেভাবে রেখে দিতে হবে; শব্দ পরিবর্তন করা যাবে না। ফলে 'ইস্তিওয়া'র জায়গায় 'জুলুস' (বসা), 'সুউদ'

বিস্তারিত জানতে দেখতে পারেন : আর-রাদ্দু আলা বিশর, ইসবাতুল হদ্দ, আস-সুন্নাহ, আত-তাম্বিহ ওয়ার রাদ্দু আলা আহলিল আহওয়া, নাকযুত তাসিস, মিনহাজুস সুন্নাহ, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, মাজমুউল ফাতাওয়া ইত্যাদি গ্রন্থ। উল্লেখ্য, পাহাড়ি ছাগলের উপর আরশ থাকা-সম্পর্কিত বর্ণনাটি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ সুনান গ্রন্থেও এসেছে। কিন্তু এটা বিশুদ্ধ হাদিস নয়। একইভাবে চার প্রাণী-সংক্রান্ত হাদিসটি বাইহাকি বর্ণনা করলেও 'যদি বিশুদ্ধ হয়' শর্ত-সহ উল্লেখ করেছেন। এটাও বিশুদ্ধ হাদিস নয়। বরং জাহেলি লোককথা। ইসলামপূর্ব যুগে মক্কার কাফেররা আল্লাহর আরশবাহি ফেরেশতাদের এমন মনে করত। আকিদায়ে মুহাম্মাদি এগুলো থেকে পবিত্র। [দেখুন : হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ : ১/২২০]

(আরোহণ) ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। আল্লাহ 'কারিম' ও 'জাওয়াদ' (দাতা/মহানুভব); সে জায়গায় 'সাখি' (দাতা) বলা যাবে না। তিনি 'কাদির' (শক্তিশালী); সে জায়গাতে 'বাতাল'/'শুজা' (বীর) বলা যাবে না। তিনি 'রহিম' (দয়ালু)। কিন্তু এর জায়গায় 'রফিক' বলা যাবে না।

একইভাবে এক বচনকে দুই বচন বানানো যাবে না। যেমন কোথাও 'ইয়াদ' (হাত) এলে সেটাকে 'ইয়াদাইন' (দুই হাত) বানানো যাবে না। বহুবচনকে এক বা দুই বচন বানিয়ে প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন আ'ইয়ুন (চোখসমূহ)-কে 'আইন' (চোখ) বা 'আইনাইন' (দুই চোখ) বানানো যাবে না। আল্লাহর 'ইয়াদ', 'ইস্তিওয়া', 'নুযুল' ইত্যাদি সাব্যস্ত করতে গিয়ে 'প্রকৃত' (হাকিকি), 'সত্তাসহ' (বিয-যাত) এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। এটা সালাফের মানহাজ নয়। হ্যাঁ, পূর্ববর্তী যুগের দু-একজন আলেম থেকে এ ধরনের 'বিচ্ছিন্ন' বক্তব্য বর্ণিত আছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা হুজ্জত নন। কারণ, পূর্ববর্তী যুগের এক ব্যক্তি একক কোনো ক্ষেত্রে হুজ্জত নয়। বিশেষত এমন কোনো বিষয়, কুরআন-হাদিসে যে ব্যাপারে তার সমর্থন নেই, অন্য ইমামদেরও বক্তব্য নেই, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কারও বিচ্ছিন্ন মতামত থাকলে প্রত্যাখ্যান করা হবে। ইজতিহাদের কারণে তাকে 'মাযুর' মনে করা হবে। কিন্তু সেই বিচ্যুতির অনুসরণ বৈধ হবে না। বরং এসব ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহতে যেভাবে এসেছে, হুবহু শব্দ ধরে ধরে অনুসরণ করতে হবে। একবিন্দু ডানে-বামে যাওয়া যাবে না।

তিন. শব্দের রূপ পরিববর্তন করা যাবে না। অর্থাৎ, কুরআন-সুন্নাহতে যে শব্দে আল্লাহর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে, সেটাকে অন্য শব্দে রূপান্তর করে তাঁর নাম ও সিফাত হিসেবে প্রয়োগ করা যাবে না। ফলে আল্লাহর কোনো 'সিফাত' (গুণ) বা ফে'ল (ক্রিয়া) থেকে তাঁর নাম বের করা যাবে না। যেমন— আল্লাহ কুরআনে জান্নাতবাসীকে পবিত্র পানীয় পান করানোর কথা বলেছেন ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ অর্থ : 'আর তাদের প্রতিপালক তাদের পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়।' ইনসান : ২১] এখানে পান করানোর আরবি হলো 'সাকা।' এই ফে'ল তথা ক্রিয়াকে ফায়েল তথা কর্মকারক বানিয়ে আল্লাহকে 'সাকি' বলা যাবে না।[৬৩৫] আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, 'রহমান আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন।' এখানে 'ইস্তিওয়া'-কে পরিবর্তন করে আল্লাহ আরশের উপর 'মুস্তাওয়িন' এমন বলা যাবে না।

---

৬৩৫. আস-সাহায়িফুল ইলাহিয়্যাহ (৩৯১)।

অতিরঞ্জন নিরসনে ইমাম আবু হানিফা এবং হানাফি আলেমদের বক্তব্য : ইমাম আজম রহ. এ কারণে আল্লাহর জন্য 'শরীর' (জিসম), 'আকার' (সুরত), 'সীমা' (হদ্দ), 'স্থান' (মাকান), 'দিক' (জিহাহ) সবকিছু নাকচ করেছেন। ইমাম বলেন, **"তিনি 'শাইউন' (বস্তু), কিন্তু অন্যান্য বস্তুর মতো নন। আর 'শাইউন'-এর অর্থ হলো 'জিসম' (দেহ), 'জাওহার' (মৌল), 'আরাজ' (বাহ্যিক রূপ-রং)-বিহীন বিদ্যমান সত্তা। তাঁর কোনো 'হদ' (সীমা) নেই।"**[৬৩৬] 'দিক' নাকচ প্রসঙ্গে ইমাম বলেন, **'আল্লাহর দিদার কোনো ধরন (কাইফিয়্যাহ), সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য (তাশবিহ) ও দিক (জিহাহ) ছাড়া। কারণ, আল্লাহ এসবের ঊর্ধ্বে।'**[৬৩৭]

স্থান নাকচ প্রসঙ্গে ইমাম বলেন, **"আল্লাহ তায়ালা তখন ছিলেন, যখন কোনো স্থানের অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ তায়ালা তখন ছিলেন, যখন 'কোথায়', 'সৃষ্টি' কিংবা 'বস্তু' এমন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। কারণ, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা।"**[৬৩৮] ইমাম আরও বলেন, **"আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন; কিন্তু তিনি আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী নন; আরশের উপর 'স্থির' (ইসতিকরার) নন। বরং তিনি কোনো প্রয়োজন ছাড়াই আরশ ও আরশের বাইরে অন্য সকল বস্তুর রক্ষাকর্তা। সৃষ্টির মতো তিনি যদি কোনো জিনিসের মুখাপেক্ষী হতেন, তবে জগৎ সৃষ্টি ও পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন না। তিনি যদি বসা কিংবা স্থির হওয়ার প্রতি মুখাপেক্ষী হতেন, তবে আরশ সৃষ্টির আগে আল্লাহ কোথায় ছিলেন? আল্লাহ এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।"**[৬৩৯]

পরবর্তী হানাফি উলামায়ে কেরাম ইমামের অনুসরণে আল্লাহকে দিক (জিহাহ), সীমা (হদ), স্থান (মাকান) ও কাল (যামান)সহ এ ধরনের সকল 'লাওয়াযিম' (সৃষ্টির আবশ্যকতা) যা কুরআন-সুন্নাহতে আসেনি, সেগুলো থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন।[৬৪০]

---

৬৩৬. আল-ফিকহুল আকবার (২)।

৬৩৭. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৫৮-৫৯)।

৬৩৮. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৭)।

৬৩৯. আল-ওয়াসিয়্যাহ (পাণ্ডুলিপি) (৩)।

৬৪০. দেখুন : তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/২৭২-২৭৩)। বাহরুল কালাম, নাসাফি (৩০-৩১)। লুবাবুল কালাম, উসমান্দি (পাণ্ডুলিপি : ৪৬-৪৭)। উসুলুদ্দিন, গযনবি (৬৯-৭০)। আস-সাহায়িফুল ইলাহিয়্যাহ, সমরকন্দি (৩৭৩)। শরহুল খায়ালি আলা নুনিয়্যাতি খিজির বেগ (১৭৮)। আদ-দুররুল আযহার, সিলেটি (৪৬)।

■ ইমাম তহাবি (৩২১ হি.) বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের সীমা-পরিসীমা ও গণ্ডির ঊর্ধ্বে। তিনি সকল উপাদান, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও উপকরণ থেকে মুক্ত। সৃষ্টির মতো ছয় দিক তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।'[৬৪১]

■ আবু হাফস বুখারি বলেন, "আল্লাহর জন্য কোনো স্থান, কাল, (স্থানান্তর অর্থে) 'আসা', 'যাওয়া' ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।" অন্যত্র বলেন, "আল্লাহর জন্য স্থান সাব্যস্ত করা যাবে না। (মাখলুকের গুণের মতো) আসা, যাওয়া এবং অন্যান্য বিষয় তাঁর উপর প্রয়োগ করা যাবে না। ফলে এটা বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ কোনো স্থানের উপর নন। তিনি কোনো স্থানের মুখাপেক্ষী নন। আরশ তাঁর কুদরতে বিদ্যমান। ...মোটকথা, মুতাশাবিহ আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে কর্তব্য হলো এগুলোতে ঈমান রাখা, ব্যাখ্যা না করা। কারণ, এগুলো ব্যাখ্যা করতে গেলে সিফাত নাকচ হয়ে যায়, যা বিদআতি মুআত্তিলাদের মাযহাব। ফলে এগুলোর ইলম আল্লাহর কাছে সঁপে দিতে হবে।"[৬৪২]

■ মাতুরিদি (৩৩৩ হি.) বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা যখন ছিলেন, তখন স্থান ছিল না। আবার এমনও হওয়া সম্ভব যে, স্থান থাকবে না, কিন্তু আল্লাহ থাকবেন। ফলে তিনি যেমন ছিলেন, এখনও তেমন আছেন, ভবিষ্যতেও তেমন থাকবেন। কারণ, তিনি সকল পরিবর্তন-পরিবর্ধন, ধ্বংস-বিলুপ্তি ও বিবর্তন থেকে পবিত্র। এগুলো সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ স্রষ্টা। ফলে তিনি চিরন্তন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, অপরিবর্তনীয়। তিনি যেমন ছিলেন, তেমন আছেন।'[৬৪৩]

■ আবু ইউসর বাযদাবি বলেন (৪৯৩ হি.), "আহলে সুন্নাতের মতে-আল্লাহ কোনো স্থানের উপর নন। আরশ কিংবা অন্য কোনো বস্তুকেই আল্লাহর স্থান ভাবা যাবে না। আল্লাহর জন্য কোনো জিহাহ তথা দিক সাব্যস্ত করা যাবে না। ...কাররামিয়্যাহ, ইহুদি এবং যারা আল্লাহকে 'শরীর' মনে করে, তারা বলে, আল্লাহ আরশের উপর 'অবস্থান' গ্রহণ করেছেন। তাদের কারও মতে, অন্য সবকিছুর মতো আল্লাহরও ছয় দিক রয়েছে। কারও মতে, ছয় দিক নয়, কেবল এক দিক (উপর) রয়েছে। এটা কাররামিয়্যাহদের বক্তব্য...। কিন্তু সঠিক কথা হলো, আল্লাহ কোনা স্থানে নন। বরং তিনি স্থান সৃষ্টির আগে যেমন ছিলেন,

---

৬৪১. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১৫)।

৬৪২. আস-সাওয়াদুল আজম (৫, ৪০)।

৬৪৩. আত-তাওহিদ (৫৪)।

এখনও তেমন। কারণ, তিনি সকল পরিবর্তন ও স্থানান্তর থেকে উর্ধ্বে...। আল্লাহ তায়ালা নবিজি (ﷺ)-কে মিরাজের রাতে উর্ধ্বজগতে নিয়েছেন। এটা এ জন্য নয় যে, তিনি সেখানে থাকেন; বরং তাঁর কুদরত দেখানোর জন্য একটি জায়গা নির্ধারণ করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। যেমন—তিনি মুসা আ.-কে তুর পাহাড়ে যেতে বলেছেন, অথচ তিনি তুর পাহাড়ে থাকেন না। একইভাবে তিনি কাবা যিয়ারত করতে বলেছেন, কাবার দিকে ফিরে নামায পড়তে বলেছেন, অথচ তিনি কাবার ভিতরে নন। দোয়ার মাঝে আমরা উপরের দিকে তাকাই এ জন্য নয় যে, তিনি সেদিকে বিদ্যমান। বরং উপরের দিকটা রহমত অবতরণের স্থান এবং দোয়ার কিবলা।"[৬৪৪]

- নাসাফি (৫০৮ হি.) বলেন, "জাহমিয়্যাহরা মনে করে, আল্লাহ সর্বত্র। এক্ষেত্রে তারা সেসব আয়াত দিয়ে দলিল দেয়, যেগুলোতে আল্লাহর কোনো স্থানে থাকা বোঝা যায়। যেমন—আল্লাহ বলেন, ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ﴾ অর্থ : 'তিনি আকাশে ইলাহ, যমিনেও ইলাহ।' [যুখরুফ : ৮৪] অন্যত্র বলেন, ﴿وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ فِي الْاَرْضِ﴾ অর্থ : 'তিনি আল্লাহ আকাসমূহে ও যমিনে।' [আনআম : ৩] আরও বলেন, ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ অর্থ : 'আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা-কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, তিনি কেয়ামতের দিন তা তাদের জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।' [মুজাদালা :৭] এসব ক্ষেত্রে আহলে হকের মাযহাব হলো, 'তাঁর মতো কিছু নেই।' [শুরা : ১১] ফলে উপরের আয়াতগুলো দিয়ে আল্লাহর কোনো স্থানের মাঝে হওয়া, কোনো স্থানের উপর হওয়া, বসা, স্থির হওয়া, অবস্থান করা ইত্যাদি বোঝানো

---

৬৪৪. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (৪০-৪২)। উসুলুদ্দিন, গযনবি (৭১)।

যাবে না। আল্লাহকে বিশেষ কোনো স্থানে কিংবা সকল স্থানে কল্পনা করা যাবে না। আল্লাহর জন্য কোনো দিক বা একাধিক দিক সাব্যস্ত করা যাবে না। বরং এসব আয়াতকে যেভাবে এসেছে সেভাবেই রেখে দেওয়া হবে।'[৬৪৫] নাসাফি তাঁর বাহরুল কালামে লিখেন, 'আল্লাহ এক, শরিকবিহীন। তিনি সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। তাঁর মতো কিছু নেই। তাঁর সদৃশ কিছু নেই। তাঁর উপর আকার-আকৃতি (শাকল) প্রয়োগ করা যাবে না। তিনি সকল ত্রুটির ঊর্ধ্বে। স্থান ও সময় সৃষ্টি করার আগে তিনি ছিলেন। অতঃপর তিনি আরশ সৃষ্টি করেছেন, সময় সৃষ্টি করেছেন। আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন। কিন্তু তিনি আরশ থেকে অমুখাপেক্ষী। আরশ তাঁর স্থান কিংবা অবস্থানস্থল নয়। বরং তিনি আরশসহ সকল স্থানের রক্ষাকর্তা। তিনি সকল স্থানের ঊর্ধ্বে।'[৬৪৬]

- আবু ইসহাক সাফফার (৫৩৪ হি.) বলেন, "আল্লাহ সকল (সুরত) আকৃতির স্রষ্টা। আল্লাহর উপর 'সুরত' (আকার-আকৃতি) শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। ইহুদিরা আল্লাহকে সুরত কল্পনা করেছে। একদল মুসলিম সম্প্রদায়, যেমন ইবরাহিম ইবনে আবি ইয়াহইয়া, দাউদ আল-জাওয়ারেবি, হিশাম ইবনুল হাকাম জাওয়ালেকি আল্লাহকে মানুষের আকৃতিতে কল্পনা করেছে। তারা বলত, আল্লাহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে! জাওয়ারেবি বলত, আল্লাহর দাড়ি ও লজ্জাস্থান ছাড়া সবকিছু আছে! হিশাম ইবনে সালেম বলত, আল্লাহর উপরের অর্ধেক ফাঁকা। তাঁর চুল কালো! মুগিরা ইবনে সাইদ বলত, আল্লাহ মানুষের আকৃতিতে বিদ্যমান। তাঁর মাথার উপর মুকুট রয়েছে। তাঁর পেট ও হৃদয় আছে। সেটা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ!" নাউযুবিল্লাহ! কেউ আল্লাহকে কোঁকড়া চুলবিশিষ্ট দাড়ি-মোচহীন যুবকের মতো বলত। আরেক দল আল্লাহকে খ্রিষ্টানদের মতো মানুষের আকৃতির ভিতরে ঢুকে যাওয়া কল্পনা করেছে। এরা মূলত পুনর্জন্ম, হুলুলসহ বিভিন্ন বিভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসী। ...প্রশ্ন আসতে পারে—একটা হাদিসে এসেছে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি আমার প্রভুকে সর্বোত্তম 'আকৃতিতে' দেখেছি—এর অর্থ কী? এর অর্থ হলো, তাঁকে সর্বোত্তম রূপে দেখেছেন। এটা ব্যক্তির আমলের উপর নির্ভরশীল। কারণ, সকল আলেম একমত যে, আল্লাহর প্রকৃত রূপ এ জগতে

---

৬৪৫. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/৩৩৪, ৩৪০-৩৪৪)।

৬৪৬. দেখুন : বাহরুল কালাম (৫৫-৫৬)।

কেউ দেখতে পারবে না—জাগ্রত অবস্থায় নয়, স্বপ্নেও নয়।[৬৪৭] সাফফার আরও বলেন, (আল্লাহকে কোনো স্থানে কল্পনা করে) "তিনি কোথায় সেটা বলা যাবে না। কারণ, কোনো জিনিস তাকে বহন করে না। কোনোকিছু তাঁকে ধারণ করে না। সামনে, পিছনে, উপর, নিচ, ডান, বাম তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। মুখোমুখি, পাশাপাশি, কাছাকাছি—এসব বিষয়ের ঊর্ধ্বে তিনি।"[৬৪৮]

- লামিশি (৫৫২ হি.) লিখেন : "ইহুদি, মুজাসসিমাহ (দেহবাদী), কাররামিয়্যাহ ও চরমপন্থি রাফেযিরা মনে করে—আল্লাহ আরশের উপর অবস্থান গ্রহণকারী। তারা এক্ষেত্রে 'ইস্তিওয়া' ও 'উলু'-সম্পর্কিত আয়াতগুলো দিয়ে দলিল দেয়। অথচ এগুলো তাদের দলিল নয়। কারণ, আল্লাহ সকল দিকের ঊর্ধ্বে।"[৬৪৯]

- সাবুনি (৫৮০ হি.) বলেন, "আল্লাহর উপর 'জিসম' ও 'সুরত' শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। ...তেমনইভাবে আল্লাহকে কোনো স্থানে অবস্থানকারী ভাবা যাবে না। কোনোকিছু তাকে বহন করে না; আল্লাহ তায়ালা সকল দিক ও স্থান থেকে পবিত্র। তিনি কোনো স্থানে অবস্থান গ্রহণ থেকে পবিত্র। উপর, নিচ, ডান, বাম এগুলো সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি সৃষ্টি না থাকত, তবে ডান-বাম, উপর-নিচ, সামনে-পিছনে বলতে কিছু থাকত না।"[৬৫০]

- কাসানি (৫৮৭ হি.) তাঁর আকিদার গ্রন্থ শুরুই করেছেন এভাবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি প্রতিপালক, প্রশংসিত; যিনি সকল দিক ও সীমারেখা থেকে পবিত্র' (المنزه عن الجهات والحدود)। তিনি আরও লিখেন, 'আল্লাহ জিসম, জাওহার ও আরাজ নন। তিনি কোনো স্থানের ভিতরে বা স্থানের উপরে নন। তিনি ছয় দিকের কোনো দিকে নন। তিনি কোনো কালে বা স্থানে নন। তিনি যখন ছিলেন, তখন কাল ও স্থান কিছুই ছিল না। এখনও তিনি তেমন আছেন, যেমন ছিলেন। স্থান ও কাল তাকে ধারণ করতে পারে না। আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দোয়া করি মানে আল্লাহ আকাশে আছেন এমন নয়।

---

৬৪৭. তালবিসুল আদিল্লাহ (৬০৩-৬১০)।
৬৪৮. তালবিসুল আদিল্লাহ (১৫৪)।
৬৪৯. আত-তামহিদ, লামিশি (৬৪-৬৫)।
৬৫০. দেখুন : আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ (৭১-৭৫)। আল বিদায়াহ মিনাল কিফায়াহ (৪৪-৪৮)। আত-তামহিদ, লামিশি (৬৫)।

বরং এটা ইবাদতের পদ্ধতি। যেমন—কাবাঘরের দিকে ফিরে আমরা নামায পড়ি। এ জন্য নয় যে, আল্লাহ কাবাঘরের মাঝে আছেন।'[৬৫১]

■ হাফিজুদ্দিন নাসাফি (৭১০ হি.) লিখেন, 'রাফেযিরা আল্লাহকে মানুষের আকৃতিতে (সুরত) মনে করে। আহলে সুন্নাতের মতে, আল্লাহ তায়ালা সুরত থেকে পবিত্র। স্থান ও দিক থেকে পবিত্র।'[৬৫২]

■ আলাউদ্দিন বুখারি (৮৪১ হি.) লিখেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা কোনো স্থানে নন। কারণ, তিনি সবসময় ছিলেন, অথচ স্থান একসময় ছিল না। ফলে তাঁর কোনো স্থানে থাকা তাঁর মাঝে পরিবর্তনের নির্দেশক; অথচ আল্লাহ সব ধরনের পরিবর্তন ও সৃষ্টির গুণাবলি থেকে মুক্ত।'[৬৫৩] বুখারি আরও লিখেন, 'সালাফে সালেহিনের কাছে আল্লাহর সাতটির বাইরেও অসংখ্য সিফাত রয়েছে, যেগুলোর প্রকৃত রূপরেখা আমাদের জানা নেই। কিন্তু সেগুলোর হাকিকি অর্থ যা দেহবাদিতার দিকে নিয়ে যায়, সেগুলোও উদ্দেশ্য নয়; বরং আমরা এগুলোর জ্ঞান আল্লাহর কাছে সঁপে দেবো, যেমনটা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ ছাড়া এগুলোর ব্যাখ্যা আর কেউ জানে না।' [আলে ইমরান : ৭][৬৫৪]

■ কামাল ইবনুল হুমাম (৮৬১ হি.) লিখেন, 'হাত', 'আঙুল' ইত্যাদিসহ এ জাতীয় সকল বিষয়ে এই আকিদা রাখতে হবে যে, এগুলো আল্লাহর সিফাত; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়।[৬৫৫]

■ কাসেম ইবনে কুতলুবুগা (৮৭৯ হি.) লিখেছেন, "আরশের উপর আল্লাহর ইস্তিওয়া আল্লাহর ধরনহীন সিফাত। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন, যেভাবে তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেভাবে। তিনি (কোথাও) অবস্থান গ্রহণ এবং স্থির হওয়া থেকে পবিত্র। ইমাম শাফেয়ি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরআন ও সুন্নাহতে এসব সিফাত যেভাবে এসেছে, আমরা

---

৬৫১. আল-মুতামাদ ফিল মুতাকাদ, কাসানি (১, ৮)।

৬৫২. দেখুন : আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (১৫৮-১৫৯)।

৬৫৩. রিসালাহ ফিল ইতিকাদ (১১৯)।

৬৫৪. মুলজিমাতুল মুজাস্‌সিমাহ (৬৬)।

৬৫৫. আল-মুসামারাহ (৩৫-৩৬)।

সেভাবে সাব্যস্ত করব। এগুলোর তাশবিহ নাকচ করব, যেমনটা আল্লাহ নিজে করেছেন। এক্ষেত্রে আমাদের সালাফের মানহাজ হলো—এগুলোর প্রতি আমরা ঈমান রাখব। এগুলোর তাবিল (ব্যাখ্যা) আল্লাহর কাছে সঁপে দেবো। (সৃষ্টির) সাদৃশ্য থেকে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করব। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর শাব্দিক অনুসরণ করতে হবে। বাইরে অতিরিক্ত একটা শব্দও বলা যাবে না। অর্থাৎ, 'ইস্তিওয়া'-কে অন্য কোনো শব্দ দিয়ে (যথা ইসতিকরার) কিংবা অন্য কোনো শব্দরূপে (যথা মুসতাউইন) বলা যাবে না। শব্দ পরিবর্তন করা যাবে না। যেমন—'ইস্তিওয়ার' ক্ষেত্রে কুরআনে 'আলা' বলা হয়েছে। সুতরাং সমার্থক হওয়া সত্ত্বেও 'আলা'-এর জায়গায় 'ফাওকা' বলা যাবে না।"[৬৫৬] ইবনে কুতলুবুগা আরও লিখেন, "কুরআনে এ জাতীয় বর্ণিত সকল শব্দ যেমন 'ওয়াজহ', 'আইন', 'জামব', 'সাক', হাদিসের শব্দ, যেমন—'আল্লাহ আদমকে রহমানের সুরতে সৃষ্টি করেছেন', আল্লাহ প্রতি রাতে দুনিয়ার আকাশে নুযুল করেন'—এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে।"[৬৫৭]

- আবুল মাহাসিন কাওকজি (১৩০৫ হি.) বলেন, "আল্লাহ আসমান কিংবা যমিনের কোনো স্থানে নন, বরং তিনি স্থান ও কাল সৃষ্টির আগে যেভাবে ছিলেন, এখনও সেভাবে আছেন...। আল্লাহ দিক ও দেহাবয়বের সকল বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র। সুতরাং তাঁর জন্য 'ডান', 'বাম', 'পিছন', 'সম্মুখ', 'উপর', 'নিচ' সাব্যস্ত করা যাবে না।"[৬৫৮]

আল্লাহর জন্য 'দিক'-সম্পর্কিত সংশয় নিরসন : প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহর জন্য সকল দিক নাকচ করলে আল্লাহর অস্তিত্ব নাকচ করা হয় না? তিনি কোথাও নেই মানে তিনি নেই—এমন হয় না? আমরা বলব, না, এটা অর্থহীন যুক্তি। আল্লাহ কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে। সকল স্থান ও দিকের ঊর্ধ্বে। এগুলো সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য। স্রষ্টার জন্য প্রযোজ্য নয়। তিনি কোনো দিক বা স্থানেই সীমাবদ্ধ নন। তাহলে তার জন্য দিক নাকচ করলে তার অস্তিত্ব কেন নাকচ করা হবে? উপরন্তু পৃথিবীর বাইরে মহাবিশ্বে দিকের ধারণা নিতান্তই আপেক্ষিক। বরং পৃথিবীতেও

---

৬৫৬. আল-মুসামারাহ ফি শরহিল মুসায়ারাহ (৩১-৩২)।
৬৫৭. আল-মুসামারাহ (৩৫-৩৬)।
৬৫৮. মুখতাসারুল ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (৭-১০)।

দিকগুলো পুরোটাই আপেক্ষিক ব্যাপার। আপনি-আমি মুখোমুখি দাঁড়ালে আমার যা সামনে আপনার তা পিছনে; আমার যা ডানে আপনার তা বামে। বরং উলটো হয়ে দাঁড়ালে আমার যা নিচে আপনার তা উপরে। ফলে আল্লাহকে এসব কৃত্রিম দিকে সীমাবদ্ধ করা বরং দুঃসাহসিকতা। এ জন্য সকল মুতাকাদ্দিম ইমামগণ আল্লাহকে দিকমুক্ত বলেছেন। দিক সাব্যস্ত করলে আল্লাহর উপর এমন শব্দ ও গুণ প্রয়োগ করা হলো, যা তিনি নিজে বা রাসুল বা সালাফের কেউ করেননি।[৬৫৯]

আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা পৃথিবীর আকার-আকৃতি ও অবকাঠামো সম্পর্কে একরকম নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করছি। আমরা জানতে পারছি, মহাবিশ্বে দিকের ধারণা শাশ্বত নয়। ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, অবস্থান ইত্যাদির প্রেক্ষিতে দিক নির্ণীত হয়। ফলে 'উপর' বলতে শাশ্বত কোনো 'উপর' নেই। নিচ বলতে শাশ্বত কোনো 'নিচ' নেই। আমাদের জ্ঞানীরা এটা আরও প্রায় সহস্র বছর আগেও অনুভব করেছিলেন। আল্লামা জামালুদ্দিন খাব্বাযি এপ্রসঙ্গে লিখেন, 'ঘরের ছাদ বেয়ে যদি একটি ভিমরুল হাঁটে তবে উপর-নিচ কীভাবে নির্ণীত হবে? একদিক থেকে ভিমরুলটি উপরে। কারণ, সে মানুষের মাথার উপর হাঁটছে। আরেক দিক থেকে ভিমরুলটি নিচে; কারণ, মানুষ তাঁর মাথার উপরে। অন্যকথায়, ঘরের ছাদ বেয়ে ভিমরুল হাঁটলে যেহেতু ঘরের ভিতরে থাকা মানুষ ও ভিমরুলের মাথা একদিকে হয়ে যায়, ফলে মানুষের বিবেচনায় ভিমরুল উপরে আর ভিমরুলের বিবেচনায় মানুষ উপরে।'[৬৬০] এই যদি হয় সৃষ্টির ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে। মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে তো এটা আরও বেশি প্রযোজ্য। ফলে সেখানে দিক বলতে চিরন্তন কিছুর অস্তিত্ব থাকে না।

আল্লাহর ক্ষেত্রে 'উপর'-'নিচ' প্রয়োগ মূলত সমতল ও চ্যাপটা পৃথিবীর কল্পনা থেকে এসেছে। এমনকি একদল মানুষ পৃথিবীকে গোলাকার জানা ও মানার পরও সমতল পৃথিবীর ধারণার প্রভাবে মহাবিশ্বকে শেষ পর্যন্ত সেই সমতলই কল্পনা করে, যার ফলে আল্লাহকে এই ক্ষুদ্র বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলে।

মোটকথা, কুরআনের আয়াতগুলোর বাহ্যিক অর্থ ধরতে গিয়ে আল্লাহর শানে মনগড়া শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'রহমান

---

৬৫৯. দেখুন : আল-আকিদাহ আর রুকনিয়্যাহ, সমরকন্দি (৭-৮)। আত-তামহিদ, নাসাফি (৩৬-৩৯)। জামেউল মুতুন, গুমুশখানভি (৫)।

৬৬০. আল-হাদি ফি উসুলিদ্দিন, খাব্বাযি (৪৮)।

আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন।' [তহা : ৫] এটাকে যদি নিচ থেকে উপরে ওঠা, আরশের উপর ওঠা, বসা, অবস্থান করা ইত্যাদি শব্দে ব্যক্ত করা হয়, তাঁকে আরশের উপর সত্তাসহ হাকিকি অবস্থানকারী হিসেবে মানা হয়, 'নুযুল' বলতে গিয়ে যদি উপর থেকে নিচে অবতরণ বলা হয়,[৬৬১] তবে কুরআনের অন্য আয়াতগুলোকেও বাহ্যিক অবস্থার উপর ছেড়ে দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ﴾ অর্থ : 'তিনি আকাশে ইলাহ, যমিনেও ইলাহ।' [যুখরুফ : ৮৪] সুতরাং আল্লাহকে হাকিকিভাবে আকাশের ভিতরে, মাটির ভিতরে মানতে হবে; ব্যাখ্যা করা যাবে না। আল্লাহ আরেক আয়াতে বলেন, ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟﴾ অর্থ : 'আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা-কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি থাকেন না। পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে আছেন।' [মুজাদালা : ৭] এখানেও হাকিকিভাবে আল্লাহকে সবার সাথে সর্বত্র মানতে হবে; ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। আল্লাহর বাণী, ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ অর্থ : 'তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন।' [হাদিদ : ৪] এটাকেও হাকিকিভাব মানতে হবে; ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। আর এগুলো যদি বিভিন্ন শব্দের মারপ্যাঁচে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তবে ইস্তিওয়াকে যারা ব্যাখ্যা দেয়, তাদের ব্যাখ্যাও মানতে হবে। এটা এমন টানাটানি, যার সমাপ্তি নেই।

ফলে সিফাত সাব্যস্তের নামে আল্লাহর উপর মনগড়া শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। আবার এগুলোর এমন ব্যাখ্যাও করা যাবে না, যা সালাফ থেকে প্রমাণিত নয়। এক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে নুসুসের কাছে আত্মসমর্পণ করা, যতটুকু এসেছে ততটুকুতে থেমে যাওয়া। ইস্তিওয়াকে যেমন আল্লাহর বসা, সত্তাসহ অবস্থান ইত্যাদি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না, তেমনই 'রাজত্ব', প্রতিপত্তি' দিয়ে এর তাবিলও করা যাবে না। বরং ইমাম আজমসহ সালাফ যেটা বলেছেন, সেভাবে

---

৬৬১. দেখুন আবুল হুসাইন মালাতির 'আত-তাম্বিহ ওয়ার রাদ্দ' (১০৩)।

বলতে হবে : **"আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন; কিন্তু তিনি আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। আরশের উপর স্থির ও অবস্থানকারী নন। বরং তিনি কোনো প্রয়োজন ছাড়াই আরশ ও আরশের বাইরে অন্য সকল বস্তুর রক্ষাকর্তা...।"**[৬৬২]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং অন্য আলেমদের বক্তব্য : হানাফি ধারার বাইরে কেবল ইবনে হিব্বান বা যাহাবি নন, যেমনটা পিছনে বর্ণনা করা হয়েছে; বরং বিভিন্ন ধারার অসংখ্য মুহাক্কিক আলেম আল্লাহর উপর সেসব শব্দ প্রয়োগ নিষেধ করেছেন, যেগুলো কুরআন-সুন্নাহতে না আসা সত্ত্বেও পরবর্তী যুগের লোকজন আল্লাহর উপর প্রয়োগ করেছে। ইমাম খাত্তাবি (৩৮৮ হি.) আল্লাহর জন্য 'হদ' সাব্যস্ত করাকে নাকচ করেছেন। একইভাবে মুতাহহার মাকদিসি (৩৫৫ হি.)[৬৬৩], কাযি ইয়ায, ইমাম নববি আল্লাহর জন্য দিক ও সীমা (জিহাহ ও হদ) নাকচ করেছেন।[৬৬৪] হাম্বলী আলেম সাফারিনি লিখেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা হদ তথা সীমাবদ্ধ হওয়ার ঊর্ধ্বে। এটা তাদের খণ্ডন যারা আরশের উপর আল্লাহর ইস্তিওয়াকে সীমাবদ্ধতা মনে করে।'[৬৬৫] এটাই হক কথা।

ইমাম বাইহাকি রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-আসমা ওয়াস সিফাতে' আল্লাহর সিফাত বর্ণনার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, সেটা এক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয় হতে পারে। তিনি আল্লাহর সেসব সিফাত যা সৃষ্টির জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অর্থ বহন করে, সেগুলো বলার সময় প্রত্যেক জায়গাতে সর্বোচ্চ তানযিহ অবলম্বন করেছেন এবং যেকোনো তাশবিহ সংঘটিত হওয়া থেকে সর্বোচ্চ সতর্ক থেকেছেন। তিনি 'ওয়াজহ' (চেহারা) সম্পর্কিত অধ্যায়ের শিরোনাম লিখেন এভাবে : 'ওয়াজহ'-সম্পর্কিত অধ্যায় : সিফাত হিসেবে; সুরত হিসেবে নয়।' 'আইন' (চোখ)-এর অধ্যায়ের শিরোনাম লিখেন : 'আইন'-সম্পর্কিত অধ্যায় : সিফাত হিসেবে; চোখের তারা (তথা দেহের অংশ) হিসেবে নয়।' 'ইয়াদাইন'

---

৬৬২. আল-ওয়াসিয়্যাহ (পাণ্ডুলিপি) (৩)।
৬৬৩. আল-বাদউ ওয়াত তারিখ (১/১৬৬)।
৬৬৪. শরহে মুসলিম, নববি (৫/২৪-২৫)।
৬৬৫. লাওয়ামিউল আনওয়ার (১/২০১-২০২)।

(দুই হাত)-এর অধ্যায়ের শিরোনাম লিখেন : 'ইয়াদাইন'-সম্পর্কিত অধ্যায় : সিফাত হিসেবে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হিসেবে নয়।'[৬৬৬]

সবশেষে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মাযহাব বর্ণনার মাধ্যমে বর্তমান আলোচনা শেষ করছি। মুহাদ্দিসদের মাঝে ইমাম আহমদের আকিদাই কুরআন ও সুন্নাহর সবচেয়ে বেশি প্রতিনিধিত্বশীল, সালাফে সালেহিনের আকিদার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। হাম্বল ইবনে ইসহাক সূত্রে বর্ণিত ইমাম আহমদ বলেন, **"আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালা আরশের উপরে যেভাবে তিনি চেয়েছেন, যেমন চেয়েছেন। এর কোনো 'হদ' (সীমা) নেই, বিবরণ নেই; কেউ এর বর্ণনা দিতে পারবে না, সীমাবদ্ধ করতে পারবে না। এটা আল্লাহর সিফাত তেমন যেমন তিনি বলেছেন।"** ...হাম্বল ইবনে ইসহাক আরও বলেন, আমি ইমাম আহমদকে আল্লাহ তায়ালার 'দুনিয়ার আকাশে নুযুল', 'আল্লাহর দিদার', 'জাহান্নামে আল্লাহর পা রাখা' ইত্যাদি হাদিসগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, **'আমরা এসব হাদিসে ঈমান রাখি। সত্যায়ন করি। এর কোনো ধরন নেই, অর্থ নেই** (لا كيف ولا معنى)**। আমরা এসব হাদিস প্রত্যাখ্যান করি না। রাসুলদের আনীত সকল পয়গাম সত্য মনে করি। বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত রাসুলুল্লাহর সকল বক্তব্য সঠিক মনে করি। এগুলো বর্জন করি না। আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, এরচেয়ে বেশি কিছু সাব্যস্ত করি না। (তাঁর সিফাত) সীমা-পরিসীমা বিহীন** (بلا حد ولا غاية)।' ইমাম আহমদ আরও বলেন, **"আল্লাহ তায়ালা 'সর্বশ্রোতা', 'সর্বদ্রষ্টা।' 'হদ'-বিহীন। পরিমাণবিহীন। কেউ এটার বর্ণনা দিতে পারবে না। ...আল্লাহ তায়ালাকে আখিরাতে দেখা যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ (তাহদিদ) বিদআত। কোনো 'হদ' ও বিবরণ ছাড়া আল্লাহর কাছে সঁপে দিতে হবে। তিনি বলেছেন,** ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ **অর্থ : 'রহমান আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন।' [ত্বহা : ৫] সুতরাং তিনি আরশের উপরে। 'হদ' (সীমা ও সংজ্ঞা)-বিহীন। যেভাবে চেয়েছেন।"**[৬৬৭]

খাল্লাল বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মাযহাব হলো, **'আল্লাহর 'চেহারা' (ওয়াজহ) রয়েছে। কিন্তু সেটা আকার-আকৃতি নয়। শরীরী বস্তু নয়। বরং 'ওয়াজহ' তাঁর সিফাত** (لا كالصور المصورة والأعيان المخططة بل وجهه وَصفه)।

---

৬৬৬. আল-আসমা ওয়াস সিফাত (৩/৪৪৩-৪৬১)।
৬৬৭. ইসবাতুল হদ্দ লিল্লাহ, দাশতি (২১৮-২২০)।

... 'ওয়াজহ' অর্থ দেহ নয়, <u>সুরত</u> নয়, নকশা-অবয়ব নয়। এমন কথা বলা বিদআত (وَلَيْسَ معنى وَجه معنى جَسَد عِنْده وَلَا صُورَة وَلَا تخطيط وَمن قَالَ ذَلِك فقد ابتدع)।' খাল্লাল আরও বলেন, **"ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. আল্লাহর উপর '<u>জিসম</u>' (দেহ) শব্দ প্রয়োগ নিষেধ করেছেন। কারণ, ভাষাবিদদের কাছে 'জিসম' শব্দটি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘনত্ব, গভীরতা, অবকাঠামো, <u>সুরত</u>, গঠন ইত্যাদিবিশিষ্ট বস্তুর উপর প্রয়োগ করা হয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা এ সবকিছু থেকে পবিত্র! সুতরাং আল্লাহকে 'জিসম' বলা বৈধ নয়।"**[৬৬৮]

সুবহানাল্লাহ! কত বিশুদ্ধ ও ভারসাম্যপূর্ণ আকিদা। এই আকিদার মাঝে আর ইমাম আজম আবু হানিফা এবং সবেমাত্র পিছনে উল্লিখিত হানাফি, শাফেয়ি ও হাম্বলি আলেমদের আকিদার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

মোটকথা, সিফাত সাব্যস্ত করা সালাফের মানহাজ। কিন্তু সিফাত সাব্যস্তের নামে অতিরঞ্জন, এগুলোর অর্থের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি, কুরআনি শব্দের পরিবর্তন-পরিবর্ধন, নিজেদের পক্ষ থেকে সংযুক্তি ইত্যাদি সবকিছু পরিত্যাজ্য। এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির অনিবার্য ফলাফল দেহবাদ, যা ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ ইবনে হাম্বলসহ সালাফে সালেহিনের কারও মাযহাব নয়।

তাবিলের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন : সিফাতকেন্দ্রিক খালাফ তথা পরবর্তী লোকদের অতিরঞ্জনের প্রথম ধারার বিপরীত চিত্র হলো তাবিলের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন। এটা ঘটেছে স্বয়ং ইমাম আজম রহ.-এর অনুসারীদের মাঝে, যদিও তারা প্রথম দিকে এটাকে 'আবশ্যক' না করে স্রেফ বৈধতা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে 'তানযিহ'-এর নামে 'তাবিল' আবশ্যক হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে, ভারসাম্যপূর্ণ ইসবাত (অথবা তাদের ভাষায় তাফবিজ)[৬৬৯], যা ইমাম আজমসহ

---

৬৬৮. খাল্লালের বর্ণনায় 'আল-আকিদাহ' (১০৩, ১১১)।

৬৬৯. সালাফের মাযহাবকে 'ইসবাত' বলা হবে নাকি 'তাফবিজ' এটা নিয়ে লম্বা বিতর্ক বিদ্যমান। অথচ এটা একটা নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজনীয় বিতর্ক। পরবর্তী লোকেরা এটা নিয়ে যে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করেছে, সালাফ তা থেকে মুক্ত। সালাফ আল্লাহর সিফাতসমূহ যেভাবে এসেছে, সেভাবে রেখে দিয়েছেন। যেখানে শাব্দিক অর্থ সাব্যস্ত করা নিরাপদ, সেখানে করেছেন। যেখানে শাব্দিক অর্থ সাব্যস্ত করা অনিরাপদ, সেখানে করেননি। ফলে এদিক থেকে সালাফের মানহাজ ইসবাত ও তাফবিজের সমন্বয়। অন্যদিক থেকে সালাফের ইসবাত ও তাফবিজের মাঝে ফারাক খুবই সামান্য। কারণ, যেখানে তারা 'ইসবাত' করেছেন, সেখানে স্রেফ শাব্দিক অর্থ সাব্যস্ত করেছেন, হাকিকত আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়েছেন। শাব্দিক অর্থ সাব্যস্ত করার দিকে তাকালে এটা ইসবাত,

সকল সালাফের মাযহাব, তাদের অনেকের কাছে দেহবাদের সমার্থক পরিগণিত হতে থাকে। তারা সিফাতের যেকোনো প্রকারের 'ইসবাত'-কে তাশবিহ ও তাজসিম গণ্য করতে থাকেন।

এভাবে একদল খোদ ইমাম আজমের মানহাজ থেকে দূরে চলে যান। ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও আকিদার এই অংশে ইমামের মানহাজের বিরোধিতা করেন। অথচ এটা রাজেহ-মারজুহের বিষয় নয়, সহিহ-গলতের বিষয়; সালাফকে ছেড়ে খালাফের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়। যেমন—আল্লাহর সিফাতগুলোকে নিজস্ব অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া সালাফের মানহাজ। এটা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সুস্পষ্ট মাসলাক, যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ফলে আমরা দেখতে পাই তিনি বিভিন্ন জায়গাতে স্পষ্ট করে বলেছেন, **'সৃষ্টির কোনো বৈশিষ্ট্য (তথা সিফাত)-কে আল্লাহর উপর আরোপ করা যাবে না। তাকে সৃষ্টির কোনো বিশেষণে বিশেষিত করা যাবে না। তাঁর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তাঁর দুটো সিফাত। কোনো ধরন বা স্বরূপ ছাড়াই সেটা বিশ্বাস করতে হবে। ...আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন এবং সন্তুষ্ট হন। তাঁর ক্রোধকে শাস্তি এবং সন্তুষ্টিকে পুরস্কার ইত্যাদি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। ...বান্দার হাতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে। কিন্তু সেটা সৃষ্টির হাতের মতো নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়। কারণ, তিনি সকল হাতের সৃষ্টিকর্তা। একইভাবে তাঁর চেহারাও সৃষ্টির কোনো চেহারার মতো নয়। কারণ, তিনিই সকল চেহারার সৃষ্টিকর্তা। তাঁর নফস সৃষ্টির নফসের মতো নয়। কারণ, তিনি সকল নফসের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর মতো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা। সর্বদ্রষ্টা।'**[৬৭০]। তিনি আরও বলেন, **'গাযাব' (ক্রোধ) ও 'রিযা' (সন্তুষ্টি) আল্লাহর ধরনবিহীন দুটি সিফাত।**[৬৭১] ইমাম আরও বলেন, **'আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন।'**[৬৭২] তিনি বলেন,

---

হাকিকত অজ্ঞাত থাকার দিকে তাকালে তাফবিজ। চূড়ান্ত ফলাফলের ক্ষেত্রে দেখা যাবে এসব সিফাতের প্রকৃত ইলম উভয়টাতেই নাকচ করা হয়, উভয় পদ্ধতিতেই এগুলোর নিগূঢ় মর্ম, তাৎপর্য ও ধরন আল্লাহর কাছে সঁপে দিতে হয়। 'অর্থ' সাব্যস্ত করার কথা যেটুকু বলা হয়, তাতে নিগূঢ় অর্থ থাকে না। ফলে তাফবিজ মুতলাক আর তাফবিজুল কাইফিয়্যাহর মাঝে ফারাক অতি সামান্য। এটাকে বড় করে দেখা নিষ্প্রয়োজন। বিস্তারিত দেখুন আমাদের 'আকিদাহ তহাবিয়্যাহ'র ভাষ্যগ্রন্থে।

৬৭০. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৬-৫৭)। আল ইতিকাদ, নিশাপুরি (৯০)।

৬৭১. আল-ফিকহুল আকবার (৩)। আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (৫)।

৬৭২. আল-ওয়াসিয়্যাহ (পাণ্ডুলিপি) (৩)।

'আল্লাহ নুযুল করেন, ধরনহীন' (ينزل بلا كيف)।[৬৭৩] ইমাম আরও বলেন, **"আল্লাহ তায়ালার 'ইয়াদ' (হাত), 'ওয়াজহ' (চেহারা) এবং 'নফস' (সত্তা) রয়েছে। যেভাবে কুরআনে এসেছে সেভাবে। এটা বলা যাবে না যে, তাঁর 'ইয়াদ' (হাত) তাঁর কুদরত ও নেয়ামত। কারণ, এভাবে বললে তাঁর সিফাতকে বাতিল করে দেওয়া হয়। আর এটা কাদরিয়্যা ও মুতাযিলাদের বক্তব্য। বরং 'ইয়াদ' (হাত) তাঁর একটি সিফাত। ধরনহীন। 'গাযাব' (ক্রোধ) ও 'রিযা' (সন্তুষ্টি) আল্লাহর দুটি সিফাত। ধরনহীন।"**[৬৭৪]

দুঃখজনক হলো, যেখানে ইমাম রহ. আল্লাহর এসব সিফাত তাবিল করাকে সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে সিফাত 'বাতিল' করার নামান্তর বলেছেন, সেখানে পরবর্তী অনেকে এগুলোকে তাবিল করেছেন এবং তাদের সেই তাবিলকে ইমামের মানহাজ বানিয়ে দিয়েছেন! অথচ ইমাম তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যেমন—কেউ কেউ 'ইস্তিওয়া'-কে 'ইসতিলা' (প্রভাব-প্রতিপত্তি) দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেটাকেই ইমাম আজমের আকিদা হিসেবে পেশ করেছেন। অথচ ইমাম ইস্তিওয়াকে মোটেই 'ইস্তিলা' দিয়ে ব্যাখ্যা করেননি। বাবিরতি এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, 'ইস্তিওয়া'র ক্ষেত্রে ইমাম সালাফের মাযহাব গ্রহণ করেছেন। সেটা হলো নুসুসকে সত্যায়ন করা, আল্লাহর যা উদ্দেশ্য তাতে বিশ্বাস রেখে হাকিকত তাঁর কাছে সঁপে দেওয়া।[৬৭৫]

কেউ কেউ আল্লাহর ক্রোধ (সাখাত, গাযাব)-কে শাস্তি আর সন্তুষ্টি (রিযা, মহব্বত)-কে সওয়াব ও পুরস্কার দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ 'গাযাব'-কে 'প্রতিশোধ' দিয়েও ব্যাখ্যা করেছেন। 'মহব্বত'-কে 'সওয়াবের ইচ্ছা' দিয়ে তাবিল করেছেন। কেউ কেউ বরং ইমামের শাগরেদ আবু মুতি বলখির নাম দিয়ে এ ধরনের তাবিলকে প্রচার করেছেন। আরেকজন শেষ রাতে দুনিয়ার আকাশে আল্লাহর নুযুল (অবতরণ)-কে 'ফেরেশতাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ অবতরণ' দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ ইমাম আজম 'ইস্তিওয়া', 'নুযুল'সহ এগুলো যেভাবে

---

৬৭৩. আল-আসমা ওয়াস সিফাত (৩/৬১৬)।

৬৭৪. আল-ফিকহুল আকবার (৩)।

৬৭৫. দেখুন : শরহুল ওয়াসিয়্যাহ, বাবিরতি (৯২)। পরবর্তী হানাফি আলেমদেরও কেউ কেউ বিভিন্ন সিফাত তাবিল করলেও 'ইস্তিওয়া'কে 'ইস্তিলা' দিয়ে তাবিল করতে বারণ করেছেন। দেখুন : আস-সাহায়িফুল ইলাহিয়্যাহ (৩৭৫)।

এসেছে সেভাবে রাখতে বলেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-কে 'আল্লাহর দুনিয়ার আকাশে নুযুল হওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'আমরা এসব হাদিস বর্ণনা করি, তাতে ঈমান রাখি। কিন্তু ব্যাখ্যা করি না।'[৬৭৬]

আল্লাহর 'ইয়াদ' (হাত) অধিক তানযিহ বাস্তবায়নের জন্য ইমাম আজম যেটার অনুবাদ পর্যন্ত করতে নিষেধ করেছেন, সেটাকে তারা 'নেয়ামত' (অনুগ্রহ) হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কোথাও আবার 'ইয়াদ'-কে ব্যাখ্যা করেছেন 'সাহায্য', 'সমর্থন', 'শক্তি' ইত্যাদি শব্দে। তাদের যুক্তি—আল্লাহর জন্য 'হাত' বললে সেটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে যায়, আর আল্লাহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে মুক্ত। কিন্তু এটা গলত দাবি। 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' বলা ছাড়াও হাত সাব্যস্ত করা যায়, যেমনটা ইমামসহ সকল সালাফ করেছেন। বরং খোদ ইমাম 'ইয়াদ'-এর তাবিলকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। তারা আল্লাহর 'কালাম' (কথা)-কেও ব্যাখ্যা করেছেন 'অনুমোদন' (মুওয়াফাকাহ) ও 'রূপক' (মাজায) অর্থে। স্বাভাবিক 'কালাম' অর্থে রাখেননি। অথচ ইমাম আজম ও ইমাম তহাবিসহ সালাফের ইমামগণ আল্লাহর কালামের এমন রূপক ব্যাখ্যা কঠোরভাবে বারণ করেছেন।

কেউ সর্বত্রই আল্লাহর 'ওয়াজহ (চেহারা)-কে তাবিল করেছেন। যেখানে সালাফ থেকে কোনো তাবিল বর্ণিত নেই সেখানেও। 'ইয়াদ'-কে নেয়ামত, কুদরত, ক্ষমতা, বদান্যতা, ধনাঢ্যতা দিয়ে তাবিল করেছেন। আল্লাহর 'ইতয়ান' ও 'মাজি' (আগমন)-কে 'তাঁর নিদর্শনের আগমন' দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। 'আইন' (চোখ)-কে 'রক্ষণাবেক্ষণ' দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

কেউ কেউ আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে তানযিহ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নেতিবাচক বিষয়গুলোর সঙ্গে সঙ্গে কুরআন-সুন্নাহতে আল্লাহর উপর যেসব সিফাত প্রয়োগ করা হয়েছে, যা তিনি নিজে নিজের উপর কিংবা তাঁর রাসুল তাঁর উপর প্রয়োগ করেছেন, সেগুলোও নাকচ করে দিয়েছেন। একজন লিখেছেন, "আল্লাহর উপর 'সমজাতীয়', 'ধরন', 'অবস্থা', 'হাসি' (যাহিক), 'পেরেশানি', 'মুচকি হাসি', 'আনন্দ', 'বেদনা' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। আল্লাহকে 'আসা' (মাজি), 'যাওয়া' (যাহাব), 'আগমন' (ইকবাল), 'প্রস্থান' (ইদবার)... 'অবতরণ' (নুযুল), 'উড্ডয়ন' (সুউদ), 'অবস্থান গ্রহণ' (ইসতিকরার), 'উপবেশন' (কুউদ) ...ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা যাবে না।" নিঃসন্দেহে

---

৬৭৬. শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৩/৪৮০)।

এগুলোর মাঝ থেকে অনেকগুলো শব্দ আল্লাহর উপর প্রয়োগ বৈধ নয়। বিশেষত সেসব শব্দ, যেগুলো নেতিবাচক অর্থ ধারণ করে। পাশাপাশি সেসব শব্দ, যেগুলো আল্লাহ নিজের উপর কিংবা তাঁর রাসুল তাঁর উপর প্রয়োগ করেননি, কুরআন ও সুন্নাহতে যেসব শব্দ আসেনি। কিন্তু যেসব সিফাত স্বয়ং আল্লাহ নিজের উপর প্রয়োগ করেছেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যেসব সিফাতে আল্লাহ তায়ালাকে বিভূষিত করেছেন, সেগুলোকে বিভিন্ন যুক্তিতে নাকচ করা সালাফে সালেহিনের মানহাজ নয়। উদাহরণত 'আসা' (মাজি)-এর কথা ধরা যাক। তারা বলছেন, এটা আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা যাবে না। অথচ কুরআন-সুন্নাহর একাধিক স্থানে এটা আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। ইমাম আজম এবং তাঁর প্রাথমিক স্তরের শাগরেদগণ প্রয়োগ করেছেন! ইমাম আজম রহ.-এর ছেলে হাম্মাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ অর্থ : 'আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন।' [ফজর : ২২] ফেরেশতাদের আগমনকে (মাজি) অস্বীকার করলে যেমন কেউ কাফের হয়ে যাবে, আল্লাহর আগমনকে (মাজি) অস্বীকার করলেও কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী, এর ধরন কী, সেটা আমাদের জানা নেই, জানা দরকারও নেই। আমাদের কাজ কেবল ঈমান আনা।"[৬৭৭] পরবর্তী লোকদের বক্তব্য কি এরচেয়ে বিশুদ্ধতর? মোটেই নয়।

বরং তাবিল করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য আর মুতাযিলাদের বক্তব্য অভিন্ন হয়ে গেছে, যে ব্যাপারে ইমাম আজম রহ. নিজেই সতর্ক করে গিয়েছিলেন। এভাবে ইমামের মানহাজ থেকে সরে যাওয়ার কারণে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। ফলে নিজেরাই নিজেদের খণ্ডন করেছেন। যেমন—তাদের একজন 'আরশ'-কে 'রাজত্ব' দিয়ে তাবিল করার বৈধতার কথা বলেছেন (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يريد بالعرش: الملك)। আরেকজন এসে বলেছেন, "মুতাযিলা ও শিয়ারা আরশকে 'রাজত্ব' দিয়ে তাবিল করেছে (قالت المعتزلة والشيعة: العرش هو الملك) আহলে সুন্নাতের মতে আরশকে 'রাজত্ব' বলা বৈধ নয়।"[৬৭৮] একইভাবে একজন আল্লাহর 'ইয়াদ' (হাত)-কে 'নেয়ামত' (অনুগ্রহ), 'সাহায্য', 'সমর্থন' ইত্যাদি শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন। আরেকজন এসে বলেছেন, "মুতাযিলারা 'ইয়াদ'-কে কুদরত, শক্তি,

---

৬৭৭. আকিদাতুস সালাফ আসহাবুল হাদিস, সাবুনি (২৩৪)।

৬৭৮. বাহরুল কালাম (২১৩-২১৪)।

নেয়ামত ইত্যাদি দিয়ে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু আমরা বলি, 'ইয়াদ'-কে 'শক্তি', 'সামর্থ্য' ইত্যাদি শব্দে ব্যাখ্যা করা বৈধ নয়।"[৬৭৯] একইভাবে একজন আল্লাহর 'গাযাব' (ক্রোধ)-কে 'উকুবাহ' (শাস্তি) ও 'রিযা' (সন্তোষ)-কে 'সওয়াব' (পুণ্য) দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। আরেকজন এসে সেটাকে মুতাযিলাদের মাযহাব আখ্যা দিয়ে বলছেন, "এই দুটো আল্লাহর চিরন্তন সিফাত, ধরন ও সাদৃশ্যহীন।"[৬৮০] অভিন্ন মাযহাবের অনুসারি হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মাঝের এই সংঘাত ও বিশৃঙ্খলার কারণ হলো, মাযহাবের ইমাম এবং সালাফে সালেহিনের বক্তব্য থেকে সরে যাওয়া, পরবর্তী লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, নিজেরা ইজতিহাদ করা। অথচ আল্লাহর ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা নিষিদ্ধ। এর ফলাফল বিশৃঙ্খলা ও বিচ্যুতি।

কেবল মানহাজগতভাবে নয়, ব্যক্তিগত কর্মপদ্ধতিতেও বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার ছাপ সুস্পষ্ট। ফলে কেউ কেউ আল্লাহর সিফাতকে হাকিকতের উপর প্রয়োগ করা সুন্নাহ এবং সালাফের নীতি স্বীকার করার পরও ইজতিরাবের শিকার হয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে সালাফের বিশুদ্ধ ও প্রকৃত মানহাজের উপর থেকেছেন, আবার কিছু ক্ষেত্রে সালাফের মানহাজের নানা অদ্ভুত ও নতুন ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। হাকিকতের নামে তাবিল করেছেন। অন্যকথায়, সিফাতের তাবিল করে সেটাকেই হাকিকত আখ্যা দিয়েছেন! লিখেছেন, "আল্লাহ তাঁর নিজেকে যেভাবে বলেছেন, আমরাও সেভাবেই বলব। এটাই সুন্নাত। ...কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে 'আগমন' (الإتيان) অর্থ স্থানান্তর নয়, বরং প্রকাশ (الظهور)। এটাই 'ইতইয়ান' শব্দের হাকিকত! এমনইভাবে 'ইস্তিওয়া' (الاستواء)-এর হাকিকত হলো প্রতিপত্তি ও পরিচালনা (الاستيلاء والقهر)! একইভাবে 'অবতরণ' (النزول)-সংক্রান্ত হাদিস প্রথমত 'মাশহুর' নয় ফলে এটা এক্ষেত্রে দলিল নয়! আর যদি শুদ্ধ ধরাও হয়, তবুও 'নুযুল' স্থানান্তর নয়, বরং এটা হলো 'একটি বস্তু অপর বস্তুর সঙ্গে মিলিত হওয়া' কিংবা 'একটি বস্তুর প্রভাব অপর বস্তুর সঙ্গে মেশা।'" সিফাতের এমন অদ্ভূত ব্যাখ্যা দিয়ে আবার সেই তিনিই কিছু সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফের মানহাজ গ্রহণ করেছেন। ফলে লিখেছেন, "আর 'ইয়াদ' (হাত)-এর ক্ষেত্রে আমরা তা-ই বলব, যা আল্লাহ বলেছেন। কিন্তু আমরা বলব, এটা বিশেষ সিফাত। একইভাবে কুরআন দ্বারা আল্লাহর 'আইন' (চোখ) প্রমাণিত। এটাকেও

---

৬৭৯. প্রাগুক্ত (১০৫-১০৬)।

৬৮০. বাহরুল কালাম (২২২)। আরও দেখুন : জামেউল মুতুন, গুমুশখানভি (১৩)।

আমরা বিশেষ সিফাত বলব; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলব না।” অন্যত্র বলেন, “আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো, আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর মতো কিছু নেই। তিনি শরীর (জিসম) নন, জাওহার নন...। মুমিনরা জান্নাতে তাদের নিজ চোখে আল্লাহকে দেখতে পাবে। কিন্তু সেটা বরাবর, সামনাসামনি কিংবা মুখোমুখি হয়ে নয়। কারণ, মানুষ স্থানে সীমাবদ্ধ হলেও আল্লাহ স্থানের ঊর্ধ্বে। আল্লাহর ‘ইয়াদ’ (হাত), ‘আইন’ (চোখ), ‘চেহারা’ (ওয়াজহ) রয়েছে। এগুলো তাঁর সিফাত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়। আল্লাহ স্থান-পাত্রের ঊর্ধ্বে। তিনি কোনো স্থানের মাঝে বা উপরে নন; বরং সৃষ্টির আগে তিনি যেমন ছিলেন, তেমন আছেন। আল্লাহ তায়ালা আরশ সৃষ্টির পরে আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন। তবে এটা স্থানান্তর কিংবা সত্তাসহ আরশের উপর অবস্থান নয়। আল্লাহর জন্য কোনো দিক প্রযোজ্য নয়। তিনি সকল দিকের ঊর্ধ্বে। দিক সৃষ্টির আগে তিনি যেমন ছিলেন, সবসময় তেমন আছেন ও থাকবেন।”

শেষোক্ত কথাগুলো হুবহু ইমাম আজম রহ. ও সালাফের আকিদা। অথচ প্রথমে তিনিই অনেক সিফাতের তাবিল করে সেটাকে হাকিকত বলেছেন। এই স্ববিরোধী বক্তব্যের উপর লম্বা পর্যবেক্ষণ পেশ করা যায়। কিন্তু সংক্ষেপে এটুকু প্রশ্ন করা যায়, যে কর্মপদ্ধতি ‘ইয়াদ’ ও ‘আইন’-এর ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হলো, ‘রুইয়াহ’ তথা আল্লাহর দিদারের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হলো, এমনকি শেষে ‘ইস্তিওয়া’র ক্ষেত্রেও অবলম্বন করা হলো, সেই একই কর্মপদ্ধতি কি ‘ইতইয়ান’, ‘মাজি’ (আগমন), ‘নুযুল’-এর ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায় না? তাহলে এগুলোকে কেন ব্যাখ্যা করতে হবে? ইস্তিওয়াকে যদি এভাবে মেনেই নেওয়া হয়, তবে সেটাকেও কেন প্রভাব-প্রতিপত্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে? হ্যাঁ, যদি সালাফের এ ধরনের ব্যাখ্যা থাকে, তবে সেটা করা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে সালাফ থেকে, হানাফি ইমামগণ থেকে এ ধরনের বক্তব্য নেই, সেগুলো আমরা কেন করব? বিশেষত যেখানে খোদ ইমাম আজম থেকেও ‘ইস্তিওয়া’ ও ‘নুযুল’ যেভাবে এসেছে বারবার সেভাবে গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। আর এটাই সালাফে সালেহিনের মাযহাব। এ কারণেই অন্য হানাফি আলেমগণ এসব বক্তব্য রদ করেছেন। আল্লামা রুকনুদ্দিন সমরকন্দি (৭০১ হি.) তাঁর ‘আল-আকিদাহ রুকনিয়্যাহ’-তে লিখেন, “হাত (ইয়াদ), আগমন (মাজি) এগুলো আল্লাহ তায়ালার সিফাত। আমাদের কর্তব্য হলো, যেভাবে এসেছে সেভাবে বিশ্বাস করা; এর ধরন ও হাকিকত অনুসন্ধান না করা। মুতাযিলারা এসব অস্বীকার করে। তারা

আল্লাহর 'হাত'-কে কুদরত দ্বারা তাবিল করেছে। আল্লাহর 'আগমন' (মাজি)-কে 'সত্য প্রকাশ' (ظهور الحق) দিয়ে তাবিল করেছে। বিপরীতে মুশাব্বিহাহরা এগুলোকে শারীরিক হাত ও শারীরিক আগমন মনে করেছে...। আহলে সুন্নাতের আকিদা দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি।"[৬৮১]

এ ধরনের ইজতিরাব (বিশৃঙ্খলা ও স্ববিরোধিতা) আরও একাধিক ব্যক্তির বক্তব্যের মাঝে বিদ্যমান। তাদের একজন আল্লাহর বিভিন্ন সিফাতের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও তাফবিজ ও তাবিল দুটো একসঙ্গে মেশাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ, স্পষ্ট করে কোনো একটাকে বেছে না নিয়ে দুটো ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। 'ইস্তিওয়া' সম্পর্কে লিখেন, "আরশের উপর আল্লাহর 'ইস্তিওয়া' হক ও সত্য। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে উদ্দেশ্য নিয়েছেন আমরা তাতে ঈমান রাখি। এর ধরন সন্ধান করি না।" "দুনিয়ার আকাশে তাঁর নুযুল অনুগ্রহ ও রহমত। স্থানান্তর ও নড়াচড়া নয়।" অন্যান্য সিফাত সম্পর্কে বলেন, "আল্লাহর দুই 'ইয়াদ' (হাত) আছে। এ দুটো তাঁর সিফাত। তিনি এর মাধ্যমে সৃষ্টি করেন। এগুলো সৃষ্টি ও কুদরতের হাত। ধরার হাত কিংবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়।" "আল্লাহর 'ওয়াজহ' (চেহারা) রয়েছে। এটা তাঁর সিফাত। এটা সম্মান ও নিবিষ্ট হওয়ার চেহারা। সামনাসামনি সাক্ষাতের নয়...।" কিছু পর্যবেক্ষণ থাকলেও সামগ্রিকভাবে এগুলো বিশুদ্ধ বক্তব্য এবং ইমাম আজমসহ সকল সালাফের মানহাজ। অথচ সেই তিনিই অন্য জায়গায় আবার সরাসরি তাবিলের পথে হেঁটে বিভিন্ন সিফাত নাকচ করেছেন। যেমন—লিখেছেন, "পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার অবতরণ (নুযুল) নেই! আরোহণ নেই। ... সন্তুষ্টি (রিযা) নেই, ক্রোধ (গাযাব) নেই! ...হাসি (যাহিক) নেই। কাছে নেই, দূরে নেই। ...স্থান নেই। উপর-নিচ, ডান-বাম, সম্মুখ-পশ্চাৎ নেই। ...মন নেই, চিন্তা নেই...।" এভাবে সিফাতকে নাকচ করা ঝুঁকিপূর্ণ। তানযিহ করতে গিয়ে অনেক সময় বিভিন্ন প্রমাণিত সিফাতও নাকচ হয়ে যায়, যেমনটা 'গাযাব', ও 'রিযা' নাকচ করা হলো; প্রথমে 'নুযুল' সাব্যস্ত করে আবার নাকচ করা হলো।

কেউ সালাফ ও খালাফের মানহাজের পার্থক্য স্বীকৃতি দেওয়ার পরও ইজতিরাবের শিকার হয়েছেন। যেমন—একজন বিখ্যাত আলেম তাঁর একটি বইয়ে লিখেছেন, "সালাফের মাযহাব হলো, (সিফাতের) আয়াত ও হাদিসে

---

৬৮১. আকিদাহ রুকনিয়্যাহ (পাণ্ডুলিপি) (২৪-২৫)।

ঈমান রাখা, কবুল করা, এগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে বিশ্বাস রাখা। এগুলোর কাইফিয়্যাত তথা ধরন সন্ধান না করা। এটুকু বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ 'জিসম' নন, সৃষ্টিসদৃশ নন। সব ধরনের নবসৃষ্ট থেকে তিনি পবিত্র। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত—তাঁকে বাহ্যিক তাশবিহ বোঝায় এসব আয়াত ও হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন—এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দেবো। এগুলোর উপর ঈমান রাখব। 'কীভাবে' এমন প্রশ্ন করব না।" তিনি বলেন, "এটাই আমাদের আসহাব, যেমন আবু ইসমাহ নুহ ইবনে মারইয়াম-এর আকিদা। এটাই আহলে মদিনার ইমাম মালেক ইবনে আনাসের মাযহাব। এটাই আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, খালেদ ইবনে সুলাইমান, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারি, আবু দাউদ সিজিস্তানি প্রমুখ ফুকাহা ও মুহাদ্দিসিনের মাযহাব...। তাদের কেউ এসব আয়াত ও হাদিস তাবিল করেননি।"

এভাবে সালাফের মানহাজ বর্ণনার পরে সেই তিনিই অন্য গ্রন্থে এসব সিফাত তাবিল করেছেন। 'ইয়াদ' (হাত)-কে শক্তি, সামর্থ্য, প্রতিপত্তি, রাজত্ব, বিজয়, সাহায্য ইত্যাদি অর্থে, 'আইন' (চোখ)-কে সংরক্ষণ, হেফাজত ইত্যাদি অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। 'জাহান্নামে আল্লাহর পা রাখা'-সংবলিত হাদিসকে ক্রোধ অর্থে তাবিল করেছেন, 'আল্লাহর হাসি'-কে সন্তুষ্টি অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লাহর 'ইস্তিওয়া'-কে গালাবাহ (তথা বিজয় ও প্রতিপত্তি) দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। বিভিন্ন সিফাতের কেবল তাবিল করেই সন্তুষ্ট থাকেননি, বরং 'মাজি' (আগমন), 'যাহাব' (গমন) ও 'নুযুল' (অবতরণ) এগুলোকে আল্লাহর শানে প্রয়োগ করা অবৈধ বলেছেন! বলেছেন, আল্লাহর শানে এসব সিফাত যায় না। বরং এই নীতি ঠিক রাখতে নবিজি যেখানে বলেছেন, 'আমি আমার রব আল্লাহকে (স্বপ্নে) দেখেছি', সেখানে তিনি জিবরাইলকে 'রব'-এর জায়গায় বসিয়ে আল্লাহকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং জিবরাইলকে দেখার মাধ্যমে তাবিল করেছেন!

প্রথমে তিনিই স্বীকার করলেন—আবু হানিফা, মুহাম্মাদ, মালেক ইবনে আনাস, আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব হলো : সিফাত যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দেওয়া, এগুলোর তাবিল না করা। অথচ এখানে এসে বলছেন—এগুলো আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা বৈধই নয়! স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই তো তাঁর উপর এগুলো প্রয়োগ করেছেন। তাহলে এটা প্রয়োগ অবৈধ হয় কী করে? ইমামগণ যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দিতে বলেছেন, তাহলে এভাবে বলা

নিষিদ্ধ হবে কোন যুক্তিতে? বরং এভাবে বলা এবং তাবিল বর্জন করাই কি আহলে সুন্নাত ও সালাফে সালেহিনের আকিদা নয়, যেটা তিনি নিজেও তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গাতে স্বীকার করেছেন!?

উক্ত সম্মানিত আলেমের এমন বৈপরীত্য ও সাংঘর্ষিক বক্তব্য আরও বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন—আল্লাহর সিফাতে 'ইয়াদ'-এর ক্ষেত্রে প্রথমে লিখেছেন, "আরবিতে আল্লাহর জন্য 'ইয়াদ' বলা বৈধ, ফারসিতে বৈধ নয়"। এটা ইমাম আজম রহ.-এর বক্তব্য, যে ব্যাপারে আমরা পিছনে আলোচনা করেছি। তিনি আরও লিখেন, "'ইয়াদ' আল্লাহ তায়ালার আযালি (অনাদি) সিফাত, ধরনবিহীন, সাদৃশ্যবিহীন, আল্লাহর অন্যান্য সিফাত তথা শোনা, দেখা, জানা, শক্তি, জীবন, ইচ্ছা ও কালামের মতো। আল্লাহ যেমন শুনতে অঙ্গ লাগে না, দেখতে চোখ লাগে না, জানতে উপকরণ লাগে না, ইচ্ছা করতে হৃদয় লাগে না, কথা বলতে তিনি জিহ্বা ও ঠোঁটের মুখাপেক্ষী নন, তেমনইভাবে 'ইয়াদ' আল্লাহর চিরন্তন সিফাত, ধরন ও সাদৃশ্যহীন; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়। সুতরাং আমরা 'ইয়াদ' স্বীকার করি। আল্লাহ যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেটার প্রতি ঈমান রাখি! মুতাযিলারা আল্লাহর বাণী : ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ অর্থ : 'তাঁর দুই হাত প্রসারিত।' [মায়িদা : ৬৪] এখানে 'ইয়াদকে কুদরত, শক্তি, নেয়ামত ইত্যাদি দিয়ে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু আমরা বলি, 'ইয়াদ'-কে 'শক্তি', 'সামর্থ্য' ইত্যাদি শব্দে ব্যাখ্যা করা বৈধ নয়।"

সুবহানাল্লাহ! কত সুন্দর কথা। এটা হুবহু ইমাম আজমের কথা, যেখানে তিনি বলেছেন, **"আল্লাহ তায়ালার 'ইয়াদ' (হাত), 'ওয়াজহ' (চেহারা) এবং 'নফস' (সত্তা) রয়েছে, যেভাবে কুরআনে এসেছে সেভাবে। এটা বলা যাবে না যে, তাঁর 'ইয়াদ' (হাত) তাঁর কুদরত ও নেয়ামত। কারণ, এভাবে বললে তাঁর সিফাতকে বাতিল করে দেওয়া হয়। আর এটা কাদরিয়্যা ও মুতাযিলাদের বক্তব্য। বরং 'ইয়াদ' (হাত) তাঁর একটি সিফাত, ধরনহীন। 'গাযাব' (ক্রোধ) ও 'রিযা' (সন্তুষ্টি) আল্লাহর দুটি সিফাত, ধরনহীন।"**[৬৮২]

কিন্তু সালাফের মাযহাব বর্ণনা এবং মুতাযিলাদের খণ্ডনের পর সেই তিনিই বলছেন, "কুরআনে 'ইয়াদ' শব্দ চারটি অর্থে বা চারভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এক. রাজত্ব, দুই. নেয়ামত (মিন্নাহ), তিন. অবাধ্যতা, চার. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কিন্তু 'ইয়াদ'-কে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলা যাবে না। বরং এ দুটো আল্লাহর নেয়ামত ও রাজত্ব,

---

৬৮২. আল-ফিকহুল আকবার (৩)।

সাদৃশ্যবিহীন, ধরনহীন, আকারবিহীন বা নিরাকার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন।” যদি এগুলোকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে তিনি একটু আগে কী বললেন? এই স্ববিরোধিতার কারণ হলো, 'ইয়াদ'-এর তাবিল ইমাম আজম থেকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাবিল তো দূরের কথা, তিনি আরবি ব্যতীত এটাকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতেও নিষেধ করেছেন। এটার তাবিলকে মুতাযিলাদের মাযহাব আখ্যা দিয়েছেন। ফলে তাঁকে প্রথমে সেটার স্বীকৃতি দিতে হয়েছে, মুতাযিলাদের খণ্ডন করতে হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে একদল হানাফি আলেম উক্ত মানহাজে অবিচল থাকেননি। তারা তাদের আকিদা ও তাফসিরে ইমাম আজমের নিষেধ করা সেই তাবিল করেছেন, যেগুলোর বিরোধিতা খুব সম্ভবত তিনি করতে চাননি। এভাবে কথার মাঝে বৈপরীত্য তৈরি হয়েছে।

আরও একজন প্রসিদ্ধ আলেমের ইজতিরাবের উদাহরণ দেয়া যাক। তিনি কোথাও সালাফের মানহাজ সমর্থন করেছেন, আবার কোথাও খোদ সালাফের বিভিন্ন বক্তব্যকে গলত ও বিদআত বলেছেন! এক জায়গায় তিনি লিখেন, (সিফাতের আয়াতের ক্ষেত্রে) “আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন এবং যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, আমরা তাতে ঈমান রাখি। যেমন—আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'রহমান আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন', তিনি বলেছেন, 'বরং তাঁর দুই হাত প্রসারিত', রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহর দুই হাত রয়েছে, উভয় হাত ডান' ইত্যাদিসহ সকল মুতাশাবিহ আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে আমাদের মাযহাব হলো : এগুলোতে ঈমান রাখা ওয়াজিব। আমরা বলব—এগুলো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের কালাম। ...মুতাযিলা ও জাহমিয়্যাহরা 'হাত'-কে শক্তি ও নেয়ামত দ্বারা তাবিল করা আবশ্যক করে নিয়েছে, কিন্তু এটা সঠিক নয়। যদি এগুলোর তাবিল আবশ্যক বা বৈধ (মাশরু) হতো, তবে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) করতেন, সাহাবা ও তাবেয়িরা করতেন। অথচ সাহাবা ও তাবেয়িরা এগুলোর তাবিল করেননি...। ...এ ব্যাপারে সমরকন্দের মাশায়েখের অভিমত হলো—আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান রাখব। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বক্তব্য হিসেবে স্বীকৃতি দেবো। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন সে উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিশ্বাস রাখব।”

সুবহানাল্লাহ! কত সুন্দর কথা। অথচ সেই তিনিই আবার অন্যত্র বলছেন, “যদি কেউ বলে, আল্লাহর 'নুযুল' ও 'মাজি' (আগমন) ধরনহীন ও স্থানান্তরহীন, তবে সেটা ভুল বক্তব্য।” একইভাবে যদি কেউ বলে, “আল্লাহ

আরশের উপর ধরনহীন ও সত্তাহীন, তাতে কাফের হবে না, কিন্তু বিচ্যুত গণ্য হবে।” সুবহানাল্লাহ! এটা কুফর তো দূরের কথা, বিচ্যুতিও কীভাবে হবে? বরং ধরনহীন আল্লাহর ইস্তিওয়া ও নুযুল সাব্যস্ত করাই তো ইমাম আজম ও সালাফে সালেহিনের মানহাজ। এই আকিদা রাখলে কেউ গোমরাহ হবে কেন? এভাবে বললে তো বিপরীতটাকেই গোমরাহি বলতে হবে।[৬৮৩]

অতিরঞ্জন নিরসন : এখানে এরচেয়ে অধিক উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বোঝানো উদ্দেশ্য, ইমাম আজম রহ.-এর পরে তাঁর অনুসারী একদল আলেম আকিদার কিছু কিছু মাসআলাতে তাঁর পথ থেকে সরে গিয়েছেন। তিনি যেটা করেননি বরং যা করতে নিষেধ করেছেন, যুগের প্রয়োজনের কথা বলে তারা সেটাই করেছেন। তাদের মতে, সালাফের মাযহাব এগুলোকে আল্লাহর উদ্দেশ্যসহ মেনে নেওয়া। তাবিল (ব্যাখ্যা) আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া। কিন্তু খালাফের মাযহাব তাবিল। এটা তারা যুগের প্রয়োজনে করার কথা বলেছেন। অথচ এমন প্রয়োজন সব যুগেই ছিল। কিন্তু সালাফে সালেহিন এসবের তাবিল করেননি, যেমন খোদ নাসাফি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বারবার স্বীকার করেছেন, ‘সালাফের মাযহাব হলো—এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দেওয়া। এগুলোতে আল্লাহর যা উদ্দেশ্য তাতে বিশ্বাস রাখা। এগুলোর সত্যতার ব্যাপারে ঈমান রাখা। তাবিল পরিত্যাগ করা (ولا نشتغل بتأويلها)।’[৬৮৪] সুতরাং এটাকে সালাফের মাযহাব সাব্যস্ত করার পর সেখান থেকে বিচ্যুত হওয়া অনুচিত।

সাবুনি লিখেছেন, (সিফাতের ব্যাপারে) “সালাফে সালেহিনের কর্মপদ্ধতি হলো—এগুলোকে কবুল করা, সত্যায়ন করা এবং ‘তাবিল’ আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া, সাথে আল্লাহকে সব ধরনের সাদৃশ্য, নবসৃষ্ট ইত্যাদি বিষয় থেকে পবিত্র ঘোষণা করা। এক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যে রূপ (ইশতিকাক) ব্যবহৃত হয়েছে, সেটার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা; শব্দ পরিবর্তন না করা,

---

৬৮৩. আলোচ্য অধ্যায়ে বর্ণিত বক্তব্যগুলোর সকল উৎস ও সূত্র স্বেচ্ছায় সরিয়ে ফেলা হলো। কারণ বিচ্যুতির জায়গাগুলো চিহ্নিত করা আমাদের উদ্দেশ্য; কোনো ব্যক্তি বা মতাদর্শকে টার্গেট করা উদ্দেশ্য নয়। তথাপি এগুলো বিস্তারিত জানতে দেখতে পারেন : আত-তাওহিদ, তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ, আত-তামহিদ, বাহরুল কালাম, তাবসিরাতুল আদিল্লাহ, উসুলুদ্দিন, তালখিসুল আদিল্লাহ, আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ, আল বিদায়াহ মিনাল কিফায়াহ, লুবাবুল কালাম, মুলজিমাতুল মুজাস্‌সিমাহ, জামেউল মুতুন ইত্যাদি গ্রন্থ।

৬৮৪. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/৩৪৬)।

এক শব্দ থেকে অন্য শব্দ বের না করা।"[৬৮৫] সালাফের মানহাজ অকপটে স্বীকার করার পর তিনিই আবার তাবিলকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বরং তাবিলকে তিনি ইমাম আবু হানিফার মাযহাব বলেছেন। এটা দলিলবিহীন দাবি। উপরন্তু সেটাকে তিনি 'অধিকতর মজবুত' আখ্যা দিয়েছেন। 'রাসিখিন' তথা প্রাজ্ঞ মানুষদের মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন। সালাফে সালেহিন যদি প্রাজ্ঞ না হন, তবে তাদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পরবর্তী লোকেরা কোনোভাবেই প্রাজ্ঞ হতে পারেন না।

ফলে যেসব আলেম উন্মুক্ত তাবিলের বৈধতা দিয়েছেন যদিও তাদের পক্ষে অনেক যুক্তি রয়েছে এবং তারা কুরআন ও আরবি ভাষার রীতি মেনেই সেই তাবিলের কথা বলছেন, এক্ষেত্রে তাদের নিয়তও স্রেফ তানযিহ তথা বিশুদ্ধ তাওহিদ—এ ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ অমূলক। তথাপি এটা সালাফে সালেহিনের মানহাজ নয়। অর্থাৎ, কুরআন-সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে সালাফে সালেহিন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী ছিলেন। আজ যে প্রয়োজন, সেটা তাঁদের যুগেও বিদ্যমান ছিল। তবুও তাঁরা এসব সিফাতের উন্মুক্ত তাবিল করেননি। 'মাজায', 'কিনায়া', 'ইস্তিআরাহ' ইত্যাদি বিভিন্ন যুক্তিতে এগুলোতে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেননি। তারা যেহেতু করেননি, আমরাও করব না। বরং তাবিলের দরজা এভাবে উন্মুক্ত করে দিলে যে-কেউ যেকোনো কাতঈ বিষয়েরও তাবিল করে ফেলবে ভাষার যুক্তি দিয়ে। বরং মুতাযিলা ও বাতেনি সম্প্রদায়গুলো এভাবেই বিচ্যুত হয়েছে। ইসমাইলি ও কারামেতা সম্প্রদায় তাবিল করতে গিয়ে পুরো কুরআনকেই বাতিল করে দিয়েছে।

এ জন্য পরবর্তী সময়ের অনেক হানাফী আলেমও ইমাম আজম এবং পূর্ববর্তী আলেমদের অনুসরণে সালাফের মানহাজকে স্বীকৃতি দিয়ে পরবর্তী মানহাজের কঠোর সমালোচনা করেছেন। আলাউদ্দিন বুখারি (৮৪১ হি.) বলেন, "আল্লাহর জন্য হাত (ইয়াদ), চেহারা (ওয়াজহ), চোখ (আইন), পার্শ্ব (জানব), পা (কাদাম), আঙুল (ইসবা'), ডান হাত (ইয়ামিন) ইত্যাদি আরবিতে বলা বৈধ। ফারসিতে বৈধ নয়।"[৬৮৬] "...এগুলো আল্লাহ তায়ালার 'শ্রবণ', 'দর্শন', জ্ঞান,

---

৬৮৫. আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ (৮৪)।

৬৮৬. পিছনে আমরা এ সম্পর্কিত মতপার্থক্য উল্লেখ করেছি। সেখানে আমরা দেখিয়েছি এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কথা হলো, আল্লাহকে সৃষ্টির সাদৃশ্য ভাবার আশঙ্কা থাকলে এগুলো অনুবাদ করা উচিত নয়। তেমন আশঙ্কা না থাকলে স্রেফ শব্দার্থ হিসেবে অনুবাদ করা যেতে পারে, যেমনটা এখানেও আমরা করেছি। কারণ, অনুবাদ করা না হলে

জীবন, ইচ্ছা, কালাম ইত্যাদির মতোই চিরন্তন সিফাত, ধরনহীন, সাদৃশ্যহীন। অঙ্গ নয়। সুতরাং আমরা এভাবে 'ইয়াদ'-কে স্বীকৃতি দিই। এর মর্ম আল্লাহ তায়ালা যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তাই। ...মুতাযিলারা 'ইয়াদ'কে 'শক্তি', 'সামর্থ্য', 'নেয়ামত' ইত্যাদি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছে। যেমন—আল্লাহর বাণী : ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ অর্থ : 'তাঁর দুই হাত প্রসারিত।' [মায়িদা : ৬৪] এখানে দুটো ইয়াদ'কে তারা দুটো নেয়ামত দিয়ে ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু ইয়াদ'কে শক্তি-সামর্থ্য ও নেয়ামত দিয়ে ব্যাখ্যা করা বৈধ নয়। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ অর্থ : 'হে ইবলিস, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কীসে বাধা দিলো?' [সোয়াদ: ৭৫] যদি হাত দ্বারা শক্তি-সামর্থ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে বলতে হবে, আল্লাহ দুটো শক্তি দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ এটা গলত কথা।"[৬৮৭]

খোদ ইমাম মাতুরিদি রহ. বলেছেন, "আল্লাহর দিকে যখন 'ইয়াদ'-কে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন সেটা দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বোঝায় না, এটা স্পষ্ট বিষয়। সুতরাং 'ইয়াদ'-এর তাবিলের প্রয়োজন নেই" (فلا حاجة لنا إلى تأويل اليد)।[৬৮৮]

'নেই' জটিলতা : ইমাম আজমের মানহাজ থেকে সরে আসার ফলে পরবর্তী লোকদের কারও কারও মানহাজে আরও একটি জটিলতা তৈরি হয়েছে, যেটাকে আমরা 'নেই' সংক্রান্ত জটিলতা বলতে পারি। সহজভাবে বললে, ইসবাত প্রতিরোধ করতে গিয়ে নাকচের বন্যা। ফলে অনেক আলেমকে দেখা যাবে, তাদের আকিদার গ্রন্থে এক থেকে দুই পৃষ্ঠা কেবল 'না', 'না' বলতেই থাকেন। আল্লাহ তায়ালা বাস্তবিকপক্ষে এগুলো থেকে পবিত্র নিঃসন্দেহে। কিন্তু এভাবে নাকচ করা সালাফে সালেহিনের মানহাজ নয়। বরং সালাফে সালেহিনের মানহাজ হলো, কুরআনে যেটাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে সেটাকে সাব্যস্ত করা, যেটাকে নাকচ করা হয়েছে সেটাকে নাকচ করা। আর যে ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ নীরব, সে ব্যাপারে নীরব ও নিরপেক্ষ থাকা। ফলে যেসব ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ নীরব, সেগুলোও

এগুলো সম্পর্কে অনারবদের জানারই কোনো উপায় থাকবে না। অনুবাদের প্রতিবন্ধক হিসেবে তাশবিহের কথা বললে তেমন আশঙ্কা আরবিতেও বিদ্যমান। তাই এগুলোকে অনুবাদ করে মানুষকে সতর্ক করে দেওয়াই যথেষ্ট।

৬৮৭. রিসালাহ ফিল ইতিকাদ, আলাউদ্দিন বুখারি (১২০-১২১)।

৬৮৮. তাফসিরে মাতুরিদি (৮/৬৪৭)।

সমূলে নাকচ করা, বরং এমন অনেক বিষয়ও নাকচ করা, যেগুলো প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষাভাবে কুরআন-সুন্নাহতে এসেছে—সেটা অননুমোদিত।

গযনবি লিখেছেন, 'পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার অবতরণ (নুযুল) নেই! আরোহণ নেই। ...সন্তুষ্টি (রিযা) নেই! ক্রোধ (গাযাব) নেই! ... হাসি (যাহিক) নেই। কাছে নেই, দূরে নেই। ...স্থান নেই। উপর-নিচ, ডান-বাম, সম্মুখ-পশ্চাৎ নেই। ...মন নেই, চিন্তা নেই...।' ৬৮৯ এখানে কিছু বিষয় ঠিকই আছে। কিন্তু এভাবে নাকচ করা ঝুঁকিপূর্ণ। তানযিহ করতে গিয়ে অনেক সময় বিভিন্ন প্রমাণিত সিফাতও নাকচ হয়ে যায়, যেমনটা 'গাযাব', ও 'রিযা' নাকচ করা হলো, 'নুযুল' নাকচ করা হলো। অথচ এগুলো আল্লাহর জন্য কুরআন-সুন্নাহতেই সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আল্লামা কাওকজি লিখেন, 'আল্লাহর ডান নেই, বাম নেই; সম্মুখ নেই, পিছন নেই; তিনি আরশের উপরে নন, নিচে নন; আরশের ডানে নন, বামে নন; জগতের ভিতরে নন, বাইরে নন...।'৬৯০ এভাবে বলার কী যৌক্তিকতা? 'আল্লাহ আরশের উপরে'—এটা সালাফের মাযহাব। কীভাবে এটা বুঝব সে সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসছে। কিন্তু 'আরশের উপর নন' এভাবে উন্মুক্তভাবে নাকচ করার সুযোগ নেই।

আল্লামা গুমুশখানভি (১৩১১ হি.) লিখেন, "আল্লাহর কোনো শরিক নেই—সত্তার ক্ষেত্রে নেই, গুণের ক্ষেত্রে নেই; নামের ক্ষেত্রে নেই, কর্মের ক্ষেত্রে নেই; রাজত্বের ক্ষেত্রে নেই। তিনি জিসম নন, জাওহার নন, আকৃতিযুক্ত নন, সীমাবদ্ধ নন; পরিমাপযোগ্য নন; গণনাযোগ্য নন; ভাঙা যায় এমন নন; কোথাও সীমাবদ্ধ নন; গঠিত নন। ...তাঁর মতো কিছু নেই। তাঁর সীমা নেই, পরিমাণ নেই; স্থান নেই, দিক নেই। তাঁকে কোনোকিছু ধারণ করে না, বেষ্টন করে না। তাঁর জন্য সময় ও স্থান প্রযোজ্য নয়। তাঁর ক্ষেত্রে 'এখন' নেই, 'দিন' নেই, 'রাত' নেই। তাঁর দুর্বলতা নেই, মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই, ঘুম নেই, নিদ্রা নেই; তাঁর জ্ঞানের শেষ নেই। আল্লাহর উপর ধরন শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না; 'অবস্থা' প্রয়োগ করা যাবে না; 'হাসি' না, 'চিন্তা' না; 'মুচকি হাসি না', 'বড় হাসি না'; 'মন খারাপ' না, 'খুশি' না; 'পেরেশান' না, 'উদ্যম' না; 'যন্ত্রণা' না, 'আহ্লাদ' না; 'বিপদ' না; তাঁর উপর 'আসা', 'যাওয়া', 'আগমন', 'প্রস্থান', 'মিলন', 'বিচ্ছেদ', 'স্থিতি',

৬৮৯. উসুলুদ্দিন, গযনবি (৮৪-৮৭)।

৬৯০. মুখতাসারুল ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (৯-১০)।

‘আরোহণ’, ‘অবতরণ’, ‘দাঁড়ানো’, ‘বসা’, ‘শোয়া’, ‘নড়াচড়া’, ‘স্থির থাকা’—এগুলো প্রয়োগ করা যাবে না। তিনি বাড়েন না, কমেন না; ছোট হন না, বড় হন না; ভুলে যান না, ভুল করেন না; দিশেহারা হন না; অসুস্থ হন না, রোগে ভোগেন না; দুর্বল হন না; কষ্ট পান না; ক্লান্ত হন না; ভয় পান না; হাল ছাড়েন না; একঘেয়েমি করেন না। তাঁর উপর নির্বুদ্ধিতা শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। ...আল্লাহর আধিক্য নেই; সংখ্যা নেই। অংশ নেই; অঙ্গ নেই; মিশ্রণ নেই; উপকরণ নেই। মেযাজ নেই, স্বভাব নেই, তবিয়ত নেই। লম্বা নেই, খাটো নেই; সংকীর্ণতা নেই। প্রস্থ নেই, গভীরতা নেই। ...শুরু নেই, শেষ নেই। পরিবর্তন নেই, পরিবর্ধন নেই। আকার নেই, আকৃতি নেই; অবকাঠামো নেই। রং নেই, স্বাদ নেই, ঘ্রাণ নেই। কুনিয়ত নেই, লকব নেই।”[৬৯১]

এভাবে লেখক দীর্ঘ প্রায় চার পৃষ্ঠা জুড়ে স্রেফ ‘নেই’ বর্ণনা করেছেন। অথচ কুরআন-সুন্নাহতে এমন করা হয়নি। সালাফে সালেহিন এভাবে করেননি। ইমাম আজম করেননি; বরং যুগেরও প্রয়োজন নেই। ‘তাঁর মতো কিছু নেই’ এটুকুই যথেষ্ট। হ্যাঁ, আল্লাহর উপর যদি কেউ অযাচিত কোনো শব্দ প্রয়োগ করে, তবে সেটা খণ্ডন করা হবে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে অতিরঞ্জন সঠিক নয়। আল্লাহর উপর ‘রং’, ‘গন্ধ’, ‘স্বাদ’, কুনিয়ত’, ‘লকব’ এসব শব্দ কেউ প্রয়োগ করে না। কেউ বলেনি আল্লাহর রং আছে, স্বাদ আছে, ঘ্রাণ আছে। কিংবা আল্লাহকে গোনা যায়, মাপা যায় বা ভাঙা যায় ইত্যাদি। ফলে নাকচ করার ক্ষেত্রে এ ধরনের পদ্ধতি ‘তাকাল্লুফ’ বিবেচিত হবে। বরং এটা করতে গিয়ে কুরআন-সুন্নাহতে প্রমাণিত বিভিন্ন সিফাতকেও নাকচ করা হবে, যা লেখকের বক্তব্যে স্পষ্ট। ফলে এমন কর্মপদ্ধতি বর্জনীয়।

সালাফের তাবিল আর খালাফের তাবিলের মাঝে পার্থক্য কী? প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে কি তাবিল পুরোপুরি নিষিদ্ধ? আমরা বলব, কখনোই নয়। সালাফে সালেহিন থেকে একাধিক সিফাতের তাবিল পাওয়া গিয়েছে। কারণ, যেসব জায়গায় তাবিল করা সম্ভব, সেখানে তারা তাবিল করেছেন। যেখানে সম্ভব নয় কিংবা অনুমোদিত নয়, সেখানে করেননি। বরং অনেক জায়গায় তাবিল করতে সরাসরি নিষেধ করেছেন। তাই পরবর্তী লোকদের কর্তব্য হলো সালাফে সালেহিনের পথে থাকা। যেখানে তারা তাবিল করেছেন, সেখানে করা। তারা যেখানে করেননি, সেখানে না করা। বিষয়টি আরেকটু খুলে বলা যাক।

---

৬৯১. জামেউল মুতুন (৫-৮)।

কুরআনের কিছু কিছু শব্দের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে সকল সালাফ একমত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ অর্থ : 'তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন।' [তাওবা : ৬৭] এখানে আল্লাহর ভুলে যাওয়ার অর্থ হলো তাদের পরিত্যাগ করা, নিজেদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া; মানুষের মতো ভুলে যাওয়া নয়। আল্লাহর বাণী, ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾ অর্থ : 'তোমরা তাদের হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ তাদের হত্যা করেছেন। (হে রাসুল) আপনি যখন নিক্ষেপ করেছেন, তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।' [আনফাল : ১৭] এখানে আল্লাহ বলছেন, (বদরযুদ্ধে) তিনি কাফেরদের হত্যা করেছেন; মুসলমানরা করেনি। তিনি মাটি নিক্ষেপ করেছেন; রাসুল (ﷺ) করেননি। অথচ সকল মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, মুসলমানরাই হত্যা করেছেন, আল্লাহ নিজে করেননি। রাসুলুল্লাহই হাতে মাটি নিয়ে কাফেরদের দিকে ছুড়েছেন; আল্লাহ তায়ালা নিজে ছোড়েননি। হ্যাঁ, যেহেতু এগুলো সম্পন্ন হয়েছে আল্লাহর শক্তি ও তৌফিকে, তাই তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। একইভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী, ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ অর্থ : 'জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যবর্তী হয়ে যান।' [আনফাল : ২৪] এখানে সর্বসম্মতিক্রমে এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অবস্থান নেন, বরং মানুষের হৃদয় আল্লাহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে বোঝানো উদ্দেশ্য।[৬৯২]

আল্লাহর বাণী, ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ অর্থ : 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনি অপেক্ষাও নিকটতর।' [কাফ : ১৬] এখানে মানুষের ঘাড়ের কাছে সত্তাগতভাবে আল্লাহর থাকা উদ্দেশ্য নয়; সবকিছু সম্পর্কে অবগতি ও নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্য। একইভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী, ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ﴾ অর্থ : 'তিনি আকাশে ইলাহ, যমিনেও ইলাহ।' [যুখরুফ : ৮৪] এখানে আকাশ ও যমিনে আল্লাহর সত্তাগত বিদ্যমানতা উদ্দেশ্য

---

৬৯২. তাফসিরে তাবারি (১৩/৪৭১)।

নয়; বরং আকাশ ও যমিনের সর্বত্র তাঁর উলুহিয়্যাত এবং তিনিই যে ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত সে চিরসত্য ঘোষণা করা উদ্দেশ্য।[৬৯৩]

আল্লাহ তায়ালার বাণী, ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ অর্থ : 'স্মরণ করুন সেই দিনের কথা, যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে। সেদিন এদের আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য। কিন্তু এরা সক্ষম হবে না।' [কলম : ৪২] এখানে ইবনে আব্বাস রাযি., মুজাহিদ, যাহহাক, সাইদ ইবনে যুবাইর, কাতাদাসহ উম্মাহর প্রথম সারির সাহাবি ও তাবেয়ি ব্যাখ্যাতাদের মতে, আল্লাহর 'পায়ের গোছা' উদ্দেশ্য নয়; বরং কিয়ামতের ভয়াবহতা উদ্দেশ্য।[৬৯৪] একইভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী, ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ অর্থ : 'আপনার পালনকর্তা আর ফেরেশতারা আসবেন কাতারে কাতারে।' [ফজর : ২২] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এখানে 'আল্লাহর আগমন'-কে 'সওয়াব আগমন' দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন। ইমাম বাইহাকি বলেন, এটার সনদে কোনো অস্পষ্টতা নেই।[৬৯৫] আল্লাহ তায়ালার বাণী, ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ﴾ অর্থ : 'তারা কি এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা এসে পড়বে। কিংবা আপনার পালনকর্তা আসবেন অথবা তাঁর কিছু নিদর্শন এসে পড়বে?' [আনআম : ১৫৮] ইবনে আব্বাস ও যাহহাকের মতে, এখানে 'আল্লাহর আগমন' বলতে তাঁর নির্দেশ আগমন উদ্দেশ্য।[৬৯৬] একইভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী, ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ অর্থ : 'তাঁর কুরসি আকাশমণ্ডলী ও জমিন পরিবেষ্টন করে রয়েছে।' [বাকারা : ২৫৫] এখানে ইবনে আব্বাস, সাইদ ইবনে যুবাইর থেকে 'কুরসি'র তাবিল বর্ণিত আছে, 'ইলম' তথা জ্ঞান। অর্থাৎ, তিনি সর্বজ্ঞানী। সবকিছু জানেন।[৬৯৭]

হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর দোয়া 'হে আল্লাহ, আপনি আমার গুনাহগুলো পানি, বরফ ও শিলা দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।'[৬৯৮] এখানে সর্বসম্মতিক্রমে হাদিসের

---

৬৯৩. প্রাগুক্ত (১৬/১২১)।
৬৯৪. তাফসিরে তাবারি (২৩/৫৫৫)।
৬৯৫. দেখুন : আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১৪/৩৮৬)।
৬৯৬. তাফসিরে কুরতুবি (৭/১৪৪)।
৬৯৭. তাফসিরে তাবারি (৫/৩৯৭)।
৬৯৮. বুখারি (কিতাবুল আজান : ৭৪৪)। ইবনে মাজা (আবওয়াবু ইকামাতিস সালাত : ৮০৫)।

উদ্দেশ্য প্রকৃত অর্থেই ধোয়া নয়; বরং ক্ষমা করা। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর অন্য একটি হাদিসে এসেছে, (আল্লাহ তায়ালা বলেন) 'যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।' তিরমিযি উক্ত হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন, আ'মাশ থেকে উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'ক্ষমা' ও 'অনুগ্রহ' দিয়ে। অন্য আলেমরাও উক্ত হাদিসকে এভাবে ব্যাখ্যা (তাফসির) করেছেন। তাদের মতে, (এগিয়ে আসা বা কাছাকাছি আসার) অর্থ হলো, 'বান্দা যখন ইবাদত ও আমার নির্দেশ পালনের মাধ্যমে আমার কাছাকাছি আসে, আমি দ্রুত তাকে ক্ষমা করে দিই এবং অনুগ্রহ করি' (অর্থাৎ বস্তুগত নৈকট্য ও দূরত্ব উদ্দেশ্য নয়)।[৬৯৯]

বরং আল্লাহর নুযুল যা ইমাম আজম থেকেও যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, ইমাম মালেক ও ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর সেটার তাবিল করেছেন।[৭০০] এমনকি খোদ ইমাম আজম রহ. আল্লাহর 'নফস', 'ইয়াদ', 'ওয়াজহ', 'ইস্তিওয়া' ও 'নুযুল' ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাবিল না করলেও আমরা দেখব আল্লাহর 'নৈকট্য' (কুরব) এবং 'দূরত্ব' (বু'দ) ইত্যাদির কিছু ক্ষেত্রে একরকম রূপক ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, **'আল্লাহর নৈকট্য বা দূরত্ব (বস্তুগত) কাছে বা দূরে থাকার ভিত্তিতে নয়। এটা মর্যাদা ও অপমানের ভিত্তিতে। অনুগত বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী, ধরন বর্ণনা ব্যতিরেকে। অবাধ্য আল্লাহ থেকে দূরবর্তী, ধরন বর্ণনা ব্যতিরেকে। একইভাবে জান্নাতে আল্লাহর পাশে থাকা ধরন ব্যতিরেকে। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো ধরন ব্যতিরেকে।'**[৭০১] পিছনে এ সংক্রান্ত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

ফলে তাবিলকে একবাক্যে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু এখানে যে বিষয়টি খুব ভালোভাবে বোঝা আবশ্যক সেটা হলো—ইমাম আজম ও সালাফে সালেহিন থেকে বর্ণিত এসব তাবিলের সংখ্যা খুবই সীমিত। কারণ, সালাফ উন্মুক্তভাবে সকল সিফাতের তাবিল করেননি। এ কারণে ইমাম আজম রহ. এবং হানাফি মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ইমামদের থেকেও বর্ণিত তাবিল সংখ্যা নিতান্তই

---

৬৯৯. তিরমিযি (আবওয়াবুদ দা'আওয়াত আন রাসুলিল্লাহ : ৩৬০৩)।

৭০০. সিয়ারু আলামিন নুবালা (৮/১০৫)। যাহাবি উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, 'উক্ত বর্ণনা বিশুদ্ধ ধরা হলে ইমাম মালেক থেকে দুটো বক্তব্য পাওয়া যাবে।' [এক. তাফসির ব্যতীত যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দেওয়া। দুই. তাবিল করা]

৭০১. আল-ফিকহুল আকবার (৭-৮)।

হাতেগোনা কয়েকটা। এটা বৃদ্ধি পায় পরবর্তী সময়ে। মাহমুদ ইবনে যায়েদ লামিশি (৫২২ হি.) লিখেন, 'আমাদের অসংখ্য বড় মাশায়েখ থেকে বর্ণিত আছে—আমরা (আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে) সেগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে বিশ্বাস রাখব। তাবিলে লিপ্ত হব না। আর কিছু কিছু মাশায়েখ থেকে বর্ণিত আছে—শব্দের জন্য প্রযোজ্য কোনো তাবিল করা।'[৭০২] সুতরাং কিছু মাশায়েখের পথ ছেড়ে প্রথম যুগের অসংখ্য ও বড় মাশায়েখের পথে চলা যে উত্তম, সেটা বলা বাহুল্য। তা ছাড়া, পিছনেও যেটা বলা হয়েছে—এ দরজা উন্মুক্ত রাখলে এর গন্তব্য নেই, শেষ মঞ্জিল নেই। ফলে এটাকে শুরুতেই রুদ্ধ রাখতে হবে। আর সেটার সীমারেখা হলো সালাফের মাযহাব। তারা যতটুকুতে সীমাবদ্ধ থেকেছেন আমরাও ততটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকব। তারা যেখানে তাবিল করেছেন, আমরা সেখানে করব। যেখানে তারা তাবিল করেননি বা নিষেধ করেছেন, আমরা সেখানে করব না। সালাফের অনুসারী দাবির প্রতি এটা ন্যূনতম সুবিচার। ইমাম আজম বলেন, **'কারও জন্য তার নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর ব্যাপারে কিছু বলা বৈধ নয়। বরং মানুষের কর্তব্য হলো, আল্লাহর জন্য সেগুলোই সাব্যস্ত করা যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন; তাঁর ব্যাপারে মনগড়া কোনো বক্তব্য না দেওয়া। বড় মহান বরকতময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা।'**[৭০৩]

মোটকথা, এমন তাবিল যা আল্লাহ ও রাসুল বলে যাননি, সালাফ বলেননি, সেটা করা যাবে না। ইমাম তহাবি বলেন, 'আল্লাহর দিদারসহ আল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয় বোঝার একমাত্র বিশুদ্ধ পন্থা হচ্ছে, অপব্যাখ্যা (তাবিল) বর্জন এবং আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের উপরই দাঁড়িয়ে আছে সকল রাসুলের দ্বীন, নবির শরিয়ত এবং মুসলমানের দ্বীনদারি। সুতরাং যে ব্যক্তি এসব ক্ষেত্রে অস্বীকার কিংবা (সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার) সাদৃশ্যকরণ থেকে বেঁচে না থাকবে, তার পদস্খলন ঘটবে এবং বিশুদ্ধ তাওহিদ (তানযিহ) পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। কারণ, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের একত্ববাদের গুণে গুণান্বিত, অদ্বিতীয়ের বিশেষণে বিশেষিত; সৃষ্টির কেউ সেসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়।'[৭০৪]

---

৭০২. আত-তামহিদ (৫৮-৫৯, ৮৪-)।
৭০৩. দেখুন : আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (৮৯)। আল-উসুলুল মুনিফাহ (১৫)।
৭০৪. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১৪-১৫)।

খোদ মাইমুন নাসাফিও সালাফের মাযহাবের স্বীকৃতি দেন এভাবে : 'আমাদের একদল মাশায়েখের বক্তব্য হলো—এসব (সিফাতের) আয়াত যেভাবে এসেছে সেভাবে ঈমান রাখতে হবে, গ্রহণ করতে হবে এবং এর বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস রাখতে হবে। অতঃপর এগুলোর কাইফিয়্যাত বা ধরন সন্ধান থেকে বিরত থাকতে হবে এই বিশ্বাসের সঙ্গে যে, আল্লাহ জিসম (শরীর) নন; সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর কোনো সাদৃশ্য নেই। নবসৃষ্ট সকল বিষয়াশয় থেকে তিনি পবিত্র। এটাই মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহ.-এর মত। হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন—তাকে আল্লাহর সিফাত (যেগুলো বাহ্যত সাদৃশ্য বোঝায়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "যেভাবে এসেছে আমরা সেভাবে রেখে দিই। এগুলোর উপর ঈমান রাখি। 'কীভাবে', 'কীরূপে' এসব বলা থেকে বিরত থাকি। এটাই নুহ ইবনে আবু মারইয়াম, মদিনাবাসীর ইমাম মালেক ইবনে আনাস, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, সুফিয়ান সাওরির শাগরেদ খালেদ ইবনে সুলাইমান, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারি, আবু দাউদ সিজিস্তানি সকলের মাযহাব...।' [৭০৫]

কামাল ইবনুল হুমাম তাবিলকে শর্তসাপেক্ষে ও নানা যুক্তিতে বৈধ বললেও লিখেছেন, "আল্লাহ আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন। এটা কোনো শরীরী বস্তুর উপর অন্য শরীরী বস্তুর অবস্থানের অর্থে নয়, বরং যে অর্থে তাঁর জন্য শোভনীয়। সুতরাং তাশবিহ তথা সাদৃশ্য নাকচসহ আল্লাহ আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন-এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। ...একই কথা 'আসাবি' (আঙুল), 'কাদাম' (পা), 'ইয়াদ' (হাত) ইত্যাদিসহ সেসব সিফাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যেগুলোর বাহ্যিক অর্থ দেহ বোঝায়। এগুলোর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। 'ইয়াদ' (হাত), 'আসাবি' (আঙুল) ইত্যাদি আল্লাহ তায়ালার সিফাত; অঙ্গ নয়, যেভাবে তাঁর জন্য শোভনীয়, যে সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশি অবগত...।"[৭০৬]

---

৭০৫. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/২৮৫)।

৭০৬. আল-মুসায়ারাহ (১৭-১৮)। অবশ্য তিনি সাধারণ মানুষের বোঝার সুবিধার্থে এসব সিফাতের তাবিলকেও বৈধতা দিয়েছেন। অথচ সাধারণ মানুষ এমন প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী নয়। কুরআন-সুন্নাহতে যা এসেছে মানুষকে হুবহু সেগুলোই মানতে বলা হবে। নিজেদের পক্ষ থেকে কুরআন-সুন্নাহর শব্দকে ব্যাখ্যার দরজা উন্মুক্ত করা হলে সাধারণ মানুষও সেটা শিখবে এবং এক পর্যায়ে অপব্যাখ্যা শুরু করবে। ফলে তাদেরকে ব্যাখ্যা শেখানোর পরিবর্তে কুরআন-সুন্নাহর শব্দকে আঁকড়ে ধরে থাকা শেখানোটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় কি? একারণে শেষে তিনি নিজেও এই মতকে প্রাধান্য না দিয়ে সালাফের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

ফাতাওয়া সিরাজিয়্যাহর লেখক আল্লামা সিরাজুদ্দিন উশি লিখেন, 'আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য 'সিফাতে কামাল' (পরিপূর্ণ গুণাবলি) রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার জন্য 'ইয়াদ' (হাত), 'আইন' (চোখ) সাব্যস্ত করা হবে। কিন্তু সেগুলো আমাদের হাত কিংবা আমাদের চোখের মতো নয়। বরং আমরা এর ধরন (কাইফিয়্যাত) নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করব না।[৭০৭]

ইমাম গাযালির নসিহত : ইমাম গাযালি রহ. সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফের মানহাজে থাকার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পথ বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, সিফাতসংক্রান্ত নসগুলো সালাফের মানহাজে বোঝার জন্য কয়েকটি কাজ করতে হবে : **এক.** 'তাকদিস' তথা আল্লাহকে (জিসমিয়্যাত তথা) দেহবাদ ও দেহবাদিতার আবশ্যকতা থেকে পবিত্র ঘোষণা করতে হবে। **দুই.** 'তাসদিক' তথা এগুলোকে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের পক্ষ থেকে সত্য বলে মানতে হবে। তারা যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, সে উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করতে হবে। **তিন.** এগুলোর দ্বারা আল্লাহর প্রকৃত **উদ্দেশ্য** (মুরাদ) সম্পর্কে জানা মানুষের ক্ষমতার বাইরে—এটা স্বীকার করতে হবে। **চার.** 'সুকুত' নীরব থাকতে হবে। এগুলোর **মর্ম** (মা'না) জানতে চাওয়া যাবে না। এগুলোতে ব্যস্ত হওয়া যাবে না। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত গণ্য হবে। বরং এগুলোতে প্রবেশ করা দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হবে। **পাঁচ.** 'ইমসাক' তথা কুরআন-সুন্নাহতে যা এসেছে, যতটুকু এসেছে, যেভাবে এসেছে, তা ততটুকু এবং সেভাবে রাখতে হবে। ফলে শব্দের এক রূপকে অন্য রূপ দিয়ে পরিবর্তন করা যাবে না; এক শব্দকে অন্য শব্দ দিয়ে বদলানো যাবে না; বাড়ানো কিংবা কমানো যাবে না। যেগুলো আলাদা এসেছে, সেগুলোকে একত্র করা যাবে না। যেগুলো একত্রে এসেছে, সেগুলোকে আলাদা করা যাবে না; বরং কুরআন কিংবা হাদিসে যেভাবে যেটুকু এসেছে, সেভাবে সেটুকু বলতে হবে। বাক্যে শব্দের অবস্থান, ক্রিয়ার রূপ, শব্দরূপ কোনোকিছু পরিবর্তন করা যাবে না। ফলে 'ইস্তিওয়া'র জায়গায় 'ইয়াসতাভি' (يستوي) কিংবা 'মুসতাভিন' (مستو) ব্যবহার করা যাবে না। 'ইয়াদ' তথা হাত বলা হলে বাহু, আঙুল, তালু খোঁজা যাবে না; বরং আঙুল (ইসবা')-এর জায়গায় (উনমুলা) ব্যবহার করা যাবে না। **ছয়.** 'কাফফ' তথা মনের ভিতরেও এগুলোকে স্থান দেওয়া যাবে না। এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যাবে না। **সাত.** এগুলোর অর্থ কারও জানা নেই এমন নয়; বরং রাসুলুল্লাহ (ﷺ), অন্য নবি-রাসুল কিংবা আউলিয়া-সিদ্দিকিন তাদের

---

৭০৭. ফাতাওয়া সিরাজিয়্যাহ (৩০৯)।

এগুলো জানা থাকতে পারে। ফলে যারা এগুলো জানেন, তাদের কাছে এগুলোর জ্ঞান সঁপে দিতে হবে। সিফাতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আকিদার জন্য প্রত্যেক সাধারণ মুসলিমকে উপরের কাজগুলো করতে হবে।[৭০৮]

মুহাক্কিক হানাফি ইমামদের মানহাজ

সিফাতের ক্ষেত্রে পরবর্তী লোকদের মানহাজ বর্ণনার পর যে-কারও প্রশ্ন জাগতে পারে—তাহলে হানাফিদের মাঝে হুবহু ইমাম আজম রহ.-এর অনুসারী কারা? ফিকহের মতো আকিদার ক্ষেত্রেও কারা ইমাম আজম রহ.-এর পঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করেছেন?

প্রথমে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বলা দরকার সেটা হলো—জাহমিয়্যাহ, মুতাযিলা, মুরজিয়াসহ যেসব ভ্রান্ত দল ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফি দাবিদার, তাদের বাইরে আহলে সুন্নাতের সকল হানাফি আলেম সামগ্রিকভাবে ফিকহের মতো আকিদার ক্ষেত্রেও ইমাম আজম রহ.-এর অনুসারী। এ বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা সেই প্রচলিত 'মিথ' গুড়িয়ে দিতে চাচ্ছি, যেখানে আহলে সুন্নাতের অনুসারী পরবর্তী হানাফি উলামায়ে কেরামকে ইমাম আজমের মানহাজ থেকে বিচ্যুত মনে করা হয়। সর্বত্র প্রচার করা হয়—'তারা ফিকহে হানাফি হলেও আকিদায় হানাফি নয়।' এই বক্তব্য সঠিক নয়। বরং হানাফিরা যেমন ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আজম রহ.-এর অনুসারী, আকিদার ক্ষেত্রেও তারা ইমামের অনুসারী। এদিক থেকে ইমাম আবু জাফর তহাবি, ইমাম আবু মনসুর আল-মাতুরিদি, সায়েদ নিশাপুরি, মাইমুন নাসাফি প্রমুখের মাঝে মৌলিক পার্থক্য নেই। তারা প্রত্যেকেই ইমাম আজমের আকিদার অনুসারী ছিলেন। আকিদার প্রায় নব্বই/পঁচানব্বই ভাগের বেশি মাসআলাতে এসব আলেমের মাঝে কোনো মৌলিক মতবিরোধ নেই; ইমাম আজমের আকিদার সঙ্গে সংঘাত নেই। বরং যুগে যুগে ইমাম আজমের আকিদাবিরোধী বিভিন্ন শিবিরের বিপরীতে সকল হানাফি আলেম একযোগে ইমাম আজমের আকিদা তথা সালাফ ও আহলে সুন্নাতের বিশুদ্ধ আকিদা সুরক্ষিত রেখেছেন, প্রচার করেছেন।

তবে সময় ও কালগত, ব্যক্তি ও জ্ঞানগত বিভিন্ন কারণে হানাফি আলেমদের আকিদাভিত্তিক কর্মপন্থায় পরবর্তী সময়ে কিছুটা মতপার্থক্য তৈরি হয়। ইরাক, মিশর, বলখ, নিশাপুর ও বুখারার আলেমগণ আকিদার শাখাগত বিভিন্ন (স্বতন্ত্র)

---

৭০৮. দেখুন : ইলজামুল আওয়াম আন ইলমিল কালাম (৪৯-৫০)।

মাসআলা যেভাবে গ্রহণ করেছেন এবং সেগুলো যেভাবে উপস্থাপন করেছেন (মানহাজ) সমরকন্দের আলেমগণের বিভিন্ন বক্তব্য, উপস্থাপনার ধরন এবং মানহাজ থেকে কিছুটা আলাদা হয়ে যায়, যা এই গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গাতেও আলোচিত হয়েছে। এগুলোকে মোটা দাগে 'তহাবি ধারা', 'বুখারা ধারা' ও সমরকন্দ ধারা' হিসেবে বিন্যস্ত করা যায়। আরও সংকুচিত করলে 'তহাবি ধারা' ও 'মাতুরিদি ধারা' নামে আখ্যা দেওয়া যায়।

এসব ধারার মতপার্থক্যগুলোকে বড় বানিয়ে একটাকে অন্যটা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও বিচ্ছিন্ন বলা, একটাকে হক বলে অন্যটাকে বাতিল বলা ভুল, যেমনটা উপরে বলা হয়েছে; আবার এগুলোকে স্রেফ কিছু বিচ্ছিন্ন মাসআলার উপস্থাপনাকেন্দ্রিক পার্থক্য বলে লঘু করাও সঠিক নয়। বরং তাদের মাঝে বিভিন্ন মাসআলায় মতপার্থক্যের পাশাপাশি মানহাজগত মতপার্থক্যও রয়েছে, যা সাধারণের চোখে না পড়লেও বিশেষজ্ঞদের চোখ এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। এ কারণে প্রায় সামসময়িক হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আবু জাফর তহাবি রহ.-এর 'আকিদাহ তহাবিয়্যাহ' এবং ইমাম মাতুরিদির 'আত-তাওহিদ', কিংবা একদিকে মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখির 'আল-খিসাল' এবং সায়েদ নিশাপুরির 'আল-ইতিকাদ', অন্যদিকে নাসাফির 'তাবসিরাতুল আদিল্লাহ' এবং সাবুনির 'আল-বিদায়াহ' পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে যে-কারও কাছে বড় ধরনের পার্থক্য চোখে পড়বে। এ পার্থক্য কেবল 'সংক্ষিপ্ত' (মুখতাসার) ও 'বিস্তারিত' (মুতাওয়াল) হওয়ার পার্থক্য নয়, বরং আকিদার তাকরির ও ইস্তিদলালি মানহাজগত পার্থক্য। এই গ্রন্থ এসব পার্থক্যের বিস্তারিত কারণ, প্রেক্ষিত, প্রেক্ষাপট, ইতিহাস ইত্যাদির তুলনামূলক আলোচনার স্থান নয়। এখানে কেবল এটুকু বলার মাঝেই ক্ষান্ত থাকা হচ্ছে যে, উভয় ধারা ইতিহাসের পুরো সময়টাতে বিদ্যমান ছিল এবং আজও আছে। উভয়টাই ফিকহ ও আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম আজমের অনুসারী ও প্রতিনিধি। দুটোই একই পাহাড় থেকে উৎসারিত এবং একই সাগরে মিলিত। ইমাম আবু জাফর তহাবির আকিদা সরাসরি 'নস' ও 'আসার'-ভিত্তিক এবং পাশাপাশি ইজমালি হওয়াতে সেটা ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর মানহাজের সর্বোচ্চ কাছাকাছি, প্রাথমিক যুগের সালাফের আকিদাচর্চার পদ্ধতির সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যদিকে মাতুরিদি ধারা নসের পাশাপাশি 'আকল' ও 'কালাম'-ভিত্তিক এবং পরবর্তী যুগের বাস্তবতার আলোকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্তিত যুগ-চাহিদার সঙ্গে সর্বোচ্চ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা শেষে এবার আমরা সিফাতের ক্ষেত্রে কিছু মুহাক্কিক হানাফি আলেমের বক্তব্য ও কর্মপদ্ধতি (মানহাজ) নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করব। এক্ষেত্রে শুরুতেই আসেন ইমাম আজমের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শাগরেদগণ। তাঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন—ইমাম আবু ইউসুফ (১৮২ হি.), মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (১৮৯ হি.), যুফার ইবুনল হুযাইল (১৫৮ হি.), আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১৮১ হি.), হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা (১৭৬ হি.), দাউদ আত-তাই (১৬৫ হি.), ইউসুফ ইবনে খালেদ সামতি (১৯০ হি.), হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুই (২০৪ হি.), হাফস ইবনে গিয়াস (১৯৪ হি.), আবু মুতি বলখি (১৯৯ হি.), আবু মুকাতিল সমরকন্দি (২০৮ হি.), আবু হাফস আল-কাবির (২১৭ হি.), ঈসা ইবনে আবান (২২১ হি.), মুহাম্মাদ ইবনে সামাআহ (২২৩ হি.), মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল রাযি (২৪৮ হি.), আবু সুলাইমান জুযজানি (২২৫ হি.), আবু হাফস সগির (২৬৪ হি.), মুহাম্মাদ ইবনে শুজা' আস-সালজি (২৬৬ হি.), আহমদ ইবনে আবি ইমরান (২৮৫ হি.) প্রমুখ, যারা সরাসরি ইমাম কিংবা ইমামের সরাসরি শাগরেদদের থেকে ফিকহ ও আকিদা গ্রহণ করেছেন। তাদের কেউ আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম আজমের সঙ্গে মতবিরোধ করেননি। তারাই বিভিন্ন গ্রন্থ লিখে এবং রিওয়ায়াত করে ইমামের বিশুদ্ধ আকিদা পরবর্তী উম্মাহর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

- ইমাম আজমের প্রাথমিক স্তরের শাগরিদদের সকলেই হুবহু তাঁর আকিদা ও কর্পমদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(সিফাতসংক্রান্ত) এসব হাদিস নির্ভরযোগ্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন, আমরাও বর্ণনা করি। এগুলো সত্য বলে মানি, এগুলোতে ঈমান রাখি। কিন্তু এগুলো ব্যাখ্যা করি না।'[৭০৯] ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-কে 'আল্লাহর দুনিয়ার আকাশে নুযুল হওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'আমরা এসব হাদিস বর্ণনা করি, তাতে ঈমান রাখি, কিন্তু ব্যাখ্যা করি না।'[৭১০] তিনি আরও বলেন, "পূর্ব থেকে পশ্চিম সকল দেশের ফকিহ এই ব্যাপারে একমত যে, কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহতে আল্লাহর তায়ালার যেসব সিফাত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে কোনো ধরনের পরিবর্তন, বিবরণ (وصف), সাদৃশ্য দেওয়া ছাড়া গ্রহণ করতে হবে। যে ব্যক্তি এগুলোর ব্যাখ্যা (تفسير) দেবে, সে আল্লাহর রাসুলের মানহাজ এবং

---

৭০৯. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৭০)।

৭১০. শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৩/৪৮০)।

আহলে সুন্নাতের মানহাজ থেকে বিচ্যুত হবে। কারণ, তারা এগুলোর বিবরণ দেননি, ব্যাখ্যাও করেননি (لم يصفوا ولم يفسروا)। বরং কুরআন ও সুন্নাহতে যা এসেছে, ততটুকু বলে চুপ হয়ে যেতেন। সুতরাং যে ব্যক্তি জাহমের মতো কথা বলবে, সে মুসলমানদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং আল্লাহর উপর 'অনস্তিত্ব' বস্তুর বিশেষণ প্রয়োগের (অর্থাৎ সিফাত নাকচের) অভিযোগে অভিযুক্ত হবে।"[৭১১]

- ইমাম আজম রহ.-এর শাগরেদ ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম (১৯৫ হি.) বলেন : 'আমি আওযায়ি, সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস, লাইস ইবনে সাদকে আল্লাহর সিফাত, দিদার এবং এ ধরনের অন্য হাদিসগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তাদের প্রত্যেকে বলেছেন, 'যেভাবে এসেছে সেভাবে ধরনহীন চালিয়ে দাও' (أَمِرُّوها كَما جاءت بِلا كَيْف)।[৭১২]

- ইমামের আরেক শাগরেদ নুহ ইবনে আবু মারইয়াম (১৭৩ হি.) একদল মানুষের সামনে কথা বলছিলেন। একপর্যায়ে তিনি রাসুলুল্লাহর একটি হাদিস পড়লেন। হাদিসটি হলো, 'বান্দা যখন (হালাল সম্পদ) থেকে কোনো সদকা করে, তখন আল্লাহ তায়ালা সেটা তাঁর ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করেন। অতঃপর সেটাকে এমনভাবে বৃদ্ধি করেন, যেভাবে তোমাদের কেউ অশ্ব বা উটশাবক প্রতিপালন করে বৃদ্ধি করে। একপর্যায়ে সেটা উহুদ পাহাড়ের মতো হয়ে যায়।' অতঃপর নুহ কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ অর্থ : "তারা কি জানে না যে, আল্লাহই তো তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং 'সদকা' গ্রহণ করেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [তাওবা : ১০৪] তখন একব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাকে বলল, আবু ইসমাহ, এসব হাদিস বর্ণনা করছেন, অথচ ব্যাখ্যা করছেন না? ...তিনি বললেন, তুমি আমাকে এগুলো জিজ্ঞাসা করছ? এগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুল থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে যেভাবে এসেছে, আমরা সেভাবে বলি; কোনো ব্যাখ্যা করি না। 'তাঁর সিফাতের রূপ ও ধরন কী কিংবা কীভাবে'—এমন বলি না। বরং আমরা বলি, 'আল্লাহর হাত রয়েছে, সৃষ্টির হাতের

---

৭১১. প্রাগুক্ত (৩/৪৮০)।

৭১২. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৬৮)।

মতো নয়' (لله تعالى يدٌ، لا كأيدي العباد)।[৭১৩] ইমাম আজমের তৃতীয় স্তরের শাগরেদ (হাম্মাদের ছেলে উমরের ছাত্র) আবু ইসমাহ সাদ ইবনে মুআজও সিফাতের ক্ষেত্রে একই কথা বলতেন।[৭১৪]

- এই সম্মানিত সিলসিলার বিশুদ্ধ আকিদাকে সুবিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ করে পরবর্তী মুসলিম উম্মাহর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী করার কাজটি করেন আহলে সুন্নাতের আকিদার গুরুত্বপূর্ণ ইমাম এবং আবু হানিফার আকিদার সর্বাধিক বিশুদ্ধ ভাষ্যকার হিসেবে প্রসিদ্ধ আবু জাফর তহাবি (৩২১ হি.)। আকিদার কেবল আলাদা আলাদা মাসআলা নয়, বরং মানহাজের ক্ষেত্রেও তিনি ইমাম আজমের শতভাগ অনুসরণ করেছেন। এই গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় ইমাম আজম রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখের পাশাপাশি আমরা ইমাম তহাবির বক্তব্যও উল্লেখ করেছি। ফলে এখানে সেগুলোর পুনরোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তথাপি আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে সিফাতসংক্রান্ত দু-একটা বক্তব্য উল্লেখ করা হচ্ছে।

সিফাতের ক্ষেত্রে ইমাম তহাবি হুবহু সেই মানহাজের উপর অবিচল ছিলেন, যা রেখে গিয়েছেন ইমাম আজম, তাঁর দুই শাগরেদ আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ এবং সকল সালাফে সালেহিন। ইমাম আজম বলেছেন, **'সৃষ্টির কোনো বৈশিষ্ট্য (তথা সিফাত)-কে আল্লাহর উপর আরোপ করা যাবে না। তাঁকে সৃষ্টির কোনো বিশেষণে বিশেষিত করা যাবে না। তাঁর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তাঁর দুটো সিফাত। কোনো ধরন ছাড়াই সেটা বিশ্বাস করতে হবে।'**[৭১৫] ইমাম তহাবি রহ. লিখেন, 'আল্লাহ তায়ালা ক্রুদ্ধ হন, সন্তুষ্ট হন; কিন্তু তাঁর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি সৃষ্টিজীবের মতো নয়।'[৭১৬] ইমাম আজম ইস্তিওয়ার ব্যাপারে বলেছেন, **"আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন। কিন্তু তিনি আরশের মুখাপেক্ষী নন।"**[৭১৭] ফলে ইমাম তহাবি রহ. বলেছেন, 'আরশ এবং কুরসি সত্য। আল্লাহ তায়ালা আরশ এবং আরশের নিচে বিদ্যমান সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি সকল বস্তু এবং আরশের উপর যা-কিছু রয়েছে সবগুলোকে পরিবেষ্টনকারী। সৃষ্টিজগৎ তাকে পরিবেষ্টন করতে

---

৭১৩. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৭১)। ঘটনায় বর্ণিত হাদিস দেখুন : বুখারি (কিতাবুয যাকাত : ১৪১০)।

৭১৪. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৭২)।

৭১৫. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৬-৫৭)।

৭১৬. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (৫)।

৭১৭. আল-ওয়াসিয়্যাহ (পাণ্ডুলিপি) (৩)।

অক্ষম।'[৭১৮] ইমাম তহাবি রহ. আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মানবীয় কোনো গুণ বা বিশেষণ আরোপ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং চক্ষুষ্মান ব্যক্তির কর্তব্য হলো এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, আল্লাহর ব্যাপারে কাফেরদের মতো বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকা। নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা, আল্লাহ তায়ালা তাঁর গুণাবলিতে মানুষের মতো নন।'[৭১৯]

- এই ধারার আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন হানাফি আকিদার অন্যতম প্রাচীন ও বিশুদ্ধ গ্রন্থ 'আস-সাওয়াদুল আজম'-এর লেখক। যদিও এই গ্রন্থটি ইমাম মাতুরিদির শাগরেদ হাকিম সমরকন্দির দিকে সম্পৃক্ত করা হয়, তবে এটা বিশুদ্ধ নয়। কারণ, 'আস-সাওয়াদুল আজম'-এ বর্ণিত আকিদার বিভিন্ন মাসায়েল ইমাম মাতুরিদি এবং সমরকন্দের পরবর্তী মাশায়েখদের আকিদা থেকে ভিন্ন। বরং সেগুলো বুখারা, ফারগানা ও বলখের মাশায়েখ, ইমাম তহাবি ও আবু হানিফা রহ.-এর প্রথম কয়েক স্তরের শাগরেদদের আকিদার সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'কালামি' মানহাজের চেয়ে 'আসারি' মানহাজের অধিকতর কাছাকাছি। এমন নানান কারণে এটা হাকিম সমকরন্দির পরিবর্তে আবু হাফস বুখারির হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ গ্রন্থে বর্ণিত অধিকাংশ আকিদা ইমাম আজম ও ইমাম তহাবি রহ.-এর আকিদার মানহাজের সঙ্গে পূর্ণ মাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। বরং শব্দ চয়নের ক্ষেত্রেও ইমাম আজম ও তহাবির সঙ্গে এর শব্দের মিল-মিছিল বিস্ময়কর। ফলে যে-কেউ অনুভব করবেন, এগুলো একই উৎস থেকে উৎসারিত।[৭২০]

কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক! ইমাম আজম বলেছেন, **'আল্লাহর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তাঁর দুটো সিফাত। কোনো ধরন বা স্বরূপ ছাড়াই সেটা বিশ্বাস করতে হবে।'**[৭২১]

---

৭১৮. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১৯)।

৭১৯. প্রাগুক্ত (১৩)।

৭২০. তবে যতটুকু বোঝা যায়, গ্রন্থটি আবু হাফস বুখারি আল-কাবির (২১৭ হি.) কিংবা তাঁর পুত্র আবু হাফস আস-সগির (২৬৪ হি.) সরাসরি নিজ হাতে লিখেননি, বরং পরবর্তী সময়ের বুখারার কোনো আলেম এ আকিদা সংকলন করেছেন। কারণ, উক্ত গ্রন্থে আহলে সুন্নাতের মুহাক্কিক আলেমদের তালিকায় আবু হাফস বুখারির নাম এসেছে (৪৭)। তাঁর এক শতাব্দ পরবর্তী সময়ের অনেক আলেমের নাম এসেছে। আবু হাফস নিজের নাম নিজে মুহাক্কিক আলেমদের তালিকায় আনবেন এটা অসম্ভব। এরচেয়েও বেশি অসম্ভব হলো তাঁর মৃত্যুর এক শতাব্দেরও অধিক পরবর্তী সময়ের আলেমদের নাম উল্লেখ করা। বোঝা গেল, তিনি নিজে এটা লিখেননি। তবে এটা সন্দেহাতীত যে, নিজে না লিখলেও উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আকিদা সামগ্রিকভাবে ইমাম আবু হাফসের আকিদাই। ফলে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় লেখক হিসেবে আবু হাফসের নাম সরাসরি ব্যবহার করেছি।

৭২১. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৬-৫৭)।

ইমাম তহাবি লিখেন, 'আল্লাহ তায়ালা ক্রুদ্ধ হন। তিনি সন্তুষ্ট হন। কিন্তু তাঁর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি সৃষ্টিজীবের মতো নয়।'[৭২২] আবু হাফস লিখেন, 'আল্লাহ তায়ালা ক্রুদ্ধ হন। সন্তুষ্ট হন। কিন্তু তাঁর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি সৃষ্টির কারও মতো নয়।' তিনি আরও লিখেন, 'আল্লাহর ক্রোধকে জাহান্নাম এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে জান্নাত দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। যদি কেউ এমন বলে, সে বিদআতি! বরং আল্লাহর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি রয়েছে, কিন্তু সেটা আমাদের ক্রোধ ও সন্তুষ্টির মতো নয়। কেননা, ক্রোধ ও সন্তুষ্টির কারণে আমাদের অবস্থার মাঝে পরিবর্তন আসে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে।'[৭২৩] আল্লাহর অন্যান্য সিফাতের ক্ষেত্রে আবু হাফস বলেন, 'মুতাশাবিহ আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো সেগুলোতে ঈমান রাখতে হবে, ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ, এগুলো ব্যাখ্যা করতে গেলে সিফাত নাকচ হয়ে যাবে এবং ফলে সেটা বিদআত গণ্য হবে।'[৭২৪]

- বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল আল বলখি (৪১৯ হি.) এই ধারার আরেকজন ব্যক্তিত্ব। তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান গ্রন্থ 'আল-ইতিকাদ' [আল-খিসাল ফি আকায়িদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ] ইমাম আজম রহ.-এর আকিদাবিষয়ক পঞ্চপুস্তক, আবু হাফসের 'আস-সাওয়াদুল আজম', ইমামু আহলিস সুন্নাহ আবু জাফর তহাবির 'আকিদাহ তহাবিয়্যাহর'র রচনাপদ্ধতির সঙ্গে ভীষণ রকমের সাদৃশ্যপূর্ণ। বলখি উক্ত গ্রন্থটি গাযিয়ে ইসলাম সুলতান মাহমুদ গযনবি রহ.-এর জন্য লিখেছিলেন। ফলে এটা ইমাম আজমের আকিদার অন্যতম বিশুদ্ধতর প্রতিনিধি। ইস্তিওয়া এবং অন্যান্য সিফাত সম্পর্কে তিনি লিখেন, 'আল্লাহ তায়ালার আগমন, নুযুল, ইয়াদ ইত্যাদিসহ সকল আয়াতে মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মাযহাব হলো, এগুলোতে ঈমান আনা, ব্যাখ্যা (তাফসির) পরিত্যাগ করা, অস্বীকার না করা। কারণ, আল্লাহর সাদৃশ্য কেউ নেই। এগুলো রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে যেভাবে এসেছে সেভাবে বিশ্বাস রাখা।' অন্যত্র লিখেন, "আল্লাহ আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন। তিনি 'আরশের উপরে' ধরনহীন, সাদৃশ্যহীন। তবে এই ইস্তিওয়া স্থান কিংবা দূরত্বগত উচ্চতা নয়; কারণ,

---

৭২২. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (৫)।

৭২৩. আস-সাওয়াদুল আজম (৪, ২৬)।

৭২৪. আস-সাওয়াদুল আজম (৪০)।

তিনি স্থানের অমুখাপেক্ষী। ...আল্লাহকে 'উপর' বলা হয়েছে রবুবিয়্যাহর প্রতি লক্ষ্য রেখে, ধরনহীন।"[৭২৫]

- এই ধারার আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হলেন ইমাম কাযি আবুল আ'লা সায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-উসতাওয়াবি নিশাপুরি (৪৩২ হি.)। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর শাগরেদদের পরম্পরায় ইমাম আজম রহ.-এর ইলম লাভ করেন। ফিকহ ও আকিদা উভয় ক্ষেত্রে ইমাম আজমের বিশুদ্ধ মাযহাবের উপর অটল থাকেন। ইমাম আজম, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদসহ তাঁর প্রথম স্তরের শাগরেদগণ, ইমাম তহাবি, আবু হাফস বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখি প্রমুখ আকিদার ক্ষেত্রে যে নুসুসভিত্তিক এবং ইজমালি মূলনীতি অবলম্বন করেছেন, তিনি তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করেছেন। ফলে পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন মতভেদ দেখার পরও সেগুলোতে অর্থহীন বিতর্ক কিংবা মনগড়া বক্তব্য দেওয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত থেকেছেন। সালাফে সালেহিনের মানহাজ পুঙ্খানুপুঙ্খ গ্রহণ করেছেন। ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আজম ও ইমাম মালেক রহ.-এর যে আকিদা ছিল, সেটা বর্ণনা করেছেন এবং সেটাকেই গ্রহণ করেছেন। কেবল ইস্তিওয়া নয়, সকল ক্ষেত্রেই তিনি হানাফি আকিদার শতভাগ উত্তরসূরি প্রমাণ দিয়েছেন।[৭২৬]

- ফখরুল ইসলাম বাযদাবি (৪৮২ হি.)। যদিও আকিদার ক্ষেত্রে বাযদাবির বক্তব্য সাম্যান্য, সেটাও বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়ানো-ছিটানো এবং আকিদার উপর তাঁর স্বতন্ত্র গ্রন্থ অনুপস্থিত, তথাপি যেটুকু উপস্থিত, সেটুকুতেই ইমাম আজম রহ.-এর মানহাজে অবিচল ছিলেন ইমাম বাযদাবি। তিনি তাঁর উসুলে লিখেন, ইলম দুই প্রকারের—এক. আল্লাহর তাওহিদ ও সিফাতের ইলম, দুই. ফিকহ, শরিয়ত ও হালাল-হারামের ইলম। প্রথম প্রকারের ইলমের ক্ষেত্রে একমাত্র বিশুদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও বিদআত বর্জন করা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথে অবিচল থাকা, যে পথে ছিলেন সাহাবা, তাবেয়িন ও সকল সালাফে সালেহিন। এ পথেই অটল ছিলেন ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ এবং তাদের সকল শাগরেদ। ইমাম আবু হানিফা রহ. ইলমে তাওহিদের ক্ষেত্রে আল-ফিকহুল আকবার নামে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। তাতে তিনি (আল্লাহর) সিফাত 'ইসবাত' (সাব্যস্ত) করতে বলেছেন।

---

৭২৫. আল-ইতিকাদ, বলখি (১০৬-১০৭)।
৭২৬. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৫০)।

তাকদিরের ভালোমন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে ও তাঁর ইচ্ছাতে হয় সেটার স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৭২৭]

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবি আরও লিখেন, 'একইভাবে হাত (ইয়াদ) ও চেহারা (ওয়াজহ) সাব্যস্তকরণ। এগুলোর মৌল (আসল) জ্ঞাত, ব্যাখ্যা অজ্ঞাত। কিন্তু ব্যাখ্যা উপলব্ধির ক্ষেত্রে অক্ষমতার কারণে মূলকে অস্বীকার করা বৈধ হবে না। মুতাযিলারা এ পথেই গোমরাহ হয়ে গিয়েছে। ব্যাখ্যা না জানার অজুহাতে মূল সিফাতকেই অস্বীকার করেছে...।'[৭২৮] আলাউদ্দিন বুখারি এর ব্যাখ্যায় বলেন, "আল্লাহ তায়ালার জন্য 'ওয়াজহ' (চেহারা), 'ইয়াদ' (হাত) ইত্যাদি গুণ সাব্যস্ত করা হবে, তবে সেটা আকার-আকৃতি (সুরত) ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (জারিহা) থেকে পবিত্র ঘোষণার পাশাপাশি। কেননা, আল্লাহর ক্ষেত্রে 'ওয়াজহ' ও 'ইয়াদ' কামালত। বিপরীতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আকার-আকৃতি তাঁর জন্য অসম্ভব। সুতরাং এগুলো সত্য বিশ্বাস করতে হবে। ধরন (কাইফিয়্যাত) কিংবা ব্যাখ্যা (তাবিল) বর্জন করতে হবে।"[৭২৯]

- ইমাম সারাখসি (৪৮৩ হি.) বলেন, 'আহলে সুন্নাত নস দ্বারা সাব্যস্তকৃত মূল বিষয়কে স্বীকার করেন। কেবল মুতাশাবিহ তথা 'কাইফিয়্যাত' (ধরন)-এর ক্ষেত্রে নীরব থাকেন। এটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির মাঝে লিপ্ত হওয়াকে তারা বৈধ মনে করেন না, যেমনটা আল্লাহ তায়ালা গভীর জ্ঞানের অধিকারীদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন এভাবে: ﴿وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ অর্থ : 'তারা বলে, আমরা ঈমান আনলাম এ সবকিছু আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে। আর কেবল জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে।' [আলে ইমরান : ৭][৭৩০]

- আল্লামা উবাইদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ রুকনুদ্দিন সমরকন্দি (৭০১ হি.)। তিনি তাঁর আকিদাহ রুকনিয়্যাহতে লিখেন, "পরকালে আল্লাহর দিদার হলো মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত, যার স্বরূপ ও ধরন অজ্ঞাত। একই কথা আমলের পরিমাপ এবং পুলসিরাত পার হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একই কথা 'হাত' (ইয়াদ)

---

৭২৭. উসুলুল বাযদাবি (৩)।

৭২৮. উসুলুল বাযদাবি (৩)।

৭২৯. কাশফুল আসরার (১/৯৪)।

৭৩০. শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৩৬)।

ও 'আগমন' (মাজি)-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে আল্লাহ বলেছেন, ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ অর্থ : 'বরং আল্লাহর উভয় হাতই প্রসারিত; যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন।' [মায়িদাহ : ৬৪] আরও বলেছেন, ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ অর্থ : 'আপনার রব আর ফেরেশতারা আসবেন সারিবদ্ধভাবে।' [ফজর : ২২] এগুলোর মতো অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হলো, এগুলোর উপর ঈমান রাখা। এগুলোর ধরন ও স্বরূপ সন্ধান থেকে বিরত থাকা। মুতাযিলারার এসব অস্বীকার করেছে। তারা 'হাত'-কে কুদরত কিংবা অস্তিত্ব দ্বারা তাবিল করেছে। একইভাবে 'আগমন'-কে 'সত্য প্রকাশ' দিয়ে তাবিল করেছে। আল্লাহর দিদারকে আল্লাহর নিদর্শনের দিদার বলে তাবিল করেছে। বিপরীতে মুশাব্বিহাহ সম্প্রদায় এগুলোকে শারীরিক হাত, শারীরিক আগমন ও শারীরিক দর্শন মনে করেছে। আল্লাহর দ্বীন হলো এই বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ির মাঝে।"[৭৩১]

- আল্লামা ইসহাক হাকিম আর-রুমি (৯৫০ হি.)। তিনি আল-ফিকহুল আকবারের ব্যাখ্যায় আল্লাহর সিফাত যেভাবে এসেছে, সেভাবে রেখে দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাবিল বারণ করেছেন। একপর্যায়ে তিনি লিখেন, 'আল্লাহর সিফাতগুলোর প্রত্যেকেটার ভিন্ন ভিন্ন মর্ম (মাফহুম) রয়েছে। এ কারণে আহলে সুন্নাতের আলেমগণ এগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট অর্থে তাবিল করেননি।'[৭৩২]

- প্রখ্যাত তুর্কি আলেম আল্লামা আবুল মুনতাহা মাগনিসাভি (১০০০ হি.)। তিনি তাঁর আল-ফিকহুল আকবারের ব্যাখ্যায় লিখেন, "আল্লাহ তায়ালার 'ইয়াদ' (হাত), 'ওয়াজহ' (চেহারা) এবং 'নফস' (সত্তা) রয়েছে, যেভাবে কুরআনে এসেছে সেভাবে—কারণ, এগুলো কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। হাতের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ অর্থ : 'আল্লাহর হাত রয়েছে তাদের হাতের উপর।' [ফাতাহ : ১০] চেহারার ব্যাপারে বলেন, ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ অর্থ : 'আর আপনার মহামহিম ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা (ওয়াজহ) অবশিষ্ট থাকবে।' [রহমান : ২৭] নফসের ব্যাপারে ঈসা আলাইহিস সালামের বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ অর্থ : 'আপনি জানেন আমার ভিতরে কী আছে। আমি জানি না আপনার ভিতরে

---

৭৩১. আল-আকিদাহ আর রুকনিয়্যাহ (২৪-২৫)।

৭৩২. মুখতাসারুল হিকমাহ আন নববিয়্যাহ (পাণ্ডুলিপি) (৩৫-৩৬)।

কী আছে।’ [মায়িদা : ১১৬] ইমাম আজম বলেন, **‘কুরআনে আল্লাহ তায়ালা চেহারা, হাত ও নফসসহ যা-কিছু উল্লেখ করেছেন, সেগুলো তার ধরনবিহীন সিফাত।’** অর্থাৎ, এগুলোর মূল (আসল) আমাদের কাছে জ্ঞাত, ব্যাখ্যা অজ্ঞাত। সুতরাং সাদৃশ্য, বর্ণনা দিতে অক্ষম ইত্যাদি যুক্তিতে জ্ঞাত মূলকে বাতিল করা যাবে না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে বর্ণিত, (এসব সিফাতের) স্বরূপ ও ধরন (কাইফিয়্যাত) অজ্ঞাত এবং সেটার অনুসন্ধান বিদআত...।” মাগনিসাভি অন্যত্র আরও লিখেন, “ক্রোধ (গজব) ও সন্তুষ্টি (রিযা) আল্লাহর দুটি সিফাত। এগুলোর ধরন বর্ণনা ব্যতীত। কারণ, এগুলোর ধরন আমাদের কাছে অজ্ঞাত। আল্লাহর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি আমাদের ক্রোধ ও সন্তুষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না। কেননা, আমাদের কাছে ক্রোধ বলতে হৃদয়ের রক্ত উদ্‌বেলিত হয়ে যাওয়া; আর সন্তুষ্টি বলতে সকল ইচ্ছার পূর্ণতা পাওয়া, যা পরবর্তীকালে অঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ফলে ক্রোধ ও সন্তুষ্টি আমাদের কাছে আনন্দ-আহ্লাদ, ইশক ও বিস্ময় ইত্যাদির মতো মানসিক অবস্থা, যা বিভিন্ন পদার্থে গঠিত আমাদের মেজাযের অনুবর্তী। অথচ আল্লাহ এ সবকিছু থেকে পবিত্র।”[৭৩৩]

- প্রসিদ্ধ আলেম মোল্লা আলি কারি (১০১৪ হি.)। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে আল্লাহ তায়ালার সিফাতগুলো সাব্যস্ত করার কথা বলেছেন। হ্যাঁ, যদিও বিভিন্ন জায়গায় তিনি তাবিলের আশ্রয় নিয়েছেন, তথাপি কুরআন-সুন্নাহ বা সালাফ থেকে প্রমাণিত নয় এমন তাবিলকে কঠোরভাবে খণ্ডন করেছেন। বরং আল-ফিকহুল আকবারের ব্যাখ্যার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, “পরবর্তী আলেমদের কেউ কেউ এগুলোর তাবিল করেছেন এবং সেটাকে ‘অধিক শক্তিশালী’ মত দিয়েছেন। অথচ খোদ ইমামুল হারামাইন প্রথম জীবনে তাবিল করে জীবনের শেষ দিকে তাবিল পরিত্যাগ করেন এবং এটাকে হারাম ঘোষণা করেন। বরং এ তাবিল নিষিদ্ধ হওয়াকে তিনি তার ‘আর-রিসালাহ আন-নিযামিয়্যাহ’-তে সালাফের সর্বসম্মত মত বলে সিদ্ধান্ত দেন। এটা আমাদের মাতুরিদি আলেমদেরও মত।”[৭৩৪]

- আল্লামা আবদুর রহিম শায়খযাদাহ (৯৪৪ হি.)। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ ‘নাজমুল ফারায়িদ’-শীর্ষক গ্রন্থে লিখেন : “হানাফি মাশায়েখের মতে, ‘ইয়াদ’ (হাত), ‘ওয়াজহ’ (চেহারা) ইত্যাদি আল্লাহ তায়ালার জন্য সাব্যস্ত করা হবে।

---

৭৩৩. শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১২০-১২২)।

৭৩৪. দেখুন শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৩৭)।

এগুলোর মৌল (আসল) জ্ঞাত, ব্যাখ্যা (ওয়াসফ) অজ্ঞাত। সুতরাং ব্যাখ্যা না জানার অজুহাতে মূলকে বাতিল করা বৈধ হবে না। এটা ফখরুল ইসলাম বাযদাবি, শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসির মত। মোল্লা আলি কারি তাঁর আল-ফিকহুল আকবারে এটাই সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। ইমাম তহাবির আকিদা থেকেও এটাই বোঝা যায়। সদরুশ শরিয়াহ তাঁর 'তাওযিহ' গ্রন্থে বলেছেন, আমাদের কাছে মুতাশাবিহের বিধান হলো, এর হাকিকতে বিশ্বাস রাখা, (কিন্তু মর্ম নির্ধারণ) থেকে বিরত থাকা। বিপরীতে আশআরি মাশায়েখের বক্তব্য হলো এগুলোকে রূপক অর্থে নেওয়া। সুতরাং তাদের কাছে 'ইয়াদ' মানে 'কুদরত', 'ওয়াজহ' মানে অস্তিত্ব, 'আইন' মানে দর্শন, 'ইস্তিওয়া' অর্থ প্রতিপত্তি-পরিচালনা, 'ইয়াদান' (দ্বিবচন) অর্থ পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য, 'নুযুল' মানে দান ও অনুগ্রহ, 'আগমন' (মাজি) মানে নির্দেশের আগমন, 'যাহিক' (হাসি) মানে ক্ষমা ইত্যাদি।"

শায়খযাদাহর কথাতে স্পষ্ট যে, হানাফি মাশায়েখের মাযহাব এসব সিফাতের তাবিল নয়, বরং এটা আশআরিদের মাযহাব। অতঃপর তিনি হানাফি মাযহাবের যথাযথতা প্রমাণ করতে একাধিক দলিল পেশ করেন। তন্মধ্যে একটি হলো, "মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে নিরাপদ পথ হলো আসল তথা মৌলিক অবস্থার উপর থাকা। যাতে করে তাবিল অথবা রূপক অর্থ নিতে গিয়ে মূল তথা সিফাত নাকচ না হয়ে যায়। ...কাশফুল কাশশাফ গ্রন্থে এসেছে, 'ইস্তিওয়া', 'ইয়াদ' (হাত), 'কাদাম' (পা), 'নুযুল', 'যাহিক' (হাসি), 'তাআজ্জুব' (বিস্ময়)... এসব সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফে সালেহিনের মাযহাব হলো, এগুলোকে সাব্যস্ত করা। তবে সাব্যস্তের ক্ষেত্রে 'তাজসিম' (দেহবাদ) ও 'তাশবিহ' (সাদৃশ্যবাদ) যাতে না হয়ে যায় সেটা নিশ্চিত করা। ...আমাদের কিছু আলেম, যেমন—কিফায়ার লেখক (সাবুনি) ও ইবনুল হুমাম প্রমুখ এগুলো তাবিল করেছেন। তাদের যুক্তি—সাধারণ মানুষের বোঝার উদ্দেশ্যে তারা এ পথ অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের আলেমদের কথা হলো, তাবিলের ক্ষেত্রে কোনো অর্থ নির্ধারণ করে সুনিশ্চিত মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, পৃথিবীতে এগুলোর 'উদ্দেশ্য' সম্পর্কে জানার সুযোগ নেই।"[৭৩৫]

- শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (১১৭৬ হি.)। তিনি তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-তে লিখেন, "আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন, কুদরত, হাসি,

৭৩৫. নাজমুল ফারায়িদ ওয়া জামউল ফাওয়ায়িদ (২৩-২৪)।

কথা, ইস্তিওয়া—এগুলোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা, এক্ষেত্রে এ সবগুলোর প্রচলিত অর্থই আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়। যেমন—হাসি দিতে এবং কথা বলতে গেলে মুখ দরকার হয়; ধরতে এবং অবতরণ করতে গেলে হাত ও পা দরকার হয়; শুনতে ও দেখতে গেলে কান ও চোখ দরকার হয়। ...কিন্তু এ কারণে তারা মুহাদ্দিসিনে কেরামের উপর বাড়াবাড়ি করেছে—তাদের মুজাস্‌সিমাহ-মুশাব্বিহাহ আখ্যা দিয়েছে; তাদের 'বালকাফা' (বিলা কাইফ)-কে ঢালস্বরূপ গ্রহণকারী সাব্যস্ত করেছে। আমার কাছে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, তাদের এই বাড়াবাড়ি মূল্যহীন। তাদের বক্তব্য সর্বসাকুল্যে ভুলে ভরা। ইমামদের ব্যাপারে তাদের সমালোচনা অন্যায্য।"[৭৩৬] তিনি তাঁর 'আল-আকিদাতুল হাসানাহ'-তে লিখেন, "তিনি (আল্লাহ) আরশের উপর যেভাবে নিজের ব্যাপারে বলেছেন। তবে এটা কোনো দিক বা স্থানে থাকার অর্থে নয়; বরং এই 'ঊর্ধ্বত্ব' ও 'ইস্তিওয়া'র প্রকৃত রহস্য তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।"[৭৩৭]

- আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (১৩৫৩ হি.)। আকিদা ও সিফাত বিষয়ে তাঁর মতামত বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, যা স্বতন্ত্র গ্রন্থে আলোচনার দাবি রাখে। এখানে কেবল দুটো উদ্ধৃতি তুলে ধরা হচ্ছে। বুখারির ব্যাখ্যা 'ফয়যুল বারি'-তে তিনি বলেন, "একইভাবে আরশের উপর আল্লাহর ইস্তিওয়া, মাইয়্যাত (সঙ্গে থাকা), 'কুরব' (নৈকট্য) ইত্যাদি—এগুলোর কাইফিয়্যাত আমরা উপলব্ধি করি না। তদুপরি আমরা সেগুলোকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য (তাশবিহ) আরোপ করি না কিংবা দেহবাদ (তাজসিম)-এর বক্তব্য দিই না, যেমনটা বিভ্রান্ত লোকজন করে থাকে। বরং চার ইমামের মতে, এই সবগুলো বিষয় তাবিল ব্যতীত বাহ্যিক অবস্থার উপর ছেড়ে দিতে হবে।"[৭৩৮] তিরমিযির ব্যাখ্যাতে তিনি বলেন, "নুযুল ও ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে সালাফের মাযহাব হলো, কোনো ধরনের ব্যাখ্যা (তাবিল-তাফসিল) ও ধরন নির্ধারণ (তাকয়িফ) ছাড়া ঈমান আনা এবং ধরন (কাইফিয়্যাত) আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া।"[৭৩৯]

- দারুল উলুম দেওবন্দের অর্ধশত বছরের সাবেক প্রধান আকিদাহ তহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যাতা কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব রহ. (১৪০৩ হি.)। তহাবিয়্যাহর

---

৭৩৬. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (১/১২৪)।
৭৩৭. আল-আকিদাতুল হাসানাহ (১৭)।
৭৩৮. ফয়যুল বারি (২/১০৭)।
৭৩৯. আল-আরাফুশ শাযি, কাশ্মীরি (১/৪১৬)।

ব্যাখ্যাতে তিনি লিখেন, "কুরআন ও সুন্নাহতে হাত, পা, চেহারা, আঙুল ও চোখসহ আল্লাহর ব্যাপারে যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর অর্থ সৃষ্টির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়; বরং সেগুলোর অর্থ আল্লাহর জন্য যেভাবে শোভনীয়। আল্লাহর সত্তা যেমন আমাদের সত্তার মতো নয়, আল্লাহর সিফাতগুলোও আমাদের সিফাতের মতো নয়। তাঁর কর্ম (আফআল) আমাদের কর্মের মতো নয়। ...সুতরাং এ ব্যাপারে নিরাপদ পথ হলো এগুলো 'হাকিকি' (মূল) অর্থের উপর রেখে দেওয়া।"[৭৪০] তিনি আরও লিখেন, "আল্লাহর সত্তা যেমন আমাদের সত্তার মতো নয়, আল্লাহর গুণাবলিও আমাদের গুণাবলির মতো নয়। একই কথা সকল কাজকর্ম এবং সব ধরনের মুতাশাবিহাত (অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক বিষয়াবলির) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফলে আল্লাহ জানেন, কিন্তু আমাদের জানার মতো নয়। আল্লাহ দেখেন, কিন্তু আমাদের দেখার মতো নয়। আল্লাহ শোনেন, কিন্তু আমাদের শোনার মতো নয়। আল্লাহ ঊর্ধ্বগমন করেন, কিন্তু আমাদের ঊর্ধ্বগমনের মতো নয়। আল্লাহ নুযুল (অবতরণ) করেন, কিন্তু সেটা আমাদের অবতরণের মতো নয়। আল্লাহ হাসেন (যাহিক), কিন্তু সেটা আমাদের হাসার মতো নয়। আল্লাহ আরশে ইস্তিওয়া করেন, কিন্তু সেটা আমাদের সিংহাসনে ইস্তিওয়ার মতো নয়। কেননা, তিনি আমাদের মতো নন। আল্লাহর মতো কিছু নেই।"[৭৪১]

কারি তৈয়ব সাহেব রহ. আরও বলেন, "এ ব্যাপারে হক মাযহাব হলো, আল্লাহর ক্রোধ, সন্তুষ্টি, শত্রুতা (আদাওত), বন্ধুত্ব (বেলায়াত), পছন্দ, অপছন্দ ইত্যাদিকে সেভাবে মেনে নিতে হবে যেভাবে শ্রবণ, দর্শন, জীবন (হায়াত), ক্ষমতা (কুদরত), ইলম, কালাম ও অন্যান্য সিফাতকে মেনে নেওয়া হয়। এগুলো আল্লাহর ক্ষেত্রে সব হাকিকত (বাস্তবিক); মাজায (রূপক) নয়। হ্যাঁ, আমরা এগুলোর স্বরূপ জানি না। তাই বলে এগুলোকে এমনভাবে তাবিল করা যাবে না, যা আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হাকিকতকে নাকচ করে দেয়! ক্রোধ ও রহমত ইত্যাদি মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলেও সাদৃশ্য কেবল শব্দের ক্ষেত্রে। অর্থের ক্ষেত্রে কোনো সাদৃশ্য নেই। তাই আল্লাহর জন্য সন্তুষ্টি ও ক্রোধের অর্থ সাব্যস্ত করা হবে, যা তাঁর শানের জন্য শোভনীয়। জাহান্নামের ফেরেশতা মালেকসহ অন্যান্য ফেরেশতাও রাগ করেন। তাই বলে তাদের রাগ কি মানুষের মতো? তাদেরও কি শরীরে রক্ত গরম হয়ে যেতে

---

৭৪০. আকীদাতুত তহাবি, কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব (৬৭)।
৭৪১. প্রাগুক্ত (৩৬)।

হয়, যেমন মানুষের হয়? তাহলে আল্লাহর কেন হতে হবে, যিনি সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, রুহ এবং এ জাতীয় সকল আবশ্যকতা থেকে পবিত্র?"[৭৪২]

- শায়খুল হাদিস আবদুল কাদের সিলেটি। তিনি 'আল-ফিকহুল আকবার'-এর ব্যাখ্যায় লিখেন, "আল্লাহর 'ইয়াদ'-কে 'কুদরত' কিংবা 'নেয়ামত' দিয়ে তাবিল করলে সিফাতকে বাতিল করে দেওয়া হয়। কারণ, আল্লাহ নিজের উপর এগুলো প্রয়োগ করেছেন। যদি তিনি এর দ্বারা 'কুদরত' বা 'নেয়ামত' উদ্দেশ্য নিতেন, তবে সরাসরি সে শব্দই উল্লেখ করতেন। যেহেতু তিনি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন বোঝা গেল, এখানে 'নেয়ামত' কিংবা 'কুদরতের' বাইরে তাঁর অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে। এ জন্য আমাদের উপর ওয়াজিব হলো তাবিল থেকে বিরত থাকা। আল্লাহর উদ্দেশ্য তাঁর কাছে সমর্পণ (তাফবিজ) করা। একইভাবে আমরা আল্লাহর 'ওয়াজহ' তথা চেহারাকে সত্তা দিয়ে, 'আইন' তথা চোখকে দর্শন দিয়ে, 'ইস্তিওয়া'-কে 'ইস্তিলা' তথা প্রভাব-প্রতিপত্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করব না। বরং আয়াতের বাহ্যিক অবস্থার উপর ঈমান আনব। উদ্দিষ্ট অর্থকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেবো।"[৭৪৩]

শেষ কথা : সবশেষে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি। সেটা হলো, এই ধারা আকিদার স্বতন্ত্র কোনো মাযহাব নয়। উপরে যেসব আলেমের কথা উল্লেখ করা হলো, তারা আকিদার প্রচলিত মাসলাক ও মানহাজগুলোর বাইরে গিয়ে আলাদা কোনো মাযহাব তৈরি এবং অনুসরণ করেছেন—এমনও নয়। বরং কেবল এটুকুই যে, তাদের অধিকাংশই ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফি হওয়া সত্ত্বেও আকিদার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত ধারাগুলোর মাঝে সীমাবদ্ধ হননি। তাদের বড় অংশ নিজেদের সেগুলোর দিকে সম্পৃক্ত করেননি কিংবা সেগুলোর পরিচয়ে পরিচিত হননি। বরং তারা আকিদার ক্ষেত্রে সরাসরি ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর গ্রন্থগুলো এবং সালাফের মাসলাক অনুসরণ করেছেন। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত আহলে সুন্নাতের ধারাগুলোর বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও কোথাও কোথাও ব্যতিক্রমও রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে তারা বিভিন্ন মাসআলায় বিভিন্ন ধারার আলেমদের সঙ্গে দ্বিমত রেখেছেন। এটা খুবই স্বাভাবিক এবং বর্তমান সময়েও সম্ভব। সবসময়েই সম্ভব থাকবে। শাখাগত বিষয়ে এই বৈচিত্র্য ইসলামে অনুমোদিত। নিখাদ সত্যের

---

৭৪২. প্রাগুক্ত (১৩৬)।

৭৪৩. আদ-দুররুল আযহার (১৪)।

সন্ধানে, কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয়।

ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে ইমামের মাযহাব পরবর্তীদের বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত

আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে পরবর্তী মানুষদের মাঝে ইসবাত ও তাবিলকেন্দ্রিক যে প্রান্তিকতা দেখা দিয়েছে, সেটা খোদ ইমামের আকিদা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছে। অর্থাৎ, প্রত্যেকে নিজেদের ইমাম আজমের আকিদার সঠিক প্রতিনিধি দাবি করেছে। এর কিছু উদাহরণ আমরা পিছনে দিয়েছি। এবার ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রেও একই দৃশ্য দেখব। বিশেষত আল্লাহর আরশে ইস্তিওয়া সম্পর্কে ইমাম আজমের একটি বক্তব্য রয়েছে, যার মর্ম নিয়ে পরবর্তীকালে ব্যাপক মতভেদ তৈরি হয়েছে এবং প্রত্যেক ধারার আলেমগণ তা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির মানদণ্ডে ব্যাখ্যার কোশেশ করেছেন। প্রত্যেকে উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে নিজেদের বিপরীতমুখী মতাদর্শ সঠিক প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

প্রথম কথা হলো, ইস্তিওয়া ও উলুর ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব কী? পিছনে আমরা এটা বারবার স্পষ্ট করেছি যে, তাঁর মাযহাব হলো সালাফের মাযহাব। কুরআন-সুন্নাহতে যেভাবে এসেছে, সেভাবে মেনে নেওয়া। ফলে ইমাম বিশ্বাস করতেন—আল্লাহ আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন, ধরনহীন, সাদৃশ্যহীন। তিনি যেভাবে বলেছেন, সেভাবে আমরা ঈমান রাখি। এর নিগূঢ় মর্ম ও রূপরেখা আল্লাহর কাছে সঁপে দিই।[৭৪৪]

তবে জটিলতা তৈরি হয়েছে ইমাম আজম রহ.-এর সেই বক্তব্যকে ঘিরে, যে বক্তব্যকে আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ধারা নিজেদের মাযহাব বিশুদ্ধ প্রমাণে দলিল হিসেবে পেশ করেন এবং প্রমাণ করতে চান যে, তাদের আকিদা মূলত ইমাম আজম ও সালাফের আকিদা। ফলে ইমামের সেই বক্তব্যটি নিয়ে এখানে আলোচনা এবং ঘরানার গণ্ডি থেকে ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করা জরুরি।

আলোচিত বাক্যটি হলো—ইমাম বলেন : لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فهو كافر، وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض অর্থাৎ, **'যে ব্যক্তি বলবে, আমি জানি না আল্লাহ আকাশে নাকি যমিনে, সে কাফের হয়ে যাবে। একইভাবে যে ব্যক্তি বলবে, তিনি আরশের উপরে, কিন্তু আমি জানি না আরশ**

৭৪৪. আল-ওয়াসিয়্যাহ (পাণ্ডুলিপি) (৩)।

আকাশে নাকি যমিনে, সেও কাফের হয়ে যাবে।'[৭৪৫] উক্ত বক্তব্যটি আকিদার সকল ধারার আলেমের কিতাবে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এর দ্বারা একপক্ষ দলিল দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, ইমাম আবু হানিফার আকিদা তাদের আকিদার মতোই। কারণ, ইমাম আবু হানিফা এখানে —তাদের মতে— আল্লাহর জন্য আকাশে তথা আরশে থাকা সাব্যস্ত করেছেন। দ্বিতীয় পক্ষও দলিল দেওয়ার চেষ্টা করেন, ইমাম আবু হানিফার আকিদা তাদের আকিদাই। কারণ, তিনি এখানে —তাদের মতে— আল্লাহর জন্য স্থান নাকচ করেছেন। একটি কথা দুটি বিপরীতমুখী মতাদর্শ নিজেদের বলে দাবি করছে। এটা কী করে সম্ভব? ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা কী?

প্রথম পক্ষের খণ্ডন : ইমাম আবু হানিফার আকিদা মোটেই প্রথম পক্ষের আকিদার মতো নয়, সেটা পিছনে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা স্পষ্ট করেছি। এ পক্ষের আলেমগণ আল্লাহকে 'আরশে' বলেন এবং সেক্ষেত্রে ইমাম আজমের বক্তব্যের সঙ্গে তাদের কথার বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তারা 'আল্লাহর আরশে থাকা'-কে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন, যার সঙ্গে ইমামের আকিদা পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। তারা আল্লাহর 'ইস্তিওয়া' ও 'উলু' (ঊর্ধ্বত্ব)-কে হিসসি তথা শারীরিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন। ফলে তারা আল্লাহর জন্য দিক ও সীমা সাব্যস্ত করেন। তারা মনে করেন—আমাদের ঠিক মাথা বরাবর উপরের দিকে আরশ এবং সে আরশের উপর আল্লাহ তায়ালা। যেখান থেকে আরশের সীমা শেষ সেখান থেকে আল্লাহর বিদ্যমানতা শুরু। উপরন্তু তারা ইস্তিওয়াকে আরোহণ, ঊর্ধ্বগমন, উপবেশন ইত্যাদি নানাবিধ শব্দে ব্যাখ্যা করেন। অথচ ইমাম আজম এসব কথা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।[৭৪৬] ইমাম আজম আল্লাহর জন্য 'দিক', 'সীমা', 'দূরত্ব' নাকচ করেন। স্থান ও অবস্থান নাকচ করেন। 'বসা' নাকচ করেন। অথচ এ ধারায় দিক, সীমা, বসা ও অবস্থান নেওয়া ইস্তিওয়ার স্বীকৃত অর্থ। বরং তাদের এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রয়েছে। ইমাম আজম তাদের খণ্ডনে বলেন, **'আল্লাহ যদি বসা কিংবা অবস্থান গ্রহণের মুখাপেক্ষী হতেন, তবে আরশ সৃষ্টির আগে কোথায় ছিলেন?'**[৭৪৭] বরং এ ধরনের বক্তব্যও প্রথম ধারার কাছে

---

৭৪৫. আল-ফিকহুল আবসাত (৪৯)।

৭৪৬. দেখুন : আল-ওয়াসিয়্যাহ (৫৯)।

৭৪৭. আল-ওয়াসিয়্যাহ (পাণ্ডুলিপি) (৩)।

প্রত্যাখ্যাত, বাতিলপন্থিদের বক্তব্য হিসেবে বিবেচিত। তাহলে তাদের আকিদা আর ইমামের আকিদা এক হবে কীরূপে?

পরকালে আল্লাহর দিদারকেও এ ধারার আলেমগণ দিকসহ বিশ্বাস করেন। দিক ছাড়া দেখার কথাকে পাগলামি মনে করেন এবং দিদার অস্বীকারকারী বলেন! কারণ, তাদের মতে, দিক ছাড়া কোনো দর্শন সম্ভব নয়। বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা পরকালে আল্লাহর দিদারকে দিক ছাড়াই বিশ্বাস করেন। তিনি মানেন, আল্লাহকে দেখতে দিকের প্রয়োজন হবে না।[৭৪৮]

ফলে উক্ত বক্তব্যে ইমাম আবু হানিফা সেই আকিদার কথা বলেননি যে আকিদা এ ধারার আলেমগণ রাখেন। আমাদের মাথা বরাবর ঠিক উপরের দিকে সোজা আরশ রয়েছে এবং ঠিক সেই আরশের উপর আল্লাহ রয়েছেন—এমন তিনি মানেন না। কারণ, তিনি আল্লাহর জন্য দিক, সীমা ও স্থান সাব্যস্ত করেন না। আল্লাহ এ সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

দ্বিতীয় পক্ষের খণ্ডন : তাহলে কি তাঁর আকিদা দ্বিতীয় পক্ষের আকিদা? না, সেটাও নয়। কারণ, দ্বিতীয় পক্ষের আলেমগণ (বিশেষত পরবর্তীরা) আল্লাহর ইস্তিওয়াকে তাবিল করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যে সুস্পষ্ট যে, তিনি ইস্তিওয়াকে ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি এগুলো দিয়ে তাবিল করেননি। তা ছাড়া, এ পক্ষের আলেমগণ 'আল্লাহ আকাশে' কিংবা 'আরশের উপরে' এমন বিশ্বাস গলত মনে করেন। অথচ ইমাম আবু হানিফা সুস্পষ্টভাবে বলছেন, 'আল্লাহ আকাশে। আরশের ওপরে'।' এজন্য অনেক আলেম অন্যান্য জায়গার মতো ইমাম আবু হানিফার ব্যাখ্যাকেও তাবিল করেছেন। তারা বলেছেন, উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে ইমাম বুঝিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য স্থান নির্ধারণ করবে সে কাফের! আবুল লাইস সমরকন্দি, আবু শাকুর সালেমি, ইয ইবনে আবদুস সালাম, তাকিউদ্দিন হিসনি, আহমদ রিফায়িসহ আল-ফিকহুল আবসাতের সকল ব্যাখ্যাতা এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৭৪৯]

---

৭৪৮. আল-ওয়াসিয়্যাহ, আবু হানিফা (৫৯)।

৭৪৯. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবর, সমরকন্দি (২৫)। আত-তামহিদ, সালেমি (৪২)। হাল্লুর রুমুয সূত্রে শরহুল ফিকহিল আকবর, আলি কারি (৩৩৩)। দাফউ শুবাহি মান শাব্বাহা, হিসনি (১৮) আল-বুরহানুল মুয়াইয়াদ, আহমদ রিফায়ি (১৮)।

অধমের পর্যবেক্ষণমতে, ইমাম এখানে আল্লাহর জায়গা নির্ধারণের ব্যাপারে আলোচনাই করেননি, বরং আল্লাহ আকাশে এবং আরশ আকাশে আছে সেটা ইজমালিভাবে কুরআন-সুন্নাহর বাহ্যিক শব্দ ধরে (বিলা কাইফিন তথা ধরনহীন) বলেছেন। এটাকে স্থান বলা হবে নাকি হবে না, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু তিনি স্থান নির্ধারণকে কাফের বলেছেন—এমন কথা নেই।

অধমের পর্যবেক্ষণ : তাহলে ইমাম আবু হানিফার মাযহাব কী? তাঁর কথার অর্থ কী? ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব হলো সালাফের মাযহাব। ইমাম আবু হানিফার উক্ত বক্তব্যের অর্থ ঠিক তা-ই, যা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য। তিনি নতুন কিছু বলেননি; বরং কুরআন ও সুন্নাহতে যা আছে তা-ই বলেছেন। আমরা প্রথমে তাদের যুক্তির বিপক্ষে দুটো কথা বলে এরপর ইমামের মাযহাব বর্ণনা করব।

ইমাম আবু হানিফা উভয় বাক্যে কুফরের ফাতওয়া দিয়েছেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ আকাশে নাকি যমিনে আমি জানি না, সে কাফের। আবার যে ব্যক্তি বলবে, আমি জানি না আরশ আকাশে নাকি যমিনে, সে কাফের। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথম পক্ষের আলেমগণ যেহেতু মনে করেন, ইমাম আবু হানিফা এর দ্বারা সত্তাগতভাবে আল্লাহর আরশের উপর থাকা প্রমাণ করেছেন, তাহলে যারা সত্তাগতভাবে আল্লাহর আরশের উপর অবস্থানকে কিংবা 'হিস্‌সি' ঊর্ধ্বত্বকে নাকচ করে আল্লাহকে 'বিলা-মাকান' বলেন তারা কি কাফের? তারা বলবেন—না, তারা কাফের নয়; অপব্যাখ্যাকারী গোমরাহ। বোঝা গেল, ইমাম আবু হানিফা তাদের আকিদার কথা বলেননি। একইভাবে দ্বিতীয় পক্ষের আলেমগণ যেহেতু মনে করেন, ইমাম আবু হানিফা এই বক্তব্যের মাধ্যমে সত্তাগতভাবে আল্লাহর আরশের উপর থাকাকে অস্বীকার করেছেন। প্রশ্ন হলো, তাদের মত অনুযায়ী যারা ইস্তিওয়াসংক্রান্ত আয়াতগুলোর বাহ্যিক অর্থ ধরে আরশের উপরে আল্লাহর সত্তাগত অধিষ্ঠানের কথা বলে, তারা কি কাফের? তারা বলবেন : না, তারা কাফের নয়; দেহবাদী গোমরাহ। বোঝা গেল, ইমাম তাদের দুই পক্ষের কারও কথাই বলেননি; বরং তিনি বলেছেন কুরআন ও হাদিসের কথা, সালাফের কথা।

কীভাবে? তাঁর কথার প্রতি গভীর দৃষ্টি দিন। পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহর দিকে দৃষ্টি দিন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তিনি আকাশে। [মুলক : ১৬] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এক দাসীকে 'আল্লাহ কোথায়' জিজ্ঞাসা করলে সে ইশারা করে দেখাল 'আকাশে।' রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সেটা সমর্থন করেন। খোদ ইমাম নিজস্ব

সনদে উক্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৭৫০] বরং আল-ফিকহুল আবসাতের আলোচিত বক্তব্যের পরেও হাদিসটি উল্লেখ করেছেন[৭৫১]। হ্যাঁ, এসব আয়াত ও হাদিসের অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তায়ালা সত্তাগতভাবে আকাশের মাঝে। কারণ, তিনি সকল স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে। তথাপি কুরআন-হাদিসে যেহেতু এভাবে বলা হয়েছে, ফলে নসের প্রতি সম্মান রেখে আমাদেরও এগুলো মেনে নিতে হবে, আল্লাহ তায়ালা যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, সে ব্যাপারে ঈমান রাখতে হবে। এটা আহলে সুন্নাতের প্রতিষ্ঠিত মাযহাব, ইমামেরও মাযহাব, যা পিছনে একাধিক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এগুলোকে সরাসরি অস্বীকার করে কেউ যদি মুখের উপর বলে, 'না, আল্লাহ আকাশে নন', তাহলে সে কুরআন ও হাদিস দু'টোকেই অস্বীকার করছে। ফলে উক্ত ব্যক্তি কাফের। একইভাবে একাধিক হাদিসে আল্লাহর আরশকে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বাইরে সর্বোর্ধ্বে বলা হয়েছে[৭৫২]। ফলে কেউ যদি বলে, আমি জানি না আরশ কোথায়, তবে সে যেন সেসব হাদীস এবং ফলশ্রুতিতে আরশের অস্তিত্ব ও আরশের ওপর আল্লাহর ইস্তিওয়াকেই প্রত্যাখ্যান করলো। আর এই সবগুলো বিষয় প্রত্যাখ্যানকারী কাফের। তাহলে দেখা গেল, ইমাম আবু হানিফা রহ. আকিদার প্রচলিত কোনো পক্ষের কথা বলেননি, বরং তিনি বলেছেন কুরআন ও সুন্নাহর কথা। সেই যুগের বিভ্রান্ত জাহমিয়্যাহদের খণ্ডনে।

এবার প্রশ্ন হলো, তাহলে আল্লাহ আকাশে এবং আরশ আকাশের ঊর্ধ্বে—এগুলোর মাধ্যমে ইমাম কী বুঝিয়েছেন? ইমাম বুঝিয়েছেন সেটাই, যেটা সকল সালাফের মাযহাব ছিল। আর তা হলো (أمروها كما جاءت بلا كيف) অর্থাৎ যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দাও। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল বলেছেন তিনি আকাশে, তাই আমরাও বলি তিনি আকাশে। কিন্তু এর অর্থ—তিনি আমাদের সামনে দৃশ্যমান আকাশের মাঝে সীমাবদ্ধ—এমন নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলেছেন, আল্লাহ আরশে ইস্তিওয়া করেছেন আর আরশ সর্বোর্ধ্বে। তাই আমরাও বলি, আল্লাহ আরশে ইস্তিওয়া করেছেন আর আরশ আকাশের ঊর্ধ্বে। কিন্তু এই ঊর্ধ্বত্বের নিগূঢ় মর্ম আল্লাহ তায়ালা জানেন। কারণ, তিনি সকল স্থান, দিক, সীমা-পরিসীমার ঊর্ধ্বে।

---

৭৫০. মুসনাদু আবি হানিফা, হারেসির বর্ণনা (২৫)।

৭৫১. আল-ফিকহুল আবসাত (৫১)।

৭৫২. বুখারি (কিতাবুল জিহাদ : ২৭৯০)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবি হুরাইরা : ৮৫৩৫)।

ফলে এসব আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক বক্তব্যের প্রতি ঈমান এনে এগুলোর প্রকৃত মর্ম, স্বরূপ, ধরন, ব্যাখ্যা সবকিছু আল্লাহর কাছে সঁপে দেয়া আবশ্যক।[৭৫৩]

এটা আমাদের মনগড়া ব্যাখ্যা নয়; খোদ আল-ফিকহুল আবসাতের একটি নুসখাতে এমন বক্তব্য রয়েছে। কাওরানির সেই নুসখাতে এসেছে, (قال أبو حنيفة من قال: لا أعرف ربي في السَّماء أم في الأَرض فقد كَفر، لأن الله تعالى قال: الرحمنُ على العرش اسْتَوى، فإن قال: إنه تعالى على العرش استوى، ولكنه يقول: لا أدري العرش في السَّماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر كونَ العرش في السَّماء، لأن العرش في أعلى علّيّين) অর্থাৎ আবু হানিফা রহ. বলেন, যে ব্যক্তি বলবে, আমি জানি না আল্লাহ আকাশে নাকি যমিনে, সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'রহমান আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন'। একইভাবে যে ব্যক্তি বলবে, তিনি আরশের উপরে ইস্তিওয়া করেছেন, কিন্তু আমি জানি না আরশ আকাশে নাকি যমিনে, সেও কাফের হয়ে যাবে। কারণ সে আকাশে আরশ থাকাকে অস্বীকার করেছে। অথচ আরশ ঊর্ধ্বজগতে'।[৭৫৪]

উপরন্তু এই বক্তব্য বাইহাকীর একটি বর্ণনা দ্বারাও প্রমাণিত হয়। বাইহাকি নিজস্ব সূত্রে নুহ ইবনে আবু মারইয়াম থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন—আমরা আবু হানিফার কাছে ছিলাম। তখন তিরমিয থেকে জাহমের অনুসারী এক নারী কুফায় এলো। সে কুফাবাসীকে তার (জাহমি) মতবাদের দিকে ডাকতে লাগল। হাজার হাজার মানুষ তার বক্তব্য শুনত। তখন তাকে বলা হলো, এখানে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ আবু হানিফা নামের একজন মানুষ আছেন। মাহিলাটি ইমামের কাছে এসে বলল, আপনি মানুষকে মাসআলা-মাসায়েল শেখাচ্ছেন, অথচ নিজে দ্বীন ত্যাগ করে বসে আছেন? আপনি যে মাবুদের উপাসনা করেন, আপনার সেই মাবুদ কোথায় বলেন তো? ইমাম আজম নীরব থাকলেন। সাত দিন পরে বললেন, **'আল্লাহ তায়ালা আকাশে; যমিনে নন।'** তখন এক ব্যক্তি বলল, তাহলে আল্লাহর বাণী 'তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথে আছেন'-এর অর্থ কী? ইমাম বললেন, এটার অর্থ ঠিক তেমন, যেমন তুমি কোনো লোকের কাছে চিঠি লিখলে- 'আমি তোমার সাথে আছি', অথচ তুমি তার কাছে নও। উক্ত ঘটনা উল্লেখের পর বাইহাকি বলেন, আবু হানিফা রাযি. সঠিক কথা বলেছেন। তিনি

---

৭৫৩. দেখুন : আল-ওয়াসিয়্যাহ (৩৮-৩৯)। আস-সিফাত, দারাকুতনি (৪১-৪২)।

৭৫৪. দেখুন : আল-ফিকহুল আবসাতের টীকায় আল্লামা কাওসারি রহ. কর্তৃক কাওরানীর নুসখা থেকে সংশ্লিষ্ট অংশের উদ্ধৃতি (৫০)।

আল্লাহর যমিনে থাকাকে নাকচ করে দিয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহর স্বাভাবিক বর্ণনার অনুসরণপূর্বক 'আল্লাহ আকাশে' বলেছেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন, 'তোমরা কি তার থেকে নিরাপদ হয়ে গেছ যিনি আকাশে?' [মুলক : ১৬][৭৫৫]

এখানে 'আল্লাহ আকাশে' অর্থ তিনি আকাশের মাঝে ঢুকে আছেন এমন নয়; বরং সৃষ্টি থেকে তিনি ঊর্ধ্বে ও আলাদা সেটা বলা হয়েছে। এভাবেই বুঝতে হবে ইমাম মালেকের বক্তব্য : 'আল্লাহ আকাশে, কিন্তু তাঁর ইলম সর্বত্র।'[৭৫৬] এমন নয় যে, আল্লাহ সত্তাগতভাবে আকাশের মাঝে ঢুকে আছেন। বরং তিনি সৃষ্টির মাঝে নন। এটাকে কুরআন-সুন্নাহতে 'আকাশে' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে, তাই কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণে ইমাম এই শব্দেই ব্যক্ত করেছেন। এর মাধ্যমে সালাফের মূলত বিভ্রান্ত জাহমিয়্যাহদের খণ্ডানো উদ্দেশ্য। যাদের মুআততিলা গোষ্ঠী আরশের ওপর আল্লাহর ইস্তিওয়া অস্বীকার করতো। আর হুলূলী গোষ্ঠী আল্লাহকে সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান বলতো। দু'টোর একটাও সঠিক আকিদা নয়। ইমাম দু'টোকেই কুফর সাব্যস্ত করেছেন।

দোয়ার মাঝে আকাশের দিকে হাত তোলার রহস্য

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে দোয়ার সময় মানুষ উপরের দিকে হাত তোলে কেন? আকাশের দিকে তাকায় কেন?

ইমাম জবাবে বলেন, **'আল্লাহকে নিচের দিকের পরিবর্তে উপরের দিকে ডাকা হয়; কারণ, 'নিচুতা' রবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহর শানের সঙ্গে সমাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। হাদিসের মাধ্যমেও এটা প্রমাণিত হয়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে জনৈক সাহাবি একজন নারী দাসী নিয়ে এসে বলেন, আমার উপর মুমিন দাসী আযাদ করা আবশ্যক হয়েছে। তাকে আযাদ করলে হবে? রাসুলুল্লাহ তাকে বললেন, তুমি মুমিন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে বলো তো আল্লাহ কোথায়? সে আকাশের দিকে ইশারা করল। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তাকে আযাদ করো। সে মুমিন।'**[৭৫৭]

---

৭৫৫. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (৫৮৮-৫৮৯)।

৭৫৬. মাসায়িলুল ইমাম আহমদ, রিওয়াইয়াতু আবি দাউদ (২৬৩)।

৭৫৭. আল-ফিকহুল আবসাত (৫১-৫২)।

এখানে লক্ষণীয়, দাসীর হাদিসটিকে ইমাম 'নিচুতা রবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের শানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়' তাই ঊর্ধ্বত্ব বলা হয়েছে—এ হিসেবে নিয়েছেন; স্থান নির্ধারণ হিসেবে নেননি। কারণ আল্লাহ আকাশ নামক স্থানের মাঝে নন। যেহেতু একদিকে আল্লাহ সৃষ্টির মাঝে নন, অপরদিকে 'নিচুটা' তাঁর শানের উপযোগী নয়। এজন্য তাঁকে সৃষ্টির ঊর্ধ্বে ও তাঁর শানের ঊর্ধ্বত্ব প্রমাণের জন্যই তাঁকে 'আকাশে' বলা হয়।

আলেমগণ মোনাজাতে উপরে হাত তোলার হিকমত প্রসঙ্গে বলেন—কারণ, সেটা রহমত ও রিযিক অবতীর্ণ হওয়ার জায়গা। [যারিয়াত : ২২] যদি আল্লাহর অবস্থানের জায়গা হতো, তবে সেদিকে মুখ দিয়ে দোয়া করতে বলা হতো। অথচ এভাবে দোয়া করা হয় না। একইভাবে কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ অর্থ : 'যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, আমি কাছেই রয়েছি।' [বাকারা : ১৮৬] ফলে আল্লাহকে সবার সঙ্গে ভাবতে হবে। আরও বলা হয়েছে, ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ অর্থ : "পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহর 'মুখ।'" [বাকারা : ১১৫] এ আয়াত দিয়ে সব জায়গায় আল্লাহর চেহারা কল্পনা করতে হবে। অথচ বাস্তবতা এমন নয়। সুতরাং আল্লাহকে কোনো নির্দিষ্ট দিকে সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

ইস্তিওয়ার ব্যাপারে ইমামের আকিদা : পিছনের আলোচনায় স্পষ্ট যে, আল্লাহর ঊর্ধ্বত্বকে ইমাম আজম শারীরিকভাবে ব্যাখ্যা করেন না। রাসুলুল্লাহর (ﷺ) হাদিসকে সেই অর্থে বোঝেন না, যে অর্থে পরবর্তীরা বুঝেছেন। তাঁর মতে, উপরের দিকে ফিরে দোয়া কিংবা হাদিসে দাসী কর্তৃক আকাশের দিকে ইশারা করার মানে আল্লাহর অবস্থানস্থল বোঝানো নয়। এ কারণে তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হলো, যদি কেউ বলে, আল্লাহ কোথায়? আপনি তাকে এ ব্যাপারে কী বলবেন? তিনি বললেন, **"তাকে বলব, গোটা সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ তায়ালা ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তখন ছিলেন, যখন কোনো স্থানের অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ তায়ালা তখন ছিলেন, যখন 'কোথায়', 'সৃষ্টি' কিংবা 'বস্তু' এমন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। কারণ, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা।"**[৭৫৮]

---

৭৫৮. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৭)।

ইস্তিওয়ার ব্যাপারে এটাই সালাফের মানহাজ। তারা সংক্ষেপে এবং কুরআনে যেভাবে এসেছে, হুবহু সেভাবে ইস্তিওয়ার প্রতি ইজমালি বিশ্বাস রাখতেন। এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিংবা ধরন বলতেন না। এটা নিয়ে অতিরঞ্জিত আলোচনা করতেন না। এটাকে 'বসা', 'স্থির হওয়া', 'অবস্থান করা' ইত্যাদি মানবিক শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতেন না। ইমামের আকিদাসংশ্লিষ্ট সকল গ্রন্থে ইস্তিওয়ার ব্যাপারে তাঁর এই মতামতই পাওয়া যায়। ইমাম রহ. বলেন, **"আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন। কিন্তু তিনি আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। আরশের উপর অবস্থানকারী নন। বরং তিনি কোনো প্রয়োজন ছাড়াই আরশ ও আরশের বাইরে অন্য সকল বস্তুর রক্ষাকর্তা। সৃষ্টির মতো তিনি যদি কোনো জিনিসের মুখাপেক্ষী হতেন, তবে জগৎ সৃষ্টি ও পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন না। তিনি যদি বসা কিংবা অবস্থানের প্রতি মুখাপেক্ষী হতেন, তবে আরশ সৃষ্টির আগে আল্লাহ কোথায় ছিলেন? আল্লাহ এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।"**[৭৫৯]

জটিলতা হলো, পরবর্তীরা এই সংক্ষিপ্ত ও বিশুদ্ধ তানযিহের মূলনীতির উপর থাকতে পারেননি। বরং বিভিন্নমুখী প্রান্তিকতার শিকার হয়েছেন। একদল আল্লাহ তায়ালাকে আসমানে আরশের উপর বসিয়ে দিয়েছেন। তারা বিশ্বাস করেছেন আরশ আল্লাহর স্থান। তিনি সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেছেন! বরং এরচেয়েও দুঃখজনক হলো ইলমি বিকৃতি। ইমাম আবু হানিফা যেহেতু উম্মাহর একজন শ্রেষ্ঠতম বরেণ্য ইমাম এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, এ জন্য তারা ইমামকে তাদের নিজ আকিদার প্রচারমাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমামের বক্তব্যকে বিকৃত করেছেন। ফলে ওয়াসিয়্যাহ পুস্তিকাতে আল্লাহর 'ইস্তিওয়া আলাল আরশ'-কেন্দ্রিক ব্যাখ্যাতে আমরা দেখব, ওয়াসিয়্যাহর পাণ্ডুলিপির উপর অনধিকার চর্চা করা হয়েছে। তাতে অন্যায় হস্তক্ষেপ হয়েছে। ওয়াসিয়্যাহর এক্ষেত্রে বিশুদ্ধতম পাঠ হলো যা আমরা উল্লেখ করেছি :

ونُقرّ بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه، وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج

অর্থাৎ, **"আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন, প্রয়োজন ও অবস্থানগ্রহণ ব্যতীত। বরং তিনি কোনো প্রয়োজন ছাড়াই আরশ ও গয়র-আরশ সবকিছুর রক্ষাকর্তা।"**[৭৬০]

---

৭৫৯. আল-ওয়াসিয়্যাহ (পাণ্ডুলিপি) (৩)।

৭৬০. প্রাগুক্ত (৩)।

কিন্তু উক্ত পাঠ কেউ কেউ বিকৃত করেছেন। ফলে ওয়াসিয়্যাহর সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নুসখার পাঠ এমন—

ونُقرّ بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة، واستقر عليه وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج

অর্থাৎ, **'আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন। কিন্তু তিনি আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি আরশের উপর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তিনি কোনো প্রয়োজন ছাড়াই আরশ ও গয়র-আরশ সবকিছুর রক্ষাকর্তা।'**[৭৬১]

দেখুন, অর্থ কীভাবে উলটে গেল। ইমামের পরবর্তী বক্তব্য হলো: **'তিনি যদি বসা কিংবা অবস্থানের প্রতি মুখাপেক্ষী হতেন, তবে আরশ সৃষ্টির আগে আল্লাহ কোথায় ছিলেন?'** বিকৃত পাঠের সঙ্গে এই বক্তব্যের কোনো সামঞ্জস্যতা আছে? মোটেই না। বরং দু'টো সাংঘর্ষিক।

তবে, আলহামদুলিল্লাহ, ইস্তিওয়াকেন্দ্রিক ইমাম আজমের একাধিক বক্তব্য রয়েছে। ফলে দু-একটির ভিতরে হস্তক্ষেপ করা হলেও সবগুলোর ভিতরে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয়নি। এভাবে ইমামের বিশুদ্ধ আকিদা আমাদের সামনে রয়ে গেছে। নিশাপুরি ইমাম থেকে বর্ণনা করেন—মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের কাছে লেখা চিঠির জবাবে ইমাম লিখেন : আল্লাহর বাণী, **'তিনি আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন' সত্য। এটা মূলত কুরআনে আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন-** ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ **অর্থ : 'নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা যিনি ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন।' [আরাফ : ৫৪]-সেটাই। তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবেই। আরশের উপর তাঁর ইস্তিওয়া সম্পর্কে আমরা কোনোকিছু জানার দাবি করি না। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি ইস্তিওয়া করেছেন। তবে তাঁর ইস্তিওয়া সৃষ্টির ইস্তিওয়ার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আরশের উপর ইস্তিওয়ার ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য**

---

৭৬১. আল-ওয়াসিয়্যাহ (দার ইবনে হাযাম) (৩৯)। একটি পাণ্ডুলিপিতে এ ধরনের পাঠ চোখে পড়ে। ফলে ভুল বা বিকৃতির সূচনা পাণ্ডুলিপি থেকে, প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে নয়।

এটুকুই।[৭৬২] সুবহানাল্লাহ! কত সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত আকিদা। কুরআনের আকিদা। এটাই সকল সালাফে সালেহিনের আকিদা।

আরেক দল ইস্তিওয়ার অর্থ সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন। আয়াতগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যা আল্লাহ নিজে করেননি, তাঁর রাসুল বলেননি; সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন করেননি। ইমাম যেখান নিজে বলেছেন, **"আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন।"**[৭৬৩] আরও বলেছেন, **"তিনি আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন সত্য।"**[৭৬৪] সেখানে তারা ইমামের অনুসরণের দাবি সত্ত্বেও 'ইস্তিওয়া'-কে নেতৃত্ব, রাজত্ব, প্রতিপত্তি, পরিচালনা ইত্যাদি নানান শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ তো ইস্তিওয়া অর্থ করেছেন সৃষ্টি। ফলে ইস্তিওয়া আলাল আরশ অর্থ হবে, আরশের উপর সৃষ্টি করা। অথচ ইমাম আজম কিংবা সালাফে সালেহিনের কেউ এমন ব্যাখ্যা করেননি; করলে বরং বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলো করেছে।[৭৬৫] তাই ব্যাখ্যার নামে এ ধরনের অদ্ভুত বক্তব্য জুড়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত।

এক্ষেত্রে কর্তব্য হলো মুতাকাদ্দিমিন তথা ইমাম আজমসহ প্রথম যুগের হানাফি ইমামদের সঙ্গে থাকা, পরবর্তীদের ব্যাখ্যা বর্জন করা। মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখি বলেন, **"আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন। তিনি 'আরশের উপরে'- ধরনহীন, সাদৃশ্যহীন,** যেমনটা তিনি চেয়েছেন।" অন্যত্র লিখেন, 'তিনি স্থানের ঊর্ধ্বে। স্থানের প্রতি অমুখাপেক্ষী। আরশ তাঁর স্থান নয়।'[৭৬৬]

এমনকি খোদ সমরকন্দের মুতাকাল্লিমগণ যারা ইলমুল কালামকে আকিদার মৌলিক হাতিয়ারস্বরূপ গ্রহণ করেছেন এবং সিফাতের তাবিলের ক্ষেত্রে 'উদারতা' দেখিয়েছেন, তাদেরও অনেকে ইস্তিওয়ার তাবিল করেননি। স্বয়ং ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদি রহ. 'ইস্তিওয়া'-কে 'ইস্তিলা' (পরিচালনা, প্রতিপত্তি) ও 'আরশ'-কে 'মুলক' (রাজত্ব) নানা শব্দে ব্যাখ্যার সম্ভাব্যতা ও বৈধতা বর্ণনার করার পর বলেন, "এক্ষেত্রে আমাদের মূলকথা হলো : যেহেতু আল্লাহ তায়ালার

---

৭৬২. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৪৯)।

৭৬৩. আল-ওয়াসিয়্যাহ (দার ইবনে হাযাম) (৩৯)।

৭৬৪. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৪৯)।

৭৬৫. দেখুন : আত-তাবাকাতুস সানিয়্যাহ, তাকিউদ্দিন গাজ্জি (১/১৫৭)। শরহুল ফিকহিল আকবার, সমরকন্দি (২৬)।

৭৬৬. আল-ইতিকাদ, বলখি (১০৬-১০৭)।

মতো কিছু নেই যেমনটা তিনি বলেছেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ অর্থ : 'তাঁর মতো কিছু নেই।' [শুরা : ১১] সুতরাং আমরা বলব, রহমান আল্লাহ আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন যেমনটা কুরআনে এসেছে। ...এরপর আমরা সেটাকে অন্য কোনো বস্তু দিয়ে নিশ্চিত তাবিল করব না। কারণ, তখন (আমরা যে শব্দে তাবিল করলাম) সেটার বাইরে আরও ভিন্ন শব্দেও তাবিল করা যাবে। তাই আমরা বলব : আল্লাহ এখানে যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তাতে আমরা ঈমান রাখি। ইস্তিওয়া ছাড়া আল্লাহর দিদারসহ কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য (সিফাতের) ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। একদিকে যেমন আল্লাহর সাদৃশ্য নাকচ করতে হবে, অন্যদিকে আল্লাহ যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তাতে বিশ্বাস রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে সুনিশ্চিত কোনো (ব্যাখ্যা) নির্ধারণ করা যাবে না।"[৭৬৭] মাতুরিদি তাঁর তাফসিরেও 'ইস্তিওয়া'র বিভিন্ন তাবিল উল্লেখ করার পরে শেষে লিখেছেন, "আমাদের মূলনীতি হলো, আল্লাহ তাঁর সকল কর্ম ও গুণে সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। ফলে 'রহমান আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন' কুরআনে যেভাবে এসেছে সেভাবেই বলতে হবে।"[৭৬৮] এভাবে 'ইস্তিওয়া'র তাবিল বর্জন খোদ মাতুরিদি রহ. থেকে প্রমাণিত হলো।

একইভাবে সদরুল ইসলাম বাযদাবিও (৪৯৩ হি.) বিভিন্ন সিফাতের তাবিল করে সে তাবিলকেই হাকিকত বলা সত্ত্বেও, সিফাতকেন্দ্রিক কোথাও কোথাও বৈপরীত্যের শিকার হওয়া সত্ত্বেও—যা পিছনে তুলে ধরা হয়েছে—সামগ্রিকভাবে এবং বিশেষত ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আজম রহ. এবং সালাফে সালেহিনের অনুসরণ করেছেন। তিনি লিখেন, "আল্লাহ স্থান-পাত্রের ঊর্ধ্বে। তিনি কোনো স্থানের মাঝে বা উপরে নন। বরং সৃষ্টির আগে তিনি যেমন ছিলেন তেমন আছেন। আল্লাহ তায়ালা আরশ সৃষ্টির পর আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন। তবে এটা স্থানান্তর কিংবা সত্তাসহ আরশের উপর অবস্থান নয়। আল্লাহর জন্য কোনো দিক প্রযোজ্য নয়। তিনি সকল দিকের ঊর্ধ্বে। দিক সৃষ্টির আগে তিনি যেমন ছিলেন, সবসময় তেমন আছেন ও থাকবেন।"[৭৬৯]

আবদুর রহিম মুফতি যাদাহ (১২০৩ হি.) একই পথে হেঁটেছেন। তিনি ইস্তিওয়া'র সম্ভাব্য একাধিক ব্যাখ্যা উল্লেখের পরে লিখেন, "তৃতীয় মাযহাব হলো 'ইস্তিওয়া'-কে একটি স্বতন্ত্র বিশেষ সিফাত হিসেবে গ্রহণ করা। এর ধরন ও স্বরূপ

---

৭৬৭. দেখুন : আত-তাওহিদ (৫৭)। তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/৩৫০)।

৭৬৮. তাফসিরে মাতুরিদি (৭/২৬৯)।

৭৬৯. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২৫০-২৫১)।

আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া। এটাই ইমাম আজম আবু হানিফা, ইমামুল হুদা আবু মনসুর মাতুরিদি এবং প্রসিদ্ধমতে আবুল হাসান আশআরির মাযহাব। আর এটাই তাবিলের বিভিন্ন জটিলতা থেকে মুক্ত মাসলাক। ...সুতরাং আল্লাহ আরশে ইস্তিওয়া করেছেন ধরনহীন, শরীরবিহীন। তিনি আরশ থেকে অমুখাপেক্ষী। আরশের উপর অবস্থান গ্রহণ থেকে অমুখাপেক্ষী।”[৭৭০]

গুমুশখানভি লিখেন, “আল্লাহ তায়ালার সিফাত সৃষ্টির সিফাতের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না। তিনি আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন যেভাবে তিনি বলেছেন এবং যে অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।”[৭৭১] শামসুদ্দিন সমরকন্দি লিখেছেন, “ইস্তিওয়াকে ‘ইস্তিলা’ দিয়ে ব্যাখ্যা করা সুন্দর নয়।”[৭৭২]

আকিদাহ তহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যায় মাহমুদ কওনভি লিখেন, ‘ইস্তিওয়া’ (সহ সকল সিফাতের) ক্ষেত্রে সালাফের মাযহাব হলো, এগুলোকে তাশবিহ তথা সাদৃশ্য থেকে মুক্ত রেখে সত্যায়ন করা। এগুলোর তাবিল তথা ব্যাখ্যাকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া। এগুলোর তাবিল না করা। বরং এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেটা হক। এটাই সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ পন্থা। যদি তারা এসব সম্পর্কে প্রশ্ন করে কিংবা এগুলোর তাবিল জানার জন্য পীড়াপীড়ি করে, তবে তাদের ধমকানো হবে, সতর্ক করা হবে।[৭৭৩]

আল্লাহর সিফাত নিয়ে বিবাদ নিষিদ্ধ :

আল্লাহর সিফাত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করব। তবে শেষ করার আগে এ ব্যাপারে আলেমদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসিহত সংযোজিত করব, যাতে এ ধরনের আলোচনার ক্ষেত্রে শরয়ি হেদায়াত ও কল্যাণ লাভ হয়, সব ধরনের অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, কুরআন-সুন্নাহতে আল্লাহর ব্যাপারে বিবাদ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ

---

৭৭০. শরহুল ওয়াসিয়্যাহ, মুফতি যাদাহ (৯৯-১০০)।
৭৭১. জামেউল মুতুন, গুমুশখানভি (৮)।
৭৭২. আস-সাহায়িফুল ইলাহিয়্যাহ (৩৭৫)।
৭৭৩. আল-কালাইদ ফি শরহিল আকাইদ (৭০)।

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ অর্থ : "তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত 'মুহকাম' (সুস্পষ্ট), এইগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ' (দুর্জ্ঞেয়)। যাদের অন্তরে সত্য-লঙ্ঘন প্রবণতা রয়েছে, শুধু তারাই ফেতনা ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, 'আমরা এটা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত।' বোধশক্তিসম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।" [আলে ইমরান : ৭] আয়েশা রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) উপরের আয়াতটি তেলাওয়াত করে বলেন, 'সুতরাং তোমরা যদি কাউকে কুরআনের নিগূঢ় বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক করতে দেখো, তবে বুঝে নিয়ো, আল্লাহ তাদেরই উদ্দেশ্য করেছেন। সুতরাং সেসব লোকের কাছ থেকে তোমরা দূরে থেকো।'[৭৭৪]

এ কারণেই ইমাম একদিকে যেমন আল্লাহর সিফাত নিয়ে আলোচনা একেবারে বাদ দেননি, আবার সিফাতের আলোচনার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনও করেননি। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে খুঁজে খুঁজে আল্লাহর হাত-পা-চেহারা, ওঠা-নামা—এ জাতীয় সিফাতগুলো দিয়ে বই ভরে ফেলেননি, যেমনটা পরবর্তী লোকেরা সালাফের নামে করেছে। বরং তাঁর দিকে সম্বন্ধকৃত পাঁচটি গ্রন্থে হাতেগোনা কয়েকটি সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। অথচ ইমাম আবু আজমই সালাফ। আমরা দেখি, ইমাম আজম তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে আল্লাহর অসংখ্য সিফাত থেকে মৌলিক কিছু সিফাত উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য নাম ও গুণের অধিকারী, যার সবগুলোর সবিস্তার ব্যাখ্যা সকল গ্রন্থে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, সেগুলোর সবকিছু সবিস্তারে জানা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য নয়; অধিকাংশ মানুষের জন্য সম্ভবও নয়। ফলে ইমাম কয়েকটি নিয়ে আলোচনার মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন।

আবু ইউসুফ রহ. বলেন, আমি আবু হানিফা রহ.-এর সাথে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমরা এক ব্যক্তিকে কুরআন নিয়ে বিতর্ক করতে দেখলাম। সে কুরআনের ব্যাপারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা বলছিল আর তার প্রতিপক্ষের সমালোচনা করছিল। ইমাম তাকে ডেকে বললেন, 'যদি তুমি এটাকে সওয়াবের কাজ মনে করো (তাহলে সেটা

---

৭৭৪. ইবনে হিব্বান (কিতাবুল ইলম : ৭৩)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আয়িশা : ২৪৮৪৭)।

ভুল)। কারণ, এতে কোনো সওয়াব নেই। বরং তোমার কর্তব্য হলো সালাফের পথে হাঁটা। **আল্লাহকে নিয়ে কিংবা আল্লাহর সিফাতসমূহ নিয়ে বিতর্ক করো না (لا تُمَارِ فِي الله ولا في صفاته)। এগুলো বাদ দিয়ে অন্য কিছুতে মনোযোগ দাও।'**[৭৭৫]

ইবনে আবদিল বার, ইমামপুত্র হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম বলেছেন : (আহলে সুন্নাত ওয়াল) 'জামাত হলো : ...গুনাহের কারণে কাউকে কাফের না বলা, প্রত্যেক মুমিনের জানাযা পড়া, প্রত্যেক মুমিনের পিছনে নামায পড়া। ...তাকদিরের ভালোমন্দ আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া। **আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে কথা বলা পরিত্যাগ করা।'**[৭৭৬]

ইমাম তহাবি বলেন, 'আমরা আল্লাহর ব্যাপারে (অসমীচীন) চিন্তাভাবনায় নিজেদের ব্যাপৃত করি না; আল্লাহর দ্বীন নিয়ে বিবাদে জড়াই না।'[৭৭৭]

আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা দ্বীন (তথা উসুলুদ্দিন বা আকিদা) নিয়ে বিতর্ক ও বিবাদ বর্জন করো। সালাফে সালেহিন যতটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছেন ততটুকুতে সন্তুষ্ট থাকো। কারণ, তারা জেনেবুঝেই এসব বিষয়ে বিতর্ক থেকে বিরত থেকেছেন। যদি এর মাঝে কল্যাণকর কিছু থাকত, তবে তারাই সেদিকে সবার আগে যেতেন, সবার আগে সেসব রহস্য উন্মোচিত করতেন।[৭৭৮]

আবু ইউসুফ রহ. থেকে 'দ্বীন নিয়ে বিতর্ক নিষিদ্ধ' পুস্তিকাতে আরও এসেছে, আমার কাছে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদিস পৌঁছেছে। একদিন তিনি সাহাবাদের মাঝে বের হলেন। দেখলেন, তারা আল্লাহকে নিয়ে কথা বলছেন। রাসুলুল্লাহকে দেখে তারা থেমে গেলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কী নিয়ে কথা বলছ? তারা জানালেন, আল্লাহ তায়ালাকে নিয়ে। রাসুল বললেন, আল্লাহকে নিয়ে চিন্তার দরকার নেই। কারণ, তোমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবে না। আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করো। কারণ, সেটা চিন্তার জায়গা।[৭৭৯] ইবনে উমর থেকেও

---

৭৭৫. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৩৩)।

৭৭৬. আল-ইনতিকা (৩১৫)।

৭৭৭. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২০)।

৭৭৮. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৭৩)।

৭৭৯. হিলইয়াতুল আউলিয়া (৬/৬৬)। আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৯৭)।

বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : **'তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করো। আল্লাহকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করো না।'**[৭৮০]

ইবনে আবিল আওয়াম বর্ণনা করেন, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, 'তোমরা দ্বীন নিয়ে বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করো। কেননা দ্বীন স্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা কিছু ফরয বিধান দিয়েছেন, কিছু সুন্নাত দিয়েছেন। কিছু সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। হালাল বলে দিয়েছেন, হারাম স্পষ্ট করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, ﴿ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ﴾ অর্থ : 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।' [মায়িদা : ৩] সুতরাং কুরআনে যা হালাল করা হয়েছে সেটা হালাল হিসেবে গ্রহণ করো; কুরআনে যা হারাম করা হয়েছে সেগুলো হারাম মানো। কুরআনের স্পষ্ট বিষয়গুলোর উপর আমল করো; অস্পষ্ট (মুতাশাবিহ) বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকো। যদি দ্বীন নিয়ে বিতর্কের মাঝে আল্লাহর তাকওয়া থাকত, তবে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর পরে সাহাবায়ে কেরাম সবার আগে সেটা করতেন। তারা কি দ্বীন নিয়ে বিবাদ করেছেন? হ্যাঁ, তাঁরা ফিকহ নিয়ে মতবিরোধ করেছেন; ফারায়েজ নিয়ে মতভেদ করেছেন। নামায, হজ, হালাল-হারাম, তালাক ইত্যাদি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন; কিন্তু কেউ দ্বীন (তথা আকিদা) নিয়ে বিতর্ক করেননি। এ বিষয়ে বিবাদ করেননি। সুতরাং তোমরা তাকওয়ার উপর থাকো। সুন্নাতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকো। এটুকুই যথেষ্ট হবে। পরবর্তী লোকেরা দ্বীন নিয়ে যেসব বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, যেগুলো নিয়ে বিবাদ-বিতর্কে জড়িয়েছে, সেগুলো থেকে দূরে থাকো। কারণ, সুন্নাতের অনুসরণের মাঝেই মুক্তি।'[৭৮১]

মোটকথা, সর্বাবস্থায় সিফাত নিয়ে বিতর্ক পরিহার করতে হবে। কারণ, এ ব্যাপারে বিতর্ক সমাধানের চেয়ে সংকট আরও ঘনীভূত করে। এ জন্য সালাফে সালেহিন সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহর সিফাত নিয়ে বিতর্ক করতে নিষেধ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমাকে আল্লাহর আসমা ও সিফাত (তথা নাম ও গুণাবলি) নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এটা বিদআতিদের আবিষ্কার করা একটা বিদআত। সাহাবা, তাবেয়িন, মাযহাবের বড় বড় ইমাম যথা মালেক ইবনে

---

৭৮০. শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৩/৫৮০)।

৭৮১. ফাযায়িলু আবি হানিফাহ, ইবনে আবিল আওয়াম (৩২৮-৩২৯)।

আনাস, সুফিয়ান সাওরি, আওযায়ি, আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, শাফেয়ি, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক হানযালি, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া—তাঁরা (আল্লাহর আসমা ও সিফাত নিয়ে) কথা বলতেন না। এগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে, এসব বিষয়ে বিদআতিদের গ্রন্থ পড়তে নিষেধ করতেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের ফেতনা থেকে রক্ষা করুন।'[৭৮২]

মুসআব বলেন, মালেক ইবনে আনাস রহ. বলতেন, 'আমি দ্বীনের ব্যাপারে সব ধরনের বিতর্ক অপছন্দ করি। মদিনাবাসীও এটা অপছন্দ করে। তাকদির, জাহমের বিভ্রান্তিসমূহ এ ধরনের কোনোকিছু নিয়ে কথা বলা আমাদের পছন্দ নয়। বরং আমলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নেই এমন যেকোনো বিষয়ে কথা বলা আমি পছন্দ করি না। আর আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলা থেকে সম্পূর্ণ নীরব থাকতে হবে। মদিনাবাসী (তথা মদিনার আলেমগণ) আমল ছাড়া দ্বীনের কোনো বিষয়ে কথা বলতে নিষেধ করতেন।'[৭৮৩]

পরবর্তী সময়ে বিতর্ক যেহেতু শুরু হয়েছে, সে যুক্তিতে এখনও এটা অব্যাহত রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এক্ষেত্রে উম্মাহর একে অন্যকে ছাড় দিতে হবে। কারণ, আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ঘরানার মাঝে আল্লাহর সিফাতকেন্দ্রিক যেসব বিতর্ক ও মতপার্থক্য রয়েছে, সেগুলো দ্বীনের কোনো মৌলিক বিষয় নয়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেননি। যেসব সাহাবা গ্রামীণ অঞ্চলে থাকতেন এবং একবার কেবল রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আল্লাহর রাসুল তাদের এগুলো শেখাননি। বোঝা গেল, ঈমানের বিশুদ্ধতা এগুলো জানার উপর নির্ভরশীল নয়। এগুলোর ক্ষেত্রে ভুলবিচ্যুতি ঈমান ভঙ্গের কারণ নয়। যদি এগুলোর উপর ঈমানের বিশুদ্ধতা নির্ভর করত, কিংবা এক্ষেত্রে ভুলবিচ্যুতি কুফর হতো, তাহলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবাদের এগুলো সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে শিখিয়ে যেতেন। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কিংবা সাহাবায়ে কেরামের সময়ে কোনো যুগেই এগুলো নিয়ে বিতর্ক হয়নি। ফলে এগুলোর উপর ভিত্তি করে পরস্পরকে কাফের-মুশরিক বা গোমরাহ বলা কিংবা উম্মাহর ঈমানি ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করে সর্বসম্মত ও মৌলিক বিষয়ের পরিবর্তে উম্মাহকে গৌণ বিষয়ে জড়িয়ে ফেলা মোটেই ইতিবাচক হবে না।

---

৭৮২. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৭৬-১৭৭)।

৭৮৩. শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালাকায়ি (১/১৬৮)।

তা ছাড়া, যদি আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ধারার শাখাগত দ্বন্দ্বগুলো মিটিয়ে ফেলতে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়, তবুও মেটানো সম্ভব হবে না। হাজার বছর ধরে এ সম্পর্কে যত বই লেখা হয়েছে, যদি সবগুলো শরবত বানিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয়, তবুও এ সমস্যার সমাধান হবে না। সহস্র বছরের অধিক সময়ের বিতর্ক, লক্ষ লক্ষ আলেমের মতামত, শতসহস্র বইয়ের ছড়াছড়ি। ফলে বিতর্কের পরিসরটা অকল্পনীয় রকমের বড়। আপনি যত দলিল-দস্তাবেজ জমা করেন, আপনার প্রতিপক্ষের কাছে সমান রকমের দলিল-দস্তাবেজ আছে। এখানে নতুন দেওয়ার কিছু নেই, আবিষ্কারের কিছু নেই। চর্বিতগুলোকে চর্বণ করাই এখানকার কাজ। যদি মনে করেন একটা মতকে অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন, তবে আপনি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মাঝে আছেন। সেটা সম্ভব হলে হাজার বছর আগেই হয়ে যেত।

ঈমান ও কুফর প্রশ্নে হানাফি, গাইরে হানাফি, মাযহাবি, লা-মাযহাবি আহলে সুন্নাতের সকল ধারা ঈমানের শিবিরে। ইসলাম ও মিশনারির সংঘাতে সবগুলো মানহাজ ইসলামের ঝান্ডাতলে। তাওহিদ ও পৌত্তলিকতার যুদ্ধে তারা সম্মিলিতভাবে তাওহিদের প্ল্যাটফরমে। আল্লাহর আইন এবং মানব রচিত আইনের দ্বন্দ্বে তারা আল্লাহর আইনের সঙ্গে। হিযবুল্লাহ ও হিযবুশ শয়তানের যুদ্ধে তারা সকলেই হিযবুল্লাহর বাহিনীতে। কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে তারা ঈমানি ভাই ভাই; শিয়াদের বিরুদ্ধে তারা সুন্নাহর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে; কবরপূজারীদের বিরুদ্ধে তারা এক শিবিরে। এভাবে সব জায়গায় তারা একসঙ্গে। অথচ গুটিকয়েক শাখাগত মাসআলাকে কেন্দ্র করে আজ তারা বিভিন্ন যুধ্যমান শিবিরে, রণ প্রস্তুতিতে। পৃথিবীর অন্যত্র থাকলেও উপমহাদেশের ইতিহাসে এ ধরনের চিত্র আগে কখনো এতটা প্রকটভাবে দেখা যায়নি। প্রথমে আলেমরা তাতে জড়ালেন; এখন সাধারণ শিক্ষিতরাও জড়াতে চাচ্ছেন। সবাই চাচ্ছেন আকিদার শাখাগত এসব মাসআলা নিয়ে যুদ্ধের ফয়সালা আগে হোক, ঈমান ও কুফরের যুদ্ধ পরে দেখা যাবে। অথচ তাদের কেউ অনুভব করছেন না, তাদের এসব মতপার্থক্য সত্ত্বেও ইসলামের শত্রুদের চোখে তারা সবাই সমান। সকলে তাদের শেষ করার জন্য একাট্টা। তাহলে তারা কি নিজেদের রক্ষার জন্যও এক হতে পারবেন না? তা ছাড়া, আকিদার এসব বিতর্ক এক অনিঃশেষ ও অনিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধ। এখানে সে তত বড় বিজয়ী, যে এ যুদ্ধ থেকে যত দূরে।

ইবনে খুযাইমা বলেন, 'মুসলমানদের বড় বড় ইমাম এবং মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাগণ, যেমন—মালেক, সুফিয়ান, আওযায়ি, শাফেয়ি, আহমদ, ইসহাক,

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, ইবনুল মুবারক, আবু হানিফা, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ও আবু ইউসুফ প্রমুখ—এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতেন না। বরং তাঁরা তাদের শাগরেদদের এসবের মাঝে প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন। কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের কথা বলতেন।'[৭৮৪]

ইমাম গাযালি লিখেন, 'মিম্বর থেকে এসব বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক কথা বলা বৈধ নয়। বরং সালাফ থেকে যতটুকু এসেছে, ততটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকা আবশ্যক। দেহবাদিতা ও সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে আল্লাহর পবিত্রতার উপর গুরুত্বারোপ করা জরুরি।'[৭৮৫]

---

৭৮৪. আকাউইলুস সিকাত, যায়নুদ্দিন হাম্বলি (৬২)।

৭৮৫. ইলজামুল আওয়াম আন ইলমিল কালাম (৬৪-৬৫)।

ফেরেশতাদের উপর ঈমান

ফেরেশতাদের পরিচয়

‘ফেরেশতা’ আরবি শব্দ ‘মালায়িকা’র (الملائكة) প্রচলিত বাংলা অর্থ। ‘মালায়িকা’র শাব্দিক অর্থ হলো দূত, বার্তাবাহক। তারা যেহেতু সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর ‘বার্তাবাহক’ হিসেবে কাজ করেন, এ জন্য তাদের ফেরেশতা (মালায়িকাহ) বলা হয়।

ফেরেশতারা হলেন সূক্ষ্ম দেহধারী আল্লাহর এক অদৃশ্য সৃষ্টি। তারা বিভিন্ন রূপ ও আকার-আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম। তাদের একদল আল্লাহর মারিফাত, তাওহিদ ও ইবাদতের সাগরে নিমজ্জিত। আল্লাহর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত। আরেক দল বিশ্বজগতের বিভিন্ন স্থানে স্ব-স্ব কাজে ব্যাপৃত। ইমাম আজম রহ. ফেরেশতাদের ব্যাপারে বিশেষ কোনো আলোচনা করেননি। ফলে আমরা তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। বরং কুরআন-সুন্নাহ ও পরবর্তী হানাফি উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করব।

ফেরেশতার প্রতি ঈমান আনার অর্থ এই বিশ্বাস রাখা যে, ফেরেশতারা আল্লাহ তায়ালার সম্মানিত বান্দা। তারা দিনরাত আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করেন, কখনো ক্লান্ত হন না। [আম্বিয়া : ২০] তারা সকল গুনাহ থেকে পবিত্র। তারা আল্লাহর অবাধ্য হন না, আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করেন না। বরং তাদের যা নির্দেশ দেওয়া হয়, সেটা পূর্ণভাবে পালন করেন [আম্বিয়া : ২৬-২৭; তাহরিম : ৬] তারা কখনো আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে অহংকার প্রদর্শন করেন না। [আম্বিয়া : ১৯] আল্লাহ তায়ালা তাদের মাঝ থেকে যাকে ইচ্ছা রাসুল হিসেবে মনোনীত করেন। আল্লাহ বলেন, ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُو۟لِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾ অর্থ : ‘সকল প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর, যিনি বার্তাবাহক করেন ফেরেশতাদের যারা দুই-দুই, তিন-তিন বা চার-চার পক্ষবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যা

ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।' [ফাতির : ১] তারা মানুষের মতো প্রবৃত্তি, মুসিবত, সংকট, বংশ বিস্তারসহ সবকিছু থেকে মুক্ত।[৭৮৬]

মক্কার কাফেররা ফেরেশতাদের নারী মনে করত; আল্লাহর মেয়ে কল্পনা করত। অথচ আল্লাহ তাদের জন্ম দেননি কিংবা সন্তান হিসেবে দত্তক নেননি। তারা নারী নন, পুরুষও নন। বরং লিঙ্গের ঊর্ধ্বে তারা। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে চেয়েছেন তাদের সেভাবে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَٰٓئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ অর্থ : 'ওরা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাদের নারী গণ্য করেছে। তাদের সৃষ্টি কি ওরা প্রত্যক্ষ করেছিল? ওদের উক্তি অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হবে এবং ওদের জিজ্ঞাসা করা হবে।' [যুখরুফ : ১৯] আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾﴾ অর্থ : 'তিনি কি ছেলের বদলে মেয়ে পছন্দ করেছেন? তোমাদের কী হলো? তোমরা কী ধরনের বিচার করছ!' [সাফফাত : ১৫৩-১৫৪] এ ধরনের গর্হিত কথা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য সেটা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ﴾ অর্থ : 'যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারাই ফেরেশতাদের নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে।' [নাজম : ২৭] আরও বলেন, ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ অর্থ : 'তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি নিজে ফেরেশতাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয়ই তোমরা অত্যন্ত জঘন্য কথা বলছ।' [ইসরা : ৪০]

সুতরাং কেউ যদি ফেরেশতাদের নারী বলে, সে কুরআন অস্বীকারের কারণে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি কেউ পুরুষ বলে, সে ফাসেক বিবেচিত হবে। কারণ, কুরআনে যদিও তাদের পুরুষবাচক শব্দে অভিহিত করা হয়েছে, যেমন—আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেন, ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ অর্থ : 'আপনি বলুন, যদি কেউ জিবরাইলের শত্রু হয় এ জন্য যে, সে আল্লাহর নির্দেশে আপনার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দিয়েছে, যা এর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ...।' [বাকারা : ৯৭] অন্যত্র বলেন,

---

৭৮৬. দেখুন : তালখিসুল আদিল্লাহ (১৫৫-১৫৬)। আকিদাহ রুকনিয়্যাহ (৪২-৪৩)।

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ অর্থ : 'বিশ্বস্ত ফেরেশতা (জিবরাইল) এটা নিয়ে অবতরণ করেছেন।' [শুআরা : ১৯৩] এসব আয়াতে জিবরাইলকে আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী পুরুষবাচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কেবল জিবরাইল নন; সকল ফেরেশতার ক্ষেত্রেই কুরআন-সুন্নাহতে পুরুষবাচক শব্দ ব্যহার করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ তারা পুরুষ এমন নয়। বরং আল্লাহর ক্ষেত্রেও তো সর্বত্র পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে কি আল্লাহকেও পুরুষ বলা হবে? না। তিনি এর ঊর্ধ্বে। বাস্তব কথা হলো, আল্লাহ তায়ালা, জিবরিল প্রমুখ নাম পুরুষবাচক শব্দে ব্যক্ত করার কারণ খোদ শব্দ; লিঙ্গ নয়। অর্থাৎ, আরবিতে শব্দ হিসেবে এগুলো পুরুষবাচক; তাই তাদের ক্ষেত্রে পুরুষজাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

ফেরেশতাদের দায়িত্ব : ফেরেশতাদের আল্লাহ তায়ালা অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং তাদের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন। একদল তাঁর ইবাদতের দায়িত্বে নিয়োজিত। একদল ফেরেশতাদের আল্লাহ তায়ালা মানুষের আমল লিখে রাখার জন্য নিযুক্ত করেছেন। তাদের 'কিরামান কাতিবিন' তথা সম্মানিত লেখক ফেরেশতা বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে বলেন, ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۞ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۞﴾ অর্থ : 'না, কখনো না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করে থাকো। অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ।' [ইনফিতার : ৯-১১] আরও বলেন, ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ অর্থ : 'যখন দুই (আমল) গ্রহণকারী ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে।' [কাফ : ১৭] দুজন ফেরেশতা রয়েছেন কবরে মানুষকে প্রশ্নের দায়িত্বে। তাদের বলা হয় 'মুনকার' ও 'নাকির।' ইমাম তহাবি বলেন, "আমরা কিরামান কাতিবিন (ফেরেশতাদের) প্রতি ঈমান রাখি। আল্লাহ তায়ালা তাদের আমাদের পর্যবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত করেছেন। আমরা মৃত্যুর ফেরেশতার প্রতি ঈমান রাখি, আল্লাহ তায়ালা যাকে গোটা জগদ্বাসীর প্রাণ সংহারের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর রাসুল এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে একাধিক হাদিসে বর্ণিত কবরে মুনকার-নাকিরের 'তোমার রব কে', 'তোমার দ্বীন কী' এবং 'তোমার নবি কে' উক্ত তিনটি প্রশ্নে ঈমান রাখি।"[৭৮৭]

৭৮৭. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৫)।

আরেকজন রয়েছেন মৃত্যুর ফেরেশতা এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ﴾ অর্থ : 'ফেরেশতারা এই অবস্থায় তাদের প্রাণ সংহার করে যে, তারা নিজেদের উপর যুলুম করছিল।' [নাহল : ২৮] একদল ফেরেশতা রয়েছেন জাহান্নামের প্রহরী। আল্লাহ তায়ালা তাদের একটি দল সম্পর্কে বলেন, ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ অর্থ : 'তার উপর রয়েছে উনিশ জন।' [মুদাসি্সর : ৩০] আরেক দল ফেরেশতা আল্লাহর আরশের আশপাশে রয়েছেন। আল্লাহ বলেন,﴿وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ অর্থ : 'আপনি ফেরেশতাদের দেখতে পাবেন, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাঁর তাসবিহ পাঠ করছে।' [যুমার : ৭৫] একদল ফেরেশতা রয়েছেন মানুষের সংরক্ষণ এবং তাকে বিপদাপদ থেকে সুরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ﴾ অর্থ : 'মানুষের জন্য তার অগ্রে ও পশ্চাতে পালাক্রমে প্রহরী থাকে। তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।' [রাদ : ১১]

ফেরেশতা নাকি মানুষ উত্তম?

সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে ঈমানদার (মুমিন) আদম সন্তান ফেরেশতার চেয়ে উত্তম। বিপরীতে কাদারিয়্যাহ ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, ফেরেশতারা মানুষের চেয়ে উত্তম। তাদের যুক্তি কুরআনের কিছু আয়াতের বাহ্যিক অর্থ। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন, ﴿لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾ অর্থ : '(ঈসা) মসিহ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে কখনও হেয় জ্ঞান করে না। আর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও এটা করে না। কেউ তাঁর ইবাদতকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহংকার করলে তিনি অবশ্যই তাদের সকলকে তাঁর নিকট একত্র করবেন।' [নিসা : ১৭২] এ আয়াতে বোঝা যায় ফেরেশতা মানুষের চেয়ে উত্তম! তা ছাড়া, তারা আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করেন না। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে আরও বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ অর্থ : 'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো দোযখ থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা

আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না। যা করতে আদিষ্ট হয় তা-ই করে।' [তাহরিম : ৬] অথচ মানুষ অহরহ আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে। আর স্বাভাবিকভাবেই যে আল্লাহর যত অনুগত, সে তত শ্রেষ্ঠ। উপরন্তু আল্লাহ নিজে তাদের সম্মানিত বান্দা বলেছেন: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ অর্থ : 'তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র। বরং তারা (ফেরেশতা) সম্মানিত বান্দা।' [আম্বিয়া : ২৬] আল্লাহর কাছে সম্মানের মানদণ্ড হলো তাকওয়া। তিনি বলেন, ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ অর্থ : 'তোমাদের মাঝে আল্লাহর কাছে সে সবচেয়ে সম্মানিত যে তাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।' [হুজুরাত : ১৩]

আহলে সুন্নাতের দলিল হলো কুরআনের অসংখ্য আয়াত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ অর্থ : 'আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদের উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমার সৃষ্টির অনেকের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।' [ইসরা : ৭০] অন্য আয়াতে বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ অর্থ : 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম, নুহ, ইবরাহিমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে সমস্ত জগদ্বাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' [আলে ইমরান : ৩৩] আরেক জায়গায় বলেন, ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾﴾ অর্থ : 'স্মরণ করুন আমার বান্দা ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। আমি তাদের এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলাম। অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।' [সোয়াদ : ৪৫-৪৭] এসব আয়াতে দেখা যাচ্ছে, গোটা সৃষ্টির মাঝে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে। আর সৃষ্টির মাঝে ফেরেশতাও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ফেরেশতার চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো। অধিকন্তু ফেরেশতাদের ব্যাপারে এমন কোনো বক্তব্য নেই।

একইভাবে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে রাজত্ব দিয়েছেন; সম্পদ এবং অন্যান্য নেয়ামত দিয়েছেন। ফেরেশতাদের সেগুলো দেওয়া হয়নি। বরং তাদের মানুষের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছে। মানুষের দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে লাগানো হয়েছে। একইভাবে আল্লাহ তায়ালা জান্নাত মানুষের জন্য বানিয়েছেন। পরকালে মানুষকে আল্লাহর দিদারের প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন। ফেরেশতাদের জন্য এমন কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। হ্যাঁ, ফেরেশতারাও জান্নাতে প্রবেশ করবেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জান্নাত দেবেন সেখানকার নেয়ামত উপভোগ করার জন্য। বিপরীতে ফেরেশতারা সেখানে মুমিনদের দেখতে যাবেন, জান্নাতের নেয়ামত উপভোগ করতে নয়। কারণ, মানুষ বিবেক ও প্রবৃত্তি দুটোর মিশ্রণে তৈরি। কিন্তু ফেরেশতাদের মাঝে বিবেক থাকলেও তারা প্রবৃত্তিমুক্ত। এ কারণে মানুষ ভালো কাজ করলে পুণ্য লাভ করে। ফেরেশতারা ভালো কাজের বিনিময়ে পুণ্য লাভ করেন না।[৭৮৮]

পরবর্তী হানাফি আলেমদের ঐকমত্যে সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। আর নবি-রাসুলগণ ফেরেশতাদের মাঝ থেকে যারা রাসুল তথা বার্তাবাহক, তাদের চেয়ে উত্তম। এ হিসেবে ফেরেশতাদের মাঝে যারা প্রথম সারিতে, যেমন—জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিল প্রমুখসহ আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ সাধারণ মানুষের চেয়ে উত্তম।[৭৮৯] বাযদাবি বলেন, 'আবু মনসুর মাতুরিদি থেকে বর্ণিত : সৃষ্টির সর্বোত্তম হলেন মুহাম্মাদ (ﷺ), অতঃপর মানব রাসুলগণ, অতঃপর ফেরেশতা রাসুলগণ, অতঃপর মানব নবিগণ, অতঃপর মানব মুত্তাকিগণ, অতঃপর সাধারণ মুমিনগণ, অতঃপর সাধারণ ফেরেশতাগণ।'[৭৯০]

কিন্তু এটা দ্বীনের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় নয়। দুনিয়া ও আখেরাতের কোনা কাজে লাগার মতো মাসআলা নয়। ফলে এটা নিয়ে অতিরঞ্জন না করা চাই। ইমাম মাতুরিদি তার তাফসিরে বলেন, 'মানুষ না ফেরেশতা উত্তম—এটা আমাদের জানা নেই। এ জ্ঞান আল্লাহর কাছে। আমাদের এ ব্যাপারে জানার প্রয়োজনও নেই।'[৭৯১]

---

৭৮৮. বিস্তারিত দেখুন : আল-ইতিকাদ, বলখি (১০৩)। উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২০৫-২০৮)। আল-আকিদাহ রুকনিয়্যাহ (৪৩)। হাসান বসরি থেকে বর্ণিত আছে, তিনিও ফেরেশতাদের নবি-রাসুল-সহ সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতেন। তার কথার খণ্ডন মুতাযিলা ও কাদারিয়্যাহদের কথার খণ্ডনই। দেখুন : তালখিসুল আদিল্লাহ (৮০৩) শরহুল ফিকহিল আকবার, সমরকন্দি (৪১)।

৭৮৯. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২০৫-২০৮)। আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ, নাসাফি (৪৫৮)।

৭৯০. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২০৫-২০৮)।

৭৯১. তাফসিরে মাতুরিদি (৭/৮৭)।

সুবকি বলেন, 'যদি সারা জীবনেও কোনো মানুষের অন্তরে ফেরেশতার চেয়ে নবিকে শ্রেষ্ঠ বলার বিষয়টি না আসে, আল্লাহ তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না।'[৭৯২] কারণ, এটা ঈমানের কোনো জরুরি বিষয় নয়। বান্দার উপর এটা জানা আবশ্যক নয়।

জিন জাতির পরিচয়

জিন জাতি ফেরেশতাদের মতো আল্লাহ তায়ালার একটি অদৃশ্য সৃষ্টি। আমরা তাদের দেখতে পাই না। তারাও ফেরেশতাদের মতো বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে সক্ষম। কিন্তু জিন জাতি ফেরেশতা থেকে সৃষ্টি ও প্রকৃতি তথা সকল দিক থেকেই আলাদা। ফেরেশতারা নূরের তৈরি, আর জিন আগুনের তৈরি। প্রধান শয়তান ইবলিস ফেরেশতা নয়; জিন জাতিভুক্ত।[৭৯৩]

জিন তাদের প্রকৃতির দিক থেকে মানুষের খুব কাছাকাছি। মানুষের মাঝে যেমন নারী-পুরুষ আছে, তেমন জিনদের মাঝেও নারী-পুরুষ আছে। তারা মানুষের মতোই ক্ষুধা ও প্রবৃত্তির চাহিদার অধিকারী। মানুষের মতো তারাও আল্লাহর ইবাদতের জন্য আদিষ্ট। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মানুষের মতো তাদের কাছেও রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। পরকালে মানুষের মতো জিনদেরও বিচার হবে। তাদের মাঝে যারা কাফের, মানব জাতিভুক্ত কাফেরদের মতো চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে। যারা গুনাহগার, তারা গুনাহগার মানুষের মতো অস্থায়ীভাবে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ অর্থ : 'আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক-নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।' [সাজদা : ১৩] অন্য আয়াতে বলেন, ﴿يَٰقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ অর্থ : (জিনরা বলল) 'হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।' [আহকাফ : ৩১][৭৯৪]

---

৭৯২. শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (১০২)।

৭৯৩. শরহুল আকায়েদ (৩৩১)।

৭৯৪. তাফসিরে মাতুরিদি (৪/৪১৮)। উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২১০)।

মুমিন জিনরা কি জান্নাতে যাবে না? প্রশ্ন হলো, পুণ্যবান মুমিন জিনরা কি মানুষের মতো জান্নাতে যাবে? সেখানকার নেয়ামত ভোগ করবে? নাকি তাদের ভিন্ন কোনো পরিণতি বরণ করতে হবে?

এটা মতভেদপূর্ণ বিষয়। ইমাম আবু হানিফার আকিদাবিষয়ক গ্রন্থগুলোতে এ সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই। তবে মাতুরিদি তাঁর তাফসিরে ইমাম আজমের একটি মত উল্লেখ করেছেন। মাতুরিদি লিখেন, 'আবু হানিফা থেকে বর্ণিত আছে—জিনদের কোনো পুণ্য নেই। কিন্তু অবাধ্য হলে পাপ আছে। অর্থাৎ, জিনরা যদি গুনাহ করে, কুফরি করে, তবে আল্লাহ তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু তারা যদি পুণ্য করে, ভালো কাজ করে, তাদের জান্নাত দান করবেন—এ কথা বলা যাবে না। কারণ হিসেবে ইমাম আজম মনে করেন, জিনদের শাস্তির কথা কুরআনে এসেছে, কিন্তু জান্নাতে নেয়ামত ভোগের কথা আসেনি। ফলে কুরআনে যতটুকু এসেছে ততটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। তা ছাড়া, মুমিনদের জান্নাত লাভ তাদের কর্মফল নয়; বরং আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি। আর এ ধরনের প্রতিশ্রুতি যেহেতু জিনদের ব্যাপারে বিদ্যমান নেই, তাই তাদের ব্যাপারে জান্নাত সাব্যস্ত করা যাবে না।[৭৯৫] অন্য হানাফি আলেমগণও ইমামের অনুসরণে একই কথা বলেছেন। সদরুল ইসলাম বাযদাবি ও সাফফার বুখারি বলেন, এটাই আহলে সুন্নাতের মত। কারণ, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে মুমিন জিনদের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা করেছেন। জান্নাতের ঘোষণা করেননি। [আহকাফ : ৩১][৭৯৬] আবুল মুঈন নাসাফি ও হাফিজুদ্দিন নাসাফিসহ অন্য সকল হানাফি আলেমের মতও এটাই। তারা সকলে এ ব্যাপারে ইমাম আজমের নীরব থাকার মত বর্ণনা করেছেন।[৭৯৭]

কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও শাফেয়িসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নাতের মতে, জিনদের পাপ-পুণ্য যেমন আছে, তাদের কর্মের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাত-জাহান্নামও আছে। সুরা আর রহমান এর সাক্ষী। কারণ, কুরআনে আল্লাহ তায়ালা সুরা আর-রহমানের সবগুলো প্রসঙ্গ মানুষ ও জিন উভয় জাতির ব্যাপারে এনেছেন। উভয়কে সম্বোধন করেছেন। সেখানে যেমন জাহান্নামের কথা আছে, তেমন জান্নাতের কথাও আছে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ۝ فَبِأَيِّ

---

৭৯৫. তাফসিরে মাতুরিদি (১০/২৫৫)।

৭৯৬. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২১০)। তালখিসুল আদিল্লাহ (৫৮৪)।

৭৯৭. দেখুন : বাহরুল কালাম (১৮০)। আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (৪৫২)।

ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾ অর্থ : ‘যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। সুতরাং তোমরা (জ্বিন ও মানুষ) উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে। সেই সকলের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না, যাদের পূর্বে কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি।’ [আর-রহমান : ৪৬-৫৬][৭৯৮]

ইমাম আজম রহ.-এর বক্তব্য, তাঁর ইলম ও ইজতিহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আমরা যদি নিষ্ঠার সঙ্গে কুরআনের প্রতি তাকাই, দেখতে পাব, ইমাম আজমের চেয়ে তাঁর দুই শাগরেদ ও জমহুরের বক্তব্য অধিকতর শক্তিশালী। ফলে জান্নাত ও জাহান্নাম দুটোই মানুষ ও জিন উভয় জাতির জন্য। জান্নাতে মানুষ যেমন নেয়ামত ভোগ করবে, জিনরাও একই নেয়ামত ভোগ করবে। কারণ, তাদের প্রকৃতি, জীবনের উদ্দেশ্য, মানসিকতা, স্বভাব-চরিত্র সবগুলোই মৌলিকভাবে অভিন্ন। কেবল সৃষ্টিগত পদার্থের ক্ষেত্রে পার্থক্য। ফলে আখিরাতেও তারা এই পার্থক্যসহই জান্নাতে থাকবে।

---

৭৯৮. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২১০-২১১)। আল-আকিদাহ রুকনিয়্যাহ (৫৯)।

কিতাবের উপর ঈমান

কিতাবের পরিচয় ও সংখ্যা

কিতাবের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো, আল্লাহ কর্তৃক বিভিন্ন নবি-রাসুলের উপর অবতীর্ণ বিভিন্ন আসমানি গ্রন্থের ব্যাপারে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহর অনেকগুলো আসমানি কিতাব রয়েছে। এগুলো তাঁর শাশ্বত কালাম। তাঁর পক্ষ থেকে এগুলো বিভিন্ন নবি-রাসুলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস ঈমানের ছয়টি রোকনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন। ঈমানের একটি ভিত্তি। কারণ, এসব গ্রন্থের মাধ্যমেই যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন, যোগাযোগ করেছেন; কিতাবরূপে তাঁর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। মানুষ নিজ নিজ ভাষায় তাঁর বাণী পড়েছে, শুনেছে, বুঝেছে এবং আমল করেছে। ফলে আসমানি কিতাব হলো আল্লাহ ও মানুষের যোগাযোগ মাধ্যম। এগুলো অস্বীকার করার অর্থ হলো ঈমানের ভিত্তি অস্বীকার করা। আল্লাহ, ফেরেশতা, নবি-রাসুল, তাকদির, পরকাল অন্য সবকিছুকে অস্বীকার করা। আল্লাহ বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا﴾ অর্থ : 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করো এবং বিশ্বাস স্থাপন করো তাঁর রাসুল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসুলের উপর। ঈমান আনো সে সমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতঃপূর্বে। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং কিয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।' [নিসা : ১৩৬]

আসমানি কিতাবের সংখ্যা কতগুলো? উলামায়ে কেরাম লিখেন, একশত চারটি। তন্মধ্যে আদম আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল দশটি, শিস আলাইহিস সালামের উপর পঞ্চাশটি, ইদরিস আলাইহিস সালামের উপর ত্রিশটি, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর দশটি। মুসা আলাইহিস সালামের উপর

অবতীর্ণ হয়েছিল তাওরাত, দাউদ আলাইহিস সালামের উপর যাবুর, ঈসা আলাইহিস সালামের উপর ইনজিল; আর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল কুরআন।[৭৯৯]

কিন্তু সংখ্যাসংশ্লিষ্ট এ বক্তব্যটি চূড়ান্ত নয়। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন নবি-রাসুলের উপর অসংখ্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যেমন—ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর সহিফা অবতীর্ণ করেছেন। মুসা আলাইহিস সালামকে তাওরাত দিয়েছেন। ঈসা আলাইহিস সালামকে ইনজিল দিয়েছেন। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এই বিষয়গুলো চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত। কারণ, আল্লাহ তায়ালা এগুলো কুরআনে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্য নবিদের আল্লাহ তায়ালা কতগুলো কিতাব দিয়েছেন এবং কোন কোন কিতাব দিয়েছেন, সেগুলোর সংখ্যা বা নাম আল্লাহ তায়ালা আমাদের জানাননি। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত কোনো বিশুদ্ধ হাদিসেও এ ব্যাপারে বক্তব্য নেই। যা আছে সেগুলো দুর্বল। ফলে এর জ্ঞান আল্লাহর কাছে সঁপে দিতে হবে।

আসমানি কিতাবের উপর ঈমানের পদ্ধতি হলো—পূর্বের নবি-রাসুলকে প্রদত্ত সকল কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য—এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। কিন্তু সেগুলোর ভিতরে বিদ্যমান আল্লাহর কালামের ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা না বলা। কারণ, সেসব গ্রন্থ হারিয়ে গিয়েছে। যেগুলো আজও অবশিষ্ট আছে—যেমন ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের গ্রন্থ—সেগুলোও সম্পূর্ণ কিংবা সিংহভাগ অংশ বিকৃতির শিকার হয়েছে। ফলে তাদের হাতে বিদ্যমান গ্রন্থগুলো হুবহু আসমানি গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করা যাবে না। বিপরীতে কুরআন আল্লাহর শাশ্বত ও অবিকৃত গ্রন্থ। আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে যেভাবে অবতীর্ণ করেছেন সেভাবেই রয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। একটি অক্ষরও পরিবর্তন হয়নি, কখনো হবেও না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা এটাকে সুরক্ষিত রাখার ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ অর্থ : 'নিশ্চয়ই আমি এ উপদেশগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি আর নিশ্চয় আমিই এর সংরক্ষণকারী।' [হিজর : ৯] ফলে কুরআনের প্রত্যেকটি অক্ষর সত্য বলে বিশ্বাস রাখতে হবে। কুরআনের মাঝে বিদ্যমান সকল ঘটনা ও পয়গামকে সত্য বলে স্বীকার করতে হবে। কুরআনের বিধিবিধানকে শিরোধার্য

---

৭৯৯. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১০৪-১০৫)।

হিসেবে মেনে নিতে হবে। ইমাম আজম রহ. বলেন, '**কেউ যদি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষরও অস্বীকার করে, সে কাফের হয়ে যাবে।**'[৮০০]

কুরআনের আয়াতগুলোর পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্য

কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই আল্লাহর চিরন্তন মুজিযা। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা অতীত ও ভবিষ্যতের এমন সংবাদ দিয়েছেন, যা কোনো মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কুরআনের প্রত্যেকটি শব্দ এবং এগুলোর গাঁথুনি আল্লাহ তায়ালা এমনভাবে করেছেন, যেভাবে কোনো মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। প্রশ্ন হতে পারে, অন্যান্য আসমানি গ্রন্থও কি মুজিযা ছিল? অর্থের দিক থেকে নিঃসন্দেহে সেগুলোও মুজিযা ছিল। কারণ, তাতেও অনেক ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। যেমন—রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী। কিন্তু অনেক আলেমের মতে, সেসব কিতাবে বর্ণিত শব্দগুলো মুজিযা ছিল না। ফলে সেগুলো সাধারণ মানুষের ভাষায় ছিল। যে-কেউ সেগুলোর মতো বাক্য গঠন করতে পারত। এই কারণে সেগুলো বিকৃতির শিকার হয়। বিপরীতে কুরআনের শব্দগুলোও মুজিযা। ফলে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ কুরআনের মতো ছন্দ তৈরি করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না।[৮০১]

ইমাম আজম বলেন, '**কুরআন আল্লাহর রাসুল (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ, গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। কুরআন কারিমের সকল আয়াত আল্লাহর কালাম হওয়ার ভিত্তিতে ফযিলত ও মর্যাদার দিক থেকে সমস্তরের। কিন্তু বর্ণনা ও বিষয়বস্তুর কারণে কিছু আয়াতের বাড়তি ফযিলত রয়েছে, যেমন আয়াতুল কুরসি। এতে আল্লাহর মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এতে দুটি ফযিলত একত্র হয়েছে। এক. বর্ণনার ফযিলত, দুই. বর্ণিতের (তথা বিষয়বস্তুর)। আর কিছু আয়াতে কেবল বর্ণনার ফযিলত রয়েছে, বিষয়বস্তুর নয়, যেমন কাফেরদের আলোচনা। এখানে কাফেরদের কোনো ফযিলত নেই।**'[৮০২]

অর্থাৎ, কুরআনের 'নযম' (ছন্দ) আল্লাহর কালাম হিসেবে সব সমান। কোনো একটি আয়াতের অন্য আয়াতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কিন্তু আলোচ্য বিষয় হিসেবে

---

৮০০. আল-ইনতিকা (৩১৮)।
৮০১. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২২৭)।
৮০২. আল-ফিকহুল আকবার (৮)।

কিছু আয়াত অপর আয়াতের চেয়ে উত্তম। যেমন—সুরা ইখলাসের আলোচ্য বিষয় (তাওহিদ) সুরা লাহাবের আলোচ্য বিষয়ের চেয়ে উত্তম।

এটা বিভিন্ন হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন—রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সুরা ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বলেছেন।[৮০৩] কারণ, এখানে তাওহিদের আলোচনা করা হয়েছে। আর তাওহিদ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আলোচ্য বিষয়। ফলে চার আয়াতের একটি ক্ষুদ্র সুরা মর্যাদার দিক থেকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সুরা ফাতিহা সম্পর্কে বলেছেন—তাওরাত, যাবুর, ইনজিল এমনকি খোদ কুরআনেও এর মতো কোনো (শ্রেষ্ঠ) সুরা অবতীর্ণ হয়নি।[৮০৪] এটাও মূলত মর্যাদার ক্ষেত্রে অন্যান্য সুরা ও আয়াতের উপর সুরা ফাতিহা ও এর আয়াতগুলোর শ্রেষ্ঠত্বের দলিল।

কুরআন আল্লাহর কালাম, মাখলুক নয়

কুরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম (তথা বাণী)—এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কুরআন নিয়ে কোনো বিতর্ক ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে উম্মাহর একদল বুদ্ধিপূজারী মানুষকে শয়তান উসকে দিয়েছে। তারা কুরআনের পয়গাম আত্মস্থ এবং নির্দেশ পালন করার পরিবর্তে কুরআনের স্বরূপ-প্রকৃতি নিয়ে তাত্ত্বিক বিতর্কে জড়িয়ে গিয়েছে। প্রথমে ছোট ছোট মজলিসে শুরু হওয়া এই তাত্ত্বিক বিতর্ক একসময় সর্বভুক দাবানলে পরিণত হয়ে গোটা উম্মাহকে কয়েক শতাব্দ জ্বালিয়েছে, পুড়িয়েছে, বরং আজও জ্বালাচ্ছে।

এই বিতর্কের সারকথা ছিল : কুরআন আল্লাহর কালাম ঠিক আছে, কিন্তু এই কালামের রূপরেখা কী? এটা কি আল্লাহর সরাসরি গুণ, নাকি তাঁর সৃষ্টি করা বস্তু? আল্লাহর সিফাত (গুণ) অস্বীকারকারী ভ্রান্ত লোকজন কুরআনকে আল্লাহর 'মাখলুক' তথা সৃষ্টি বলে আখ্যা দিলো, যাতে আল্লাহর কালাম সিফাত অস্বীকারের পথ প্রশস্ত হয়। আহলে সুন্নাতের আলেমগণ তাদের কঠোরভাবে প্রতিহত করলেন। কুরআনকে আল্লাহর কালাম ও 'গাইরে মাখলুক' তথা সৃষ্টি নয় বলে আখ্যা দিলেন।

---

৮০৩. মুসলিম (কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন : ৮১১)। তিরমিযি (আবওয়াবু ফাযায়িলিল কুরআন : ১৮৯৯)।
৮০৪. তিরমিযি (আবওয়াবু ফাযায়িলিল কুরআন : ২৮৭৫)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবি হুরাইরা : ৮৮০০)।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে এখানেই ঘটনা শেষ হলো না। দ্বীনের মৌলিক বিষয় বাদ দিয়ে অর্থহীন বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ির অনিবার্য কুফল সর্বত্র প্রকাশ পেতে থাকল। একসময় আহলে সুন্নাতের আলেমরাও জড়িয়ে গেলেন অভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিতর্কে। কয়েক শতাব্দ এটা চলল। মৌখিক কাদা ছোড়াছুড়ি একসময় সহিংসতায় রূপ নিল। পরস্পরের বিরুদ্ধে গিবত-শেকায়েত, অভিযোগ-অপবাদের তুফান বয়ে চলল। বরং একপর্যায়ে মামলা-হামলা, একে অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, জালিমের কাছে বিচার দিয়ে শাস্তির মুখোমুখি করা, দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়াসহ কোনোকিছু বাদ থাকল না। এটা ছিল একটা অভিশাপ, যা আজও উম্মাহর কাঁধ ভারী করে রেখেছে।

ইমাম আজম রহ. এই ফেতনার সূচনা নিজ চোখে দেখেছিলেন, যার সামনে চুপ থাকা সমীচীন ছিল না। ফলে তিনি হক প্রকাশ এবং বাতিলের খণ্ডন নিজের দায়িত্ব মনে করে সামনে এগিয়ে আসেন। কুরআন সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা তুলে ধরেন। ইমাম বলেন, **“কুরআন আল্লাহ তায়ালার ‘কালাম’ (বাণী), গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, হৃদয়ে সুরক্ষিত, মুখে পঠিত, নবিজি (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ। ...কুরআন সৃষ্ট নয়। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মুসা আলাইহিস সালামসহ যেসব নবির ঘটনা বর্ণনা করেছেন, ফিরাউন ও ইবলিসের ঘটনা বলেছেন, সেগুলোর সবই আল্লাহ তায়ালার ‘কালাম’ (বাণী)। তিনি নিজের ‘কালামে’র মাধ্যমে তাদের সংবাদ দিয়েছেন। তাঁর কালাম সৃষ্ট নয়। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালামসহ অন্যান্য সৃষ্টির ‘কালাম’ (কথা) সৃষ্ট। কুরআন আল্লাহর কালাম। সুতরাং এটা চিরন্তন। এটা তাদের কালাম নয়।”**[৮০৫]

ইমাম আল-ওয়াসিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন, **‘আমরা বিশ্বাস করি, কুরআন আল্লাহর কালাম, মাখলুক নয়। এটা তাঁর ওহি এবং তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তাঁর গুণ (সিফাত)। ফলে কুরআন আল্লাহ নয়, আবার তাঁর থেকে আলাদাও নয়। মুসহাফে লিখিত, মুখে পঠিত, হৃদয়ে সংরক্ষিত। ...আল্লাহর কালাম তাঁর সত্তার সঙ্গে বিদ্যমান। ...সুতরাং যে বলবে আল্লাহর কালাম (কুরআন) মাখলুক, সে মূলত মহান আল্লাহকে অস্বীকারকারী’ (কাফের)।**[৮০৬]

ইমাম তহাবি রহ. ইমাম আজমের আকিদা বর্ণনা করেন এভাবে, “কুরআন আল্লাহর কালাম। এর উৎস আল্লাহ তায়ালার ‘কথা’ যার স্বরূপ তিনিই জানেন।

---

৮০৫. আল-ফিকহুল আকবার (২)।
৮০৬. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৪০-৪২)।

এটা তিনি তাঁর রাসুলের উপর ওহি হিসেবে পাঠিয়েছেন। মুমিনগণ এটা হক হিসেবে সত্যায়ন করেছেন। এটাকে প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর কথা হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস করেছেন। এটা সৃষ্টির কথার মতো সৃষ্ট নয়। সুতরাং যদি কেউ মনে করে কুরআন মানুষের কথা, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির নিন্দা-ভর্ৎসনা করেছেন। তাকে জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন, যেমনটি কুরআনে তিনি বলেছেন, 'আমি তাকে সাকার (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করব।' সুতরাং কুরআনকে 'এটা তো কেবল মানুষের কথা' সাব্যস্তকারীকে আল্লাহ তায়ালা যখন জাহান্নামে নিক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারলাম, কুরআন মানুষের স্রষ্টার কথা, মানুষের কথার সঙ্গে এর সাদৃশ্য নেই।"[৮০৭]

'কুরআন সৃষ্টি'র মাসআলাতে ইমামের উপর অভিযোগ

উপরের আলোচনাতে স্পষ্ট যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. 'কুরআন আল্লাহর সৃষ্ট' এমন বক্তব্যের বিরোধিতা করতেন। বরং তিনিই এই ভ্রান্তির বিরুদ্ধে আহলে সুন্নাতের সংগ্রামী ইমামদের প্রথম সারিতে ছিলেন। একপর্যায়ে যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক (সৃষ্টি) বলবে তাকে কাফের বলেছেন। এটা তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাব। তাঁর ছাত্রগণ শতাব্দের পরে শতাব্দ এ আকিদা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। ফলে তাঁর দিকে সম্বন্ধকৃত সবগুলো গ্রন্থেই এটা নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

দুঃখের বিষয় হলো, এত বক্তব্য থাকার পরও অতীত ও বর্তমানের কিছু ব্যক্তি তাঁর দিকে আঙুল তুলেছেন। তিনি কুরআনকে মাখলুক (সৃষ্ট) বলতেন— এমন অভিযোগ করেছেন। বরং এ কারণে একদল তাকে মুশরিকও বলেছেন! অথচ এটা ডাহা মিথ্যা অপবাদ। সত্যের ছিটেফোঁটাও নেই তাতে। কিছু বিভ্রান্ত মানুষ এসব অপবাদ ইমাম আজমের নামে রটিয়েছে। পরবর্তীকালে আহলে সুন্নাতের একদল আলেম তাদের ফাঁদে পড়ে ইমাম আজমকে ভুল বুঝেছেন। গোমরাহ লোকদের অপপ্রচারে বিশ্বাস করে ইমামের অন্যায্য সমালোচনা করেছেন। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন।

ইমামকে ভুল বুঝে তাঁর নামে ছড়ানো ভিত্তিহীন বক্তব্য বিশ্বাস ও বর্ণনার প্রথম সারিতে রয়েছেন ইমাম বুখারি। বুখারি তাঁর 'খালকু আফআলিল ইবাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, সুফিয়ান সাওরিকে হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান বলেন, (أَبْلِغْ أَبَا فُلَانٍ الْمُشْرِكَ , أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ دِينِهِ) আপনি আবু ফুলান তথা জনৈক মুশরিককে জানিয়ে দিন

---

৮০৭. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২০)।

যে, আমি তার দ্বীন থেকে মুক্ত। সুফিয়ান বলেন, কারণ তিনি বলতেন, কুরআন মাখলুক।[৮০৮] প্রশ্ন আসতে পারে, এখানে 'আবু ফুলান' (জনৈক) বলতে কে উদ্দেশ্য? উত্তর হলো, দুঃখজনকভাবে এখানে 'আবু ফুলান' বলতে 'আবু হানিফা' উদ্দেশ্য! কারণ বুখারি এখানে নামটা অস্পষ্ট রাখলেও তাঁর 'আত তারিখুল কাবির'-এ অস্পষ্ট রাখেননি। সেখানে লিখেন, (أبلغ أبا حنيفة المشرك أني بريء منه) অর্থাৎ, আপনি মুশরিক আবু হানিফাকে জানিয়ে দিন যে, আমি তার থেকে মুক্ত।[৮০৯]

উভয় জায়গাতেই বুখারি বর্ণনা দুটো উল্লেখের পরে কোনো খণ্ডন করেননি। বোঝা যায়, তিনি এসব বর্ণনার প্রতি একরকম বিশ্বাস করতেন, এগুলো সমর্থন করতেন। এ কারণে ইমাম আজমকে 'মুশরিক' বলার পরও সেটা খণ্ডনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

বুখারির পরে ইমাম আজমের উপর এ ধরনের অপবাদে বিশ্বাসী ও প্রচারকারী আরেকজন হলেন, বরং এক্ষেত্রে শীর্ষ সারিতে রয়েছেন, ইমাম আহমদ তনয় আবদুল্লাহ। তিনি ইমাম আজমের নামে কেবল 'কুরআন মাখলুক' বলার বক্তব্য চালিয়েছেন এমন নয়; বরং তিনি তাঁকে এই বিদআতের সর্বপ্রথম সৃষ্টিকর্তা এবং প্রধান কারিগর বানিয়ে দিয়েছেন! তিনি ইমাম আবু ইউসুফ সূত্রে (!) বর্ণনা করেন—সর্বপ্রথম 'কুরআন মাখলুক' এমন কথা বলেন আবু হানিফা।[৮১০] অথচ আমরা দেখব, ইমাম আজম কখনো এ ধরনের কথা বলেননি। বরং তিনি এটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। ফলে উলটো তাঁকে এই বিদআতের জনক বানিয়ে দেওয়া বড় রকমের জুলুম। লালাকায়ি বর্ণনা করেন, 'এ বিষয়ে উম্মাহর মাঝে কোনো দ্বিমত নেই যে, সর্বপ্রথম কুরআনকে মাখলুক বলেছে জা'দ ইবনে দিরহাম। অতঃপর জাহম ইবনে সফওয়ান।'[৮১১] আবদুল্লাহ কি এগুলো জানতেন না? তাহলে ইমাম আজমকে কীভাবে এই বিভ্রান্তির উদ্ভাবক বানালেন? আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

অতঃপর আরেকজন বড় ইমাম, যিনি এই মুসিবতে মুবতালা হয়েছেন, তিনি আবুল হাসান আশআরি। তিনি তাঁর 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থে এমন একাধিক বর্ণনা

---

৮০৮. খালকু আফআলিল ইবাদ (৭)।
৮০৯. আত-তারিখুল কাবির, বুখারি (৪/১২৭)।
৮১০. দেখুন : আস-সুন্নাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ (১২৬)।
৮১১. শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ (২/৩৪৪)।

এনেছেন, যেগুলো ইমাম আজমের উপর সুস্পষ্ট অপবাদ। যেমন—তিনি লিখেছেন, সুফিয়ান সাওরি বলেন, 'আমাকে হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান বললেন, (بلغ أبا حنيفة المشرك أني منه بريء) আপনি মুশরিক আবু হানিফাকে জানিয়ে দিন যে, আমি তার থেকে মুক্ত। সুফিয়ান বললেন, কারণ তিনি কুরআনকে মাখলুক বলতেন!' আশআরি ইমাম আজমকে উক্ত বক্তব্য থেকে তাওবা করানোর কথাও বলেছেন। শেষে বলেন, হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান আবু হানিফার কাছে খবর পাঠান, তাওবা করার আগ পর্যন্ত আমি তোমার থেকে মুক্ত। তার কাছে তখন ইবনে আবি উকবা ছিলেন। তিনি বললেন, আপনার প্রতিবেশী আমাকে জানিয়েছে, আবু হানিফাকে (খলকে কুরআন বক্তব্য থেকে) তাওবা করানোর পরও তিনি তাকে সেটার দাওয়াত দিয়েছেন।'[৮১২] এর মানে, তাওবা করানোর পরও আবু হানিফা তাঁর ভ্রান্ত আকিদা থেকে ফেরেননি!

---

৮১২. আল-ইবানাহ আন উসুলিদ দিয়ানাহ, আশআরি (২৯)। 'ইবানা'র কিছু কিছু নুসখাতে এসব বর্ণনা উল্লেখের পরে আশআরির পক্ষ থেকে ইমামের পক্ষে প্রতিরক্ষামূলক বক্তব্য উল্লেখ আছে (যেমন : ড. ফাওকিয়্যাহর নুসখায়)। তাই কিছু কিছু আলেম এই নুসখাকে অন্যান্য নুসখার উপর 'হুজ্জাহ' ধরেছেন এবং সেগুলোকে বিকৃত বলেছেন। অথচ ইবানাহ'র অসংখ্য পাণ্ডুলিপিতে এ ধরনের কোনো বক্তব্য নেই। এমনকি ইমাম সাখাভির হাতে লেখা টীকাসংবলিত একটি প্রাচীন বিশুদ্ধ নুসখা (যা ইদারাতুত তিবাআহ আল-মুনিরিয়্যাহ থেকে ছাপানো হয়েছে), সেখানেও এ ধরনের বক্তব্য নেই। ফলে একই যুক্তিতে উলটো ড. ফাওকিয়্যাহর নুসখাকেই বিকৃত এবং ইমামের শানে প্রতিরক্ষামূলক বক্তব্যগুলোকে পরবর্তীকালে সংযোজিত বলা যেতে পারে। বরং আশআরির নামে খণ্ডনী বক্তব্যের ভাষা ও উসলুব পরবর্তীকালে সংযোজিত হওয়ার সম্ভাবনাকেই বৃদ্ধি করে। কারণ, এ ধরনের অভিযোগ কেবল ইবানাহতে নয়; বুখারিও তার 'খালকু আফআলিল ইবাদ (৭) ও 'আত তারিখুল কাবির' (৪/১২৭)-এ করেছেন, যা আমরা উপরে বলেছি। ফলে ইবানাহতেও এমন অভিযোগ পরে সংযোজিত হবার পরিবর্তে মূল গ্রন্থে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। আল্লামা কাওসারি ইবনে কুতাইবা দিনাওয়ারির 'আল-ইখতিলাফ ফিল লফজ'-এর টীকায় লিখেন, এখানে ইবানাহর বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে। মূল বক্তব্যে 'আবু হানিফা' নেই; বরং 'আবু ফুলান' (জনৈক ব্যক্তি) উল্লেখ আছে, যেমনটা বুখারির 'খালকু আফআলিল ইবাদ' গ্রন্থেও এসেছে। [আল-ইখতিলাফ ফিল লফজ ৪২]

জবাবে আমরা বলব, 'ইবানাহ'র এ জায়গাতে কেবল একটি নয়; একাধিক বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। সবগুলো আবু হানিফার ব্যাপারে। সুতরাং কোনো একটা যদি 'আবু ফুলান' হয়ও, সেটা দ্বারাও উদ্দেশ্য আবু হানিফাই। যেমন : বুখারির খালকু আফআলিল ইবাদে 'আবু ফুলান' (জনৈক ব্যক্তি) থাকলেও উদ্দেশ্য আবু হানিফা, যা তিনি আত তারিখুল কাবিরে স্পষ্ট করেছেন। সেখানে সরাসরি 'আবু হানিফা' লিখেছেন। মোটকথা, ইমাম আজম রহ. কুরআনকে মাখলুক বলতেন না। এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, যা আমরা উপরে দলিল-সহ আলোচনা করেছি। কিন্তু তাই বলে ইবানাহ গ্রন্থে তার প্রতি এমন অভিযোগ থাকাকেই ইবানাহর বিকৃতির দলিল বানানোর কোনো মজবুত ভিত্তি নেই। কারণ, কেবল আশআরি নন; বুখারির একাধিক বইয়েও উক্ত বক্তব্য বিদ্যমান। তাহলে বুখারির গ্রন্থগুলোও কি বিকৃত বলা হবে? বরং এভাবে তো ইমাম আজমের ব্যাপারে প্রাচীন কিতাবাদিতে যা-কিছু আছে,

ইমামের উপর এমন অভিযোগকারীদের প্রথম সারির আরেকজন হলেন আবু বকর খতিবে বাগদাদি। তিনি বিভিন্ন অজ্ঞাত ও দুর্বল ব্যক্তির পতিত সনদে বর্ণনা করেছেন, আবু হানিফা কুরআন মাখলুক মনে করতেন, যার ফলে তাকে তাওবা করানো হয় এবং তিনি ফিরে আসেন।[৮১৩] খতিব তার তারিখে এর সপক্ষে অনেকগুলো বর্ণনা তুলে ধরেছেন। কিন্তু সেগুলোর অনেকগুলো হিংসা, প্রতিপক্ষের প্রোপাগান্ডা থেকে উৎসারিত। আর অধিকাংশই দুর্বল, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বর্ণনা।

অভিযোগের পর্যালোচনা

প্রথম কথা হলো, এগুলো ইমামের উপর সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ। বুখারি ও আশআরি দুজনই উক্ত ঘটনা আবু নুআইম (যিরার ইবনে সুরাদ) থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাক্কিকদের মতে, তিনি মিথ্যুক ছিলেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার আসকালানি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন-এর উদ্ধৃতিতে লিখেন, "কুফাতে দুজন মিথ্যুক রয়েছে। একজন আবু নুআইম নাখায়ি, অন্যজন আবু নুআইম যিরার ইবনে সুরাদ। বুখারি নিজে ও নাসায়ি ইবনে সুরাদকে 'পরিত্যক্ত' (মাতরূক) বলেছেন।"[৮১৪] অর্থাৎ, বুখারি হাদিসের ক্ষেত্রে তাকে বর্জন করলেও আবু হানিফার বিরুদ্ধে অভিযোগটা ঠিকই তার কাছ থেকে গ্রহণ করলেন এবং সেটা কোনো মন্তব্য বা পর্যালোচনা ছাড়া বর্ণনা করলেন। আশআরি ও বুখারির এই ভূমিকা দুঃখজনক এবং তাদের সঙ্গে বেমানান। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে ফিরদাউসে স্থান দিন।

এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত হানাফি মাযহাবের একমাত্র বক্তব্য হলো, কুরআন আল্লাহর কালাম, মাখলুক (সৃষ্ট) নয়, যেমনটা উপরে খোদ ইমাম আজমের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। একাধিক গ্রন্থে

সবগুলোকে বিকৃত এবং পরবর্তী সময়ে সংযোজিত বলতে হবে। অথচ এটা যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন দাবি। তাই এ ব্যাপারে অধিকতর বিশুদ্ধ কথা হলো, ইমাম আজমের ব্যাপারে এসব সমালোনামূলক বক্তব্য আশআরি ও বুখারি নিজেরাই দিয়েছেন। এর বিভিন্ন হেতু ও প্রণোদক রয়েছে যা ভিন্ন আলোচনার বিষয়। তবে তারা যেসব সনদে এগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তারা উম্মাহর বড় ইমাম গণ্য হওয়া সত্ত্বেও এবং এসব বর্ণনা তাদের গ্রন্থে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ভিত্তিহীন গণ্য হবে।

৮১৩. তারিখে বাগদাদ (১৫/৫১৬)।

৮১৪. তাহযিবুত তাহযিব (৪/৪৫৬)।

তিনি এটার তাগিদ দিয়েছেন। 'আল-ফিকহুল আকবারে' বলেন, **কুরআন আল্লাহ তায়ালার 'কালাম' (বাণী)... সৃষ্ট নয়।**[৮১৫] বরং ইমাম 'আল-ওয়াসিয়্যাহ' গ্রন্থে যারা কুরআন মাখলুক বলে তাদের কাফের বলেছেন। তিনি বলেন, **"আমরা বিশ্বাস করি, কুরআন আল্লাহর কালাম, মাখলুক নয়। এটা তাঁর ওহি এবং তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তাঁর গুণ (সিফাত)। ...সুতরাং যে বলবে আল্লাহর কালাম (কুরআন) মাখলুক, সে মূলত মহান আল্লাহকে অস্বীকারকারী (কাফের)।"**[৮১৬] তহাবি ইমাম আজমের আকিদা লিখেছেন এভাবে, "কুরআন আল্লাহর কালাম। এর উৎস আল্লাহ তায়ালার 'কথা', যার স্বরূপ তিনিই জানেন। এটা তিনি তাঁর রাসুলের উপর ওহি হিসেবে পাঠিয়েছেন। মুমিনগণ এটা হক হিসেবে সত্যায়ন করেছেন। এটাকে প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর কথা হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস করেছেন। এটা সৃষ্টির কথার মতো সৃষ্ট নয়। সুতরাং যদি কেউ মনে করে কুরআন মানুষের কথা, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।"[৮১৭]

কাযি আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কুরআনকে মাখলুক বলা হারাম। এমন কথা যে বলবে তাকে পরিত্যাগ করা ফরয।'[৮১৮] অন্য বর্ণনায় আবু ইউসুফ বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলে, সে পথভ্রষ্ট ও বিদআতি।'[৮১৯] ইমামের আরেক শাগরেদ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানি বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলবে, তার পিছনে নামায পড়ো না।'[৮২০]

উল্লেখ্য, কোনো কোনো গ্রন্থে আবু ইউসুফ থেকে একটি ঝামেলাপূর্ণ বর্ণনা এসেছে যা পরবর্তীকালে ইমাম আজমের ব্যাপারে অনেককে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। যেমন—খোদ আশআরি আবু ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেন, "আমি দুই মাস আবু হানিফার সঙ্গে বিতর্ক করেছি। পরিশেষে তিনি 'কুরআন মাখলুক' এমন মত থেকে ফিরে আসেন।"[৮২১] সময়টা কোথাও কোথাও ছয় মাস আবার কোথাও এক

---

৮১৫. আল-ফিকহুল আকবার (২)।

৮১৬. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৪০-৪২)।

৮১৭. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২০)।

৮১৮. উসুল ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালাকায়ি (২/২৯৮)।

৮১৯. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৪২)।

৮২০. দেখুন : উসুল ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালাকায়ি (২/২৯৯)। আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (১/৩৮১)।

৮২১. দেখুন : আল ইবানাহ (২৯-৩০)।

বছরের কথা এসেছে। এ থেকে অনেকে সন্দেহ করেছেন (যেমনটা খতিবে বাগদাদি), ইমাম যদি কুরআনকে মাখলুক না বলতেন, তবে এ দীর্ঘ সময় এটা নিয়ে আলোচনা করা লাগল কেন? বিশেষত কিছু বর্ণনায় কথা বলার পরিবর্তে বিতর্কের কথা পাওয়া যায়।

বাস্তবতা হলো, ইমাম কখনোই কুরআনকে মাখলুক বলতেন না। আশআরির উক্ত বর্ণনাটি আগের বর্ণনাগুলোর মতোই পরিত্যাজ্য। এ ব্যাপারে ইমামের দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার কারণ হলো, মুহাক্কিক হিসেবে পুরো মাসআলাটির উপর চূড়ান্ত রায় দিতে তিনি সময় নিয়েছেন। কারণ, কাউকে কাফের বলা বড় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তা ছাড়া, কিছু কিছু বর্ণনায় বোঝা যায়, তাদের আলোচনা বা বিতর্ক কুরআন মাখলুক কি না সে ব্যাপারে ছিল না। বরং যে ব্যক্তি এমন কথা বলবে (তাকে কাফের বলা হবে কি না) তার ব্যাপারে ছিল। এ কারণে বাইহাকির বর্ণনায় ইমামের সঙ্গে আবু ইউসুফের মুনাযারার কথা উল্লেখ থাকলেও 'তিনি কুরআন মাখলুক বলা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন'—এ ধরনের বক্তব্য নেই যেমনটা আশআরি বলেছেন। বাইহাকির বর্ণনা এমন—'আবু ইউসুফ বলেন, আমি এক বছর ইমামের সঙ্গে কুরআন মাখলুক কি না বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছি। পরিশেষে তিনি ও আমি উভয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি—যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলবে, সে কাফের'(كلمت أبا حنيفة سنة جراداء في أن القرآن مخلوق أم لا؟ فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر)।[৮২২]

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবিও একই শব্দে উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সেখানেও 'তিনি কুরআন মাখলুক বলা থেকে ফিরে এসেছেন'—এ ধরনের কোনো কথা নেই। বাযদাবি লিখেন, আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'আমি ছয় মাস ইমামের সঙ্গে কুরআন মাখলুক কি না সেটা নিয়ে কথা বলেছি। পরিশেষে তিনি ও আমি উভয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি—যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলবে, সে কাফের।'[৮২৩]

সুতরাং আর কোনো সন্দেহ থাকে না। ইবনে আবদিল বার খোদ আবু ইউসুফ থেকেই বর্ণনা করেন—আবু ইউসুফ রহ.-এর ছেলে সালম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আব্বাজান, এ ব্যাপারে আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে কিছু বলবেন? তিনি

---

৮২২. আসমা ওয়াস সিফাত (১/৩৮১)।
৮২৩. কাশফুল আসরার (১/৯)।

বললেন, 'হ্যাঁ। আবু হানিফাও এ কথা (কুরআন আল্লাহর কালাম; মাখলুক নয়) বলতেন। আমি তাঁর কাছ থেকে এটা ছাড়া আর কিছু শুনিনি। যদি এমন কিছু শুনতাম, তবে তাঁর সান্নিধ্যে থাকতাম না! তিনি তো তাঁর যুগে ফিকহ, ইলম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে গোটা জগতের ইমাম ছিলেন! তিনি ছিলেন হকের মানদণ্ড; তাঁর মাধ্যমে আহলে সুন্নাত থেকে আহলে বিদআত চেনা যেত' (وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ مِحْنَةً يُعْرَفُ بِهِ أَهْلُ الْبِدَعِ مِنَ الْجَمَاعَةِ)।[৮২৪]

বাইহাকি ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলবে, তার পিছনে নামায পড়ো না।' তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সাবেক থেকে বর্ণনা করেন, আমি আবু ইউসুফকে জিজ্ঞাসা করলাম—আবু হানিফা কি কুরআনকে মাখলুক বলতেন? জবাবে আবু ইউসুফ বললেন, 'নাউযুবিল্লাহ।' তিনি এমন কথা বলতেন না, আমিও এমন কথা বলি না।[৮২৫] লালাকায়িও উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[৮২৬]

বরং খতিবে বাগদাদি নিজেও বর্ণনা করেন, সুফিয়ান সাওরি এবং নুমান ইবনে সাবেত (আবু হানিফা) দুজনেই বলতেন, কুরআন আল্লাহর কালাম; মাখলুক নয়।[৮২৭] খতিব আরও বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. আবু হানিফার কাছে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কী সমস্যা? ইবনুল মুবারক বলেন, জাহম নামের এক লোকের আর্বিভাব ঘটেছে। আবু হানিফা বলেন, সে কী বলে? ইবনুল মুবারক বললেন, কুরআনকে মাখলুক বলে। তখন আবু হানিফা রহ. এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, ﴿مَّا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِءَابَآئِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ অর্থ : 'এই বিষয়ে এদের কোনো জ্ঞান নেই এবং এদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। এদের মুখনিঃসৃত বাক্য কী সাংঘাতিক! এরা তো কেবল মিথ্যাই বলে।' [কাহাফ : ৫] উক্ত বর্ণনায় স্পষ্ট যে, ইমাম আজম কখনোই কুরআনকে মাখলুক বলতেন না। বরং আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে খতিব বিশুদ্ধ

---

৮২৪. আল-ইনতিকা (৩১৯)।

৮২৫. আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (১/৩৮১)।

৮২৬. দেখুন : উসুল ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালাকায়ি (২/২৯৭)।

৮২৭. দেখুন : তারিখে বাগদাদ (১৫/৫১৭)। মুহাক্কিক ড. বাশার আওয়াদ উক্ত বর্ণনার সনদকে হাসান বলেছেন। বিপরীতে মুনাযারাসংক্রান্ত বর্ণনার সনদকে যয়িফ তথা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

সনদে বর্ণনা করেন, আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, **'আবু হানিফা কুরআনকে মাখলুক বলতেন এমন অভিযোগ সত্য নয়।'**[৮২৮] আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ছিলেন এ ময়দানের বীর পুরুষ। তিনি যখন এ বিষয়ে ইমাম আজমের শুদ্ধতার সাক্ষ্য দেন, তখন এক্ষেত্রে আর সন্দেহ করা অমূলক।

ইবনে তাইমিয়্যাহ (৭২৮ হি.) একই সাক্ষ্য দেন এভাবে : 'উম্মাহর প্রসিদ্ধ ইমামদের সবাই আল্লাহর সিফাতকে সাব্যস্ত করতেন। তারা বলতেন, কুরআন আল্লাহর কালাম; মাখলুক নয়। ...এটা সকল সাহাবি, আহলে বাইত ও তাবেয়িনের মাযহাব। এটা মালেক ইবনে আনাস, (সুফিয়ান) সাওরি, লাইস ইবনে সাদ, আওযায়ি, **আবু হানিফা**, শাফেয়ি, আহমদ ইবনে হাম্বলসহ সকল ইমামের মাযহাব।'[৮২৯] ইবনে হাজার আসকালানিও লিখেছেন, আবু হানিফা রহ.-এর প্রতি এ ধরনের অভিযোগ মিথ্যা।[৮৩০]

প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনকে কেউ মাখলুক বললে কাফের কেন হবে? আমাদের সামনে বিদ্যমান সবকিছুই তো মাখলুক। সবগুলোকে আমরা মাখলুক বলি। কুরআনকে কেন মাখলুক বলা যাবে না? এর অনেকগুলো কারণ আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় হলো, কুরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম। কালাম তাঁর চিরন্তন সিফাত। এমন কোনো সময় ছিল না যখন তাঁর মাঝে কালাম সিফাত ছিল না। কারণ, সেটা ত্রুটি হিসেবে গণ্য হবে। বিপরীতে মাখলুক চিরন্তন নয়। হাদেস তথা নবসৃষ্ট। ফলে আল্লাহর কালাম কুরআনকে মাখলুক বলার অর্থ হলো আল্লাহর 'কালাম' সিফাতকে অস্বীকার করা, সিফাতের আযালিয়্যাত তথা অনাদি হওয়াকে অস্বীকার করা, আল্লাহকে নবসৃষ্ট বিষয়ের পাত্র (محل للحوادث) বানানো, অপূর্ণতার দোষে দোষী করা। আল্লাহর সত্তার সঙ্গে নবসৃষ্ট বিষয় জুড়ে দেওয়া। এ সবগুলো কুফর। ফলে আল্লাহর কালাম কুরআনকে মাখলুক বলাও কুফর। হ্যাঁ, কেউ যদি বলে, 'কুরআন মাখলুক', কিন্তু কুরআন বলতে সে আল্লাহর চিরন্তন কালাম গুণকে উদ্দেশ্য না নেয়; বরং আমাদের সামনে কাগজ-কলম ও লিখিত অক্ষর-শব্দ ইত্যাদি উদ্দেশ্য নেয়, তবে সেটা কুফর হবে না।

---

৮২৮. দেখুন : তারিখে বাগদাদ (১৫/৫১৭)।

৮২৯. মিনহাজুস সুন্নাহ (২/১০৬)।

৮৩০. লিসানুল মিযান (২/১১৪)। এ বিষয়ে লিখিত সমকালীন একটি সুন্দর রিসালাহ হলো আমর আবদুল মুনইমকৃত 'ইমাম আবু হানিফা ওয়া নিসবাতুহু ইলাল কাওলি বিখালকিল কুরআন'। এতে তিনি ইমাম আজমের উপর অভিযোগমূলক সবগুলো বর্ণনার সনদ যাচাই করে সেগুলোর অসারতা প্রমাণ করেছেন।

আল্লাহর কালাম নিয়ে আহলে সুন্নাতের অভ্যন্তরীণ বিতর্ক

বিচ্যুতির ব্যাপারে ইমাম আজমের আগাম সতর্কবার্তা : পিছনের আলোচনাতে স্পষ্ট হয়েছে যে, ইমাম আজম রহ. এবং তার সঙ্গীরা কুরআনকে 'মাখলুক' বলবেন দূরের কথা, তারা কুরআন নিয়ে কোনো ধরনের বিতর্ক পছন্দ করতেন না। বরং আমরা এ ব্যাপারে ইমাম থেকে বর্ণিত আকিদাগুলো একরকম 'তাওয়াতুর' (সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রসিদ্ধ) আকারে পাই। ফলে তিনি বিভ্রান্তি খণ্ডনের জন্য কিছু কিছু জায়গাতে 'কুরআন মাখলুক নয়' কিংবা কাছাকাছি এ জাতীয় কিছু জরুরি বক্তব্য দিলেও অধিকাংশ জায়গাতে আমরা দেখব তিনি 'কুরআন আল্লাহর কালাম' বলেই থেমে যাচ্ছেন। এর বাইরে কথা বলছেন না। কালামের হাকিকত, রূপরেখা এগুলোর পিছনে পড়ছেন না। এগুলো নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কে জড়াচ্ছেন না। কারণ, এগুলো নিয়ে বিতর্ককে তিনি বিভ্রান্তি ও ধ্বংসের কারণ মনে করতেন।

আবু ইউসুফ রহ. বলেন, আমি আবু হানিফা রহ.-এর সাথে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমরা এক ব্যক্তিকে কুরআন নিয়ে বিতর্ক করতে দেখলাম। সে কুরআনের ব্যাপারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা বলছিল আর তার প্রতিপক্ষের সমালোচনা করছিল। ইমাম তাকে ডেকে বললেন, 'যদি তুমি এগুলো সওয়াবের কাজ মনে করো (তাহলে সেটা ভুল), কারণ এতে কোনো সওয়াব নেই। বরং তোমার কর্তব্য হলো সালাফের পথে হাঁটা। **আল্লাহকে নিয়ে কিংবা আল্লাহর সিফাতসমূহ নিয়ে বিতর্ক করো না। এগুলো বাদ দিয়ে অন্য কিছুতে মনোযোগ দাও।**'[৮৩১]

ইমাম আজমের ঘনিষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ শাগরেদ দাউদ আত-তাই রহ. বলেন, কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন, এর বাইরে কিছু বলা বৈধ নয়। আমি ইমাম আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, **'আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন কুরআন তাঁর কালাম। সুতরাং যে ব্যক্তি এটুকু আঁকড়ে ধরবে, সে মজবুত রজ্জু আঁকড়ে ধরল। এর পরে ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নেই।**'[৮৩২]

বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, ইমাম আজম রহ. আশংকা করছিলেন কুরআন নিয়ে বিতর্ক উম্মাহকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এ জন্য এ ব্যাপারে তিনি নিজে কথা বলতেন না এবং অন্যদেরও সতর্ক করতেন। ইবনে আবদিল বার আবু ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেন, এক জুমার দিন কুফার মসজিদে জনৈক ব্যক্তি এলো। সে

---

৮৩১. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৩৩)।

৮৩২. প্রাগুক্ত (১৩৫)।

মানুষকে কুরআন (মাখলুক কি না এ সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করতে লাগল। একপর্যায়ে আমাদেরও জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু ইমাম (আবু হানিফা) তখন মক্কায় ছিলেন। ফলে আমরা কোনো জবাব দিলাম না। তিনি যখন ফিরে এলেন, আমরা তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। লম্বা সময় নীরব থেকে বললেন, তোমরা কী জবাব দিয়েছ? আমরা বললাম, আমরা কিছুই বলিনি। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমার ওসিয়ত মনে রেখো : 'এ ব্যাপারে তোমরা কিছু বলবে না। এ ব্যাপারে কাউকে কখনো জিজ্ঞাসা করবে না। এতটুকুর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। এর বাইরে একটি অক্ষরও বলবে না। **আমার ধারণা, এই মাসআলা মুসলিম উম্মাহকে এক বিশাল মুসিবতের সাগরে ফেলার আগ পর্যন্ত থামবে না। আল্লাহ আমাকে এবং তোমাদের শয়তান থেকে রক্ষা করুন।**'[৮৩৩] সুবহানাল্লাহ! ইমামের দূরদর্শিতা দেখুন। তাঁর ফিরাসাত ও কারামতই পরবর্তীকালে বাস্তবায়িত হয়েছিল অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে। কারণ, পরবর্তী লোকেরা উক্ত ওসিয়তের উপর আমল করেনি।

ইমাম ও সালাফের এই আলোকিত পথেই হেঁটেছেন তাঁর অনুসারীরা। ফলে আমরা দেখি, আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কুরআন আল্লাহর কালাম। তাঁর ওহি এবং তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এটাই আবু হানিফা ও অন্যান্য ইমামের মাযহাব। তাদের কাছে কুরআন 'খালেক' কিংবা 'মাখলুক' কোনোটাই ছিল না।"[৮৩৪] হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন, 'কুফায় আমরা ইমাম আবু হানিফা,

---

৮৩৩. আল-ইনতিকা (৩১৭-৩১৮)।

৮৩৪. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৩৫)। কিন্তু এই বক্তব্যের মাধ্যমে আবার ভুল বোঝা যাবে না, যেমনটা কেউ কেউ বুঝেছেন। তারা ইমাম আজম ও তাঁর সঙ্গীদের 'ওয়াকিফা' ফিরকা (যারা কুরআনকে মাখলুক কিংবা মাখলুক নয় দুটোর একটাও বলত না) বানিয়ে দিয়েছেন। বাস্তবতা মোটেও তেমন নয়। কারণ, বিভিন্ন জায়গাতে সরাসরি ইমাম ও তাঁর শাগরিদরা জাহমিয়্যাহদের খণ্ডনে 'কুরআন আল্লাহর কালাম; মাখলুক নয়'—এ ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। ফলে উপরের বর্ণনা কুরআনকেন্দ্রিক বিতর্ক থেকে দূরে থাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; 'ওয়াকিফা'দের মাযহাব গ্রহণ নয়। এর প্রমাণ হানাফি উলামায়ে কেরাম কর্তৃক উক্ত মাযহাবের শক্ত সমালোচনা। আবু হাফস লিখেন, 'যে ব্যক্তি বলবে, কুরআন মাখলুক কি মাখলুক না আমি জানি না, তার কথা খ্রিষ্টানদের মতো।' [আস-সাওয়াদুল আজম : ১৭] মুহাম্মাদ ইবনুল ফজল বলখি লিখেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনকে ওহি বলে নীরব হয়ে যাবে, মাখলুক বা গাইরে মাখলুক কিছু বলবে না, সে কাররামিয়্যাহ অথবা জাহমিয়্যাহদের অন্তর্ভুক্ত।' [আল-ইতিকাদ : ১০০] মাইমুন নাসাফিও সুস্পষ্ট ভাষায় 'ওয়াকিফা'দের মাযহাব ভুল ও বাতিল আখ্যা দিয়েছেন। [তাবসিরাতুল আদিল্লাহ : ১/৪৪৮-৪৪৯] তবে এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, কোনো কোনো সালাফ থেকেও এ ধরনের মাযহাব প্রমাণিত। ফলে এটাকে তখন বাতিল বলা হবে, যখন জাহমিয়্যাহদের বিভ্রান্তির মুখে এ ব্যাপারে নীরব থেকে

যুফার, আবু ইউসুফসহ সকল শায়খকে বলতে শুনেছি : 'কুরআন আল্লাহর কালাম।' এর বাইরে তারা কিছু বলতেন না। এটাই ছিল আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা, হাজ্জাজ বিন আরতাআ ও ইবনে শুবরুমার বক্তব্য।[৮৩৫]

বরং আহলে সুন্নাতের আকিদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইমাম আবু জাফর তহাবি রহ. এ ধরনের বিতর্কের আগুন যখন দাউদাউ করে জ্বলছিল, সেই ক্রোধোন্মত্ত সময়ে জন্মেও আহলে সুন্নাতের নিজেদের এ বিতর্কে জড়াননি। তিনি আকিদাহ তহাবিয়্যাহর বিভিন্ন জায়গাতে আল্লাহর কালাম ও কুরআন নিয়ে আলোচনা করলেও 'কালামের সংজ্ঞায়ন', 'হাকিকত' নির্ধারণ এবং স্বরূপ বর্ণনা করতে যাননি। বরং মোটা দাগে কুরআন আল্লাহর কালাম—এটুকু বিশ্বাস করে এ ব্যাপারে যেকোনো বিতর্ক করতে নিষেধ করেছেন। তিনি লিখেন, "আমরা কুরআন নিয়ে বিতর্ক করি না। বরং সাক্ষ্য দিই এটা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কথা। ফেরেশতা জিবরিল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি রাসুলদের নেতা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে এটা শিখিয়েছেন। এটা আল্লাহর কথা। সৃষ্টির কথার সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য নেই। আমরা 'কুরআন সৃষ্ট' এমন কথা বলি না। আমরা মুসলিম জামাতের বিরোধিতা করি না।"[৮৩৬]

কিন্তু পরবর্তী আলেমরা পূর্ববর্তী আলেমগণের এই নীতি মানেননি। তারা নিজেদের মতো করে বিতর্ক অব্যাহত রাখেন। জাহমিয়্যাহদের বাদ দিয়ে খোদ নিজেরা কুরআন ও আল্লাহর 'কালাম'-কেন্দ্রিক বিভিন্ন রকমের নতুন মতবিরোধ আবিষ্কার করেন। কুরআন 'আল্লাহর কালাম বলতে কী বোঝায়', 'কুরআন আল্লাহর হাকিকি কালাম কি না', 'আল্লাহ অক্ষর ও আওয়াজসহ কথা বলেন', অথবা 'অক্ষর ও আওয়াজসহ কথা নয়; বরং কালামে নফসি বা আত্মকথা'—এসব বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় তৃতীয়

তাদের বিভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেবে, খণ্ডন না করবে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কায় এ ব্যাপারে আলোচনা থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে যদি নীরব থাকে, তবে তাকে গোমরাহ আখ্যা দেওয়া যাবে না, যেমনটা এই অভিযোগে কেউ কেউ মুহাম্মাদ ইবনে শুজা'কে দোষারোপ করেছেন। অথচ তিনি এর ঊর্ধ্বে। তাকে দোষারোপ করতে হলে ইমাম আজম ও যুফার-সহ অনেককেই করতে হবে। কিন্তু তারা এ অভিযোগ থেকে পবিত্র। তারা কুরআন নিয়ে বিতর্ক করতে নিষেধ করতেন। 'ওয়াকিফা' মতাদর্শের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।

৮৩৫. আল-ই'তিকাদ, নিশাপুরি (১৩৭)।

৮৩৬. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১২-১৩)।

হিজরিতে। একদিকে আহলে সুন্নাত ও মুতাযিলাদের মাঝে সংঘর্ষ বাধে, আরেকদিকে খোদ আহলে সুন্নাতের মুহাদ্দিস ও ফকিহরা জড়িয়ে পড়েন এক ভ্রাতৃঘাতী আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে। একজন আরেকজনকে কাফের বলতে থাকেন, ফাসেক বলতে থাকেন; বর্জন করতে থাকেন, বয়কটের ডাক দেন। এতে নিজেদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দারুণভাবে ছিন্ন হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ। বরং ইমাম আজম যিনি কুরআন নিয়ে বিতর্ক করতে সবসময় নিষেধ করতেন, বিনা দোষে শতাব্দের পর শতাব্দ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন।[৮৩৭]

আরও দুঃখজনক কথা হলো, সেই বিতর্ক কখনোই থামেনি। ভ্রান্ত মুতাযিলাদের পতনের পর কুরআন নিয়ে বিতর্ক যেখানে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরকার ছিল, একদল আলেম সেটা হতে দেননি। ফলে উম্মাহ বারবার কাফের-মুশরিকদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা কুরআনকেন্দ্রিক অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন বিতর্ক ছাড়েননি। উম্মাহ চরম নির্যাতিত, নিপীড়িত থাকা অবস্থায়ও যুগে যুগে তারা কুরআন নিয়ে নফল বরং নিষিদ্ধ বিতর্ক করেছেন, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আজও চলমান।

মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামগণ এবং আমাদের সালাফ যেগুলো নিয়ে কথা বলা থেকে বারবার সতর্ক করেছেন, বন্দি ও বেত্রাঘাত করার হুমকি দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে উম্মাহ ক্ষতি ছাড়া কোনোভাবে উপকৃত হয়নি, যেগুলো কোনো মুসলিমের দ্বীন ও দুনিয়া কোথাও কাজে লাগবে না, সেসব ব্যাপারে কথা বলা আমাদের মোটেই পছন্দ নয়। ফলে আকিদাহ তহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যাতে এ বিষয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করিনি, এখানেও করব না। তবে বিষয়টি নিয়ে যেহেতু অদ্যাবধি বিতর্ক চলমান এবং এক্ষেত্রে প্রত্যেক দলই সালাফের অনুসরণের দাবিদার, নিজেদের ইমাম আজমসহ সালাফে সালেহিনের আকিদার প্রতিনিধি দাবিদার এবং এটা নিয়ে আজও উম্মাহর দূরত্ব বেড়ে চলেছে, ফলে সংক্ষিপ্ত হলেও নসিহত হিসেবে এ ব্যাপারে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি।

বিতর্কের রূপরেখা: প্রথম কথা হলো—কুরআনকেন্দ্রিক বিতর্ক মূলত আল্লাহর 'কালাম' সিফাতকেন্দ্রিক বিতর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, **(এক.)** আল্লাহর 'কালাম'-এর অর্থ ও রূপরেখা কী? **(দুই.)** আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে কথা বলেছেন-এর রূপরেখা কী? **(তিন.)** আমাদের সামনে বিদ্যমান

৮৩৭. উদাহরণ দেখুন : খতিবে বাগদাদির 'তারিখে বাগদাদ' গ্রন্থে। সেসব বর্ণনার বাস্তবতা দেখুন আল্লামা কাওসারির 'তানিবুল খতিব' গ্রন্থে।

'কুরআন'-এর রূপরেখা কী? এই সবগুলো বিষয়কে কেন্দ্র করেই উম্মাহর মাঝে মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। ফলে এটা একটা জটিল, কুটিল, বিস্তৃত মতপার্থক্য। উম্মাহর অসংখ্য ফিরকা এগুলো নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও ইজতিহাদ অনুযায়ী কথা বলেছে। আমরা এখানে সেগুলো আলোচনা করতে যাব না। যেহেতু এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর আকিদা, তাই আমরা এ ব্যাপারে কেবল হানাফি আলেমগণ এবং আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত তাদের বিপরীত ধারার বক্তব্যগুলো দেখব। শেষে ইমাম আজম রহ.-এর বক্তব্যের আলোকে সবগুলো মূল্যায়নের চেষ্টা করব।

হানাফি ধারার বাইরের মত : হানাফি ধারার বাইরে এক্ষেত্রে একাধিক বক্তব্য রয়েছে। সেগুলোর কিছু ধারার বক্তব্য হানাফিদের বক্তব্যের সঙ্গে মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক নয়। ফলে এখানে সেগুলোর উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন। আমরা এখানে কেবল তাদের কথা উল্লেখ করব, যাদের বক্তব্য মৌলিকভাবেই হানাফিদের বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং যারা হানাফিদের বক্তব্যকে বিভ্রান্ত মনে করেন। এ ধারার বক্তব্য হলো :

(এক.) আল্লাহ যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা কথা বলেন। তিনি অক্ষর ও আওয়াজসহ কথা বলেন। অর্থাৎ, তিনি কথা বললে আওয়াজ হয় এবং সেটা শোনা যায়। তাঁর মূল কালাম কদিম তথা চিরন্তন। কিন্তু কথা বলার সময় বিশেষ আওয়াজটি কদিম হওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাদের মতে, অক্ষর ও আওয়াজ ছাড়া কোনো কথা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং আল্লাহ এগুলোসহ কথা বলেন।[৮৩৮]

(দুই.) ফলে আল্লাহ যখন মুসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তখন অক্ষর ও আওয়াজসহ কথা বলেছিলেন। । কারণ, অক্ষর ও আওয়াজ ছাড়া কথা হয় না, অক্ষর ও আওয়াজ ছাড়া ডাক দেওয়া যায় না, অক্ষর ও আওয়াজ ছাড়া মানুষ কথা শুনতে পায় না। মুসা আলাইহিস সালামকে যেহেতু আল্লাহ ডাক দেওয়ার কথা বলেছেন [মারইয়াম : ৫২] মুসা আলাইহিস সালাম যেহেতু তাঁর কথা শুনেছেন, সুতরাং আল্লাহ তাঁর সঙ্গে অক্ষর ও আওয়াজসহ কথা বলেছেন। অক্ষর ও আওয়াজ না থাকলে মুসা সে কথা শুনতে পেতেন না।

(তিন.) আমাদের সামনে বিদ্যমান কুরআন শব্দ ও অর্থসহ আল্লাহর কালাম। শব্দ ছাড়া অর্থ আল্লাহর কালাম নয়, আবার অর্থ ছাড়া শব্দ আল্লাহর কালাম নয়;

---

৮৩৮. শরহুল আকিদাহ তহাবিয়্যাহ, ইবনে আবিল ইয (১২৯)।

বরং শব্দ ও অর্থ দুটোই আল্লাহর কালাম। বরং তাদের কেউ কেউ আরও আগে বেড়ে কুরআনের মাঝে লিখিত অক্ষরগুলো এবং মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত শব্দগুলোকেও 'হুবহু আল্লাহর কালাম' বলেন। সুতরাং যদি কেউ কুরআনের মাঝে লিখিত অক্ষরগুলো আল্লাহর কালাম না বলে, তাকে কাফের সাব্যস্ত করেন।[৮৩৯]

হানাফি আলেমদের মত : হানাফি আলেমগণ উপরের বক্তব্যগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। তারা এসব বক্তব্যকে বিভ্রান্তিকর মনে করেন। তাদের বক্তব্য হলো :

(এক.) আল্লাহর কালাম তাঁর সত্তার সঙ্গে বিদ্যমান একটি অর্থ বা গুণ (صفة/معنى قائم بذات الله)। এটাকে কখনো কখনো 'আত্মকথা' (الكلام النفسي) বলা হয়। শব্দ, অক্ষর ও আওয়াজের সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা নেই। শব্দ, অক্ষর ও আওয়াজ নবসৃষ্ট। এগুলো আল্লাহর কালামের অংশ নয়; আল্লাহর কালামের উপর নির্দেশক শ্রেফ।[৮৪০] আবুল লাইস সমরকন্দি বলেন, 'আল্লাহর কালাম তাঁর সিফাত। কিন্তু অক্ষর, সুর ও আওয়াজ ইত্যাদি সবকিছু মাখলুক তথা সৃষ্টি। অথচ আল্লাহর সিফাত তাঁর সৃষ্টি হতে পারে না। এ কারণে আল্লাহর কালামের কোনো আওয়াজ, সুর, অক্ষর ও স্বর নেই। এটাই সমরকন্দের মাশায়েখের মত।'[৮৪১] সাফফার বুখারি বলেন, "আল্লাহর কালাম 'অক্ষর ও আওয়াজ' নয়; বরং ধরনহীন।"[৮৪২]

আবু ইউসর বাযদাবি (৪৯৩ হি.) বলেন, 'আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো—আল্লাহ তায়ালা তাঁর কদিম কালাম দ্বারা কথা বলেন। তাঁর সকল সিফাত যেমন কদিম, কালামও কদিম। কাররামিয়্যাহদের মতে, আল্লাহর কালাম অক্ষর ও আওয়াজের সমন্বয়ে তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান। এটা ভ্রান্ত বক্তব্য।'[৮৪৩] কাযি ইসমাইল

---

৮৩৯. কাতফুস সামার ফি বায়ানি আকিদাতি আহলিল আসার (৭৪)।

৮৪০. দেখুন : তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/৪৬৫-৪৬৬)। আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ (১২০)। আল-বিদায়াহ মিনাল কিফায়াহ (৬১)। আল-আকিদাহ রুকনিয়্যাহ (১৪)। লুবাবুল কালাম (পাণ্ডুলিপি : ৫০)। উসুলুদ্দিন, গযনবি (১০২)। আত-তামহিদ, লামিশি (৭১)। শরহুল আকায়েদ, তাফতাযানি (১৫৪)। শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (২৪)। শরহুল ওয়াসিয়্যাহ, মুফতি যাদাহ (১১৩)। জামেউল মুতুন (১১)। মাকালাত, কাওসারি (৪৪)।

৮৪১. শরহুল ফিকহিল আকবার, সমরকন্দি (৩৫)।

৮৪২. তালবিসুল আদিল্লাহ (১৫৬)।

৮৪৩. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (৬২-৬৪)।

শাইবানি (৬২৯ হি.) আকিদাহ তহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যায় বলেন, "আল্লাহর কালামের উপর 'অক্ষর' ও 'আওয়াজ' প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা, অক্ষর ও আওয়াজ আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষের প্রয়োজনে মানুষের ভাবের আদান-প্রদানের জন্য তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। অথচ আল্লাহ সব ধরনের প্রয়োজন থেকে অমুখাপেক্ষী।"[৮৪৪] খাব্বাযি (৬৯২ হি.) বলেন, 'আল্লাহর কালাম অক্ষর ও আওয়াজজাতীয় নয়। মুতাযিলাদের মতে, এটা অক্ষর ও আওয়াজজাতীয়।'[৮৪৫]

মাইমুন নাসাফি বলেন, 'আল্লাহর কালাম কদিম, নবসৃষ্ট নয়। অক্ষর ও আওয়াজ ছাড়া। তিনি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে সেটা অক্ষর ও আওয়াজ দিয়ে শুনিয়েছেন! অর্থাৎ, তিনি আওয়াজ সৃষ্টি করেছেন, জিবরাইল সেই আওয়াজ ও অক্ষর মুখস্থ করেছেন এবং নবিজির কাছে অবতীর্ণ করেছেন।'[৮৪৬] নাসাফি তাঁর 'তামহিদ' গ্রন্থে বলেন, 'কালাম আল্লাহর চিরন্তন সিফাত। অক্ষর ও আওয়াজ নয়।'[৮৪৭]

আবদুল্লাহ নাসাফি তাঁর 'উমদাহ'-তে লিখেন, 'আল্লাহর কালাম এক, অবিনশ্বর। তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান। অক্ষর ও আওয়াজজাতীয় নয়।'[(৮৪৮)] নাসাফি তাঁর 'ইতিমাদ' গ্রন্থেও লিখেন, 'আল্লাহর কালাম এক ও অবিনশ্বর। এটা তাঁর সত্তার সঙ্গে বিদ্যমান গুণ। অক্ষর ও আওয়াজজাতীয় নয়।'[৮৪৯] নুরুদ্দিন সাবুনি বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার কালাম চিরন্তন, চিরস্থায়ী। ...এটা অক্ষর ও আওয়াজজাতীয় নয়।'[৮৫০] কামাল ইবনুল হুমাম লিখেন, 'আল্লাহ কদিম তথা চিরন্তন কথার মাধ্যমে কথা বলেন। এটা অক্ষর ও আওয়াজজাতীয় নয়।'[৮৫১]

শামসুদ্দিন সমরকন্দি আল্লাহর কালাম সম্পর্কে বিভিন্ন ধারার বক্তব্য খণ্ডনের পর লিখেন, "হক কথা হলো, আল্লাহর কালাম 'আত্মকথা' (কালামে

---

৮৪৪. শরহুল আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১৭)।

৮৪৫. আল-হাদি ফি উসুলিদ্দিন (৯২)।

৮৪৬. বাহরুল কালাম (১৩০)।

৮৪৭. আত-তামহিদ ফি উসুলিদ্দিন (৪৪)।

৮৪৮. উমদাতু আকিদাতি আহলিস সুন্নাহ (৭)।

৮৪৯. আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (১৮৩)।

৮৫০. আর-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ (১১৩)। আল-বিদায়াহ মিনাল কিফায়াহ (৬০)।

৮৫১. আল-মুসায়ারাহ (৩২)।

নফসি)।"[৮৫২] হুসাইন ইবনে ইসকান্দার হানাফি লিখেন, 'আল্লাহর কালাম তাঁর সত্তার সঙ্গে বিদ্যমান একটি অর্থ (বৈশিষ্ট্য)। অক্ষর কিংবা আওয়াজ নয় (كلام الله تعالى معنى قائم بذاته، ليس بحرف ولا صوت)। কেননা অক্ষর ও আওয়াজ মাখলুক। আল্লাহর কালাম মাখলুক নয়। তা ছাড়া, অক্ষর ও আওয়াজ হাদেস (নবসৃষ্ট)। আল্লাহর সত্তার সঙ্গে কোনো নবসৃষ্ট বিষয় সম্পৃক্ত হতে পারে না। সুতরাং আল্লাহর কালাম অক্ষর ও আওয়াজসহ হতে পারে না।'[৮৫৩] মোল্লা আলি কারি লিখেন, "কালাম আল্লাহ তায়ালার সত্তাগত সিফাত। এটাকে 'কালামে নফসি' (আত্মকথা) বলা হয়। অক্ষর ও আওয়াজ থেকে মুক্ত। আল্লাহ তায়ালা যখন আদেশ ও নিষেধ করেন, তখন তাঁর মাঝে নতুন কোনো গুণের অস্তিত্ব আসে না, বরং চিরন্তন 'কালাম' গুণের মাধ্যমে করেন। ফলে অক্ষর ও আওয়াজসহ তৈরি শাব্দিক ও নবসৃষ্ট কথা (الكلام اللفظي الحادث) আল্লাহর কালাম হতে পারে না।"[৮৫৪] কওনভি বলেন, 'আল্লাহর কালামকে অক্ষর ও আওয়াজ বলা বাতিল।'[৮৫৫]

(দুই.) শব্দ, অক্ষর ও আওয়াজ যেহেতু আল্লাহর কালামের অংশ নয়, এ জন্য তারা মুসার সঙ্গে আল্লাহর কালামকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। তারা বলেন, আল্লাহ যখন মুসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তখন তাঁর শাশ্বত কালাম গুণের মাধ্যমে কথা বলেছিলেন। আর তাঁর শাশ্বত কালাম অক্ষর ও আওয়াজের প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। তাঁর সিফাত পরিবর্তনশীল নয়। সুতরাং মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে তাঁর কথাও অক্ষর ও আওয়াজবিহীন চিরন্তন সিফাত ছিল।[৮৫৬] প্রশ্ন হতে পারে, যদি আল্লাহর কালামের অক্ষর ও আওয়াজ না-ই থাকে, তবে মুসা আলাইহিস সালাম আসলে শুনলেনটা কী? কারণ, মানুষ তো অক্ষর ও আওয়াজ ছাড়া কিছু শুনতে পায় না।

এটা নিয়ে খোদ হানাফি আলেমগণ মতবিরোধ করেছেন। আবু মনসুর মাতুরিদি বলেন, "আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর সৃষ্টি করা অক্ষর ও আওয়াজ শুনিয়েছেন। অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর 'গাইরে মাখলুক' কথাই শুনেছেন। কিন্তু

৮৫২. আস-সাহায়িফুল ইলাহিয়্যাহ (৩৫৪)।
৮৫৩. আল-জাওহারাতুল মুনিফাহ (৬৫-৬৬)।
৮৫৪. শরহুল ফিকহিল আকবার (১৬)।
৮৫৫. আল-কালাইদ (৫৫)।
৮৫৬. দেখুন : তাফসিরে মাতুরিদি (৩/৪২০)।

উপকরণ ভিন্ন ছিল” أسمعه بلسان موسى وبحروف خلقها وصوت أنشأه، فهو أسمعه ما ليس (بمخلوق)।[৮৫৭] তাফতাযানি এর ব্যাখ্যায় বলেন, ‘শায়খ আবু মনসুর মাতুরিদির মতে, আল্লাহর কালাম শোনা যায় না। সুতরাং তিনি আল্লাহর কালামের নির্দেশক আওয়াজ শুনেছেন।’[৮৫৮] মুফতি যাদাহ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ‘তিনি আল্লাহর কালামের নির্দেশক কথা শুনেছেন।’[৮৫৯] মোল্লা আলি কারি বলেন, ‘আল্লাহ যখন মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে কথা বলেছেন, এমন নয় যে, মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে অক্ষর ও আওয়াজসহ কথা বলতে শুনেছেন। বরং তিনি একটি আওয়াজ শুনেছেন যা তাঁর কথার নির্দেশক ছিল।’[৮৬০] আহমদ গযনবি লিখেন, ‘আল্লাহর কালাম শোনা যায় না।’[৮৬১] সাবুনি বলেন, “শায়খ আবু মনসুর ‘তাবিলাত’-এ লিখেছেন, ‘মুসা আলাইহিস সালাম একটি আওয়াজ শুনেছেন যা আল্লাহর কালামের নির্দেশক ছিল; প্রকৃত কালাম নয়’ (سمع صوتا دالا على كلام الله لا نفس الكلام)।”[৮৬২] মাইমুন নাসাফি বলেন, ‘আল্লাহর কালাম অক্ষর ও আওয়াজবিহীন। তিনি জিবরাইলকে সেটা অক্ষর ও আওয়াজের মাধ্যমে শোনান। এভাবে যে, তিনি আওয়াজ সৃষ্টি করেন, জিবরিল সেই আওয়াজ ও অক্ষরের মাধ্যমে শোনেন।’[৮৬৩] মাইমুন নাসাফি অন্যত্র লিখেন, ‘আল্লাহর কালাম কোনোভাবে শোনা যায় না। কারণ, সেটা অক্ষর ও আওয়াজ নয়। তাই মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কালামের উপর নির্দেশক অক্ষর ও আওয়াজ শুনেছেন! আল্লাহ তায়ালা তাকে নিজ কালাম শোনানোর জন্য সেই আওয়াজ সৃষ্টি করেছেন।’[৮৬৪] কওনভি মাতুরিদির উদ্ধৃতিতে লিখেছেন, ‘মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কালামের নির্দেশক আওয়াজ শুনেছেন।’[৮৬৫]

---

৮৫৭. আত-তাওহিদ (৪৭)।

৮৫৮. শরহুল আকায়েদ, তাফতাযানি (১৬৭)।

৮৫৯. শরহুল ওয়াসিয়্যাহ, মুফতি যাদাহ (১২৪)।

৮৬০. শরহুল ফিকহিল আকবার (২৫)।

৮৬১. উসুলুদ্দিন, গযনবি (১০৫)।

৮৬২. আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ (১৩৩-১৩৫)।

৮৬৩. বাহরুল কালাম (১৩০)।

৮৬৪. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১/৪৮৯)।

৮৬৫. আল-কালাইদ ফি শরহিল আকাইদ (৫৭)।

বিপরীতে আবুল ইউসর বাযদাবি বলেন, 'কালাম আল্লাহ তায়ালার সত্তাগত গুণ। ফলে অন্য কোথাও তিনি কালাম সৃষ্টি করে সেটা দিয়ে কথা বলবেন—এটা বৈধ নয়।'[৮৬৬] আবু ইসহাক সাফফার বলেন, 'আল্লাহর কালামকে এভাবে তাবিল করা বৈধ নয় যে, তিনি কথা ও আওয়াজ সৃষ্টি করে সেটা মুসার কানে ঢেলে দিয়েছেন, যেমনটা কিছু লোক মনে করে! কেননা, মুসার সঙ্গে তাঁর কথা বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা। আর সেটা এ পদ্ধতিতে অবশিষ্ট থাকে না। মুসা আলাইহিস সালামের তখন মাধ্যম ও দোভাষী ছাড়া আল্লাহর কালাম শোনা হয় না।'[৮৬৭] মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখি বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে হাকিকি (বাস্তব অর্থেই) কথা বলেছেন, রূপকভাবে নয়।'[৮৬৮] রুকনুদ্দিন সমরকন্দি বলেন, 'আবুল লাইস, আবু ইয়াহইয়াসহ অনেকের মত হলো, আল্লাহর কালাম হাকিকিভাবেই শোনা যায়। আল্লাহ সেটা করতে সক্ষম।'[৮৬৯]

এভাবে তাদের বক্তব্য খোদ ইমাম মাতুরিদি এবং প্রথম ধারার হানাফি আলেমদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সামগ্রিকভাবে একই ধারার অনুসারী সত্ত্বেও এমন অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল কারণ আল্লাহর কালামের 'কাইফিয়্যাত' (রূপরেখা ও ধরন) অনুসন্ধান, যা তাদের সকলের মতেই নিষিদ্ধ।

(তিন.) এটা নিয়েও হানাফি আলেমগণ নিজেরা অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের শিকার হয়েছেন। বিশেষত সমরকন্দ ও বুখারার ধারাকেন্দ্রিক এই মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। সমরকন্দের অধিকাংশ আলেমের মতে, আমাদের সামনে বিদ্যমান মুসহাফের লেখাগুলো মূলত আল্লাহর সত্তার সঙ্গে বিদ্যমান অর্থের উপর নির্দেশক কিছু শব্দ (الألفاظ الدالة على المعنى القائم بالذات)। আল্লাহ যেমন সৃষ্টির মাঝে বিদ্যমান নন; তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান সেই অর্থ (বা বৈশিষ্ট্যও) মানুষের সৃষ্টিকৃত উপকরণের মাঝে বিদ্যমান নেই।[৮৭০] মাতুরিদি বলেন, 'আল্লাহর হাকিকি কালাম কোনো গ্রন্থ বা বুক ধারণ করতে পারে না। ফলে মুসহাফে যেটা লেখা আছে সেটা আল্লাহর কালামের অর্থ অথবা আল্লাহর কালাম সম্পর্কে বিবরণ' (حكاية عن/ ما يفهم به ذلك

---

৮৬৬. উসুলুদ্দিন (৬৬)।

৮৬৭. তালখিসুল আদিল্লাহ (৭৪৮)।

৮৬৮. আল-ইতিকাদ (১১৩)।

৮৬৯. আল-আকিদাহ রুকনিয়্যাহ (১৫)।

৮৭০. দেখুন : আল-জাওহারাতুল মুনিফাহ (৬৫-৬৬)। মুখতাসারুল ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ, কাওকজী (১৫)।

ذلك)।[৮৭১] বাযদাবি বলেন, ‘অক্ষর মাখলুক। সুতরাং এটা আল্লাহর কালাম নয়। বরং আমাদের সামনে বিদ্যমান ছন্দ আল্লাহর কালামের নির্দেশক। একইভাবে আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত হয় কালামের উপর নির্দেশক ছন্দ তেলাওয়াতের মাধ্যমে। কুরআন হিফজ করা হয় আল্লাহর কালামের উপর নির্দেশক ছন্দ হিফজ করার মাধ্যমে। এ কারণেই আল্লাহর কালামের তেলাওয়াত কিংবা আল্লাহর কালামের হাফেজ বলা সঠিক।’[৮৭২] সাফফার বলেন, ‘যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে বা লিখবে অথবা শুনবে, সে মূলত অক্ষরের পাঠ, শ্রবণ ও লেখাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহর কালামের শ্রোতা, পাঠক ও লেখক বিবেচিত হবে। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা লাওহে মাহফুজে তাঁর কালামকে অক্ষর (الحروف المعجمة) দ্বারা লিখেছেন। এসব অক্ষরের সমন্বয়ে ‘অর্থ’ গঠিত হয়। অক্ষরগুলো মাধ্যম (আল্লাহর কালাম নয়); অর্থটা আল্লাহর কালাম (حروف دالة على المعنى، وذلك المعنى كلام الله)। ...সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে, তাঁর পড়াটা অক্ষর ও আওয়াজের সমন্বয়ে হবে। কিন্তু পঠিত বস্তুটা আল্লাহর কালাম।’[৮৭৩]

মোটকথা, তাদের কাছে আমাদের সামনে বিদ্যমান কুরআনের অর্থটা (المعنى) আল্লাহর কালাম; শব্দ, অক্ষর, আওয়াজ কোনোকিছুই আল্লাহ কালাম নয়। সাফফার অন্যত্র লিখেন, “যখন বলা হবে, ‘কুরআন আল্লাহর কালাম গাইরে মাখলুক’, তখন অর্থ উদ্দেশ্য। কেননা, অক্ষর আল্লাহর কালাম নয়। বরং আল্লাহর কালামকে ছন্দবন্ধকারী। আল্লাহ তায়ালা এই অক্ষরগুলোর মাঝে তাঁর কালামকে দিয়েছেন ধরনহীনভাবে। এর অর্থ এই নয় যে, এসব অক্ষর, শব্দ, আওয়াজ আল্লাহর প্রকৃত কালাম।”[৮৭৪]

কাসানি লিখেন, ‘আল্লাহর তায়ালার কালাম অক্ষর ও আওয়াজ নয়। অক্ষর ও আওয়াজ কেবল তাঁর কালামের বর্ণনা (ইবারত) এবং সেটার নির্দেশক। অক্ষর ও আওয়াজ নবসৃষ্ট। বিপরীতে আল্লাহর কালাম সৃষ্ট নয়। ফলে আমরা যখন মুখে কুরআন পড়ি, আমাদের পড়াটা আল্লাহর কালামের নির্দেশক। আমরা যখন

---

৮৭১. তাফসিরে মাতুরিদি (৭/১০৭)।

৮৭২. উসুলুদ্দিন (৭১)।

৮৭৩. তালবিসুল আদিল্লাহ (১৫৭-১৫৮)।

৮৭৪. তালবিসুল আদিল্লাহ (৭৭০)। দেখুন : আত-তামহিদ, নাসাফি (৪৪-৪৬)। আরও দেখুন : শরহুল ওয়াসিয়্যাহ, মুফতি বাদাহ (১২২)।

কুরআন লিখি, আমাদের লেখাটা আল্লাহর কালামের নির্দেশক। আমাদের পড়া কিংবা লেখাটাই মূল কালাম এমন নয়।’[৮৭৫] ইবনুল আলা দেহলভি লিখেন, ‘কুরআন আল্লাহর কালাম, গাইরে মাখলুক। কিন্তু মুসহাফের মাঝে লিখিতটা আল্লাহর কালামের নির্দেশক (প্রকৃত কালাম নয়), ফলে এটা মাখলুক।’[৮৭৬] সাবুনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, ‘কুরআন বলতে কখনো পঠিত বিষয়টা বোঝানো হয়, কখনো পড়াটাকে বোঝানো হয়, আবার কখনো লিখিত বস্তুটাকে বোঝানো হয়। সুতরাং কুরআন বলতে যদি পঠিত বিষয়টা বোঝানো হয়, তখন সেটা গাইরে মাখলুক। আর যদি কুরআন বলতে পড়া কিংবা লেখার অক্ষর বোঝানো হয়, সেটা মাখলুক। সেটা আল্লাহর হাকিকি কালাম নয়; বরং কালামের উপর নির্দেশক। হাম্বলিরা কুরআনের অক্ষরকে, মুসহাফের মাঝে লিখিত রূপকে গাইরে মাখলুক মনে করে। এটা স্পষ্ট বাতিল বক্তব্য।’[৮৭৭] রুকনুদ্দিন সমরকন্দি একইভাবে বলেন, ‘হাম্বলিরা মুসহাফের মাঝে লিখিত রূপকে হাকিকি (প্রকৃত) কালাম বলে। এটা স্পষ্ট ভ্রান্ত কথা। কারণ, কাগজ ও কালি না থাকলে এই অক্ষরের অস্তিত্ব থাকে না। অথচ আল্লাহর কালাম সদা বিদ্যমান। এগুলো সৃষ্টির মাঝে অবস্থান করে না। ফলে বোঝা গেল, কাগজ ও কালির মাঝে মূল কালাম বিদ্যমান নয় (বরং অর্থ বিদ্যমান)। মুতাযিলারাও এই পঠিত ও লিখিত বস্তুকে আল্লাহর কালাম বলে এবং এর ভিত্তিতে আল্লাহর কালামের চিরন্তনতাকে নাকচ করে তারা আল্লাহর কুরআনকে মাখলুক বলে।’[৮৭৮]

কিন্তু আমরা দেখব কেবল হাম্বলিরা নয়; হানাফিদের মাঝে মাশায়েখে বুখারা, বলখ ও ফারগানার মতামত অনেকটা ‘হাম্বলি’ মতের অনুরূপ, সমরকন্দিদের বিপরীত। অর্থাৎ, তাদের মতে, আমাদের সামনে বিদ্যমান কুরআনটাই আল্লাহর প্রকৃত কালাম। যেমন—আবু হাফস বুখারি লিখেন, ‘মুসহাফের মাঝে যা লেখা আছে সেটা হাকিকি কুরআন। বাচ্চারা ফলকে যা লেখে সেটা কুরআন।’ আবু হাফসের কথায় স্পষ্ট যে, তিনি লিখিত রূপটাকেই প্রকৃত কুরআন তথা আল্লাহর কালাম বলেন; অর্থ বা নির্দেশক বলেন না। বরং তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন,

৮৭৫. আল-মুতামাদ ফিল মুতাকাদ (৭-৮)।
৮৭৬. ফাতাওয়া তাতারখানিয়্যাহ (১৮/৫)।
৮৭৭. আল-বিদায়াহ মিনাল কিফায়াহ (৬২-৬৩)।
৮৭৮. দেখুন : আল-আকিদাহ আর রুকনিয়্যাহ (১৪)।

'আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে কিতাব বলেছেন। কিতাব বলা হয় লিখিত রূপকে। সুতরাং লিখিত রূপটাই কুরআন। একইভাবে আল্লাহ কুরআন পড়ার সময় শুনতে বলেছেন। সুতরাং কেউ যখন কুরআন পড়ে এবং আমরা শুনি সেটাই আল্লাহর হাকিকি কালাম' [অর্থ নয়]।[৮৭৯] এ বক্তব্যের সঙ্গে উপরের বক্তব্যগুলোর সংঘাত সুস্পষ্ট। এ কারণে 'আস-সাওয়াদুল আজম'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'সালামুল আহকাম' লেখক সমরকন্দি ধারার আলেম ইবরাহিম হুলমি কিছুটা গোসা করে বলেন, 'এখানে গ্রন্থকারের বক্তব্য ভুল! কারণ 'আল্লাহর কালাম মাখলুক' বলতে শাব্দিক কালাম উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থের দিকে লক্ষ করে 'আত্মকথা' (কালামে নফসি) উদ্দেশ্য। এটাই সঠিক মাযহাব। অন্য কোনো বক্তব্য সঠিক নয়...। গ্রন্থকার এই বক্তব্য হাম্বলিদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। ...কিন্তু এটা সঠিক বক্তব্য নয়। সঠিক হলো যা আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং অন্তর্চক্ষুসম্পন্ন হলে সেটা গ্রহণ করুন। না হলে খান বা ঘুমান।[৮৮০]

সমরকন্দি ধারার বিপক্ষে মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল আল-বলখি (৪১৯ হি.) এর বক্তব্য আরও শক্ত। তিনি বলেন, 'মুসহাফের মাঝে যা লেখা আছে সেটা কুরআন। আমাদের বুকে যা সংরক্ষিত, মুখে যা পঠিত, কানে যা শ্রুত হয়—সব কুরআন। যে ব্যক্তি এগুলোকে কুরআন না বলে কুরআন সম্পর্কে বিবরণ (حكاية القرآن) বলবে, সে অভিশপ্ত কাররামি।'[৮৮১] আবুল আব্বাস নাতেফি (৪৪৬ হি.) লিখেন, 'মোটকথা, পঠিত বস্তু ও লিখিত অক্ষর সবগুলোই আমাদের ফকিহদের কাছে কুরআন।'[৮৮২]

ইমাম আজমের মাযহাব : প্রথমেই যেটা আমরা বলেছিলাম, এ ব্যাপারে ইমাম আজম রহ.-এর সরাসরি কোনো বক্তব্য নেই, তাঁর ছাত্রদেরও বক্তব্য নেই। কারণ, এসব বিষয়ে তিনি কথা বলা পছন্দ করতেন না। আবু ইউসুফ রহ. বর্ণনা করেন, 'আমরা আবু হানিফা রহ.-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় একদল লোক দুই ব্যক্তিকে নিয়ে এলো। এসে বলল, এই ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলে। আর দ্বিতীয় জন তাকে নিষেধ করে বলে, কুরআন মাখলুক নয়। (আমরা তাদের

---

৮৭৯. আস-সাওয়াদুল আজম (৩৩-৩৫)।

৮৮০. সালামুল আহকাম আলা সাওয়াদিল আজম (১৩৯)।

৮৮১. আল-ইতিকাদ, বলখি (১০৫)।

৮৮২. আল-আজনাস (১/৪৪৩)।

ব্যাপারে কী করব?) ইমাম বললেন, 'তাদের কারও পিছনে নামায পড়ো না।' আমি বললাম, প্রথম জনের ব্যাপার তো স্পষ্ট। কারণ, সে কুরআনকে মাখলুক বলে। কিন্তু দ্বিতীয় জনের পিছনে নামায বাদ দেওয়ার কারণ কী? তার কথা তো ঠিকই আছে! ইমাম বললেন, **'কারণ, তারা দ্বীন নিয়ে বিবাদ করেছে। অথচ দ্বীন নিয়ে বিবাদ বিদআত।'**[৮৮৩] হাসান ইবনে আবি মালিক বলেন, আমি আবু ইউসুফ রহ.-কে বলতে শুনেছি, **"কুরআন আল্লাহর কালাম। যদি কেউ বলে, 'কীভাবে' কিংবা 'কেন', অথবা এটা নিয়ে বিতর্ক করে, তাকে বন্দি করা হবে। ভালো করে বেত্রাঘাত করা হবে।"**[৮৮৪]

ইমাম আবু ইউসুফের মতে, আল্লাহর কালামের ব্যাপারে যদি কেউ 'কীভাবে' কিংবা 'কেন' বলে, তবে তাকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পাঠক খেয়াল করবেন, উপরের বিতর্কগুলো সেই 'কীভাকে'-কেন্দ্রিকই। অন্যকথায়, আল্লাহর সিফাতের কাইফিয়্যাত অনুসন্ধান, যা আহলে সুন্নাতের সকল ধারার কাছে সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। এখানে এসে তারা সেটাই সন্ধান করেছেন। সেটা নিয়েই বিতর্ক করেছেন। অবশ্য প্রত্যেকেই সেটা করেছেন প্রতিপক্ষের 'বিভ্রান্তি' খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বা অজুহাতে।

মোটকথা, এটা যেহেতু একরকম নিষিদ্ধ বিতর্ক, সে জন্য এ ব্যাপারে আমরা ইমাম আজম রহ. এবং তাঁর প্রথম স্তরের শাগরেদদের বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বক্তব্য পাই না। তবে যেহেতু জাহমিয়্যাহ ও কাররামিয়্যাহদের বিভ্রান্তি ইমাম আজমের যুগেই প্রকাশ পেয়েছিল, ফলে তাদের খণ্ডনে ইমাম আজম এবং তাঁর শাগরেদদের কিছু কিছু বক্তব্য আমরা পাই। সেগুলোর আলোকে উদ্ভূত বিতর্ক সমাধানের চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

(এক.) ইমাম আজম এবং তাঁর শাগরেদরা কুরআনকে কেবল 'আল্লাহর কালাম; সৃষ্ট নয়—এটুকু বলার মাঝে সীমাবদ্ধ থেকেছেন। আল্লাহর কালামের রূপরেখা কী, সেটার মাঝে প্রবেশ করেননি। আল্লাহর কালামের উপর 'কালামে নফসি' (আত্মকথা) শব্দ প্রয়োগ করেননি। তবে তিনি আল্লাহর কালামকে 'অক্ষর' হওয়া নাকচ করেছেন। তাঁর মতে, **"আল্লাহর কালাম তাঁর সত্তার সঙ্গে**

---

৮৮৩. তালবিসুল আদিল্লাহ (৫৬)।

৮৮৪. ফাযায়িলু আবি হানিফা, ইবনে আবিল আওয়াম (৩১১)।

সম্পৃক্ত (كلام الله تعالى قائم بذاته)। **লেখা** (الكتابة), **অক্ষর** (الحرف), **শব্দ** (الكلمات) **ও আয়াত** (الآيات)**—এগুলো সেই সিফাতের অর্থের বাহক। মানুষের প্রয়োজনে এগুলো অস্তিত্বে এসেছে।"**[৮৮৫] উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম 'অক্ষর ও আওয়াজের সমন্বয়'—এটা নাকচ হয়ে যায়। ইমাম আল-ফিকহুল আকবারে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার সকল সিফাত (গুণ) মাখলুকের সিফাতের (গুণ) চেয়ে ভিন্ন। ...আমরা বিভিন্ন উপকরণ ও অক্ষরের মাধ্যমে কথা বলে থাকি। আল্লাহ কথা বলেন কোনো উপকরণ ও অক্ষর ছাড়াই। **অক্ষর** (الحروف) **হলো সৃষ্ট। কিন্তু আল্লাহর কালাম সৃষ্ট নয়।'**[৮৮৬] এ বক্তব্যেও সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর কালাম 'অক্ষরসহ' নাকচ হয়ে যায়। ফলে ইমামের বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় : 'কালাম আল্লাহর সত্তার সঙ্গে বিদ্যমান চিরন্তন গুণ। অক্ষর ও শব্দজাতীয় নয়।' এ হিসেবে হানাফি আলেমদের বক্তব্য ইমামের বক্তব্যের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথম ধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তবে ইমাম কি অক্ষরের মতো আওয়াজকেও নাকচ করতেন? সে ব্যাপারে স্বতন্ত্র আলোচনা সামনে আসছে।

(দুই.) মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে আল্লাহর কথোপকথন সম্পর্কে ইমাম বলেন, **"মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কালাম (কথা) শুনেছেন, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন,** ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ **অর্থ : 'আল্লাহ মুসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন।' [নিসা : ১৬৪] কিন্তু মুসার সঙ্গে কথা বলার অনেক আগে অনাদিতেও আল্লাহ তায়ালা 'মুতাকাল্লিম' (কালাম গুণসম্পন্ন) ছিলেন, যেমন গোটা সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার আগেও আল্লাহ তায়ালা 'খালিক' (সৃষ্টিকর্তা) ছিলেন। সুতরাং তিনি যখন মুসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তখন তাঁর সেই শাশ্বত 'কালাম' গুণের মাধ্যমে কথা বলেছিলেন।"**[৮৮৭] ইমাম আজম আরও বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা মুসা আলাইহিস সালামকে তাঁর রিসালাত ও কথোপকথনের জন্য মনোনীত করেছেন। ফলে তিনি তাঁর সঙ্গে কোনো দূত ছাড়া (সরাসরি) কথা বলেছেন।'**[৮৮৮]

ইমাম আজম রহ.-এর উপরের বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ শাশ্বত কালাম গুণের মাধ্যমে মুসার সঙ্গে কথা বলেছেন। এখানে অক্ষর ও আওয়াজের কোনো

---

৮৮৫. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৪০-৪২)।

৮৮৬. আল-ফিকহুল আকবার (২)।

৮৮৭. প্রাগুক্ত (২)।

৮৮৮. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২৮)।

প্রাসঙ্গিকতা নেই। ফলে (প্রথম দল) যারা বলেন, আল্লাহ তায়ালা মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে অক্ষর ও আওয়াজসহ কথা বলেছেন, তাদের বক্তব্য এখানেও ইমামের বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। বিশেষত ইমাম আল্লাহর কালামের জন্য অক্ষর ও শব্দকে নাকচ করেন, যা আমরা উপরে দেখেছি। ফলে এখানেও মুসার সঙ্গে কথোপকথনের ক্ষেত্রে অক্ষর/শব্দ নাকচ হবে।

একইভাবে (দ্বিতীয় দল তথা সমরকন্দি উলামায়ে কেরাম) যারা বলেন, আল্লাহ অক্ষর ও আওয়াজ সৃষ্টি করে মুসাকে সেটা শুনিয়ে দিয়েছেন—এটাও ইমামের কথার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ, ইমাম এখানে অক্ষর ও আওয়াজ সৃষ্টি করে মুসাকে শোনানোর কথা বলেননি। স্রেফ শাশ্বত গুণের মাধ্যমে কথার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন আর এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। বিপরীতে এখানে অক্ষর ও আওয়াজ সৃষ্টির কথা এলে 'হাদেস' ঢুকে যাচ্ছে, যা ইমামের কথার দূরতম ব্যাখ্যাও হয় না। ইমাম শাফেয়ি 'আল্লাহ তায়ালা কালাম সৃষ্টি করে মুসাকে সেটা শুনিয়েছেন' এমন বক্তব্যকে জাহমিয়্যাহদের বক্তব্য আখ্যা দিয়েছেন।[৮৮৯] বরং পরবর্তী সময়ে খোদ হানাফি (বুখারা ও বলখের) আলেমগণই 'অক্ষর ও আওয়াজ সৃষ্টি করে শোনানো' এ ধরনের কথাকে অবৈধ বলেছেন, যা পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৯০]

একইভাবে 'আল্লাহর কালাম শোনা যায় না, তাই কালামের নির্দেশক অক্ষর ও আওয়াজ শোনা' কিংবা "বৃক্ষকে আল্লাহর কালামের উপর নির্দেশক অক্ষর ও আওয়াজের 'মহল্ল' বলে আল্লাহর মূল কালাম শোনা নাকচ করাও" ইমামের মাযহাব নয়। খোদ ইমাম আজম বলেছেন, মুসা আলাইহিস সালাম **আল্লাহর কালাম শুনেছেন**। যদি তারা বলেন, মুসা আলাইহিস সালাম তাহলে আল্লাহর কালাম কীভাবে শুনলেন? আমরা বলব জানি না, আল্লাহ ভালো জানেন। বরং এটা আল্লাহর সিফাতের কাইফিয়্যাত নিয়ে প্রশ্ন, যা আপনাদের কাছেও বৈধ নয়।

(তিন.) আমাদের সামনে বিদ্যমান কুরআন কি শব্দ ও অর্থসহ (اللفظ والمعنى) আল্লাহর কালাম, নাকি স্রেফ অর্থ আল্লাহর কালাম; শব্দ সেই কালাম সিফাতের উপর নির্দেশক উপকরণ মাত্র? ইমাম আজম রহ.-এর বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, তিনি কুরআনের শব্দ ও অর্থ দুটোকে আল্লাহর কালাম মনে করতেন না। বরং তিনি আল্লাহর কালাম সিফাতকে অন্যান্য সিফাতের মতো কদিম তথা শাশ্বত বলতেন। এর বাইরের সবকিছুকে উপকরণ বলতেন। ইমাম আল-ফিকহুল

৮৮৯. দেখুন : আল-ইনতিকা, ইবনে আবদিল বার (১৩২)।
৮৯০. দেখুন : তালখিসুল আদিল্লাহ (৭৪৮)।

আকবারে বলেন, “কুরআন আল্লাহ তায়ালার ‘কালাম’ (বাণী), গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, হৃদয়ে সুরক্ষিত, মুখে পঠিত, নবিজি (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ। কুরআন (পাঠের সময়) **আমাদের শব্দগুলো** (اللفظ) সৃষ্ট। কুরআন (লেখার সময়) **আমাদের লেখাগুলো** সৃষ্ট। আমাদের (কুরআনের) **পাঠ** সৃষ্ট। কিন্তু স্বয়ং কুরআন সৃষ্ট নয়।’[৮৯১] ইমাম আল-ওয়াসিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি কুরআন আল্লাহর কালাম। মাখলুক নয়। এটা তাঁর ওহি এবং তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তাঁর গুণ (সিফাত)। ফলে কুরআন আল্লাহ নয়, আবার তাঁর থেকে আলাদাও নয়। মুসহাফে লিখিত, মুখে পঠিত, হৃদয়ে সংরক্ষিত। **কিন্তু এগুলোতে অবস্থানকারী নয়** (غير حالّ فيها)। আর **কাগজ, কালি,** (কলমের) লেখা—এগুলো সব মাখলুক। কেননা এগুলো মানুষের কাজ। আর মানুষ মাখলুক। ফলে মাখলুকের কাজও মাখলুক। আল্লাহর কালাম মাখলুক নয়। **লেখা, অক্ষর** (الحرف), **শব্দ** (الكلمات) **ও আয়াত—এগুলো কুরআনের নির্দেশক। মানুষের প্রয়োজনে এগুলো অস্তিত্বে এসেছে। বিপরীতে আল্লাহর কালাম তাঁর সত্তার সঙ্গে বিদ্যমান। সেই কালামের অর্থ বোধগম্য হয় এসব উপকরণের মধ্য দিয়ে** (لأن الكتابة والحرف والكلمات والآيات كلها دلالة القرآن لحاجة العباد إليه، وكلام الله تعالى قائم بذاته، ومعناه مفهوم بهذه الأشياء)।[৮৯২]

এসব বক্তব্যে ইমাম স্পষ্টভাবে ‘অক্ষর’ (الحرف) ও ‘শব্দ’ (اللفظ/الكلمة) এগুলোকে আল্লাহর সত্তার সঙ্গে বিদ্যমান ‘কালাম’-এর স্রেফ নির্দেশক এবং সেই কালামের অর্থের বাহক বলছেন। প্রকৃত কালাম এতে হুলুল বা অবতরণের দাবি অস্বীকার করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, ইমাম রহ.-এর মতে, আমাদের সামনে বিদ্যমান কুরআনের শব্দ ও অক্ষর সরাসরি (সিফাতে) কালাম নয়। বরং এসবের মাধ্যমে ধারণকৃত ‘অর্থ’ আল্লাহর (সিফাতে) কালাম, যা প্রথম দলের বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, দ্বিতীয় তথা হানাফি আলেমদের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল্লাহর আওয়াজের ব্যাপারে ইমামের মাযহাব

পিছনের আলোচনাতে আমরা ইমাম আজম রহ.-এর দূরদর্শিতা ও দ্বীনি ইলমে তাঁর বিপুল গভীরতা এবং সর্বোপরি কুরআন-সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের আরও একটি সুস্পষ্ট দলিল পাই। সেটা হলো, ইমাম আজম তাঁর আকিদার বিভিন্ন গ্রন্থে আল্লাহর কালাম গুণের আলোচনার সময় অক্ষর (الحرف)-কে নাকচ করেছেন;

---

৮৯১. আল-ফিকহুল আকবার (২)।

৮৯২. দেখুন : আল-ওয়াসিয়্যাহ (৪০-৪২)। শরহুল আকায়েদ, তাফতাযানি (১৬৪)। শরহুল ওয়াসিয়্যাহ, খাদেমি (১৬৬-১৬৭)।

কিন্তু আওয়াজ (الصوت)-কে সরাসরি নাকচ করেননি, যা পরবর্তী সময়ের হানাফি আলেমগণ সুস্পষ্টভাবে ও এককথায় নাকচ করেছেন।

ইমাম 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে বলেন, **'আমরা বিভিন্ন উপকরণ (الآلة) ও অক্ষরের মাধ্যমে কথা বলে থাকি। আল্লাহ কথা বলেন কোনো উপকরণ ও অক্ষর ছাড়াই। অক্ষর হলো সৃষ্ট। কিন্তু আল্লাহর কালাম সৃষ্ট নয়।'**[৮৯৩] 'আল-ওয়াসিয়্যাহ' গ্রন্থে ইমাম বলেন, **'আমরা বিশ্বাস করি কুরআন আল্লাহর কালাম। মাখলুক নয়। এটা তাঁর ওহি এবং তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তাঁর গুণ (সিফাত)। লেখা (الكتابة), অক্ষর (الحرف), শব্দ (الكلمات) ও আয়াত (الآيات) এগুলো কুরআনের নির্দেশক। মানুষের প্রয়োজনে এগুলো অস্তিত্বে এসেছে। বিপরীতে আল্লাহর কালাম তাঁর সত্তার সঙ্গে বিদ্যমান। সেই কালামের অর্থ বোধগম্য হয় এসব উপকরণের মধ্য দিয়ে।'**[৮৯৪]

এই দুটো বক্তব্যে স্পষ্ট যে, ইমাম আজম রহ. আল্লাহর কালামের জন্য 'অক্ষর' থাকার প্রয়োজনীয়তা নাকচ করে দিয়েছেন। অথচ তিনি কোথাও সরাসরি 'আওয়াজ'-কে নাকচ করেননি। এর রহস্য কী? তাহলে কি তিনি অক্ষর ও আওয়াজের মাঝে পার্থক্য করতেন? তিনি কি 'অক্ষর' নাকচ করলেও আল্লাহর কালামের জন্য 'আওয়াজ' সাব্যস্ত করতেন?

প্রথম কথা হলো, আল্লাহর কালামের জন্য 'অক্ষর' থাকার বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লাহর কালামের জন্য 'অক্ষর' সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে যেসব আয়াত ও হাদিস পেশ করা হয়, সেগুলোর একটাও কাছাকাছি দলিল নয়, যথাযথ তো নয়ই। বিপরীতে ইমামের বক্তব্য সুস্পষ্ট। তার কথা হলো, আমাদের সামনে বিদ্যমান কুরআনে লিখিত আয়াতের অক্ষরগুলো (যেমন—আলিফ, লাম, মিম) আল্লাহর কালাম উচ্চারণের একটা উপকরণ মাত্র। কাগজে আমরা কুরআন লিখি, তাতে কাগজ আল্লাহর কালাম হয়ে যায় না। কালি দিয়ে আমরা লিখি, তাতে লাল বা কালো কালি আল্লাহর কালাম হয়ে যায় না। মুখে আমরা একেকজন একেকভাবে কুরআন তেলাওয়াত করি। তাই বলে আমাদের মুখের উচ্চারণ, মাখরাজ, জিহ্বা, স্বর—এগুলো আল্লাহর কালাম হয়ে যায় না। আল্লাহর কালাম হচ্ছে কুরআনের আয়াতগুলো; উপকরণ নয়। একই কথা

---

৮৯৩. আল-ফিকহুল আকবার (২)।

৮৯৪. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৪০-৪২)।

প্রযোজ্য অক্ষরের ক্ষেত্রেও। অক্ষর মানুষের প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে অস্তিত্বে এসেছে। মানুষ মুখের নানাবিধ উচ্চারণকে অক্ষরের মাধ্যমে আলাদা করে এবং আরও পরে সেগুলোর লিখিত রূপ দান করেছে। এই লিখিত রূপ চিরন্তন নয়। একটা ভাষাকে যেমন আরবি অক্ষরে লেখা যায়, সেটাকে ল্যাটিন অক্ষরেও লেখা যায়। উপরন্তু আল্লাহ তাওরাত, ইঞ্জিলসহ অন্যান্য আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন বিভিন্ন ভাষায়, সেসব ভাষার অক্ষরে। এভাবে প্রত্যেক ভাষাভাষীর অক্ষরে আল্লাহ সে ভাষার কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যেগুলো পরবর্তীকালে অস্তিত্বে এসেছে। ফলে সকল ভাষার সকল অক্ষর আল্লাহর কালাম হবে—এমন নয়। বরং এগুলো মানুষের প্রয়োজনে পরবর্তীকালে অস্তিত্ব এসেছে। বিপরীতে আল্লাহর কালাম হলো আল্লাহর সত্তাগত গুণ, তাঁর সত্তার মতো চিরন্তন। যখন কোনো ভাষা, শব্দ ও অক্ষর ছিল না, তখনও আল্লাহ ছিলেন, তাঁর কালাম ছিল। ফলে তাঁর কালাম মানুষের ভাষা, শব্দ ও 'অক্ষর'-এর প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। বরং এসব যুক্তিতর্ক বাদ দিলেও সবচেয়ে বড় কথা 'আল্লাহ অক্ষরসহ কথা বলেন'—এমন কথা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

ফলে ইমাম আল্লাহর কালামের জন্য 'অক্ষর' নাকচ করেছেন। কিন্তু তিনি কোথাও কি 'আওয়াজ' নাকচ করেছেন? হানাফি আলেমদের বক্তব্যে স্পষ্ট যে, তারা আল্লাহর অক্ষর ও আওয়াজ দুটোই নাকচ করেন। কিন্তু আমরা যদি এ ব্যাপারে ইমামের বক্তব্য খুঁজি, তবে সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধরূপে বর্ণিত ইমামের কোনো বক্তব্য পাই না। নানাবিধ উপায়ে এ বাস্তবতার ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অধমের কাছে যেটা জুতসই ও প্রকৃত কারণ মনে হয়েছে সেটা হলো, 'আওয়াজ'-এর বিষয়টি সুন্নাহ দ্বারা ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও প্রমাণিত।

অর্থাৎ, কয়েকটি হাদিসে—কিংবা ন্যূনতম একটি হাদিসে—আল্লাহর 'আওয়াজ'সহ ডাকার কথা এসেছে। সেটা হলো, আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি—يَحْشُرُ اللهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ অর্থাৎ, "আল্লাহ তায়ালা হাশরের দিন তার বান্দাদের একত্র করবেন। অতঃপর তিনি তাদের 'আওয়াজ'সহ ডাক দিয়ে বলবেন, 'আমি মালিক। আমি বিচারের অধিপতি।' কাছে ও দূরের সবাই সেটা সমানভাবে শুনতে পাবে।"[৮৯৫]

---

৮৯৫. বুখারি (কিতাবুত তাওহিদ : ৭৪৮১ নং হাদিসের আগে মুআল্লাকান বর্ণিত)।

জটিলতা হলো, বুখারির এ বর্ণনাটি মুআল্লাক, অর্থাৎ মূল সহিহতে অনুসৃত অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নয়। শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার আসকালানি বুখারির এ বর্ণনার সনদের উপর আপত্তি করেছেন। বরং খোদ বুখারি এটাকে 'বলা হয়ে থাকে' (يُذْكَرُ) শব্দে উল্লেখ করেছেন, যা এটার দুর্বলতা প্রমাণ করে। ইবনে হাজার বলেন, "এটা ছাড়া আর কোনো সহিহ হাদিসে 'আওয়াজ' প্রমাণিত নয়। আর প্রমাণিত হলেও—যেসব ইমাম আওয়াজ নাকচ করেন তাদের কাছে—সেগুলোর ভিন্ন অর্থ ও ভিন্ন ব্যাখ্যা (যেমন ফেরেশতার আওয়াজ) ইত্যাদি রয়েছে। বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন, "আল্লাহর সিফাত সৃষ্টির সিফাতের মতো ভাবা যাবে না। সুতরাং যদি বিশুদ্ধ হাদিসে 'আওয়াজ' প্রমাণিত হয়, তবে সেটার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব হবে। এরপর সেটাকে তাফবিজ অথবা তাবিল করা হবে।"[৮৯৬]

ইমাম বুখারি রহ. 'খালকু আফআলিল ইবাদ' গ্রন্থে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা (কিয়ামতের দিন) এমন **আওয়াজে** ডাক দেবেন, যা দূরের ও কাছের সবাই সমানভাবে শুনতে পারবে।'[৮৯৭] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর জন্য 'আওয়াজ'সহ কালাম সাব্যস্ত করতেন। আবদুল্লাহ বলেন, আমি আব্বাজান (আহমদ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, একদল লোক বলে, আল্লাহ তায়ালা যখন মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে কথা বলেছেন, তখন আওয়াজসহ বলেননি। আব্বা বললেন, 'বরং হ্যাঁ, তোমার প্রভু আওয়াজসহ কথা বলেছেন। আমরা এসব হাদিস যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দেবো।'[৮৯৮]

আমাদের জানা নেই ইমাম আজম উপরের হাদিসটি (অথবা হাদিসগুলো) গ্রহণযোগ্য মনে করতেন কি করতেন না। তবে এ ব্যাপারে যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িগণ নীরব ছিলেন (যে কারণে পরবর্তী সময়ে বুখারি ও আহমদ ছাড়া এ ব্যাপারে সালাফের উল্লেখযোগ্য কারও সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই), ফলে ইমাম আজম সম্ভবত এ ব্যাপারে নীরব থাকাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। হ্যাঁ, ইমামের বক্তব্য 'কুরআন (পাঠের সময়) **আমাদের শব্দগুলো** সৃষ্ট। আমাদের (কুরআনের) **পাঠ** (তেলাওয়াত) সৃষ্ট'[৮৯৯]—এটাসহ পিছনে উল্লিখিত আরও কিছু বক্তব্য দ্বারা

---

৮৯৬. দেখুন : ফাতহুল বারি : (১৩/৪৫৮)।
৮৯৭. খালকু আফআলিল ইবাদ (২৪০)।
৮৯৮. দেখুন : আস-সুন্নাহ (২৩৮)। ফাতহুল বারি (১৩/৪৬০)।
৮৯৯. আল-ফিকহুল আকবার (২)।

কেউ বুঝতে পারে যে, ইমাম 'আওয়াজ'-কেও নাকচ করেছেন। কিন্তু সেটা স্পষ্ট নয়। অর্থাৎ, ইমাম স্পষ্টভাবে শব্দ ও অক্ষরকে যেমন নাকচ করেছেন, আওয়াজকে সেভাবে নাকচ করেননি। আল্লাহ ভালো জানেন।

অধমের পর্যবেক্ষণ

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনাতে স্পষ্ট যে, আলোচিত দুটো ধারার মাঝেই আল্লাহর কালামের ক্ষেত্রে এমন অনেক বক্তব্যের উদ্ভব ঘটেছে, যা ইমাম বলে যাননি। স্রেফ ইমাম আজম নন, সালাফে সালেহিনের প্রথম যুগ তথা সাহাবা ও তাবেয়িদের কেউ বলেননি। বরং সময়ের বিবর্তনে এসব বক্তব্য তৈরি হয়েছে। এগুলোকে কেন্দ্র করে হাজার বছর ধরে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা-পর্যালোচনা ও দলিল-প্রমাণ গড়ে উঠেছে। বরং আমরা দেখেছি কীভাবে একই ধারার আলেমদের মাঝেও পরস্পরবিরোধী ও সাংঘর্ষিক বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে।

এসব বিষয়ে তর্ক যেহেতু শেষ হবার নয়, ফলে এখানেই আমরা আমাদের কথা শেষ করতে চাচ্ছি। বাস্তব কথা হলো, এসব মাসআলা একজন মুসলিমের দ্বীন ও দুনিয়া, ইহকাল ও পরকাল কোনো জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। ফলে কুরআনে এ সম্পর্কে কোনো তফসিলি আলোচনা করা হয়নি, হাদিসেও এ ব্যাপারে সবিস্তার এবং এটাকে মুখ্য বানিয়ে কিছু বলা হয়নি। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িনসহ সালাফের প্রথম প্রজন্মের কেউ এ ব্যাপারে দীর্ঘ কথা বলেননি। এসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় আরও পরে। তাই কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে এগুলোর কোনো একটাকে চূড়ান্ত ও দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ করার সুযোগ নেই।

তবে কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ অবশ্যই রয়েছে। ফিতরত ও সুস্থ আকল দিয়ে কিছু ভাবার সুযোগ আছে। আল্লাহ তায়ালা তো সৃষ্টি নন, সৃষ্টিকর্তা। তাহলে আমরা সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলব কেন? মানুষ স্বপ্নে এমন অনেককিছু দেখে, বাস্তবে যেসব বস্তুর অস্তিত্ব নেই। স্বপ্নে অনেককিছু শোনে, বাস্তবে যেসব কথার অস্তিত্ব নেই। অন্ধ ব্যক্তি স্বপ্নে স্বাভাবিক মানুষের মতোই দেখতে সক্ষম। বধির স্বপ্নে শুনতে সক্ষম। এমনকি জন্মান্ধ কিংবা জন্ম থেকে বধির ব্যক্তি, যার বাস্তব জগতের দৃশ্য কিংবা শব্দের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, তারাও স্বপ্নে বিভিন্ন টাইপের ভিজুয়াল ও অডিটোরি সেন্সেশন এক্সপেরিয়েন্স করে, বিভিন্ন মাত্রায় দেখা ও শ্রবণের অভিজ্ঞতা নেয়। পার্থক্য এটুকু যে, তারা সেগুলোর হাকিকত ও

কাইফিয়্যাত (স্বরূপ ও ধরন) বর্ণনা করতে পারে না। উপলব্ধি করতে পারে না। স্বপ্নের ঘোরে ঘুমন্ত মানুষ নিজেকে যুদ্ধক্ষেত্রে আবিষ্কার করে; খাটে-শোয়া মানুষ নিজেকে সমুদ্রের তুফানের সামনে লড়াই করতে দেখে, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সবকিছু অনুভব করে, অথচ বাস্তবতার সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। সে নীরব বদ্ধ ঘরে ঘুমন্ত।

পৃথিবীর সিস্টেমে যদি এগুলো সম্ভব হয়, আল্লাহর ক্ষেত্রে কেন অসম্ভব ভাবছি? আমাদের দেখতে চোখ লাগে, ধরতে হাত লাগে, শুনতে কান লাগে। আল্লাহর এগুলোর কিছুই প্রয়োজন নেই। আল্লাহর ডাক দেওয়া এবং কথা বলার জন্য যদি অক্ষর, আওয়াজ ইত্যাদি উপকরণ দরকার হয়, তবে দেখতে চোখ দরকার হবে, ভাবতে ব্রেইন দরকার হবে, সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হতে হৃদয় দরকার হবে। অথচ তিনি এসব মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত।

একইভাবে আল্লাহ আমাদের দেখার জন্য চোখ উপকরণ হিসেবে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি চাইলে আমাদের চোখ ছাড়াও দেখাতে পারেন। আমাদের তিনি শোনার জন্য কান দিয়েছেন। ভাষা, অক্ষর ও আওয়াজ উপকরণ হিসেবে তৈরি করেছেন। তিনি চাইলে আমাদের এসব মাধ্যম ছাড়াও শোনাতে পারেন। মুসা আলাইহিস সালামকে শোনাতে গাছকে মাধ্যম ধরতে হবে কেন? গাছের মাঝে আওয়াজ সৃষ্টি করে সেটা শোনাতে হবে কেন? তাহলে তো মুসা আল্লাহর সঙ্গে নয়, গাছের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কি উপকরণ ছাড়া মুসাকে কথা শোনাতে পারেন না? অবশ্যই পারেন।

কাযি বাযদাবি এখানে সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "কেউ বলতে পারে—'অক্ষর ও আওয়াজ ছাড়া কথার অস্তিত্ব নেই।' এটা ভিত্তিহীন দাবি। পৃথিবীতে আমাদের সামনেও অক্ষর ও আওয়াজ ছাড়া কথার অস্তিত্ব দেখি। আল্লাহ তায়ালা অনেক জড় বস্তুর কথার বিষয়টি কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তাদের কথা বলতে কি অক্ষর ও আওয়াজ লাগে? বরং কালামের ক্ষেত্রে অক্ষর ও আওয়াজের শর্ত করলে অন্যান্য সিফাতের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন শর্ত যুক্ত করতে হবে। যেমন—আল্লাহর ইলম (জ্ঞান) সিফাতের জন্য মস্তিষ্ক ও হৃদয় ইত্যাদির শর্ত লাগবে। অথচ আল্লাহর ক্ষেত্রে এসব বিষয় প্রযোজ্য নয়। মোটকথা, সৃষ্টিকে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন উপকরণের মুখাপেক্ষী হতে হয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী।"[১০০]

---

১০০. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (৬৪)।

একইভাবে কুরআনে কারিমে লিখিত অক্ষরগুলোকে আল্লাহর হাকিকি কালাম বললে যথেষ্ট জটিলতা আছে। আপনি পেন্সিল দিয়ে কোনো আয়াত লিখলেন। আপনার লেখা অক্ষরগুলো মাত্রই অস্তিত্বে এলো। আবার চাইলে আপনি নিমিষেই সেটা মুছে ফেলতে পারবেন। তাহলে এটাকে আল্লাহর 'হাকিকি' কালাম বলার অর্থ কী? কোনো অর্থ নেই। হ্যাঁ, আপনি যা লিখছেন সেটা আল্লাহর কালাম, আপনি মুখে যা পড়ছেন সেটা আল্লাহর কালাম। কিন্তু আপনার লেখাটা বা সামনে বিদ্যমান লিখিত অক্ষরগুলো কিংবা আপনার উচ্চারণ করা শব্দগুলো আপনার নিজের কাজ; এগুলো আল্লাহর সিফাত নয়। অথচ কেউ কেউ যারা লিখিত অক্ষরকে কালাম না বলবে, তাদের কাফের ফাতাওয়া দিয়েছেন। উক্ত ফাতাওয়ার আলোকে তো ইমাম আজমও কাফের হয়ে যান। কারণ তিনি বলেছেন, **'লেখা, অক্ষর, শব্দ ও আয়াত—এগুলো কুরআনের নির্দেশক। মানুষের প্রয়োজনে এগুলো অস্তিত্বে এসেছে। বিপরীতে আল্লাহর কালাম তাঁর সত্তার সঙ্গে বিদ্যমান। সেই কালামের অর্থ বোধগম্য হয় এসব উপকরণের মধ্য দিয়ে'**।[৯০১]

তা ছাড়া, আল্লাহ 'কথা বলেন'—এতটুকুই তাঁর সিফাত সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। এতটুকুই তানযিহ। এরপর কীভাবে কথা বলেন, সেটা মূলত কাইফিয়্যাত (ধরন) অনুসন্ধান, যা শরিয়তে মূলত নিষিদ্ধ। অথচ এখন সেই নিষিদ্ধের সন্ধানকেই আমরা আমাদের মূল ব্যস্ততা বানিয়ে রেখেছি। ইমাম আজম রহ. বলেন, **'আল্লাহ তায়ালার সকল সিফাত (গুণ) মাখলুকের সিফাতের (গুণ) চেয়ে ভিন্ন। তিনি জানেন; কিন্তু আমাদের জানার মতো নয়। তিনি শক্তি রাখেন; কিন্তু আমাদের শক্তির মতো নয়। তিনি দেখেন; তবে আমাদের দেখার মতো নয়। তিনি কথা বলেন; তবে আমাদের কথা বলার মতো নয়। তিনি শোনেন; তবে আমাদের শোনার মতো নয়। আমরা বিভিন্ন উপকরণ ও অক্ষরের মাধ্যমে কথা বলে থাকি। <u>তিনি কথা বলেন কোনো উপকরণ ও অক্ষর ছাড়াই</u>। অক্ষর হলো সৃষ্ট, কিন্তু আল্লাহর কালাম সৃষ্ট নয়।'**[৯০২] তহাবি বলেন, কুরআন আল্লাহর কালাম। এর উৎস আল্লাহ তায়ালার 'কথা' যার স্বরূপ তিনিই জানেন।[৯০৩]

ফলে 'কুরআন আল্লাহর কালাম; মাখলুক নয়' এবং 'কালাম আল্লাহর সিফাত'—এটুকু বিশ্বাস করাই যথেষ্ট। এর অতিরিক্ত অনুসন্ধান এবং সেটা নিয়ে

---

৯০১. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৪০-৪২)।

৯০২. আল-ফিকহুল আকবার (২)।

৯০৩. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২০)।

বিতর্ক পরিত্যাজ্য। এটাই সালাফে সালেহিনের আকিদা। আর এটুকুতে গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত। ফলে ঐকমত্যপূর্ণ মৌলিক বিষয় বাদ দিয়ে আল্লাহর কালাম কি 'আত্মকথা' না 'অক্ষর ও আওয়াজের সমন্বয়ে কথা'—এ ধরনের শাখাগত অপ্রয়োজনীয় মতভেদপূর্ণ বিষয়ে অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ করা, সেগুলোকে ঈমান ও আকিদার মৌলিক বিষয়ের পর্যায়ে উন্নীত করে চিরদিন বিতর্ক জিইয়ে রাখা দ্বীন ও উম্মাহর ক্ষতি বই উপকার করবে না; আগেও উপকার করেনি। হাদিসের সনদসংক্রান্ত ইলম (জারহ ও তাদিল)-এর ক্ষেত্রে এই বিতর্ক মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। মুহাদ্দিসদের এমন জটিলতায় জড়িয়ে ফেলেছিল, যার কোনো দরকার ছিল না। এই মতভেদকে কেন্দ্র করে রিজালের কিতাবগুলোতে অভিযোগ-অপবাদ, কাদা ছোড়াছুড়ি, অতিরঞ্জিত মন্তব্য এবং প্রতিপক্ষের প্রতি সীমালঙ্ঘনের অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে।[১০৪] এটা পরবর্তীকালেও অব্যাহত থেকেছে। এমনকি সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. সরকারিভাবে আইন করে আল্লাহর কালাম 'অক্ষর ও আওয়াজ'সহ নাকি ছাড়া এ ব্যাপারে ঘাঁটাঘাঁটি নিষিদ্ধ করেছিলেন।[১০৫]

এক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ হতে পারেন ইমাম আজমসহ হানাফি মাযহাবের প্রথম যুগের আলেমগণ, যারা আকিদার ক্ষেত্রে হুবহু ইমাম আজম ও সালাফে সালেহিনের অনুসরণ করেছেন, পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত বিভিন্ন ইজতিহাদি ব্যাখ্যা কিংবা অতিরঞ্জন পরিহার করেছেন। তাদের মাঝে অন্যতম হলেন আহলে সুন্নাতের ইমাম আবু জাফর তহাবি রহ.। তিনি কুরআনকেন্দ্রিক বিতর্কের চরম সংক্ষুব্ধ শতাব্দে জন্ম নিয়েও কুরআনকেন্দ্রিক যতটুকু আকিদা বর্ণনা করেছেন, ততটুকুকে উম্মাহর সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। তহাবি বলেন, "কুরআন আল্লাহর কালাম। এর উৎস আল্লাহ তায়ালার 'কথা', যার স্বরূপ তিনিই জানেন। এটা তিনি তাঁর রাসুলের উপর ওহি হিসেবে পাঠিয়েছেন। মুমিনগণ এটা হক হিসেবে সত্যায়ন করেছেন। এটাকে প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর কথা হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস করেছেন। এটা সৃষ্টির কথার মতো সৃষ্ট নয়। সুতরাং যদি কেউ মনে করে কুরআন মানুষের কথা, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির নিন্দা-ভর্ৎসনা করেছেন। তাকে জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন, যেমনটি কুরআনে তিনি বলেছেন, 'আমি তাকে সাকার (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করব।' সুতরাং কুরআনকে 'এটা তো

---

১০৪. দেখুন : আল-ইখতিলাফ ফিল-লফজ (২০)। আল-ইমতা' (৫৮-৬০)।
১০৫. দেখুন : তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা, তাজুদ্দিন সুবকি (৭/৩৫১)।

কেবল মানুষের কথা' সাব্যস্তকারীকে আল্লাহ তায়ালা যখন জাহান্নামে নিক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারলাম, কুরআন মানুষের স্রষ্টার কথা, মানুষের কথার সঙ্গে এর সাদৃশ্য নেই।"[৯০৬] আরও একজন হলেন ইমাম আবু হাফস বুখারি রহ.। তিনি লিখেন, 'কুরআন আল্লাহর কালাম, গাইরে মাখলুক। কারণ, কুরআন আল্লাহর প্রকৃত কালাম, রূপক নয়। ফলে কুরআনকে মাখলুক বললে আল্লাহর সিফাতকে মাখলুক বলা হয়। আর এটা কুফর।'[৯০৭] আল্লাহর কালাম গুণের ব্যাপারে এটুকু আকিদাই যথেষ্ট ও নিরাপদ।

ইমাম আজম কি ফারসিতে কুরআন তেলাওয়াত বৈধ বলতেন?

ইমাম আজম রহ.-এর উপর কুরআনকেন্দ্রিক আরেকটি অভিযোগ আরোপ করা হয়। সেটা হলো, তিনি নামাযের ভিতরে ফারসিতে কুরআন পাঠ করতে বলেছেন! যতটুকু বোঝা যায়, মূল বিষয়টি ইমাম থেকে প্রমাণিত। কিন্তু অভিযোগকারীরা তাঁর বক্তব্য ভুল বুঝেছেন এবং ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাস্তবে ইমাম ফারসিতে কুরআন পড়ার মত দিয়েছিলেন, কিন্তু কুরআন তো আরবি। তাহলে ফারসিতে পড়া হবে কী করে? বোঝা গেল, মতটি ছিল ফারসিতে কুরআন পড়া নয়, বরং কুরআনের অনুবাদ পড়া। তা ছাড়া, এটা তিনি তাদের জন্য রুখসত (সুযোগ) দিয়েছিলেন যারা আরবি পড়তে পারে না। সুতরাং এমন ব্যক্তি নীরব থাকার পরিবর্তে কুরআনের যা-কিছু বোঝে সেটা বলবে কিংবা যেকোনো জিকির পড়বে—এটুকুই। সেটা ফারসি, ইংরেজি, উর্দু বা বাংলা যে ভাষাতেই হোক। এটাকে উন্মুক্তভাবে নামাযে ফারসিতে কুরআন তেলাওয়াতের বৈধতা নামে প্রচার করা যথাযথ নয়। কারণ, যে ব্যক্তি আরবিতে কুরআন পড়তে সক্ষম, তাকে আরবিতেই পড়তে হবে।[৯০৮]

ফারসিতে কুরআন পড়ার বৈধতার কথা বলা ইমামের জ্ঞানগত দুর্বলতা নয়; বরং দূরদর্শিতা এবং ইসলামের সর্বজনীনতার প্রমাণ। এতে ইসলামের প্রশস্ততা এবং মাতৃভাষায় ইসলাম চর্চার নবদিগন্ত উন্মোচনের আভাস ছিল। ফলে ইমাম ফারসিতে কুরআন তেলাওয়াতের অনুমতি দেন। স্রেফ কুরআন তেলাওয়াত নয়,

---

৯০৬. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২০)।

৯০৭. আস-সাওয়াদুল আজম (১৭)।

৯০৮. দেখুন : ইলাউস সুনান (৪/১৪৮-১৫০)।

নামাযের তাকবির, হজের তালবিয়া, পশু যবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ ইত্যাদিও যদি কেউ আরবিতে না পেরে ফারসি বা নিজস্ব অন্য যেকোনো ভাষায় দেয়, সেটাকে বৈধ ঘোষণা করেন।[৯০৯]

এটা ইমামের মনগড়া বিদআত ছিল না, বরং সুন্নাহ ছিল। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদিসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। রিফাআহ ইবনে রাফে রাযি. থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদিসে এক গ্রাম্য সাহাবিকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক নামায শেখানোর বর্ণনায় এসেছে, "... (নামাযে) তাকবির বলার পরে যদি তোমার কুরআনের কিছু জানা থাকে, তবে সেটা পড়ো। না থাকলে 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহ আকবার', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো।"[৯১০]

আলেমগণ উক্ত হাদিস থেকে ইজতিহাদ করেছেন—নামাযে কুরআন পড়া আবশ্যক। অথচ ওজর থাকার কারণে সেক্ষেত্রে 'রুখসত' তথা ছাড় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোনো নওমুসলিম কিংবা যৌক্তিক ওজরের কারণে কোনো সাধারণ মুসলিম যদি আরবিতে আল্লাহর যিকিরগুলো করতেও অক্ষম হয়, তবে সে যিকিরগুলো নিজের ভাষায় করতে পারবে, ঠিক কালিমার মতো। কোনো অমুসলিম যদি ইসলামে প্রবেশ করতে চায়, তবে তাকে 'কালিমা' পাঠ করতে হয়। কিন্তু সে যদি আরবি কালিমা পাঠ না করতে পারে, বরং নিজের মাতৃভাষায় কালিমার অর্থ স্বীকৃতি দেয়, তবে সে মুমিন গণ্য হবে। কারণ, মূল উদ্দেশ্য তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া। আর সেটা অন্য ভাষাতেও সম্ভব।[৯১১]

তবে জটিলতা হলো, কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়—আরবিতে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ফারসিতে কেরাত পড়ার বৈধতা দিয়েছেন! কাসানি লিখেন, 'আবু হানিফার মতে, আরবির মতো ফারসিতেও (নামাযে) কেরাত পড়া বৈধ। আরবি পারুক না পারুক সেটা বিবেচ্য নয়। বিপরীতে আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে, আরবি পারলে ফারসিতে বৈধ হবে না। আরবি না পারলে বৈধ হবে। ইমাম শাফেয়ির মত আরও ভিন্ন। তিনি বলেন, আরবি পারুক না পারুক, কোনো অবস্থাতেই ফারসিতে কিছু পড়া যাবে না। যদি আরবি না পারে, তবে

---

৯০৯. দেখুন : আল-বাহরুর রায়েক (১/৫৩৫)।

৯১০. আবু দাউদ (কিতাবুস সালাত/বাবু সালাতি মান লা ইউকিমু সুলবাহ : ৮৫৬)। তিরমিযি (আবওয়াবুস সালাত : ৩০২)।

৯১১. আল-বাহরুর রায়েক (১/৫৩৫)।

তাসবিহ পড়বে। তবুও ফারসিতে কেরাত পড়বে না।' প্রশ্ন আসতে পারে, যদি ইমাম থেকে এই বর্ণনা বিশুদ্ধ হয়, তবে তিনি কীসের ভিত্তিতে আরবি পারা সত্ত্বেও ফারসিতে কুরআন পাঠের বৈধতা দিলেন?

মূলত এ প্রশ্নের জবাবই উক্ত ফিকহি মাসআলাকে আকিদার মাসআলায় পরিণত করে। মুতাকাল্লিমিন হানাফি ফকিহগণ মনে করেন, ইমাম আজমের কাছে কুরআন আরবি শব্দগুলো নয়; বরং আল্লাহর সত্তার সঙ্গে বিদ্যমান সিফাতে কালাম হলো মূল কুরআন। শব্দগুলো সেগুলোর নির্দেশক মাত্র। সুতরাং নামাযে কুরআন পাঠের নির্দেশ আল্লাহর সঙ্গে বিদ্যমান সেই অর্থ পাঠ করা উদ্দেশ্য, যা আরবিতে যেমন সম্ভব, অন্য ভাষাতেও সম্ভব। (এ জন্য ইমাম আজম এবং কোনো কোনো বর্ণনামতে আবু ইউসুফের বক্তব্য হলো—কুরআনি ইজায স্রেফ আরবি ছন্দের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়)... ফলে যে ভাষাতেই কুরআনের অর্থগুলো উচ্চারণ করা হবে, সেটাকেই কুরআন বলা যাবে! সুতরাং—কাসানি লিখেন—ইমাম আজমের কথাই শুদ্ধ। একই কথা প্রযোজ্য তাশাহহুদ, জুমার খুতবা, যবাইয়ের সময় (অন্য ভাষায়) বিসমিল্লাহ পড়া, তালবিয়া পড়ার ক্ষেত্রেও। বরং কারও কারও মতে, আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় আজান দেওয়াও বৈধ, যদি মানুষ সেটা শুনে আজান বুঝতে পারে।[৯১২]

কিন্তু কাসানির উক্ত বক্তব্য উন্মুক্তভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, বরং ইমাম আজম থেকে উক্ত মত (আরবিতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ফারসিতে কুরআন বৈধতা) প্রমাণিত ধরা হলেও সেটা স্বীকৃত বক্তব্য নয়। এক্ষেত্রে তাঁর দুই শাগরেদ ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের বক্তব্য বিশুদ্ধ। বরং বলা হয়ে থাকে, সর্বশেষে ইমাম আজম উক্ত উন্মুক্ত মত প্রত্যাহার করে দুই শাগরিদের মত গ্রহণ করেন। বাযদাবি বর্ণনা করেন, 'ইমাম আজমের বিশুদ্ধ মাযহাব হলো কুরআন ছন্দ ও অর্থ দুটোর সমন্বয়।'[৯১৩] সুতরাং আরবিতে সক্ষমতা থাকলে ফারসি বা অন্য ভাষায় কেরাত পড়া যাবে না। এভাবে এটা হানাফি ইমামদের সর্বসম্মত বক্তব্যে পরিণত হয়।

একই কথা অন্যান্য যিকিরের ক্ষেত্রেও—আরবিতে সক্ষম হলে অন্য ভাষায় করবে না। ইবনে আবিদিন 'সিরাজিয়্যাহ'র উদ্ধৃতিতে লিখেছেন, 'ফারসি (তথা

---

৯১২. দেখুন : বাদায়েউস সানায়ে' (১/১১২-১১৩)। আরও দেখুন : আত-তামহিদ, আবু শাকুর সালেমি (৭৮-৭৯)।
৯১৩. কাশফুল আসরার (১/২৪)।

অনারবি ভাষায়) আজান দেওয়া বিশুদ্ধ নয়। মানুষ সেটা শুনে আজান বুঝতে পারলেও বিশুদ্ধ হবে না।'[৯১৪] কারণ, ইবাদতটা এভাবেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়েছে। আমাদের সামনে বিদ্যমান কুরআন স্রেফ অর্থ নয়; বরং অর্থ ও ছন্দ/শব্দ (নযম) দুটোর সমন্বয়ে আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ আমাদের এটাই পড়তে বলেছেন। এগুলো আরবিতে যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেভাবে পড়লেই রাসুলুল্লাহ (ﷺ) প্রতি শব্দে দশটি পুণ্যের ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এই আরবি কুরআনকেই সুরক্ষিত রাখার ঘোষণা করেছেন। একটি শব্দও তাতে বেশি-কম হবে না। অথচ অনুবাদে মুহূর্তে মুহূর্তে ভাষায় ভাষায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও বিকৃতির আশঙ্কা প্রবল। বরং অন্য ধর্মগ্রন্থগুলো বিকৃতির অন্যতম কারণ ছিল শব্দগুলোকে হেফাজত না করা, অর্থের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা। এ জন্য কুরআনকে আল্লাহ শব্দ ও অর্থ দুটোসহই হেফাজত করবেন।

মোটকথা, কুরআনের শব্দ ও অর্থ দুটোকেই আল্লাহ তায়ালা কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং নামাযে এই কুরআনই পড়তে হবে যা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.সহ সকল আলেমের মত। ইমাম আজম থেকে বিপরীতটা বর্ণিত থাকলেও তিনি পরবর্তীকালে দুই শাগরিদের মত গ্রহণ করেছেন বলে ধরা হবে। তাই আরবি ব্যতীত অন্য ভাষায় কেরাত পড়া যাবে না। হ্যাঁ, আরবি কুরআন না পারলে যেহেতু রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাসবিহ, তাহলিল তথা যিকির করতে বলেছেন, আর যিকির অন্য ভাষাতেও বৈধ, সুতরাং তখন (অক্ষম অবস্থায়) নিজস্ব মাতৃভাষায় কুরআনের যিকিরসংক্রান্ত আয়াতগুলোর অনুবাদ পড়া বৈধ হবে।[৯১৫]

ইমাম আজম ও কুরআনের বিচ্ছিন্ন পাঠ (কিরাআতে শাযযাহ)

কিছু কিছু গ্রন্থে ইমাম আজম রহ.-এর নামে আরও একটি অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, তিনি নাকি কুরআন কারিমের কিছু আয়াতকে তাঁর নিজস্ব কেরাতে পড়তেন, যা প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ কেরাতের চেয়ে ভিন্ন। যেমন—আল্লাহ তায়ালার বাণী : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ অর্থ : 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই তাঁকে (প্রকৃত) ভয় করে।' [ফাতির : ২৮] আয়াতে 'আল্লাহ' শব্দটি 'যবর' এবং 'উলামা' পেশ দিয়ে পড়া হয়। কিন্তু ইমাম আজমের ব্যাপারে বলা হয়, তিনি নাকি এর বিপরীত তথা 'আল্লাহ' শব্দের উপর 'পেশ' এবং 'উলামা' শব্দের উপর 'যবর' দিয়ে পড়তেন!

---

৯১৪. রদ্দুল মুহতার (১/৩৮৩, ৪৮৪)।

৯১৫. রদ্দুল মুহতার (১/৪৮৫)।

এটা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ, তাতে আয়াতের অর্থ সম্পূর্ণ উলটে যায়। অর্থ দাঁড়ায়—'আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের মাঝে যারা আলেম তাদের ভয় করেন।' এটা ইমাম আজমের উপর অপবাদ। তিনি এ ধরনের কাজ থেকে পবিত্র। কারণ, তিনি কেরাত শিখেছেন খোদ ইমাম আসেম রহ. থেকে। সুতরাং তিনি প্রসিদ্ধ কেরাতের বাইরে কোনো শায তথা বিচ্ছিন্ন কেরাত পড়তেন না।[৯১৬]

হ্যাঁ, তিনি জমহুরের মতো সাত হরফে কুরআনের অবতরণ এবং কুরআনের একাধিক কেরাতের স্বীকৃতি দিতেন। ইমাম বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে মানুষের জন্য সহজ করার লক্ষ্যে সাত অক্ষরে অবতীর্ণ করেছেন। ফলে এটা তাঁর হিকমত।'**[৯১৭] আবু উবাইদ ও মুবাররিদের মতে, সাত অক্ষর বলতে আরবের সাতটি (আঞ্চলিক) ভাষা উদ্দেশ্য।[৯১৮] কেরাতের ব্যাপারে ইমাম বলেন, **'কেরাতের ভিন্নতার মাঝে হালাল-হারাম এ-জাতীয় কিছু নেই।'** কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, বিচ্ছিন্ন কেরাত পড়া বৈধ। কারণ, কেরাতের ভিন্নতার ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত হলো, কেরাতটা সালাফ থেকে প্রমাণিত হওয়া এবং অর্থ বিশুদ্ধ হওয়া। অর্থ বদলে গেলে—যেমনটা উপরের আয়াতে তাঁর নামে বলা হয়েছে—সে ধরনের কেরাত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বলেন, **'কেরাতের ভিন্নতার মাঝে হালাল-হারাম এ-জাতীয় কিছু নেই। কারণ, পড়ার ভিন্নতা সত্ত্বেও এগুলোর অর্থ এক ও অভিন্ন।'**[৯১৯] সুতরাং যে ধরনের বিচ্ছিন্ন কেরাতে অর্থও বিকৃত হয়ে যাবে, সেটা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

উপরের উসুলের ভিত্তিতে তিনি বিভিন্ন মাসআলাতে কেরাতে শাযযাহ তথা বিচ্ছিন্ন কেরাত দিয়ে দলিল দিয়েছেন। যেমন—শপথ ভঙ্গের কাফফারার ক্ষেত্রে ইমাম আজমের বক্তব্য হলো, **টানা তিন দিন রোযা রাখতে হবে।** মাঝে ফাঁকা রাখা যাবে না। এক্ষেত্রে তিনি কুরআনের এই আয়াত দিয়ে দলিল দেন : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ তোমাদের

৯১৬. দেখুন : উকুদুল জুমান (২৯১-২৯২)।

৯১৭. তালখিসুল আদিল্লাহ (৭৮৮)।

৯১৮. প্রাগুক্ত (৭৯৩)।

৯১৯. প্রাগুক্ত (৭৮৮)।

পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য; কিন্তু পাকড়াও করেন ওই শপথের জন্য যা তোমরা মজবুত করে করো। অতএব, এর কাফফারা এই যে—দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণির খাদ্য যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাকো। অথবা তাদের বস্ত্র প্রদান করবে, অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দেবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটা কাফফারা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা করো। এমনইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।' [মায়িদা : ৮৯]

এখানে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা স্রেফ তিন দিন রোযার কথা বলেছেন। তাহলে ইমাম আজম 'ধারাবাহিক/টানা' শর্তটা কীভাবে যোগ করলেন? বাস্তব কথা হলো, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কেরাত দিয়ে দলিল দিয়েছেন। আর ইবনে মাসউদের কেরাতে (متتابعات) তথা 'ধারাবাহিক'/'একটানা' তিন দিন কথাটা আছে।[৯২০]

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে তো প্রমাণিত হয়েই গেলে তিনি 'বিচ্ছিন্ন কেরাতের' প্রবক্তা। আমরা বলব, না। তিনি বিচ্ছিন্ন কেরাতকে কুরআনের আয়াত হিসেবে দলিল দেননি। বরং 'খবর' তথা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবির একটি বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বক্তব্য হিসেবে দলিল দিয়েছেন। অর্থাৎ, এমন 'বর্ধিত' কেরাত ইমাম আজমের যুগে ইবনে মাসউদ থেকে প্রসিদ্ধ ছিল। বরং বলা হয়ে থাকে, সুলাইমান আল-আ'মাশ কুরআন এক খতম করতেন ইবনে মাসউদের অক্ষরে, আরেক খতম করতেন উসমানের অক্ষরে। সে যা-ই হোক, ইবনে মাসউদ রাযি. নিঃসন্দেহে উক্ত শব্দ কুরআনে নিজ থেকে জুড়ে দেননি। এটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। বরং তিনি অবশ্যই রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শুনে থাকবেন। সুতরাং এটা হাদিসের মর্যাদা পাবে এবং কুরআনের 'সংক্ষিপ্ত' আয়াতের 'ব্যাখ্যা' গণ্য হবে, যা শরয়ি বিধানের দলিল হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ। কিন্তু এটাকে মূল কুরআনের অংশ ধরে তেলাওয়াত, নামাযে বা নামাযের বাইরে পাঠ করা বৈধ নয়।[৯২১]

---

৯২০. দেখুন : আল-মানখুল, গাযালি (৩৭৪)।
৯২১. দেখুন : আল-মাবসুত, সারাখসি (৩/৭৫)। আরও দেখুন : আত-তাহরির, ইবনুল হুমাম (২৯৯)।

নবি-রাসুলের উপর ঈমান

নবি-রাসুলের পরিচয়

'নবি' আরবি শব্দ (النبأ) তথা সংবাদ থেকে উদ্গত। যেহেতু নবিগণ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সংবাদ, আদেশ-নিষেধ বহন করেন, ওহি প্রাপ্ত হন, এ জন্য তাদের 'নবি' বলা হয়। 'রাসুল' আরবি শব্দ (الرسالة) থেকে উদ্গত, যার অর্থ পয়গাম, বার্তা। রাসুলগণ যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবতার জন্য আসমানি বার্তা বহন করেন, দূত হিসেবে কাজ করেন, এ জন্য তাঁদের রাসুল বলা হয়। এ হিসেবে নবি ও রাসুল দুজনই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٖ وَلَا نَبِيٍّ﴾ অর্থ : 'আমি আপনার পূর্বে যখনই কোনো রাসুল বা নবি পাঠিয়েছি...।' [হজ : ৫২]

নবি-রাসুলগণ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। সততা, আমানতদারিতা, দূরদর্শিতা, গুনাহ থেকে পবিত্রতা, হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা, আত্মা ও আখলাকের নির্মলতার ক্ষেত্রে তাঁরা পৃথিবীর সকল মানুষের ঊর্ধ্বে। তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব যথযথভাবে পালন করেন। দাওয়াত ও তাবলিগের ক্ষেত্রে তাঁরা ত্রুটি করেন না। আল্লাহর কোনো পয়গাম তাঁরা লুকোন না। সত্য প্রকাশে তাঁরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও প্রতি তাঁরা আশা করেন না। অন্য কাউকে ভয় পান না। ইচ্ছাকৃত কোনো অন্যায় ও পাপে লিপ্ত হন না। তাঁরা পৃথিবীর সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বোত্তম মানুষ। আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যাপারে বলেন, ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا﴾ অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' [আহযাব : ২১] এটা সকল নবি-রাসুলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কিন্তু তাঁরা যেহেতু মানুষ, ফলে সেসব মানবিক বিশেষণের ঊর্ধ্বে ছিলেন না, যা তাঁদের জন্য অশোভন নয়। ফলে তারা পানাহার করতেন, ঘুমাতেন, বিবাহ ও সংসার করতেন। ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যাবসা-বাণিজ্য করতেন। সফর করতেন, জিহাদ

করতেন। বিপদাপদে আক্রান্ত হতেন। গরম বা ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতেন। ক্ষুধা ও পিপাসা অনুভব করতেন। ক্লান্ত হতেন, অসুস্থ হতেন। অনেকে আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণও করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ব্যাপারে বলেন, ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِ﴾ অর্থ : 'আমি আপনার পূর্বে যত রাসুল পাঠিয়েছি, তাঁদের প্রত্যেকে খাবার খেত, বাজারে যেত।' [ফুরকান : ২০] অর্থাৎ, তাঁরা মানবিক দিক থেকে অন্য সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন। আদম সন্তান ছিলেন। মানবীয় প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা সাধারণ মানুষের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির অধিকারী নন।

নবি-রাসুলের পার্থক্য

প্রথমেই বলে নেওয়া উচিত, কুরআন ও সুন্নাহতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো কথা বলা হয়নি। ফলে এটা নিয়ে যে উম্মতের মাঝে মতভেদ হবে, সেটা তো একদম লিখিত ছিল। বাস্তবেও তা-ই হয়েছে। নবি ও রাসুলের পরিচয় ও পার্থক্য নিয়ে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ এতটাই মতভেদ করেছেন যে, সেখান থেকে চূড়ান্ত কোনো ফয়সালা দেওয়া দুরূহ। আরও জটিলতা হলো, এ ব্যাপারে ইমাম আজম রহ.-এর কোনো বক্তব্য নেই, ইমাম তহাবিরও বক্তব্য নেই। ফলে এক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তী যুগের আলেমদের কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

একদল আলেম মনে করেন, নবি ও রাসুলদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, দুজনই সমান। নবি ও রাসুল প্রত্যেকের কাছেই ওহি আসত, প্রত্যেকেই আল্লাহর পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এই মত পোষণ করেন প্রসিদ্ধ একদল হানাফি, আশআরি ও মুতাযিলি আলেম। তাদের মাঝে কামাল ইবনুল হুমাম, যমখশারি, আজুদ্দিন ইজি, তাফতাযানি, শরিফ জুরজানি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এভাবে নবি ও রাসুলের মাঝে পার্থক্য না থাকার ক্ষেত্রে হানাফি, আশআরি ও মুতাযিলি মাসলাকের মাঝে বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। প্রত্যেক আলেম নিজস্ব ইজতিহাদ অনুযায়ী ফয়সালা দিয়েছেন। কারও ইজতিহাদ সঠিক হয়েছে, কারওটা ভুল। যেমন—নবি ও রাসুলকে এক ও সমার্থক বলা ভুল।[৯২২]

আরেক দল আলেম মনে করেন, রাসুল হচ্ছেন যার কাছে ওহি আসে এবং যাকে দাওয়াত ও তাবলিগের নির্দেশ দেওয়া হয়; আর নবি হচ্ছেন যার কাছে ওহি আসে, কিন্তু দাওয়াত ও তাবলিগের নির্দেশ দেওয়া হয় না। এটাও সঠিক কথা নয়।

---

৯২২. দেখুন : ফয়যুল কাদির, মুনাভি (১/২০-২২)।

কারণ, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে নবি ও রাসুল দুজনকেই 'প্রেরণ করা'র কথা বলেছেন। [হজ : ৫২] আর এভাবে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যেই হলো দাওয়াত ও তাবলিগ—আল্লাহর পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। স্রেফ নিজের আমল শোধরানোর জন্য ওহিপ্রাপ্তির বিশেষ কোনো অর্থ নেই।

এভাবে আমরা নবি-রাসুলের পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলেমদের নানামুখী বক্তব্যের সম্মুখীন হব, যেখান থেকে চূড়ান্ত কোনো ফলাফল পাওয়া কঠিন। তথাপি আলোচনার পূর্ণতার প্রতি লক্ষ রেখে এ ব্যাপারে আমরা আলেমদের আরও কিছু মতামত তুলে ধরব এবং শেষে আমাদের পর্যবেক্ষণ পেশ করব।

কাযি সদর বাযদাবি (৪৯৩ হি.) বলেন, 'প্রত্যেক রাসুল নবি, কিন্তু প্রত্যেক নবি রাসুল নন। কেননা, নবি হলেন যার কাছে খবর বা প্রত্যাদেশ আসে; আর রাসুল হলেন যাকে কোনো সম্প্রদায়ের কাছে মিশন দিয়ে পাঠানো হয়। অন্যকথায়, রাসুল হলেন, আল্লাহ তায়ালা যার কাছে জিবরাইলকে পাঠান, যাকে তার সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়, তাদের শরিয়ত শেখাতে নির্দেশ দেওয়া হয়, আল্লাহ যাকে শরিয়ত দান করেন। আর নবি হলেন, আল্লাহ যার কাছ জিবরাইলকে পাঠান না; তাঁকে শরিয়ত দেন না, বরং ইলহাম কিংবা স্বপ্নের মাধ্যমে তাকে ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকার নির্দেশ দেন। অথবা অন্য কোনো রাসুলের মাধ্যমে তাকে জানান যে, তিনি নবি; তিনি যেন মানুষকে আল্লাহর প্রতি ডাকেন।'[৯২৩]

বায়যাবি (৬৮৫ হি.) লিখেন, 'রাসুল হচ্ছেন যাকে আল্লাহ তায়ালা নতুন শরিয়ত দিয়ে পাঠান। আর নবি হচ্ছেন যিনি আগের শরিয়তের অনুসারী হন। যেমন—মুসা ও ঈসার মধ্যবর্তী বনি ইসরাইলের নবিগণ। সুতরাং নবি রাসুলের চেয়ে 'আম।' অর্থাৎ প্রত্যেক রাসুল নবি, কিন্তু প্রত্যেক নবি রাসুল নন। নবি ও রাসুলের পার্থক্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন—রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে নবিদের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এক লাখ অথবা দুই লাখ চব্বিশ হাজার। রাসুলদের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন, তিনশত তেরো জন। তবে নবি ও রাসুলের মাঝে আরও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্যের কথা বলা হয়। যেমন—কারও মতে, রাসুল হচ্ছেন যার কিতাব ও মুজিযা রয়েছে; আর নবি হচ্ছেন যার কিতাব নেই। কেউ মনে করেন, রাসুল হচ্ছেন যার কাছে সরাসরি

---

৯২৩. উসুলুদ্দিন (২২৯)।

ফেরেশতা ওহি নিয়ে আসেন; আর নবি হচ্ছেন যার কাছে স্বপ্নের মাধ্যমে ওহি পাঠানো হয় ইত্যাদি।'[৯২৪]

মাগনিসাভি লিখেন, 'কোনো কোনো আলেমের মতে, নবি ও রাসুলের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবে (আমার) কথা হলো, রাসুল হচ্ছেন যাকে আলাদা কিতাব ও শরিয়ত দেওয়া হয়; আর নবি হচ্ছেন যাকে এগুলো দেওয়া হয় না। ফলে রাসুল নবির তুলনায় অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রাখেন। তবে পার্থক্য থাক বা না থাক, কিতাব অবতীর্ণ হোক বা না হোক, সকল নবির উপর ঈমান আনা আবশ্যক।'[৯২৫]

মাহমুদ কওনভি তাঁর আকিদাহ তহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যায় লিখেন, 'রাসুল হচ্ছেন আল্লাহ যাকে কোনো সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেন এবং আগের রাসুলের দ্বীনের চেয়ে ভিন্ন নতুন নির্দেশনা দান করেন। তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ হোক বা না হোক এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর নবি হলেন যার কাছে কিতাব অবতীর্ণ হয়নি এবং যাকে নতুন কোনো নির্দেশনাও দেওয়া হয়নি; বরং যিনি আগের রাসুলের দ্বীন অনুসরণ করেন।' কওনভির ব্যাখ্যা অনুযায়ী রাসুল হওয়ার জন্য নতুন শরিয়তের অধিকারী হওয়া মুখ্য, কিতাব মুখ্য নয়। বিপরীতে নবি হওয়ার জন্য আগের শরিয়তের অনুসারী হওয়া মুখ্য।[৯২৬]

সাফফার বুখারি লিখেন, 'প্রত্যেক নবি (এক হিসেবে) রাসুল। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ অর্থ : "রাসুল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন এবং (ঈমান এনেছে) মুমিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসুলগণে ঈমান এনেছে। তারা বলে, 'আমরা তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।' আর তারা বলে, 'আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।" [বাকারা : ২৮৫] এটা সবার জানা যে, নবি-রাসুল সবার প্রতি ঈমান রাখতে হবে। নবিদের অস্বীকার

---

৯২৪. তাফসিরে বায়যাবি (৪/৭৫)।

৯২৫. শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১০৫)।

৯২৬. দেখুন : আল কালাইদ (৪০)।

করে কেবল রাসুলদের উপর ঈমান রাখলে হবে না। সুতরাং এই আয়াতে রাসুলদের মাঝে নবিগণও অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا﴾ অর্থ : 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করো এবং বিশ্বাস স্থাপন করো তাঁর রাসুল ও তাঁর কিতাবের উপর যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসুলের উপর। ঈমান আনো সে সমস্ত কিতাবের উপর যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতঃপূর্বে। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর এবং রাসুলগণের উপর ও কিয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।' [নিসা : ১৩৬] তবে আল্লাহ যেহেতু নবি ও রাসুল নামে দুটো অভিধা দিয়েছেন, বোঝা গেল, তাদের মাঝে পার্থক্য আছে। ফলে রাসুল হলেন শরিয়ত ও কিতাবের অধিকারী, যিনি আল্লাহর নির্দেশে পূর্বের শরিয়তকে রহিত করে দেন। কিন্তু নবি তাঁর পূর্বের রাসুলের শরিয়তের অনুসারী এবং কিতাবের সুরক্ষা দানকারী হয়ে থাকেন, যেমনটা হারুন আলাইহিস সালাম ছিলেন মুসার সঙ্গে; লুত ছিলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সঙ্গে।'[৯২৭]

অধমের পর্যবেক্ষণ : উপরের আলোচনাশেষে অধমের কাছে অগ্রগণ্য মত হলো, রাসুল হলেন : (এক) যাকে স্বতন্ত্র শরিয়ত দেওয়া হয়, (দুই.) বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়ের মাঝে যিনি দাওয়াতের কাজ করেন। এই দুটো বৈশিষ্ট্য যার মাঝে পাওয়া যাবে, তিনি রাসুল। 'রাসুল'-এর শাব্দিক অর্থ এবং কুরআন-সুন্নাহতে রাসুলদের সংগ্রাম দেখলে এই দুটো অভিন্ন বৈশিষ্ট্য সবার মাঝে চোখে পড়ে। এখানে কিতাব দেওয়া না-দেওয়া মুখ্য নয়। জিবরাইল সরাসরি আসা না-আসাও মুখ্য নয়। কারণ, ওহির একাধিক প্রকার রয়েছে। ফলে যিনি বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়ের কাছে নতুন শরিয়ত নিয়ে আগমন করেন, আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেন, তিনিই রাসুল। ওহির অধিকারী (চাই সেটা ওহির যেকোনো প্রকারই হোক) বাকি সবাই নবি।

তবে এ বক্তব্যকেই আমরা চূড়ান্ত বলতে পারছি না; বরং আমাদের কথা হলো বিষয়টা মতভেদপূর্ণ থাকবেই। কারণ, প্রথমত এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে কোনো সুস্পষ্ট আলোচনা আসেনি। দ্বিতীয়ত সাহাবা বা তাবেয়িসহ প্রথম যুগের

---

৯২৭. দেখুন : তালখিসুল আদিল্লাহ (১৬৮-১৬৯)।

সালাফ এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য দেননি। তৃতীয়ত কুরআন ও সুন্নাহতে হাতেগোনা কয়েকজন নবির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাজার হাজার নবির নবুওত ও রিসালাতের বিস্তারিত আলোচনা দূরের কথা, নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। ফলে তাদের জানা ব্যতীত মাত্র কয়েকজন নবি-রাসুলের ব্যাপারে শরিয়তে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত কিছু নস (বক্তব্য) ইজতিহাদ করে চূড়ান্ত বক্তব্য দেওয়া নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। তাই এ ব্যাপারে আমরা নীরব-নিরপেক্ষ থাকব। যাদের কুরআন-সুন্নাহতে রাসুল বলা হয়েছে কেবল তাদের রাসুল বলব। বাকি সবাইকে নবি গণ্য করব।

নবি-রাসুলদের সংখ্যা

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে যত নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন, সবার উপর ঈমান আনতে হবে। নবি প্রমাণিত এমন কোনো একজনের নবুওত অস্বীকার করলে সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। নবি ও রাসুলদের সংখ্যার ব্যাপারেও নানান বক্তব্য পাওয়া যায়। কারণ, কুরআন এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কিছু বলেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ অর্থ : 'আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসুল পাঠিয়েছি যাদের কতক রাসুলের কথা আপনাকে বলেছি। অনেক রাসুলের কথা আপনাকে বলিনি।' [নিসা : ১৬৪] নবি-রাসুলদের সংখ্যার ব্যাপারে যেসব হাদিস বর্ণিত আছে সেগুলো দুর্বল। তাই উত্তম হলো তাদের সংখ্যার ব্যাপারে নীরব থাকা।

বাযদাবি বলেন, "নবি-রাসুলদের ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বলা উচিত নয়। কারণ, এটা কুরআন-সুন্নাহতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়। কুরআনে কেবল বলা হয়েছে, ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ অর্থ : 'আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি। তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি।' [গাফের : ৭৮] সুতরাং সকল নবি-রাসুলের উপর ঈমান আনাই যথেষ্ট; তাদের সংখ্যা জানা নিষ্প্রয়োজন।"[৯২৮]

নাসাফি লিখেন, (যেহেতু নবি-রাসুলের সংখ্যা চূড়ান্তরূপে জানা নেই) 'সেহেতু নিরাপদ পন্থা হলো এভাবে বলা : আমি আল্লাহর উপর ঈমান রাখি, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা-কিছু এসেছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যসহ তাতে বিশ্বাস করি। আমি আল্লাহর প্রেরিত সকল নবি-রাসুলের প্রতি ঈমান রাখি। এভাবে বললে

---

৯২৮. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২২৯)।

যিনি নবি ছিলেন এমন কাউকে অবিশ্বাস করা হবে না; আবার যিনি নবি ছিলেন না এমন কাউকে নবি বানানো হবে না।'[৯২৯]

নবুওত ও রিসালাত চিরন্তন

নবি ও রাসুলের বৈশিষ্ট্য চিরন্তন। অর্থাৎ, নবির মৃত্যুর পরও তাঁর নবুওতের মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে। রাসুলের ওফাতের পরও তাঁর রিসালাতের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান থাকে। এগুলো কবর, হাশর এমনকি জান্নাতেও থাকবে। কারণ, এগুলো আল্লাহর চিরন্তন ও শাশ্বত অনুগ্রহ। এটা বোঝার জন্য গভীরে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ মুমিন ও ওলির বৈশিষ্ট্যও তো মৃত্যুর পরে অব্যাহত থাকে। আল্লাহর একজন ওলি কি মৃত্যুর পরে ফাসেক হয়ে যান? তার বেলায়াত ছিনিয়ে নেওয়া হয়? কখনোই নয়। তাহলে নবুওত ও রিসালাতের মর্যাদা কেন থাকবে না? বোঝা গেল, এটাও স্বাভাবিকভাবেই অব্যাহত থাকে। হ্যাঁ, দায়িত্ব থেকে তারা অব্যাহতি পান। এটা স্বাভাবিক। কারণ, দুনিয়া হচ্ছে কর্মস্থল, পরকাল সে কর্মের ফলাফল পাওয়ার জায়গা।

মুতাযিলারা বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পরে নবি-রাসুলের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অবশিষ্ট থাকে না! এটা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য। একইভাবে একদল ভ্রান্ত সুফিরও ধারণা হলো, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নবুওত ও রিসালাত শেষ হয়ে যায়। এ কারণে তারা ওলিদের নবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। এটাও চূড়ান্ত পর্যায়ের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য।[৯৩০]

নারীরা কি নবি হতে পারে?

কোনো নারী নবি হতে পারেন কি না? এ ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে কথা বলেননি। তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িনও এটা নিয়ে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। ফলে এ ব্যাপারে ইমাম আজম রহ.-এর কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। আকিদার গ্রন্থগুলো অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, খুব সম্ভবত আবুল হাসান আশআরি সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি নারীদের নবি হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। পরবর্তীকালে একদল আলেম তাঁর অনুসরণ করেছেন।[৯৩১]

---

৯২৯. বাহরুল কালাম (২৮২)।

৯৩০. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২২৯)।

৯৩১. দেখুন : তালবিসুল আদিল্লাহ (১৬৬)।

এক্ষেত্রে তাদের দলিল হলো কুরআনের সেসব আয়াত, যেগুলোতে নারীদের কাছে ওহির আগমন এবং তাদের সঙ্গে ফেরেশতার কথোপকথন-সম্পর্কিত বয়ান পাওয়া যায়। যেমন—আল্লাহ তায়ালা মারইয়াম আলাইহিস সালামের কাছে জিবরিল আলাইহিস সালামকে মানুষের আকৃতিতে পাঠান। তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলেন [মারইয়াম : ১৬-২১]। আল্লাহ তায়ালা মুসা আলাইহিস সালামের মায়ের কাছে ওহি পাঠিয়েছেন [তহা : ৩৮]। ইসহাক আলাইহিস সালামের মাতা সারার কাছে ফেরেশতারা এসেছেন এবং কথা বলেছেন [হুদ : ৭১-৭৩। এ ধরনের ঘটনা নবি ছাড়া অন্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘটে না। এ কারণে প্রথমোক্ত আলেমগণ পৃথিবীর প্রথম মানবী হাওয়া, মুসার মাতা, ঈসার মাতা মারইয়াম ও ফিরাউনের স্ত্রীকে নবি সাব্যস্ত করেছেন।

কিন্তু উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম উক্ত মতের বিরোধী। কারণ, কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা কোনো নারী নবি হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পঁচিশজন নবি-রাসুলের নাম উল্লেখ করলেও তাতে কোনো নারীর নাম নেই। ফেরেশতাদের সঙ্গে কথোপকথন কিংবা ওহি আগমনের কারণেও তাদের নিশ্চিতভাবে নবি বলা যায় না। এটা নারী জাতির ত্রুটি কিংবা তাদের প্রতি অবজ্ঞা নয়; বরং দাওয়াত ও তাবলিগের সঙ্গে নারীর প্রকৃতির একটা বড় রকমের অসামঞ্জস্যতা আছে, জিহাদ ও লড়াই-সংগ্রামের ক্ষেত্রে মাঠে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে নারী প্রকৃতির একটা বৈপরীত্য আছে, ফলে আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহপূর্বক কোনো নারীর উপর এ ধরনের গুরুদায়িত্ব দেননি।

অধমের পর্যবেক্ষণ : এটা আলেমদের ইজতিহাদ। এ বিষয়ে প্রকৃত ও চূড়ান্ত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছে। যদিও কুরআনে কোনো নারীকে সরাসরি নবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি, তথাপি ইসহাক আলাইহিস সালামের মাতা সারা, মুসা আলাইহিস সালামের মাতা [তাঁর নাম সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না], ঈসা আলাইহিস সালামের মাতা মারইয়াম প্রমুখ নারীকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে যেভাবে উল্লেখ করেছেন, তাতে তারা পুরুষ হলে আলেমগণ নিশ্চিতভাবে তাদের নবি বলতেন। অর্থাৎ, যেসব আয়াতের মাধ্যমে একাধিক নবির নবুওত প্রমাণ করা হয়েছে, এসব আয়াতের ভাষ্য, বাকরীতি, সম্বোধনের তরিকা আর সেসব আয়াতের ভাষ্যের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। স্রেফ নারী হওয়ার কারণে এসব আয়াতকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা নিরপেক্ষ গবেষণার সামনে নড়বড়ে প্রমাণিত হয়। ফলে এসব নারী নবি হলেও হতে পারেন। জরুরি

নয় যে, তাদের উপর পুরুষ নবিদের সমান দায়িত্ব থাকবে; বরং তাদের প্রকৃতির ভিন্নতার মতো তাদের দায়িত্বও পুরুষ নবিদের চেয়ে ভিন্ন হওয়া সম্ভব। তবে যেহেতু বিষয়টি মতভেদপূর্ণ এবং কুরআন-সুন্নাহতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই, তাই এ বিষয়ের চূড়ান্ত জ্ঞান আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়াই উত্তম।

হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইবরাহিম আ.-এর কোনো সম্পর্ক নেই

হিন্দুরা কি ইসলামের কোনো নবিকে বিশ্বাস করে? আবুল ইউসর বাযদাবি লিখেন : "হিন্দুরা নুহ, ইবরাহিম ও ইদরিস আলাইহিমুস সালামের নবুওতে বিশ্বাস করে, অন্যান্য নবিকে অস্বীকার করে। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রতি বিশ্বাসের কারণে তাদের 'ব্রাহ্মণ্যবাদ'-এর অনুসারী বলা হয়।"[৯৩২]

বাযদাবির এই বক্তব্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং অনুমানভিত্তিক। শতাব্দের পর শতাব্দ কিছু মানুষ এমন ধারণা করে এসেছে। বর্তমানেও কিছু গবেষক এ ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। কিন্তু এটার কোনো ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সঙ্গে হিন্দুধর্মের কোনো প্রমাণিত ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। ব্রাহ্মণ্যবাদ আরবি (البراهما) থেকে উদ্‌গত। আর ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আরবি নিসবতি রূপ হচ্ছে (الإبراهيمي) ইবরাহিমি; ব্রাহ্মণ্য নয়। তা ছাড়া, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্মস্থান ও বসবাসের স্থানের সঙ্গে ভারতের দূরতম সম্পর্ক নেই। তাঁর আনীত দ্বীনের সম্পর্ক তো মোটেই নেই। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাওহিদবাদীদের ইমাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ অর্থ : 'ইবরাহিম ইহুদি ছিলেন না, খ্রিষ্টানও ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ মুসলিম। তিনি কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।' [আলে ইমরান : ৬৭] তাঁর আনীত শরিয়ত বিকৃত হয়ে যাওয়ার পরও মক্কার কাফেরদের মাঝে অনেককিছু অবশিষ্ট ছিল। নবুওতের আগে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইবরাহিমি শরিয়ত মোতাবেক ইবাদত করতেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। বরং ইবরাহিমি শরিয়তের অনেক বিষয় পরবর্তীকালে ইসলামি শরিয়তেও অনুমোদিত হয়। এগুলো সব রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগের তথা ঈসায়ি ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দের চিত্র। অপরদিকে হিন্দুধর্ম শুরু থেকেই পৌত্তলিকতার

---

৯৩২. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (৯৫)।

ভাগাড়। খ্রিষ্টপূর্ব কয়েক হাজার বছর আগ থেকে ভারতের যে ভাঙাচোরা ইতিহাস পাওয়া যায়, সে সবকিছু পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজায় ভরপুর। তাওহিদ ও মিল্লাতে ইবরাহিমির ছিটেফোঁটা নিদর্শন নেই সেখানে। ইবরাহিমি ধর্মের ন্যূনতম সাদৃশ্যও নেই তাতে।

হ্যাঁ, বেদসহ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন প্রধান গ্রন্থে একত্ববাদের কিছু আভাস পাওয়া যায়, ইসলামের তাওহিদ ও নবি-রাসুলের বিশ্বাসের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এগুলো ভারতে আসা নবি-রাসুলের দাওয়াতের অবশিষ্ট ছটা। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু পৃথিবীর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মাঝে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন [নাহল : ৩৬; রাদ : ৭; ফাতির : ২৪] সুতরাং ভারতেও অবশ্যই নবি-রাসুল এসে থাকবেন। তারা ভারতবাসীকে আল্লাহর পথে, তাওহিদের দিকে ডেকে থাকবেন। পরবর্তীকালে তাওহিদের দাওয়াতে বিকৃতি এসেছে। ভারতবাসী তাওহিদ ভুলে পৌত্তলিকতার সাগরে তলিয়ে গিয়েছে। রয়ে গেছে পুরোনো তাওহিদের বিন্দু বিন্দু নিদর্শন, যেগুলো সেসব প্রাচীন নবি-রাসুলের দাওয়াত ও দীক্ষার ফল হয়ে থাকবে। কিন্তু ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সঙ্গে এগুলোর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল দ্বীনে ইবরাহিম—এ ধারণার শরয়ি ও ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই। একই কথা প্রযোজ্য ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের ব্যাপারেও। ইসলামি শিক্ষার সঙ্গে কিছু সাদৃশ্যের উপর ভর করে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রমুখকে নবি বলার সুযোগ নেই। তারা নবি হলেও হতে পারেন। কিন্তু আমাদের হাতে এর কোনো মজবুত দলিল নেই। ফলে আমরা তাদের নবি বলতে পারি না। ইসলামে কুরআন-সুন্নাহর বাইরে অন্য কারও জন্য নবুওত সাব্যস্ত করা বৈধ নয়।

শাহরাস্তানি সঠিক লিখেছেন, “একদল লোক মনে করেছে ‘ইবরাহিম’ আলাইহিস সালামের নামে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নাম হয়েছে। এটা ভুল ধারণা। এই সম্প্রদায় নবুওত ও রিসালাতে মোটেই বিশ্বাস করে না। ফলে ইবরাহিমকেও তারা নবি মানে না।”[৯৩৩]

আদম আ. নবি ছিলেন, রাসুল নন

মুতাযিলাদের খণ্ডন করতে গিয়ে বাযদাবি লিখেন, ‘মুসলমানদের বিশ্বাস হলো—আদম আলাইহিস সালাম রাসুল ছিলেন। তিনি তার মতের পক্ষে কুরআনের এই আয়াত দিয়ে দলিল দেন : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ

৯৩৩. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, শাহরাস্তানি (৩/৯৫)।

﴿عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ অর্থ : 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম, নুহ, ইবরাহিমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে সমস্ত জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' [আলে ইমরান : ৩৩] বাযদাবি বলেন, 'রাসুল হচ্ছেন মনোনীত ব্যক্তি। এই মনোনয়ন সকল রাসুলের বৈশিষ্ট্য। আর এখানে তাকে নুহের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। নুহ রাসুল ছিলেন। সুতরাং আদমও রাসুল।' তা ছাড়া, তিনি যুক্তি দেন, আদমের সঙ্গে হাওয়া ছিলেন, পরবর্তীকালে তাদের সন্তানগণ ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের রিসালাত দরকার ছিল। বরং আদমের নিজেরও বিধিবিধান জানা জরুরি ছিল। ফলে তিনি রাসুল ছিলেন।[৯৩৪] প্রশ্ন হলো, এটা কতটুকু সঠিক বক্তব্য?

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় লম্বা আলোচনা করলেও তিনি তাঁর ব্যাপারে 'নবি' বা 'রাসুল' কোনো শব্দ ব্যবহার করেননি। তবে তাঁর শানে 'ইস্তিফা' (নির্বাচন, মনোনয়ন)সহ এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যা তাঁর নবি হওয়ার প্রমাণ। বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে বড় বড় নবি-রাসুলের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন [আলে ইমরান : ৩৩]। তাঁকে সরাসরি সম্বোধন করেছেন, নাম ধরে ডেকেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَقُلْنَا
يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾
অর্থ : 'আর আমি বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেথা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার করো। কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' [বাকারা : ৩৫] ফলে আদম আলাইহিস সালাম যে নবি ছিলেন এটা অনেকটা শক্তিশালী হয়। একটি দুর্বল হাদিসেও সরাসরি তাঁকে নবি বলা হয়েছে।[৯৩৫] কুরআনের সমর্থনে থাকার কারণে সেটা গ্রহণ করা যায়।

মোটকথা, আদম আলাইহিস সালাম নবি ছিলেন এটা একরকম সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এ ব্যাপারে উম্মাহর সকল মুহাক্কিক একমত। তবে তাঁর রিসালাত প্রমাণিত নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম তাঁকে 'রাসুল' বলেননি। বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারাও তাঁর রাসুল না হওয়ার বিষয়টাই বোঝা যায়। যেমন—কিয়ামতের দিন শাফায়াতসংক্রান্ত লম্বা হাদিসে নুহ আলাইহিস সালামকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম

---

৯৩৪. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (৯৯-১০০)।

৯৩৫. মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুল আনসার : ২১৯৪৭)। বাযযার (মুসনাদু আবি যর গিফারি : ৪০৩৪)।

রাসুল সাব্যস্ত করা হয়েছে।[৯৩৬] এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আদম আলাইহিস সালাম নুহ আলাইহিস সালামের আগে ছিলেন। ফলে তিনি রাসুল হলে নুহকে সর্বপ্রথম রাসুল বলা ভুল। এতে প্রমাণিত হয়, আদম আলাইহিস সালাম কেবল নবি ছিলেন, আর নুহ আলাইহিস সালাম ছিলেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাসুল।

তা ছাড়া, আদম আলাইহিস সালামের দাওয়াত ও তাবলিগের প্রকৃতিও তাঁর নবুওতের প্রমাণ; রিসালাতের প্রমাণ বহন করে না। কারণ, তিনি পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব। তাঁর বংশধরদের মাঝেই তিনি দাওয়াত, তালিম ও তরবিয়তের কাজ করেছেন। বিরুদ্ধবাদী ও কাফের-মুশরিক সম্প্রদায়ের মোকাবিলা করতে হয়নি তাঁকে। উপরন্তু তাঁর সময়ে শিরকের প্রকাশই ঘটেনি। বরং সকল মানুষ বিশুদ্ধ তাওহিদের উপর ছিল। হাজার হাজার বছর পরে শিরকের সর্বপ্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে নুহ আলাইহিস সালামের সময়ে। ফলে দাওয়াতের জন্য রাসুলদের যে জিহাদ ও সংগ্রাম করতে হয়, কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাদের যে নানা ফ্রন্টে লড়াই করতে হয়, সেটা আদম আলাইহিস সালামকে করতে হয়নি। এর মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় তিনি একজন নবি ছিলেন, রাসুল ছিলেন না।

নবি-রাসুলের দাওয়াতের অভিন্নতা

আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে নবি পাঠিয়েছেন। যদিও বিভিন্ন রাসুলের শরিয়ত ভিন্ন ভিন্ন ছিল, তথাপি সকলের ঈমান ও আকিদা ছিল এক ও অভিন্ন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ অর্থ : 'আল্লাহর ইবাদত এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ হেদায়াত দিয়েছেন, আর কতকের উপর গোমরাহি অবধারিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কী হয়েছে।' [নাহল : ৩৬] আরও বলেন, ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ অর্থ : 'আমি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। বস্তুত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের

---

৯৩৬. বুখারি (কিতাবু তাফসিরিল কুরআন : ৪৪৭৬)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৯৩)।

মাঝেই সতর্ককারী গত হয়েছেন।' [ফাতির : ২৪] অন্যত্র রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ অর্থ : 'আপনি তো একজন সতর্ককারী। আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশক রয়েছে।' [রাদ : ৭] ধারাবাহিক নবি পাঠানোর ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۚ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَٰهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾ অর্থ : 'এরপর আমি একের পর এক আমার রাসুল প্রেরণ করেছি। যখনই কোনো জাতির নিকট রাসুল এসেছে, তখনই এরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। এরপর আমি এদের একের পর একেকে ধ্বংস করলাম। আমি এদের কাহিনির বিষয় করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা।' [মুমিনুন : ৪৪]

ইমাম আজম রহ. বলেন, **'সকল রাসুলের দ্বীন এক ও অভিন্ন। তাঁদের ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন ছিল না। কোনো নবি বা রাসুল তাঁর উম্মতকে পূর্বের রাসুলের দ্বীন পরিত্যাগের দাওয়াত দেননি। কারণ, তাঁদের সকলের দ্বীন এক। হ্যাঁ, শরিয়ত (শাখাগত বিধিবিধান) ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তাই প্রত্যেক রাসুল তাঁর নিজস্ব শরিয়তের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, অন্য রাসুলদের শরিয়তের দিকে নয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেছেন,** لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً **অর্থ 'আর আমি প্রত্যেকের জন্য শরিয়ত ও জীবন-বিধান তৈরি করেছি। আর তিনি যদি চাইতেন তবে সবাইকে একটি উম্মতে পরিণত করতেন।' [মায়িদা : ৪৮] ফলে শরিয়তের ক্ষেত্রে নবি-রাসুলগণ এবং তাদের উম্মতরা ভিন্ন, কিন্তু তাওহিদের ক্ষেত্রে সবাই এক। আল্লাহ সবাইকে দ্বীন তথা তাওহিদের রজ্জুতে এক হতে বলেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন :** شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ **অর্থ : 'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নুহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।' [শুরা : ১৩] আল্লাহ আরও বলেন,** فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ **অর্থ : 'তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। এটাই আল্লাহর ফিতরত, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি**

করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই চিরন্তন সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' বোঝা গেল, নবিদের দ্বীন এক ও অভিন্ন। দ্বীনের মাঝে কখনোই কোনো পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু শরিয়ত ভিন্ন ভিন্ন। ফলে শরিয়তের মাঝে পরিবর্তন এসেছে। এক শরিয়তে যেটা হালাল ছিল, অন্য শরিয়তে সেটা হারাম করা হয়েছে। এক উম্মতকে আল্লাহ একটি জিনিস করতে বলেছেন, আরেক উম্মতকে সেটা করতে নিষেধ করেছেন।'[৯৩৭]

ইমাম আজম বলেন, 'ফলে দ্বীন হলো তাওহিদ। আল্লাহ সকল নবি-রাসুলকে অভিন্ন দ্বীন (তাওহিদ) দিয়ে পাঠিয়েছেন। এক্ষেত্রে মতভেদ করতে নিষেধ করেছেন। শরিয়ত হলো ফরয বিধিবিধান। আল্লাহ যেসব বিধিনিষেধ দান করেছেন, সেগুলোকে শরিয়ত বলা হবে; দ্বীন নয়। কারণ, সেগুলোকেও যদি দ্বীন বলা হয়, তবে কেউ আল্লাহর কোনো ফরয বিধান (উদাহরণস্বরূপ নামায বা রোযা) ছেড়ে দিলেই বলা হতো যে, সে আল্লাহর দ্বীন পরিত্যাগ করেছে এবং সে কাফের গণ্য হতো। এতে বিবাহ, উত্তরাধিকার, জানাযা, যবেহ ইত্যাদি সবকিছু থেকে সে বঞ্চিত হতো। অথচ তেমন হয় না।'[৯৩৮]

সকল নবির উপর ঈমান আনা আবশ্যক : যেহেতু সকল নবির ধর্ম ও দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন, যেহেতু সকল নবি-রাসুল কেবল ইসলামের দিকেই দাওয়াত দিয়েছেন, 'এ কারণে সকল নবির উপর ঈমান আনা জরুরি। কেউ যদি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আনীত গোটা দ্বীনকে বিশ্বাস করে স্রেফ এটুকু বলে যে, মুসা ও ঈসা নবি ছিলেন কি না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।'[৯৩৯]

ইমাম তহাবি রহ. বলেন, 'আমরা আল্লাহর প্রেরিত রাসুলগণের মাঝে কোনো পার্থক্য করি না। তাদের সবার আনীত পয়গামকে সত্য বলে মানি।'[৯৪০]

বাযদাবি লিখেন, 'রাসুলদের মাঝে কোনো পার্থক্য করা যাবে না। কারও রিসালাত মেনে অন্যদের রিসালাত প্রত্যাখ্যান করা যাবে না, যেমনটা ব্রাহ্মণ,

---

৯৩৭. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১১-১২)।
৯৩৮. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১২)।
৯৩৯. আল-ফিকহুল আবসাত (৪৭)।
৯৪০. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২২)।

ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা করেছে। কারণ, যে মানদণ্ডে একজনের রিসালাত মেনে নিতে হয়, সেই একই মানদণ্ডে অন্যদের রিসালাতও মেনে নিতে হবে। ফলে একজনকে অস্বীকার করা মানে সকল রাসুলকে অস্বীকার করা।'[৯৪১] এ কারণেই ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে অস্বীকার করার কারণে ইহুদিরা কাফের। মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে অস্বীকার করার কারণে খ্রিষ্টানরা কাফের।

নবি-রাসুলগণের মর্যাদার তারতম্য

নবি-রাসুলগণ সাধারণ মানুষের তুলনায় মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রতিষ্ঠিত আকিদা। ইমাম আজম বলেন, '**নবিগণ বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের সাধারণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ, তারা এমন কিছু বৈশিষ্ট্যেমণ্ডিত যা থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম হলো নবুওত ও রিসালাত। তারা এক্ষেত্রে সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়ত আল্লাহর ভয় এবং তাঁর প্রতি আশা। উত্তম চরিত্র-মাধুর্য। এগুলোর ক্ষেত্রেও তারা সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তা ছাড়া, নবিগণ ফেরেশতা ও আল্লাহর বিস্ময়কর যেসব নিদর্শন দেখেছেন, সাধারণ মানুষ সেগুলো থেকেও বঞ্চিত। নবিগণ বিপদে-আপদে হতাশাগ্রস্ত হন না, ভেঙে পড়েন না। সাধারণ মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়, ভেঙে পড়ে। সবশেষে নবিগণ গুনাহের কারণে অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর আপতিত শাস্তির কথা জানেন। এটা গুনাহ এবং তাদের মাঝে প্রাচীর হিসেবে কাজ করে।**'[৯৪২]

এভাবে নবিগণ পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ, সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ, সবচেয়ে মর্যাদাময় মানুষ, আল্লাহর সবচেয়ে কাছের মানুষ। তবে সকল নবির মর্যাদা সমান নয়। সকল নবি সম্মান এবং আল্লাহর নৈকট্যের ক্ষেত্রে সমস্তরে নন। কারণ, ওহি ও নবুওতপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এক হলেও দ্বীনের জন্য কুরবানি, মুজাহাদা, আল্লাহর ভালোবাসা, মনোনয়নসহ বিভিন্ন কারণে তাদের মাঝে মর্যাদার তারতম্য হয়ে থাকে। এটা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং উম্মতের ইজমা তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। ফলে স্বাভাবিকভাবে সকল রাসুল সকল নবির চেয়ে উত্তম। কারণ, প্রত্যেক রাসুল নবি; কিন্তু প্রত্যেক নবি রাসুল নন। আবার রাসুলগণের মাঝে থেকেও সবার মর্যাদা সমান নয়। বরং কিছু রাসুল কিছু রাসুলের চেয়ে উত্তম। ইমাম তহাবি রহ. বলেন, 'আমরা পূর্ণ বিশ্বাস, সত্যায়ন ও সমর্পণপূর্বক ঘোষণা করছি,

---

৯৪১. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১০১)। আরও দেখুন : লুবাবুল কালাম, উসমান্দি (পাণ্ডুলিপি : ৫৭)।
৯৪২. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৫)।

আল্লাহ তায়ালা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। আমরা ফেরেশতা, নবিগণ, রাসুলদের উপর অবতীর্ণ সকল আসমানি গ্রন্থে ঈমান রাখি। আমরা সাক্ষ্য দিই যে, তারা সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।'[৯৪৩] ইমাম তহাবির কথায় স্পষ্ট যে, সকল নবির মর্যাদা সমস্তরে নয়। বরং নবিদের মাঝ থেকে মুহাম্মাদ (ﷺ), ইবরাহিম ও মুসা আলাইহিমাস সালামের মর্যাদা অন্যদের তুলনায় অনেক ঊর্ধ্বে। এ জন্য আল্লাহ তাদের যা দান করেছেন অন্যদের তা দান করেননি।

নবি-রাসুলের পারস্পরিক মর্যাদার পার্থক্য কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, ﴿تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ﴾ অর্থ : 'এই রাসুলগণ আমি তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তাদের কারও সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কথা বলেছেন। তাদের কতককে তিনি উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।' [বাকারা : ২৫৩] অন্য আয়াতে বলেন, ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ অর্থ : 'আর আমি কতক নবিকে কতক নবির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' [ইসরা : ৫৫]

সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচজন রাসুল

রাসুলদের মাঝে মর্যাদাগত তারতম্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রতিষ্ঠিত আকিদা। আহলে সুন্নাতের আরেকটি প্রতিষ্ঠিত আকিদা হলো, রাসুলদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল হচ্ছেন পাঁচজন, কুরআনে যাদের 'উলুল আযমি মিনার রুসুল' তথা 'দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসুল' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তারা হলেন নুহ, ইবরাহিম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিম ওয়া সাল্লাম)। তারা অন্যান্য রাসুলের চেয়ে আল্লাহর পথে বেশি মেহনত ও মুজাহাদা করেছেন। তা ছাড়া, অন্যদের তুলনায় পৃথিবীতে তাদের মুজাহাদার ফলাফল বেশি। আল্লাহর প্রতি তাদের নিষ্ঠা ও মহব্বতও বেশি। তাই আল্লাহ তাদের বেশি ভালোবেসেছেন, তাদের বেশি মর্যাদা দান করেছেন।

এটা কুরআনের একাধিক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ

৯৪৩. দেখুন : আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২০)। আরও দেখুন : আকিদাহ রুকনিয়্যাহ (৩৪)।

﴿إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ অর্থ : 'তিনি তোমাদের জন্য সেই দ্বীন নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নুহকে, আর যা আমি ওহি করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ঈসার প্রতি এ মর্মে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে মতভেদ করো না।' [শুরা : ১৩] আরেক আয়াতে বলেন, ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ অর্থ : 'যখন আমি নবিগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম, আপনার কাছ থেকে এবং নুহ, ইবরাহিম, মুসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকে।' [আহযাব : ৭]

উক্ত পাঁচজন শ্রেষ্ঠ হওয়ার অর্থ তারা সবাই সমস্তরের নন, বরং অন্যদের চেয়ে যেমন তাদের মর্যাদা আলাদা, ঠিক তেমন তাদের মাঝ থেকে একেকজনের মর্যাদা অন্যদের তুলনায় বেশি। ফলে উক্ত পাঁচজনের মাঝে সর্বসম্মতিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মুহাম্মাদ (ﷺ)। স্বয়ং কুরআনের উপরের আয়াত থেকেও এটা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ অর্থ : 'যখন আমি নবিগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম, আপনার কাছ থেকে এবং নুহ, ইবরাহিম, মুসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকে।' [আহযাব : ৭] এখানে দেখুন, চারজন রাসুলকে ঐতিহাসিক পালাক্রমে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (ﷺ) সবার শেষে হওয়া সত্ত্বেও আগে উল্লেখ করেছেন। কারণ, তিনি শেষে এলেও মর্যাদার দিক থেকে বাকি চারজনের আগে।

তা ছাড়া, তিনি গোটা বিশ্বের কাছে রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, অথচ অন্যান্য নবি-রাসুলের দাওয়াত তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য নবি-রাসুলের দাওয়াত ছিল সাময়িক, পরবর্তী রাসুল আসার আগ পর্যন্ত। এভাবে স্থান ও কাল উভয় দিক থেকেই তাদের রিসালাত সীমাবদ্ধ ছিল। বিপরীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রিসালাত গোটা বিশ্বজগৎ বিস্তৃত। কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ফলে কাল ও স্থান সকল সীমার ঊর্ধ্বে তাঁর রিসালাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ অর্থ : 'বরকতময় সেই সত্তা (আল্লাহ তায়ালা) যিনি তাঁর বান্দার উপর সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি গোটা বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হন।' [ফুরকান : ১] অন্য আয়াতে বলেন, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ অর্থ : 'আমি আপনাকে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।' [আম্বিয়া : ১০৭]

হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আমাকে ছয়টি জিনিসের মাধ্যমে সকল নবির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে—এক. আমাকে স্বল্প কথায় অধিক মর্ম পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে; দুই. দুশমনের অন্তরে ভয় ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে (ফলে দূর থেকে শত্রু তাঁর আগমনের কথা শুনলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ত); তিন. আমার জন্য গনিমত হালাল করা হয়েছে; চার. গোটা ভূপৃষ্ঠ আমার জন্য পবিত্রতার মাধ্যম এবং সিজদায় জায়গা বানানো হয়েছে; পাঁচ. আমাকে গোটা সৃষ্টির কাছে রাসুল হিসেবে পাঠানো হয়েছে; ছয়. আমার মাধ্যমে নবিদের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করা হয়েছে।'[৯৪৪]

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আমি কিয়ামতের দিন গোটা আদম সন্তানের নেতা হব। সর্বপ্রথম আমার কবর বিদীর্ণ হবে। আমি সর্বপ্রথম সুপারিশ করব। সর্বপ্রথম আমার সুপারিশ কবুল করা হবে।'[৯৪৫] ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে এসেছে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা ইবরাহিমকে খলিল তথা পরম প্রিয় বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মুসাকে তিনি নাজি তথা তাঁর সঙ্গে কথোপকথনকারী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ঈসা হচ্ছেন তাঁর দেওয়া রুহ এবং তাঁর নির্দেশ (কালিমা)। আদম তাঁর মুস্তফা তথা মনোনীত। আর আমি তাঁর হাবিব তথা প্রিয় বন্ধু; গর্ব নেই, গর্ব নেই। আমিই কিয়ামতের দিন আল্লাহর প্রশংসার ঝান্ডাধারী হবো। আমিই কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম শাফায়াত করব আর সর্বপ্রথম আমার শাফায়াতই গৃহীত হবে; গর্ব নেই। আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার কড়া নাড়ব এবং আমার জন্য আল্লাহ তা খুলে দেবেন। আমাকে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; গর্ব নেই। আমার সাথে থাকবে দরিদ্র মুমিনরা। আমিই ইহকাল ও পরকাল, প্রথম যুগ ও শেষ যুগ সকল মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত। এতে গর্ব নেই।'[৯৪৬]

দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। এটা বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন—কুরআনে আল্লাহ তায়ালা একাধিক জায়গায় ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ অর্থ : 'আল্লাহ ইবরাহিমকে খলিল (পরম বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ

---

৯৪৪. মুসলিম (কিতাবুল মাসাজিদ : ৫২৩)। তিরমিযি (আবওয়াবুস সিয়ার : ১৫৫৩)।

৯৪৫. মুসলিম (কিতাবুল ফাযায়েল : ২২৭৮)। আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৬৭৩)। তিরমিযি (আবওয়াবুল মানাকিব : ৩৬১৫)।

৯৪৬. তিরমিযি (আবওয়াবুল মানাকিব : ৩৬১৬)। মুসনাদে দারেমি (মুকাদ্দিমাতুল মুআল্লিফ : ৪৮)।

করেছেন। [নিসা : ১২৫] কুরআনে তাকে একাই এক উম্মাহ (জাতি) বলা হয়েছে, তাওহিদবাদীদের ইমাম বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ অর্থ : 'ইবরাহিম ছিলেন একটি জাতি। আল্লাহর একনিষ্ঠ বন্দেগিকারী। তিনি মুশরিক ছিলেন না।' [নাহল : ১২০] একব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে ডাক দেয়, হে সৃষ্টির সর্বোত্তম। তখন রাসুলুল্লাহ বলেন, 'তিনি ইবরাহিম।'[৯৪৭]

মুহাম্মাদ (ﷺ) ও ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পরে হচ্ছেন নুহ, মুসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালাম। তবে শেষোক্ত তিনজনের মাঝে কে শ্রেষ্ঠ সে সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহতে সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। ফলে বিষয়টি মতভেদপূর্ণ থাকবে। এ ব্যাপারে নীরব-নিরপেক্ষ থাকা উচিত হবে। সাফারিনি লিখেন, 'মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম। এটা মুসলমানদের সর্বসম্মত মতামত। সুতরাং ইবরাহিম আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালামের চেয়ে উত্তম। তবে শেষ তিন জনের মাঝে কে উত্তম সেটা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।' ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, 'এ ব্যাপারে আমি কোনো দলিল পাইনি। তবে আমার কাছে মনে হয়, প্রথমে মুসা আলাইহিস সালাম, অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ নুহ আলাইহিস সালাম। কোনো কোনো আলেমের মতে, মুসাকে নুহ ও ঈসার আগে আনার কারণ হচ্ছে, তিনি আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তবে সুনিশ্চিত হওয়া যায় না এমন বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকাই উত্তম।'[৯৪৮]

নবিদের মাঝে তুলনা নিষিদ্ধ নয়

হ্যাঁ, কিছু কিছু হাদিসে নবিদের মাঝে তুলনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাদের একজনকে অন্যজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতে বারণ করা হয়েছে। ফলে বাহ্যত এসব হাদিসের সঙ্গে সেসব হাদিসের সংঘাত তৈরি হয়। বাস্তবতা হলো, উপরের আয়াত ও হাদিসগুলো উন্মুক্তভাবে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, নবিদের মাঝে মর্যাদার তারতম্য সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত বাস্তবতা। ফলে যেসব হাদিসের সঙ্গে এই বাস্তবতার সংঘাত দেখা দেবে, সেগুলোকে উন্মুক্তভাবে গ্রহণ করা হবে না; বরং প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতার আলোকে ব্যাখ্যা করা হবে।

---

৯৪৭. মুসলিম (কিতাবুল ফাযায়েল : ২৩৬৯)। তিরমিযি (আবওয়াবু তাফসিরিল কুরআন : ৩৩৫২)।

৯৪৮. লাওয়ামিউল আনওয়ার, সাফারিনি (২/৩০০)।

যেমন—একটি হাদিসে এসেছে, একজন মুসলিম এবং একজন ইহুদি কার নবি শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে মারামারি করে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে বিচার নিয়ে গেল। আল্লাহর রাসুল শুনলেন, মুসলিম লোকটি তাকে মুসা আলাইহিস সালামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলছিল। ইহুদিটি মুসা আলাইহিস সালামকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলছিল। সব শুনে রাসুল (ﷺ) বললেন, 'আমাকে তোমরা মুসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলো না।' কেননা, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে। আমিও বেহুঁশ হব। সবার আগে আমার হুঁশ ফিরে আসবে। কিন্তু জ্ঞান ফেরার পরে আমি মুসাকে আরশের পাশে দেখব। আমি নিশ্চত নই, তিনি কি বেহুঁশ হয়ে আমার আগেই হুঁশ ফিরে পেয়েছেন, নাকি আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এটা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।'[৯৪৯] আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'কারও জন্য এটা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম।'[৯৫০]

এসব হাদিস আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হবে না। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে সাধারণ নীতি হলো উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াত ও হাদিসগুলো। ফলে নবিদের মাঝে মর্যাদাগত তারতম্য স্বীকৃত বাস্তবতা। কিন্তু যেসব হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে মুসা কিংবা ইউনুসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতে নিষেধ করেছেন, সেগুলো বিভিন্ন ব্যাখ্যাসহ গ্রহণ করা হবে। যেমন—রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কখনো বিনয়বশত সেগুলো বলেছেন। বাস্তবে তাঁর মর্যাদা মুসা ও ইউনুসের চেয়ে বেশি। আবার কখনো বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বলেছেন। যেমন—মুসলিম ও ইহুদির ঝগড়াসংক্রান্ত হাদিস। সেখানে মুসলিম ব্যক্তি ইহুদির উপর আবেগ ও জাত্যাভিমানকে উপরে রাখতে অহংকার করে রাসুলুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করছিলেন। অথচ মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলদের একজন। ফলে স্বাভাবিকভাবে রাসুলুল্লাহকে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলাতে সমস্যা ছিল না। কিন্তু অহংকার প্রদর্শন কিংবা জাত্যাভিমানের লড়াই থেকে বললে সেখানে মুসা আলাইহিস সালামের মর্যাদাহানি হয়। ফলে সেক্ষেত্রে এ ধরনের বক্তব্য নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে। একইভাবে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে স্বতন্ত্রভাবে শ্রেষ্ঠ বলা আপত্তিকর নয়। কিন্তু ইউনুস আলাইহিস সালামের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে ইউনুস আলাইহিস সালামের ভুলের কারণে তাকে ছোট করে রাসুলুল্লাহকে শ্রেষ্ঠ বলা অনুচিত।

---

৯৪৯. বুখারি (কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া : ৩৪০৮)। মুসলিম (কিতাবুল ফাযায়েল : ২৩৭৩)।

৯৫০. বুখারি (কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া : ৩৩৯৫)। মুসলিম (কিতাবুল ফাযায়েল : ২৩৭৬)।

মোটকথা, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। সকল মানুষের চেয়ে উত্তম। অন্যান্য নবির মাঝেও পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্য রয়েছে। এক্ষেত্রে অনুমান কিংবা যুক্তি নয়; বরং কুরআনে যাদের শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠ হিসেবে মেনে নিতে হবে। অন্য নবিগণকে যেন ছোট না করা হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। নির্দিষ্টভাবে কোনো নবিকে অন্য নির্দিষ্ট নবির তুলনায় শ্রেষ্ঠ বললে যদি দ্বিতীয় জনের ছোট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে সেখানে তুলনা বর্জন করতে হবে।

হায়াতুল আম্বিয়া (নবিদের কবরের জীবন)

বাহ্যিক চোখে মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছু শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। ইসলাম আমাদের চোখের দেখার বাইরে ও ঊর্ধ্বেও অনেক বিষয় জানিয়েছে যা খোলা চোখে কিংবা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা সম্ভব নয়। বরং তা দেখার জন্য কুরআন-সুন্নাহর দিকে তাকানো জরুরি, ওহির চোখে দেখা জরুরি। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে শহিদদের সম্পর্কে বলেছেন, ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ অর্থ : 'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা মৃত ভেবো না। বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত।' [আলে ইমরান : ১৬৯] অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করে, দুনিয়াবাসী খালি চোখে তাদের মৃত্যুবরণ করতে দেখলেও আসলে তারা অমর। তারা মৃত্যুঞ্জয়ী। ফলে যখন তাদের কবরে রাখা হয় কিংবা তাদের রুহ আল্লাহর নির্দেশে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তারা জীবিত হয়ে আল্লাহর নেয়ামত উপভোগের সৌভাগ্য লাভ করেন। পার্থক্য এটুকু যে, আমরা মানুষ সেটা দেখতে পাই না, অনুভব করি না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ অর্থ : 'আল্লাহর পথে যাদের প্রাণ যায়, তাদের তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা বুঝতে পারো না।' [বাকারা : ১৫৪]

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যখন তোমাদের ভাইয়েরা উহুদের যুদ্ধে শহিদ হলো, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের রুহগুলো সবুজ পাখির পেটে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তারা জান্নাতের নদীগুলো থেকে পানি পান করছে। জান্নাতের ফল খাচ্ছে। আরশের ছায়ায় ঝুলন্ত প্রদীপের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। এভাবে যখন তারা জান্নাতের সুস্বাদু খাদ্য, পানীয় ও অবসর-বিনোদনের স্বাদ পেল, তখন বলে উঠল, আমরা যে জান্নাতে জীবিত আছি এবং পানাহার

করছি এসব কথা কে আমাদের ভাইদের দুনিয়াতে পৌঁছিয়ে দেবে, যাতে তারা আমাদের কথা শুনে জিহাদে অমনোযোগী না হয় এবং যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন না করে? তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমিই তাদের তোমাদের অবস্থার কথা পৌঁছিয়ে দেবো। নবিজি (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করলেন, ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ অর্থ : 'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা মৃত ভেবো না। বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত।' [আলে ইমরান : ১৬৯][৯৫১]

এই যদি হয় উম্মাহর সাধারণ একজন সদস্যের ফযিলত, তবে নবি ও রাসুলের মর্যাদা কত বেশি সেটা সহজেই বোধগম্য হওয়ার কথা। উক্ত শহিদের ঈমান, আমল, জিহাদ, শাহাদাত সবকিছুর পিছনে তাঁর নবির অবদান রয়েছে। নবির হাতে সে মুসলমান হয়েছে, নবির উপর অবতীর্ণ কিতাবে সে ঈমান এনেছে, নবির কথার উপর ভরসা করে সে জিহাদের ময়দানে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, ফলে এসব পুণ্যে নবির পূর্ণ অংশ থাকবে। নবির মর্যাদা হবে তাঁর চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং শহিদ যদি মৃত্যুর পরে পাখি হয়ে ঘোরাফেরা করে, জান্নাতের খাদ্য ও পানাহার উপভোগ করে, তবে নবি-রাসুলরা যে এগুলো পাওয়ার এবং এরচেয়ে শতগুণ বেশি পাওয়ার উপযুক্ত, সেটা তো সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত বিষয়।

এটা কেবল গবেষণালব্ধ মতামত নয়; কুরআন-সুন্নাহর অনেক বক্তব্য দ্বারাও প্রমাণিত। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একটি হাদিসে বলেছেন, 'নবিগণ তাদের কবরে জীবিত। তারা নামায আদায় করেন।'[৯৫২] মিরাজের রাতে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কা থেকে বোরাকের পিঠে করে বাইতুল মাকদিস যাচ্ছিলেন, তখন মুসা আলাইহিস সালামকে তাঁর কবরে নামায আদায় করতে দেখেছেন।[৯৫৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আমি একদল নবিকে দেখতে পাই। মুসা আলাইহিস সালামকে নামায পড়তে দেখতে পাই। তিনি কোঁকড়াকেশী শানুআ গোত্রের লোকদের মতো ছিলেন। আমি ঈসা আলাইহিস সালামকে

---

৯৫১. আবু দাউদ (কিতাবুল জিহাদ : ১৫২০)। মুসতাদরাকে হাকেম (কিতাবুল জিহাদ : ২৪৫৮)।

৯৫২. বাযযার (মুসনাদু আনাস ইবনে মালেক : ৬৮৮৮)। মুসনাদে আবি ইয়ালা (মুসনাদু আনাস ইবনে মালেক : ৩৪২৫)।

৯৫৩. মুসলিম (কিতাবুল ফাযায়েল : ২৩৭৫)। নাসায়ি (কিতাবু কিয়ামিল লাইল : ১/১৬৩০)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আনাস ইবনে মালেক : ১২৬৯৯)।

নামাযরত দেখতে পাই। তাকে দেখতে হুবহু উরওয়া ইবনে মাসউদের মতো লাগছিল। আমি ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে নামাযরত দেখতে পাই। তাকে আমার মতো লাগছিল।'[৯৫৪] বরং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন ঊর্ধ্বজগতে গেলেন, সেখানে বিভিন্ন আকাশে নামাযরত এসব নবি এবং তারা ছাড়াও বিভিন্ন নবিকে দেখতে পান। মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম আকাশে আদম, দ্বিতীয় আকাশে ঈসা, তৃতীয় আকাশে ইউসুফ, চতুর্থ আকাশে ইদরিস, পঞ্চম আকাশে হারুন, ষষ্ঠ আকাশে মুসা এবং সপ্তম আকাশে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সঙ্গে তিনি মুলাকাত করেন। অর্থাৎ, প্রথমে মুসা আলাইহিস সালামকে কবরে নামায পড়তে দেখেন, আবার ষষ্ঠ আকাশেও তাঁর সঙ্গে মুলাকাত করেন। বরং তাঁর অনুরোধেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে আমাদের দৈনন্দিন ফরয নামায পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে পাঁচ ওয়াক্তে নামিয়ে আনেন।[৯৫৫]

এসব অদৃশ্য জগতের কথা। ফলে এগুলোকে কাল্পনিক ঘটনা ভাবা যাবে না। আবার এগুলোর ব্যাপারে মনগড়া ব্যাখ্যাও দেওয়া যাবে না। বরং একজন সাচ্চা মুমিন হিসেবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল (ﷺ) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত সবকিছু বিনা বাক্যে গ্রহণ করে নিতে হবে। এখানেই একজন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর পার্থক্য। বিভিন্ন কুযুক্তির কারণে অতীত ও সমকালীন অনেক পণ্ডিত দাবিদার লোকজন মিরাজকে অস্বীকার করেছে। এগুলো কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিমুখতা ও বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভরতার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের কুফল। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

মোটকথা, মত্যুই শেষ নয়। বরং মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ অমরত্বের মাঝে প্রবেশ করে। নবিদের ক্ষেত্রে বিষয়টা আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক। ফলে নবিগণ মৃত্যুর পরও জীবিত। ভূপৃষ্ঠের জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য না রাখলেও তাদের জীবন অত্যন্ত পরিপূর্ণ ও সৃমৃদ্ধ সেটা বোঝা যায়। একটি হাদিসে এসেছে, রাসুল (ﷺ) বলেন, 'তোমরা আমার উপর সালাম পাঠ করো। কেননা, তোমরা যেখানেই থাকো, তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।'[৯৫৬] স্বাভাবিকভাবেই বোঝা

---

৯৫৪. মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৭২)।

৯৫৫. মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৬৩-১৬৪)। ইবনে হিব্বান (কিতাবুল ইসরা : ৫০)।

৯৫৬. আবু দাউদ (কিতাবুল মানাসিক : ২০৪২)। হাদীসটির সনদ সহীহ। তা ছাড়া, উক্ত হাদিসের বেশ কিছু শাওয়াহিদ তথা কাছাকাছি বর্ণনা রয়েছে যা এর সত্যতাকে সমর্থন করে। ফলে হাদিসটি নির্ভরযোগ্য গণ্য করা

যায় যে, আমাদের এবং আমাদের পিতার নাম-পরিচয়সহ রাসুলুল্লাহর কাছে সালাম পৌঁছে দেওয়া হয় এবং তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন আর দোয়া করেন। পরকালে হয়তো এ ভিত্তিতে শাফায়াতও করবেন। নতুবা সালাম পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ কোনো অর্থ থাকে না। বরং আরেক হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর দূর থেকে সালাম পাঠ করে, সেটা আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি আমার উপর আমার কবরের কাছে এসে সালাম দেয়, আমি সেটা শুনতে পাই।'[৯৫৭] ফলে কবরের ভিতর থেকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের আওয়াজ শোনেন এবং কে সালাম দিলো সেটাও জানেন। বরং আবু দাউদে আবু হুরাইরা রাযি.-এর হাদিসে আরও স্পষ্টভাবে এসেছে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যখন কোনো মুসলিম আমাকে সালাম দেয়, আল্লাহ আমার রুহ ফিরিয়ে দেন, আমি তাঁর সালামের জবাব দিই।'[৯৫৮]

আরও একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমাদের সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন। এ দিন আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এ দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। এ দিন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং এ দিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি সালাম পাঠ করো। কেননা, তোমাদের দরুদ-সালাম আমার কাছে পেশ করা হয়। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, কীভাবে পেশ করা হয়, অথচ আপনার তখন মাটিতে মিশে যাওয়ার কথা? রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তায়ালা মাটির উপর নবিদের দেহভক্ষণ হারাম করে দিয়েছেন।'[৯৫৯] বাযযারের বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

---

হবে। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবি হুরাইরা : ৮৯২৬)। বাযযার (মুসনাদু আলি ইবনে আবি তালিব : ৫০৯)। মুসান্নাফে আবদির রাযযাক (কিতাবুস সালাত : ৪৮৩৯)।

৯৫৭. আবুশ শাইখের কিতাবুস সাওয়াবের উদ্ধৃতিতে ইবনে হাজার এটা বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদকে 'জাইয়্যিদ' (ভালো) বলেছেন। দেখুন : ফাতহুল বারি (৬/৪৮৮)।

৯৫৮. আবু দাউদ (কিতাবুল মানাসিক : ২০৪১)। আলিমদের মতে এটার সনদও সহীহ। [দেখুন : আউনুল মাবুদ ২/১৬৯]।

৯৫৯. আবু দাউদ (কিতাবুস সালাত : ১০৪৭)। ইবনে মাজা (আবওয়াবু ইকামাতিস সালাত : ১০৮৫)। নাসায়ি (১/১৩৭৩)। মুসনাদে আহমদ (আউয়ালু মুসনাদিল মাদানিয়্যিন : ১৬৪১৩)। সহিহ ইবনে খুযাইমা (কিতাবুল জুমুআহ : ১৭৩৩)। দারেমি (কিতাবুস সালাত : ১৬১৩)। ইবনে হিব্বান (কিতাবুর রাকায়েক : ৯১০)। উক্ত হাদিসটি বিশুদ্ধ। আবু দাউদ, নাসায়ি ও ইবনে মাজা তিন ইমামই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান ও হাকেম এটাকে সহিহ বলেছেন। হাকেম লিখেছেন, এটা বুখারির শর্ত মোতাবেক সহিহ (মুসতাদরাকে হাকেম : কিতাবুল জুমুআহ : ১০৩৪)।

'আমার জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আমার মৃত্যুও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আমার জীবন কল্যাণকর এভাবে যে, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলি, তোমরা আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো। আর মৃত্যু কল্যাণকর এভাবে যে, আমার কাছে তোমাদের আমল পেশ করা হয়। তাতে ভালো কিছু দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করি, মন্দ দেখলে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করি।'[৯৬০]

এসব হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, নবিদের কবরের জীবন, যাকে 'বারযাখি জীবন' বলা হয়, সাধারণ মানুষের বারযাখি জীবনের তুলনায় অনেক বেশি পরিপূর্ণ, বিস্তৃত ও মাহাত্ম্যপূর্ণ। ফলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর বেশি বেশি দরুদ ও সালাম পাঠ করা জরুরি। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে মহব্বত করা, তাঁর অনুসরণ করা জরুরি, যাতে প্রত্যেক শুক্রবার যখন তাঁর কাছে আমাদের সালাম পেশ করা হয়, তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, দোয়া করেন। পরকালে এগুলো আমাদের জন্য তাঁর শাফায়াত প্রাপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সতর্কতা : কিন্তু এসব হাদিস থেকে ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণের সুযোগ নেই। নবি-রাসুলগণ কবরে জীবিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আমাদের আমলনামা পেশ করা হয়, সালাম পেশ করা হয়, কবরের কাছে গিয়ে সালাম দিলে তিনি সালাম শুনতে পান, তাই তাঁর কবরের জীবনকে হুবহু দুনিয়ার জীবনের মতো মনে করা, তাঁর কবরের কাছে গিয়ে দরুদ-সালামের পরিবর্তে সন্তান-সম্পদ ও সুখ-সৌভাগ্য প্রার্থনা করা কিংবা পরকালে জান্নাত চাওয়ার কোনো বৈধতা নেই। কারণ, এখানে হাদিসে যেসব বিষয় বলা হয়েছে, সেগুলো স্বাভাবিক জীবন ও যুক্তিভিত্তিক বাস্তবতা নয়। বরং এগুলো যুক্তির ঊর্ধ্বে এক অদৃশ্য জগতের কথা, যার বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই। ফলে কুরআন-সুন্নাহতে যতটুকু এসেছে, ততটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। সীমালঙ্ঘন করা যাবে না।

দুঃখজনকভাবে একদল লোক সীমালঙ্ঘন করেছে। তারা কবরে থাকা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'আলিমুল গায়েব' তথা যাবতীয় অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বানিয়ে দিয়েছে। তিনি আমাদের সকল আমল সম্পর্কে জানেন, আমাদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখেন—মনে করেছে। অথচ দুনিয়ার জীবনেও তিনি এমন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। বরং আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কয়েক কদম দূরের

---

৯৬০. মুসনাদে বাযযার (মুসনাদু আবদিল্লাহ ইবনে মাসউদ (১৯২৫)। আল-মাতালিবুল আলিয়াহ (কিতাবুল মানাকিব : ৩৮২৪) হাইসামি এটার সনদ সহিহ বলেছেন। যুরকানি 'জাইয়িদ' (ভালো) বলেছেন। [শরহুয যুরকানি আলাল মুওয়াত্তা ১/১৪৭]

বস্তু সম্পর্কেও তিনি জানতে পারতেন না। 'যাতুর রিকা' যুদ্ধে আয়েশা রাযি.-এর গলার হার হারিয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত পেরেশান হন। সকল মুসলমানের যাত্রা বিলম্বিত হয়। পানির অভাবে তাদের তায়াম্মুম করে নামায পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত এক সাহাবি হারটি খুঁজে পান! অথচ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) খুঁজে পাননি।[৯৬১] 'ইফকে'র ঘটনায় স্ত্রী আয়েশা রাযি.-এর নামে অপবাদ দেওয়া হয়। দীর্ঘ এক মাসের অধিক সময় রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ব্যাপারে ওহির অপেক্ষা করেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত থাকেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আম্মাজান আয়েশার পবিত্রতা ও নির্মলতার সাক্ষ্য দিয়ে আয়াত নাযিল করেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সন্তুষ্ট হন। অথচ ওহি আসার আগ পর্যন্ত তিনি সত্যতা জানতে পারেননি।[৯৬২] বিরে মাউনার ঘটনায় তিনি সত্তরজন সাহাবিকে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠান। তাদের জঘন্যভাবে হত্যা করা হয়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এতটাই মর্মাহত হন যে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ত্রিশ দিন নামাযে বদদোয়া করেন।[৯৬৩] এটা ছিল একটা ষড়যন্ত্রমূলক হত্যাকাণ্ড। তিনি যদি গায়েব জানতেন, তাহলে এমন পরিস্থিতি সহজেই এড়িয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু পারেননি। কারণ, তিনি গায়েবের মালিক ছিলেন না। গায়েবের একমাত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা। গায়েব থেকে আল্লাহ যতটুকু তাঁকে জানাতেন, তিনি ততটুকুই জানতেন। এটাকে গায়েব জানা বলা হয় না। ফলে যে মানুষটি দুনিয়ার জীবনেও সর্বজ্ঞানী ছিলেন না, গায়েবের অধিকারী ছিলেন না, মৃত্যুর পরে কবরে থাকা অবস্থায় তাকে সর্বজ্ঞানী মনে করা, তিনি দুনিয়ার সবার অবস্থা সম্পর্কে জানেন, সবার কথা শোনেন এবং প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখেন, সব জায়গায় উপস্থিত হন এবং সবকিছু দেখেন (হাজির-নাজির) বলে বিশ্বাস করা সীমালঙ্ঘন ছাড়া আর কী হতে পারে?

উপরন্তু এখানে আরও যে ভয়ংকর অবস্থা তৈরি হয় তা হলো, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন মুজিযার ক্ষেত্রে অন্যান্য মানুষকেও শরিক করা। ফলে পির-মাশায়েখের ক্ষেত্রেও উপরের বিশ্বাসগুলো রাখা হয়। কারামতের নামে তাদের সকল খবর সম্পর্কে জ্ঞাত দাবি করা হয়। অথচ এগুলো সুস্পষ্ট

---

৯৬১. মুয়াত্তা মালেক (১/৫৩; হাদিস নং ৮৯; তাহকিক : আবদুল বাকি)। বুখারি (কিতাবুত তায়াম্মুম : ৩৩৪)। মুসলিম (কিতাবুল হায়েয : ৩৬৭)।
৯৬২. বুখারি (কিতাবুশ শাহাদাত : ২৬৬১)। মুসলিম (কিতাবুত তাওবা : ২৭৭০)।
৯৬৩. বুখারি (কিতাবুল জিহাদ : ৩০৬৪)। মুসলিম (কিতাবুল মাসাজিদ : ৬৭৭)।

বিচ্যুতি। সাহাবায়ে কেরাম কিংবা পরবর্তী সময়ের সাধারণ ওলি-আউলিয়াদের কারও কারও ব্যাপারে কবরে নামায কিংবা কুরআন তেলাওয়াতের কথা এলেও সেগুলো তাদের কারামত বিবেচিত হবে এবং বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হওয়াসাপেক্ষে যেটুকু এসেছে সেটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। কিন্তু তারা আমাদের আমল সম্পর্কে জানেন, সালাম দিলে শোনেন বা জবাব দেন—এমন কোনো বৈশিষ্ট্যের কথা কুরআন-সুন্নাহতে আসেনি। বরং এগুলো রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর একক বৈশিষ্ট্য। আর কবরে বসে প্রয়োজন পূর্ণ করেন—এমন আকিদা কারও ব্যাপারেই রাখা যাবে না।[৯৬৪]

উপরন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, সকল চাওয়া-পাওয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা। যখন কিছু চাওয়ার, আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে ছুটে যেতে হবে। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ ও সুখ-সৌভাগ্যের মালিক আল্লাহ তায়ালা; কোনো ফেরেশতা বা মানুষ নন। আল্লাহর পরিবর্তে কোনো মানুষকে—হোন তিনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)—যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী মনে করা উম্মাহর মুহাক্কিক আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে শিরক। কবরকেন্দ্রিক যাবতীয় বাড়াবাড়ি ও বিচ্যুতির সূচনা এখান থেকেই। সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি রাখা আবশ্যক।

খিযির ও ইলিয়াসের বর্তমানে জীবিত থাকার দাবি

পিছনে আমরা 'হায়াতুল আম্বিয়া' বা নবিদের কবরের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার একটু দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। অর্থাৎ, যদি প্রশ্ন করা হয় : দুনিয়াতে কি বর্তমানে কোনো নবি বা-হায়াত তথা জীবিত আছেন? সহজাত ও যৌক্তিক উত্তর 'না' হওয়া স্বাভাবিক হলেও এত সহজে এখানে 'না' বলার সুযোগ নেই। কারণ, উম্মাহর বড় একদল আলেম এক্ষেত্রে বিপরীত বিশ্বাস রাখেন। তারা মনে করেন, একদল নবি এখনও জীবিত, মৃত্যুহীন। হাজার হাজার বছর পরও তারা এখনও মৃত্যুবরণ করেননি। পৃথিবী

---

৯৬৪. ইস্তিশফা তথা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কবরের কাছে গিয়ে তাঁর কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করা, তিনি যেন পরকালে আল্লাহর কাছে শাফায়াত করেন এমন দোয়া চাওয়ার বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন এই গ্রন্থের শেষ দিকে এবং অধমের 'আকিদাহ তহাবিয়্যাহ'র ব্যাখ্যাগ্রন্থে।

ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা বেঁচে থাকবেন। গযনবি লিখেন, 'চারজন নবি এখনও জীবিত। তারা হলেন : ঈসা, ইদরিস, খিযির ও ইলিয়াস।'[৯৬৫]

ঈসা আলাইহিস সালাম আকাশে জীবিত। এটা সন্দেহাতীত সত্য। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। ফলে এটা নিয়ে আহলে সুন্নাতের কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম আকাশে জীবিত, পৃথিবীতে নন। ইদরিস আলাইহিস সালামের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। তিনিও আকাশে, দুনিয়াতে নন। আর দুনিয়ার বাইরে সকল নবিই তাদের কবরে জীবিত। মিরাজের রাতে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একাধিক নবিকে তাদের কবরে ও আসমানে জীবিত দেখেছেন। এটা দুনিয়ার বাইরের জীবন। ফলে উক্ত জীবনকে দুনিয়ার জীবনের উপর কিয়াস করার সুযোগ নেই। তাই ঈসা ও ইদরিস (আলাইহিমাস সালাম) আমাদের আলোচনার বাইরে। বাকি রইল খিযির ও ইলিয়াস (আলাইহিমাস সালাম)-এর কথা।

খিযির আলাইহিস সালাম ইসলামের ইতিহাসের এক বিস্ময়কর চরিত্র—কেউ তাকে জিন আখ্যা দিয়েছেন; কেউ তাকে ফেরেশতা বলেছেন; কেউ নবি বলেছেন; কেউ ওলি বলেছেন; কেউ মারা গেছেন বলেছেন; কেউ জীবিত আছেন বলেছেন। কেউ মনে করেন, তিনি জঙ্গলে আছেন। কেউ মনে করেন, সাগরে আছেন। কেউ বলেন, প্রত্যেক শুক্রবার তিনি মসজিদুল হারামে মাহদি ও ঈসার সঙ্গে বৈঠক করেন। আবার কেউ বলেছেন, প্রত্যেক রাতে যুল কারনাইনের প্রাচীরের কাছে তিনি আর ইলিয়াস বৈঠক করেন! প্রত্যেক বছর হজ ও উমরা করেন। তখন যমযমের পানি পান করেন, যা পুরো এক বছরের খাবার হিসেবে যথেষ্ট হয়ে যায়! আবার কেউ তাঁর সূত্রে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শত শত হাদিস বর্ণনা করেছেন! কেউ খিযিরকে ব্যক্তির পরিবর্তে 'খিযিরিয়্যাত' নামে তাসাওউফের রুতবা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ ইলিয়াস ও খিযির দুজনকেই তাসাওউফের দুটো হালত 'কবজ' ও 'বাসত' দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন! এভাবে অসংখ্য মতভেদপূর্ণ বিষয় ও বিতর্কের মিশ্রণে এক অদ্ভুত অস্পষ্টতা, অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের বেড়াজালে বন্দি হয়ে আছেন এ মহাপুরুষ।[৯৬৬]

সুফিয়ায়ে কেরাম এবং একদল আলেমের কাছে খিযির আলাইহিস সালাম এখনও জীবিত। এটা বিশাল একদল আলেম ও মাশায়েখের বক্তব্য। তারা এ

---

৯৬৫. উসুলুদ্দিন, গযনবি (১৪৬-১৫১)।

৯৬৬. বিস্তারিত দেখুন : আয-যাহরুন নাযির ফি হায়াতিল খাযির, ইবনে হাজার আসকালানি।

বিষয়ের উপর অসংখ্য স্বতন্ত্র বই-পুস্তকও লিখেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। নববি লিখেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে খিযির এখনও আমাদের মাঝে জীবিত। এটা সুফিয়ায়ে কেরাম এবং মারেফতপন্থি লোকদের সর্বসম্মত বক্তব্য। তাঁর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ, তাঁর কাছ থেকে ওয়াজ-উপদেশ গ্রহণ, প্রশ্নোত্তর, বিভিন্ন স্থানে তাঁর উপস্থিতি ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের বক্তব্য এত বেশি যা গোনা সম্ভব নয়, লুকানোও সম্ভব নয়। ...সালাবি বলেন, খিযির এখনও জীবিত। অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে। কিয়ামতের আগ মুহূর্তে কুরআন উঠে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন।'[৯৬৭] হাফেজ ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি.) লিখেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম, বুযুর্গ ও সাধারণ মুসলমানদের নিকট তিনি জীবিত হিসেবে গণ্য। কেবল কিছু মুহাদ্দিস তাঁর বেঁচে থাকার বিষয়টি নাকচ করেছেন।'[৯৬৮]

বিপরীতে ইমাম বুখারি, ইবরাহিম ইবনে ইসহাক হরবি, আবুল হুসাইন ইবনুল মুনাদি, ইবনুল জাওযি, ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়িম, ইবনে কাসির ও ইবনে হাজার আসকালানিসহ উম্মাহর অসংখ্য মুহাক্কিক আলেম খিযির আলাইহিস সালামের জীবিত থাকাকে নাকচ করে দিয়েছেন।[৯৬৯] বুখারিকে খিযিরের জীবিত থাকার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'তিনি কীভাবে জীবিত থাকবেন, অথচ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন একশো বছর পরে কেউ জীবিত থাকবে না?' ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'খিযির আলাইহিস সালামের জীবিত থাকার ব্যাপারে যেসব হাদিস বর্ণনা করা হয়, সবগুলো বানোয়াট। তাঁর জীবিত থাকার ব্যাপারে কোনো বিশুদ্ধ হাদিস নেই।'[৯৭০]

---

৯৬৭. শরহে মুসলিম, নববি (১৫/১৩৫-১৩৬)।

৯৬৮. ফাতাওয়া ইবনিস সালাহ (১/১৮৫)।

৯৬৯. দেখুন। রুহুল মাআনি (৮/৩০৩-৩০৬)। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২/২৭০)। আল-মানারুল মুনিফ (৭৩-৭৪)। মাজমুউল ফাতাওয়া (১/২৪৯)। ইবনে তাইমিয়্যাহর ফাতাওয়া সংকলনের একটি স্থান থেকে খিযিরের জীবিত থাকার যে উদ্ধৃতি দেখানো হয়, সেটা তাঁর নিজের বক্তব্য নয়; ভুলে অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে ঢুকে পড়েছে। নতুবা তিনি ফাতাওয়ার অন্যান্য স্থান-সহ বিভিন্ন গ্রন্থে খিযিরের মৃত্যুর কথা বলেছেন। মিনহাজে তিনি লেখেন, 'খিযিরের জীবিত থাকার উপর তাদের দলিল বাতিলের উপর বাতিল। সকল আলেম ও মুহাক্কিকের মতে খিজির মৃত্যুবরণ করেছেন।' [মিনহাজুস সুন্নাহ : ৪/৯৩] শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার আসকালানি খিযিরের উপর তাঁর স্বতন্ত্র গ্রন্থ 'আয-যাহরুন নাযির'-এ উভয় পক্ষের দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করে শেষে বলেন, 'এসব মজবুত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে আমার মন তাঁর জীবিত থাকার ব্যাপারে জনসাধারণের বিশ্বাসের বিপরীতে যায়।' [আয-যাহরুন নাযির : ২০৮] এটাই সঠিক, ইনশাআল্লাহ।

৯৭০. আল-মানারুল মুনিফ (৬৭-৭২)।

অধমের পর্যবেক্ষণ : ইমাম আজম রহ. এ ব্যাপারে কোনো কথা বলেননি। চার ইমাম থেকেও এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। কারণ, এটা দ্বীনের কোনো মৌলিক আকিদা নয়। জানা জরুরি এমন কোনো আবশ্যক বিষয় নয়। তদুপরি যেহেতু এটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, এ জন্য প্রসঙ্গক্রমে সামান্য আলোচনা করা হচ্ছে।

বস্তুত উপরের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে যেহেতু উভয় পক্ষে বড় বড় আলেম আছেন, সুতরাং কোনো একটাকে সরাসরি ভুল বলে অন্যটাকে সন্দেহাতীত সত্য বলার সাহস আমাদের নেই। কিন্তু দিলের রুজহান প্রকাশ করা জরুরি হলে আমাদের বক্তব্য হলো, কুরআন-সুন্নাহর দলিলগুলো পর্যালোচনার পরে খিযির আলাইহিস সালামের নবি হওয়া আমাদের কাছে অগ্রগণ্য। বিশেষত মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে তাঁর ঘটনা-পরিক্রমা, তাঁর হাতে বিভিন্ন আশ্চর্য বিষয় সংঘটন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নিশ্চিত জ্ঞানলাভ—ওহি ছাড়া যার অন্য কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন—সবকিছু তাঁর নবি হওয়ার সুস্পষ্ট আলামত। হুজ্জাতুল ইসলাম গাযালিসহ আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ধারার মুহাক্কিক আলেমদের মত এটাই। বিপরীত মত দুর্বল যা গ্রহণ করা কঠিন।

আর তাঁর জীবনের ব্যাপারে আমাদের কথা হলো—খিযির আলাইহিস সালাম যেহেতু স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন, আর স্বাভাবিক মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার নীতি হলো নির্দিষ্ট সময় পরে মৃত্যুবরণ করা, আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴾وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴿ অর্থ : 'আমি আপনার পূর্বে কোনো মানুষকে চিরস্থায়িত্ব দান করিনি। সুতরাং আপনি যদি মারা যান তারা কি চিরকাল থাকবে?' [আম্বিয়া : ৩৪] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ﴾إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴿ অর্থ : 'নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল। তারাও মরণশীল।' [যুমার : ৩০] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, তিনি জীবনের শেষ দিকে এক রাতে ইশার নামাযের পরে সাহাবাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজকের রাতটি তোমরা লক্ষ করেছ? বর্তমানে যারা পৃথিবীর বুকে জীবিত রয়েছে একশো বছরের মাথায় তাদের কেউ বেঁচে থাকবে না।'[৯৭১] উক্ত হাদিসটি বুখারি, মুসলিম, কুতুবে

---

৯৭১. বুখারি (কিতাবুল ইলম : ১১৬)। মুসলিম (কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবাহ : ২৫৩৭)। আবু দাউদ (কিতাবুল মালাহিম : ৪৩৪৮)। তিরমিযি (আবওয়াবুল ফিতান : ২২৫১)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবদিল্লাহ ইবনে উমর : ৫৭২১)।

সিত্তাহসহ বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে। ফলে এটার প্রামাণ্যতা শতভাগ নিশ্চিত। ঈসা আলাইহিস সালাম আকাশে জীবিত; যমিনে নন। দাজ্জালের উপরও কিয়াস করা যাবে না। কারণ, দাজ্জালকে বিশাল উদ্দেশ্য আঞ্জামের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে উক্ত হাদিসের ভিত্তিতে খিযির, ইলিয়াসসহ যাদের জীবনের কথা বলা হয়, সবগুলো নাকচ হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর জানাযায় উপস্থিত হওয়াসহ সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের যেসব বর্ণনা পেশ করা হয়, সেগুলোও প্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য নয়।

তা ছাড়া, খিযির আলাইহিস সালামের বেঁচে থাকার বিশেষ কোনো অর্থ নেই, উদ্দেশ্য নেই। ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনের উপর এটাকে কিয়াস করা বিশুদ্ধ নয়। কারণ, ঈসা আলাইহিস সালাম পৃথিবীর শেষ লগ্নে তাজদিদ ও সংস্কারের বিশাল গুরুত্বপূর্ণ মিশন আঞ্জাম দেবেন। কিয়ামতের আগ মুহূর্তের ঘটনাবহুল পৃথিবীতে তিনি হবেন প্রধান রাষ্ট্রনায়ক। দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের বিপরীতে মুমিনদের সিপাহসালার তিনি। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন। আল্লাহর দুশমনদের নিজ হাতে হত্যা করবেন। পৃথিবীতে ইসলাম কায়েম করবেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। সকল বাতিল সমূলে বিনাশ করবেন। চতুর্দিকে তাওহিদ ও শান্তি ছড়িয়ে দেবেন। তাও হাতেগোনা মাত্র কয়েক বছরে। বিপরীতে খিযির কিংবা ইলিয়াসের কাজ কী? হাজার হাজার বছর ধরে তাদের জীবিত বলা হচ্ছে, অথচ তাসাওউফের কিছু লোকজনের সঙ্গে জঙ্গল ও বনবাদাড়ে সাক্ষাৎ ছাড়া তাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই। ইসলামের দাওয়াত, তাযকিয়া, জিহাদ, কিয়াদাত কোনো ক্ষেত্রে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। তাহলে এই বেঁচে থাকা কাদের জন্য?

এ জন্য আল্লামা আলুসি রহ. লিখেন, 'তিনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর কাছে আসেননি, তাঁর হাতে বাইয়াত হননি। তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেননি। বরং তিনি যদি সত্যিই বেঁচে থাকতেন, তবে জঙ্গল থেকে বের হন না কেন? পৃথিবীতে এসে কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ করা, ময়দানে সময় কাটানো, জুমা ও জামাতের নামাযে শরিক হওয়া, উম্মাহর অক্ষরজ্ঞানশূন্য সদস্যদের দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া কি পাহাড়-পর্বতে পশুপাখির মাঝে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে বেশি জরুরি নয়? ...আলুসি অন্যত্র আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের এক যুদ্ধে খিযির কর্তৃক সহায়তার ভিত্তিহীন ঘটনাকে খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন, এখানে হাজির হওয়ার চেয়ে তাঁর রাসুলুল্লাহর সঙ্গে উহুদের ময়দানে হাজির হওয়া বেশি জরুরি ছিল।'[৯৭২]

---

৯৭২. রুহুল মাআনি (৮/৩০৩-৩০৬)।

ইসমাতুল আম্বিয়া [নবিগণের পাপ থেকে পবিত্রতা]

নবিগণ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সম্প্রদায়। তাদের হৃদয় সবচেয়ে পবিত্র। তাদের মন সবচেয়ে বিশুদ্ধ। মানব প্রবৃত্তির উপর তারা পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণশীল। বংশমর্যাদায় তারা সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত। চরিত্র-মাধুরীতে তারা সর্বোত্তম। তাদের হৃদয় সবচেয়ে বেশি উদার। তাদের মানসিকতা সর্বোন্নত। তারা সবচেয়ে বেশি মহানুভব, সাহসী, সত্যবাদী, ইনসাফগার, অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে সবচেয়ে দূরে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো আল্লাহর কোনো আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করেন না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তারা গুনাহ থেকে নিষ্পাপ কি না?

ইসমতের পরিচয় : আহলে সুন্নাতের আকিদামতে, নবিগণ গুনাহ থেকে পবিত্র। তারা মাসুম ও নিষ্পাপ। আহলে সুন্নাতের মতো একদল মুতাযিলাও নবিদের গুনাহ থেকে মাসুম মনে করে। বিপরীতে আরেক দল মুতাযিলা এবং মুরজিয়া ও খারেজিরা নবিদের মাসুম মনে করে না।[৭৭৩]

ইসমতের হাকিকত : তবে এই 'ইসমত' তথা নিষ্পাপতার প্রকৃতি কী—এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। একদল আলেমের মতে, ইসমতের ক্ষেত্রে বান্দার কোনো এখতিয়ার থাকে না। দুইভাবে এটা হতে পারে : **এক.** নবিগণের স্বভাব সাধারণ মানুষের স্বভাবের চেয়ে ভিন্ন হয়। ফলে তাদের মাঝে ভালোর প্রতি প্রাকৃতিক আকর্ষণ এবং মন্দের প্রতি বিকর্ষণ থাকে। যেমন—ফেরেশতাদের ইসমত। **দুই.** নবিগণের স্বভাব সাধারণ মানুষের স্বভাবের মতোই হয়। তবে আল্লাহ তাদের গুনাহ থেকে দূরে থাকতে এবং ভালোর প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য করেন (ফলে এখানেও কোনো এখতিয়ার থাকে না)।

বিপরীত আরেক দল আলেম মনে করেন, এই ইসমত আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা, বাধ্যবাধকতা কিংবা চাপিয়ে দেওয়া নয়। অর্থাৎ, নবিগণ মাসুম হওয়া সত্ত্বেও তাদের স্বাধীনতা সীমিত নয়। তারা চাইলে স্বেচ্ছায় পাপ ও পুণ্য বেছে নিতে পারেন। ইবাদত করতে পারেন, আবার গুনাহও করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন।[৭৭৪] মোটকথা, ইসমত পরীক্ষা দূর করে না। অর্থাৎ, আনুগত্যের উপর বাধ্য করে না এবং পাপ থেকে অক্ষম করে দেয় না। বরং এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা ভালো কাজে উদ্দীপ্ত করে এবং মন্দ কাজ থেকে

---

৭৭৩. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৭২)।

৭৭৪. দেখুন : আল-কিফায়াহ, (২০৩-২০৪)। শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৫৭)।

সতর্ক করে। এই ইসমত থাকা সত্ত্বেও নবিদের ভালোমন্দ বেছে নেওয়ার পূর্ণ এখতিয়ার থাকে। কারণ, এমন এখতিয়ার ছাড়া পরীক্ষা অসম্ভব। তা ছাড়া, এ ধরনের এখতিয়ার যদি না-ই দেওয়া হয়, তবে পুণ্যে পুরস্কার প্রাপ্তির কোনো যথার্থতা থাকে না। এটাই সঠিক বক্তব্য ইনশাআল্লাহ।

ইসমতে আম্বিয়ার ব্যাপারে আলেমদের মতবিরোধ : উপরে আমরা উল্লেখ করেছি—সকল আহলে সুন্নাতের মতে, নবিগণ গুনাহ থেকে পবিত্র। তারা মাসুম ও নিষ্পাপ। এটা ইজমালি আকিদা। তফসিলের মাঝে মতভেদ রয়েছে। অর্থাৎ, যেহেতু গুনাহের সগিরা ও কবিরাসহ বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে, ফলে যদি প্রশ্ন করা হয়, নবিগণ কোন ধরনের গুনাহ থেকে মাসুম? তখনই আসলে জটিলতা ও মতবিরোধ তৈরি হয়।

গোটা উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে নবিগণ নবুওতের আগে ও পরে সবসময়ের জন্য কুফর থেকে পবিত্র। একইভাবে নবুওতের পরে তারা সব ধরনের কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্র। এটাও উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের বক্তব্য। স্রেফ একদল—সাবুনির ভাষায়—হাশাভিরা এটাকে অস্বীকার করে। তারা মনে করে, নবিগণ কবিরা গুনাহ করতে পারেন! এটা অজ্ঞতাপূর্ণ কথা।[৯৭৫]

রইল সগিরা গুনাহের ব্যাপার। এটা মতভেদপূর্ণ। (এক.) একদল আলেমের মতে, তারা সগিরা গুনাহ থেকে পবিত্র নন। (দুই.) বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নাতের মতে, নবিগণ সব ধরনের কবিরা গুনাহ এবং ইচ্ছাকৃত সগিরা গুনাহ থেকে পবিত্র। সব ধরনের মানহানিকর কাজ থেকে মুক্ত। তবে সামান্য ভুলচুক, মানবিক দুর্বলতা ও মানবিক বিচ্যুতি থেকে মুক্ত নন। ইমাম আজম রহ.-এর মতে, **'আম্বিয়ায়ে কেরাম সব ধরনের সগিরা ও কবিরা গুনাহ, কুফর ও অশালীন বিষয় থেকে পবিত্র। হ্যাঁ, তাদের সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি (যাল্লাত) ও ভুলচুক (খাতা) হতে পারে।'**[৯৭৬] যেমন—কুরআনে আদম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলা হয়েছে, ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا﴾ অর্থ : 'আমি ইতঃপূর্বে আদমকে নির্দেশ দান করেছিলাম। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল। আমি তাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাইনি।' [তহা : ১১৫] ফলে নবিদের সামান্য ভুলবিচ্যুতি হওয়া কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হলো। এটা হানাফি ধারার বুখারার আলেমদেরও মত (তিন.) আবুল হাসান

---

৯৭৫. দেখুন : আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ (২০৫)।

৯৭৬. দেখুন : আল-ফিকহুল আকবার (৪)। উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৭২)।

আশআরি এবং হানাফিদের সমরকন্দি ধারার মতে, নবিগণ কবিরা-সগিরা গুনাহের পাশাপাশি মানবিক বিচ্যুতি থেকেও মুক্ত। অর্থাৎ, তাদের কোনো গুনাহ নেই, ভুলবিচ্যুতি নেই। স্রেফ উত্তমের পরিবর্তে অনুত্তম করে ফেলতে পারেন। তাই নবিগণের উপর 'ভুলবিচ্যুতি' শব্দ প্রয়োগ করাও সমীচীন নয়। কেননা, এটাও এক ধরনের গুনাহ। একইভাবে তাদের উপর 'অবাধ্যতা' (মাসিয়াত) শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নয়। বরং স্রেফ 'উত্তমের পরিবর্তে অনুত্তম' করেছেন এভাবে বলতে হবে।[৯৭৭]

কামাল ইবনুল হুমাম (৮৬১ হি.) লিখেন, 'কুফরি নয় এমন গুনাহ থেকেও নবিদের মাসুম হওয়া আবশ্যক। তবে বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। কারও কারও মতে, কবিরা গুনাহ থেকে তারা সম্পূর্ণ মাসুম, সগিরা গুনাহ থেকে মাসুম নন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য কথা হলো, নবিগণ কবিরা ও সগিরা সব ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র। হ্যাঁ, ভুলে সামান্য লঘু পর্যায়ের সগিরা (অন্যকথায় মানবিক বিচ্যুতি) হয়ে যেতে পারে।'[৯৭৮]

সাফফার লিখেন, 'নবিগণ স্বেচ্ছায় আল্লাহর কোনো নির্দেশের বিরোধিতা করেন না। কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হন না। হ্যাঁ, অনেক সময় কোনো কাজের দুটি প্রান্ত বরাবর হলে তারা ইজতিহাদ করে যেকোনো একটা বেছে নেন। এক্ষেত্রে হতে পারে আল্লাহর কাছে সঠিক ছিল বিপরীতটা। তখন আল্লাহ তাদের মৃদু ভর্ৎসনা করেন। এটা দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো গুনাহ নয়, ওহির ক্ষেত্রে কোনো বিচ্যুতি নয়, তাবলিগের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি নয়। নবুওতের আগে ও পরে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তারা সব ধরনের সগিরা ও কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্র।'[৯৭৯]

খায়ালি লিখেন, 'নবিগণ চরিত্রের জন্য অশোভন ও নিচু কর্ম থেকে পবিত্র—এ ব্যাপারে সবাই একমত। সগিরা গুনাহ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে, নবিগণ ভুলবশত সগিরা গুনাহ করে ফেলতে পারেন। আমাদের মতে, তারা সগিরা গুনাহ থেকেও পবিত্র।'[৯৮০]

---

৯৭৭. দেখুন : আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ (২০৬)। তাফসিরে নাসাফি (১/৮১)। লুবাবুল কালাম (৬২)।
৯৭৮. আল-মুসায়ারাহ (১২৭-১২৮)।
৯৭৯. তালবিসুল আদিল্লাহ (১৬৪-১৬৫)।
৯৮০. শরহুল খায়ালি আলা নুনিয়্যাতি খিজির বেগ (৩০৫-৩০৬)।

জটিলতা হলো, আল-ফিকহুল আবসাতে ইমামের এমন কিছু বক্তব্য আনা হয়েছে যেগুলো ইমামের এই প্রসিদ্ধ মানহাজের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমনটা আমরা উপরে দেখেছি, নবিগণ কবিরা ও সগিরা সকল গুনাহ থেকে পবিত্র—এটাই ইমাম আবু হানিফার সর্বসিদ্ধ মাযহাব। কিন্তু আল-ফিকহুল আবসাতে কবিরা গুনাহের মাধ্যমে মানুষ কাফের হয় না—এমন বক্তব্য প্রমাণ করতে গিয়ে ইমাম নবিগণকে গুনাহগার সাব্যস্ত করেছেন। যেমন—তিনি বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা ইউনুস আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেন,** ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ **অর্থ : 'আর স্মরণ করুন মৎসওয়ালার কথা। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন আর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধরতে পারব না। পরে তিনি অন্ধকারের মধ্যে ডাকলেন, আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; আপনি পবিত্র, আমি জালেম।' [আম্বিয়া : ৮৭] এখানে ইউনুস আলাইহিস সালামকে জালেম মুমিন বলা হয়েছে; কাফের বা মুনাফিক বলা হয়নি। একইভাবে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়ে বলেন,** ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ **অর্থ : 'যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন আর আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।' [ফাতাহ : ২] এখানেও আল্লাহ গুনাহের কথা বলেছেন, কুফরের কথা নয়। একইভাবে মুসা আলাইহিস সালাম যখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন, এর মাধ্যমে তিনি গুনাহগার হয়েছিলেন, কাফের নন।'**[৯৮১]

এসব বক্তব্য যদিও ইমাম খারেজি ও মুতাযিলাদের খণ্ডন করতে দিয়েছেন, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তিনি নবিগণকে গুনাহগার সাব্যস্ত করলেন। ফলে এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যে, যদি ধরে নেওয়া হয়, তারা গুনাহ করেছেন—সেটাও স্রেফ গুনাহ-ই; কুফর নয়। ফলে গুনাহকারীকে কাফের বলার সুযোগ নেই। এটা নবিদের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রযোজ্য, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আবু হাফসও গুনাহের কারণে কেউ কাফের হয় না সেটা বোঝাতে আদম আলাইহিস সালাম ও হারুত-মারুতের ঘটনা তুলে ধরেছেন।[৯৮২]

---

৯৮১. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৫-৫৬)।

৯৮২. আস-সাওয়াদুল আজম (৯-১০)।

উপরের ব্যাখ্যার কারণ হলো, ইসমতে আম্বিয়া বিষয়টি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর প্রসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত মতবাদ। গোটা উম্মতের মুহাক্কিক আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে নবিগণ কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্র। ফলে উপরের বিষয়গুলো যে কবিরা গুনাহ নয়, তা তো সুস্পষ্ট। যেমন—আদম আলাইহিস সালামের ঘটনা। আল্লাহ তায়ালা তাকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু ইবলিস তাদের ওয়াসওয়াসা দিয়ে ভুলিয়ে দেয়। আদম উত্তমের পথ থেকে সরে পড়েন। এটাকেই কুরআনে 'অবাধ্যতা ও পথচ্যুতি' বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿فَاَكَلَا مِنۡهَا فَبَدَتۡ لَهُمَا سَوۡاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا یَخۡصِفٰنِ عَلَیۡهِمَا مِنۡ وَّرَقِ الۡجَنَّۃِ ۫ وَ عَصٰۤی اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰی﴾ অর্থ : 'অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল। তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথচ্যুত হয়ে গেল।' [তহা : ১২১] কিন্তু এটা ধমক ও সতর্কীকরণ হিসেবে বলা হয়েছে। আদম আলাইহিস সালাম কবিরা গুনাহ করেছেন এমন নয়। এ জন্য অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ব্যাপারে বলেন, ﴿وَلَقَدۡ عَهِدۡنَاۤ اِلٰۤی اٰدَمَ مِنۡ قَبۡلُ فَنَسِیَ وَلَمۡ نَجِدۡ لَهٗ عَزۡمًا﴾ অর্থ : 'আমি ইতঃপূর্বে আদমকে নির্দেশ দান করেছিলাম। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল। আমি তাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাইনি।' [তহা : ১১৫] ফলে আদম আলাইহিস সালাম যা করেছেন, সেটা ভুলে যাওয়ার ফল ছিল। ইচ্ছাকৃত পাপ ও অবাধ্যতা ছিল না। একইভাবে মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনাতে—যা ইমাম নিজে উল্লেখ করেছেন—তাঁর লোকটিকে হত্যার ইচ্ছা ছিল না। বরং তিনি স্রেফ হাত দিয়ে আঘাত করে বিবাদ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতেই লোকটি মারা যায়। ফলে এটা ছিল ভুলক্রমে হত্যা। আর ভুলে এমন করলে সেটা কবিরা গুনাহ নয়; বরং ভুল হিসেবেই গণ্য হবে।[৯৮৩] অন্য নবিদের ঘটনাও এভাবে ভুল, মানবিক বিচ্যুতি ছিল; গুনাহ নয়।[৯৮৪]

সাবুনি লিখেন, 'নবিদের এসব ঘটনা দেখলে গুনাহ মনে হয়। বাস্তবে এগুলো তেমন নয়, বরং ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আল্লাহ নবিদের অনুসরণীয় করে পাঠান। এখন যদি তারাই গুনাহে লিপ্ত থাকেন, তবে তাদের অনুসরণ করার সুযোগ থাকে?'[৯৮৫]

---

৯৮৩. শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১৩২-১৩৩)।

৯৮৪. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৭৩-১৭৪)।

৯৮৫. আল-মিনাল কিফায়াহ (৯৬)।

জামালুদ্দিন গযনবি বলেন, 'এগুলোর ব্যাখ্যা করতে যাওয়া ভুলের আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। আমাদের এমন দায়িত্বও দেওয়া হয়নি। ফলে এ ব্যাপারে নীরব থাকা আবশ্যক।'[৯৮৬]

রইল সগিরা গুনাহের কথা। উপরের বিষয়গুলোকে যদি সগিরা গুনাহও ধরা হয়, তবুও ইমামের বক্তব্যের উপর আপত্তি আসে। অর্থাৎ, তাঁর বক্তব্যই তাঁর মাযহাবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। কারণ, ইমাম আজম রহ.-এর মাযহাব হলো, নবিগণ ইচ্ছাকৃত সগিরা গুনাহ থেকেও পবিত্র। তাহলে ইমাম উপরে এগুলো 'গুনাহ' শব্দে ব্যক্ত করলেন কেন? আল্লামা খায়ালি বলেন, দুইভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। এক. নবুওতের আগে সংঘটিত হয়েছে ধরা হবে। দুই. ভুলে করেছেন ধরা হবে।[৯৮৭]

অধমের পর্যবেক্ষণ : নবিগণ কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্র—এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের সকল আলেম একমত। সগিরা গুনাহ নিয়ে মতবিরোধের কারণ মূলত সংজ্ঞায়নের জটিলতা। পিছনে আমরা বলেছি যে, সগিরা ও কবিরা গুনাহের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নিয়ে আলেমদের মতপার্থক্য রয়েছে। আর সেই মতপার্থক্যের ফলে এখানেও মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। লঘু পর্যায়ের মানবিক বিচ্যুতিকে কেউ সগিরা গুনাহ ধরেছেন। ফলে তারা বলেছেন, নবিগণ সগিরা গুনাহ করেন। কেউ গুনাহ ধরেননি, বরং ভুলবিচ্যুতি ধরেছেন। ফলে তারা বলেছেন, নবিগণ সগিরা-কবিরা সব ধরনের গুনাহ থেকে মুক্ত, স্রেফ মানবিক ভুল করেন, যেমনটা ইমাম আজমেরও বক্তব্য। আবার কেউ দুটোকেই নাকচ করে স্রেফ উত্তমের পরিবর্তে অনুত্তম বলেছেন। এগুলো শাব্দিক মতপার্থক্য। মৌলিক কোনো মতবিরোধ নেই।

ইসমাইল হক্কি ইস্তাম্বুলি (১১২৭ হি.) একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা দেন। সেটাও সুন্দর। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য কথা হলো, নবিগণ নবুওত অবস্থায় সগিরা-কবিরা সব ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র। হ্যাঁ, উত্তমের পরিবর্তে অনুত্তম করে ফেলতে পারেন। (আমাদের কাছে এটা গুনাহ না হলেও) তাদের জন্য এটাই সগিরা। কারণ, সাধারণ লোকদের পুণ্যের কাজটাও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের পাপ গণ্য হয়।'[৯৮৮]

---

৯৮৬. উসুলুদ্দিন, গযনবি (১৩৯)।

৯৮৭. শরহুল খায়ালি আলা নুনিয়্যাতি খিজির বেগ (৩০৭)।

৯৮৮. রুহুল বায়ান (৬/৩২৩)।

মুজিযা ও কারামত

আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত আকিদা অনুযায়ী নবি ও ওলিদের হাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও নির্দেশে বিভিন্ন আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব। নবিদের হাতে প্রকাশিত এমন ঘটনাকে বলা হয় 'মুজিযা', আর ওলিদের হাতে প্রকাশিত হলে বলা হয় 'কারামত'। এ বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত। কিন্তু এগুলো একান্তই আল্লাহর অনুগ্রহ ও দান। এক্ষেত্রে মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই।

মুতাযিলা ও কাদারিয়্যাহসহ একাধিক বিভ্রান্ত ও আকলপূজারী সম্প্রদায় মুজিযা ও কারামতকে অস্বীকার করেছে। তাদের এ অস্বীকারের ভিত্তি স্রেফ কুযুক্তি। অর্থাৎ, এগুলো যেহেতু প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার এবং যুক্তির বাইরে, ফলে তারা এগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে। অথচ মুজিযা ও কারামত কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এগুলোকে প্রত্যাখ্যানের কোনো সুযোগ নেই। তা ছাড়া, এগুলো যুক্তির বাইরে নয়, বরং যুক্তির ঊর্ধ্বে। আর কোনো জিনিস যুক্তির ঊর্ধ্বে হলেই সেটাকে নাকচ করা অনৈতিকতা ও অন্যায়।

তাদের খণ্ডনেই মূলত আহলে সুন্নাতের আলেমগণ তাদের আকিদার গ্রন্থাবলিতে মুজিযা ও কারামত নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। ইমাম আজম বলেন, **'নবিদের মুজিযা হক, আর ওলিদের কারামতও সত্য।'**[৯৮৯] ইমাম তহাবি বলেন, 'আমরা কোনো ওলিকে নবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করি না। বরং আমরা বলি, মাত্র একজন নবি সকল ওলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমরা তাদের থেকে প্রকাশিত কারামত এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত তাদের অন্যান্য ঘটনাতে বিশ্বাস রাখি।'[৯৯০]

মুজিযার বিষয়টি যেমন কুরআন দ্বারা প্রমাণিত, কারামতও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা একাধিক কারামতের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন—সুলাইমান আলাইহিস সালামের সামনে চোখের পলকে বিলকিসের সিংহাসন উপস্থিত করা : ﴿قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ অর্থ : 'যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল, আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেবো। সুলাইমান যখন তা সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখল তখন সে বলল,

---

৯৮৯. আল-ফিকহুল আকবার (৫-৬)।

৯৯০. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (৩০-৩১)।

এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ।' [নামল : ৪০] একইভাবে আসহাবে কাহফের ঘটনা, যারা তিনশত বছরের অধিক সময় ঘুমন্ত থেকে জেগে উঠেছেন। আল্লাহ কুরআনে এ সম্পর্কে বলেন, ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ অর্থ : 'তারা তাদের গুহায় তিনশত বছর এবং আরও অতিরিক্ত নয় বছর অবস্থান করল।' [কাহাফ : ২৫] একইভাবে ঈসা আলাইহিস সালামের মাতা মারইয়ামের সন্তান জন্মদানের ঘটনা : ﴿قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۝﴾ অর্থ : 'তিনি বললেন, আমার কীভাবে সন্তান হবে, অথচ কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি আর আমি ব্যভিচারীও নই? তিনি (জিবরাইল) বললেন, এভাবেই আপনার প্রতিপালক বলেছেন আর এটা তার জন্য সহজ। (আল্লাহ বলেন) যাতে আমি তাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন এবং আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ বানাই। আর এটা ছিল একটা ফয়সালাকৃত বিষয়।' [মারইয়াম : ২০-২১] যাকারিয়া আলাইহিস সালাম কর্তৃক মারইয়ামের কারামত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকরণ : ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ অর্থ : 'যাকারিয়া যখনই ইবাদতগৃহে প্রবেশ করতেন, তার কাছে খাবার দেখতে পেতেন। তখন তিনি বললেন, মারইয়াম, তুমি এগুলো কোথায় পেয়েছ? তিনি বললেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ যাকে চান বেহিসাব রিযিক দান করেন।' [আলে ইমরান : ৩৭] বরং সাহাবা ও তাবেয়িদের কাছ থেকে এত অধিক পরিমাণে কারামত বর্ণিত হয়েছে, যা বর্ণনা করতে বিশাল কলেবরের গ্রন্থ প্রয়োজন।

মুজিযা ও কারামতের মাঝে পার্থক্য

সালাফে সালেহিন এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য দেননি। যেমন—ইমাম আবু হানিফা মুজিযা ও কারামতের কথা বললেও দুটোর মাঝে পার্থক্যের কথা বলেননি। কারণ, তারা দুটোর মাঝের প্রকৃতিকে ভিত্তি ধরে পার্থক্য করতেন। অর্থাৎ, অলৌকিক ঘটনা যদি নবির হাতে ঘটে তবে সেটা মুজিযা, আর ওলির হাতে ঘটলে কারামত। এর বাইরে কিছু নয়। তা ছাড়া, ওলির হাতে কারামতের প্রকাশ মূলত নবির মুজিযার অংশ। কারণ, নবির অনুসরণের ভিত্তিতেই সে ওলি এবং সে কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্মান (কারামতের) উপযুক্ত হয়েছে।[৯৯১]

---

৯৯১. দেখুন : আকিদাহ রুকনিয়্যাহ (৩৩)।

তবে পরবর্তী আলেমগণ দুটোর মাঝে বিভিন্ন পার্থক্য টেনেছেন। যথা:

- নবি মুজিযা প্রকাশ করেন তাঁর নবুওত প্রমাণ করতে। বিপরীতে ওলি যদি নবুওতের দাবি করে, উলটো সে কাফের হয়ে যাবে। কারামতের সঙ্গে কোনো দাবি প্রমাণের সম্পর্ক নেই। বরং কারামতের মাধ্যমে যদি কেউ বেলায়াত (ওলিত্ব) প্রমাণের দাবি করে, তার বেলায়াতও নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, বেলায়াতের সঙ্গে কারামতের সম্পর্ক নেই। বেলায়াত দাবি-দাওয়ার বিষয় নয়।

- নবি-রাসুলগণ মুজিযা প্রকাশ করতে আদিষ্ট। অর্থাৎ, তাদের হাতে মুজিযা সংঘটিত হয় মূলত মানুষকে প্রভাবিত করতে, ইসলামে প্রবেশ করাতে। ফলে তারা মুজিযা প্রকাশে আদিষ্ট। বিপরীতে ওলির কর্তব্য হলো কারামত যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখা, প্রকাশ না করা।

- নবি আল্লাহর ইচ্ছায় যখন খুশি মুজিযা প্রকাশ করতে পারেন। অর্থাৎ, তিনি মুজিযার প্রয়োজন হলে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ তাঁর হাতে মুজিযা প্রকাশ করেন। বিপরীতে ওলির এ ধরনের কোনো ক্ষমতা নেই। বরং আল্লাহ যখন চান বিশেষ সময়ে ওলির হাতে কারামত প্রকাশ করতে পারেন, আবার নিয়ে নিতে পারেন। এ ব্যাপারে ওলির কোনো স্বাধীনতা থাকে না।

- নবিদের হাতে প্রকাশিত মুজিযা কখনো 'ইসতিদরাজ' (মন্দ) হতে পারে না। বিপরীতে ওলির সবসময় আতঙ্কিত থাকতে হয় তার হাতে প্রকাশিত কারামত ইসতিদরাজ হয়ে যায় কি না।

- মুজিযা ও কারামতের আরেকটি পার্থক্য হলো, মুজিযা নবিদের হাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রকাশ পায়। আর কারামত হলো যেটা সাধারণ মানুষের হাতে প্রকাশ পায় এবং তাতে কাফেরদের প্রতি কোনো চ্যালেঞ্জ থাকে না।[৯৯২]

কারামত কামালত নয়

আবু আলি জুযজানি বলেন, 'ইস্তিকামাতের অন্বেষণকারী হও; কারামতের অন্বেষণকারী হয়ো না। কেননা, কারামত তোমার নফস চাচ্ছে। অথচ তোমার রব তোমার কাছে ইস্তিকামাত (দ্বীনের উপর অবিচলতা) চাচ্ছেন।' শায়খ

---

৯৯২. দেখুন : তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/৭৭৭)। বাহরুল কালাম (১৯৮-১৯৯)। শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৬৯)।

সোহরাওয়ার্দী এ ব্যাপারে লম্বা কথা বলেছেন। তাঁর কথার সারমর্ম হলো, 'কারামত কামালত নয়'—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। সুলুকের পথের অনেক লোক এটা থেকে গাফেল। ফলে তারা যখন সালাফে সালেহিনের জীবনীর মাঝে বিভিন্ন কারামত ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ পড়ে, তখন তাদের নফসও সেটা পাওয়ার জন্য লালায়িত হতে থাকে। বরং অনেক সময় না পেলে ভগ্নমনোরথ হয়ে পড়ে, কষ্ট পায়। কাশফ-কারামত না এলে নিজের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে সন্দেহ করা শুরু করে। অথচ তারা বাস্তবতা বুঝলে এত কষ্ট পেত না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা অনেক সময় তার কোনো কোনো বান্দার উপর এ কারণে কারামতের দরজা খুলে দেন, যাতে সেগুলো দেখে তার ইয়াকিন বৃদ্ধি পায়, যুহদের প্রতি মনোযোগ বাড়ে, প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়। বিপরীতে আল্লাহ তায়ালা কিছু বান্দার মাঝে ইয়াকিন ঢেলে দেন। ফলে তার অলৌকিক কিছুর প্রয়োজন পড়ে না। কেননা, উদ্দেশ্য হলো ইয়াকিন হাসিল হওয়া। সেটা কারামত ছাড়াই অর্জিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং কারামত এখানে নিষ্প্রয়োজন। বরং এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থা প্রথম অবস্থার চেয়ে উত্তম ও অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। কারণ, প্রথম অবস্থায় ইয়াকিনের জন্য চোখের দেখার প্রয়োজন হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থায় চোখের দেখা ছাড়াই ইয়াকিন তৈরি হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সবসময় নফসকে ইস্তিকামাতের উপর অটল রাখা চাই। এটাই আসল কারামত।[৯৯৩]

সব কারামত কারামত নয় (ইস্তিদরাজ)

'ইস্তিদরাজ' হলো গুনাহগার ও কাফেরদের হাতে ঘটা অলৌকিক ঘটনা। যেমন—শয়তান মুহূর্তের মাঝে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে পারে। সে মানুষের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে রগ ও ধমনিতে চলতে পারে! একইভাবে ফিরাউনের নীল নদের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল, কিয়ামতের আগে দাজ্জালের হাতে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ঘটবে—এগুলো মুজিযা বা কারামত নয়। বরং এগুলোকে বলা হয় সুযোগ প্রদান, ঢিল দেওয়া, সময় দিয়ে পাকড়াও করা। ইমাম আজম বলেন, "...**তবে ইবলিস, ফিরাউন এবং দাজ্জালের মতো আল্লাহর দুশমনদের হাতে যেসব আশ্চর্যজনক বিষয় সংঘটিত হয়, সেগুলোকে আমরা মুজিযা বা কারামত বলি না। সেগুলোকে আমরা বলি 'প্রয়োজন পূরণ।' কেননা, আল্লাহ তায়ালা অনেক সময় তাদের পৃথিবীতে অবকাশ এবং আখেরাতে শাস্তি দেওয়ার**

---

৯৯৩. দেখুন : আওয়ারিফুল মাআরিফ, সোহরাওয়ার্দি (৪২-৪৩)।

উদ্দেশ্যে তাদের অনেক প্রয়োজন পূরণ করেন 'ইস্তিদরাজ' হিসেবে। তখন তারা ধোঁকায় পড়ে যায়। তাদের অবাধ্যতা ও কুফরি আরও বৃদ্ধি পায়। এ কারণে তাদের হাতে আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে থাকে।"[১১৪]

কুরআন সুন্নাহতে এর দলিল রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ অর্থ : 'যারা আমার আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের আমি ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করব যে, তারা বুঝতেই পারবে না।' [আরাফ : ১৮২] অর্থাৎ, অন্যায় ও অপরাধ করা সত্ত্বেও, আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের বিরোধিতা সত্ত্বেও শাস্তি বা পরীক্ষা না করে উলটো সুখ ও স্বচ্ছলতা দান করা, মৌজ-মাস্তিতে কিছুদিন জীবনযাপনের সুযোগ দেওয়া। এতে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবতে এবং আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে থাকে। অথচ আল্লাহ তাকে দ্বীন ও পারলৌকিক কল্যাণ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন—এটা অনুভবই করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা এভাবে একসময় উপরে ওঠাতে ওঠাতে হঠাৎ নিচে ছুড়ে ফেলেন। তখন আফসোস করেও লাভ হয় না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ﴾ অর্থ : 'তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন সেটা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের সামনে সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। অবশেষে তারা নিজেদের প্রাপ্তি নিয়ে যখন উল্লসিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদের পাকড়াও করলাম। তখন তারা ব্যর্থমনোরথ হয়ে গেল।' [আনআম : ৪৪] এটাও 'ইসতিদরাজ'-এর বহিঃপ্রকাশ।

একটি হাদিসেও ইস্তিদরাজের কথা পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যখন কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও সুখে-শান্তিতে দেখবে, বুঝে নেবে, আল্লাহ তাকে সাময়িক ছাড় দিচ্ছেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন।'[১১৫]

মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি (ফিরাসাত)

'ফিরাসাত' শব্দের অর্থ হলো দূরদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি। অর্থাৎ, খালি চোখে যা দেখা যায় না হৃদয়ের চোখে সেটা দেখা। মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখে ভিতরের অনেক

---

১১৪. আল-ফিকহুল আকবার (৫-৬)।

১১৫. মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুশ শামিয়্যিন : ১৭৫৮৪)। আল মুজামুল কাবির, তাবারানি (উকবা ইবনে আমের : ১৭/৩৩১; হাদিস নং ৯১৩)।

খবর বলে দিতে পারা। এটা ওহি বা ইলহাম নয়, ইলমুল গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান নয়, জিন ও শয়তানের সাহায্য গ্রহণও নয়। বরং মানব দেহের মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি, ক্ষমতা, বিচক্ষণতা, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টির আলোকে গভীর অনুভব-ক্ষমতা। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দেন। আল্লাহওয়ালাদের জন্য এটা কারামত হিসেবে বিবেচিত হয়।

মানুষের এই ক্ষমতা কুরআন-হাদিস দ্বারা স্বীকৃত। মুমিনদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ অর্থ : '(সদকা) ওই সকল গরিব লোকের জন্য যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে, যারা জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। যাচ্ঞা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। তাদের তোমরা তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতিমিনতি করে চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত রয়েছেন।' [বাকারা : ২৭৩] কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ অর্থ : 'অপরাধীদের তাদের লক্ষণ দ্বারা চেনা যাবে। মাথার চুল ও পা ধরে এদের পাকড়াও করা হবে।' [রহমান : ৪১]

হাদিসেও 'ফিরাসাতে'র স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ইমাম রহ. নিজস্ব সনদে আবু সাইদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা মুমিনের ফিরাসাত ভয় করো। কেননা, সে আল্লাহর নুর দ্বারা দেখে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন : ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ অর্থ : 'নিশ্চয়ই এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।' [হিজর : ৭৫]

ফলে এই অন্তর্দৃষ্টি-ই ফিরাসাত। উসমান রাযি. এই জ্ঞানে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি চোখ দেখে ব্যক্তি সম্পর্কে বলে দিতে পারতেন। ইমাম আজমও এ ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলো এমন অসংখ্য ঘটনায় ভরপুর যার কিছু পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন নিয়ে ভবিতব্য ফেতনা তিনি ফিরাসাতের মাধ্যমে প্রথমেই অনুভব করতে পেরেছিলেন।[৯৯৬]

---

৯৯৬. দেখুন : শরহে মুসনাদে আবি হানিফা, আলি কারি (৫৬৬)।

নবি ওলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ

ওলি হলেন সাধারণ মুমিন, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আমলের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী থাকেন। শিরক ও অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে দূরে অবস্থান করেন। আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। ইবাদত ও বন্দেগিতে ব্যাপৃত থাকেন। আল্লাহর অনুগ্রহে নেক কাজে আগে থাকেন। হ্যাঁ, তাদের থেকে ভুলভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নয়। ফলে কখনো কখনো আমলে ত্রুটিবিচ্যুতির শিকার হন। পুণ্যের সঙ্গে পাপ মিশ্রিত করে ফেলেন। কেউ কখনো কখনো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেন। অতঃপর আবার তাওবা করেন। ফলে গুনাহ সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি ঈমান, আনুগত্য ও নিবেদনের কারণে তারা আল্লাহর ওলি তথা বন্ধু, প্রিয় পাত্র।[৯৯৭]

অতীতের কিছু বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এবং বিভ্রান্ত সুফি নবিদের চেয়ে ওলিদের শ্রেষ্ঠ মনে করেছে। তাদের ধারণা ছিল, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নবুওতের সমাপ্তি ঘটে, বেলায়াতের সমাপ্তি ঘটে না। সুতরাং ওলি নবির চেয়ে উত্তম। অথচ তারা এটা বোঝেনি যে, যিনি নবি তিনি বড় ওলিও। ফলে ওলি নবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে তো দূরের কথা, একজন নবি জগতের সকল ওলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তা ছাড়া, নবুওত মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না। বরং স্রেফ তাবলিগের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। নবুওতের মর্যাদা কবর, পরকাল, কিয়ামত, হাশর-নাশর, পুলসিরাত এমনকি জান্নাতেও অব্যাহত থাকবে।[৯৯৮]

এ ধরনের বিভ্রান্তি অনেক আগ থেকেই চলে এসেছে। এ জন্য ইমাম তহাবি রহ.-কে বলতে হয়েছে, 'আমরা কোনো ওলিকে নবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করি না। বরং আমরা বলি, মাত্র একজন নবি সকল ওলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'[৯৯৯] আবু হাফস লিখেন, 'নবিগণের মর্যাদা ওলিগণের মর্যাদার চেয়ে উর্ধ্বে। যে ব্যক্তি নবিদের চেয়ে ওলিদের শ্রেষ্ঠ মনে করবে, সে বিদআতি কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায়ভুক্ত গণ্য হবে। এটা সাধারণ যুক্তিতেও বোঝা যায়। নবিগণ বেলায়াতের দরজা লাভ করার পরেই নবুওতপ্রাপ্ত হন। একইভাবে ওলিরা বেলায়াতের মর্যাদা নবিগণের অনুসরণের ফলেই লাভ করেন।'[১০০০]

---

৯৯৭. তালখিসুল আদিল্লাহ (৮১০)।
৯৯৮. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২৪১)।
৯৯৯. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (৩০-৩১)।
১০০০. আস-সাওয়াদুল আজম (২৭)।

আবদুল কাহের বাগদাদি (৪২৯ হি.) লিখেন, 'কাররামিয়্যাহদের একটি দল মনে করেছে, ওলি নবির চেয়ে উত্তম। বরং তাদের জাহেল অনুসারীরা ইবনে কাররামকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদসহ অনেক সাহাবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেছে। রাফেযিরা নবিদের চেয়ে তাদের ইমামদের শ্রেষ্ঠ মনে করে। কিন্তু আহলে হকের আকিদা হলো, প্রত্যেক নবি ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। সুতরাং মানুষের চেয়ে তো আরও বেশি উত্তম।'[১০০১]

নবির চেয়ে ওলির শ্রেষ্ঠ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ নবি মাসুম; ওলি মাসুম নন। নবিগণের জীবনের শেষ পরিণতি নিশ্চিতভাবে ঈমান, ইখলাস ও তাকওয়ার উপর। ওলিদের জন্য এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। নবিদের কাছে ওহি আসে, ওলিদের কাছে আসে না। নবি ফেরেশতাদের দেখতে পান, ওলি দেখে না। নবিগণ সৃষ্টির সকল সুন্দর গুণ এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী। ওলিদের জন্য এত পূর্ণাঙ্গ কামালত নেই। ফলে কাররামিয়্যাহ ও রাফেযিদের বক্তব্য সুস্পষ্ট অজ্ঞতা ও গোমরাহি।

একদল সুফি থেকেও এ ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। বিশেষত ইবনে আরাবির সঙ্গে সম্পৃক্ত একাধিক বক্তব্য বিভিন্ন গ্রন্থে বিদ্যমান। আলুসি সেসব বক্তব্য ব্যাখ্যা করেন। আলি কারি মনে করেন, এগুলো ইবনে আরাবির উপর অপবাদ। তিনি নবিদের চেয়ে সাধারণ ওলিদের শ্রেষ্ঠ বলতে পারেন না।[১০০২]

কোনো বিশেষ সুফি এ ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন কি না সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু একদল সুফি যে এ ধরনের ধারণা করত, ফলে সুফি সম্প্রদায়ের মাঝে এমন বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, সেটা স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত দুঃখজনক বাস্তবতা। প্রখ্যাত সুফি শায়খ আল্লামা রুকনুদ্দিন সমরকন্দি হানাফি (৭০১ হি.) বলেন, 'একজন ওলি যত চেষ্টা করুক, বেলায়াতের যত উঁচু পর্যায়ে উন্নীত হোক, কখনোই একজন নবির মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না। বিপরীতে একদল মূর্খ সুফি এক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা ওলিকে নবির চেয়ে ঊর্ধ্বে মনে করেছে। অথচ আমাদের মাশায়েখের বক্তব্য হলো, সিদ্দিকিনের মঞ্জিল যেখানে শেষ, নবিদের সেখান থেকে শুরু। তা ছাড়া, ওলিদের বেলায়াতের ভিত্তিই হলো নবিদের অনুসরণ।'[১০০৩]

১০০১. উসুলুদ্দিন, বাগদাদি (১৬৭)।

১০০২. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (১১০)। ইবনে আরাবির আলোচ্য বিষয়সংশ্লিষ্ট বক্তব্যগুলোর উপর পর্যালোচনা দেখুন আমাদের 'আকিদাহ তহাবিয়্যাহ'র ব্যাখ্যাতে।

১০০৩. দেখুন : আকিদাহ রুকনিয়্যাহ (৩৮)।

তাসাওউফের নামে যুগে যুগে এমন অনেক ভ্রান্তির চাষাবাদ করেছে এক শ্রেণির মানুষ। তেমন আরেকটি বিভ্রান্তি হলো এমন বিশ্বাস রাখা যে, বেলায়াতের উচ্চমার্গে পৌঁছে গেলে ইবাদতের দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। অথচ বাস্তব কথা হলো, ওলির মর্তবা যত উঁচুই হোক, তার উপর আরোপিত ফরয ইবাদতগুলো কখনো রহিত হয় না। বরং যে বেলায়াতের যত উচ্চতায় পৌঁছে যায়, তাঁর ইবাদত ও বন্দেগি তত বৃদ্ধি পায়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন এর জীবন্ত উদাহরণ। ফলে যে ব্যক্তি এমন মনে করবে যে, ওলি হয়ে হাকিকতের দরজায় পৌঁছে গেলে শরিয়তের বিধিবিধান তার উপর থেকে রহিত হয়ে যায়, সে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। কাসানি লিখেন, 'এমন ব্যক্তি কাফের ও মুলহিদ। এটা তো নবিদের বেলাতেই হয় না। তাহলে ওলির বেলায় কীভাবে হবে?'[১০০৪]

১০০৪. দেখুন : আল-মুতামাদ ফিল মুতাকাদ (১০-১১)। উসুলুদ্দিন, গযনবি (১৬৩-১৬৪)।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-সম্পর্কিত আকিদা

রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সঙ্গে মুমিনদের সম্পর্ক

তাওহিদের পরে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মারিফাত লাভ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, তিনি আমাদের দ্বীনদারির মূল ভিত্তি। তিনিই আমাদের আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। আমাদেরকে আমাদের রব চিনিয়েছেন। কুরআন নিয়ে এসেছেন। ইসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি আমাদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। জীবদ্দশায় আমাদের জন্য চোখের অশ্রু এবং শরীরের খুন ঝরিয়েছেন। আমাদের চিন্তায় অস্থির থেকেছেন। মৃত্যুর পরেও তিনি আমাদের জন্য কবরে অস্থির থাকেন। আমরা সুপথে থাকলে খুশি হন। বিপথে গেলে বিমর্ষ হন, ইস্তিগফার করেন। পরকালেও আমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি চিন্তাগ্রস্ত থাকবেন তিনি। হাশরের ময়দানের বিভিন্ন স্থানে আমাদের জন্য ছোটাছুটি করবেন। হিসাবের জন্য আমাদের অপেক্ষার পালা সুদীর্ঘ ও সুতীব্র হলে আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আমাদের জন্য কাঁদবেন। সূর্যের তাপে আমাদের ছাতি ফাটার উপক্রম হলে আমাদের জন্য হাউযে কাওসারের পাড়ে পানির পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। মিযানে আমলনামা মাপা শুরু হলে সেখানে ছুটে যাবেন। আমরা যখন পুলসিরাত পার হব, তখন এর পাড়ে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহ রক্ষা করুন! আল্লাহ রক্ষা করুন!' বলতে থাকবেন। আমাদের জান্নাতে পৌঁছে দিয়ে তবেই তিনি প্রশান্তি লাভ করবেন।

ফলে এ মহামানব আমাদের আত্মার আত্মীয়। আমাদের জীবন ও মরণের, দুনিয়া ও আখেরাতের সবচেয়ে কাছের বন্ধু, নেতা ও অভিভাবক। আল্লাহর পরে আমাদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা পাওয়ার উপযুক্ত। বরং মুমিন হওয়ার জন্য তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেই হবে। তিনি নিজে বলে গিয়েছেন, 'আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমাকে সে তার নিজের চেয়ে, নিজের পিতা ও সন্তানের চেয়ে, ধনসম্পদ ও দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসবে।'[১০০৫]

১০০৫. বুখারি (কিতাবুল ঈমান : ১৪)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ৪৪)।

এ ভালোবাসার কারণ হলো রাসুলুল্লাহর প্রতি প্রত্যেকটি মানুষের মুখাপেক্ষিতা সারা জীবনের। জন্ম থেকে কেবল মৃত্যু পর্যন্ত নয়; বরং কবর, হাশর থেকে জান্নাতে গিয়েও তাঁর সঙ্গে আমাদের বন্ধন শেষ হওয়ার নয়। প্রত্যেকটি মানুষকে মুসলিম হওয়ার জন্য তাওহিদের পরেই রিসালাত তথা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে রাসুল হিসেবে মেনে নেওয়ার সাক্ষ্য দিতে হয়। নামায-রোযার মতো ইসলামের বড় বড় ইবাদত থেকে শুরু করে ছোট ছোট ইবাদতেও রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য সালাত-সালামের অংশ রাখতে হয়। মৃতুর সময় তাওহিদের সঙ্গে রিসালাতের সাক্ষ্য দিতে হয়। কবরে শোয়ানোমাত্রই প্রত্যেকটি মানুষকে উঠিয়ে বসিয়ে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়! পরকালেও মানুষ তাঁর কাছে সুপারিশ চাইতে ছুটে যাবে। পিপাসার্ত হলে তাঁর হাউযের পানি পান করে তৃপ্ত হতে চাইবে। তাঁর পতাকাতলে সমবেত হতে চাইবে। জান্নাতেও তাঁর সঙ্গে থাকতে চাইবে!

ফলে প্রত্যেক মুমিনের জন্য রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে পূর্ণভাবে চেনা, তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি সবকিছু জানা, তাঁর সুন্নাতগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা, তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আকিদার বিষয়গুলো জানা আবশ্যক। তবে সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো, তাঁর ওপর ঈমান আনা।

ইমাম আজম বলেন, **'প্রত্যেক মুমিনকে তাওহিদের পাশাপাশি সর্বপ্রথম রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান আনতে হবে।'** প্রশ্ন করা হলো- কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনি কিন্তু মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর ঈমান আনি না, তার ব্যাপারে বক্তব্য কী? ইমাম বলেন : **'এটা সম্ভব নয়। তাকে কাফের গণ্য করা হবে। আল্লাহর ঈমান সম্পর্কে তার দাবি মিথ্যা মনে করা হবে। সে যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে না এটার প্রমাণ হলো মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর ঈমান না রাখা। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে অবিশ্বাস করবে, সে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কেও অবিশ্বাস করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে অবিশ্বাস করলে আল্লাহকে অবিশ্বাস করবে এমন জরুরি না। যেমন—খ্রিষ্টানরা প্রথমে এক আল্লাহতে অবিশ্বাস করল। এর ফলে তারা ত্রিত্ববাদের শিকার হলো। একইভাবে ইহুদিরা যখন আল্লাহর ধনী হওয়া, দাতা হওয়া, প্রতিপালক ও ক্ষমতাশালী হওয়াকে অস্বীকার করল, তখন ধারণা করতে লাগল যে—আল্লাহ ফকির; তিনি কৃপণ; উযাইর তাঁর ছেলে; আল্লাহ তায়ালা মানুষের মতো। একই কথা যারা আগুন কিংবা সূর্য ও চন্দ্রের পূজা করে। তা ছাড়া, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ অর্থ : 'অতএব, আপনার পালনকর্তার শপথ! যতক্ষণ না তাদের মধ্যে**

সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তারা আপনাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুমিন হতে পারবে না।' [নিসা : ৬৫] সুতরাং যে ব্যক্তি বলে, সে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে কিন্তু মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে অবিশ্বাস করে, আমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি অবিশ্বাসের মাধ্যমেই বুঝে নেব যে, সে মূলত আল্লাহকেও অবিশ্বাস করে। এটা এভাবে বুঝব যে, যদি কোনো ব্যক্তি দাবি করে সে একা ১০ মনের বোঝা ওঠাতে পারে, কিন্তু দুই মন উঠিয়েই কাত হয়ে পড়ে যায়, তবে বুঝতে হবে তার দাবি মিথ্যা। কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহকে মানি কিন্তু মানুষ যে মাখলুক সেটা মানি না। বুঝতে হবে তার দাবি মিথ্যা। কারণ, সে যদি আল্লাহকে চিনত, তবে বুঝত, পৃথিবীতে তিনি ছাড়া সবকিছু তাঁর সৃষ্টি। এর আরও একটি উদাহরণ হচ্ছে সেই ব্যক্তির মতো যার কাছে সমান দূরত্বে একটি কুপি আর একটি প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত। তার দাবি, কুপিটি সে দেখছে, কিন্তু আগুন দেখতে পাচ্ছে না। তার এ দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। কারণ, সে যদি প্রকৃতপক্ষেই কুপিটি দেখত আগুন সেটার আগে দেখতে পেত।[১০০৬]

সুতরাং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে জানা এবং তাঁর উপর ঈমান আনা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারবে না। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে জানা ব্যতীত কারও ঈমান বিশুদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে জানার ন্যূনতম পরিমাণ কী? এটা আসলে ব্যক্তি ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নির্ণীত হবে। সাধারণ অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম, পরিচয়, তাঁর নবুওত ও রিসালাত সম্পর্কে মৌলিক বিষয়গুলো জানতে হবে। এর বাইরে তাঁর ব্যাপারে যখনই কোনো গলত আকিদা কিংবা গলত বক্তব্য বা সন্দেহ-সংশয় তৈরি হবে, সেটা দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। আকিদার সকল মাসআলার জন্য নিবেদিত গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা মোটেই সম্ভব নয়। কারণ, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আকিদার মাসআলা অগণিত-অসংখ্য। ফলে এখানে আমরা স্রেফ সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো ইমাম আজম রহ. তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আজম রহ. বলেন, **'মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বন্ধু। তাঁর বান্দা। তাঁর নবি। তাঁর রাসুল। তাঁর মনোনীত ও নির্বাচিত। তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি। কখনো**

১০০৬. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২০)।

এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহর সঙ্গে শরিক করেননি। কখনো কোনো সগিরা বা কবিরা গুনাহ করেননি।'[১০০৭]

তিনি আল্লাহর বন্ধু (হাবিব)

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) হলেন, আল্লাহর পরম প্রিয় বন্ধু। তাঁর 'হাবিব' (প্রিয়পাত্র) ও 'খলিল' (পরম বন্ধু)। পৃথিবীর সকল মানুষের মাঝে আল্লাহ তায়ালা তাঁকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন। তাঁর উপর সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ করেছেন। তাঁকে সবচেয়ে বেশি আপন করেছেন। ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, '...আমি আল্লাহর হাবিব তথা প্রিয় বন্ধু। এতে গর্ব নেই।'[১০০৮]

তিনি আল্লাহর বান্দা

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যত মর্যাদাবান হন, তবুও তিনি মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। তাঁর দাস ও গোলাম। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্বে এনেছেন, নবুওত ও রিসালাত দিয়েছেন। তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বানিয়েছেন। বরং আল্লাহ নিজের পরে তাঁকে সবচেয়ে দামি বানিয়েছেন। এ সবকিছু তাঁর উপর আল্লাহর অনুগ্রহ। এ জন্য তিনি ছিলেন আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা, সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ বান্দা। তিনি দিনে আল্লাহর পথে দাওয়াত ও সংগ্রাম করতেন, আর রাতের পর রাত আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। দাঁড়াতে দাঁড়াতে তাঁর পা ফুলে যেত। তাকে বলা হলো, আপনাকে তো আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাহলে এত কাঁদেন কেন? তিনি বললেন, 'আমি কি আমার প্রভুর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?'[১০০৯]

আল্লাহর সঙ্গে এই উবুদিয়্যাত তথা দাসত্বের সম্পর্ক গোটা চরাচরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও দামি সম্পর্ক। পৃথিবীর দাসত্ব লাঞ্ছনা ও অবজ্ঞার কারণ। অপরদিকে আল্লাহর দাসত্ব সম্মান ও গৌরবের। যে আল্লাহর যত বড় দাস হতে পারবে, তাঁর সামনে নিজেকে যত ক্ষুদ্র করতে পারবে, সে তত বড় সম্মানিত, তাঁর তত প্রিয় হতে পারবে। এ জন্য নবিজি (ﷺ) রাতের আঁধারে কেঁদে বুক ভাসাতেন, জান্নাতের জন্য নয়। কারণ, আল্লাহ তো তাকে সৃষ্টির আগেই জান্নাতের মালিক

১০০৭. আল-ফিকহুল আকবার (৪)।

১০০৮. তিরমিযি (আবওয়াবুল মানাকিব : ৩৬১৬)। মুসনাদে দারেমি (মুকাদ্দিমাতুল মুআল্লিফ : ৪৮)।

১০০৯. বুখারি (আবওয়াবুত তাহাজ্জুদ : ৪৮৩৬)। মুসলিম (সিফাতু ইয়াওমিল কিয়ামাহ : ২৮১৯)।

বানিয়ে রেখেছেন। তিনি কাঁদতেন আল্লাহর কৃতজ্ঞ দাস হওয়ার জন্য। দাস ও মনিবের এই সম্পর্ক পৃথিবীর সবচেয়ে দৃঢ়, সুন্দর, নিঃস্বার্থ ও বরকতময় সম্পর্ক।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সবসময় নবুওত ও রিসালাতের পাশপাশি নিজেকে আল্লাহর বান্দা ও দাস হিসেবে পরিচয় দিতেন। উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না যেভাবে খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো কেবল আল্লাহর বান্দা। তাই তোমরা বলো, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল।'[১০১০]

তাঁর মনোনীত ও নির্বাচিত

জগতের অনেককিছু চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করা যায়, করতে হয়। কিন্তু সবকিছু চেষ্টা করেও অর্জন করা যায় না। সব সৌভাগ্য পৃথিবীর সবকিছু বিসর্জন দিয়েও লাভ করা যায় না। এমন এক সৌভাগ্য হচ্ছে আল্লাহর 'মনোনয়ন।' আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্দার বানিয়েছেন, শেষ নবি ও রাসুল বানিয়েছেন, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বানিয়েছেন, তাঁর পরম প্রিয় বন্ধু বানিয়েছেন। এটা হয়েছে স্রেফ তাঁর অনুগ্রহ ও মনোনয়নের ফলে। তাঁকে সৃষ্টির আগেই তিনি তাঁর জন্য এ সৌভাগ্য লিখে রেখেছেন। এটা আমলের মাধ্যমে অর্জন করার বিষয় নয়; এ সৌভাগ্য আল্লাহ যার জন্য লিখে রেখেছেন তিনিই এটা লাভে ধন্য হন। রাসুলুল্লাহর মতো অন্য সকল নবি-রাসুলও বিভিন্ন পরিমাণ ও পর্যায়ে এ সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ তাদের নবি ও রাসুল হিসেবে মনোনীত করেছেন নিজ অনুগ্রহ ও নির্বাচনের মাধ্যমে। তাঁরা তাঁদের নিজেদের আমলের মাধ্যমে এ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। কেউই আমলের মাধ্যমে নবি হতে পারবে না। এটার একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনয়ন ও নির্বাচন।

আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন নবিকে মনোনয়নের ব্যাপারে কুরআনে বলেছেন, ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ অর্থ : 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম, নুহ, ইবরাহিমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে সমস্ত জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' [আলে ইমরান : ৩৩] ওয়াসিলা ইবনে আসকা' থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা ইসমাইলের বংশধর থেকে

১০১০. বুখারি (কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া: ৩৪৪৫)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুল আশারাহ আল-মুবাশশারিন বিল জান্নাহ : ১৫৬)।

কিনানা সম্প্রদায়কে মনোনীত করেছেন। কিনানা থেকে কুরাইশ বংশকে মনোনীত করেছেন। কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে বাছাই করেছেন। আর বনু হাশিম থেকে আমাকে নির্বাচিত করেছেন।'[১০১১]

সর্বশেষ নবি ও রাসুল

মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর সর্বশেষ নবি এবং শ্রেষ্ঠ রাসুল। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো নবি-রাসুল নেই। তাঁর পরে আর কোনো নবি-রাসুল আসবেন না। তিনি সকল মানুষের নেতা। সকল নবি-রাসুলের সর্দার। তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে মানজাতির নেতৃত্বের শিরোমণি।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর 'খাতামুল আম্বিয়া' বা সর্বশেষ নবি হওয়া কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ অর্থ : 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবি। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞানী।' [আহযাব : ৪০] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'ত্রিশজন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটার আগ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাদের প্রত্যেকে দাবি করবে সে আল্লাহর নবি। অথচ আমি শেষ নবি। আমার পরে কোনো নবি নেই।'[১০১২]

যারা রাসুলুল্লাহর শেষ নবি হওয়াকে অস্বীকার করবে কিংবা তাঁর পরে অন্য কারও নবুওতের স্বীকৃতি দেবে—যেমন আহমদিয়া নামে পরিচিত কাদিয়ানি সম্প্রদায়—মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে তারা কাফের এবং ইসলাম থেকে খারিজ অমুসলিম সম্প্রদায় গণ্য হবে। ইমাম তহাবি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে নবুওতের দাবি ভ্রষ্টতা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ।'[১০১৩] জামালুদ্দিন গযনবি লিখেন, 'যে ব্যক্তি নবুওতের দাবি করবে, তাকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি তাওবা করে, ভালো। না করলে তাকে হত্যা করা আবশ্যক হবে। কারণ, নবুওতের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'[১০১৪]

১০১১. বুখারি (কিতাবুল ফাযায়েল : ২২৭৬)। তিরমিযি (আবওয়াবুল মানাকিব : ৩৬০৬)।
১০১২. বুখারি (কিতাবুল ফিতান : ৭১২১)। ইবনে হিব্বান (মানাকিবুস সাহাবাহ : ৭২৩৮)।
১০১৩. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১২)।
১০১৪. উসুলুদ্দিন, গযনবি (২০৮)।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিষ্পাপ (মাসুম)

পিছনে আমরা সাধারণভাবে সকল নবির সব ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র থাকার কথা উল্লেখ করেছি। এখানে ইমাম আজম রহ.-এর বক্তব্যের আলোকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইসমত (নিষ্পাপতা)-সংক্রান্ত আরও কিছু কথা সংযুক্ত করছি। ইমাম আজম রহ. বলেন, **'রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কখনো মূর্তিপূজা করেননি। কখনো এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহর সঙ্গে শরিক করেননি। কখনো কোনো সগিরা বা কবিরা গুনাহ করেননি।'**[১০১৫]

অর্থাৎ, সাধারণভাবে উলামায়ে কেরাম নবি-রাসুলদের ইসমতের কথা নবুওতের পরবর্তী সময়ের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। কিন্তু রাসুলল্লাহ (ﷺ)-এর ক্ষেত্রে নবুওতের পূর্বাপর কোনো পার্থক্য নেই। তাঁর পুরো জীবন ইসমতময়, সুরক্ষিত ও পবিত্র। নবুওতের পরেও যেমন আগেও তেমন। তিনি আল্লাহর নবি ও রাসুল। তিনি পৃথিবীতে তাওহিদের ঝান্ডাধারী, কুফর ও শিরক বিলুপ্তকারী, মূর্তিপূজা উচ্ছেদকারী। ফলে তিনি জীবনে কখনো শিরক করে থাকবেন এটা অসম্ভব। নবুওতের আগে কিংবা পরে তিনি কখনো এক মুহূর্তের জন্যও মূর্তিপূজা করেননি। মূর্তিপূজা দূরের কথা, কখনো তিনি কোনো গুনাহও করেননি। এর কারণ হলো, তিনি মানবজাতির সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। সবচেয়ে বেশি 'কামেল' মানব। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' [আহযাব : ২১]

কেবল নিজ জীবনে নয়, বরং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, দাওয়াত ও তাবলিগের ময়দানেও রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সব ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি-মুক্ত। ইমাম আজম বলেন, **"আমরা সাক্ষ্য দিই যে, নবিজি (ﷺ) আল্লাহর নিষিদ্ধ কোনো বিষয়ের আদেশ দেননি। আল্লাহ সংযুক্ত করতে বলেছেন এমন কোনো বিষয় কর্তন করেননি। আল্লাহর বর্ণনার বাইরে কোনো জিনিস বর্ণনা করেননি। আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সবকিছুতে নবিজি (ﷺ) আল্লাহর আনুগত্য করেছেন। তিনি কোনো নতুন বিষয় নিয়ে আসেননি। আল্লাহ যা বলেননি তেমন কিছু আল্লাহর নামে চালিয়ে দেননি। এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন,** ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ

১০১৫. আল-ফিকহুল আকবার (৪)।

﴿أَطَاعَ اللَّهَ﴾ অর্থ : 'যে রাসুলের আনুগত্য করল সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করল।'" [নিসা : ৮০][১০১৬]

হ্যাঁ, মানুষ হিসেবে তিনি কিছু মানবিক 'ভুলত্রুটি'র শিকার হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে তাকে অবহিত করেছেন। বদরযুদ্ধে মুসলমানদের হাতে কাফেররা বন্দি হলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করেন : ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ অর্থ : 'ভূপৃষ্ঠে শত্রুকে চূড়ান্তভাবে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোনো নবির জন্য সংগত নয়। তোমরা কামনা করো পার্থিব সম্পদ, আর আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [আনফাল : ৬৭] এভাবে আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে মৃদু ভর্ৎসনা করে জানিয়ে দেন যে, বদরযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল দুশমনের প্রভাব সম্পূর্ণ খতম করে দেওয়া। এ জন্য কোনো মুক্তিপণ না নিয়ে সকল বন্দিকে হত্যা করা উচিত ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে প্রশস্ততা আসে এবং যুদ্ধবন্দিদের অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়ার বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটকথা, এটা কোনো পাপ ছিল না, বরং উত্তমের পরিবর্তে অনুত্তম ছিল। একইভাবে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মুনাফিকদের মিথ্যাচার বুঝতে না পেরে তাদের মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে না গিয়ে বাড়িতে থাকার অনুমতি দেন। তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করেন : ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের?' [তাওবা : ৪৩] সুবহানাল্লাহ! লক্ষ করুন, আল্লাহর শাসন ও শাসানোর পদ্ধতিও কত সুন্দর, মহান আর তাৎপর্যপূর্ণ! এখানকার উল্লিখিত ক্ষমা পাপের ক্ষমা নয়, বরং এভাবে মূলত অত্যন্ত কাছের ও মহব্বতের মানুষকে শাসন করা হয়।

'ইসমতে আম্বিয়া'-সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পিছনে অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে আমরা দেখিয়েছি, ইমাম আজম আবু হানিফাসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মতে, নবিগণ সকল কবিরা ও সগিরা গুনাহ থেকে পবিত্র। ফলে কুরআনের যেসব আয়াতে নবিজির ক্ষমাসংক্রান্ত বক্তব্য এসেছে, সেগুলো 'মানবিক বিচ্যুতি' কিংবা

১০১৬. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৯)।

'উত্তমের পরিবর্তে অনুত্তম' কাজ বোঝানো হয়েছে, গুনাহ নয়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং আল্লাহর পরম প্রিয় বন্ধু, এ জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর সামান্য ভুল কিংবা উত্তমের পরিবর্তে অনুত্তম কাজের ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন। আবার ক্ষমার ঘোষণাও করেছেন।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'মাঝে মাঝে আমার অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে আড়ালে চলে যায়, আর তাতেই আল্লাহর কাছে আমি প্রতিদিন একশতবার ইস্তিগফার করি।'[১০১৭] অর্থাৎ, তিনি গুনাহ করবেন দূরের কথা, ঘুমন্ত ও জাগ্রত সর্বাবস্থায় তাঁর হৃদয় আল্লাহর দিদার ও মুরাকাবায় থাকে। মাঝে মাঝে মানবিক কারণে একটু আড়াল হয়ে গেলে সে জন্য তিনি শতবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বরং এই যে সামান্য আড়াল ও অন্যমনস্কতা—উলামায়ে কেরাম লিখেছেন—সেটাও উম্মাহর চিন্তায়, আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণে! এটা ফানাফিল্লাহর এমন মাকাম, যেখানে অন্য কারও পৌঁছার সাধ্য নেই।

ইসরা ও মিরাজ

ইসরা ও মিরাজ হলো রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ নেয়ামতগুলোর একটি। বরং ধুলির ধরার একমাত্র রাসুলুল্লাহই এই নেয়ামত লাভের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। ইসরা হলো মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাতের ভ্রমণ। আর মিরাজ হলো বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ঊর্ধ্বজগতে ভ্রমণ। এই দুটো একই রাতে সংঘটিত হয়েছিল, জাগ্রত অবস্থায় এবং সশরীরে। বোরাক নামক এক অলৌকিক প্রাণীর পিঠে চড়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা থেকে মুহূর্তে বাইতুল মুকাদ্দাস চলে যান। সেখানে নবিদের ইমাম হয়ে নামায পড়েন। অতঃপর বিশেষ এক যানে করে জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাকে ঊর্ধ্বজগতে নিয়ে যান। সাত আকাশ পার হয়ে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছে যান। আল্লাহর সৃষ্টির বিভিন্ন বিস্ময়কর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। আল্লাহর সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্যে কথা বলেন। জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করেন। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির প্রতি মহা উপহার 'নামায' নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

ইমাম আজম রহ. বলেন, **'মিরাজের সংবাদ সত্য। যে ব্যক্তি এটা প্রত্যাখ্যান করবে সে গোমরাহ ও বিদআতি।'**[১০১৮] ইমাম তহাবি রহ. বলেন, "মিরাজ সত্য।

১০১৭. মুসলিম (কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া : ২৭০২)। আবু দাউদ (কিতাবুস সালাত : ১৫১৫)।

১০১৮. আল-ফিকহুল আকবার (৮)।

নবিজি (ﷺ)-কে নৈশভ্রমণ (ইসরা) করানো হয়েছে। অতঃপর তাকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে আকাশে নেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে আল্লাহ যেখানে চেয়েছেন তাঁকে ঊর্ধ্বজগতে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁকে যেভাবে চেয়েছেন সম্মানিত করেছেন। তিনি তাঁর প্রতি ওহি নাযিল করেছেন, 'তাঁর হৃদয় মিথ্যা বলেনি যা তিনি দেখেছেন।' আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন।"[১০১৯]

ইসরা ও মিরাজের ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। ফলে এতে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। এটা অস্বীকার কুফর ও ফিসক। অর্থাৎ, কেউ যদি মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত (ইসরা) যাত্রাকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, এটা কুরআনের সুস্পষ্ট (কাতয়ি) নস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, ﴿سُبْحٰنَ الَّذِى اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِى بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ﴾ অর্থ : 'পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রজনিতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার চতুর্পাশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' [ইসরা : ১] আর কেউ যদি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ঊর্ধ্বজগতে যাত্রা (মিরাজ) অস্বীকার করে, তবে কাফের হবে না, কিন্তু বিদআতি ও গোমরাহ সাব্যস্ত হবে। কারণ, এটা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং সহিহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।[১০২০]

রাসুলুল্লাহর (ﷺ) নামে প্রচলিত ভিত্তিহীন আকিদা

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে ইমাম আজমের উল্লেখ করা আকিদার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার পর তাঁর সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস সম্পর্কে সচেতন করা আবশ্যক মনে করছি। কারণ, সহজাতভাবে মানুষ দুর্বল। অপরদিকে ইবলিস শয়তান সবসময় মানুষকে বিপথে-কুপথে নিতে বদ্ধপরিকর। ফলে মানুষ সিরাতে মুস্তাকিমের মধ্যম পথে চলতে হিমশিম খায়। ডানে-বামে বেঁকে যায়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে মহব্বত করা, তাঁকে পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসা এবং তাঁকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। কিন্তু এক্ষেত্রেও ভালোবাসার মনগড়া মানদণ্ড তৈরি করা যাবে না। আল্লাহর নির্দেশনা মানতে হবে।

১০১৯. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১৫)।

১০২০. দেখুন : আস-সাওয়াদুল আজম (২১)। আকিদাহ রুকনিয়্যাহ (৩৭)। ফাতহুল কাদির (১/৩৫০)। ফাতাওয়া আলমগিরি (১/৮৪)।

কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে। সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। কারণ, ইতিবাচক বিষয়ের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করলে সেটা আর ইতিবাচক থাকে না, নেতিবাচক হয়ে যায়। ঈসা আলাইহিস সালামকে খ্রিষ্টানরা বেশি ভালোবাসা ও সম্মান দিতে গিয়ে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে ফেলেছে। এটা সীমালঙ্ঘন। এই ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই। একইভাবে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে ভালোবাসতে গিয়েও একদল মানুষ সীমালঙ্ঘন করেছে। এই সীমালঙ্ঘনকেই তারা ইবাদত ও সিরাতে মুস্তাকিম মনে করেছে। অথচ তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত। ফলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-সম্পর্কিত আহলে সুন্নাতের আকিদাগুলো বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন ও ভ্রান্ত আকিদাগুলো সম্পর্কে সতর্ক করাও জরুরি।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কি সর্বপ্রথম সৃষ্টি? রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নবুওত প্রাপ্তির দিক থেকে সর্বপ্রথম নবি, আর প্রেরণের দিক থেকে সর্বশেষ নবি। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সকল নবির পূর্বে নবুওত দান করেছেন, কিন্তু পাঠিয়েছেন সবার শেষে। এটি বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, আপনাকে কখন নবি বানানো হয়েছে? তিনি বললেন, 'যখন আদম রুহ ও শরীরের মাঝামাঝি ছিলেন' (অর্থাৎ আদম সৃষ্টির আগে)।[১০২১] আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'সৃষ্টির দিক থেকে আমি সর্বপ্রথম নবি, আর প্রেরণের দিক থেকে সর্বশেষ।'[১০২২]

এটা মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ, আল্লাহ সবকিছু জানেন। তাঁর কাছে অতীত ও ভবিষ্যৎ এক সমান। ফলে তিনি যে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং শেষ নবি বানাবেন এটা তিনি আগ থেকেই জানেন। তাই আমাদের যেমন রুহের জগতে তিনি প্রশ্ন করেছেন, একইভাবে রাসুলুল্লাহকেও সৃষ্টির শুরুতে নবি হিসেবে মনোনীত করেছেন। পাঠিয়েছেন সবার শেষে।

কিন্তু কিছু কিছু লোক এসব হাদিস ভুলভাবে গ্রহণ করেছে। তারা ধারণা করেছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে আল্লাহ বাস্তবিকভাবে সৃষ্টির শুরুতে সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি সৃষ্টির শুরু থেকেই বিদ্যমান। এক্ষেত্রে তারা এক বিচ্যুতি থেকে আরেক বিচ্যুতিতে নিমজ্জিত হয়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে মাটির তৈরি

১০২১. মুসনাদে আহমদ (আওয়ালু মুসনাদিল মাদানিয়্যিন : ১৬৮৯১)। তিরমিযি (আবওয়াবুল মানাকিব : ৩৬০৯)। মুসতাদরাকে হাকেম (কিতাবু তাওয়ারিখিল মুতাকাদ্দিমিন : ৪২৩২)।

১০২২. মুসনাদে বাযযার (তাতিম্মাতু মারউয়্যাতি আবি হুরাইরা : ৯৫১৮)। দালায়িলুন নুবুয়্যাহ, বাইহাকি (২/৩৯৭)। তাফসিরে তাবারি (১৭/৩৩৭)।

মহামানবের পরিবর্তে নুরের তৈরি অতিমানব ভাবতে শুরু করে। তারা এক্ষেত্রে বিভিন্ন জাল হাদিস দিয়ে দলিল দেয়। যেমন—জাবের রাযি. রাসুলুল্লাহকে (ﷺ) সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'জাবের, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম তোমার নবির নুরকে সৃষ্টি করেছেন...।'[১০২৩] এই বর্ণনা 'নুরে নবি' আকিদার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। আজলুনি এটাকে আবদুর রাযযাক থেকে বর্ণনার কথা বলেছেন। অথচ মুসান্নাফে আবদির রাযযাকে এ ধরনের কোনো বক্তব্য অনুপস্থিত। সুয়ুতিসহ উম্মাহর সকল মুহাক্কিক আলেমের মতে এটা ভিত্তিহীন বর্ণনা।[১০২৪] লাখনৌভি রহ. রাসুলুল্লাহর সর্বপ্রথম নুর হওয়া কিংবা আল্লাহর নুর থেকে তাঁর তৈরি হওয়াকে বিভিন্ন দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে নাকচ করে দিয়েছেন।[১০২৫] এক্ষেত্রে তারা তৃতীয় আরেকটি ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বিভিন্ন বানোয়াট হাদিস তৈরি করেছে। যেমন—'আল্লাহ যদি রাসুলুল্লাহকে সৃষ্টি না করতেন, তবে আসমান-যমিন কিছুই সৃষ্টি করতেন না।' এটাও ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনা।[১০২৬] আসমান ও যমিনের অস্তিত্ব মানুষের অস্তিত্বের প্রয়োজনে। আর মানুষের অস্তিত্ব আল্লাহর দাসত্বের জন্য।

এগুলো তাঁর ব্যাপারে সেসব বাড়াবাড়ির সূচনাবিন্দু, যেগুলো থেকে তিনি নিজে বারবার নিষেধ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না যেমনটা খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়ামের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছে।'[১০২৭] কিন্তু তারা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ নির্দেশনা লঙ্ঘন করে রাসুলুল্লাহকে সৃষ্টির সর্বপ্রথম সৃষ্টি এবং নুরের সৃষ্টি বানিয়ে দিয়েছে। তাঁকে আলিমুল গায়েব কল্পনা করেছে। অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আলিমুল গায়েব নন। তারা তাঁকে সৃষ্টির সর্বত্র হাজির-নাজির বিশ্বাস করেছে। অথচ তিনি তাঁর কবরে, কোথাও হাজির নন। কবরের বাইরের কিছু প্রত্যক্ষকারী (নাজির) নন। বরং তাঁকে যতটুকু আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো হয় ততটুকু তিনি জানেন। কিন্তু তারা বিভিন্ন গালগল্প, কেচ্ছা-কাহিনি, ভিত্তিহীন বর্ণনা আর আবেগকে কুরআন-সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দিয়েছে। ফলে রাসুলুল্লাহর শানে যার যা ইচ্ছা আজগুবি অলৌকিক বিশ্বাস তৈরি করেছে। এভাবেই তাদের অনেকে শিরকে আকবরের

১০২৩. কাশফুল খাফা, আজলুনি (১/৩০২)।
১০২৪. আল-মুগির, আহমদ গুমারি (৫২)।
১০২৫. বিস্তারিত দেখুন : আল-আসারুল মারফুআহ ফিল আখবারিল মাওযুআহ (৪২-৪৩)।
১০২৬. দেখুন : তাযকিরাতুল মাওযুআত, মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানি (৮৬)।
১০২৭. বুখারি (কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া : ৩৪৪৫)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুল আশারাহ আল-মুবাশশারিন বিল জান্নাহ : ১৫৬)।

দুয়ার খুলে দিয়েছে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে প্রার্থনা শুরু করেছে। আল্লাহর পরিবর্তে আল্লাহর বান্দা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

বাস্তব কথা হলো, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে আল্লাহ অন্য সবার মতোই রুহের জগতে সৃষ্টি করেছেন। বরং আমাদের সবার শরীরের আগে আমাদের রুহ সৃষ্টি করেছেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর রুহ ও হাকিকতকেও তিনি আগে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর জন্য নবুওত নির্ধারণ করেছেন। এটা রুহের জগতের বিষয় যার উপর আমরা ঈমান রাখি। কিন্তু এর হাকিকত সম্পর্কে আমরা জ্ঞান রাখি না। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) হস্তিবাহিনীর বছর আরবে জন্মগ্রহণ করেন।

যদি উপরের হাদিস 'সৃষ্টির দিক থেকে আমি সর্বপ্রথম নবি, আর প্রেরণের দিক থেকে সর্বশেষ'-কে আল্লাহর রাসুলের সর্বপ্রথম সৃষ্টির উপর দলিল বানানো হয়, তবে নবির সকল উম্মতকেই অন্য সব মানুষের আগে সৃষ্ট ও বিদ্যমান মানতে হবে। কারণ, উক্ত হাদিসেই এসেছে, 'আমি আপনার উম্মতকে সর্বপ্রথম উম্মত বানিয়েছি।' এর মানে আপনার-আমার সৃষ্টিও সকল মানুষের আগে হয়েছিল! এটা হাদিসের অপব্যাখ্যা। এখানে বরং মর্যাদা বোঝানোর জন্য এটা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আগে থেকেই জানেন তিনি নবি হবেন, ফলে তিনি তাঁকে সৃষ্টির শুরুতেই নবি হিসেবে মনোনীত করেছেন। একইভাবে তিনি জানেন আমরা শেষ নবির উম্মত হব। ফলে আমাদেরও তিনি সৃষ্টির শুরুতেই মনোনীত করেছেন। ইমাম তহাবি 'আমি নবি ছিলাম যখন আদম রুহ ও শরীরের মাঝামাঝি ছিলেন'-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবি হওয়ার কথা লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন।'[১০২৮]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কি নুরের তৈরি? রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন; নুরের তৈরি নয়। মানুষ হওয়ার দিক থেকে তিনি অন্যান্য মানুষের মতো। সকল মানুষ যেমন পিতার ঔরসে মাতার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে, রাসুলুল্লাহও তেমন সাইয়েদ আবদুল্লাহর ঔরসে সাইয়েদা আমিনার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন। কুরআন বলেছে ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ অর্থ : 'আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতোই মানুষ।' [কাহাফ : ১১০] অন্য আয়াতে কাফেররা যখন নবিজির প্রতি ঈমান আনার জন্য আকাশে আরোহণের শর্ত দেয়, আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ

১০২৮. শরহু মুশকিলিল আসার (১৫/২৩১)।

করেন, ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا﴾ অর্থ : 'আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক পবিত্র। আমি তো একজন মানব রাসুল।' [ইসরা : ৯৩] অর্থাৎ, আমার কাজ আকাশে চড়া নয়। আমি তোমাদের মতো মানুষ। ফলে আমার কাছে এমন কিছু চেয়ো না, যা মানুষের কাজ নয়। মোটকথা, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মানুষ ছিলেন এটা সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত বাস্তবতা। তাঁর শরীর রক্ত-মাংস ও হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তিনি কষ্ট পেতেন, খুশি হতেন, কাঁদতেন, ক্ষুধা অনুভব করতেন, ব্যথা পেতেন, আহত হতেন, পানাহার করতেন, শারীরিক ও প্রাকৃতিক চাহিদা পূর্ণ করতেন, অসুস্থ হতেন। বরং অসুস্থতার মুখেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

মানবিক দুর্বলতার কারণে তিনি (ওহি ব্যতীত) বিভিন্ন বিষয় ভুলে যেতেন, যেভাবে মানুষ ভুলে যায়। একটি হাদিসে স্বয়ং তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের মতোই মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও ভুলে যাই। সুতরাং আমি যখন ভুলে যাব, আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।'[১০২৯] আয়েশা রাযি. বলেন, 'রাসুল মানুষের মাঝে একজন মানুষ ছিলেন। তিনি তার জামাকাপড় ধৌত করতেন, দুধ দোহন করতেন, নিজের কাজ নিজে করতেন।'[১০৩০] এটা রাসুলুল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর সাক্ষ্য। কিন্তু একদল মানুষ এগুলো পছন্দ করে না। খ্রিষ্টানরা যেমন ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর মানবিক রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসা অবতার কল্পনা করেছে, একদল মুসলিমও সরাসরি অবতার বলার সাহস না পেয়ে রাসুলুল্লাহকে আল্লাহর নুর থেকে তৈরি অতিমানবিক এক সৃষ্টি কল্পনা করেছে।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মানুষ ছিলেন; কিন্তু আমাদের মতো মানুষ নন : হ্যাঁ, এর মানে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মানবিক দিক থেকে আমাদের মতো হলেও সকল দিক থেকে আমাদের মতো নন; বরং তিনি একাধিক এমন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন, যেসব আমাদের নেই। তিনি গুনাহ থেকে পবিত্র ছিলেন। তাঁর বুক চিরে হৃদয় ধুয়ে পবিত্র করে দেওয়া হয়েছিল।[১০৩১] পাথর তাঁকে সালাম দিত এবং তিনি

১০২৯. বুখারি (কিতাবুস সালাত : ৪০১)। মুসলিম (কিতাবুল মাসাজিদ : ৫৭২)।
১০৩০. মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আয়িশাহ : ২৬৮৩৫)। সহিহ ইবনে হিব্বান (কিতাবুল হাযার ওয়াল ইবাহাহ : ৫৬৭৫)।
১০৩১. মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৬২)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আনস ইবনে মালেক : ১৪২৮৫)।

সেটা শুনতেন। তিনি ফেরেশতাদের দেখতেন। বরং তিনি পিছনে না ফিরেও পিছন দিকে দেখতে পেতেন।[১০৩২] শুকনো কাঠ তাঁর জন্য কাঁদত।[১০৩৩] তিনি হাত দিয়ে কিছু স্পর্শ করলেই সেটা বরকতপূর্ণ হয়ে উঠত। দুধবিহীন বকরির শরীর স্পর্শ করতেই সেটা দুধেল হয়ে উঠত।[১০৩৪]

তিনি আকাশ ও মাটির এমন অনেককিছু দেখতে ও শুনতে পেতেন, যেসব অন্যরা দেখে না বা শোনে না। যেমন—তিনি এক হাদিসে বলেন, 'আমি যা দেখি, তোমরা তা দেখো না। আমি যা শুনি, তোমরা তা শোনো না। আকাশ কড়কড় করেছে আর কড়কড় করাই তার সাজে। (আকাশে) একবিন্দু জায়গা খালি নেই, যেখানে কোনো-না-কোনো ফেরেশতা আল্লাহর জন্য সিজদায় লুটিয়ে পড়ে না আছে। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি, তোমরা তা জানলে কম হাসতে বেশি কাঁদতে। বিছানায় স্ত্রী সম্ভোগ করতে না। বরং কাঁদকে কাঁদতে আল্লাহর জন্য পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে।'[১০৩৫] আল্লাহর রাসুলের চোখ ঘুমাত; কিন্তু তাঁর হৃদয় ঘুমাত না।[১০৩৬]

তাঁর ঘাম পবিত্র ও সুরভিত ছিল। একইভাবে তাঁর শরীরের গন্ধও সুবাসিত ও সুনির্মল ছিল। এ কারণে সাহাবাগণ তাঁর শরীরের ঘাম সংগ্রহ করতেন। তারা সাক্ষ্য দিয়েছেন রাসুলুল্লাহর শরীরের গন্ধ আতর ও মেশকের চেয়েও সুরভিত ছিল। তিনি কোনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে মানুষ ঘ্রাণে বুঝে ফেলত রাসুলুল্লাহ এ পথ দিয়ে গিয়েছেন! তাঁর শরীর রেশমের চেয়েও কোমল ও পেলব ছিল।[১০৩৭] তাঁর ওজুর পানি, থুথু, চুল ইত্যাদি বরকতময় ছিল। সাহাবায়ে কেরাম সেগুলো সংগ্রহের জন্য প্রতিযোগিতা করতেন।[১০৩৮]

ফলে তিনি মানুষ হয়েও সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন মহামানব। এক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকতে হলে কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ

১০৩২. বুখারি (কিতাবুল আযান: ৭১৮)। মুসলিম (কিতাবুস সালাত : ৪২৩)।

১০৩৩. বুখারি (কিতাবুত তারিখ : ৯১৮)। ইবনে মাজা (আবওয়াবু ইকামাতিস সালাত : ১৪১৭)।

১০৩৪. মুসতাদরাকে হাকেম (কিতাবুল হিজরাহ : ৪২৯৭)। আল-মুজামুল কাবির (হুবাইশ ইবনে খালেদ : ৩৬০৫)।

১০৩৫. তিরমিযি (আবওয়াবুয যুহদ : ২৩১২)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুয যুহদ : ৪১৯০)।

১০৩৬. বুখারি (কিতাবুল মানাকিব : ৩৫৬৯)। সুনানে কুবরা, বাইহাকি (কিতাবুন নিকাহ : ১৩৫১৮)।

১০৩৭. বুখারি (কিতাবুস সাওম : ১৯৭৩)। মুসলিম (কিতাবুল ফাযায়েল : ২৩৩০, ২৩৩১)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদে আনাস ইবনে মালেক : ১৩৫১৪)।

১০৩৮. বুখারি (কিতাবুশ শুরুত : ২৭৩১) (কিতাবুল ওযু : ১৯৪)। মুসনাদে আহমদ (আউয়ালু মুসনাদিল কুফিয়্যিন : ১৯২৩১)।

সালাফে সালেহিনের মানহাজের আলোকে মানার বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে যারা সবচেয়ে বেশি বাড়াবাড়িতে লিপ্ত, কুরআন-হাদিস দিয়ে তারাই সবচেয়ে বেশি দলিল পেশ করার দাবিদার। অথচ তারা কুরআন-সুন্নাহর নামে যা পেশ করছে, সেগুলোর অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর নিরেট অপব্যাখ্যা। ফলে কেউ সুন্নাহর রেফারেন্স দিলেই তার কথা শোনা যাবে না। বরং এ ব্যাপারে সালাফে সালেহিন এবং মুসলিম উম্মাহর প্রথম যুগের সম্মানিত ইমামগণের কী আকিদা, সেটা জেনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক। কারণ, রাসুলুল্লাহর (ﷺ) ভালোবাসা ও অনুসরণের ক্ষেত্রে তারাই এ উম্মাহর সর্বাপেক্ষা ভারসাম্যপূর্ণ, মধ্যমপন্থি ও আদর্শ প্রজন্ম।

রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সম্মানিত মাতা-পিতার পরিণতি

এবার এখানে একটি ব্যতিক্রম বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে, যা সাধারণত আকিদার গ্রন্থগুলোতে চোখে পড়ে না। কারণ, বিষয়টি ইসলামি আকিদার মৌলিক কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়; আমাদের দ্বীন ও শরিয়াহর ক্ষেত্রে আমলযোগ্য মাসআলা নয়; দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষেত্রে আবশ্যক ইস্যু নয়। তবুও এখানে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে কারণ : (এক.) ইমাম আজম রহ.-এর 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে এ ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে। (দুই.) সমাজে এটা নিয়ে কথা হচ্ছে। নানামুখী প্রান্তিক আলোচনা ছড়াচ্ছে। ফলে ভারসাম্য বজায় রাখতে, বিশুদ্ধ আকিদা প্রচার ও সংরক্ষণ করতে এ বিষয়ে আহলে সুন্নাতের ভারসাম্যপূর্ণ বয়ান তুলে ধরা জরুরি হয়ে পড়েছে।

বিষয়টি হলো : রাসুল (ﷺ)-এর সম্মানিত পিতা-মাতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী? পরকালে তাদের পরিণতি কী হবে? এ ব্যাপারে ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. এবং সালাফে সালেহিনের বক্তব্য কী ছিল?

প্রথম কথা হলো, এ-বিষয়ক আলোচনা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। একদিকে যে-কারও পরকালীন পরিণতির ব্যাপারে কথা বলা অনিরাপদ, অপরদিকে তারা সাইয়েদুল মুরসালিন (ﷺ)-এর সম্মানিত মাতা-পিতা। ফলে তাদের ব্যাপারে কথা বলা আরও ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। আরেকদিকে এ ব্যাপারে ইমাম আজমের বক্তব্যের অস্পষ্টতা জটিলতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, আল-ফিকহুল আকবারের কিছু পাণ্ডুলিপিতে এ সম্পর্কে আলোচনা থাকলেও কিছু পাণ্ডুলিপিতে নেই। ফলে এটা নিয়ে ইমাম আজমের সুনিশ্চিত বক্তব্য জানা বেশ দুরূহ। সবমিলিয়ে এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবুও দ্বীনি প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ করে কিছু কথা বলার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আজমের বক্তব্যের ব্যাপারে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা : হায়দ্রাবাদের দারুল মাআরিফ আল-উসমানিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত 'আল-ফিকহুল আকবার'-এর পাণ্ডুলিপিতে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর মাতা-পিতার পরিণতি নিয়ে কোনো বক্তব্য নেই। একইভাবে আরব আমিরাতের মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে প্রকাশিত নুসখাতেও এ ব্যাপারে কোনো কথা নেই। এগুলোতে স্রেফ রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সন্তানসন্ততির কথা বলা হয়েছে : **'কাসেম, তাহের ও ইবরাহিম রাসুল (ﷺ)-এর পুত্র। ফাতেমা, রুকাইয়া, যইনব ও উম্মে কুলসুম রাযি. তাঁর কন্যা।'**[১০৩৯] অথচ আমাদের হাতে বিদ্যমান আযহারে সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতে স্পষ্টভাবে তাঁর মাতা-পিতা ও চাচার কথা এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে : **'রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতা-মাতা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। একইভাবে তাঁর চাচা আবু তালিবও কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।'**[১০৪০] বিপরীতে আরেফ হিকমত লাইব্রেরির একটি পাণ্ডুলিপিতে এসেছে, **'রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতা-মাতা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেননি।'**[১০৪১] একই লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত অন্য পাণ্ডুলিপিতে এসেছে, **'রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতা-মাতা ফিতরতের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন।'**[১০৪২]

তাহলে সমাধান কী? সমাধানের জন্য আমরা 'আল-ফিকহুল আকবার'-এর বৈপরীত্যপূর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলোর বাইরে দৃষ্টি দেবো। কারণ, যুগে যুগে অনেক প্রাচীন ও সমকালীন আলেম আল-ফিকহুল আকবারের ব্যাখ্যা লিখেছেন। ফলে তাদের কাছেও নিশ্চয়ই এর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি থেকে থাকবে। সেখান থেকে আমরা সমাধান পেতে পারি।

ঝামেলা হলো, মূল গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে যেমন পরবর্তী লোকদের খড়্গ চলেছে, বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থও এ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ফলে আলি কারির একটি নুসখাতে আমরা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতাসংক্রান্ত আলোচনাতে দেখি তিনি বলছেন, 'আল্লাহর রাসুলের মাতা-পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন। এটা তাদের খণ্ডন যারা মনে করে, তারা ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন,

---

১০৩৯. আল-ফিকহুল আকবার (৮)।

১০৪০. আল-ফিকহুল আকবার (আযহার পাণ্ডুলিপি) (১১ আলিফ)।

১০৪১. দেখুন : আল-ইমাম আলি কারি ওয়া আসারুহু ফি ইলমিল হাদিস (১০৬)। আরেফ হিকমত লাইব্রেরির পাণ্ডুলিপি (নং ১৬১/মাজামি')।

১০৪২. দেখুন : আল-ফিকহুল আকবার (আরেফ হিকমত লাইব্রেরি, নাসেখ মুহাম্মাদ নুর) (৯)।

অতঃপর আল্লাহ তাদের পুনর্জীবিত করে ঈমান আনার সুযোগ দিয়েছেন।' আলি কারি বলেন, "এ ব্যাপারে আমি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছি এবং সুয়ুতির এ-সম্পর্কিত তিনটি রিসালাকে খণ্ডন করেছি! কুরআন-সুন্নাহ, কিয়াস ও উম্মাহর ইজমার মাধ্যমে এ মতের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কিছু কিছু জাহেল হানাফি এ কারণে আমার সমালোচনা করেছে। তাদের কথা হলো, এটা ইমামের বক্তব্যের সঙ্গে যায় না। আমি বলব, তাদের কথা এক্ষেত্রে অনেকটা জাহাম ইবনে সফওয়ানের কথা, যে কুরআন থেকে 'ইস্তিওয়া'র আয়াত মুছে দিতে চেয়েছিল।"[১০৪৩] আরেকটি হস্তলিখিত নুসখাতেও একই বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৪৪] কিন্তু তৃতীয় আরেকটি প্রাচীন নুসখাতে এ সম্পর্কে কোনো বক্তব্য বিদ্যমান নেই।[১০৪৫] ফলে আলি কারি আদৌ এ ব্যাপারে কথা বলেছেন কি না সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কেউ যুক্তি হিসেবে আলি কারির "মু'তাকাদু আবি হানিফাহ আল আযাম ফি আবাওয়াইর রাসুল আলাইহিস সালাম"-শীর্ষক রিসালার কথা পেশ করতে পারেন, যেখানে আলি কারি সুস্পষ্টভাবে 'আল-ফিকহুল আকবার'-এর সূত্র দিয়ে বলেন, আবু হানিফা রহ.-এর আকিদা হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।[১০৪৬] জটিলতা হলো, অন্য কিছু গ্রন্থে দেখা যায়, তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করছেন! যেমন—'শরহুশ শিফা' গ্রন্থে তিনি লিখেন, আবু তালিবের ইসলামগ্রহণ প্রমাণিত নয়। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতার ইসলামগ্রহণের ব্যাপারটি মতভেদপূর্ণ। উম্মাহর সম্মানিত আলেমদের ঐকমত্যপূর্ণ ও বিশুদ্ধতর সিদ্ধান্ত হলো, তারা মুসলমান ছিলেন।[১০৪৭]

১০৪৩. দেখুন : মিনাহুর রাওযিল আযহার ফি শরহিল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৩১০)। শায়খ ওয়াহবি গাউযির তাহকিকে দারুল বাশায়ের থেকে প্রকাশিত।

১০৪৪. দেখুন : মিনাহুর রাওযিল আযহার ফি শরহিল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (১০৩)। ইরানের মজলিসে শুরা ইসলামি কুতুবখানার লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি।

১০৪৫. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, মোল্লা আলি কারি, দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ আল-কুবরা, মিসর (৯৭)।

১০৪৬. আদিল্লাতু মুতাকাদি আবি হানিফা ফি আবাওয়াইর রাসুল, আলি কারি (৬৮)।

১০৪৭. দেখুন : শরহুস শিফা, আলি কারি (১/৬০৫)। এখানে তিনি কী কারণে এমন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বলা কঠিন। তবে এ ব্যাপারে তার প্রতিষ্ঠিত মত হলো স্বতন্ত্র পুস্তিকাতে যা বলেছেন। এ কারণে তাবারি, মারআশি, বারযানজি, মুহিব্বি দিমাশকি-সহ একাধিক আলেম তাঁর সমালোচনা ও খণ্ডন করেছেন। বরং শায়খ হাসনাইন মাখলুফের তাহকিককৃত শরহুশ শিফাতে রাসুলুল্লাহর পিতা-মাতার ইসলাম নয়, কুফরের কথাই আলি কারির কলমে তুলে ধরা হয়েছে।

আল-ফিকহুল আকবারের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাতা আল্লামা আবুল মুনতাহা মাগনিসাভি রহ.-এর ব্যাখ্যাতেও এ ধরনের কোনো বক্তব্য নেই—রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতা কিংবা আবু তালিব কারও ব্যাপারেই নয়। অথচ মূল পাণ্ডুলিপিতে থাকলে সেটা ফেলে দেওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়, আমানত ও ইনসাফ নয়। ফলে বোঝা যায়, আল্লামা মাগনিসাভির কাছে বিদ্যমান তুরস্কের পাণ্ডুলিপিগুলোতে এ বক্তব্য ছিল না।

মোটকথা দাঁড়াচ্ছে—আল-ফিকহুল আকবারের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতা-মাতাসংক্রান্ত ইমাম আজমের বক্তব্যের একাধিক রূপ বিদ্যমান : **এক**. এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্যই বিদ্যমান নেই। ফলে ইমাম আবু হানিফা রহ. এ ব্যাপারে নীরব ছিলেন ধরা হবে।[১০৪৮] **দুই**. (ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر/كافرَين) অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতা-মাতা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। **তিন**. এখানে একটি শব্দ বাদ পড়ে গিয়েছে। ফলে পুরো অর্থই বিকৃত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, আল-ফিকহুল আকবারের যেসব পাণ্ডুলিপিতে বলা হয়েছে : (ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر) অর্থাৎ, 'রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন—এখান থেকে একটি 'না-বাচক' ('মা') শব্দ ছুটে গেছে, যার ফলে অর্থ সম্পূর্ণ উলটে গেছে। আল-ফিকহুল আকবারের মূল ভাষ্য ছিল : (ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ماتا على الكفر) অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেননি।[১০৪৯] **চার**. (ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الفطرة) অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতা-মাতা ফিতরতের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন।[১০৫০]

এভাবে প্রায় চার ধরনের বিপরীতমুখী বক্তব্যের মাঝে প্রকৃত অর্থেই এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বক্তব্য কী ছিল সেটা নির্ধারণ করা অসম্ভব। যদিও হানাফি আলেম মোল্লা আলি কারি দ্বিতীয় মতটাকেই ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য মনে করেন, তথাপি এ ব্যাপারে তিনি আল-ফিকহুল আকবারের বাইরে থেকে আবু হানিফা রহ.-এর কোনো বক্তব্য প্রমাণ হিসেবে দেখাতে পারেননি।

১০৪৮. দেখুন : শরহু জাওহারাতিত তাওহিদ, বাইজুরি (৪৬)। সাদাদুদ দ্বীন ও সিদাদুদ দাইন, বারযানজি (৮৮-৮৯)।

১০৪৯. আরেফ হিকমত লাইব্রেরির পাণ্ডুলিপি (নং ১৬১/মাজামি')। আল-ইমাম আলি কারি ওয়া আসারুহু ফি ইলমিল হাদিস (১০৬)। আল-মুনতাখাবাত মিন রাসায়িলিস সাইয়েদ আবদিল হাকিম আরওয়াসি (২১৯)

১০৫০. আল-ফিকহুল আকবার (মাকতাবাতু আরেফ হিকমত, নাসেখ মুহাম্মাদ নুর) (৯)।

ফলে সেটাকে সুনিশ্চিতভাবে ইমাম আজমের বক্তব্য বলার সুযোগ নেই। আলি কারির বিপরীতে হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবের বিভিন্ন আলেম ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে এ ধরনের আকিদা থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। বারযানজি লিখেন, 'ইমাম আবু হানিফা এমন বক্তব্য দিতে পারেন না। এ কারণে আল-ফিকহুল আকবারের অনেক নুসখাতে এ ধরনের কোনো বক্তব্য নেই। বরং এটা পরবর্তীকালে কেউ যোগ করেছে।' অতঃপর তিনি মোল্লা আলি কারির উপরের বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেন।[১০৫১]

আল-ফিকহুল আকবারকেন্দ্রিক জটিলতা উল্লেখের পর এবার আমরা অন্যান্য ইমামের বক্তব্যে যাব। ঝামেলা হলো, এখানেও বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। বরং এই বিশাল মতভেদই খুব সম্ভবত আল-ফিকহুল আকবার এবং এর বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থের মাঝে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ইত্যাদি সংঘটনের জন্য দায়ী। ফলে এ ব্যাপারে আলেমদের সর্বসম্মত কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির সুযোগ নেই।

প্রথম দলের মত : একদল মুহাক্কিক আলেম রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতাকে জাহান্নামি মনে করেন! বাইহাকি (৪৫৮ হি.) উক্ত মতবাদের শক্ত প্রচারক। তিনি সুস্পষ্টভাবেই রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতা ও দাদাকে কাফের আখ্যা দিয়েছেন।[১০৫২] 'সুনানে কুবরা'তেও তিনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতাকে সরাসরি 'মুশরিক' আখ্যা দিয়েছেন।[১০৫৩] ইবনে জারির তাবারিও (৩১০ হি.) তাঁর তাফসিরে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতাকে মুশরিক গণ্য

১০৫১. দেখুন : সাদাদুদ দ্বীন ও সিদাদুদ দাইন, বারযানজি (৮৯-৯০)। আল্লামা মুরতাযা যাবিদির শাগরেদ উমর আল-আমিদি আদ-দিয়ার বকরি আল-ফিকহুল আকবারের একটি পাণ্ডুলিপিতে নিজ হাতে একটি টিকা যোগ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ৬০০ হিজরির শেষের দিকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতার পরিণতি নিয়ে আব্বাসি খেলাফতে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা যায়। তখনকার খলিফা বিষয়টি সুরাহা করার জন্য সরকারি লাইব্রেরি এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা আল-ফিকহুল আকবারের সকল কপি অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন। তারা আল-ফিকহুল আকবারের একটি প্রাচীন কপি হাতে পান, যা খোদ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানির লেখা ছিল এবং যা ইমাম আজম রহ.-এর সামনে পড়া হয়েছিল! সেখানে লেখা ছিল (ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ماتا على الكفر) অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেননি! অতঃপর খলিফা কুফাতে একদল লোক পাঠালেন। তারা সেখানেও আল-ফিকহুল আকবারের আরেকটি নুসখা পেয়ে যান, যাতে হুবহু এই কথাগুলোই লেখা ছিল। পরবর্তীকালে এটাকেই মূল ধরে অন্যান্য নুসখা সংশোধন করা হয়েছিল [আল-ফিকহুল আকবার; আব্দুর রহমান ইবনে ইউসুফ (২১০)]।

১০৫২. দেখুন : দালায়েলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি (১/১৯২)।

১০৫৩. দেখুন : সুনানে কুবরা, বাইহাকি (কিতাবুন নিকাহ : ১৪১৮৮)।

করেছেন।[১০৫৪] মুসলিমের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি (৬৭৬ হি.)-এর বক্তব্য দ্বারাও বোঝা যায়, তিনি উক্ত মত সমর্থন করেন, যদিও তিনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতার ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেননি।[১০৫৫] ইবনে তাইমিয়্যাহ রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন বলে মত দিয়েছেন।[১০৫৬] ইবনে কাসির (৭৭৪ হি.) তাঁর তাফসির ও ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'সহ সর্বত্র রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতা, দাদা আবদুল মুত্তালিব সবাইকে জাহান্নামি হওয়ার মত দিয়েছেন।[১০৫৭]

এভাবে তাদের মতে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতা উভয়েই জাহান্নামি। এটা তারা কুরআন-সুন্নাহতে প্রমাণিত এবং আহলে সুন্নাতের সুস্পষ্ট আকিদা দাবি করেন। সরাসরি কুরআনের কোনো আয়াত না থাকলেও তারা একটি ঘটনাকে শানে নুযুল মেনে সেটা দিয়ে দলিল দেওয়ার চেষ্টা করেন। ঘটনাটি হলো :

- রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একদিন বলেন, হায়! আমি যদি জানতাম আমার মাতা-পিতার কী অবস্থা! তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর উপর এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : ﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۖ وَلَا تُسۡـَٔلُ عَنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَحِيمِ﴾ অর্থ : 'নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আপনি দোযখবাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না।' [বাকারা : ১১৯][১০৫৮] এটার মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতাকে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে জাহান্নামি বলা হয়েছে। কিন্তু উক্ত শানে নুযুল নিজেই সুপ্রমাণিত নয়। ফলে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আকিদার ক্ষেত্রে এটা দলিল হতে পারে না।

এক্ষেত্রে তাদের মূল দলিল হলো কিছু হাদিস, যেগুলো হাদিসের বিভিন্ন নির্ভযোগ্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ফলে সনদের দিক থেকে এসব হাদিস বিশুদ্ধ। এমন কিছু হাদিস হলো :

১০৫৪. দেখুন : তাফসিরে তাবারি (২/৫৬০)।

১০৫৫. দেখুন : শরহে মুসলিম, নববি (৩/৭৯)।

১০৫৬. দেখুন : মাজমুউল ফাতাওয়া (৪/৩২৪-৩২৮)।

১০৫৭. দেখুন : তাফসিরে ইবনে কাসির (৪/১৯৫)। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির (৩/৪২৯)।

১০৫৮. তাফসিরে তাবারি (২/৪৮১)। তাফসিরে ইবনে কাসির (১/২৮০)। কিন্তু এটা যয়িফ উপরন্তু মুরসাল বর্ণনা। ফলে এক্ষেত্রে এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

- আনাস বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার পিতা কোথায়? তিনি বললেন, 'জাহান্নামে।' লোকটি ফিরে যেতে উদ্যত হলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ডেকে বললেন, 'তোমার পিতা এবং আমার পিতা দুজনেই জাহান্নামে।'[১০৫৯]

- আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (ﷺ) একদিন কবর যিয়ারতের জন্য বের হলেন। আমরাও তার সাথে বের হলাম। তিনি আমাদের বসার নির্দেশ দিলে আমরা বসে গেলাম। অতঃপর তিনি বিভিন্ন কবরের মাঝে হাঁটাহাঁটি করতে থাকেন। একসময় একটি কবরের কাছে পৌঁছে লম্বা সময় সেখানে গুনগুন আওয়াজ করেন। একপর্যায়ে তাঁর কান্নার আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। তাকে কাঁদতে দেখে আমরাও কাঁদলাম। অতঃপর তিনি আমাদের কাছে ফিরে এলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার কান্নার কারণ কী? আপনার কান্না আমাদেরও কাঁদিয়েছে, আমাদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছে। আল্লাহর রাসুল আমাদের কাছে এসে বললেন, "আমার কান্না তোমাদের কষ্ট দিয়েছে?' আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'আমাকে যে কবরের কাছে মুনাজাত করতে দেখেছ, সেটা আমার মা আমিনা বিনতে ওয়াহাবের কবর। আমি আমার রবের কাছে তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছি, তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার (ইস্তিগফার) অনুমতি চেয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। বরং আমার উপর এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾﴾ অর্থ : 'নবি ও মুমিনদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাতে তারা আত্মীয়স্বজনই হোক না কেন, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহান্নামি। ইবরাহিম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে। তার পর যখন এটা তার নিকট সুস্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন ইবরাহিম তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ইবরাহিম তো কোমল-হৃদয় ও সহনশীল।' [তাওবা : ১১৩-১১৪] তখন স্বাভাবিকভাবেই

১০৫৯. মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ২০৩)। আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৭১৮)। ইবনে হিব্বান (কিতাবুল বির ওয়াল ইহসান : ৫৭৮)

মায়ের জন্য একজন সন্তানের যেমন লাগে আমারও তেমন লেগেছে। তাই আমি কেঁদেছি।"[১০৬০] সহিহ মুসলিম, সুনানে আবি দাউদ ও ইবনে মাজাসহ বিভিন্ন গ্রন্থে উক্ত হাদিসটি আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে।[১০৬১]

- ইবনে বুরাইদা থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা (বুরাইদা) থেকে বর্ণনা করেন, আমরা আল্লাহর রাসুলের সাথে ছিলাম। তিনি কতগুলো কবরের কাছে এসে তাঁর মায়ের জন্য শাফায়াত প্রার্থনা করলেন। তখন জিবরিল তার বুকে আঘাত করে বললেন, আপনি কি এমন কারও জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছেন, যিনি মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছেন? তখন তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে ফিরে আসেন।[১০৬২]

- আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর লম্বা হাদিস। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মুলাইকার দুই ছেলেকে বলেন, 'তোমাদের মা জাহান্নামে।' তখন তাদের খারাপ লাগে। রাসুল (ﷺ) তাদের ডেকে বলেন, 'আমার মাও তোমাদের মায়ের সাথে রয়েছেন।'[১০৬৩]

- আবু রযিন থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসুলকে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার মা কোথায়? রাসুল (ﷺ) বললেন, 'তোমার মা জাহান্নামে।' আবু রযিন বললেন, তাহলে আপনার আত্মীয়স্বজন কোথায়? রাসুল (ﷺ) বললেন, 'পেরেশান হয়ো না। তোমার মা আমার মায়ের সাথেই আছেন।'[১০৬৪]

দ্বিতীয় দলের মত : উল্লিখিত অধিকাংশ বর্ণনা সনদের দিক দিয়ে বিশুদ্ধ। তাহলে কি নিশ্চিতভাবেই রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতা জাহান্নামি? বিষয়টি এত সরল নয়। এ কারণে ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি, খতিবে বাগদাদি, শাইখুল

১০৬০. মুসতাদরাকে হাকেম (কিতাবুত তাফসির : ৩৩১১)। মুসান্নাফে আবদির রাযযাক (কিতাবুল জানায়েয : ৬৭১৪)।

১০৬১. মুসলিম (কিতাবুল জানায়েয : ৯৭৬)। আবু দাউদ (কিতাবুল জানায়েয : ৩২৩৪)। সুনানে ইবনে মাজা (আবওয়াবুল জানায়েয : ১৫৭২)

১০৬২. মুসনাদে বাযযার (মুসনাদে বুরাইদা : ৪৪৫৩)। কিন্তু উক্ত বর্ণনার সনদে মুহাম্মাদ ইবনে জাবের নামে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে।

১০৬৩. মুসতাদরাকে হাকেম (কিতাবুত তাফসির : ৩৪০৫)। মুসনাদে আহমদ (৩৮৪৪)। এ বর্ণনাটিও উসমান ইবনে উমাইর নামক এক রাবির কারণে যয়িফ।

১০৬৪. মুসনাদে আহমদ (আওয়ালু মুসনাদিল মাদানিয়্যিন : ১৬৪৩৯)। মুসনাদে তয়ালেসি (১১৮৬)

মুসলাম ইবনে হাজার আসকালানি, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, মাওয়ারদি, আবুল কাসেম সুহাইলি, মুহিব্বুদ্দিন তাবারি, মুহাম্মাদ ইবনে রাসুল বারযানজি, মুহাম্মাদ মারআশি, মুহাম্মাদ মুহিব্বি, কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি, যাহেদ কাওসারিসহ উম্মাহর বিশাল সংখ্যক আলেম উক্ত মতের বিরোধিতা করেন। তারা কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তির আলোকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতা-মাতা জাহান্নামি নন—প্রমাণ করেন। পিছনে বর্ণিত হাদিসগুলোকে তারা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। এ বিষয়ে তারা এবং বিভিন্ন আলেম প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১০৬৫] তাদের মতে, বিভিন্ন বিচারে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতা জাহান্নামি হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারেন :

এক: সুহাইলি, মুহিব্বুদ্দিন তাবারি, সুয়ুতি, বারযানজিসহ একদল আলেম মনে করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতাকে তাঁর জীবদ্দশায় জীবিত করা হয়েছিল। তারা তাঁর উপর ঈমান আনেন এবং মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তাদের জান্নাতে প্রবেশে আর কোনো বাধা থাকল না।

তবে এ ব্যাপারে তারা যেসব বর্ণনা পেশ করেন, সেসবের অধিকাংশই ভিত্তিহীন। যেমন—একটি বর্ণনায় বলা হয়, রাসুলুল্লাহর (ﷺ) বিদায় হজের সময় আল্লাহ তাঁর মাতা-পিতাকে জীবিত করে দেন এবং তারা তাঁর উপর ঈমান আনেন। এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য বর্ণনা নয়।[১০৬৬] একইভাবে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কিয়ামতের দিন তাঁর পিতা-মাতা, চাচা এবং জাহেলি যুগের এক ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করবেন—এমন বর্ণনাও প্রমাণিত নয়।[১০৬৭]

দুই. রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতা মুশরিক ছিলেন না। বরং তারা উভয়ে 'হানিফ' এবং দ্বীনে ইবরাহিমির উপর ছিলেন। ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি, জালালুদ্দিন

১০৬৫. উদাহরণস্বরূপ দেখুন : সাদাদুদ দ্বীন ওয়া সিদাদুদ দাইন, বারযানজি (৭২-৭৫)। দেখুন : তাফসিরে মাযহারি (১/১২০)। মুকাদ্দিমাতুল ইমাম কাওসারি (১৬৯-১৭০)।

১০৬৬. আস-সাবেক ওয়াল লাহেক, খতিবে বাগদাদি (৩৪৪)। আর-রাওযুল উনুফ, সুহাইলি (২/১৮৭-১৮৮)। খতিবে বাগদাদি ও সুহাইলি ছাড়াও দারাকুতনি, ইবনে আসাকির, ইবনে শাহিন, মুহিব্বুদ্দিন তাবারি, বারযানজি, মারআশি প্রমুখ আলেম তাদের গ্রন্থে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। তারা সকলে স্বীকার করেছেন হাদিসটি যয়িফ। কিন্তু 'মানাকিব'-এর ক্ষেত্রে যয়িফ হাদিস গ্রহণযোগ্য—এমন দলিল দিয়েছেন। অথচ এটা স্রেফ 'মানাকিব' নয়; 'গায়েব' ও 'আকিদা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একারণে ইবনে কাসির সুহাইলির বর্ণনাকে 'অত্যন্ত মুনকার' হিসেবে অভিহিত করেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৪২৯)।

১০৬৭. যাখায়িরুল উকবা ফি মানাকিবি যাবিল কুরবা, মুহিব্বুদ্দিন তাবারি (৭)।

সুয়ুতি, মাওয়ারদি, বারযানজি প্রমুখ আলেম উক্ত মত রাখেন। তাদের যুক্তি, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে মুশরিকদের ‘অপবিত্র’ আখ্যা দিয়েছেন [তাওবা : ২৮]। আর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কোনো অপবিত্রের ঔরস থেকে জন্ম নিতে পারেন না। অথচ তাঁর পূর্বপুরুষের মাঝে কেউ মুশরিক থাকলে তাকে অপবিত্র ঔরস থেকেই জন্ম নিতে হয়! তাই আবদুল্লাহ থেকে শুরু করে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত রাসুলুল্লাহর পূর্বপুরুষ সকলে মুমিন ছিলেন! তাওহিদের উপর ছিলেন।[১০৬৮]

উক্ত মতটিও গ্রহণযোগ্য নয়। তারা যে যুক্তিতে আদম আলাইহিস সালাম থেকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত তাঁর পুরো বংশ লতিকাকে মুমিন হওয়া আবশ্যক মনে করেন, সেটা মোটেই আবশ্যক নয়। বরং এক্ষেত্রে তাদের হাতে কোনো প্রমাণও নেই। যেসব বিষয়কে তারা প্রমাণস্বরূপ পেশ করতে চান, সেগুলো নিতান্তই তাকাল্লুফপূর্ণ ও অযৌক্তিক। তাই এ ব্যাপারে বাস্তবসম্মত কথা হলো— রাসুলুল্লাহর পূর্বপুরুষদের মাঝে অনেকে মুমিন ছিলেন, আবার অনেকে কাফের ছিলেন। তাঁর বংশপরম্পরায় কোনো কাফেরের উপস্থিতি তাঁর শান ও মানের জন্য বেমানান নয়। নবুওতের মর্যাদার সঙ্গেও সাংঘর্ষিক নয়।

তিন : রাসুলুল্লাহর সম্মানিত মাতা-পিতা **‘আহলে ফাতরাহ’র** অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ, তারা সেসব মানুষের মাঝে গণ্য হবেন যারা দুই নবির আগমনের মাঝামাঝি সময়ে বসবাস করেছেন। ফলে তাদের কাছে ইসলাম ও তাওহিদের বিশুদ্ধ দাওয়াত পৌঁছয়নি। তারা আল্লাহর মনোনীত দ্বীন সম্পর্কে জানার সুযোগ পাননি। এ অবস্থাতেই তারা মৃত্যুবরণ করেছেন। এক্ষেত্রে ইসলামের সর্বসম্মত নীতি হলো— যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছবে না, আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না। কারণ, সেটা জুলুম গণ্য হবে। আল্লাহ সব ধরনের জুলুম থেকে পবিত্র।[১০৬৯]

কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ অর্থ : ‘যে সৎপথে চলে, সে নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎপথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের

১০৬৮. দেখুন : আল-হাভি লিল ফাতাওয়া, সুয়ুতি (২/২৫৪)। আদ-দুরাজুল মুনিফাহ ফিল আবায়িশ শরিফাহ (রাশেদ খলিল সংকলিত রাসায়িলুস সুয়ুতি) (২৩-২৮)। বাইজুরিও উক্ত মত পোষণ করেন। দেখুন : শরহুল জাওহারাহ (৪৬)।

১০৬৯. দেখুন : সাদাদুদ দ্বীন ওয়া সিদাদুদ দাইন (১৬৬)। রিসালাতুস সুরুর ওয়াল ফারাহ (পাণ্ডুলিপি), মারআশি (৮-৯)।

বোঝা বহন করবে না। আর রাসুল পাঠানোর আগ পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি দান করি না।' [ইসরা : ১৫] অন্য আয়াতে বলেন, ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى ٱلْقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَٰلِمُونَ﴾ অর্থ : 'আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রাসুল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন। আর আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা জুলুম করে।' [কাসাস : ৫৯] তৃতীয় আরেক আয়াতে বলেন, ﴿وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۝ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ۝﴾ অর্থ : 'আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করিনি এ ব্যতিরেকে যে, তাদের জন্য সতর্ককারী ছিল, যাতে তারা তাদের উপদেশ দান করে। আর আমি জালেম নই।' [শুআরা : ২০৮-২০৯]

আল্লাহ যদি নবি-রাসুল ও কিতাব পাঠানোর আগেই কোনো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন, তবে তারা কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষে সেটাকে যুক্তি হিসেবে পেশ করবে। তাই তিনি নবি-রাসুল ও কিতাব পাঠানোর আগে কোনো সম্প্রদায়কে শাস্তি দেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ নিজেই বলেন, ﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَٰفِلِينَ ۝﴾ অর্থ : 'এটা এক বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি। সুতরাং এর অনুসরণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হয়। এ জন্য যে, কখনো তোমরা বলতে শুরু করো, গ্রন্থ তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমরা সেগুলোর পাঠ ও পঠন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।' [আনআম : ১৫৫-১৫৬] আরেক আয়াতে বলেন, ﴿وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ অর্থ : 'যাতে তাদের কৃতকার্যের কারণে তাদের উপর কোনো মুসিবত এলে তারা বলতে না পারে—হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের কাছে কোনো রাসুল পাঠালেন না কেন? তাহলে আমরা আপনার আয়াতসমূহ অনুসরণ করতাম এবং আমরাও ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।' [কাসাস : ৪৭]

একাধিক হাদিস দ্বারাও 'আহলে ফাতরাহ' তথা ইসলামের দাওয়াত পৌঁছয়নি এমন ব্যক্তিদের পরকালে মুক্তির ঘোষণা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হাদিস হলো :

▪ আসওয়াদ ইবনে সারি থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'চার ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তাদের (ইসলাম গ্রহণ না করার) কৈফিয়ত পেশ করবে—এক. বধির। দুই. পাগল। তিন. বৃদ্ধ। চার. ইসলাম পৌঁছার আগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি। বধির বলবে—প্রভু, ইসলাম এসেছিল। কিন্তু আমি তা শুনতে পাইনি। পাগল বলবে—প্রভু, ইসলাম এসেছিল। কিন্তু বাচ্চারা আমার উপর বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দিত। বৃদ্ধ বলবে—প্রতিপালক, ইসলাম এসেছিল। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি। চতুর্থ ব্যক্তি বলবে—হে প্রভু, আমার কাছে আপনার কোনো রাসুল আসেননি! তখন আল্লাহ তাদের থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার নিয়ে একজন রাসুল পাঠাবেন। রাসুল (দূত) এসে (পরীক্ষাস্বরূপ) বলবেন, তোমরা আগুনে ঝাঁপ দাও! আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তারা তাতে প্রবেশ করে, তবে আগুন তাদের জন্য শীতল ও প্রশান্তিময় স্থানে পরিণত হবে।' উক্ত হাদিসটি একাধিক সনদে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[১০৭০] এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, যাদের কাছে নবিদের দাওয়াত পৌঁছয়নি, আল্লাহ তাদের সরাসরি জাহান্নামের শাস্তি দেবেন না।

▪ আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন চার ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে—এক. ছোট শিশু। দুই. পাগল। তিন. যার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছয়নি। চার. অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে (ঈমান না আনার) কারণ পেশ করবে। আল্লাহ তখন জাহান্নামের একটা অংশকে লক্ষ্য করে বলবেন, বেরিয়ে আসো। অতঃপর তাদের উদ্দেশে বলবেন, আমি আমার বান্দাদের কাছে তাদের ভিতরের মানুষকে রাসুল হিসেবে প্রেরণ করতাম। আজ আমি নিজেই তোমাদের রাসুল। তোমরা ওটার মাঝে প্রবেশ করো। তখন যার কপালে দুর্ভাগ্য লেখা হয়েছে সে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলবে—হে প্রভু, আমরা যেটা থেকে পালাতাম এখন সেখানেই আমাদের প্রবেশ করাবেন? আর যার কপালে সৌভাগ্য লেখা হয়েছে সে আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণপূর্বক দ্রুত জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন আল্লাহ অবাধ্যদের লক্ষ্য করে বলবেন, তোমরা আমারই অবাধ্য হয়েছ। পৃথিবীতে রাসুলদের দাওয়াত

১০৭০. মুসনাদে আহমদ (আউয়ালু মুসনাদিল মাদানিয়্যিন : ১৬৫৫৯)। সহিহ ইবনে হিব্বান (কিতাবু ইখবারিহি আন মানাকিবিস সাহাবাহ : ৭৩৫৭)। মুসনাদুল বাযযার (তাতিম্মাতু মারউইয়্যাতি আবি হুরাইরা : ৯৫৯৭)

পেলে তো আরো বেশি অবাধ্য হতে। তখন তিনি অনুগতদের জান্নাত দান করবেন, আর অবাধ্যদের জাহান্নামে ফেলবেন।'[১০৭১]

- সাওবান থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবি (ﷺ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন জাহেলি যুগের মানুষ তাদের পিঠে মূর্তি নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হবে। আল্লাহ তাদের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে, হে প্রভু, আমাদের কাছে আপনি কোনো রাসুল পাঠাননি। আমাদের কাছে আপনার নির্দেশ পৌঁছয়নি। যদি আপনি আমাদের কাছে রাসুল প্রেরণ করতেন, তবে আমরা সবাই আপনার সবচেয়ে অনুগত হতাম। তখন আল্লাহ তাদের বলবেন, তাহলে এখন যদি আমি তোমাদের নির্দেশ দিই তোমরা আমার নির্দেশ পালন করবে? তারা বলবে, হ্যাঁ। তখন তিনি তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করার নির্দেশ দেবেন। তারা জাহান্নামের কাছাকাছি পৌঁছে এর ক্রোধোন্মত্ত গর্জন শুনে তাতে প্রবেশ না করে আল্লাহর কাছে ফিরে এসে বলবে, প্রভু, আপনি আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন। আল্লাহ তাদের বলবেন, তোমরা কি বলোনি আমি তোমাদের যা নির্দেশ দেবো তোমরা তা পালন করবে? তারা আবারও আনুগত্যের ওয়াদা করবে। আল্লাহ তাদের ওয়াদা নিয়ে আবার জাহান্নামে প্রবেশের নির্দেশ দেবেন। তারা পূর্বের মতোই আবারও ভীত হয়ে ফিরে এসে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। তখন আল্লাহ তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আল্লাহর নবি বলেন, যদি তারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে জাহান্নামে প্রবেশ করত, সেটা তাদের জন্য শীতল শান্তিদায়ক স্থানে পরিণত হতো।'[১০৭২]

- আবু সাইদ খুদরি থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে আনা হবে—এক. ইসলাম পৌঁছানোর আগে মৃত্যুবরণকারী। দুই. পাগল। তিন. শিশু। ইসলাম পৌঁছার আগে মৃত্যুবরণকারী বলবে, প্রভু, আমার কাছে কোনো কিতাব অথবা রাসুল আসেনি...। পাগল বলবে, হে আল্লাহ, আমাকে আপনি ভালোমন্দের মাঝে পার্থক্য করার বিবেক দেননি। শিশু বলবে, হে আল্লাহ, আমি পরিণত বয়সে পৌঁছতে পারিনি। তখন তাদের সামনে জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে। তাদের বলা হবে, এখানে প্রবেশ

১০৭১. মুসনাদে বাযযার (মুসনাদে আনাস ইবনে মালেক : ৭৫৯৪)। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (কিতাবু সিফাতিল জান্নাতি ওয়ান নার : ৩৫৩২১)। তাফসিরে ইবনে কাসির (৫/৫১)।

১০৭২. মুসনাদে বাযযার (মুসনাদে সাওবান : ৪১৬৯)। তাফসিরে ইবনে কাসির (৫/৫১)।

করো। যে ব্যক্তি আল্লাহর জ্ঞানে সৌভাগ্যবান ছিল সে তাতে প্রবেশ করবে। আর যে আল্লাহর জ্ঞানে দুর্ভাগা ছিল সে তাতে প্রবেশ করবে না। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা আমারই অবাধ্য হলে। আমার রাসুলদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করতে তা তো বোঝাই যাচ্ছে।'[১০৭৩]

এসব আয়াত ও হাদিসের ভিত্তিতে আলেমগণ বলেন, এ মূলনীতি অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতাকেও কিয়ামতের দিন পরীক্ষা নেওয়া হবে। তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন এবং জান্নাত লাভ করবেন। বিভিন্ন মাযহাবের অসংখ্য ইমামের মতামত এটা। তারা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতার জাহান্নামে যাওয়াসংক্রান্ত যেসব হাদিস পাওয়া যায়, সেগুলোকে এসব আয়াত ও হাদিস দ্বারা রহিত (মানসুখ) গণ্য করেন। যেমন—একটি হাদিসে এসেছে, মুশরিকদের শিশুরা জাহান্নামে যাবে। কিন্তু সে হাদিস কুরআনের আয়াত (কোনো ব্যক্তি অন্যের বোঝা বহন করবে না।) [আনআম : ১৬৪] দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। এটাই শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-এর মত। তিনি উপরের হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, 'আমার বিশ্বাস, সেদিন আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর পরিবার (যারা নবুওতের আগে মৃত্যুবরণ করেছেন) আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করবেন এবং ফলে মুক্তি লাভ করবেন।'[১০৭৪]

একইভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী : ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ অর্থ : 'আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।' [যুহা : ৫] ইমাম তাবারি ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে উক্ত আয়াতের তাফসির লিখেন, 'মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সন্তুষ্টি হলো, তাঁর পরিবারের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।'[১০৭৫] অনেক আলেমের মতে, এখানে নবি-পরিবারের মাঝে তাঁর মাতা-পিতাও অন্তর্ভুক্ত। বাইজুরি মনে করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতা আহলে ফাতরাহ হওয়ার কারণে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। জাহান্নামি নন।[১০৭৬]

১০৭৩. মুসনাদে আবিল জাদ (২০৩৮)। শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালাকায়ি (১০৭৬)। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (মুআজ ইবনে জাবাল : ২০/৮৩ হাদিস নং ১৫৮)।

১০৭৪. দেখুন : আল-ইসাবা (১২/৩৯৮)।

১০৭৫. দেখুন : তাফসিরে তাবারি (২৪/৪৮৭)।

১০৭৬. দেখুন : শরহুল জাওহারাহ (৪৫)।

অধমের পর্যবেক্ষণ : যেমনটা পিছনেও বলেছি যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতাকে মুক্তিপ্রাপ্ত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে উপরে প্রদত্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণটি শক্তিশালী নয়। কারণ, তাদের জীবিত হয়ে ঈমান আনার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে যেসব বর্ণনা পেশ করা হয় সেগুলো গ্রহণীয় পর্যায়ের নয়। অপরদিকে রাসুল (ﷺ)-এর পিতা আবদুল্লাহ থেকে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকলের মুমিন হওয়ার বিষয়টিও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়; বরং একান্তই অনুমানমূলক বক্তব্য। তবে তৃতীয় কারণটি বেশ শক্তিশালী। কারণ, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতা-মাতা সন্দেহাতীতভাবে 'আহলে ফাতরাহ'র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ইনশাআল্লাহ। যারা এর বিপরীত কথা বলেছেন তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তাদের কাছে ইসলামের এবং বিশুদ্ধ তাওহিদের দাওয়াত পৌঁছয়নি। সে যুগ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا۟ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾ অর্থ : 'হে কিতাবিগণ, তোমাদের নিকট এমন একসময় আমার রাসুল (দ্বীনের) ব্যাখ্যাদানের জন্য এসেছে, যখন রাসুলগণের আগমনধারা বন্ধ ছিল, যাতে তোমরা বলতে না পারো, আমাদের কাছে (জান্নাতের) কোনো সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নাম সম্পর্কে) সতর্ককারী আসেনি। এবার তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা সতর্ককারী এসে গেছে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।' [মায়িদা : ১৯]

ফলে ঢালাওভাবে তাদের মূর্তিপূজক আখ্যা দেওয়া—যেমনটা বাইহাকিসহ অতীত ও সমকালীন কেউ কেউ করেছেন—ভিত্তিহীন অভিযোগ। এ ব্যাপারে তারা কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখাতে সক্ষম হননি। বাইহাকি প্রশ্ন তুলেছেন, তারা ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্ম গ্রহণ করেননি কেন?[১০৭৭] জবাবের পরিবর্তে বরং বাইহাকিকে প্রশ্ন করা যায়, ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্ম আরবে তখন কতটা বিস্তৃত ছিল? কতটুকু বিশুদ্ধ ছিল? এক ওয়ারাকা ইবনে নওফল এবং এ শ্রেণির কিছু লোক বাদে আর কেউ কি প্রকৃত ঈসায়ি দ্বীনের উপর ছিল? সালমান ফারসি রাযি.-এর সত্য সন্ধানের ঘটনা তো বরং প্রমাণ করে, ঈসায়ি দ্বীনের অবস্থাও তখন দীনে ইবরাহিমির মতো কিংবা আরও করুণ ছিল। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আগমনের পরে কয়েক সহস্র বছর পার হয়ে গিয়েছিল। ফলে সময়ের বিবর্তনে ইবরাহিমি ধর্ম বিকৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দু-একজন মানুষ দ্বীনে

১০৭৭. দালায়েলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি (১/১৯২)।

ইবরাহিমির সামান্য কিছু ইবাদত ধরে রেখেছিল। তারা ছিল 'হুনাফা' নামে পরিচিত। একই কথা ঈসায়ি ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঈসা আলাইহিস সালামের পরে অর্ধসহস্র বছর কেটে গিয়েছিল। তাঁর রেখে যাওয়া দ্বীন ব্যাপক বিকৃতির শিকার হয়েছিল। হাতেগোনা কিছু মানুষ এর অবশিষ্ট কিছু অংশ আঁকড়ে ধরে ছিল। সেটাও ছিল গির্জা ও পাদরি-পুরোহিতদের মাঝে সীমাবদ্ধ। ফলে এই হুনাফা ও ঈসায়ি ধর্মের পাদরিদের অবস্থা ছিল ঘন অন্ধকার রাতে দু-চারটা জোনাকির মতো, যা এদিক-সেদিক নিভুনিভু করে আলো জ্বেলে রাখলেও গোটা জাযিরাতুল আরব ছিল পৌত্তলিকতা, কুফর ও গাফলতির নিশ্ছিদ্র তমসায় নিমজ্জিত। বরং যদি ইবরাহিমি কিংবা ঈসায়ি ধর্ম তখন বিশুদ্ধরূপে বিদ্যমান থাকত, আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবকে উপরের আয়াতের কথা কেন বললেন? তিনি তো বললেই পারতেন—তোমরা ইবরাহিমি কিংবা ঈসায়ি দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করেছ। ঠিক আছে, এবার মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ধর্ম গ্রহণ করো।

আল্লাহর ঘর কাবার ভিতর ও চারপাশ জুড়ে কয়েকশো মূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল। দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম ঘর যা আল্লাহর ইবাদতের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, সেখানেই চলছিল পৃথিবীর বুকে সর্বনিকৃষ্ট কাজ শিরক। এমন এক ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থায় জন্ম হয়েছিল আবদুল্লাহ ও আমিনার। সামান্য কিছু বছর বাঁচার পরে যৌবনের শুরুতেই, জীবন ও জগতকে ঠিকভাবে উপলব্ধি করার আগেই দুজনে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের মৃত্যুর কয়েক দশক পরে নবুওত লাভ করেন। ফলে তাদের আহলে ফাতরাহর অন্তর্ভুক্ত না করে সরাসরি মূর্তিপূজক আখ্যা দিয়ে জাহান্নামি বানানো কুরআনি নুসূস ও বাস্তবতা দুটোকেই প্রত্যাখ্যানের নামান্তর।[১০৭৮]

আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারেই বলেছেন, ﴿يسٓ ۝١ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ ۝٢ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ۝٣ عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ۝٤ تَنزِيلَ ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۝٥ لِتُنذِرَ قَوۡمٗا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمۡ فَهُمۡ غَٰفِلُونَ ۝٦﴾

১০৭৮. আযিমাবাদি তাঁর আউনুল মাবুদে নববির উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'তাদের কাছে ইবরাহিম ও অন্যান্য নবীর দাওয়াত পৌঁছেছে' (১২/৩২৩)। এটা ভিত্তিহীন বক্তব্য। নবিজির বাবা-মায়ের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে সিরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থগুলো একেবারেই নীরব। তা ছাড়া, মক্কাতে প্রকৃত ইবরাহিমি কিংবা ঈসায়ি ধর্মের অবশিষ্ট ছিটেফোঁটা সম্পর্কে অবগত লোকের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা দু-একজন। সামগ্রিকভাবে ইবরাহিমি কিংবা ঈসায়ি ধর্ম বলতে যা ছিল সেগুলো কোনো আসমানি ধর্ম ছিল না; বরং বিকৃত, মূর্তিপূজা ও কুফর-শিরকে ভরা সেসব ধর্মের খোলস এবং কিছু আচার-অনুষ্ঠান ছিল। এটাকে আসমানি ধর্মের দাওয়াত পৌঁছেছে বলে চালিয়ে দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই।

অর্থ : 'ইয়া-সিন। প্রজ্ঞাময় কুরআনের শপথ! নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রাসুলগণের একজন। সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট থেকে, যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, যাদের পূর্বপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফেল।' [ইয়াসিন : ১-৬] আল্লাহ আরও বলেছেন, ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ অর্থ : 'তারা কি বলে এটা সে মিথ্যা রচনা করেছে? বরং এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি। সম্ভবত এরা সুপথপ্রাপ্ত হবে।' [সাজদা : ৩] স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে বলছেন, তিনি তাদের কাছে রাসুল পাঠাননি ফলে তারা গাফেল। তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী আসেনি। অথচ এসব আলেম বিভিন্ন যুক্তিতে তাদের উপর ইবরাহিমি ও ঈসায়ি ধর্ম চাপিয়ে তাদের মুশরিক ও জাহান্নামি ঘোষণা করেছেন!

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা অন্য জায়গায় এ যুক্তি খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, তাদের কিতাব দেওয়ার আগে শাস্তি দিলে তারা বলত—হে আল্লাহ, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কাছে নবি-রাসুল ও কিতাব এসেছে। আমাদের কিতাব না দিয়ে কেন শাস্তি দিয়েছেন? ফলে আল্লাহ কিতাব পাঠানোর মাধ্যমে তাদের উপর 'হুজ্জত' সম্পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ অর্থ : 'এ কিতাব আমি নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং এর অনুসরণ করো আর ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (আমি এ কিতাব নাযিল করেছি এ জন্য যে) পাছে তোমরা বলা শুরু করো—কিতাব তো নাযিল করা হয়েছিল আমাদের পূর্বের দুটি সম্প্রদায় (ইহুদি ও খ্রিষ্টান)-এর প্রতি। আমরা তার পাঠ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলাম। কিংবা বলতে শুরু করো—যদি আমাদের প্রতি কোনো গ্রন্থ অবতীর্ণ হতো, আমরা এদের চাইতে অধিক পথপ্রাপ্ত হতাম। অতএব, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়াত ও রহমত এসে গেছে। অতঃপর সে ব্যক্তির চাইতে অধিক জালেম কে হবে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়?

অতি সত্বর আমি তাদের শাস্তি দেবো যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমি তাদের সত্যবিমুখতার কারণে তাদের কঠোর শাস্তি দেবো।' [আনআম : ১৫৫-১৫৭] সুতরাং কিতাব আসার আগে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, যেমন— রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতা, তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে একই যুক্তি পেশ করতে পারবেন খুব সহজেই। কারণ, শাস্তি হবে কিতাব আসার পরেও যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের। যারা কিতাবই পাননি তাদের শাস্তির কোনো যুক্তি নেই।

প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে সে যুগে মক্কার সবাই কি গাফেল এবং সবাই জান্নাতে যাবে? নাহ্। আহলে ফাতরাহর সবাই জান্নাতে চলে যাবে ব্যাপারটি তেমন নয়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমর ইবনে লুহাইর ব্যাপারে জাহান্নামের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি আমর বিন লুহাইকে জাহান্নামের মধ্যে তার নাড়িভুঁড়ি টানতে দেখেছি।'[১০৭৯] একইভাবে আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের ব্যাপারেও জাহান্নামের সাক্ষ্য দিয়েছেন।[১০৮০] অথচ তারাও সেই একই যুগের মানুষ। বোঝা গেল, পরকালে পরীক্ষা বা মুক্তি আহলে ফাতরাহর সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যাদের কাছে নবিদের দাওয়াত কিংবা কোনো দ্বীনের বিশুদ্ধ পয়গাম পৌঁছেছে এবং ফলে যারা 'গাফেল'-এর আওতার বাইরে চলে গেছে, দাওয়াত পৌঁছা সত্ত্বেও যারা শিরকের মাঝে ডুবে গেছে, বিভিন্ন উপায়ে শয়তানের পূজা করেছে, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। বিপরীতে যারা কোনো সত্য ধর্মের অনুসারী হওয়ার সুযোগ না পাওয়াতে স্বাভাবিক ফিতরত ও গাফলতের মাঝে জীবনযাপন করেছে, বিশুদ্ধ তাওহিদের দাওয়াত যেমন পায়নি, তেমনই কোনো শিরকেও লিপ্ত হয়নি, এমন লোকদের কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পরীক্ষা করবেন এবং পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করবেন। সরাসরি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না। এ ব্যাপারে পিছনে একাধিক হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। উপরের লোকদের ব্যাপারে শিরক প্রমাণিত। ফলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের জাহান্নামি ঘোষণা করেছেন। বিপরীতে তাঁর সম্মানিত মাতা-পিতার ব্যাপারে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তারা শিরক করতেন, মূর্তিপূজা করতেন। বরং সর্বোচ্চ যতটুকু বোঝা যায়, তারা দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে ফিতরত ও গাফলতের উপর

১০৭৯. বুখারি (কিতাবুল মানাকিব : ৩৫২১)। মুসলিম (কিতাবুল জান্নাহ : ২৮৫৬)।

১০৮০. বুখারি (কিতাবুল মানাকিব : ৩৫২১; কিতাবু মানাকিবিল আনসার : ৩৮৮৩)। মুসলিম (কিতাবুল জান্নাহ : ২৮৫৬; কিতাবুল ঈমান ২০৯)।

ছিলেন। বরং অসম্ভব নয় যে, শিরক থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাদেরকে যৌবনের শুরুতেই দুনিয়া থেকে তুলে নিয়েছেন। যারা বলেন, আবদুল্লাহ ও আমিনা যেহেতু মক্কায় ছিলেন, আর মক্কাবাসী মূর্তিপূজা করত, তাই তারাও করতেন—এমন বক্তব্য সঠিক নয়। এটা বিদ্বেষপূর্ণ ও ভিত্তিহীন কথা। পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর শানে গোস্তাখি।

হ্যাঁ, সহিহ হাদিসের ভিত্তিতে যেসব ইমাম রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতার ব্যাপারে জাহান্নামের কথা বলেছেন, তারা নসের অনুসরণ ও সম্মানের কারণে বলেছেন। ফলে তাদের কথা ভুল কিংবা শুদ্ধ যেটাই হোক, ইজতিহাদের কারণে তারা পুণ্য লাভ করবেন, নিন্দিত হবেন না। আবার যারা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতাকে জান্নাতি বলেছেন, তারাও নসের ভিত্তিতে ইজতিহাদ এবং রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মহব্বত ও সম্মানের খাতিরে বলেছেন। ফলে তাদের কথাও ভুল কিংবা শুদ্ধ যেটাই হোক, তারা পুণ্য লাভ করবেন, নিন্দিত হবেন না। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে কিছু মানুষ রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতাকে জাহান্নামে পাঠানোর ঠিকাদারি নিয়েছেন। বিপরীত পক্ষের আলেমদের গুরুত্বপূর্ণ ইজতিহাদকে তারা 'শুবাহ' তথা সংশয় আখ্যা দিয়ে নিজেদের মতামতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করছেন। কোনো শরয়ি নস ছাড়া কেবল অনুমানের উপর ভিত্তি করে তাদের কাফের-মুশরিক আখ্যা দিচ্ছেন। অথচ কুরআন-সুন্নাহর কোথাও তাদের সরাসরি কাফের-মুশরিক বলা হয়নি। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচা আবু তালিব নবুওতের প্রায় এক দশক পরে ইন্তেকাল করেন। দীর্ঘ দশ বছর রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে নবি হিসেবে দেখেন। তাঁর দাওয়াতের কাজে ইখলাস ও ফিদা দেখে তাকে সাহায্য করেন। অথচ নিজে ঈমান আনেননি। এমনকি আবু তালিব যখন মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে, সেই মুমূর্ষু অবস্থাতেও রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ঈমানের দাওয়াত দেন, কালিমা পড়তে বলেন। কিন্তু আবু তালিব প্রত্যাখ্যান করেন। এতকিছুর পরও মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি আবু তালিবের মহব্বত ও ভালোবাসার কারণে আল্লাহ তার শাস্তি লঘু করে দেবেন। ফলে জাহান্নামে সবার চেয়ে কম শাস্তি হবে আবু তালিবের।[১০৮১]

১০৮১. মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ২১৪)। ইবনে হিব্বান (কিতাবুল বির ওয়াল ইহসান : ৩৩০)। শিয়া-সহ একদল সুফি সম্প্রদায় 'আবু তালিবও মুমিন হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন।'—এমন বিশ্বাস রাখে। কিন্তু সেটা

তাহলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতার কী দোষ? বাবা আবদুল্লাহ তো তাঁর জন্মের আগেই মারা গেলেন। মাতা আমিনা মৃত্যুবরণ করলেন ছয় বছর বয়সে। তারা হয়তো কখনো কল্পনাও করার সুযোগ পাননি—আল্লাহ নতুন দ্বীন পাঠাবেন। তিনি গর্ভে থাকাকালীন মাতা আমিনা অনেক আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। পেট থেকে নুর বের হতে দেখেছেন।[১০৮২] কিন্তু তিনি কি কখনো বুঝতে পেরেছেন তাঁর সন্তান একদিন নবি হবেন? বিশ্বজাহানের সর্দার হবেন? হয়তো বোঝেননি। বুঝলেও কিছু করার সুযোগ তাঁর ছিল না। দ্বীনে ইবরাহিমি পুরোপুরি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। মূর্তিপূজার ভিড়ে সত্যকে খুঁজে বের করার সুযোগই পাননি আবদুল্লাহ। আমিনা তো ছিলেন ঘরের ভিতরে। হুনাফা কিংবা খ্রিষ্টানদের কাছে গিয়ে সত্য দ্বীন পরখ করার সুযোগ কোথায় তাঁর? উপরন্তু, তারা মূর্তিপূজা করতেন—এমন কোনো প্রমাণও নেই আমাদের কাছে। এর পরও তাদের জাহান্নামে পাঠানোর জন্য এত আগ্রহ কেন?

হ্যাঁ, **একদিকে** সনদ বিশুদ্ধ এমন একাধিক হাদিসে রাসুলুল্লাহর পিতা জাহান্নামে থাকার কথা বলা হয়েছে এবং মাতা আমিনার জন্য ইস্তিগফার নিষেধ করা হয়েছে, **অপরদিকে** তাদের 'আহলে ফাতরাহ' হওয়া সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, আর আহলে ফাতরাহদের জাহান্নামি সাব্যস্ত করা কুরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। **উপরন্তু** উভয় পক্ষে পরবর্তী আলেমদের বক্তব্য থাকলেও আমাদের প্রাচীন ইমামদের এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য নেই, বিশেষত ইমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে এ ব্যাপারে কথা বলার সুনিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই, অথচ তারা এসব হাদিস জানতেন না কিংবা এ ব্যাপারে কুরআন-হাদিসের আপাত সাংঘর্ষিক অবস্থান বুঝতেন না এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বোঝা গেল, এ ব্যাপারে আমাদের প্রথম যুগের ইমামগণ ইচ্ছাকৃতভাবেই নীরব থাকাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এমনকি পরবর্তী ইমামদের মাঝে ইমাম নববিও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত রাসুলুল্লাহর 'পিতা' জাহান্নামে-সংক্রান্ত হাদিসটি খুবই সংক্ষিপ্ত ও বাহ্যিক অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর

প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে তারা যেসব বর্ণনা পেশ করে সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। আবু তালিবের কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণের বিষয়টি কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। বিপরীতে মাতা-পিতার বিষয়টি অস্পষ্ট।

১০৮২. মুসান্নাফে আবদির রাযযাক (কিতাবুল মাগাযি : ৯৭১৮)। মুসনাদে তয়ালেসি (আহাদিসু আবি উমামা বাহেলি : ১২৩৬)। মুসনাদে দারেমি (মুকাদ্দিমাতুল মুআল্লিফ : ১৩)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুশ শামিয়্যিন : ১৭৪২৫)।

পিতার পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য দেননি। খুব সম্ভবত তিনিও এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকাকে অগ্রাধিকার দিতেন।[১০৮৩]

আল্লামা আহমদ হামাভি (১০৯৮ হি.) 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের'-এর ব্যাখ্যায় লিখেন, 'আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাহাবাদের ব্যাপারে মন্দ কথা বলতে নিষেধ করেছেন। ফলে রাসুলুল্লাহর মাতা-পিতার ব্যাপারে এমন কিছু বলা থেকে বিরত থাকা আরও বেশি জরুরি। তা ছাড়া, এটা আকিদার জরুরি কোনো বিষয় নয়। ফলে এ বিষয়ে কথা বলা থেকে মুখে লাগাম দেওয়া আবশ্যক।'[১০৮৪] ইবনে আবিদিন শামি লিখেন, 'সেকালে মক্কার একদল লোক আহলে ফাতরাহর অন্তর্ভুক্ত হয়ে 'গাফেল' অবস্থায় ছিলেন [শিরক করেননি, ঈমানও আনেননি]। আরেক দল আকলের মাধ্যমে হেদায়াত পেয়েছিলেন [হুনাফা]। সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের সুধারণা হলো, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতা উপরের দুই প্রকারের যেকোনো দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন [ফলে জাহান্নাম থেকে নাজাত পেতে পারেন]। ...মোটকথা, এটা এমন মাসআলা, যেটা নিয়ে কথা বলার সময় অত্যন্ত আদবের সঙ্গে বলা উচিত [যাতে রাসুলুল্লাহর প্রতি বেয়াদবি না হয়]। উপরন্তু এটা এমন কোনো মাসআলা নয়, যা না জানলে ক্ষতি হবে কিংবা যে সম্পর্কে কবরে বা হাশরের মাঠে প্রশ্ন করা হবে। ফলে হয় এ ব্যাপারে উত্তম কথা বলতে হবে, নয়তো চুপ থাকতে হবে।'[১০৮৫]

তাই আহলে সুন্নাতের অনুসারী প্রত্যেক আল্লাহভীরু ও রাসুলপ্রেমী মুসলিমের কর্তব্য হলো, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্মানিত মাতা-পিতার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কিংবা জবান-দরাজি দুটো থেকেই বিরত থাকা। অতিভক্তি কিংবা গোস্তাখি দুটোই বর্জনপূর্বক তাদের আখেরাতের পরিণতের ব্যাপারে নীরব-নিরপেক্ষ থাকা। মুমিন-কাফের, জান্নাতি-জাহান্নামি কোনোটা না বানিয়ে এগুলো বরং আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া। তিনি নিশ্চয়ই কাউকে একবিন্দু জুলুম করবেন না। তাঁর প্রিয় বন্ধু রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতা-পিতার প্রতি তিনি ইনসাফ করবেন। পরকালে রাসুলুল্লাহকে সম্পূর্ণ ও সর্বোচ্চ সন্তুষ্ট করবেন—এটা তো সুনিশ্চিত। ফলে এ ব্যাপারে মনস্তাপে ভোগার কিছু নেই।

১০৮৩. শরহে মুসলিম, নববি (৩/৭৯)।
১০৮৪. গামযু উয়ুনিল বাসায়ের (৩/২৪১)।
১০৮৫. রদ্দুল মুহতার (৩/১৮৫)।

রাসুলুল্লাহর (ﷺ) পবিত্র সন্তানসন্ততি

ইমাম আজম রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র সন্তানসন্ততির ব্যাপারে বলেন, **'কাসেম, তাহের ও ইবরাহিম রাসুল (ﷺ)-এর পুত্র। ফাতেমা, যয়নব, রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম রাযি. তাঁর কন্যা।'**[১০৮৬] তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ :

কাসেম : তিনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর জ্যেষ্ঠ সন্তান। নবুওতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামেই রাসুলুল্লাহর উপনাম ছিল 'আবুল কাসেম' (কাসেমের পিতা)। কিন্তু জন্মের বছর দুয়েকের মাঝে ওফাত লাভ করেন। বলা হয়, তিনি হাঁটাচলা করতে শুরু করেছিলেন! খুব সম্ভবত রাসুলুল্লাহর নবুওত লাভের পরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাহের : তিনি মক্কাতে নবুওতের পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং শিশু বয়সেই ওফাত লাভ করেন। তাহের ছাড়া তাকে 'আবদুল্লাহ' ও 'তাইয়েব' নামেও ডাকা হতো। যদিও কারও কারও মতে, তাইয়েব ও আবদুল্লাহ নামে রাসুলুল্লাহর অন্য আরও দুজন ছেলে ছিলেন, যেমনটা দারাকুতনি বলেছেন। কিন্তু ইমাম আজমের কাছে খুব সম্ভবত এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তিনি তাহের, তাইয়েব ও আবদুল্লাহ একজনের তিনটি নাম মনে করেন। এ কারণে কেবল রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর তিন ছেলের কথাই উল্লেখ করেছেন। এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ কথা।

ইবরাহিম : তিনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর তৃতীয় পুত্র। অষ্টম হিজরিতে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসুলুল্লাহর একমাত্র সন্তান যিনি খাদিজার গর্ভে জন্ম নেননি। বরং মিশরীয় বংশোদ্ভূত মারিয়া ছিলেন তাঁর মাতা। জন্মের ষোলো বা আঠারো মাসের মাথায় মৃত্যুবরণ করেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত হন। চোখের পানি ছেড়ে বলেন, 'আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত, চোখ অশ্রুসিক্ত। তদুপরি আমরা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এমন কিছু বলব না। ইবরাহিম, আমরা তোমার বিচ্ছেদে বেদনা-ভারাক্রান্ত।' অতঃপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজে তাঁর জানাযা পড়ান। বাকী' গোরস্থানে নিজের দুধভাই উসমান ইবনে মাযউনের পাশে সন্তানকে দাফন করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন, কিন্তু মর্যাদায় উচ্চ ছিলেন। হাদিসে একাধিক সাহাবির বক্তব্য

১০৮৬. আল-ফিকহুল আকবার (৮) [আলি কারির ব্যাখ্যার ধারাক্রম হিসেবে]।

এসেছে, যদি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে কোনো নবি আসত, তবে নবিপুত্র ইবরাহিম নবি হতেন।[১০৮৭]

একজন এতিম মানুষ। জন্মের আগেই বাবাকে হারান। জন্মের কয়েক বছর পরে মাকে হারান। ভাই নেই, বোন নেই। প্রৌঢ়ত্বে এসে আল্লাহ তায়ালা তাকে তিনটি ছেলে দান করেন। কিন্তু কেউ কয়েক মাস কিংবা কয়েক বছরের বেশি পৃথিবীতে থাকেন না। একের পর এক তিনটি ছেলেই মৃত্যুবরণ করেন! সাধারণ একজন মানুষের জীবনে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে সে কী করত? সে কি বেঁচে থাকতে পারত? আল্লাহর প্রতি অভিযোগ না ছুড়ে শান্তি পেত? যে সমাজের মানুষ মেয়ে জন্মালে ভ্রু কুঁচকায়, অসন্তুষ্ট হয়, ভবিষ্যৎ ও বার্ধক্যের সময় বেঁচে থাকার অবলম্বনের কথা চিন্তা করে মুষড়ে পড়ে, সে সমাজে কারও তিনটা ছেলে মারা গেলে কী পরিমাণ আঘাত পেতে পারে সেটা তো বলাই বাহুল্য। আরবে মেয়েদের আরও বেশি অলক্ষুনে ও বোঝা মনে করা হতো। বরং ক্ষেত্রবিশেষে মেয়েদের জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলার রেওয়াজও ছিল। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এগুলো ভাঙার জন্যই মনোনীত হয়েছিলেন। ফলে তাঁর সবর করতে হয়েছিল। তিনটি ছেলেকেই হারিয়ে বোঝাতে হয়েছিল, মেয়েরা অলক্ষুনে নয়, বোঝা নয়। বরং মেয়েরা সুখের ঠিকানা, জান্নাতের চাবি। ছেলেরা সবকিছু নয়। বার্ধক্যে ছেলে ছাড়া বেঁচে থাকা যাবে না—এটা তাকদির ও রিযিকের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ, মানসিক বিকলাঙ্গতা। মেয়ে জন্ম নিলে বোঝা মনে করা, অসন্তুষ্ট হওয়া বিশুদ্ধ তাওহিদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এ সবকিছু রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেই দেখিয়ে গিয়েছেন, শিখিয়ে গিয়েছেন।

ফাতিমা : জান্নাতের নারীদের সর্দার, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সবচেয়ে আদরের মেয়ে ফাতিমা আয-যাহরা। বয়সে অন্য বোনদের ছোট হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আজম রহ. তাকে সবার আগে এনেছেন তাঁর মর্যাদার প্রতি লক্ষ করে। পরিণত বয়সে পৌঁছার পর রাসুলুল্লাহর চাচাতো ভাই আলি রাযি.-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয় (অর্থাৎ চাচাতো চাচার সাথে)। এই বিবাহ ছিল আল্লাহর নির্দেশে এবং ওহির ভিত্তিতে। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। রাসুল (ﷺ) যখন দূরে যেতেন, সবশেষে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতেন। আবার যখন দূর থেকে আসতেন, সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁর ব্যাপারে রাসুল (ﷺ)

১০৮৭. বুখারি (কিতাবুল আদাব : ৬১৯৪)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আনাস ইবনে মালেক : ১২৫৫৩)।

বলেন, 'ফাতিমা আমার অংশ। সে কষ্ট পেলে আমিও কষ্ট পাই।'[১০৮৮] রাসুলের জীবদ্দশায় তিনি বেঁচে ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের মাত্র ছয় মাস পরে ফাতিমাও ইন্তিকাল করেন। ফাতিমার পাঁচজন সন্তান ছিলেন। হাসান, হুসাইন, মুহসিন, উম্মে কুলসূম ও যয়নব। মুহসিন শিশু অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। হাসান ও হুসাইন রাযি. জান্নাতের যুবকদের সর্দারে পরিণত হন। রাসুল (ﷺ)-এর অন্যান্য মেয়ের সন্তান ছোটবেলাতেই ইন্তিকাল করেন। কেবল ফাতিমার দুই সন্তান হাসান ও হুসাইন বেঁচে থাকেন। তাদের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশধারা সংরক্ষিত এবং পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়।

যয়নব : তিনি, বিশুদ্ধ মতে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সবচেয়ে বড় মেয়ে। নবুওতের প্রায় দশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। মদিনায় হিজরত করেন। তাঁর স্বামী ছিলেন আবুল আস। যয়নব অষ্টম হিজরিতে ওফাত লাভ করেন। তাঁর এক ছেলে ছিলেন আবদুল্লাহ। মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ প্রিয় নাতিকে নিজের উষ্ট্রীর পিছনে বসিয়ে নিয়েছিলেন। আবদুল্লাহও অল্প বয়সে ইন্তিকাল করেন। যয়নবের উমামা নামে একজন মেয়ে ছিলেন। ফাতিমা রাযি.-এর ইন্তিকালের পরে আলি রাযি. তাকে বিয়ে করেছিলেন। অর্থাৎ, সম্পর্কে আলি রাযি. উমামার খালু ছিলেন। খালার মৃত্যুর পরে খালুকে বিবাহ করেন। সাহাবাদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। সামাজিক কৃত্রিম জটিলতা ও লৌকিকতা ছিল না।

রুকাইয়াহ : নবুওতের প্রায় সাত বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে উতবা ইবনে আবি লাহাবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ ঠিক হয়। কিন্তু আবু লাহাবের কুফরের কারণে ঘর-সংসার করার আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তখন উসমান ইবনে আফফান রাযি. তাকে বিবাহ করেন। হাবশায় মুসলমানদের সঙ্গে হিজরত করেন। অতঃপর মদিনায় হিজরত করেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বদরযুদ্ধে বের হওয়ার পরে রুকাইয়াহ ওফাত লাভ করেন।

উম্মে কুলসুম : রুকাইয়াহর ওফাতের পরে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) উম্মে কুলসুমকে উসমান রাযি.-এর সঙ্গে বিবাহ দেন। এতে উসমান রাযি.-এর মাহাত্ম্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পায় । ইমাম আজম এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেন, রুকাইয়াহ রাযি.-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে উমর রাযি. উসমানের কাছে

১০৮৮. বুখারি (কিতাবুন নিকাহ : ৫২৩০)। মুসলিম (কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা : ২৪৪৯)।

তাঁর মেয়ে হাফসাকে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। উসমান রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে পরামর্শের কথা জানান। উমর রাযি. রাসুলুল্লাহর কাছে পরামর্শের জন্য গেলে তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে উসমানের চেয়ে উত্তম জামাতা দেখিয়ে দেবো? আর উসমানকে তোমার চেয়ে উত্তম শ্বশুর দেখিয়ে দেবো? উমর বললেন, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ। নবিজি (ﷺ) বললেন, তোমার মেয়ে হাফসাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দাও। আমি উসমানের সঙ্গে আমার মেয়ে (উম্মে কুলসুম)-কে বিবাহ দিই![১০৮৯] সুবহানাল্লাহ! এভাবে উমর রাযি. পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষকে মেয়ের জামাতা হিসেবে পেলেন। আবার উসমান পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষকে শ্বশুর হিসেবে পেলেন! আর তিনি হলেন সাইয়েদুনা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)। পাশাপাশি উক্ত ঘটনা তাদের সারল্য, হৃদয়ের বিশুদ্ধতা, লৌকিকতা থেকে তাদের দূরাবস্থানের সাক্ষী। উম্মে কুলসুম হিজরতের নবম বর্ষে ওফাত লাভ করেন।

রাসুলুল্লাহর সন্তানদের আলোচনা কেন? প্রশ্ন হতে পারে, ইমাম আজম এখানে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সন্তানদের ব্যাপারে কেন আলোচনা করলেন? সাধারণত আকিদার কিতাবগুলোতে রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সন্তানসন্ততি নিয়ে আলোচনা চোখে পড়ে না। কারণ, এগুলো একদিক থেকে ঈমানের মৌলিক কোনো বিষয় নয়, অন্যদিকে এগুলো নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি নেই। ফলে এ ব্যাপারে কথা বলার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু ইমাম আজম রহ. রাসুলুল্লাহর সকল সন্তানের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তাদের নাম ধরে ধরে উল্লেখ করেছেন। এটাকে মোটা দাগে দুটো কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় :

এক. এক্ষেত্রে প্রয়োজনের চেয়ে মহব্বতের বিষয়টা সম্ভবত বেশি ছিল। এর মাধ্যমে নবিপরিবারের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক, নবিজির সন্তানসন্ততি ও আহলে বাইতের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগ ফুটে ওঠে। কারণ, ইমাম আজম রহ. আহলে বাইতকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। বরং অত্যধিক ভালোবাসার কারণে কেউ কেউ তাকে শিয়া বলেও সন্দেহ করত। যদিও তিনি কখনোই শিয়া ছিলেন না, যেমনটা আমরা সামনে দেখব। তা ছাড়া, ইমামের যুগে একাধিক উমাইয়া শাসকের দৌরাত্ম্যে আহলে বাইতের প্রতি সমাজে ঘৃণা ছড়ানো হতো। ফলে আকিদার বইয়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সন্তানসন্ততির ব্যাপারে আলোচনা করে ইমাম সেটার প্রতি কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

১০৮৯. শরহু মুসনাদে আবি হানিফা (৪১২-৪১৩)।

দুই. খোদ শিয়া ও রাফেযিদের খণ্ডনে ইমাম আজম রহ. রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সন্তানসন্ততির ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। কারণ, শিয়াদের একটি গ্রুপ রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সন্তানসন্ততির ব্যাপারে মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়। ফাতিমা রাযি.-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তারা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর অন্যান্য সন্তানকে অস্বীকার করে। তাদের মতে, কেবল ফাতিমাই রাসুলুল্লাহর ঔরসজাত সন্তান, বাকিরা খাদিজা রাযি.-এর আগের ঘরের সন্তান। আবার কেউ যয়নব ও রুকাইয়াহকে খাদিজার পালিত সন্তানও ঘোষণা করে। অন্যদিকে উসমান রাযি.-এর প্রতি বিদ্বেষ রাখতে গিয়ে তাঁর দুই স্ত্রী রুকাইয়াহ ও উম্মে কুলসুমকে নবিজির মেয়ের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেয়।[১০৯০] নাউযুবিল্লাহ!

সম্ভবত এ কারণেই ইমাম আজম রহ. রাসুলুল্লাহর সন্তানসন্ততির কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের বিচ্যুতি খণ্ডন করে রাসুলুল্লাহর সকল সন্তানের ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত আকিদা ঘোষণা করেছেন। আহলে সুন্নাতের ইমামদের শক্ত প্রতিবাদের ফলে সম্ভবত শিয়ারা একসময় পিছু হটে, রাসুলুল্লাহর সন্তানদের ব্যাপারে উক্ত বিচ্যুতি বর্জন করে। ফলে আজকের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়াদের এ-সংক্রান্ত আকিদা আহলে সুন্নাতের আকিদার মতোই। যয়নব ও রুকাইয়াহর ব্যাপারে গোমরাহি আকিদা শিয়াদের ক্ষুদ্র শ্রেণির মাঝে সীমাবদ্ধ। শিয়াদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আল-কাফিতে এসেছে, 'রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর বয়স যখন বিশের অধিক হয়, তখন তিনি খাদিজা রাযি.-কে বিবাহ করেন। খাদিজার গর্ভে নবুওতের আগে কাসেম, রুকাইয়াহ, যয়নব ও উম্মে কুলসুমের জন্ম হয়। নবুওতের পরে জন্ম হয় তাইয়িব, তাহের ও ফাতিমা আলাইহাস সালামের।'[১০৯১]

১০৯০. দেখুন : আল-ইস্তিগাসাহ ফি বিদায়িস সালাসাহ, আবুল কাসেম আলাভি (১০৮)।
১০৯১. আল-কাফি, কুলাইনি (১/৪৩৯-৪৪০)।

তাকদিরের উপর ঈমান

'তাকদির' ঈমানের ছয়টি ভিত্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। প্রত্যেক মুমিনের জন্য এতে বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। এটা অস্বীকার করা কুফর। কিন্তু ঈমানের অন্যান্য রুকন থেকে এটার প্রকৃতি ভিন্ন হওয়ায়, রহস্যপূর্ণ ও জটিল হওয়ায় এটাকে কেন্দ্র করে যতটা বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে, ঈমানের অন্যান্য রুকনকে কেন্দ্র করে এতটা বিচ্যুতি দেখা দেয়নি। তাকদিরে বিচ্যুতি ছিল ইসলামের ইতিহাসের একেবারে প্রথম দিকের অন্যতম ফেতনা। খোদ সাহাবায়ে কেরামের আলোকিত যুগে অন্ধকারের ফেরিওয়ালা একদল লোক এই ফেতনার জন্ম দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এক্ষেত্রে একাধিক বিপরীতমুখী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে, যাদের প্রত্যেকে কুরআন ও সুন্নাহর ভারসাম্যপূর্ণ আলোকিত মধ্যমপন্থা ছেড়ে ডানে-বামে সরে গিয়ে প্রান্তিকতার শিকার হয়। একদল তাকদিরকে অস্বীকার করে মানুষকে তার ভাগ্যের সৃষ্টিকর্তা ও বিধাতা বানিয়ে দেয়, আরেক দল তাকদির স্বীকারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে মানুষকে নিষ্প্রাণ পুতুল ও রোবটের মতো কল্পনা করে। প্রথম দল কাদারিয়্যাহ (ও মুতাযিলা) নামে পরিচিত, দ্বিতীয় দল জাবরিয়্যাহ (ও জাহমিয়্যাহ) নামে পরিচিত। তাদের ফেতনায় গোটা মুসলিম উম্মাহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। স্বয়ং আহলে সুন্নাতের মাঝেও এগুলো নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। যেহেতু কুরআন-সুন্নাহতে তাকদির নিয়ে বিতর্ক থেকে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সালাফে সালেহিনের শক্ত বারণ আছে। মুসলিমরা যখন এই নিষিদ্ধ বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন প্রচণ্ড ফেতনা দেখা দেয়। বিভিন্ন মীমাংসিত বিষয়ের তর্ক নতুন করে সামনে আসে। মুসলিমদের বিভক্তি ও সংশয় বাড়ে।

এ সময় আহলে সুন্নাতের ইমামদের নীরব থেকে ফেতনা ও পতনের এ দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ ছিল না। ফলে তারা ময়দানে নেমে আসেন। তাকদিরকেন্দ্রিক সকল বিভ্রান্তি খণ্ডন করে উম্মাহর সামনে এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর দিক-নির্দেশনা পেশ করেন। ইমাম আজম 'আহলে সুন্নাতের আকিদার ইমাম' হওয়াতে তাঁর দায় ছিল আরও বেশি। ফলে তিনি এক্ষেত্রে গুরুদায়িত্ব পালন করেন। কাদারিয়্যাহ, মুতাযিলা ও জাবরিয়্যাহ-জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের সঙ্গে

একাধিক মুনাযারা করেন। সরাসরি তাদের খণ্ডন করেন। তাদের নানা ভ্রান্তি উন্মোচিত করেন। তাঁর দরস ও মজলিসগুলোতে তাকদিরকেন্দ্রিক আলোচনা অব্যাহত রাখেন। এ কারণে ঈমানের যেসব বিষয়ে ইমাম আজম থেকে বিস্তারিত ও দীর্ঘ বয়ান পাওয়া যায়, তাকদির সেগুলোর অন্যতম। এ ব্যাপারে ইমাম আজম রহ. দীর্ঘ আলোচনা ও হেদায়াত দান করেছেন। বর্তমান সময়েও মুসলমানদের মাঝে তাকদিরকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিচ্যুতি, অস্থিরতা ও সংশয় বিদ্যমান। এ জন্য আমরা এখানে প্রথমে তাকদিরের পরিচয় অতঃপর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয়, তাকদিরকেন্দ্রিক সংশয়ের প্রতিকারস্বরূপ ইমামের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ।

তাকদিরের পরিচয় এবং তাকদিরে বিশ্বাসের আবশ্যকতা

'তাকদির' (التقدير) শব্দের শাব্দিক অর্থ : নির্ধারণ করা, ধার্য করা। তাকদিরে বিশ্বাস ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকিদা, ঈমানের একটি মৌলিক ভিত্তি। আহলে সুন্নাতের মতে, তাকদিরে ঈমানের অর্থ হলো এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তায়ালা গোটা বিশ্বজগতের সবকিছু সৃষ্টির আগেই প্রত্যেকটি বিষয় জেনে নিয়েছেন সেটা কখন ঘটবে কীভাবে ঘটবে। সেই পরিপূর্ণ জ্ঞান ও তাঁর সর্বব্যাপী ইচ্ছা অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিষয় সুপরিমিতভাবে নির্ধারণ করেছেন। 'লাওহে মাহফুজে' সে মোতাবেক সবকিছু লিখেছেন। সবকিছুকে সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। ফলে এখন জীবন ও জগতের ভালোমন্দ সবকিছু সেভাবেই ঘটছে ও ঘটবে যেভাবে তিনি জেনেছেন, চেয়েছেন, লিখেছেন, নির্ধারণ ও সৃষ্টি করেছেন। কোনোকিছুতে একবিন্দু পরিমাণ ব্যত্যয় ঘটবে না। কেউ তাঁর জ্ঞান, ইচ্ছা, লেখা, নির্ধারণ ও সৃষ্টির বাইরে যেতে পারবে না।[১০৯২]

কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য বক্তব্য দ্বারা তাকদির সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। ফলে এটা ঈমানের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি। যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ অর্থ : "তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। যদি তাদের কোনো কল্যাণ হয় তবে তারা বলে, 'এটা আল্লাহর নিকট হতে।' আর যদি তাদের

১০৯২. শরহে মুসলিম, নববি (১/১৫৪)।

কোনো অকল্যাণ হয় তবে তারা বলে, 'এটা আপনার নিকট হতে।' বলুন, 'সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে।' এই সম্প্রদায়ের হলো কী যে, এরা কোনো কথা বুঝতে চায় না?" [নিসা : ৭৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ۝﴾ অর্থ : 'তাদের সকল কর্ম কিতাবে রয়েছে। ছোট-বড় সবকিছু লেখা রয়েছে।' [কামার : ৫২] আরও বলেন, ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ অর্থ : 'তুমি কি জানো না আকাশ ও যমিনের সবকিছু আল্লাহ তায়ালা জানেন? এ সমস্ত কিছু কিতাবে রয়েছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য সহজ।' [হজ : ৭০]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) হাদিসে বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেককে মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত (সৃষ্টির মৌল উপাদানরূপে) সংগৃহীত করা হয়। অতঃপর তা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়, অতঃপর মাংসপিণ্ডে। এরপর আল্লাহ তার কাছে চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে একজন ফেরেশতা পাঠান। ফেরেশতা তার আমল, জীবনকাল, রিযিক এবং সে সৌভাগ্যবান হবে নাকি দুর্ভাগা সেটা লিখে রাখেন। অতঃপর তার মাঝে রুহ ফুঁকে দেওয়া হয়।'[১০৯৩] ইমাম আজম হাম্মাদ সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে উক্ত হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন : **'তোমাদের প্রত্যেকে মায়ের গর্ভে সর্বপ্রথম চল্লিশ দিন বীর্য আকারে থাকে। এর পরের চল্লিশ দিনে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এর পর চল্লিশ দিনে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তখন আল্লাহ তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান যে তার ভিতরে রুহ ফুঁকে দেয় এবং চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করে : তার রিজিক, মৃত্যু, আমল এবং সে সৌভাগ্যবান হবে নাকি দুর্ভাগা। ওই সত্তার শপথ যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই! তোমাদের কেউ জীবনভর জাহান্নামের আমল করতে থাকে, এর পর যখন জাহান্নাম এবং তার মাঝে মাত্র এক হাত বাকি থাকে, ওই সময় ভাগ্যলিপি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং তার সর্বশেষ আমল হয় জান্নাতিদের। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ সারা জীবন জান্নাতিদের আমল করে। পরিশেষে যখন তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, তার জীবনের শেষ আমল হয় জাহান্নামিদের। ফলে মৃত্যুর পরে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।'**[১০৯৪]

অন্য প্রসিদ্ধ হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বালক ইবনে আব্বাসকে নসিহত করেন, 'বৎস, আল্লাহ তায়ালাকে হেফাজত করো (অর্থাৎ, তাঁর আদেশ-নিষেধ

১০৯৩. বুখারি (কিতাবুত তাওহিদ : ৭৪৫২)। মুসলিম (কিতাবুল কদর : ২৬৪৩)।
১০৯৪. আল-ফিকহুল আবসাত (৪৪)।

মেনে চলো), আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন। সুখের সময়ে তাকে মনে রাখো, তিনি দুঃখের সময় তোমাকে মনে রাখবেন। যখন কিছু চাও, আল্লাহর কাছে চাও। যখন সাহায্যের জন্য কাউকে দরকার, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। কলম শুকিয়ে গিয়েছে। যা হওয়ার তা-ই হবে। যদি সৃষ্টির সবাই তোমাকে উপকার করার ইচ্ছা করে, আল্লাহর ফয়সালা না থাকলে তারা তোমাকে একবিন্দু উপকার করতে পারবে না। আবার যদি সৃষ্টির সবাই তোমাকে ক্ষতি করার ইচ্ছা করে, আল্লাহর ফয়সালা না থাকলে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'[১০৯৫]

ইমাম আজম রহ. বলেন, **'তাকদিরের ভালোমন্দ উভয়টিই আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং কেউ যদি এটা মনে করে যে, ভালোমন্দ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে হয়, তবে তার তাওহিদ নষ্ট হবে এবং সে কাফের হয়ে যাবে।'**[১০৯৬]

ইমাম আরও বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কোনো বস্তু থেকে এগুলো সৃষ্টি করেননি** (সম্পূর্ণ নতুন তৈরি করেছেন)। **অনাদিতে সকল বস্তু সৃষ্টির আগেই আল্লাহ এগুলো সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত ছিলেন। তিনিই সবকিছু নির্ধারণ করেছেন এবং ফয়সালা করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাতের কোনোকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা, তাঁর জ্ঞান, তাঁর ফয়সালা এবং তাঁর কুদরত ব্যতীত সংঘটিত হয় না। তিনি এসব লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন।'**[১০৯৭]

লেখার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ইমাম বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা কলমকে সৃষ্টি করে নির্দেশ দিলেন, তুমি লেখো। কলম বলল, হে প্রতিপালক, কী লিখব? তিনি বললেন, 'কিয়ামত পর্যন্ত যা-কিছু হবে তা লেখো।' কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন, 'وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ۝' অর্থ : 'তারা যা-কিছু করে, সবই আমলনামায় রয়েছে। প্রত্যেক ছোট ও বড় সবকিছুই লিপিবদ্ধ।' [কামার : ৫২-৫৩]**[১০৯৮]

আবু ইউসুফ রহ. বলেন, "আমি ইমাম আবু হানিফার কাছে ছিলাম। তখন বসরা থেকে এক ব্যক্তি এসে ইমামকে জিজ্ঞাসা করল, আবু হানিফা, আপনি কি তাকদির মানেন? তিনি বললেন, তাকদির না মেনে উপায় আছে? আল্লাহ তায়ালা

১০৯৫. তিরমিযি (আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ : ২৫১৬)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু বনি হাশিম : ২৭১৩)।

১০৯৬. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৩৪)। আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৬)।

১০৯৭. আল-ফিকহুল আকবার (৩)।

১০৯৮. আল-ফিকহুল আকবার (৩)।

কুরআনে এটা সাব্যস্ত করে বলেছেন, ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ অর্থ : 'আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণে।' [কামার : ৪৯] সুতরাং পৃথিবীর সবকিছুই তাকদিরের অন্তর্ভুক্ত। ...বান্দার কাজে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে বান্দা যে কাজ করবে, সেটার দায়ভারও তার বহন করতে হবে।"[১০৯৯]

আবু জাফর তহাবি লিখেন : 'আল্লাহ নিজ পূর্ণজ্ঞানে সবাইকে সৃষ্টি করেছেন; সবার ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন; সবার জন্ম-মৃত্যু সুনির্দিষ্ট করেছেন। সৃষ্টজীবকে সৃষ্টি করার আগে তাদের কোনোকিছুই তাঁর কাছে গোপন ছিল না। সৃষ্টির আগেই তিনি জানতেন তারা কী করবে। তিনি তাদের তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। সবকিছু তাঁর নির্ধারণ ও ইচ্ছা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছাই কার্যকর হয়। তাঁর ইচ্ছার বাইরে সৃষ্টির ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হয়। যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না।'[১১০০]

তহাবি আরও বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালাম এবং তার সন্তানদের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, তা সত্য। অনাদিকাল থেকেই আল্লাহ তায়ালা বিস্তারিত জানেন—কতজন মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কতজন জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সুতরাং তাতে প্রবেশকারীদের সংখ্যা কোনো ধরনের কমবেশি হবে না। একইভাবে পৃথিবীতে কে কী কাজ করবে আল্লাহ তায়ালা তাও জেনে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেককে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার কাছে সহজ করে দেওয়া হয়েছে। সকল আমল শেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তাই প্রকৃত সৌভাগ্যবান হচ্ছে সে ব্যক্তি, আল্লাহ তায়ালা যার কপালে সৌভাগ্য লিখে রেখেছেন। আর দুর্ভাগা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যার কপালে দুর্ভাগ্য লিখে রেখেছেন।'[১১০১]

লাওহে মাহফুজের লেখা এবং তাকদিরের অপরিবর্তনীয়তা প্রসঙ্গে তহাবি বলেন, "আমরা লওহ (মাহফুজ), কলম এবং (লাওহে) লিপিবদ্ধ সবকিছুতে বিশ্বাস করি। সুতরাং তাতে যদি কোনো বিষয় 'হবে' বলে লেখা থাকে, গোটা সৃষ্টি মিলেও সেটাকে প্রতিহত করতে পারবে না। একইভাবে তাতে যদি কোনো বিষয়

১০৯৯. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১১৭)।
১১০০. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১০-১১)।
১১০১. প্রাগুক্ত (১৬)।

'হবে না' লেখা থাকে, গোটা সৃষ্টির সবাই মিলেও সেটা করতে পারবে না। কলম শুকিয়ে গেছে। ফলে যা লেখা হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত সেগুলোই থাকবে। কেউ যা হারিয়েছে, সে কখনো তা পাওয়ারই ছিল না। আর যা পেয়েছে, কখনো তা হারানোরই ছিল না।"[১১০২]

তাকদিরে ঈমান আনার আবশ্যকতা বর্ণনার পাশাপাশি ইমাম রহ. একাধিক বক্তব্যে তাকদির অস্বীকার করা থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি নিজস্ব সনদে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে এ ব্যাপারে একাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। একটি বর্ণনায় তিনি (নাফে ইবনে উমর সূত্রে) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, **'এমন একটি সম্প্রদায় আসবে যারা বলবে, তাকদির বলতে কিছু নেই। যদি তোমরা তাদের পাও, তবে তাদের সালাম দেবে না। তারা অসুস্থ হলে দেখতে যাবে না। মারা গেলে তাদের জানাযা পড়বে না। কারণ, তারা দাজ্জালের অনুসারী, এই উম্মতের অগ্নিপূজারী। আল্লাহ তায়ালা তাদের সেসব লোকের সঙ্গেই একত্র করবেন।'**[১১০৩]

অপর আরেকটি বর্ণনায় তিনি (সালেম আবদুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রে) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়কে লানত করেছেন এবং বলেছেন, 'আমার পূর্বে আল্লাহ তায়ালা যত নবি প্রেরণ করেছেন, প্রত্যেকেই তাদের উম্মতকে তাদের থেকে সতর্ক করেছেন এবং তাদের লানত দিয়েছেন।' আরেকটি বর্ণনায় তিনি আলি রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, আলি রাযি. কুফার মিম্বরে বসে বলেন, 'যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস রাখবে না যে, ভালোমন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[১১০৪]

১১০২. প্রাগুক্ত (১৮)।

১১০৩. আল-উসুলুল মুনিফাহ (২৫)।

১১০৪. আল-উসুলুল মুনিফাহ (২৫)। জটিলতা হলো, খোদ ইমাম আজমের কোনো কোনো শাগরেদের ব্যাপারে তাকদির অস্বীকারের অভিযোগ উঠেছে। এটা ভিত্তিহীন বক্তব্য, বাতিল অপবাদ। এটা ঠিক সেই প্রকারের অপবাদ, যেমনটা ইমাম হাসান বসরির উপর তোলা হয়েছে। ইতিহাসের আরও বড় বড় ব্যক্তির উপর তোলা হয়েছে। স্বয়ং ইমামের নামে বিভিন্ন বিষয়ে অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, যার কিছু উদাহরণ আমরা এ গ্রন্থে আলোচনা করেছি। আবদুল মালেক ইবনে আবিশ শাওয়ারিব বসরার একটি প্রাচীন ভবনের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'এই ঘর থেকে আবু হানিফার মাযহাবের উপর সত্তর জন কাযি বের হয়েছেন। তাদের প্রত্যেকে তাকদির সাব্যস্ত করতেন। আল্লাহ তায়ালাকে ভালোমন্দ সবকিছুর স্রষ্টা বলতেন। এসব আকিদা তারা আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, যুফার, মুহাম্মাদ

মানুষ স্বাধীন নাকি পরাধীন? আল্লাহর ইচ্ছা ও মানুষের ইচ্ছার ভারসাম্য তাকদির নিয়ে আলোচনার শুরুতেই একটি জটিল প্রশ্নের উদয় হয়—যদি সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়, তবে মানুষের স্বাধীনতা কোথায়? তবে কি মানুষ স্বাধীন নয়? নাকি পরাধীন? এটা এমন এক প্রশ্ন যা যুগে যুগে মানুষকে ভাবিয়েছে, পেরেশান ও অস্থির করেছে, সংকটে ফেলেছে। মানুষ বিভিন্নভাবে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে। কেউ ডানে চলে গেছে, কেউ-বা বামে। কেউ সত্যের কাছাকাছি পৌঁছেছে, কেউ বিভ্রান্তির অতলান্তে তলিয়ে গিয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ দিয়েছে এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান—ওহিভিত্তিক সমাধান, মানবীয় বিবেকবোধ যা দিতে অক্ষম।

ইবনুল হাসান এবং তাদের শাগরেদদের ব্যাপারে বর্ণনা করতেন। (আকিদা ও) ফিকহের ক্ষেত্রে তারা আবু হানিফা এবং তাঁর এসব শাগরেদের অনুসারী ছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ কেবল ভালো সৃষ্টি করেছেন, মন্দ তাঁর সৃষ্টি নয়, সে তাকদিরকে অস্বীকারকারী বিদআতি গণ্য হবে। তার পিছনে নামায পড়া যাবে না।' [আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি; ১২৭-১২৯]

হাসান বসরি কি তাকদীর অস্বীকার করতেন? খোদ ইমাম আজম হাসান বসরির উপর উত্থাপিত অপবাদ মিথ্যারোপ করে বলেন, 'মানুষ হাসানের ব্যাপারে মিথ্যাচার করেছে। তাকে তাকদির অস্বীকারকারী বানিয়ে দিয়েছে।' [আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১২৯)] ইমাম আজম রহ. সত্য বলেছেন। কারণ, হাসান বসরির উপর এটা মিথ্যাচার। স্বয়ং হাসান বসরি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাকদিরকে অস্বীকার করল, সে যেন কুরআনকে অস্বীকার করল।' [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : কিতাবুল জামে : ২০০৮৫]

হুমাইদ বর্ণনা করেন, একবার হাসান বসরি মক্কা এলেন। মক্কার ফকিহগণ আমাকে বললেন আমি যেন তাকে কোনো একটা মজলিসে কিছু কথা ও নসিহত করার অনুরোধ করি। তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। মানুষ সমবেত হওয়ার পরে তিনি তাদের নসিহত করলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, আবু সাইদ, শয়তানকে কে সৃষ্টি করেছে? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সৃষ্টিকর্তা আছে নাকি? তিনিই শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ভালো সৃষ্টি করেছেন, মন্দকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন। তখন লোকটি বলল, তাদের সর্বনাশ হোক! তারা কীভাবে এই শায়খের নামে মিথ্যাচার করে! ইবনে আউন বলেন, আমি শামে গেলাম। হঠাৎ একব্যক্তি আমাকে পিছন থেকে ডাক দিলো। আমি পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম তিনি রজা ইবনে হাইওয়া। আমাকে তিনি বললেন, আবু আউন, লোকজন হাসানের নামে কী বলাবলি করছে? আমি তাকে বললাম, মানুষ হাসানের নামে অনেক মিথ্যা বলাবলি করে।

প্রশ্ন আসতে পারে, মানুষ হাসান বসরি ও ইমাম আজমের শাগরেদদের নামে কেন মিথ্যাচার করত? উক্ত মিথ্যাচারের কারণ ঠিক সেগুলো, যেগুলো তাদের নামে অন্যান্য অপবাদের ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিল। একদল সুবিধাবাদী, আরেকদল হিংসুক, যেমনটা আইয়ুব সাখতিয়ানি বলতেন। আবু দাউদ বর্ণনা করেন, আইয়ুব সাখতিয়ানি বলতেন, দুই শ্রেণির লোক হাসানের উপর মিথ্যাচার করেছে। এক. যারা নিজেরা তাকদির অস্বীকার করত। হাসানের নাম ব্যবহার করে তারা তাদের মতাদর্শ মানুষের মাঝে বিকাতে চেয়েছে। দুই. যারা হিংসুক ও বিদ্বেষগ্রস্ত। তারা বলত, সে কি এটা বলেনি? সে কি ওটা বলেনি? [আবু দাউদ : কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৬১৮-৪৬২২]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ আকিদা অনুযায়ী, মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, আবার পরাধীনও নয়। বরং মানুষের স্বাধীনতা এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর মুখাপেক্ষিতা, অন্যকথায়, আল্লাহর ইচ্ছা এবং মানুষের ইচ্ছার এক বিরল ভারসাম্যের উপর গোটা বিশ্বজগৎ দাঁড়ানো। এই ভারসাম্যের সুফলে মানুষ নিজের ইচ্ছামতো পৃথিবীতে জীবনযাপন করতে পারছে। আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো সবকিছু করতে পারছে না। এই ভারসাম্যের কারণে মানুষ অন্যায় করলে পরকালে সেটার দায়ভার নিতে হবে। আবার এই ভারসাম্যের কারণে মানুষ বিপদে আক্রান্ত হলে সেটাকে ভাগ্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারছে।

তাকদির বোঝার জন্য এই ভারসাম্য বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বরং এই ভারসাম্য উপলব্ধিই তাকদির অনুধাবনের মূল চাবিকাঠি। এটা না বোঝার ফলেই তাকদিরের ক্ষেত্রে একাধিক সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়েছে। এ কারণে ইমাম আজম বিভিন্ন জায়গায় সবিস্তারে এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা নিচে সংক্ষেপে সেগুলো উল্লেখ করার চেষ্টা করব :

ইমাম আজম রহ.-কে প্রশ্ন করা হলো—পৃথিবীর সবকিছু যদি আল্লাহর ইচ্ছাতে হয়ে থাকে, তবে তো মানুষ পরাধীন বিবেচিত হলো। তাহলে ভুল করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন? তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহ যদি চাইতেন সমগ্র সৃষ্টিকে ফেরেশতাদের মতো অনুগত বানাতে পারতেন কি না? তিনি বললেন, **'হ্যাঁ, পারতেন। কারণ, আল্লাহ বলেছেন,** ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ﴾ **অর্থ : 'তিনি তাঁর বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী।' [আনআম : ১৮]** তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহ যদি চাইতেন ইবলিসকে জিবরিলের মতো অনুগত বানাতে পারতেন কি না? তিনি বললেন, **'হ্যাঁ, অবশ্যই।'** তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মানুষ যখন ব্যভিচার করে, মদ্যপান করে, সেগুলো কি আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় না? তিনি বললেন, **'আলবত হ্যাঁ। পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়।'** তখন তাকে মূল প্রশ্ন করা হলো, তাহলে মানুষের কী দোষ? ইবলিসের কী দোষ? ব্যভিচারী ও মদ্যপের কী দোষ? কেন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে? সবকিছু তো আল্লাহর ইচ্ছাতেই হচ্ছে! ইমাম জবাবে বলেন, **'এসব কর্ম আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। কিন্তু আল্লাহর <u>ইচ্ছার</u> বিরোধিতার কারণে শাস্তি দেওয়া হয় না। বরং আল্লাহর <u>নির্দেশের</u> বিরোধিতার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়।** পৃথিবীতে এটা কোনো আশ্চর্য নিয়ম নয়। **যেমন—কারও যদি একজন গোলাম থাকে, সে যদি তাকে হত্যা করে, তবে আল্লাহর ইচ্ছাতেই হত্যা করল। কিন্তু তাতে মানুষ তার সমালোচনা করবে।**

আর যদি তাকে মুক্ত করে দেয়, সেটাও আল্লাহর ইচ্ছাতেই করল। কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষ তার প্রশংসা করবে। তাহলে দুটো কাজই আল্লাহর ইচ্ছাতে সংঘটিত হলেও একটিতে মানুষ সমালোচনা করে আরেকটিতে প্রশংসা করে। আল্লাহর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি এমন। পুণ্য ও পাপ দুটোই আল্লাহর ইচ্ছাতে সংঘটিত হয়। কিন্তু আল্লাহ পুণ্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং পুণ্য করলে তিনি সন্তুষ্ট হন। তাই তাকে পুরস্কৃত করেন। বিপরীতে তিনি পাপ থেকে বারণ করেছেন এবং পাপ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। ফলে পাপীকে শাস্তি দেবেন।'[১১০৫]

উপরের কথায় কারও কাছে জবাব স্পষ্ট নাও হতে পারে। এ জন্য ইমাম আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলেন, 'কুরআনের অসংখ্য আয়াতে ঈমান ও কুফর, হেদায়াত ও গোমরাহিসহ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাতে হয়—এ কথার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾ অর্থ : 'আর আপনার রব যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে তাদের সবাই সমবেতভাবে ঈমান আনত।' [ইউনুস : ৯৯] আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ অর্থ : 'আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদের অবতারণ করতাম, তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে পেশ করতাম, তবুও তারা কখনো বিশ্বাস স্থাপনকারী হতো না যদি না আল্লাহ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ।' [আনআম : ১১১] আরও বলেন, ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ অর্থ : 'আর কারও পক্ষে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ঈমান আনা সম্ভব নয়।' [ইউনুস : ১০০] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ অর্থ : 'আর আপনার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে সব মানুষকে একই জাতিসত্তায় পরিণত করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে।' [হুদ : ১১৮] আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ অর্থ : আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমরা কোনো ইচ্ছা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' [ইনসান : ৩০][১১০৬] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ অর্থ : 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মাঝে রাসুল প্রেরণ করেছি (এই দাওয়াত নিয়ে যে) তোমরা আল্লাহর

১১০৫. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৪-৫৫)।

১১০৬. প্রাগুক্ত (৫৭-৫৮)।

ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিচ্যুতি অবধারিত হয়ে গেছে।' [নাহল : ৩৬] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾ অর্থ : 'যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, তবে আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারী হয়ে যাব, অথচ তিনি আমাদের এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আর আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত এই প্রত্যাবর্তন সম্ভবও নয়।' [আরাফ : ৮৯] নুহ আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন, ﴿وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ অর্থ : 'আর আমি তোমাদের নসিহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের গোমরাহ করতে চান; তিনিই তোমাদের পালনকর্তা এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।' [হুদ : ৩৪][১১০৭]

উপরের সবগুলো আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, হেদায়াত ও গোমরাহির মালিক আল্লাহ তায়ালা। সৎপথ প্রদর্শন কিংবা বিচ্যুতকরণ, ইমান ও কুফর, ভালো ও মন্দ পথে গমন—সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর ইচ্ছাতে হয়। এসব আয়াত দ্বারা বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে, সৃষ্টির সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণের অধীন। অন্যকথায়, মানুষ পরাধীন!

এখানেই আহলে সুন্নাতের আলেমগণ শক্তভাবে দাঁড়িয়ে যান। তারা উপরের বক্তব্যকে কঠোরভাবে খণ্ডন করে বলেন, মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, আবার পুরোপুরি পরাধীনও নয়। বরং মানুষের স্বাধীনতা আর আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্ধারণ—দুটোর ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের উপর গোটা জীবন ও জগৎ প্রতিষ্ঠিত। এটার ব্যাখ্যা হলো—হ্যাঁ, মানুষের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে এবং আল্লাহর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। কিন্তু মানুষকে তিনি ঈমান ও কুফরের মাঝে, আলো ও কালোর মাঝে, হক ও বাতিলের মাঝে কোনোটা গ্রহণে বাধ্য করেননি; বরং তিনি তাকে দুটোর যেকোনো একটা বেছে নেওয়ার শক্তি ও স্বাধীনতা দান করেছেন। তাকে হেদায়াত ও সত্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। গোমরাহি ও মিথ্যা থেকে সতর্ক করেছেন। তবুও মানুষ মিথ্যাকে গ্রহণ করেছে। ফলে এর দায়ভারও কেবল তাকেই নিতে হবে।

১১০৭. প্রাগুক্ত (৫৮)।

"আল্লাহ তায়ালা সামুদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন, ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ অর্থ : 'আর সামুদ সম্প্রদায়কে আমি পথ প্রদর্শন করেছিলাম, কিন্তু তারা পথপ্রাপ্তির পরিবর্তে অন্ধত্বকেই বেছে নিল। ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের অবমাননাকর শাস্তি এসে পাকড়াও করল।' [ফুসসিলাত : ১৭] আর মানুষকে ভালোমন্দ, ঈমান ও কুফর গ্রহণের স্বাধীনতা ও নির্দেশ দেওয়ার পরও যখন মানুষ মন্দ ও কুফরকে গ্রহণ করেছে, তখন আল্লাহ তাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ অর্থ : 'তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই করো।' [ফুসসিলাত : ৪০] অন্যত্র বলেন, ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ অর্থ : 'যার ইচ্ছা ঈমান আনবে, আর যার ইচ্ছা কুফর করবে।' [কাহাফ : ২৯] এখানে মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই করবে সেটা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং হুঁশিয়ারি প্রদান উদ্দেশ্য।"[১১০৮]

এ কারণে ইমাম রহ. বলেন, **"পৃথিবীতে আল্লাহর ফয়সালার বাইরে গিয়ে কারও কিছু করার সাধ্য নেই। তবে কেউ কুফরে লিপ্ত হলে সেক্ষেত্রে আল্লাহকে জালেম বলার সুযোগ নেই। কারণ, আল্লাহ তাকে কুফরের নির্দেশ দেননি; বরং ঈমানের নির্দেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনের ফলে খোদ মানুষ জালেম সাব্যস্ত হবে। হ্যাঁ, আল্লাহ তাঁর কুফর চেয়েছেন। কিন্তু এই চাওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তিনি সেটা তার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। বরং তাকে ঈমান চিনিয়েছেন, তার কাছে ঈমান চেয়েছেন, ঈমানের নির্দেশ দিয়েছেন। ঈমান ও কুফর গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছেন।"**[১১০৯]

ইচ্ছা-আদেশ-সন্তোষ তিনের সম্পর্ক

আল্লাহর ইচ্ছার মাধ্যমেই জগতে সবকিছু হয়। পৃথিবীর সবকিছু এবং সবকিছুর ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছার অধীনে। তবে তাঁর ইচ্ছার একাধিক বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। তাঁর আদেশ ও সন্তোষের সঙ্গে ইচ্ছার একাধিক সম্পর্ক রয়েছে।

ইমাম আজম বলেন, **'আল্লাহর ইচ্ছা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। কখনো কখনো তিনি কোনো বিষয়ের আদেশ দেন, অথচ সেটার ইচ্ছা করেন না। আবার কখনো কোনো বিষয় ইচ্ছা করেন, অথচ সেটার আদেশ দেন না। যেমন—তিনি**

১১০৮. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৭)।

১১০৯. আল-উসুলুল মুনিফাহ (১৬)।

কাফেরকে ইসলামের আদেশ দিয়েছেন, অথচ সেই আদেশ সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের ইচ্ছা করেননি। বরং তিনি সেটা তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ, তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে কাফের মুসলিম হয়ে যেত। একইভাবে তিনি কাফেরের জন্য কুফরের ইচ্ছা করেছেন, ফলে কাফের কুফর করে। কিন্তু তিনি তাকে কুফরের আদেশ দেননি।'[১১১০]

অর্থাৎ, আল্লাহ কাফেরের জন্য কুফরের ইচ্ছা করলেও তিনি তাকে কুফরের আদেশ দেননি কিংবা বাধ্য করেননি। বরং (সে কুফর করবে জেনে) তার জন্য কুফরের ইচ্ছা করে তাকে ঈমান ও কুফর অবলম্বনের এখতিয়ার দিয়েছেন। দুটোর মাঝে যেকোনো একটা গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছেন। কারণ, তিনি কাফেরকে ইসলামের নির্দেশ দিয়েছেন। যদি তাকে কুফরের উপর বাধ্যই করতেন, তবে এমন নির্দেশ দিতেন না। দিলে সেটা অর্থহীন কাজ হতো। আল্লাহ এমন কাজ থেকে পবিত্র।

অপরদিকে আদেশ ও সন্তোষের মাঝেও সম্পর্কের একাধিক দিক রয়েছে। কখনো কখনো আল্লাহ অনেক বিষয় পছন্দ করেন, কিন্তু আদেশ দেন না। যেমন—তিনি নফল নামায পছন্দ করেন, কিন্তু সেটা আদেশ দেননি (অর্থাৎ আবশ্যক করেননি)। **তবে তিনি কখনো এমন আদেশ দেন না যা তিনি পছন্দ করেন না। বরং তিনি যা আদেশ দেন সবগুলোই পছন্দ করেন।**[১১১১]

মুহাম্মাদ রহ.-এর বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আল্লাহর আদেশকে দুই ভাগে ভাগ করেন—এক. সৃষ্টিসংশ্লিষ্ট আদেশ। এখানে আদেশ ও ইচ্ছা দুটোরই সমন্বয় ঘটে। এটা চূড়ান্ত। এখানে তিনি যা আদেশ করেন সেটাই হয়। তবে এক্ষেত্রে সন্তোষ থাকা আবশ্যক নয়। দুই. ওহির আদেশ। এখানে সন্তোষ থাকা জরুরি। তবে এটা চূড়ান্ত নয়। ফলে এখানে আদেশ দিলেও ইচ্ছা করেন না, ইচ্ছা করলেও আদেশ দেন না। যেমন—ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে তাঁর ছেলে ইসমাইলকে যবেহ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখানে তার আদেশ ছিল, কিন্তু ইচ্ছা ছিল না। ফলে আল্লাহর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়েছে।[১১১২] একইভাবে আল্লাহ সকল মানুষকে ঈমানের আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু ইচ্ছা করেননি। ফলে সেটা বাস্তবায়িত হয় না। সকল মানুষ ঈমান আনে না। যদি তিনি চূড়ান্ত ইচ্ছা করতেন, তবে সবাই ঈমান

১১১০. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৩)।

১১১১. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৩)।

১১১২. আল-উসুলুল মুনিফাহ (১৫)।

আনত। কিন্তু চূড়ান্ত ইচ্ছা করলে মানুষের স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকত না। এ জন্য তিনি চূড়ান্ত ইচ্ছা করেননি।

ফলে আল্লাহর ইচ্ছা দুই ধরনের—প্রথমটা হলো প্রকৃতই ইচ্ছা। চূড়ান্ত ইচ্ছা। এখানে ইচ্ছা ও নির্দেশ দুটোই বিদ্যমান। ফলে এটার বিপরীত হতে পারবে না। এটা হলো পৃথিবীর পরিচালনাসংক্রান্ত ইচ্ছা ও নির্দেশ। এখানে আল্লাহর ভালোবাসা থাকা জরুরি নয়। যেমন—আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিপদে ফেলেন, কারও বাচ্চা নিয়ে নেন, কারও প্রিয়জনকে দূরে সরিয়ে দেন, ঝড়-তুফান দিয়ে কারও ঘড়বাড়ি ধ্বংস করে ফেলেন ইত্যাদি। এগুলো পৃথিবীর শৃঙ্খলা এবং আল্লাহর 'হিকমত' তথা প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আল্লাহ এগুলো ভালোবাসেন এমন নয়। যেমন—এক হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা (তাঁর প্রিয় বান্দা সম্পর্কে) বলেছেন, 'সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, কিন্তু আমি তাকে কষ্ট দিতে অপছন্দ করি।[১১১৩] অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাকে মৃত্যু দিয়ে কষ্ট দিতে পছন্দ করেন না। তবুও মৃত্যু দিতেই হয়। পৃথিবীর নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং হিকমতের কারণে তিনি এমন করেন। এক কথায়, এখানে আল্লাহর পছন্দ ও ভালোবাসা নেই, চূড়ান্ত ইচ্ছা ও আদেশ রয়েছে। ফলে এটা অনিবার্য।

দ্বিতীয় প্রকারের ইচ্ছাটা হলো ভালোবাসা, পছন্দ করা; প্রকৃত রূপে ইচ্ছা নয়। কারণ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সেটার বিপরীত হতে পারবে না। ফলে এখানে 'ইচ্ছা' শব্দটা ব্যবহার করা হলেও এটার মর্ম হলো পছন্দ, চাওয়া। যেমন—আল্লাহ চান সকল কাফের মুসলিম হয়ে যাক। আল্লাহ চান সবাই জান্নাতে যাক। তাই সবাইকে ঈমানের আদেশও দিয়েছেন। কিন্তু এটা তাঁর পছন্দ এবং ওহির আদেশ, চূড়ান্ত ইচ্ছা নয়। ফলে সবাইকে মুসলিম হওয়ার আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও, এটা আল্লাহর পছন্দ সত্ত্বেও সকল কাফের মুসলিম হয় না। কারণ, চূড়ান্ত ইচ্ছা নেই। চূড়ান্ত ইচ্ছা থাকলে তাঁর ইচ্ছার বাইরে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই। এটাই আল্লাহর আদেশ, ইচ্ছা ও সন্তোষের আন্তঃসম্পর্কের সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা।[১১১৪]

১১১৩. বুখারি (৬৫০২)। বাইহাকি (সুনানে কুবরা) (৬৪৮৬)। মুসনাদে আবি ইয়ালা (৭০৮৭)।

১১১৪. দেখুন : আল ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ, নাসাফি (২০৮)। ইমাম আবু হানিফা রহ. 'ইরাদাহ' ও 'মাশিআহ'-এর মাঝে পার্থক্য করতেন। তাঁর মতে, ইরাদার মাঝে 'তালাব' (চাওয়া, প্রত্যাশা) ও সন্তুষ্টি বিদ্যমান। কিন্তু

উপরের আলোচনায় আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। তা হলো—আল্লাহর জাগতিক নির্দেশ এবং শরয়ি নির্দেশের মাঝে পার্থক্য। জাগতিক নির্দেশ চূড়ান্ত, কিন্তু তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা জরুরি নয়। যেমন—আল্লাহ ঝড়-তুফান দিয়ে শহর ধ্বংস করেন, মানুষকে মৃত্যু দেন, বিপদে ফেলেন। এগুলো সব তাঁর ইচ্ছাতে হয়। কিন্তু তিনি বান্দাকে কষ্ট দিতে পছন্দ করেন না। বিপরীতে শরয়ি নির্দেশ তাঁর সন্তোষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ফলে এক্ষেত্রে তিনি যা নির্দেশ দেন সবগুলোই তাঁর পছন্দ। তিনি অপছন্দ করেন এমন কোনো বিষয়ের (শরয়ি) নির্দেশ দেন না।

প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তোষের মাঝে সম্পর্ক কী? ইমাম বলেন, **'যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ মানে, সে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তোষ দুটোই বাস্তবায়ন করে। যেমন—কাফের যদি মুসলিম হয়ে যায়, তবে তাতে আল্লাহর আদেশ, ইচ্ছা ও সন্তোষ সবগুলোই রয়েছে। বিপরীতে যে আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করে, সেখানে আল্লাহর ইচ্ছা থাকলেও সন্তোষ থাকে না। যেমন—কাফের যদি কুফর করে, সেটা আল্লাহর আদেশ ও সন্তোষ দুটোরই বিপরীত। কিন্তু সেখানে আল্লাহর ইচ্ছা রয়েছে। ইচ্ছা না থাকলে কুফর করতে পারত না।'**[১১১৫]

আল্লাহর সৃষ্টি ও সন্তোষের মাঝে কী সম্পর্ক? ইমাম বলেন, **'আল্লাহ কুফর সৃষ্টি করাকে পছন্দ করেছেন, ফলে সেটা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি কুফরকে পছন্দ করেন না।'** প্রশ্ন হতে পারে, যদি আল্লাহ কোনো জিনিস পছন্দ না করেন, তবে সেটা সৃষ্টি করলেন কেন? ইমাম উত্তরে বলেন, **'সৃষ্টির সম্পর্ক ইচ্ছার সঙ্গে, পছন্দের সঙ্গে নয়। ফলে আল্লাহ কুফরকে সৃষ্টি করেছেন। কারণ, তিনি কাফেরদের জন্য কুফরের ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু তিনি কুফরকে পছন্দ করেন না। যেমন—তিনি ইবলিস সৃষ্টিকে পছন্দ করেছেন, ফলে তাকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু স্বয়ং ইবলিসকে তিনি পছন্দ করেন না। একইভাবে তিনি মদ, শূকর—এগুলোর সৃষ্টিকে পছন্দ করেছেন, কিন্তু এগুলোকে তিনি পছন্দ করেন না। কারণ, এগুলোকে তিনি পছন্দ**

মাশিআহর মাঝে সেটা বিদ্যমান নেই। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফি আলেমের কাছে 'ইরাদা' ও 'মাশিআহ' সমার্থক। দুটোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (৫২)। তালখিসুল আদিল্লাহ (৭৩৮)। আল-জাওহারাতুল মুনিফাহ, মোল্লা হুসাইন হানাফি (৬০)। শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (২০)।

১১১৫. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৩)।

করলে এগুলো অবলম্বন করা নিষিদ্ধ হতো না। বরং কেউ এগুলো গ্রহণ করলে আল্লাহর সন্তোষজনক বস্তুই গ্রহণ করা হতো।'[১১১৬]

আল্লাহর আদেশ-ইচ্ছা-সন্তোষ-তাকদির ইত্যাদির মাঝে সম্পর্ক আরও স্পষ্ট হয় ইমামের ওসিয়তে। তিনি সেখানে এগুলোর সঙ্গে সম্বন্ধের ভিত্তিতে আমলকে তিনভাগে ভাগ করেছেন : **এক. ফরয, যাতে উপরের সবগুলো বিদ্যমান তথা আল্লাহর আদেশ, ইচ্ছা, সন্তুষ্টি, পছন্দ, নির্ধারণ, সৃষ্টি, হুকুম, ইলম, তৌফিক, লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ সবকিছু এতে পাওয়া যায়। দুই. ফযিলত (তথা নফল আমল), যাতে আল্লাহর ইচ্ছা, সন্তুষ্টি, পছন্দ, নির্ধারণ, সৃষ্টি, হুকুম, ইলম, তৌফিক ও লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ পাওয়া গেলেও আদেশ অনুপস্থিত। কারণ, আল্লাহ এটা করার আদেশ দেননি (অর্থাৎ ওয়াজিব করেননি)। তিন. পাপ ও অবাধ্যতা। এতে আল্লাহর ইচ্ছা পাওয়া গেলেও আদেশ পাওয়া যায় না। এটা আল্লাহর ফয়সালা হলেও তাতে তাঁর সন্তোষ ও পছন্দ বিদ্যমান নেই। আল্লাহর নির্ধারণ হলেও তাতে তার তৌফিক নেই। এখানে বান্দাকে তিনি পরিত্যাগ করেন, সাহায্য করেন না। এটাও লাওহে মাহফুজে লিখিত।**[১১১৭]

মোটকথা, তিন প্রকারের আমলই আল্লাহর জ্ঞান, নির্ধারণ ও লাওহে মাহফুজে লিখিত। কিন্তু প্রথমটা তথা ফরযের মাঝে তার ইচ্ছা, আদেশ ও সন্তুষ্টি তিনটিই বিদ্যমান। দ্বিতীয়টা তথা নফলে ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকলেও আদেশ (আবশ্যকীকরণ) বিদ্যমান নেই। তৃতীয়টা তথা গুনাহে ইচ্ছা বিদ্যমান থাকলেও আদেশ ও সন্তুষ্টি বিদ্যমান নেই। ইচ্ছাটা এখন বিদ্যমান থাকা জরুরি। কারণ, পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। তিনি ইচ্ছা না করলে কিছু হবেই না। ফলে কেউ গুনাহের ইচ্ছা করলে তিনিও চাইলে সেটার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তিনি গুনাহের নির্দেশ দেন না, তাতে সন্তুষ্টও হন না। সেক্ষেত্রে তিনি বান্দাকে সাহায্য করেন না। এর পরও যদি বান্দা সেটা করে, তবে এর দায়ভারও তার।

ইনসাফ ও অনুগ্রহ : তাকদির বোঝার গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি

'ইচ্ছা', 'আদেশ' ও 'সন্তোষ'—এই তিনের সম্পর্ক তাকদির রহস্যের এক বিশাল জট খুলে দেয়। সেটা হলো—আল্লাহর ইনসাফ ও অনুগ্রহের মাঝে

১১১৬. প্রাগুক্ত (৫৪)।

১১১৭. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৩৫-৩৭)। উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (৫২)।

তাকদিরের আবর্তন। ইমাম আজম রহ. বলেন, **'আল্লাহর সকল আনুগত্য সংঘটিত হয় তাঁর আদেশ, ভালোবাসা, সন্তোষ, ইলম, ইচ্ছা, ফয়সালা ও তাঁর নির্ধারণে। আর তাঁর অবাধ্যতাও সংঘটিত হয় তাঁর জ্ঞান, ফয়সালা, নির্ধারণ ও ইচ্ছায়; কিন্তু তাঁর ভালোবাসা, সন্তুষ্টি ও আদেশে নয়।'**[১১১৮] অর্থাৎ, মানুষকে যেহেতু আল্লাহ ভালোমন্দ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন, এ কারণে মানুষ আল্লাহর আনুগত্য কিংবা অবাধ্যতা দুটোর যেকোনো একটা বেছে নিতে পারে। কোনটা বেছে নেবে সেটা তিনি আগেই জানেন এবং সংঘটনের অনুমতি দেন আর লাওহে মাহফুজে সেটা লিখে রাখেন। ফলে মানুষ আনুগত্য অথবা অবাধ্যতা দুটোর যেটাই বেছে নিক, সেটা আল্লাহর জ্ঞান, ইচ্ছা ও ফয়সালার অধীনেই হচ্ছে। তবে দুটোর মাঝে পার্থক্য হলো, মানুষ যখন আনুগত্যের পথ বেছে নেয়, আল্লাহ তখন সন্তুষ্ট হন, ভালোবাসেন এবং সেটা করার নির্দেশ দেন। বিপরীতে যখন অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন সেটা ভালোবাসেন না, সন্তুষ্ট হন না এবং অবাধ্য হওয়ার নির্দেশও দেন না। কিন্তু তিনি ইচ্ছা ও নির্ধারণ করেন। কারণ, তাঁর ইচ্ছা ও নির্ধারণ না থাকলে মানুষ কোনো কাজই করতে পারবে না। সে পরাধীন হয়ে পড়বে।

ফলে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়ে তৈরি করলেও আল্লাহর পছন্দ হলো মানুষ সবসময় ভালো কাজ করুক, আনুগত্যের পথে চলুক। কেউ এটা করলে আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেন। কেউ অবাধ্যতার পথে চললে তাঁর প্রতি ইনসাফ করেন, কিন্তু জুলুম করেন না। ইমাম লিখেন, **'আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি করুণাময় ও ইনসাফগার। কখনো করুণা প্রদর্শন করে বান্দা পুণ্য করলে যতটুকু উপযুক্ত তারচেয়ে অনেক বেশি প্রতিদান প্রদান করেন; আর পাপ করলে কখনো ইনসাফের কারণে পাপের শাস্তি দেন, আবার কখনো করুণা করে ক্ষমা করে দেন।'**[১১১৯] যেমন—কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَاۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ﴾ অর্থ : 'কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে, আর কেউ কোনো অসৎকাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেওয়া হবে, আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।' [আনআম : ১৬০] আরও বলেন, ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ

১১১৮. আল-ফিকহুল আকবার (৪)। আকিদাহ রুকনিয়্যাহ (২১)।

১১১৯. আল-ফিকহুল আকবার (৬-৭)।

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ অর্থ : 'যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শিষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শিষে একশো করে দানা থাকে। আল্লাহ যার জন্য চান দ্বিগুণ করে দেন। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।' [বাকারা : ২৬১] অন্য আয়াতে বলেন, ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ অর্থ : 'তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে, তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করে দেন।' [শুরা : ৩০] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একটি হাদিসে বলেন, আদম সন্তান (মানুষের) প্রত্যেকটি পুণ্য দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।[১১২০]

আল্লাহর অনুগ্রহ ও ইনসাফের আরও প্রকট উদ্ভাস ঘটে আনুগত্য ও অবাধ্যতা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে ইমাম বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা পথচ্যুত করেন। এটা তাঁর ইনসাফ। পথচ্যুত করার অর্থ হলো পরিত্যাগ করা। আর পরিত্যাগ করার অর্থ হলো বান্দাকে তাঁর সন্তোষজনক কাজের তৌফিক না দেওয়া। এটা তাঁর ইনসাফ। ফলে বান্দা তখন গুনাহ করলে সেটার শাস্তি প্রদানও ইনসাফ।'**[১১২১] ইমাম তহাবিও একই কথা এভাবে বলেন, 'তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে নিজ অনুগ্রহপূর্বক সঠিক পথে পরিচালিত করেন, সুরক্ষিত রাখেন, সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা ইনসাফপূর্বক তার নিজের উপর ছেড়ে দেন, বিপথগামী করেন, পরীক্ষায় ফেলেন। সকলেই তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর অনুগ্রহ ও ইনসাফের মাঝে আবর্তিত হয়।'[১১২২] আবু হাফস বলেন, 'আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো এই বিশ্বাস রাখা যে, 'সৌভাগ্যবানের দুর্ভাগা হওয়া আল্লাহর ইনসাফ। আর দুর্ভাগার সৌভাগ্যবান হওয়া আল্লাহর অনুগ্রহ।'[১১২৩]

ইমামদের উপরের সবগুলো বক্তব্যের অর্থ হলো : মানুষকে আল্লাহ স্বাধীনতা ও ভালোমন্দ বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছেন। তবে মানুষ দুর্বল। মানুষ সবসময়

১১২০. মুসলিম (কিতাবুস সিয়াম : ১১৫১)। সুনানে ইবনে মাজা (আবওয়াবুস সিয়াম : ১৬৩৮)।
১১২১. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।
১১২২. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১১)।
১১২৩. আস-সাওয়াদুল আজম (৪)।

নিজের ভালো নিজে বেছে নিতে পারে না। প্রবৃত্তি ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মানুষের ফিতরত নষ্ট হয়ে যায়। হৃদয়ে কালিমা জমে যায়। ফলে এক্ষেত্রে মানুষকে যদি আল্লাহ সবসময় তাদের নিজেদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেন, তবে দুর্বল মানুষ পথ হারাবে, হোঁচট খাবে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নানা মুসিবতে আক্রান্ত হবে। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের সবসময় তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেন না, বরং কিছু বান্দার প্রতি অনুগ্রহ ও করুণার দৃষ্টিতে তাকান। তাদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পথচ্যুত হতে দেখে নিজ থেকে তাদের রক্ষা করেন। মহব্বতের কাউকে যখন নিজের কর্মের কারণে বিপদে পড়তে দেখেন, তার কাছ থেকে বিপদ সরিয়ে নেন। পছন্দের কাউকে যখন শয়তানের পথে হাঁটতে দেখেন, তাঁর দয়ার সাগর উথলে ওঠে। তিনি বান্দার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজে অনুগ্রহপূর্বক তাকে গোমরাহি থেকে রক্ষা করেন। এভাবে একদল বান্দা স্বাধীনতার অপব্যবহার করে অনিবার্য ধ্বংসের পথে ছোটা শুরু করলে আল্লাহর অনুগ্রহ তাকে হেফাজত করে। কিন্তু আল্লাহ সবার ক্ষেত্রে এটা করেন না। বরং আরেক দলকে নিজেদের ইচ্ছার উপরই ছেড়ে দেন। তারা নিজেদের স্বাধীন শক্তি ব্যবহার করে পথচ্যুত হয়ে গেলে আল্লাহ সেগুলো পর্যবেক্ষণ করেন, তথাপি তাদের বিচ্যুতি থেকে ফিরিয়ে রাখেন না। বরং তাদের কর্মফলস্বরূপ বিপথগামী করেন, বিভিন্ন মুসিবত ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। এটা তাঁর ইনসাফ। কারণ, তিনি নিজ থেকে বান্দাকে এমন পরিস্থিতিতে নিয়ে আসেন না, বরং বান্দার কর্মফলের উপর ছেড়ে দেন মাত্র। তাকে অনুগ্রহ ও সহায়তা পরিত্যাগ করেন মাত্র।

ইমাম বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকে কুফর ও ঈমান থেকে বিমুক্ত সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাদের ঈমানের আদেশ দিয়েছেন, কুফর থেকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তারা কেউ ঈমান গ্রহণ করেছে, আবার কেউ কুফর গ্রহণ করেছে। যারা ঈমান এনেছে, তারা নিজেদের ইচ্ছাতেই এনেছে। কিন্তু আল্লাহ তাদের তৌফিক দিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন। বিপরীতে যারা কুফর গ্রহণ করেছে, সেটাও তাদের ইচ্ছায় করেছে। তবে এক্ষেত্রে মূল কারণ আল্লাহ তাকে ঈমান গ্রহণে সহায়তা করেননি কিংবা কুফর গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াননি। ফলে দুজনের মাঝে পার্থক্য এটুকুই যে, প্রথম জনকে তিনি সাহায্য করেছেন, দ্বিতীয় জনকে করেননি। কিন্তু এটা জুলুম নয়। বরং প্রথম জনের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেছেন আর দ্বিতীয় জনের প্রতি ইনসাফ করেছেন।'** ইমাম আরও বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকে কুফর ও ঈমান থেকে বিমুক্ত সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাদের সম্বোধন করেছেন, আদেশ দিয়েছেন, নিষেধ করেছেন। অতঃপর তাদের কেউ কেউ কুফরি করেছে স্বেচ্ছায় স্বীয় কর্মের**

দ্বারা। কিন্তু তার এই কুফরির কারণ হলো, আল্লাহ তাকে সাহায্য পরিত্যাগ করেছেন। আর কেউ কেউ ঈমান এনেছে স্বেচ্ছায় স্বীয় কর্মের দ্বারা। কিন্তু তার এই স্বীকৃতি ও সত্যায়নের কারণ হলো, আল্লাহ তাকে তৌফিক দিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন।'[১১২৪]

প্রশ্ন হতে পারে, একদলকে অনুগ্রহ করে আরেক দলকে ইনসাফ করাই কি খোদ বেইনসাফি নয়? একদলকে নিজ উদ্যোগে অনিবার্য ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে অনুগ্রহ করা, আরেক দলকে তাদের অনিবার্য ধ্বংসের পথে ছেড়ে দিয়ে ইনসাফ করা কি একধরনের জুলুম নয়? কারণ, আল্লাহ চাইলে তো দ্বিতীয় দলকেও অনুগ্রহ করতে পারতেন! তারাও প্রথম দলের মতো বেঁচে যেত। উত্তর হলো, না। একজনকে অনুগ্রহ করা আর অন্যজনকে অনুগ্রহ পরিত্যাগ করা জুলুম নয়। কারণ, এখানে প্রথম জনকে অনুগ্রহ করা হচ্ছে তাঁর অনুগ্রহভাজন হওয়ার উপযুক্ততার কারণে। দ্বিতীয় জনকে অনুগ্রহ করা হচ্ছে না। কারণ, সে অনুগ্রহের উপযুক্ত নয়। ফলে দ্বিতীয় জনের প্রতি কোনো জুলুম করা হচ্ছে না। তাঁর প্রতি যেটা করা হচ্ছে সেটা হলো ইনসাফ। সে যদি নিজের কর্মফলে কিংবা যেকোনো কারণে আল্লাহর অনুগ্রহের পাত্র হতো, আল্লাহ তাকেও অনুগ্রহ করতেন। কিন্তু সেটা হয়নি। ফলে আল্লাহ তাকে ইনসাফ করছেন। এটার উপর কোনো আপত্তি করা যায় না। আপত্তি করা যেত, যদি তার প্রতি ক্রোধ কিংবা অন্য কোনো কারণে জুলুম করতেন। কিন্তু আল্লাহ সব ধরনের জুলুম থেকে মহাপবিত্র। এ অর্থেই রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যদি আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীর সবাইকে শাস্তি দান করেন, তবে তিনি শাস্তি দিতে পারেন এবং সেটা জুলুম হবে না। আর যদি তিনি তাদের অনুগ্রহ করেন, তবে সেটা তাদের আমলের চেয়ে কল্যাণকর হবে।'[১১২৫] এ অর্থে ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আজম আতা ইবনে আবি রাবাহের এই বক্তব্য নকল করেন, **'যদি আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও যমিনের সকল অধিবাসীকে শাস্তি দান করেন, তবুও তিনি জালেম হবেন না। কারণ, তিনি তাদের সৎপথের সন্ধান দিয়েছেন। তাদের হৃদয়ে সেটা ঢেলে দিয়েছেন। তাদের সে পথে সবরের তৌফিক দিয়েছেন। এসবের উর্ধ্বে, তিনি তাদের জীবন ও জগৎকে নিয়ামতে ভরপুর করে দিয়েছেন। তিনি যদি তাদের থেকে সেসব**

১১২৪. আল-ফিকহুল আকবার (৩-৪)।

১১২৫. সুনানে ইবনে মাজা (আবওয়াবুস সুন্নাহ : ৭৭)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুল আনসার : ২২০১২)।

নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা চান, তবে তারা কখনোই আদায় করতে পারবে না। এই কৃতজ্ঞতা আদায় করতে না পারার অপরাধে তিনি তাদের শাস্তি দিতে পারেন এবং সে ক্ষেত্রে তা মোটেও জুলুম হবে না।'[১১২৬]

কাউকে অনুগ্রহ আর কাউকে ইনসাফের রহস্য : প্রশ্ন হতে পারে, প্রথম জনকে অনুগ্রহ ও সহায়তা করা আর দ্বিতীয় জনকে অনুগ্রহ ও সহায়তা পরিহার করে ইনসাফ করার মাঝে বিশেষ কোনো কারণ আছে কি?

যেমনটা পিছনে বলেছি, হ্যাঁ আছে। কুরআন ও সুন্নাহতে আমরা এর উত্তর পাই। আল্লাহ বলেন, : 'فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۝٧ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝٨ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۝١٠' অর্থ : 'অতএব, যে দান করে, আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্যায়ন করে, আমি তার জন্য সুখের বিষয়কে সহজ করে দেবো। আর যে কৃপণতা করে, মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উত্তম বিষয়কে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য দুঃখের পথ সহজ করে দেবো।'[১১২৭] [লাইল : ৫-১০] উক্ত আয়াতে স্পষ্ট যে, প্রথম জনকে আল্লাহ সুখের পথ সহজ করে দেন। কারণ, সে আল্লাহকে ভয় করে, সদকা করে, দ্বীন ও ঈমানকে সত্যায়ন করে। আর দ্বিতীয় জনের জন্য দুঃখের পথ সহজ করে দেন (অনুগ্রহ করে সুখের পথ দেখান না)। কারণ, সে মুখ ফিরিয়ে নেয়, দ্বীন ও ঈমান অস্বীকার করে। ফলে অনুগ্রহ ও ইনসাফের পাত্র হওয়ার ক্ষেত্রেও মানুষের কর্মফলের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

অন্য আরেকটি আয়াতেও বিষয়টি স্পষ্ট। আল্লাহ বলেন, ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন।' [ইউনুস : ৪৪] অর্থাৎ, দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আল্লাহর অনুগ্রহ নিঃসন্দেহে। কিন্তু নিজেকে এই অনুগ্রহপ্রাপ্তির উপযুক্ত বান্দার নিজেকেই হতে হয়। যে আল্লাহর অভিমুখী হয়, আল্লাহর দিকে ছুটে যায়, আল্লাহ তাকে হেদায়াত দেন। যার হেদায়াতের সদিচ্ছা থাকে না, চেষ্টা থাকে না, আল্লাহ তাকে হেদায়াত দেন না। ফলে আল্লাহ যাকে সাহায্য পরিত্যাগ করেন সেটা তার অহংকার, সত্য প্রত্যাখ্যানের দম্ভ এবং একগুঁয়েমির কারণে করেন। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ

১১২৬. আল-উসুলুল মুনিফাহ (২০-২১)।

১১২৭. বুখারি (৪৯৪৯)। মুসলিম (২৬৪৭)।

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ অর্থ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষকে একবিন্দু জুলুম করেন না, বরং মানুষ নিজেদের উপর জুলুম করে।' [ইউনুস : ৪৪]

আরেকটি উত্তর হচ্ছে, 'রুহের জগতে **আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানকে তাঁর (আদমের) পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেছেন। তাদের জ্ঞান দান করেছেন। তাদের সম্বোধন করে ঈমানের নির্দেশ দিয়েছেন। কুফরি থেকে বারণ করেছেন। তখন তারা আল্লাহর রবুবিয়্যাহকে স্বীকার করে নিয়েছিল। আর এভাবেই তারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল। পরবর্তীকালে আদম সন্তান সেই ফিতরত (ঈমানের প্রস্তুতির) উপরই জন্মলাভ করে। সুতরাং পরে যে কুফরি করল, সে মূলত (তার প্রতিশ্রুতি) বদলে ফেলল। আর যে ঈমান আনল এবং সত্যায়ন করল, সে (প্রতিশ্রুতির উপর) অটল ও অবিচল রইল। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কাউকে কুফর বা ঈমানের উপর বাধ্য করেননি, কিংবা কাউকে মুমিন বা কাফের হিসেবে সৃষ্টি করেননি; বরং সবাইকে সৃষ্টি করেছেন ব্যক্তি (মানুষ) হিসেবে।'**[১১২৮] ফলে একজনকে সাহায্য করা অন্যজনকে না করা জুলুম নয়, বরং এটাও তাদের কর্মের প্রতিদান।

রুহের জগতে প্রতিশ্রুতি নেওয়ার রহস্য : প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ তায়ালা কেন আমাদের থেকে রুহের জগতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন? সেটা করে তো উলটো আমাদের ক্ষতি করলেন। কারণ, সে প্রতিশ্রুতি আমাদের মনে নেই; অথচ সে কারণে এখন আমাদের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। এর উত্তর হলো, আল্লাহ তায়ালা নিজেই আমাদের সেটা পরীক্ষার জন্য ভুলিয়ে দিয়েছেন। সেটা মনে থাকলে তো আর পরীক্ষা হতো না। কারণ, দুনিয়ার বাইরের সব বিষয় হলো গায়েবি তথা অদৃশ্যের। এক্ষেত্রে ঈমানই একমাত্র পথ। সুতরাং সেই প্রতিশ্রুতি মনে না থাকলেও ঈমানের মাধ্যমে সেটার অস্তিত্ব ও সত্যতার ব্যাপারে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। তবে আল্লাহ এখানেই আমাদের ছেড়ে দেননি। কেবল সেই প্রতিশ্রুতি উপর ভিত্তি করে আমাদের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের ফয়সালা করেননি; বরং পৃথিবীতে পাঠানোর পর তিনি আমাদের কাছ থেকে আবার সেই প্রতিশ্রুতি নবায়ন করেছেন। বিস্মৃত প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন, অসংখ্য আসমানি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং এর পর আর কোনো অজুহাত পেশ করার সুযোগ নেই।[১১২৯]

১১২৮. আল-ফিকহুল আকবার (৩-৪)।
১১২৯. শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১২৮)।

তাই আমাদের মনে রাখতে হবে—যেমনটা ইমাম বলেন, **'আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কাউকে কুফর বা ঈমানের উপর বাধ্য করেননি; কিংবা কাউকে মুমিন বা কাফের হিসেবে সৃষ্টি করেননি; বরং সবাইকে সৃষ্টি করেছেন ব্যক্তি (মানুষ) হিসেবে।'**[১১৩০] কারণ, কাউকে মুমিন হিসেবে সৃষ্টি করলে পৃথিবীতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো অর্থহীন হতো। তা ছাড়া, এটা কাফেরদের প্রতিও জুলুম হতো। একইভাবে কাউকে কাফের হিসেবে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো অর্থহীন হতো। তা ছাড়া, এটা তাদের প্রতিও জুলুম হতো। ফলে আল্লাহ সবাইকে স্বাধীনভাবে ফিতরতের উপর সৃষ্টি করেছেন। ভালোর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং মন্দের প্রতি স্বাভাবিক বিকর্ষণ তৈরি করে দিয়েছেন [হুজুরাত : ৭]। এর পর ভালোমন্দ কর্ম প্রত্যেকে নিজে বেছে নেয়। ফলে প্রত্যেককে তার কর্মের দায়ভার বহন করতে হবে।

ইমাম তহাবি বলেন, 'সবকিছু তাঁর ইচ্ছা, জ্ঞান, ফয়সালা এবং নির্ধারণ অনুযায়ীই সম্পাদিত হয়। তাঁর ইচ্ছা সকল ইচ্ছার উপর বিজয়ী। তাঁর ফয়সালা সকল কলাকৌশল এবং উপায়-উপকরণের ঊর্ধ্বে। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। কিন্তু তিনি কাউকে কখনো জুলুম করেন না। তিনি যা করেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হন না, কিন্তু তারা জিজ্ঞাসিত হবে।'[১১৩১] ইমাম তহাবি অন্যত্র বলেন, "আল্লাহ মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেননি। একইভাবে মানুষ ততটুকুই সাধ্য রাখে যতটুকু আল্লাহ তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। এটাই 'লা হাওয়া ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'র অর্থ। ফলে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারও কোনো উপায় নেই, নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। তাঁর সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে বাঁচার পথ নেই, তাঁর আনুগত্য করা এবং আনুগত্যে অবিচল থাকার সুযোগ নেই।"[১১৩২]

এ ব্যাপারে ইমাম রহ. নিজস্ব সনদে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। সুরাকা ইবনে মালেক রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা যে কাজগুলো করি, সেগুলো কি তাকদিরে লিখিত, নাকি আমরা নিজেদের মতো করে করি? আল্লাহর রাসুল বললেন, 'তাকদিরে লিখিত।' তখন কেউ বললেন, তাহলে আমল করে কী লাভ? তিনি বললেন, 'আমল করতে থাকো। প্রত্যেকের জন্য তা-ই সহজ করে দেওয়া হবে যার জন্য তাকে

১১৩০. আল-ফিকহুল আকবার (৩-৪)।

১১৩১. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৭-২৮)।

১১৩২. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৭)।

সৃষ্টি করা হয়েছে।' অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন: 'فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۝ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۝' অর্থ : 'অতএব, যে দান করে, আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্যায়ন করে, তার জন্য সুখের বিষয়কে সহজ করে দেবো। আর যে কৃপণতা করে, মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উত্তম বিষয়কে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য দুঃখের পথ সহজ করে দেবো।' [লাইল : ৫-১০][১১৩৩]

আবু ইউসুফ রহ. বলেন, আমি আবু হানিফা রহ.-কে বলতে শুনেছি—**'যে ব্যক্তি আল্লাহর কুদরতের ক্ষেত্রে তাকে অক্ষমতায় অভিযুক্ত করবে, আল্লাহর জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি মূর্খতার অভিযোগ আরোপ করবে, আল্লাহর ইনসাফের ক্ষেত্রে তাকে জালেম ঠাওরাবে, আল্লাহর তাওহিদের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে, সে পথহারা-বিভ্রান্ত গণ্য হবে।'**[১১৩৪]

তাকদিরের লিখন বর্ণনা হিসেবে, নির্দেশ হিসেবে নয়

এটা তাকদির বোঝার সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অথচ সহজ চাবিকাঠি। এটা একজন সাধারণ মানুষেরও বোঝার কথা। ফলে এই আলোচনার পর তাকদিরের উপর আর কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

ইমাম আজম বলেন, **'দুনিয়া ও আখেরাতের কোনোকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা, জ্ঞান, ফয়সালা ও কুদরত ব্যতীত সংঘটিত হয় না। তিনি এসব লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। কিন্তু তাঁর এ লিখন বর্ণনা হিসেবে, হুকুম হিসেবে নয়'** (كتبه بالوصف لا بالحكم)।[১১৩৫] অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীতে কী করবে সেটা তিনি জেনে লিখেছেন। তিনি আগেই তাদের ভাগ্যের উপর কিছু চাপিয়ে লিখেছেন, আর মানুষ পৃথিবীতে এসে কেবল সেটাই পালন করছে—এমন নয়। কারণ, এমন হলে কিতাব অবতীর্ণ করা, রাসুল পাঠানো এবং আদেশ-নিষেধ দেওয়ার কোনো মানে হয় না। এ জন্য ইমাম প্রশ্ন করেন, **'পৃথিবীতে বর্তমানে যা-কিছু হচ্ছে আল্লাহ জানতেন কি না? যদি কেউ বলে, না, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, সে আল্লাহর ইলমকে অস্বীকার করল। আর যদি বলে, হ্যাঁ, তবে তাকে বলা হবে, আল্লাহ কি তখন যেভাবে জেনেছেন সেভাবে হওয়ার ইচ্ছা করেছেন, নাকি**

১১৩৩. আল-উসুলুল মুনিফাহ (২৬)।

১১৩৪. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১১৮)।

১১৩৫. আল-ফিকহুল আকবার (৩)।

বিপরীত হওয়ার ইচ্ছা করেছেন? যদি বলে, যেভাবে হবে জেনেছেন সেভাবে ইচ্ছা করেছেন, তখন সে স্বীকার করে নিল যে, আল্লাহ মুমিনের জন্য ঈমান এবং কাফেরের জন্য কুফর চেয়েছেন, ফলে তা-ই হচ্ছে। আর যদি বলে, যেভাবে হবে জেনেছেন সেটা তার ইচ্ছা অনুযায়ী ছিল না, তবে আল্লাহকে অক্ষম সাব্যস্ত করা হলো। এতে সে কাফের হয়ে যাবে।'[১১৩৬]

উপরের বক্তব্যে স্পষ্ট যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালা ইলমের অনুগামী। আল্লাহ যেভাবে হবে জেনেছেন, সেভাবে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং সেভাবে তার ভাগ্য লিখেছেন। আগে লিখে কারও উপর চাপিয়ে দেননি। খাত্তাবি বলেন, 'অনেক লোক মনে করে, আল্লাহ তায়ালা তাকদিরের লেখার মাধ্যমে মানুষকে ভাগ্যের লিখনের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন, বাধ্য করেছেন। এটা ভুল ধারণা। তাকদির অর্থ মানুষকে বাধ্য করা নয়; বরং এর অর্থ মানুষকে সৃষ্টির আগেই আল্লাহ যেহেতু জানেন সে কী করবে, ফলে তিনি বান্দার কর্মফল সে ভিত্তিতেই লিখেছেন। তার জন্য ভালোমন্দ সৃষ্টি করেছেন। নিজের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেননি।'[১১৩৭]

ইমাম আরও বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকে কুফর ও ঈমান থেকে বিমুক্ত সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাদের ঈমানের আদেশ দিয়েছেন, কুফর থেকে নিষেধ করেছেন। তারা কেউ ঈমান গ্রহণ করেছে, আবার কেউ কুফর গ্রহণ করেছে। যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, তারা নিজের ইচ্ছাতেই করেছে...। বিপরীতে যারা কুফর গ্রহণ করেছে, সেটাও তাদের ইচ্ছায় করেছে।'** ইমাম অন্যত্র বলেন, **'...আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কাউকে কুফর বা ঈমানের উপর বাধ্য করেননি। কিংবা কাউকে মুমিন বা কাফের হিসেবে সৃষ্টি করেননি; বরং সবাইকে সৃষ্টি করেছেন ব্যক্তি (মানুষ) হিসেবে।'**[১১৩৮]

কাসানিও এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বর্ণনা করেন, যা এ সম্পর্কিত সংশয় কাটাতে সাহায্য করবে। তিনি লিখেন, 'আল্লাহ তায়ালা যা হবে বলে জেনেছেন, সেটা হওয়ার ইচ্ছা করেছেন, সেটা তাঁর আনুগত্য হোক কিংবা অবাধ্যতা হোক। আবার যেটা তিনি হবে না বলে জেনেছেন, সেটা তিনি না হওয়ার

১১৩৬. আল-উসুলুল মুনিফাহ (২৮)।

১১৩৭. শরহে মুসলিম, নববি (১/১৫৫)।

১১৩৮. আল-ফিকহুল আকবার (৩-৪)।

ইচ্ছা করেছেন, হোক সেটা আনুগত্য কিংবা অবাধ্যতা। মোটকথা, তাঁর ইচ্ছাটা 'জানার' সঙ্গে সম্পৃক্ত, আদেশ-নিষেধের সঙ্গে নয়।'[১১৩৯] অর্থাৎ, আল্লাহ যখন কারও ব্যাপারে জেনেছেন সে ভালো কাজ করবে, তার জন্য সেটাই ইচ্ছা করেছেন। তাকে ভালো কাজের আদেশও দিয়েছেন। ফলে ভালো কাজটা সংঘটিত হচ্ছে। আবার আল্লাহ যখন কেউ খারাপ কাজ করবে জেনেছেন, খারাপের ইচ্ছা করেছেন। যদিও তিনি খারাপটা করতে নিষেধ করেছেন, তবু শেষ পর্যন্ত খারাপটাই হবে। কারণ, তিনি জেনেছেন সেটা, পরে ইচ্ছাও করেছেন। সুতরাং ভালোমন্দ বেছে নেওয়ার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত মানুষের ঘাড়েই পড়ে। সে নিজে বাছাই করে। ফলে এর দায়ভারও তাঁর কাঁধে।

মাগনিসাভি লিখেন, "আল্লাহ লাওহে মাহফুজে সবকিছুর বর্ণনা লিখেছেন। অর্থাৎ, তাতে আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর ভালোমন্দ, লম্বা-চওড়া, ছোট-বড়, কম-বেশি, হালকা-ভারি, গরম-ঠান্ডা, আর্দ্রতা-শুষ্কতা, আনুগত্য-অবাধ্যতা, ইচ্ছা, সামর্থ্য, উপার্জন ইত্যাদি সাধারণ বর্ণনা ও অবস্থা, গুণাগুণ ও চরিত্র লিখেছেন। ব্যাখ্যা ও কারণ ছাড়া কেবল 'নির্দেশমূলক' কথা লিখেননি। অন্যকথায়, লাওহে মাহফুজে আল্লাহ এমন লিখেননি—'যায়েদ মুমিন হোক', 'আমর কাফের হোক।' এমন লিখলে যায়েদ ঈমান আনতে বাধ্য হতো, আমর কুফরি করতে বাধ্য হতো। কারণ, আল্লাহর নির্দেশ অনিবার্যভাবে বাস্তবায়িত হবে। তাঁর নির্দেশ রহিত করার ক্ষমতা কারও নেই (আর এমন হলে তাতে মানুষের কোনো দায় থাকে না)। তাই আল্লাহ লিখেছেন, যায়েদ স্বেচ্ছায় ও নিজের স্বাধীনতায় ঈমান আনবে। সে ঈমান চাইবে, কুফর চাইবে না। আমর স্বেচ্ছায় ও নিজের স্বাধীনতায় কুফরি গ্রহণ করবে। কুফর চাইবে, ঈমান চাইবে না (এ কারণে মানুষকেই তার ঈমান ও কুফরের দায়ভার বহন করতে হবে)। উদ্দেশ্য হলো, বান্দার কাজের ক্ষেত্রে 'জাবর' তথা বাধ্যবাধকতাকে নাকচ করে দেওয়া, জাবরিয়্যাহদের মতাদর্শ বাতিল সাব্যস্ত করা।"[১১৪০]

তাকদিরের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ও খণ্ডন

তাকদিরের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ ও ভারসাম্যপূর্ণ আকিদা বর্ণনার পর এবার আমরা তাকদিরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিচ্যুতি ও বিচ্যুত সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করব; তাদের বিচ্যুতির জায়গাগুলো সংশোধন করব। এতে করে তাকদিরকেন্দ্রিক সকল জটিলতা ও বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে, ইনশাআল্লাহ।

১১৩৯. আল-মুতামাদ ফিল মুতাকাদ, কাসানি (৫)।

১১৪০. শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১২৩-১২৪)।

আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো—মানুষের সকল কাজ আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ সেগুলোর সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবক এবং অস্তিত্বে আনয়নকারী। কিন্তু মানুষ সেগুলোর কর্তা। মানুষের ইচ্ছা-স্বাধীনতা ও সামর্থ্যের মাধ্যমে সেটা সম্পন্ন হয়। ফলে আল্লাহ সৃষ্টি করেন। মানুষ কাজে পরিণত করে; সৃষ্টি করে না। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায় ভারসাম্য নষ্ট করেছে। তাকদিরের ক্ষেত্রে তারা নানারকম প্রান্তিকতায় লিপ্ত হয়েছে। তাকদিরের নানান বিষয় অস্বীকার করে প্রান্তিকতার শিকার হয়েছে সকল কাদারিয়্যাহ, একদল শিয়া, মুতাযিলা এবং অধিকাংশ খারেজি ফিরকা। অপরদিকে তাকদির স্বীকার করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির কারণে প্রান্তিকতার শিকার হয়েছে জাবরিয়্যাহ ও জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়। নিচে ধারাবাহিকভাবে তাদের বিচ্যুতি এবং ইমাম আজমের ভাষ্যে সেগুলোর খণ্ডন উল্লেখ করা হচ্ছে :

তাকদির অস্বীকারকারীদের সংশয় নিরসন

ভালোমন্দ দুটোই আল্লাহর সৃষ্টি : কাদারিয়্যাহ, শিয়া, মুতাযিলা ও খারেজিসহ তাকদির অস্বীকারকারী সম্প্রদায়গুলোর একটি উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি হলো, তারা বিশ্বাস করে—বান্দার (মন্দ) কাজ আল্লাহর সৃষ্টি নয়, বরং বান্দার নিজের সৃষ্টি। কাযি আবদুল জাব্বার (৪১৫ হি.) লিখেন, 'মানুষের কাজ আল্লাহর সৃষ্টি নয়; বরং মানুষের নিজের কর্ম (أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى، وأنها أفعالهم)। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো, যদি এগুলো আল্লাহর কাজই হতো, তবে আমাদের এগুলো থেকে ভালোমন্দের নির্দেশ দেওয়ার কিছু নেই। আমরা ভালো কিছু করলে প্রশংসা করা এবং সওয়াব দেওয়া আর খারাপ করলে নিন্দা করা এবং শাস্তি দেওয়ারও যুক্তি নেই। তা ছাড়া, বান্দার কাজ যদি আল্লাহর কাজই হতো, তবে সেটা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত হতো না। একইভাবে মানুষ আল্লাহকে গালি দেয়, তাঁর নিন্দা করে। তাহলে আল্লাহ কি নিজের গালি এবং নিজের নিন্দা সৃষ্টি করেছেন? একইভাবে (আল্লাহকে যদি মানুষের কাজের সৃষ্টিকর্তা বলা হয়, তবে) কেউ জুলুম করলে আল্লাহকে জালেম বলতে হবে; কেউ ইনসাফ করলে আল্লাহকে আদিল বলতে হবে...। সুতরাং প্রমাণিত হলো, মানুষের মন্দ কাজ আল্লাহর সৃষ্টি নয়; বরং সেটা মানুষের নিজের কাজ (الأفعال القبيحة لم يخلقها الله عز وجل وأنها من فعل العباد)। এ কারণেই তারা তাদের কর্মফল লাভ করে।'[১১৪১]

১১৪১. আল-উসুলুল খামসাহ, কাযি আবদুল জাব্বার (৭৭-৭৮)।

কিন্তু এগুলো কিছু শুবাহ ও সংশয়; কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ সমঝ নয়। যেহেতু ইমাম রহ.-এর যুগেই কাদারিয়্যাহ ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, ফলে তাকদিরের ক্ষেত্রে সকল বিচ্যুতির তিনি জবাব দেন। এ কারণে ইমামের বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের উপরের সংশয়ের জবাব রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি শরয়ি তথা কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জবাব যেমন দিয়েছেন, তেমনই যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়েও খণ্ডন করেছেন। ইমাম বলেন, **“ভালো (খাইর) ও মন্দ (শার) দুটোই আল্লাহর সৃষ্টি। যেমন—আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,** ‘قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۝١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢’ **অর্থ : ‘আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।’” [ফালাক: ১-২]**[১১৪২]

ইমামের উল্লেখকৃত আয়াতে আল্লাহ ‘সৃষ্টির মন্দত্ব’-কে সরাসরি নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। আরও বিভিন্ন আয়াতে তিনি এটা করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ অর্থ : ‘প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমাদের সকল কাজকে।’ [সাফফাত : ৯৬] এখানে মানুষের সকল কাজকে আল্লাহর সৃষ্টি বলা হয়েছে। তা ছাড়া, উপরের আয়াতে মন্দ কাজকেও সুনির্ধারিতভাবে আল্লাহর সৃষ্টি বলা হয়েছে। তাই এগুলোকে মানুষের সৃষ্টি বলা মূলত আল্লাহর পাশাপাশি মানুষকেও সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্ত করা। এ জন্যই তাকদির অস্বীকারকারী (কাদারিয়্যাহ ও মুতাযিলা) সম্প্রদায়কে অগ্নিপূজক বলা হয়েছে। কারণ, অগ্নিপূজকরাও দুই খোদায় বিশ্বাসী।[১১৪৩] ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ‘শেষ যুগে একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা তাকদির অস্বীকার করবে। সাবধান! তারা এই উম্মতের অগ্নিপূজারী (মাজুস)। তারা অসুস্থ হলে তোমরা দেখতে যাবে না, মৃত্যুবরণ করলে উপস্থিত হবে না।’[১১৪৪]

১১৪২. আল-ফিকহুল আবসাত (৪৩)।

১১৪৩. আবু দাউদ (৪৬৯১)। মুসতাদরাকে হাকেম (২৮৫)।

১১৪৪. তাবারানি, আল-মুজামুস সাগির (২/৭১; হাদিস নং ৮০০), আল-আওসাত (৫৩০৩)। কিন্তু এর মানে (পরবর্তী) কাদারিয়্যাহ (ও মুতাযিলা) সম্প্রদায় কাফের নয়। কারণ, তাদের ভুলগুলো শুবুহাত (সংশয়) ও জাহালত (অজ্ঞতা) থেকে উৎসারিত। ফলে তাদের ‘অগ্নিপূজারী’ বলা হয়েছে তাদের আকিদার জঘন্যতা বোঝাতে, প্রকৃত অর্থেই কাফের ঘোষণা করতে নয়। হ্যাঁ, কেউ যদি আল্লাহর ইলম (জ্ঞান) ও তাকদির (ভাগ্য নির্ধারণ)-কে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তারা মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত বিচ্যুত সম্প্রদায়।

মোটকথা, ভালো ও মন্দ উভয়টাই আল্লাহর পক্ষ থেকে। কারণ, আল্লাহ যদি চাইতেন সৃষ্টিতে কুফর-শিরক কিছু থাকবে না, কেউ তার অবাধ্য হবে না, তবে তিনি সেটা করতে পারতেন। কিন্তু হিকমতের কারণে করেননি। ফলে মন্দটাও তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই একে অস্তিত্বে এনেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত রাখবেন। সুতরাং আমাদের ভালোমন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। তবে আলেমগণ মন্দকে সরাসরি আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত করা অপছন্দ করেন। এটা কুরআনেরও রীতি। কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা', 'তিনি সবকিছুর পালনকর্তা।' কিন্তু আল্লাহ 'মলমূত্রের সৃষ্টিকর্তা' বা তিনি 'শূকরের পালনকর্তা'—এভাবে বলা হয়নি। অথচ বাস্তবে এগুলোও কিন্তু তাঁর সৃষ্টি ও পালনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সরাসরি তাঁর দিকে সম্পৃক্ত না করার কারণ হলো তাঁর সুউচ্চ শান ও মর্যাদা। আল্লামা তাশকুবরা যাদাহ লিখেন, 'মাশায়েখগণ মন্দটা আল্লাহর প্রতি আদবের কারণে সম্পৃক্ত করেন না। নতুবা আল্লাহ ভালোমন্দ সবকিছুর স্রষ্টা। এটাই ইবরাহিমি আদর্শ।'[১১৪৫]

প্রশ্ন আসতে পারে, মন্দ কাজও যদি আল্লাহর সৃষ্টি হয়, তবে মানুষের কী দোষ? উত্তর হলো, এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি হলেও মূলত মানুষের ইচ্ছা ও শক্তিতেই সংঘটিত হচ্ছে। আল্লাহ জোর করে করাচ্ছেন না। ফলে এর দায়ভার মানুষের কাঁধেই। ইমাম বলেন, **'মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং মানুষের সকল কাজকর্ম, স্বীকারোক্তি, জানাশোনা সবকিছুও সৃষ্টি। কারণ, সৃষ্টির কাজ তো সৃষ্টিই হবে। এ সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা।'**[১১৪৬] **'কিন্তু আল্লাহ বান্দাকে এগুলো গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছেন। ফলে তাকে তার কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।'**[১১৪৭]

সৃষ্টি ও কামাইয়ের সম্পর্ক : বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য আহলে সুন্নাতের ইমামগণ বেশ কিছু পরিভাষা ও মূলনীতি ব্যবহার করেন। তন্মধ্যে একটি হলো, **'খালক'** তথা সৃষ্টি ও **'কাসব'** তথা কামাই বা উপার্জন। ইমাম আজম রহ. বলেন, **'নড়াচড়া ও স্থিরতাসহ বান্দার সকল কাজ মূলত তাঁর উপার্জন (কাসব)। কিন্তু**

১১৪৫. দেখুন : রিসালাহ ফিল কাজা ওয়াল কাদার (১০৭-১০৮)।

১১৪৬. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৪৫)।

১১৪৭. আল-ফিকহুল আবসাত (৪৩)।

এগুলোর সৃষ্টিকর্তা (খালিক) হলেন আল্লাহ তায়ালা। আর তাই এ সবকিছু সংঘটিত হয় তাঁর ইচ্ছা, জ্ঞান, ফয়সালা ও নির্ধারণে।'[১১৪৮] ইমাম তহাবি এটাকে এভাবে বলেন, 'বান্দার সকল কাজ আল্লাহর সৃষ্টি, কিন্তু বান্দার হাতের কামাই (কাসব)।'[১১৪৯]

কাসব শব্দের শাব্দিক অর্থ উপার্জন, কামাই। পরিভাষায় কাসব হলো : বান্দার কাজে তার ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকা। অন্যকথায়, স্বেচ্ছায় ও নিজ স্বাধীনতায় কোনো কাজ করা। ফলে একজন মানুষ যখন নড়াচড়া করে, সেটা তাঁর ইচ্ছা ও সামর্থ্যে করে। এ হিসেবে এটাকে মানুষের 'কাসব' তথা কামাই বলা হয়। কিন্তু আল্লাহর এ কাজটা অস্তিত্বে আনা, তাঁর দেওয়া তৌফিক ও ইচ্ছা ছাড়া যেহেতু মানুষ নড়াচড়া করতে পারত না, এ হিসেবে এটাকে আল্লাহর সৃষ্টি বলা হয়। ফলে মানুষের প্রত্যেকটা কাজ আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের কাসব তথা কামাইয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সাফফার বুখারি বলেন, 'প্রত্যেক কাজের একজন কর্তা দরকার হয়। সুতরাং মানুষ যেটা করে সেটা তার নিজের হাতের ক্রিয়া (কামাই)। আল্লাহর সৃষ্টির ব্যবহার। অন্যকথায়, প্রত্যেকটা কাজের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক সৃষ্টির। তিনি সেগুলো সৃষ্টি করেন। কিন্তু কাজটা বাস্তবায়ন করে বান্দা। ফলে সেটা তার কামাই (কাসব)।'[১১৫০]

সামর্থ্যের প্রকারভেদ : প্রশ্ন হতে পারে, যেহেতু মানুষ আল্লাহর দেওয়া শক্তি-সামর্থ্য দিয়েই গুনাহের কাজ করে, তিনি গুনাহের শক্তি না দিলে মানুষ গুনাহ করতে পারত না, তাহলে এর জন্যও তো প্রকারান্তরে আল্লাহই দায়ী হচ্ছেন!

প্রাথমিকভাবে এটা সত্য ও সঠিক। অর্থাৎ, মানুষের সব ধরনের সামর্থ্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। এটাকে অস্বীকার করা যাবে না যেমনটা কাদারিয়্যাহ ও মুতাযিলারা করেছে। কারণ, তাতে আল্লাহ থেকে মানুষের অমুখাপেক্ষিতা ফুটে ওঠে। ইমাম আজম আল্লাহপ্রদত্ত সামর্থ্য প্রসঙ্গে বলেন, **"আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে দেওয়া সামর্থ্য (ইস্তিতাআহ) কাজ করার সময় আসে; কাজের আগেও না পরেও না। কারণ, কাজটি করার আগেই যদি তার সামর্থ্য থাকে, তবে তো কাজটি করার সময় সে আল্লাহর মুখাপেক্ষী থাকল না।**

১১৪৮. আল-ফিকহুল আকবার (৪)।
১১৪৯. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৭)। আরও দেখুন : আল-মুতামাদ ফিল মুতাকাদ, কাসানি (৩)।
১১৫০. তালখিসুল আদিল্লাহ (১৭৭-১৭৮)।

অথচ কুরআন বলছে, ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ **অর্থ : 'আল্লাহ অমুখাপেক্ষী আর তোমরা সবাই মুখাপেক্ষী।' [মুহাম্মাদ : ৩৮] একইভাবে কাজটি সম্পন্ন করার পরে সামর্থ্য আসবে সেটাও অসম্ভব। কারণ, আল্লাহর দেওয়া সামর্থ্য ছাড়া মানুষের কোনো কাজ করা সম্ভব নয়।"**[১১৫১]

প্রশ্ন হতে পারে, সামর্থ্য যদি আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়, তবে মানুষকে দায়ী করার কী যুক্তি? আল্লাহ সামর্থ্য না দিলে তো কাজটিই হতো না। দুইভাবে ইমামগণ এর জবাব দিয়েছেন :

এক. আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই সামর্থ্য দিয়েছেন। তাকে যদি কোনো ধরনের সামর্থ্য না দিতেন, তবে সে তো সম্পূর্ণ পরাধীন হয়ে পড়ত। ফলে তাকে সামর্থ্য দেওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু যেহেতু সে সামর্থ্য নিজ স্বাধীনতা অনুযায়ী ব্যয় করতে পারছে, ফলে এর পাপ-পুণ্যের দায়ভারও তার কাঁধে। ইমাম আজম বলেন, **'মানুষের গুনাহ করার জন্য যে ইস্তিতাআহ (সামর্থ্য)-এর দরকার হয়, পুণ্য করার জন্যও সেই একই (ইস্তিতাআহ) সামর্থ্যের দরকার হয়। তিনি মানুষকে স্বাধীনভাবে এই সামর্থ্য দিয়েছেন, কিন্তু সেটা পাপের পরিবর্তে পুণ্যের কাজে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে এখন মানুষ যদি সেটা পাপের কাজে ব্যবহার করে, তবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন এবং এটা ইনসাফ।'**[১১৫২]

দুই. সামর্থ্যটা দুই ভাগে ভাগ করা হবে। এক. বান্দার শারীরিক সুস্থতা ও প্রস্তুতি। এটা কাজের আগে। দুই. আল্লাহর তৌফিক। এটাই মূল সামর্থ্য। এটা ছাড়া কাজ হয় না। কিন্তু বান্দাকে প্রথম প্রকারের সামর্থ্যের জন্য (অর্থাৎ, তার নিজের সক্ষমতার ভিত্তিতে) জবাবদিহি করতে হবে। তার সামর্থ্যের বাইরে থাকলে সেটার জন্য জবাবদিহি করতে হবে না।

প্রশ্ন আসতে পারে, আকিদার বিভিন্ন কিতাবে দুই প্রকারের সামর্থ্যের কথা দেখা যায়, আমরাও এখানে তা-ই বলেছি। তাহলে ইমাম আজম উপরে স্রেফ এক প্রকারের সামর্থ্যের কথা কেন বললেন **(আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে দেওয়া সামর্থ্য (ইস্তিতাআহ) কাজ করার সময় আসে; কাজের আগেও না পরেও না।)**?

১১৫১. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৪৮-৪৯)। আরও দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১২০)। আস-সাওয়াদুল আজম (৩৮) আল-ইতিকাদ, বলখি (১০৬)।

১১৫২. আল-ফিকহুল আবসাত (৪৩)।

এটা কয়েকটা কারণে বলেছেন। (এক.) প্রথম প্রকারের সামর্থ্যটা আল্লাহপ্রদত্ত সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। (দুই.) দ্বিতীয় প্রকারের সামর্থ্যই মূল, প্রথম প্রকারের নয়। (তিন.) মুতাযিলারা দ্বিতীয় প্রকারের মূল সামর্থ্য (তথা কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত সামর্থ্য) নাকচ করে স্রেফ প্রথম প্রকারের সামর্থ্যের কথা বলে (কারণ, তাদের কাছে বান্দা সর্বেসর্বা, আল্লাহর পক্ষ থেকে করণীয় কিছু নেই, তাকদির নেই)। তারা কেবল কাজের আগে বিদ্যমান সামর্থ্যের কথা বলে। ফলে তাদের খণ্ডনে ইমাম কাজের আগের সামর্থ্যের বিদ্যমানতা নাকচ করেছে। দ্বিতীয় প্রকারের সামর্থ্য তথা মূল সামর্থ্য আল্লাহর তৌফিকের কথা উল্লেখ করেছেন।

তাঁর অনুসরণে আবু হাফস বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখি ও বাযদাবিসহ অনেক হানাফি আলেম প্রথম প্রকারের সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করেননি। তবে বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য ইমাম তহাবি, মাতুরিদি, আবু সালামা সমরকন্দি, নাসাফি, সাবুনি, গযনবি, খাব্বাযি, লামিশিসহ অধিকাংশ হানাফি আলেমই দুই প্রকারের সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম তহাবি লিখেন, 'সামর্থ্য দুই প্রকারের। এক প্রকারের সামর্থ্য যা কাজের ঘটক হিসেবে পরিগণিত এবং ঘটার জন্য অপরিহার্য। এটা আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন—তৌফিক দান। এমন সামর্থ্য বান্দার দিকে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয় (উপরে ইমাম আজম এটার কথা বলেছেন)। আরেক প্রকারের সামর্থ্য কাজের কার্যকারণ (ঘটক নয়)। যেমন— সুস্থতা, সক্ষমতা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকা। এটা বান্দার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং শরিয়তের আদেশ-নিষেধ এই প্রকারের সামর্থ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। কুরআনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে চাপিয়ে দেন না।'[১১৫৩]

১১৫৩. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৬-২৭)। ইমাম মাতুরিদি বলেন, 'আমাদের কাছে কুদরত (বা ইস্তিতাআহ= সামর্থ্য) দুই প্রকারের। এক. উপায়-উপকরণ ঠিক থাকা। এটা কাজের আগে বিদ্যমান থাকা জরুরি। এটা থাকলেই কাজ হয়ে যাবে এমন নয়। দুই. কাজ করার সময় বিদ্যমান সামর্থ্য। যখন কাজ সংঘটিত হয় তখন এর মাধ্যমেই সংঘটিত হয়।' [আত-তাওহিদ (১৮৮)] আবু সালামা সমরকন্দি (৩৪০ হি.) লিখেন, 'সামর্থ্য দুই প্রকারের— একটা হলো অবস্থাগত সামর্থ্য। অর্থাৎ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকা, উপায়-উপকরণ সক্রিয় ও শুদ্ধ থাকা। অপরটা হলো কর্মগত সামর্থ্য। এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তৌফিক দেওয়া না-দেওয়া, তাকদির ও ফয়সালা ইত্যাদি।' [জুমাল মিন উসুলিদ্দিন (২৫)]

মোটকথা, মানুষের সামর্থ্য দুই প্রকারের। একটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তৌফিক যা বান্দার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় না। এটা কাজ করার সময় জরুরি হয়। এটা না থাকলে কাজ সম্পাদিত হয় না। আরেকটা হলো কাজের আগে বিদ্যমান থাকা; যেমন—সুস্থতা, কাজ করার শক্তি, উপকরণ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকা। এটা

মাইমুন নাসাফি লিখেন, 'সামর্থ্য (ইস্তিতাআহ), কুওয়াত (শক্তি), কুদরত, 'তাকাত'—এগুলো সব কাছাকাছি অর্থবোধক শব্দ। কুদরত ও ইস্তিতাআহ আমাদের কাছে দুই প্রকারের : এক. উপায়-উপকরণ এবং মাধ্যম-হাতিয়ারের বিশুদ্ধতা। এটা কাজের আগে আসে। এটা কাজের মূল সংঘটক নয়। তবে এগুলো ছাড়াও কাজ হয় না। মোটকথা, এগুলো আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত; যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। এ ধরনের ইস্তিতাআহকে, এক কথায়, কাজের প্রস্তুতি বলা যেতে পারে। কুরআনে এর উদাহরণ, যেমন—আল্লাহ তায়ালার বাণী : 'فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا' অর্থ: '(যিহারের কাফফারা) যে ব্যক্তি দিতে সমর্থ না হবে, সে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াবে।' [মুজাদালাহ : ৪] দুই. এটা কাজের সময় আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ সাহায্য, যা কাজের আগে বোঝার ক্ষমতা নেই। এই সাহায্যে বান্দা কাজটা করতে পারে। ফলে এটা কাজের মূল কারণ (ঘটক)। এই প্রকারের সামর্থ্যের উদাহরণ হলো, আল্লাহর বাণী : 'وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ' অর্থ: 'তারা শীঘ্রই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সামর্থ্য থাকলে তোমাদের সঙ্গে বের হতাম!' [তাওবা : ৪২] এখানে আল্লাহ তাদের মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছেন। কারণ, তাদের সামর্থ্য আছে কি না সেটা মদিনার ভিতরে বসে বোঝা যাবে না। যদি মদিনা থেকে বাইরে যুদ্ধের জন্য বের হতো, এরপর পারত কি পারত না বোঝা যেত।' [দেখুন : তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/৭৮০-৭৮১)]

আলাউদ্দিন উসমান্দি লিখেন, 'ইস্তিতাআহ তথা সামর্থ্য দুই প্রকারের। একটা হলো অবস্থাগত সামর্থ্য তথা উপায়-উপকরণ প্রস্তুত থাকা, শরীর সুস্থ থাকা। এটা কাজের আগে। ...আরেকটা হলো কর্মগত সামর্থ্য। এটা আহলে সুন্নাতের মতে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মুতাযিলারা এটাকেও কাজের আগে মনে করে।' [দেখুন : লুবাবুল কালাম, উসমান্দি (পাণ্ডুলিপি : ৬৩)] খাব্বাযি লিখেন, 'সামর্থ্য দু প্রকারের। এক. উপায়-উপকরণের বিশুদ্ধতা। এটা কাজের আগে আসে। (আল্লাহর পক্ষ থেকে) দায়িত্ব এটার উপর ভিত্তি করে। কারণ, এটা না থাকলে দায়িত্বই আসবে না। দুই. প্রকৃত সামর্থ্য। এটা না থাকলে কাজই হবে না। এটা কাজের সময় থাকে।' [আল-হাদি ফি উসুলিদ্দিন (১৪৭-১৪৮)]

আবদুল্লাহ নাসাফি লিখেন, 'সামর্থ্য (ইস্তিতাআহ), শক্তি (তাকাত), কুদরত, কুওয়াত ইত্যাদি সব সমার্থক শব্দ। এটা দুই প্রকারের। এক. উপায়-উপকরণ শুদ্ধ থাকা। এটা কাজের আগে আসে, যাতে বান্দা নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতায়, নিজ সামর্থ্যে কাজটি করার প্রস্তুতি নিতে পারে। যেমন—আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا' অর্থ: 'যারা সফরের সামর্থ্য রাখে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বাইতুল্লাহর হজ করা আবশ্যক।' [আলে ইমরান : ৯৭] এখানে সামর্থ্য বলতে কাজের আগের সামর্থ্য বোঝানো হয়েছে। এগুলো থাকলেই কাজ বাস্তবায়িত হয়ে যাবে এমন নয়। দুই. হাকিকি সামর্থ্য। এটা কাজের ঘটক। এটার মাধ্যমেই কাজ সংঘটিত হয়। এটা ছাড়া কাজ হয় না। যেমন—আল্লাহ বলেন, 'مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ' অর্থ: 'তারা শুনতে পারত না, দেখতে পেত না।' [হুদ : ২০] এখানে আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন। কারণ, তাদের উপায়-উপকরণ সবকিছু বিশুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তারা অন্যায়ের পথে হেঁটেছে। শুনেও শোনেনি, দেখেও দেখেনি। ফলে হেদায়াত পায়নি।' [আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (২৭৯-২৮০)। আরও দেখুন : আত-তামহিদ, লামিশি (৯৩)] কাসানি দুটো প্রকারকে আরও স্পষ্ট করে লিখেন, 'বান্দার ইস্তিতাআহ তথা সামর্থ্য যার মাধ্যমে সে কাজ করে সেটা কাজের সঙ্গে বিদ্যমান থাকে, আগেও নয় পরেও নয়। আর 'তাকলিফ' তথা দায়িত্বের সামর্থ্য (অর্থাৎ, যা কাজের মূল ঘটক নয়, কিন্তু যার উপর ভিত্তি করে কাজটা শরিয়তের পক্ষ থেকে বান্দার উপর আবশ্যক হয়) সেটা কাজের আগে আসে। যেমন—উপায়-উপকরণ বিশুদ্ধ থাকা।' [আল-মুতামাদ, কাসানি (৬)]

বান্দার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় এবং কাজ করার আগে বিদ্যমান থাকা জরুরি হয়। কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় বিশ্বাস করে—মানুষের মাঝে সব ধরনের সামর্থ্য সবসময় বিদ্যমান থাকে। ফলে সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। এটা গলত কথা। এমন বলা হলে আল্লাহর প্রতি মানুষের কোনো মুখাপেক্ষিতা থাকে না; অথচ আল্লাহ থেকে অমুখাপেক্ষিতা কুফর। এখানেই তাদের বিচ্যুতি।[১১৫৪]

ভালোমন্দ দুটোই আল্লাহর ইচ্ছার অধীন : ভালোমন্দের সম্পর্ক নিয়ে কাদারিয়্যাহ, ফালাসিফাহ ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আরও একটা বিচ্যুতি হলো—তারা মনে করে, বান্দার মন্দ কাজে আল্লাহর কোনো ইচ্ছা (ইরাদা ও মাশিয়াহ) নেই। ফলে ফাসেক ব্যক্তি যখন গুনাহ করে কিংবা কোনো কাফের যখন কুফর করে, তাতে আল্লাহর ইচ্ছা থাকে না; বরং সে নিজের ইচ্ছায় করে। কারণ, আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হলে তাকে শাস্তি দেওয়ার সুযোগ থাকত না। বরং শাস্তি দিলে জুলুম হিসেবে গণ্য হতো। অথচ আল্লাহ গুনাহের শাস্তি দেবেন। বোঝা

১১৫৪. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, সমরকন্দি (১৭)। আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ, সাবুনি (২৪৩-২৪৪)। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়; তা হলো, বাহ্যত তহাবি, মাতুরিদি, সমরকন্দি, নাসাফি, সাবুনি-সহ হানাফি আলেমদের বক্তব্য ইমাম আজমের বক্তব্যের বিপরীত। কারণ, ইমাম আজম কেবল কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত একধরনের সামর্থ্যের কথা বলেছেন, কাজের আগে যার অস্তিত্ব নেই, পরেও নেই। বিপরীতে তাঁর অনুসারী হানাফি আলেমগণ কাজের আগেও একধরনের সামর্থ্যের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এ কারণে আবুল ইউসর বাযদাবি-সহ কেউ কেউ এসব বক্তব্যকে গলত বলেছেন। বাযদাবি লিখেন, 'খোরাসান ও ইরাকে আমাদের একদল ফকিহ মনে করেন—সামর্থ্য কাজের আগে পাওয়া যায়। এটা গলত বক্তব্য। মুতাযিলাদের কাছ থেকে নেওয়া। কারণ, কাজের আগে সামর্থ্যের কথা বলা মানে মানুষকে কাজের সৃষ্টিকর্তা বানিয়ে ফেলা।' [উসুলুদ্দিন, বাযদাবি : ১২১] কিন্তু বাযদাবির কথা বরং গলত। কারণ, ইমাম তহাবি-সহ যেসব আলেম পূর্ব সামর্থ্যের কথা বলেছেন তারা মূলত বান্দার সুস্থতা, শারীরিক উপকরণ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকার কথা বলেছেন। এটা প্রকৃত সামর্থ্য নয়। কারণ, এগুলো থাকলেই কেউ কোনো কাজ করতে পারবে সেটার নিশ্চয়তা নেই। বরং প্রকৃত সামর্থ্য হলো আল্লাহর দেওয়া শক্তি ও তৌফিক যার মাধ্যমে কাজ সংঘটিত হয় এবং যা ছাড়া কাজ সংঘটিত হয় না। ফলে ইমাম তহাবি-সহ এসব আলেম আর ইমাম আজমের কথার মাঝে কোনো সংঘর্ষ নেই। বরং আল্লাহ তায়ালাও এ ধরনের (পূর্ব) সামর্থ্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন [আলে ইমরান : ৯৭; তাগাবুন : ১৬] তা ছাড়া, এটা স্রেফ কয়েকজন আলেমের বক্তব্য নয়, বরং অধিকাংশ হানাফি আলেমই দুই প্রকারের সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। উপরে সেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। বিপরীতে বলখি, বাযদাবি-সহ যারা কেবল এক প্রকারের সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা মূলত ইমামের মতো প্রথম প্রকারের সামর্থ্যটাকে গৌণ ধরার কারণে। অর্থাৎ, সে সামর্থ্যটা মূলত আল্লাহর দেওয়া তৌফিকেই হয়; আল্লাহ না চাইলে কেউ সুস্থ থাকতে পারে না, উপকরণ প্রস্তুত করতে পারে না। এ জন্য তারা মূল সামর্থ্য তথা দ্বিতীয় প্রকারটাকেই একটা ধরে উল্লেখ করেছেন। ফলে তফসিলি বক্তব্য ভিন্ন হলেও তাদের মূল কথা এক।

গেল, গুনাহ ও কুফর আল্লাহর ইচ্ছার অধীন নয়। উলটো আহলে সুন্নাত যেহেতু পুণ্য ও পাপ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার অধীন বলেন, এ জন্য তারা আহলে সুন্নাতকে 'জালেম' (أهل الجور) আখ্যা দিয়ে নিজেদের 'ইনসাফগার' (أهل العدل) দাবি করে।

এটা সুস্পষ্ট বিচ্যুতি। কারণ, আল্লাহর ইচ্ছার উপর কারও ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় না। ফলে আল্লাহ কারও গুনাহ বা কুফরের ইচ্ছা না করা সত্ত্বেও কেউ সেটা করতে পারবে এমন কোনো সুযোগ নেই। বরং গুনাহ ও কুফরও আল্লাহর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হচ্ছে। তাকদিরের ভালোমন্দ দুটোই আল্লাহর জ্ঞান, ইচ্ছা, সৃষ্টি ও নির্ধারণে সম্পন্ন হয়। কিন্তু আল্লাহ কাউকে বাধ্য করেন না। ফলে এর দায়ভারও মানুষের কাঁধে।[১১৫৫]

আল্লাহর উপর কোনোকিছু আবশ্যক নয় : উপরের বিচ্যুতি এসব সম্প্রদায়কে আরেক বিচ্যুতির দিকে ঠেলে দেয়। তারা মনে করে, আল্লাহর উপর বান্দার জন্য কল্যাণকর ফয়সালা করা আবশ্যক (ওয়াজিব)। অর্থাৎ, তাকদির শুধু ভালো ও ইতিবাচক। ভালো কিছু ঘটলে মনে করতে হবে তাকদিরের ফল। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত অনুগ্রহ। বিপরীতে তাকদিরে মন্দের উপস্থিতি নেই। আল্লাহ মানুষের জন্য খারাপ কিছু নির্ধারণ করেন না। ফলে মন্দ কিছু হলে সেটা মানুষের সৃষ্টি, আল্লাহর নয়। আল্লাহর উপর স্রেফ ভালোটা করা আবশ্যক!

তারা মূলত কুরআন-সুন্নাহর কিছু বক্তব্য ভুল বুঝে সেগুলোকে নিজেদের দলিল মনে করে। অথচ বাস্তবে সেগুলো আদৌ তাদের মতবাদের দলিল নয়। তারা আল্লাহ তায়ালার এই বাণী তাদের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلّٞ فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ﴾ অর্থ : 'ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি এদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।' [হুদ : ৬] এখানে আল্লাহ নিজের উপর গোটা সৃষ্টির রিযিককে আবশ্যক (ওয়াজিব) করে নিয়েছেন। এ জন্য তারা মনে করে ভালোটা করাও আল্লাহর উপর আবশ্যক। মন্দটা তাঁর পক্ষ থেকে নয়।

১১৫৫. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, সমরকন্দি (৮)। আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ (১৬৭-১৬৮, ২৮৬)।

আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো, উপরের আয়াত আল্লাহর উপর আবশ্যক বোঝায় না; বরং উলটো তাঁর অনুগ্রহ বোঝায়। তিনি নিজ অনুগ্রহে সবার রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। কারণ, তাঁর দায়িত্ব নেওয়া ছাড়া সৃষ্টি রিযিক লাভ করতে পারবে না। বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে।

বিপরীতে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে নিজের পূর্ণ স্বাধীনতা ও এখতিয়ারের জানান দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা যা করো সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।' [নাহল : ৯৩] আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ﴿مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ হেদায়াত দিতে পারে না। আর আল্লাহ তাদের ছেড়ে দেন। ফলে তারা তাদের অবাধ্যতার ভিতর উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।' [আরাফ : ১৮৬] এসব আয়াতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার কথা বলছেন। অথচ সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর নয়। বোঝা গেল, বান্দার কল্যাণটাই করতে হবে আল্লাহর উপর এটা আবশ্যক নয়। তা ছাড়া, আল্লাহর উপর কোনোকিছু আবশ্যক করার অর্থ হলো তাকে 'বাধ্য' ও 'পরাধীন' করে ফেলা; অথচ এটা ঈমান বিধ্বংসী কথা।[১১৫৬]

'যা হয়েছে ভালোর জন্য হয়েছে' : উপরের আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয় হলো—মুসলিম সর্বসাধারণের মাঝে একটি বহুল প্রচলিত বক্তব্য : 'তাকদিরে আল্লাহ যা লিখেছেন ভালোর জন্যই লিখেছেন' কিংবা 'যা হয়েছে ভালোর জন্যই হয়েছে।' শরিয়তে এই কথার ভিত্তি কী? বান্দা বিভিন্ন মুসিবত-সংকট দ্বারা আক্রান্ত হলেও কি সবসময় সেটা তার ভালোর জন্য হয়েছে এমনটা মানতে হবে?

আবুল ইউসর বাযদাবি বলেন, 'এটা সাধারণ মানুষের কথা। তারা আল্লাহর প্রতি সম্মান রেখে এমন কথা বলে এবং এমন বিশ্বাস রাখে। কিন্তু আমরা এর সঙ্গে

১১৫৬. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১২১-১২২)। আল-বিদায়াহ মিনাল কিফায়াহ (১২৮-১২৯)।

একমত নই। কাউকে এমন বলতে দেখলে নিষেধ করি।'[১১৫৭] কারণ, এটার অর্থ অনেকটা এমন হয় যে, বান্দার ভালোটা করা আল্লাহর উপর আবশ্যক। অথচ উপরে এ ধরনের বক্তব্যকে আমরা নাকচ করেছি। তা ছাড়া, মানুষ অনেক সময় নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনে। ফলে তার কর্মফলস্বরূপ বিপদ আসে। এখানে বিপদটা তার ভালোর জন্য এসেছে এমন নয়; তার কর্মের কারণে এসেছে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় নয়; বরং এটা তার মন্দ কর্মের মন্দ পরিণতি। সে যদি ভালো কাজ করত, চিন্তাভাবনা করে কাজ করত এবং আরও সাবধান হতো, হয়তো তাকে এ বিপদে পড়তেই হতো না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٍ﴾ অর্থ : 'তোমাদের উপর যেসব বিপদাপদ পতিত হয় তা তোমাদের কর্মের ফল। উপরন্তু তিনি তোমাদের অনেক অপরাধ ক্ষমা করে দেন।' [শুরা : ৩০] এখানে মুসিবতকে মানুষের কর্মফল সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ আরও স্পষ্ট করে বলেন, ﴿ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ﴾ অর্থ : 'স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে মানুষের কৃতকর্মের ফলে, যাতে তিনি তাদের কর্মের কিছু শাস্তি তিনি তাদের আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।' [রুম : ৪১] এখানে মানুষের কর্মফলকে 'ফ্যাসাদ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যা কল্যাণের বিপরীত। আয়াতের শেষে তাদের 'কর্মফল ভোগ' করার কথা বলা হয়েছে, যেটা কল্যাণের বিপরীত; অকল্যাণ। ফলে মন্দ কাজের মন্দ ফল কিংবা ভুলের পরিণতি সবসময় ভালো কিংবা মঙ্গল দিয়ে ব্যাখ্যা করা কঠিন। কাসানি লিখেন, 'বান্দার জন্য ভালোটা করা আল্লাহর উপর আবশ্যক নয়; বরং আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবে করেন। ফলে যদি কিছু বান্দার জন্য কল্যাণকর হয় সেটা আল্লাহর অনুগ্রহ। আর যদি কল্যাণকর না হয় তবে সেটা তাঁর ইনসাফ।'[১১৫৮]

তবে অধমের পর্যবেক্ষণ হলো, যদি মানুষ নিজের সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করেও, সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও বিপদে আক্রান্ত হয়, তখন সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণের ফয়সালা হিসেবে মেনে নিতে হবে। এর সঙ্গে আল্লাহর উপর কিছু আবশ্যক করার সম্পর্ক নেই। কারণ, বিপদ যেমন অনেক সময় কর্মফলস্বরূপ হয়, অনেক সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ,

---

১১৫৭. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৩৩)।

১১৫৮. আল-মুতামাদ ফিল মুতাকাদ (৬)।

কল্যাণস্বরূপ, ছোট বিপদের মাধ্যমে বড় বিপদ থেকে সুরক্ষা এবং দুনিয়ায় বিপদ দিয়ে আখেরাতে আল্লাহর কাছে মর্যাদা উঁচু করার মতো মঙ্গলময়ও হয়। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ অর্থ : 'আমি তোমাদের কিছু ভয়, ক্ষুধা ও ধনসম্পদ, জীবন ও ফলফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে অবশ্যই পরীক্ষা করব। সুতরাং সুসংবাদও দাও ধৈর্যশীলদের।' [বাকারা : ১৫৫] ফলে কোন বিপদ পরীক্ষাস্বরূপ আর কোনটা কর্মফলস্বরূপ এটা যেহেতু পার্থক্য করা সবসময় সম্ভব হয় না, তাই যদি সাধারণ মানুষ তাকদিরের সকল ফয়সালাকে কল্যাণকর মনে করে সান্ত্বনা পায়, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। অধিকন্তু কর্মফলস্বরূপ বিপদ এলেও মানুষ যদি সতর্ক হয়ে যায়, সেটাও তার জন্য শেষ পর্যন্ত কল্যাণকরই। তাই সাধারণ মানুষের এমন বিশ্বাসকে একেবারে ভুল কিংবা ভিত্তিহীন বলার অবকাশ নেই।

তাকদিরের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনকারী সম্প্রদায়ের সংশয় নিরসন

তাকদিরের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের বিপরীতে জাবরিয়্যাহ সম্প্রদায় মনে করে—মানুষের কোনো প্রকারের সামর্থ্য নেই। হ্যাঁ, মানুষ কাজ করে। কিন্তু সেটা এমন, যেমন কোনো গাছ ধরে নাড়া দিলে গাছের পাতা নড়ে। সবকিছু আল্লাহ তাকে দিয়ে করান। জাহমিয়্যাদের বিভ্রান্তি আরও বেশি। তাদের কথা হলো, বান্দা যত নড়াচড়া করে, সব আল্লাহ করেন। বান্দা নিজে কিছুই করে না। এগুলো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী ধ্যানধারণা। আল্লাহ তায়ালা তাদের খণ্ডনে বলেন, ﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن شَيۡءٖۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأۡسَنَاۗ قُلۡ هَلۡ عِندَكُم مِّنۡ عِلۡمٖ فَتُخۡرِجُوهُ لَنَآۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا تَخۡرُصُونَ﴾ অর্থ : "যারা শিরক করেছে তারা বলবে, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরক করতাম না এবং কোনোকিছুই হারাম করতাম না।' এভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। আপনি বলে দিন, 'তোমাদের নিকট কোনো যুক্তি আছে কি? থাকলে আমার নিকট তা পেশ করো; তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ করো আর স্রেফ মনগড়া কথা বলো।'" [আনআম : ১৪৮] আরও বলেন, ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدۡنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَيۡءٖ نَّحۡنُ وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَيۡءٖۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ

﴿فَهَلۡ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ﴾ অর্থ : "মুশরিকরা বলবে, 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তাঁর ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনোকিছুর ইবাদত করতাম না এবং তাঁর অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোনোকিছু নিষিদ্ধ করতাম না।' এদের পূর্ববর্তী লোকেরা এরূপই করত। রাসুলদের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেওয়া।" [নাহল : ৩৫] অন্য আয়াতে বলেন, ﴿وَقَالُواْ لَوۡ شَآءَ ٱلرَّحۡمَٰنُ مَا عَبَدۡنَٰهُمۗ مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ﴾ অর্থ : 'তারা বলে, রহমান আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আমরা ওদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে।' [যুখরুফ : ২০]

শিরক করে তাকদিরের দোহাই দেওয়া এবং আল্লাহর উপর দোষ চাপানো পূর্ববর্তী যুগের কাফের-মুশরিকদের স্বভাব। অবশ্য তাতে কোনো লাভ নেই। আল্লাহর কাছে এসব মনগড়া অসার যুক্তির কোনো মূল্য নেই। ফলে তাদের শাস্তি অনিবার্য। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যা চান তা-ই হয়, যা চান না তা হয় না, যেমনটা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজে বলেছেন, 'আল্লাহ যা চান তা-ই হয়, তিনি যা চান না তা হয় না।'[১১৫৯] কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর চিরন্তন ইচ্ছা; বান্দার সকল স্বাধীনতাকে নাকচ করা নয়। কারণ, তিনি মানুষকে হেদায়াত ও গোমরাহি, হক ও বাতিল দুটোর মাঝে যেকোনো একটা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

জাবরিয়্যাহ ও জাহমিয়্যাহরা মূলত কয়েকটি আয়াত গলত বোঝার ফলে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। তারা বলে, কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ তোমাদের এবং তোমাদের কর্মসমূহ সৃষ্টি করেছেন।' [সাফফাত : ৯৬] সুতরাং বোঝা গেল, মানুষের কিছু করার নেই। কিন্তু এটা ভুল দাবি। কারণ, এখানে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, কাজের কথা নয়। অর্থাৎ, জগতের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা। তিনি কোনো কাজ সৃষ্টি না করলে সেটা অস্তিত্বেই আসত না। কিন্তু সৃষ্টি আর কর্ম এক নয়। আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সেটা নিজে করে। পিছনে আমরা সৃষ্টি ও কামাই সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকেই তার কাজের কর্তা এবং সেটার প্রতিদানের উপযুক্ত পাত্র বলেছেন। যেমন—তিনি বলেন, ﴿فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ

১১৫৯. আবু দাউদ (কিতাবুল আদাব : ৫০৭৫)। সুনানে কুবরা, নাসায়ি (কিতাবু আমালিল ইয়াওমি ওয়া লাইলাহ : ৯৭৫৬)।

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ অর্থ : 'কেউ জানে না তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কী প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এটা তাদের কর্মের প্রতিদান।' [সাজদা : ১৭] আরও বলেন, ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا﴾ অর্থ : 'যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে।' [বাকারা : ৭২] এখানে হত্যাটা আল্লাহ মানুষের সঙ্গেই সম্পৃক্ত করেছেন। কারণ, কাজটা মানুষই করেছে। এভাবে সকল কাজ মানুষ নিজেই করে, ফলে সে নিজেই তার কর্মের জন্য দায়ী। তা ছাড়া, আল্লাহ আমাদের অনেক কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। বোঝা গেল, আমরা সেগুলো করি, আল্লাহ করেন না। আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। যেমন—আমরা বসি। বসা ব্যাপারটা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি যদি বসা বলতে কিছু সৃষ্টি না করতেন, আমরা বসতে পারতাম না। কিন্তু আমরা যখন বসছি, তখন সেটা আমাদের কাজ হচ্ছে।

তা ছাড়া, আল্লাহ আমাদের কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ অর্থ : 'তোমরা যা ইচ্ছা করো। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম দেখছেন।' [ফুসসিলাত : ৪০] পরকালের পরিণতিকে আমাজের নিজেদের কাজের ফলাফল বলেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝﴾ অর্থ : 'যে একবিন্দু ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে; যে একবিন্দু মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।' [যালযালাহ : ৭-৮] আরও বলেন, ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ অর্থ : 'এটা তাদের কর্মের ফল।' [ওয়াকিয়াহ : ২৪] বোঝা গেল, কাজ মানুষকেই করতে হবে এবং মানুষকেই তার কাজের দায়ভার বহন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালাকে কর্মের কর্তা এবং নিজেদের পরাধীন ভাবলে আখেরাতে উপকার হবে না। আল্লাহর প্রতি কর্মের সম্পৃক্ততা শুধু এদিক থেকে বিশুদ্ধ যে, আল্লাহ তায়ালা সকল কাজের প্রকৃত স্রষ্টা। যদি তিনি কাজগুলো সৃষ্টি না করতেন, তবে অস্তিত্বেই আসত না। তিনি ভালো ও মন্দ সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্বে এনেছেন। অস্তিত্বে আসার পরে সেগুলো বাস্তবায়ন ও ব্যবহার করছে মানুষ। ফলে মানুষের সব কাজ তার হাতের কামাই। সুফল কিংবা কুফল সে-ই ভোগ করবে।

বর্ণিত আছে, একবার উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর কাছে এক চোর ধরে নিয়ে আসা হয়। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন—চুরি করলে কেন? সে বলল, আল্লাহ তাকদিরে লিখে রেখেছেন, তাই। উমর রাযি. তাকে প্রথমে বেত্রাঘাত করলেন। এরপর তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন, হাত কাটা

হলো চুরির শাস্তি। আর বেত্রাঘাত হলো আল্লাহর উপর মিথ্যাচারের শাস্তি। অর্থাৎ, সে নিজের অন্যায়কে তাকদিরের দোহাই দিয়ে ঢাকতে চেয়েছে। সে বলতে চেয়েছে—আল্লাহ ভাগ্যে চুরি লিখেছেন, তাই করেছে। অথচ বাস্তবতা হলো, সে নিজে চুরিকে বেছে নিয়েছে। আল্লাহ তাকে চুরি করতে বাধ্য করেননি।[১১৬০]

মোটকথা, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ তাঁর ইচ্ছা ও স্বাধীনতামতো ঈমান ও কুফর, ভালো ও মন্দ বাছাই করে নিতে পারে। আল্লাহ তাকদির লিখেছেন, তাই মানুষ বাধ্য—এমন নয়। তাকদিরের লিখন মানুষকে অন্যায় কাজে বাধ্য করে না। কারণ, আল্লাহ সবকিছু জানেন। ফলে তিনি যেভাবে জেনেছেন সেভাবে লিখেছেন। তা ছাড়া, আল্লাহ কার ভাগ্যে কী লিখেছেন সেটা কারও জানা নেই। ফলে আল্লাহ কী লিখেছেন সেটার সঙ্গে মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষকে প্রশ্ন করা হবে আল্লাহর নির্দেশ পালন করেছে কি না। যদি নির্দেশ পালন করে, সে মুক্তি পাবে; অমান্য করলে শাস্তি পাবে। তাকদিরে আল্লাহ তায়ালা কী লিখেছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সুযোগই পাবে না।

তাকদির নিয়ে বিতর্ক ও ঘাঁটাঘাঁটি নিষিদ্ধ

তাকদির নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি ও সংশয়ের ফলেই ইমাম আজম এ ব্যাপারে মোটামুটি লম্বা আলোচনা করেছেন। নতুবা এক্ষেত্রে সাধারণ নীতি হলো নীরব থাকা, ইজমালি ঈমান আনা। অতিরিক্ত ঘাঁটাঘাঁটি না করা।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'যখন তাকদির নিয়ে আলোচনা হয়, তখন সেটা থেকে বিরত থাকো।'[১১৬১] আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাকদির নিয়ে কথা বলবে, কিয়ামতের দিন তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আর যে কথা বলবে না, তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না।'[১১৬২] আলি রাযি.-কে তাকদির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'অন্ধকার পথ, এ পথে যেয়ো না।' তাকে আবারও জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'গভীর সমুদ্র, এতে নেমো না।' তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি

১১৬০. তালবিসুল আদিল্লাহ (৪৭)।

১১৬১. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (সাওবান : ২/৯৬; হাদিস নং ১৪২৭)। আল মাতালিবুল আলিয়াহ (কিতাবুল ঈমান ওয়াত তাওহিদ : ২৯৫৬)।

১১৬২. সুনানে ইবনে মাজা (আবওয়াবুস সুন্নাহ : ৮৪)।

বলেন, 'আল্লাহর গোপন রহস্য, খুঁড়তে যেয়ো না।'[১১৬৩] ফলে বিনা প্রয়োজনে তাকদির নিয়ে বিতর্ক ও অনুসন্ধান বর্জন গোটা উম্মাহর সর্বসম্মত আকিদা।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন, 'আমি তাকদির নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি। এতে আমার অস্থিরতা বেড়েছে। আবার চিন্তা করেছি, তখন অস্থিরতা-পেরেশানি আরও বেড়েছে। শেষে আমি উপলব্ধি করেছি—তাকদির সম্পর্কে সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী যে এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা থেকে সবচেয়ে দূরে। আর তাকদির সম্পর্কে সে সবচেয়ে বড় মূর্খ, যে এটা নিয়ে বেশি ব্যস্ত।' আমর ইবনুল আলা বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ হেদায়াত দেন, আল্লাহই গোমরাহ করেন। যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কীভাবে? আমি তাকে বলব, আমার কাছ থেকে দূর হও।'[১১৬৪]

ইমাম আজম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (তাকদিরের ক্ষেত্রে) **'আমি তা-ই বলি যা বলেছেন আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলি (মুহাম্মাদ আল বাকের মৃত : ১১৪ হি.) : 'আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বাধ্যবাধকতা (জবর) নেই। আবার মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতাও (তাফবিজ) নেই। চাপাচাপি নেই, ছাড়াছাড়িও নেই। আল্লাহ মানুষের সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না। মানুষের যে বিষয়ে জ্ঞান নেই তথা তাকদির নিয়ে অনুসন্ধান তিনি পছন্দ করেন না।'**[১১৬৫]

আবু হাফস বুখারি ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেছেন, 'জগতের ভালোমন্দ সবকিছু নির্ধারিত। আহলে সুন্নাতের সকল ফকিহ এ ব্যাপারে একমত। ফলে তোমরা তাকদির নিয়ে বিতর্ক করো না।'[১১৬৬]

ইমাম তহাবি রহ. বলেন, 'তাকদির সৃষ্টিজগতের ব্যাপারে আল্লাহর এক গোপন রহস্য। আল্লাহর নিকটবর্তী কোনো ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত নবিরও এ সম্পর্কে জ্ঞান নেই। বরং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি এবং অধিক চিন্তাভাবনা দুর্ভাগ্য বয়ে আনে, বঞ্চিত করে, অবাধ্যতার পথে নিয়ে যায়। সুতরাং তাকদির নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা এবং মনের কুমন্ত্রণার ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, আল্লাহ

১১৬৩. তালবিসুল আদিল্লাহ (৫১)। আশ-শরিয়াহ, আজুররি (২/৮৪৪)।
১১৬৪. আত-তামহিদ, ইবনে আবদিল বার (৬/৬৭)।
১১৬৫. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১১৯)।
১১৬৬. প্রাগুক্ত (১২২)।

তায়ালা সৃষ্টিজগতের কাছ থেকে তাকদিরের জ্ঞান ঢেকে রেখেছেন। এর পিছনে পড়তে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'তিনি যা করেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন না, কিন্তু তারা যা করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' সুতরাং কেউ যদি বলে, 'তিনি কেন এটা করলেন,' তবে সে আল্লাহর কিতাবের আইনকে অমান্য করল। আর যে আল্লাহর কিতাবের আইন অমান্য করে সে কাফের।'[১১৬৭]

ইমাম তহাবি আরও বলেন, 'বান্দার জানা কর্তব্য, শুরু থেকেই সৃষ্টির প্রত্যেকটি বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার সর্বাঙ্গীণ জ্ঞান রয়েছে। তাই তিনি সুচারুরূপে এবং সুদৃঢ়ভাবে সকলের তাকদির নির্ধারণ করেছেন। আসমান ও যমিনের কারও পক্ষে এটা রদ কিংবা বাতিল করার সাধ্য নেই। এটার বিরুদ্ধাচরণ কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজনের সামর্থ্য নেই। এটাই দৃঢ় ঈমান এবং প্রকৃত জ্ঞান। আল্লাহ তায়ালার তাওহিদ এবং রবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি। ...সুতরাং ধ্বংস সে ব্যক্তির জন্য যে তাকদির নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়; অসুস্থ অন্তর দিয়ে এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে। এভাবে নিছক অনুমানের বশবর্তী হয়ে সুপ্ত জ্ঞানের সন্ধানে ঘোরে। শেষে পরিণত হয় মিথ্যুক পাপাচারীতে।'[১১৬৮]

১১৬৭. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১৭)।

১১৬৮. প্রাগুক্ত (১৮-১৯)।

আখেরাতের উপর ঈমান

আখেরাতের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

একদিন এই বিশ্বজগতের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সকল প্রাণী মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বে। পচেগলে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তায়ালা নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া সৃষ্টির অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো আবারও একত্রে জড়ো করবেন। তাতে রুহ ফিরিয়ে দেবেন। এভাবে সকলে পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে। সূচনা হবে এক নতুন জীবনের, এক অনন্ত কালের যাত্রার, যাকে আমরা আখেরাত বা পরকাল নামে জানি। পরকালে বিশ্বাস ঈমানের ছয়টি ভিত্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। ফলে কেউ যদি এটা অস্বীকার করে, তবে তাফের হয়ে যাবে।

কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা পরকাল প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ অর্থ : '(শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হলে) তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? বস্তুত রহমান আল্লাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রাসুলগণ সত্য বলেছিলেন।' [ইয়াসিন : ৫২] অন্যত্র বলেন, ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝٧٨ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝٧٩﴾ অর্থ : 'সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচেগেলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।' [ইয়াসিন : ৭৮-৭৯] আল্লাহ বলেন, ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ অর্থ : 'অতঃপর নিশ্চয়ই তোমাদের কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করা হবে।' [মুমিনুন : ১৬] আরও বলেন, ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ অর্থ : 'কিন্তু যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে তারা বলবে, তোমরা

আল্লাহর বিধান অনুসারে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই তো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতে না।' [রুম : ৫৬]

যুক্তিরও দাবি—পরকাল থাকা উচিত। নতুবা পৃথিবীতে মানবজীবনের কোনো অর্থ থাকে না। জগতের এত ব্যস্ততা এত কর্মযজ্ঞ অর্থবহ হয় না। এখানকার জীবন ক্ষণস্থায়ী। অথচ এই স্বল্পস্থায়ী জীবনও নানা জুলুম, জটিলতা, বিশৃঙ্খলা, মারামারি-হানাহানি, স্বার্থপরতা, অন্যায় ও বঞ্চনা দিয়ে ভরপুর। ফলে আরেকটা জীবন প্রয়োজন। অন্তত জগতের সকল জুলুম ও বঞ্চনা মেটানোর জন্য, ভালো ও মন্দের প্রতি, সৎকর্মশীল আর অসৎ লোকদের মাঝে ইনসাফ করার জন্য হলেও পরকাল প্রয়োজন। এই ইনসাফটুকু না হলে পৃথিবীতে ভালো আর মন্দ, নৈতিকতা-অনৈতিকতা এবং পাপ-পুণ্যের মাঝে কোনো ফারাক থাকে না। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এই যুক্তি তুলে ধরে বলেন, ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ অর্থ : 'দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে এদের মুমিন ও সৎকর্মশীলদের সমান গণ্য করব? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ।' [যাসিয়াহ : ২১] পরকাল না থাকলে পৃথিবীর সবকিছু অর্থহীন বিষয়ে পরিণত হয়। অথচ আল্লাহ এ সবকিছু অর্থপূর্ণ করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾﴾ অর্থ : 'আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনোকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না। নিশ্চয়ই ফয়সালার দিন তাদের সবার জন্য অপেক্ষমাণ।' [দুখান : ৩৮-৪০]

জ্ঞানগত ও যৌক্তিক পন্থায় পরকাল থাকার প্রমাণ দিয়ে আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾﴾ অর্থ : 'হে মানুষ, পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও, তবে অবধান করো—আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা থেকে, তারপর শুক্র থেকে,

তারপর জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতির মাংসপিণ্ড থেকে—তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য। আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমি তোমাদের শিশুরূপে বের করি, পরে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারও কারও মৃত্যু ঘটানো হয় আর কাউকে পৌঁছে দেওয়া হয় হীনতম বয়সে, যাতে মানুষ আগের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তুমি ভূমিকে দেখো শুষ্ক। এতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। নিশ্চয়ই কিয়ামত আসবেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর নিশ্চয়ই কবরে যারা আছে আল্লাহ তাদের উত্থিত করবেন।' [হজ : ৫-৭]

ইমাম রাযি রহ. বলেন, ধরুন পরকাল বলতে কিছু নেই। তবুও আমরা এর উপর ঈমান আনলাম। যথাযথ প্রস্তুতি নিলাম। এরপর যদি সত্যি সত্যিই পরকাল চলে আসে, তবে তো আমরা বেঁচে যাব। অস্বীকারকারীরা ধ্বংস হবে। আর যদি পরকাল কখনো না আসে, তবে এ বিশ্বাসে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। হ্যাঁ, এতটুকু যে, দুনিয়ার ভোগবিলাস মন ভরে উপভোগ করতে পারলাম না। কিন্তু এটা কোনো ক্ষতির বিষয় নয়। বরং এই সাময়িক ভোগবিলাসের জন্য চিরস্থায়ী ভবিষ্যৎকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া নির্বুদ্ধিতা। ভোগের ক্ষেত্রে মানুষ, পশুপাখি, কুকুর-বিড়াল সব সমান। ফলে এটাকে বড় করে না দেখে পরকালে ঈমান আনাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ।[১১৬৯]

কবর : পরকালের প্রথম মঞ্জিল

কবর মানুষের পরকালের সফরের প্রথম স্টেশন। সেখান থেকেই পরকালের যাত্রার বাস্তবতা সামনে আসতে থাকে। পুণ্যবান হলে কবর থেকেই সুফলপ্রাপ্তি শুরু হয়। কাফের বা গুনাহগার হলে কবর থেকেই ভয়ংকর পরিণতির সূচনা ঘটে। এটা কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত সুস্পষ্ট ও সন্দহাতীত বাস্তবতা। উসমান ইবনে আফফান রাযি. কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় প্রচুর কাঁদতেন। তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাকে বলা হলো, আপনি জান্নাত-জাহান্নামের কথা মনে করেও তো এত কাঁদেন না। কবর দেখে এত কাঁদার অর্থ কী? তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'কবর আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল। যদি কেউ এখানে রক্ষা পায়,

১১৬৯. দেখুন : শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৯২)।

তবে পরবর্তী সকল মঞ্জিল তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর যদি কেউ এখানে ধরা খায়, তবে পরবর্তী সকল মঞ্জিল তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে।' রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেছেন, 'কবরের চেয়ে ভয়াবহ কোনো দৃশ্য আমি দেখিনি।'[১১৭০]

কবরে শাস্তি হওয়ার বিষয়টি ইসলামের সুপ্রমাণিত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত মতে কবরের শাস্তি সত্য। এটা সকল কাফের এবং একদল গুনাহগার মুমিনের জন্য প্রযোজ্য। কেবল মুতাযিলা ও জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় এটাকে অস্বীকার করে। সেটা তাদের বিভ্রান্তি।[১১৭১]

কুরআনের একাধিক আয়াত এবং অসংখ্য হাদিস দ্বারা কবরের শাস্তির বাস্তবতা প্রমাণিত। যেমন—আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ﴾ অর্থ : 'গুরু শাস্তির পূর্বে এদের আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব।' [সাজদা : ২১] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا۟ ۖ وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ۝ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ۝﴾ অর্থ : 'অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন গোত্রকে পরিবেষ্টন করল শোচনীয় শাস্তি। সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন আদেশ করা হবে—ফেরাউন গোত্রকে প্রচণ্ডতম শাস্তিতে দাখিল করো।' [গাফের: ৪৫-৪৬]

ইমাম আজম বলেন, **'কবরে বান্দার শরীরে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া সত্য। কবরের চাপ ও শাস্তি সত্য। এটা সকল কাফেরের জন্য এবং কিছু গুনাহগার মুমিনের জন্য।'**[১১৭২] ইমাম আরও বলেন, **'আমরা বিশ্বাস করি, কবরের আযাব নিঃসন্দেহে হবেই হবে। কারণ, এ সম্পর্কে একাধিক হাদিস এসেছে।'**[১১৭৩] ইমাম তহাবি রহ. বলেন, 'আমরা কবরের আযাবে বিশ্বাস করি এর উপযুক্ত লোকদের জন্য।

১১৭০. তিরমিযি (আবওয়াবুয যুহদ : ২৩০৮)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুয যুহদ : ৪২৬৭)। মুসতাদরাকে হাকেম (কিতাবুল জানায়েয : ১৩৭৭)।

১১৭১. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১০৩৩)।

১১৭২. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।

১১৭৩. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৫৩-৫৪)।

(আমরা বিশ্বাস করি) কবর হয়তো জান্নাতের একটি বাগান, নয়তো জাহান্নামের একটি গর্ত।'[১১৭৪]

ইমাম আজম রহ. নিজস্ব সনদে বারা ইবনে আযেব রাযি. সূত্রে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন : 'মুমিনকে যখন কবরে রাখা হয় ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? সে বলে, আল্লাহ। তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নবি কে? সে জবাবে বলে, মুহাম্মাদ। তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, ইসলাম। তখন তার কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং সে জান্নাতে তার অবস্থান দেখতে পায়। যখন কোনো কাফেরকে রাখা হয়, ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং প্রশ্ন করেন, তোমার রব কে? সে বলে, হায়! জানি না। যেন কিছু হারিয়ে ফেলছে এমন। তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নবি কে? সে বলে, জানি না। তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কী? সে এবারও আফসোস করে বলে, হায়! আমি জানি না। তখন তার কবরকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় এবং সে জাহান্নামে তার আবাস দেখতে পায়। অতঃপর তাকে প্রচণ্ড এক আঘাত করা হয় এবং তার চিৎকার জিন ও মানুষ ছাড়া সবাই শুনতে পায়। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তেলাওয়াত করেন, ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের মজবুত বাক্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। আর আল্লাহ জালেমদের পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন।' [ইবরাহিম : ২৭][১১৭৫]

আহলে সুন্নাতের সকল আলেমের নিকট কবরের শাস্তি সত্য। এ ব্যাপারে সকল মাসলাক-মাশরাব নির্বিশেষে হকপন্থি আলেমগণ একমত। ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর শাগরেদ মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল আর-রাযি বলেন, 'কবরের শাস্তি (সত্য হওয়ার ব্যাপারে) কোনো সন্দেহ নেই। একাধিক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে এটা বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে কোনো মতপার্থক্য নেই।'[১১৭৬]

১১৭৪. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৫)।
১১৭৫. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৫৪-৫৫)।
১১৭৬. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৪৭)।

ইমাম আজম রহ. বলেন, **“যে ব্যক্তি বলবে, আমি পরকালের শাস্তি সম্পর্কে নিশ্চিত জানি না, সে অভিশপ্ত জাহমিয়্যাহদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তার এ কথার মাধ্যমে সে মূলত আল্লাহর বক্তব্যকে অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যান করল। আল্লাহ বলেছেন,** ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ﴾ **অর্থ : 'আমি তাদের দুইবার শাস্তি দান করব। অতঃপর তাদের নিয়ে যাওয়া হবে কঠোর শাস্তির দিকে।' [তাওবা : ১০১] অন্যত্র বলেছেন,** ﴿اِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ **অর্থ : 'নিশ্চয়ই জালেমদের জন্য এ ছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।'” [তুর : ৪৭] ইমাম আজমের মতে, “এখানে 'আরও শাস্তি' বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে কবরের শাস্তি।”**[১১৭৭]

আবুল লাইস সমরকন্দি লিখেন, 'জাহমিয়্যাহ, কাদারিয়্যাহ ও মুতাযিলারা কবরের আযাব অস্বীকার করে। কারণ, তাদের কাছে আকল চোখ ও কানের মতো একটি ইন্দ্রিয়। তাদের যুক্তি হলো, আমরা মৃতকে কোনো প্রকারের শাস্তি অনুভব করতে দেখি না। সুতরাং আমাদের চোখের বাইরে গেলেও সে কোনো শাস্তি অনুভব করবে না এটাই স্বাভাবিক! এভাবে তারা কবরের আযাব অস্বীকার করে। জড়বস্তুর তাসবিহ অস্বীকার করে। তাদের যুক্তি, তারা তাসবিহ পাঠ করলে আমরা শুনতে পেতাম। একই যুক্তিতে তারা মিযান, পুলসিরাত, মিরাজ, আল্লাহর দিদার—সবকিছু অস্বীকার করে। অথচ মানুষের বিবেক সীমাবদ্ধ। সবকিছু চিন্তা করতে সক্ষম নয়। এ জন্য রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করো। সৃষ্টিকর্তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করো না।'[১১৭৮]

কবরের শাস্তি দৈহিক নাকি আত্মিক? কবরের শাস্তি রুহ ও শরীর উভয়টির উপর হবে। যদিও ব্যাপারটি নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে, কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর স্বাভাবিক বর্ণনায় কবরের আযাব রুহ ও শরীর উভয়টির উপর প্রযোজ্য বোঝা যায়। তাই ইমাম আজম এটাকেই গ্রহণ করেছেন। ইমাম বলেন, **'কবরে বান্দার শরীরে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া সত্য। কবরের চাপ ও শাস্তি সত্য।'**[১১৭৯] উক্ত বক্তব্যে ইমামের কাছে রুহ ও শরীর দুটোর উপর শাস্তি বা শান্তি হওয়া সুস্পষ্ট। কিন্তু কোনো কারণে যদি দেহ দাফন না করা হয় কিংবা বিলুপ্ত হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে

১১৭৭. আল-ফিকহুল আবসাত (৫২)।

১১৭৮. শরহুল ফিকহিল আকবার, সমরকন্দি (৩০)।

১১৭৯. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।

আল্লাহ নতুন দেহ তৈরি করে তাতে আত্মা প্রবেশ করিয়ে শান্তি বা শাস্তি প্রদান করতে পারেন। অথবা শ্রেফ আত্মার উপরও শান্তি পা শাস্তি দিতে পারেন। মোটকথা, কবরের শাস্তির ব্যাপারটি প্রমাণিত। কিন্তু সেটা কীভাবে হবে তার রূপরেখা আল্লাহ ভালো জানেন। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

কবরের চাপ সত্য : যদি মৃত ব্যক্তি পুণ্যবান হয়, তবে কবরে তার কোনো শাস্তি হবে না। শুধু একবার চাপ দেওয়া হবে এবং সেটাও তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক হবে না। যদি গুনাহগার হয়, তবে চাপ এবং আল্লাহ চাইলে শাস্তি দুটোই হবে।

বিষয়টি কিছুটা মতভেদপূর্ণ। তবে আমরা যা উল্লেখ করেছি এটাই শুদ্ধতর বক্তব্য। অর্থাৎ, কবরের শাস্তি সবার জন্য না হলেও চাপ সবার জন্য প্রযোজ্য। মুমিন-কাফের, পুণ্যবান-গুনাহগার কেউ এ চাপ থেকে রক্ষা পাবে না। এটা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহর রাসুল (ﷺ) সাদ বিন মুআজ রাযি.-এর শাহাদাতের পরে তাঁর ব্যাপারে বলেন, 'কবরে চাপ দেওয়া হয়। যদি কেউ এটা থেকে নিষ্কৃতি পেত, তবে সে হতো সাদ বিন মুআজ।'[১১৮০] অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, 'যদি কেউ কবরের চাপ থেকে রক্ষা পেত, তবে সে হতো সাদ বিন মুআজ। কিন্তু তাকেও একটি চাপ দেওয়া হয়েছে, অতঃপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'[১১৮১] তৃতীয় আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তার জন্য আরশ কেঁপে উঠেছে। আকাশের দরজা খুলে গিয়েছে। সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জানাযায় উপস্থিত হয়েছে। তবুও কবরে তাকে একটা চাপ দিয়ে এরপর ছাড়া হয়েছে।'[১১৮২] অন্য একটি হাদিস দেখলে বোঝা যায়, শিশুরাও এটা থেকে অব্যাহতি পাবে না। আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যদি কেউ কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেত, তবে এই বাচ্চা পেত।'[১১৮৩]

১১৮০. মুসনাদে আহমদ (মুসনাদে আয়েশা : ২৪৯২১)। সহিহ ইবনে হিব্বান (কিতাবুল জানায়েয : ৩১১২)।
১১৮১. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস : ১০/৩৩৪; হাদিস নং ১০৮২৭)। আল-মুজামুল আওসাত (মুহাম্মাদ ইবনে জাফর : ৬/৩৪৯; হাদিস নং ৬৫৯৩)।
১১৮২. সুনানে কুবরা, নাসায়ি (কিতাবুল জানায়েয : ২১৯৩)। আল-মুজামুল কাবির (বাকুস সিন : ৫৩৩৩)
১১৮৩. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (খালেদ ইবনে যায়দ : ৪/১২১; হাদিস নং ৩৮৫৮)। আল-আহাদিসুল মুখতারাহ, মাকদেসি (মুসনাদে আনাস ইবনে মালেক) (১৮২৪)।

তবে আবু হুরায়রা রাযি.-এর একটি হাদিস দ্বারা বিপরীত বোঝা যায়। সেখানে মুনকার-নাকির কর্তৃক তিন প্রশ্নের পরে দেখা যায় মুমিনের কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়, তাকে ঘুমানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। চাপের কোনো কথা নেই। বিপরীতে কাফের ও মুনাফিক প্রশ্নের জবাব দিতে না পারায় তাদের কবরকে চাপ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কবর তাদের এমনভাবে চাপ দেয় যে, তাদের পাঁজরের হাড়গুলো একটি অপরটির মাঝে ঢুকে যায়।[১১৮৪] এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, মুমিনকে কবরে চাপ দেওয়া হয় না।

উলামায়ে কেরাম দুই ধরনের হাদিসের সমন্বয় সাধনের জন্য বলেন, উক্ত হাদিসে চাপের কথা উল্লেখ নেই বলে চাপ দেওয়া হবে না এমন নয়। কারণ, অন্যান্য হাদিসে সবার জন্য চাপ প্রমাণিত। সুতরাং উক্ত হাদিসকে সংক্ষিপ্ত ধরতে হবে। দ্বিতীয়ত, চাপ সবার জন্য সমান হলেও এর ফলাফল সবার জন্য সমান হবে না। এটা আল্লাহর ইনসাফের জন্য শোভনীয়ও নয়। ফলে এটা কাফের ও গুনাহগারদের জন্য প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক হবে। বিপরীতে মুমিন ও মুত্তাকিদের জন্য সহনীয় পর্যায়ের হবে। সবাইকে চাপ দেওয়ার রহস্য সম্পর্কে হাকিম তিরমিযি বলেন, 'পৃথিবীর সকলেই কোনো-না-কোনো পাপ করে থাকে। ফলে কবরে রাখামাত্রই তাকে সেটার একটা বিনিময় দেওয়া হবে। এরপর রহমত শুরু হবে।'[১১৮৫] যেহেতু মুমিনের চাপ তার জন্য যন্ত্রণার হবে না, এ জন্য হতে পারে কোনো কোনো বর্ণনায় এটাকে উল্লেখ করা হয়নি।

কবরের শাস্তি সবার জন্য নয় : কবরের চাপ (উপরের ব্যাখ্যাসহ) মুমিন-কাফের-মুনাফিক সবার জন্য প্রযোজ্য হলেও কবরের শাস্তি সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাঁর প্রিয় বান্দাদের এ শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। গুনাহগার মুমিন এবং কাফের-মুনাফিকদের তিনি শাস্তি দেবেন। এটা ইমামের কথায়ও স্পষ্ট।

১১৮৪. তিরমিযি (আবওয়াবুল জানায়েয : ১০৭১)। ইবনে হিব্বান (কিতাবুল জানায়েয : ৩১১৭)।
১১৮৫. হাশিয়াতুস সুয়ূতি আলা সুনানিন নাসায়ি (৪/১০২)।

ইমাম রহ. বলেন, **'কবরের চাপ ও শাস্তি সত্য। এটা সকল কাফেরের জন্য এবং কিছু গুনাহগার মুমিনের জন্য।'**[১১৮৬] অর্থাৎ, সকল মুমিনের জন্য নয়। ইমাম তহাবি বলেন, 'আমরা কবরের আযাবে বিশ্বাস করি এর উপযুক্ত লোকদের জন্য।'[১১৮৭] ফলে দেখা যাচ্ছে, কবরের শাস্তি সবাইকে পেতে হবে এমনটা জরুরি নয়। বরং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে অনেককেই রক্ষা করবেন। নবি-রাসুলদের কবরে কোনো শাস্তি হবে না। মুমিনদের নাবালেগ সন্তানেরও কবরে কোনো শাস্তি হবে না। একইভাবে সাধারণ পুণ্যবান মুমিনদেরও আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সবসময় কবরের শাস্তি থেকে পানাহ চাইতেন। কিন্তু সেটা নিজের জন্য নয়, বরং আল্লাহর সর্বোচ্চ দাসত্ব প্রকাশ, তাঁর প্রতি পূর্ণ নিবেদন, তাঁর অনুগ্রহের প্রতি ওয়াফাদারি এবং মুমিনদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য।[১১৮৮]

হাদিসে বেশ কিছু আমলকে কবরের শাস্তির কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক মুমিনের এসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। যেমন—প্রস্রাবের পর সঠিকভাবে পবিত্র না হওয়া, গিবত ও চোগলখুরি করা। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে কোনো কবিরা গুনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। (বরং শাস্তির কারণ হলো) তাদের একজন প্রস্রাব থেকে যথাযথভাবে পবিত্র হতো না। আরেকজন পরনিন্দা ও কুৎসা রটিয়ে বেড়াত...।'[১১৮৯] কবরে শাস্তির আরেকটি কারণ হলো, ঋণ শোধ না করে মৃত্যুবরণ করা। সাদ ইবনুল আতওয়াল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ভাই মৃত্যুর সময় তিনশত দিনার এবং কিছু সন্তান রেখে গেল। আমি দিনারগুলো তাদের পিছনে খরচ করতে চাইলাম। আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বললেন, 'তোমার ভাই ঋণের কাছে আটকে আছে। আগে তার ঋণ পরিশোধ করো। তখন আমি

১১৮৬. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।

১১৮৭. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৫)।

১১৮৮. তালবিসুল আদিল্লাহ (৫৬৯)। বাহরুল কালাম (১৯৩)।

১১৮৯. বুখারি (কিতাবুল ওযু : ২১৮; কিতাবুল জানায়েয : ১৩৬১। মুসলিম (কিতাবুত তাহারাত : ২৯২)।

ঋণ পরিশোধ করে রাসুলুল্লাহর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, ঋণ শোধ করেছি...।'[১১৯০]

কবরের শাস্তি থেকে রক্ষাকারী আমল : রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বেশ কিছু আমল শিখিয়ে গিয়েছেন। ফলে দ্বীন ও ঈমানের উপর অবিচল থাকার পাশাপাশি নিম্নের আমলগুলোর প্রতিও যত্নবান হতে পারলে আশা করা যায় আল্লাহ কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। কবরের আযাব থেকে রক্ষাকারী কিছু বিষয় হলো :

- **আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করা :** মিকদাম ইবনে মাদিকারিব রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে শহিদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। (এক.) তাকে প্রথমেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (দুই.) সে কবরে থেকে জান্নাতে তার বাসস্থান দেখতে পায়। (তিন.) কবরের ফেতনা (প্রশ্ন) থেকে নিষ্কৃতি পায়। (চার.) কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদে থাকবে। (পাঁচ) তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেওয়া হবে, যার একটি ইয়াকুত গোটা পৃথিবী ও তার ভিতরে যা-কিছু আছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম। (ছয়.) তাকে জান্নাতের বাহাত্তর জন হুরের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হবে। সত্তর জন নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে তার শাফায়াত কবুল করা হবে।'[১১৯১]

- **পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করা :** রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করবে, কবরে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না।'[১১৯২]

- **সদকা প্রদান করা :** উকবা ইবনে আমের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সদকা কবরের আগুনকে নিভিয়ে দেয়।'[১১৯৩]

- **নিয়মিত সুরা মুলক পড়া এবং তদনুযায়ী আমল করা :** ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুলের এক সাহাবি অসতর্ক অবস্থায় একটি কবরের

১১৯০. মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুশ শামিয়্যিন : ১৭৫০০)। সুনানে কুবরা, বাইহাকি (কিতাবু আদাবিল কাযি : ২০৫৬২)।

১১৯১. তিরমিযি (আবওয়াবু ফাযায়িলিল জিহাদ : ১৬৬৩)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুল জিহাদ : ২৭৯৯)।

১১৯২. সুনানে কুবরা, নাসায়ি (কিতাবুল জানায়েয : ২১৯০)। মুসনাদে আহমদ (আওয়ালু মুসনাদিল কুফিয়্যিন : ১৮৬০০)।

১১৯৩. আল-মুজামুল কাবির, তাবরানি (আকিল : ১৭/২৮৬; হাদিস নং ৭৮৭)। বর্ণনাটি যয়িফ।

উপর তাঁবু গাড়লেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন, সেখানে এক ব্যক্তি সুরা মুলক তেলাওয়াত করছে। সাহাবি রাসুলের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি না জেনে একটি কবরের উপর তাঁবু স্থাপন করি। তখন কবরে থাকা ব্যক্তিকে সুরা মুলক তেলাওয়াত করতে শুনি। আল্লাহর রাসুল বললেন, 'এটা আপদ প্রতিহতকারী, বিপদ থেকে হেফাজতকারী, কবরের আযাব থেকে সুরক্ষা দানকারী।'[১১৯৪]

- **জুমার দিন অথবা জুমার রাতে মৃত্যুবরণ করা :** ইমাম আজম রহ. নিজস্ব সূত্রে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, **'যে ব্যক্তি জুমার দিন মারা যাবে, তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।'**[১১৯৫]

- **জীবিত কর্তৃক মৃতের জন্য দোয়া ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা :** আউফ ইবনে মালেক আশজায়ি বলেন, আমি একটি জানাযার পরে আল্লাহর রাসুলকে মৃতের জন্য এই দোয়া করতে শুনলাম : 'হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করুন। তাকে দয়া করুন। তার গুনাহ মাফ করে দিন। তাকে নিরাপদে রাখুন। তার আগমনকে মহানুভবতার সঙ্গে গ্রহণ করুন। কবরকে তার জন্য প্রশস্ত করে দিন। তাকে আপনি পানি, বরফ ও শিলা দ্বারা ধৌত করুন। তাকে আপনি সেভাবে পবিত্র করে দিন যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়। আপনি তাকে তার দুনিয়ার গৃহের চেয়ে উত্তম গৃহ দান করুন, দুনিয়ার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার দান করুন। তার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করুন। আর তাকে কবরের ফেতনা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।' আউফ বলেন, রাসুলের দোয়া শুনে আমার মন বলে উঠল, হায়! আমি যদি সেই মৃতের জায়গায় থাকতাম।[১১৯৬]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক নামাযে কবরের আযাব থেকে মুক্তি চাইতেন। আল্লাহর রাসুলের স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)

১১৯৪. তিরমিযি (আবওয়াবু ফাযায়িলিল কুরআন : ২৮৯০)। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস : ১২/১৭৫; হাদিস নং ১২৮০১)। তবে হাদিসটির একজন রাবি ইয়াহইয়া ইবনে আমর ইবনে মালেক দুর্বল। এ কারণে আলেমগণ হাদিসটিকে যয়িফ বলেছেন।

১১৯৫. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৫৫)। শরহু মুসনাদি আবি হানিফা (৪২৪)।

১১৯৬. মুসলিম (কিতাবুল জানায়েয : ৯৬৩)। তিরমিযি (আবওয়াবুল জানায়েয : ১০২৫)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুল জানায়েয : ১৫০০)।

নামাযের ভিতরে এই দোয়া পড়তেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনার কাছে মিথ্যুক কানা দাজ্জালের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে শরণ চাইছি। আমি আপনার কাছে গুনাহ ও ঋণের বোঝা থেকে আশ্রয় কামনা করছি।'[১১৯৭]

কাফেরদের কবরের শাস্তি বন্ধ থাকে কি? আল-ওয়াসিয়্যাহ গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা মোল্লা হাসান ইবনে ইস্কান্দার হানাফি 'বাহরুল কালাম'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, 'যদি কেউ কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তার শাস্তি হতে থাকে। কেবল জুমার দিন ও রমজানে আল্লাহর রাসুলের সম্মানের কারণে শাস্তি দেওয়া হয় না।'[১১৯৮] নাসাফি 'বাহরুল কালাম'-এ কোনো সূত্র ছাড়া এটি বর্ণনা করেছেন।[১১৯৯] আকিদাহ তহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যাতা মাহমুদ কওনভিও তাঁর 'আল-কালাইদ' গ্রন্থে এটাকে উল্লেখ করেছেন।[১২০০] উক্ত বক্তব্যটি সম্ভবত কাযি জগন হানাফি গুজরাটির 'খিযানাতুর রিওয়ায়াত'-শীর্ষক ফিকহি সংকলন থেকে অবচয়িত।[১২০১] 'খিযানাতুর রিওয়ায়াত'-এর দুটি পাণ্ডুলিপি অধমের হস্তগত হয়েছে। তাতে দেখা গেছে—কেবল উপরের বক্তব্য নয়, পুরো বইয়ের বিভিন্ন জায়গাতে এমন অসংখ্য অদ্ভুত বক্তব্য রয়েছে। খুব সম্ভবত লেখক এসব বিষয় উল্লেখের ক্ষেত্রে তাহকিক ও তামহিসের উপর যথাযথ গুরুত্ব দেননি। যা-ই হোক, লেখক গুজরাটি জুমার দিন ও রমযান মাসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্মানের কারণে কাফেরদের শাস্তি স্থগিত রাখার বিষয়টি 'আল-আকিদাতুল মুঈনিয়্যাহ আন নাসাফিয়্যাহ'র উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন। অন্য কোনো হাদিস বা যৌক্তিক দলিল বর্ণনা করেননি। কিন্তু আমরা কুরআন-সুন্নাহ কিংবা নাসাফি রহ.-এর আকিদাগ্রন্থ কোথাও এ ধরনের বক্তব্য খুঁজে পাইনি। হতে পারে লেখক সহিহাইনের প্রসিদ্ধ

১১৯৭. বুখারি (কিতাবুল আযান : ৮৩২)। মুসলিম (কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াজিউস সালাত : ৫৮৬)।

১১৯৮. আল-জাওহারাতুল মুনিফাহ, মোল্লা হুসাইন হানাফি ৭৯)।

১১৯৯. দেখুন : বাহরুল কালাম (২৫০)।

১২০০. দেখুন : আল-কালাইদ (১২৭)।

১২০১. দেখুন : খিযানাতুর রিওয়ায়াত (পাণ্ডুলিপি), কাযি জগন গুজরাটি (৩৪২-৩৪৩) (দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি ১২৩)।

হাদিসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যেখানে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেছেন, 'যখন রমযানের আগমন ঘটে, তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।'[১২০২]

কিন্তু উক্ত হাদিস বিশুদ্ধ হলেও লেখকের বক্তব্যের দলিল নয়। কারণ, হাদিসটি দ্বারা রমজানে কাফের বা মুমিনদের কবরের শাস্তি বন্ধ রাখা হয় এটা প্রমাণিত হয় না। স্রেফ জাহান্নামের দরজা বন্ধ করার কথা প্রমাণিত হয়। আর কবরের শাস্তি জাহান্নামের বাইরের অতিরিক্ত বিষয়। এ কারণে নববি, ইবনে হাজার আসকালানি, আইনিসহ বড় বড় মুহাদ্দিসের প্রায় প্রত্যেকে উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন রূপক অর্থে। অর্থাৎ, রমজানে নেক কাজে আগ্রহ জন্মে, মন্দ কাজ থেকে দিল সরে যায়। তাদের আযাব বন্ধ থাকে এমন নয়। তথাপি যদি বাহ্যিক অর্থে ধরা হয়, তবুও কাফেররা এর বাইরে থাকবে।[১২০৩]

তা ছাড়া, যৌক্তিকভাবেও জুমা ও রমযান মাসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্মানে কাফেরের কবরের শাস্তি স্থগিত থাকার বিষয়টি অদ্ভুত। কাফের ব্যক্তি যে দুনিয়ার জীবনে জুমা ও রমযান বলে কিছু জানত না, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে নবি বলে শিকার করত না, সেই জুমা ও রমযানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নবিজির সম্মানের কারণে তার কবরের আযাব কীভাবে বন্ধ থাকবে? এমন হলে তো পরকালেও নবির সম্মানে কাফেরদের জাহান্নামের শাস্তি স্থগিত রাখতে হবে। বরং নবির সুপারিশে কাফেরদেরও জান্নাত দিতে হবে। এ জন্য এ ধরনের বক্তব্য সঠিক নয়। ইমাম রহ. বলেন, **কবরের চাপ ও শাস্তি সত্য। এটা সকল কাফেরের জন্য।**[১২০৪]

মুনকার-নাকিরের প্রশ্ন

কবরের শাস্তির মতো মুনকার নাকিরের প্রশ্নও সত্য। আহলে সুন্নাতের সকল ইমামের এটা সর্বসম্মত আকিদা। কেবল মুতাযিলা ও রাফেযিদের একটা অংশ এটাকে অস্বীকার করে।[১২০৫] ইমাম আজম বলেন, **'আমরা বিশ্বাস করি, কবরে**

১২০২. বুখারি (কিতাবু বাদয়িল খালক : ৩২৭৭)। মুসলিম (কিতাবুস সিয়াম : ১০৭৯)।
১২০৩. দেখুন : শরহে মুসলিম, নববি (৭/১৮৮)। উমদাতুল কারি (১০/২৭০)।
১২০৪. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।
১২০৫. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৬৯)।

মুনকার-নাকিরের প্রশ্নও সত্য। কারণ, এ সম্পর্কে একাধিক হাদিস এসেছে।'[১২০৬] ইমাম আরও বলেন, **'কবরে মুনকার-নাকিরের প্রশ্ন সত্য।'**[১২০৭]

সাহল ইবনে মুযাহিম (২১১ হি.) বলেন, এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কাছে এসে বলল, আমি ঈমান নিয়ে সন্দেহে আছি। ইমাম তাকে বললেন, 'যখন কবরে যাবে, মুনকার ও নাকির তোমাকে এসে প্রশ্ন করবে—তোমার দ্বীন কী? তখনও সন্দেহ করবে?' লোকটি তখন অত্যন্ত কাঁদল।[১২০৮]

ইমাম তহাবি রহ. বলেন, "আমরা আল্লাহর রাসুল এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে একাধিক হাদিসে বর্ণিত কবরে মুনকার-নাকিরের 'তোমার রব কে', 'তোমার দ্বীন কী' এবং 'তোমার নবি কে' উক্ত তিনটি প্রশ্নে ঈমান রাখি।"[১২০৯]

ইমাম আজম রহ. নিজস্ব সনদে বারা ইবনে আযেব রাযি. সূত্রে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদিস বর্ণনা করেন : 'মুমিনকে যখন কবরে রাখা হয়, ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? সে বলে, আল্লাহ। তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নবি কে? সে জবাবে বলে, মুহাম্মাদ। তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, ইসলাম। তখন তার কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং সে জান্নাতে তার অবস্থানস্থল দেখতে পায়। আর যখন কোনো কাফেরকে রাখা হয়, ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং প্রশ্ন করেন, তোমার রব কে? সে বলে, হায়! জানি না। যেন কিছু হারিয়ে ফেলেছে এমন। তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নবি কে? সে বলে, জানি না। তাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার দ্বীন কী? সে এবারও আফসোস করে বলে, হায়! আমি জানি না। তখন তার কবরকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় এবং সে জাহান্নামে তার আবাস দেখতে পায়। অতঃপর তাকে প্রচণ্ড এক আঘাত করা হয় যার চিৎকার জিন ও মানুষ ছাড়া সবাই শুনতে পায়। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তেলাওয়াত করেন, ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের মজবুত বাক্য দ্বারা শক্তিশালী

১২০৬. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৫৩-৫৪)।

১২০৭. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।

১২০৮. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১০৯)।

১২০৯. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৫)।

করে, পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। আল্লাহ জালেমদের পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন।' [ইবরাহিম: ২৭][১২১০]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেন, 'আমার কাছে ওহি পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের কবরে পরীক্ষা করা হবে।'[১২১১] এখানে পরীক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কবরে মুনকার ও নাকির নামক দুই ফেরেশতা কর্তৃক তিনটি প্রশ্ন : 'তোমার রব কে?' 'তোমার দ্বীন কী?' 'তোমার রাসুল কে' অথবা 'ইনি কে?'

বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে এক আনসারের জানাযার জন্য বের হলাম। ...রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'তোমরা কবরের শাস্তি থেকে পানাহ চাও।' কথাটি তিনি দুইবার অথবা তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন, 'যখন মানুষ দাফন কাজ শেষ করে ফিরে যায়, মৃত ব্যক্তি তাদের জুতোর ঠকঠক আওয়াজ শুনতে পায়। তখন দুজন ফেরেশতা তার কবরে আসেন। তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর প্রশ্ন করেন, তোমার রব কে? সে বলে, আমার রব আল্লাহ! তারা বলেন, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, আমার দ্বীন ইসলাম। তারা জিজ্ঞাসা করেন, যাকে তোমাদের কাছে রাসুল হিসেবে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে? সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসুল (ﷺ)। তখন তারা বলে, তুমি কীভাবে জানলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কুরআন পড়েছি, তাতে ঈমান এনেছি। সত্যায়ন করেছি। ...কাফেরের কবরেও দুজন ফেরেশতা আসেন। তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর প্রশ্ন করেন, তোমার রব কে? সে বলে, হায়! আমি জানি না। তারা বলেন, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, হায়! আমি জানি না। তারা বলেন, যাকে তোমাদের মাঝে রাসুল হিসেবে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে? সে বলে, হায়! আমি জানি না।'[১২১২]

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যখন মানুষকে কবর দেওয়া হয়, তখন নীল চক্ষুবিশিষ্ট দুজন কৃষ্ণবর্ণের ফেরেশতা কবরে আগমন

১২১০. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৫৪-৫৫)। এ ধরনের হাদিস আরও দেখুন : মুসনাদে আবি হানিফা, হারেসির বর্ণনা (হাদিস নং : ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪)। ইমাম আবু ইউসুফও এটা বর্ণনা করেছেন। দেখুন : আল-আসার (হাদিস নং ৯১২)।

১২১১. বুখারি (কিতাবুল ইলম : ৮৬)।

১২১২. এটা প্রসিদ্ধ হাদিস। বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে। দেখুন : আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৭৫৩)। মুসতাদরাকে হাকেম (কিতাবুল ঈমান : ১০৮)। মুসনাদে আহমদ (আওয়ালু মুসনাদিল কুফিয়্যিন : ১৮৮৩২)। মুসান্নাফে আবদির রাযযাক (কিতাবুল জানায়েয : ৬৭৩৭)। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (কিতাবুল জানায়েয : ১২১৮৫)।

করেন। তাদের একজনকে বলা হয় মুনকার অন্যজনকে বলা হয় নাকির। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, মুহাম্মাদ কে যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল? তখন সে দুনিয়ায় যা বলত সেটাই বলে। যদি মুমিন হয় তবে বলে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। তখন ফেরেশতাদ্বয় তাকে বলেন, আমরা জানতাম তুমি এটাই বলবে। অতঃপর তার কবর সত্তর হাত দীর্ঘ এবং সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। কবরে আলো দান করা হয়। তাকে বলা হয়, নতুন বরের মতো ঘুমাও যাকে তার সবচেয়ে প্রিয়জনই সজাগ করে। ঘুমাও সেদিন পর্যন্ত যেদিন আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করবেন। আর যদি মুনাফিক হয় তবে বলে, হায়! আমি জানি না। মানুষকে বলতে শুনতাম, আমিও বলতাম। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, আমরা জানতাম তুমি এটাই বলবে। তখন মাটিকে বলা হয়, তাকে চাপ দাও। মাটি তাকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, তার পাঁজরের হাড়গুলো একটি অপরটির সাথে মিশে যায়। এভাবে তাকে কিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া হবে।[১২১৩]

তবে কিছু কিছু হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, একদল মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্ম এবং নিজ অনুগ্রহের ফলে কবরের প্রশ্নের মতো জটিল পরীক্ষা থেকে রক্ষা করবেন। তারা হলেন :

- **নবি-রাসুলগণ।** তাদের কবরে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। কারণ, তাঁরাই মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাঁরাই পৃথিবীতে ইসলাম নিয়ে এসেছেন, প্রচার করেছেন, ইসলামের জন্য সবকিছু কুরবানি করেছেন। কবরে উম্মতকে তাদের ব্যাপারেই প্রশ্ন করা হবে। তাহলে তাদের প্রশ্ন করার কোনো তাৎপর্য থাকে না।[১২১৪]

- **আল্লাহর পথে শহিদগণ।** আল্লাহ তায়ালা কবরে তাদের প্রশ্ন করবেন না। কারণ, কবরে প্রশ্ন মূলত মুমিন ও কাফের/মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য করার জন্য করা হয়। শহিদ যেখানে ঈমানের পক্ষে কুফরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জীবন দিয়ে কবরে এসেছে, তার ঈমানের পরীক্ষা নেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এটা বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো—হে আল্লাহর রাসুল,

---

১২১৩. তিরমিযি (আবওয়াবুল জানায়েয : ১০৭১)। ইবনে হিব্বান (কিতাবুল জানায়েয : ৩১১৭)
১২১৪. দেখুন : তালখিসুল আদিল্লাহ (৫৬৯)।

সকল মানুষকে কবরে প্রশ্ন করা হবে, কিন্তু শহিদকে প্রশ্ন করা হবে না। কারণ কী? রাসুল (ﷺ) বলেন, 'তার মাথায় তরবারির আঘাত তাকে কবরের ফেতনা (প্রশ্ন) থেকে রক্ষা করবে।'[১২১৫]

▪ **আল্লাহর পথে পাহারাদারগণ** কবরের প্রশ্ন থেকে রক্ষা পাবেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার আমল শেষ হয়ে যায়। আল্লাহর পথে পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি ব্যতিক্রম। কেননা, কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে কবরের ফেতনা (প্রশ্ন) থেকে নিরাপদ থাকে।'[১২১৬] আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহর রাস্তায় এক রাত পাহারা দেওয়া এক মাস দিনে রোযা এবং রাত জেগে ইবাদতের চেয়ে উত্তম। যদি সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে মৃত্যুর পরও তার এই আমল অব্যাহত থাকবে। তাকে রিযিক প্রদান করা হবে। কবরের 'ফাত্তান' (তথা প্রশ্নকারী ফেরেশতা) থেকে নিরাপদে থাকবে।"[১২১৭]

▪ **জুমার দিন অথবা রাতে মৃত্যুবরণ করা।** আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেছেন, 'যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি জুমার দিন অথবা রাতে মারা যায়, আল্লাহ তাকে কবরের ফেতনা (প্রশ্ন) থেকে রক্ষা করেন।'[১২১৮]

পুনরুত্থান ও হাশর

কবরের প্রশ্ন, চাপ, শাস্তি—এ সবকিছুই কেবল সূচনা, গন্তব্য নয়। এটা পথের শুরু, শেষ নয়। মানুষ কিছুদিন এখানে অবস্থান করবে। প্রস্তুতি নেবে চূড়ান্ত গন্তব্যের জন্য, হিসাবের জন্য, জান্নাত ও জাহান্নামের জন্য। ফলে তার কর্মের ভিত্তিতে কবরে শান্তি বা শাস্তি যা দেওয়া হবে সেগুলো নিতান্তই সামান্য ও সাময়িক। চূড়ান্ত ও স্থায়ী শান্তি বা শাস্তির তুলনায় সেগুলো কিছুই নয়।

১২১৫. সুনানে নাসায়ি (কিতাবুল জানায়েয : ১/২০৫২)।

১২১৬. তিরমিযি (আবওয়াবু ফাযায়িলিল জিহাদ : ১৬২১)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুল জিহাদ : ২৭৬৭)।

১২১৭. সহিহ মুসলিম (কিতাবুল ইমারাহ : ১৯১৩)। তিরমিযি (আবওয়াবু ফাযায়িলিল জিহাদ : ১৬৬৫)।

১২১৮. তিরমিযি (আবওয়াবুল জানায়েয : ১০৭৪)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস : ৬৬৯৩)। এটাকেও আলেমগণ যয়িফ বলেছেন। তবে এর একাধিক 'শাওয়াহিদ' আছে। ফলে এটা সর্বতোভাবে ভিত্তিহীন নয়।

জগতের সকল মুসলিম এ ব্যাপারে একমত যে, কবরের জগৎ শেষ নয়। এটা পরকালীন জীবনের প্রথম মঞ্জিল মাত্র। কবরের জীবনে গোটা সৃষ্টির শরীরগুলো পচেগলে যাওয়ার পরে আল্লাহ তায়ালা সেগুলো আবার পুনরুত্থিত করবেন। সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ও নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো নতুন করে সংযুক্ত করবেন এবং তাতে রুহ ফুঁকে দেবেন। এটাকে বলা হয় 'নাশর।' অতঃপর সকল সৃষ্টিকে একটা স্থানে সমবেত করবেন। এটাকে বলা হয় 'হাশর।' সেখানে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের ভালোমন্দ কর্মের হিসাব নেবেন এবং বিনিময় দেবেন।

মানুষ ও জিন এবং তাদের সঙ্গে সকল পশুপাখি ও প্রাণীকুলও সেখানে একত্র হবে। আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ۝٤٩ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝٥٠﴾ অর্থ : 'আপনি বলুন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষজন। সকলকে একত্র করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।' [ওয়াকিয়াহ : ৪৯-৫০] হাশরের ময়দান থেকে কেউ বাদ যাবে না। কারও লুকিয়ে থাকার সুযোগ নেই কোথাও। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ۝٩٣ لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝٩٤ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَرْدًا ۝٩٥﴾ অর্থ : 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত না হয়ে পারবে। নিশ্চয়ই তিনি সকলকে বেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদের ভালোভাবে গুনে রেখেছেন। কিয়ামত দিবসে এদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়।' [মারইয়াম: ৯৩-৯৪]

পশুপাখিকে একত্র করার বিষয়ে আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ অর্থ : 'ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল জীব এবং নিজ ডানার সাহায্যে উড়ন্ত পাখি—তারা সকলে তোমাদের মতোই একেকটি জাতি। কিতাবে কোনোকিছুই আমি বাদ দিইনি; এরপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাদের একত্র করা হবে।' [আনআম : ৩৮] হিংস্র শ্বাপদও বাদ যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ অর্থ : 'যখন বন্য পশুসমূহ একত্র করা হবে।' [তাকভির : ৫]

তাদের মাঝের দেনা-পাওনা সমান সমান করার পর তাদের মাটিতে পরিণত করা হবে। বিপরীতে মানুষ ও জিনকে জান্নাত অথবা জাহান্নামের অনন্ত জীবনের দিকে পাঠানো হবে। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন সবার অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া হবে। শিংবিহীন ছাগলকে

শিংবিশিষ্ট ছাগল থেকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হবে।'[১২১৯] আরেকটি বর্ণনায় আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, 'কিয়ামতের দিন গোটা সৃষ্টিকে একত্র করা হবে। সকল প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু, পশুপাখি—সবকিছু। আল্লাহ তায়ালা সবার প্রতি ইনসাফ করবেন। শিংবিহীন ছাগল শিংবিশিষ্ট ছাগল থেকে নিজ পাওনা বুঝে নেবে। অতঃপর আল্লাহ সবাইকে মাটি হয়ে যাওয়ার আদেশ দেবেন। কাফেররা আফসোস করে বলতে থাকবে, 'হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।'[১২২০]

ইমাম আজম বলেন, **'আমরা মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি। আল্লাহ তায়ালা সকল মৃত প্রাণীকে একদিন একত্র করবেন। সে দিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। ...আল্লাহ বলেন,** ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ﴾ **অর্থ : 'কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী; এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর নিশ্চয়ই কবরে যারা আছে আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত করবেন।' [হজ : ৭]**[১২২১] ইমাম তহাবি রহ. বলেন, 'আমরা কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান এবং আমলের প্রতিদান পাওয়ার বিশ্বাস রাখি। বিশ্বাস রাখি আমলনামা উপস্থাপন, হিসাব-নিকাশ, আমলনামা পাঠ, সওয়াব, শাস্তি, পুলসিরাত ও মিযানের ব্যাপারে।'[১২২২]

পুনরুত্থান পুনর্জন্ম নয়

কেউ কেউ ইসলামের পরকালবিষয়ক আকিদাকে পৌত্তলিক ধর্মের 'পুনর্জন্ম' বিশ্বাসের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। তাদের যুক্তি, পুনর্জন্মবাদের বক্তব্য হলো—মানুষের আত্মা এক দেহ থেকে আরেক দেহে স্থানান্তরিত হওয়া। ইসলামও তা-ই বলছে—মৃত্যুর পরে মানুষের দেহ পচে যাবে। আল্লাহ নতুন দেহে প্রাণ সঞ্চার করে মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন। এভাবে ইসলামের পুনরুত্থান আকিদা জন্মান্তরবাদের বিশ্বাসের মতোই।

এটা ভিত্তিহীন কথা। ইসলামি আকিদায় এর কোনো অস্তিত্ব নেই, স্থান নেই। কয়েকভাবে এ সংশয়ের জবাব দেওয়া যায়। **এক.** জন্মান্তরবাদের আকিদামতে, মানুষের দেহ আরেকটি সম্পূর্ণ নতুন দেহে স্থানান্তরিত হয়। বিপরীতে ইসলামের

১২১৯. মুসলিম (কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ : ২৫৮২)। তিরমিযি (আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ : ২৪২০)।

১২২০. মুসতাদরাকে হাকেম (কিতাবুত তাফসির : ৩২৫০)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু উসমান ইবনে আফফান : ৫২৭)।

১২২১. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৫৮)।

১২২২. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৬)।

আকিদা হলো, মানুষের বর্তমান শরীরের কিছু মৌলিক অংশ দিয়েই আল্লাহ তায়ালা মানুষের শরীর পুনর্গঠন বা পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। আর আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান। ফলে এটা তার জন্য কঠিন নয়। সুতরাং পুনরুত্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন দেহে হবে না; পুনর্গঠিত দেহে হবে। **দুই.** পুনর্জন্মে বিশ্বাসীরা এক দেহ থেকে আরেক দেহে স্থানান্তরের বিষয়টি পৃথিবীতে মনে করে; অন্য কোনো জীবন বা অন্য কোনো জগতে নয়। বিপরীতে ইসলামের পুনরুত্থানের আকিদা পরকালের সঙ্গে নির্ধারিত; ইহকালে প্রযোজ্য নয়। সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন ও জগৎ। **তিন.** পুনর্জন্মে বিশ্বাসীরা পরকাল, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নাম—সবকিছু অস্বীকার করে। ইসলামের দৃষ্টিতে তারা কাফের। ফলে তাদের আকিদার সঙ্গে ইসলামের আকিদা মিলে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।[১২২৩]

হিসাব-নিকাশ

হাশরের দিন প্রত্যেককে হিসাব দিতে হবে। দুনিয়াতে যা করেছে সেটার জন্য সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা এ দিনকে 'হিসাব দিবস' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সকল নবি-রাসুল এ দিন এবং এ দিনের হিসাব সম্পর্কে নিজ নিজ জাতিকে সজাগ ও সতর্ক করেছেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করেছেন, ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব কায়েম হবে।' [ইবরাহিম : ৪১] আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন আয়াতে নিজেকে হিসাব গ্রহণকারী আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ অর্থ : 'কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয়, তবু তা আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।' [আম্বিয়া : ৪৭] অন্যত্র নিজের নামে শপথ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾ অর্থ : 'আপনার প্রভুর শপথ! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করব, যা তারা করত সে ব্যাপারে।' [হিজর : ৯২-৯৩]

১২২৩. দেখুন : আল মাওয়াকিফ, ইজি (৩৭২-৩৭৩)। শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (১২)।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহর কাছ থেকে মানুষ এক কদম নড়তে পারবে না। এক. জীবন কোথায় ব্যয় করেছে? দুই. যৌবন কোথায় শেষ করেছে? তিন. সম্পদ কীভাবে উপার্জন করেছে? চার. সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছে? পাঁচ. জানা অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে?'[১২২৪]

ইমাম আজম আবু হানিফা বলেন, **'আমরা মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি। আল্লাহ তায়ালা সকল মৃত প্রাণীকে একদিন একত্র করবেন। সে দিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সেদিন আল্লাহ সব কাজের হিসাব নেবেন, প্রতিদান দেবেন, সবার প্রাপ্য পূর্ণ করবেন।'**[১২২৫] ইমাম তহাবি রহ. বলেন, 'আমরা কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান এবং আমলের প্রতিদান পাওয়ার বিশ্বাস রাখি।'[১২২৬]

তবে সবার জন্য হিসাব সমান নয়। যারা পুণ্যবান, আল্লাহ তাদের হিসাব সহজ করবেন। তাদের সামনে কেবল আমলনামা পেশ করে ছেড়ে দেবেন। কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। বিপরীতে কাউকে আল্লাহ প্রত্যেক কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। কাউকে শাসাবেন, ভর্ৎসনা করবেন। আরেক দলকে আল্লাহ অনুগ্রহ করে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন। তাদের কাছে কোনো হিসাবই চাইবেন না। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা সেসব মানুষ যারা অন্যের কাছে ঝাড়ফুঁক প্রার্থনা করে না, শুভাশুভ (ইত্যাদি ভিত্তিহীন) বিশ্বাস রাখে না; বরং তাদের প্রভুর উপর ভরসা করে।'[১২২৭] আবু উমামা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আমার প্রতিপালক আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তিনি আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষকে জান্নাতে

১২২৪. তিরমিযি (আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ : ২৪১৬)। মুসনাদে দারেমি (মুকাদ্দিমা : ৫৫৬)।

১২২৫. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৫৮)।

১২২৬. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৬)।

১২২৭. বুখারি (কিতাবুত তিব্ব : ৫৭৫২)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ২২০)। ইসলামে 'রুকইয়া' (ঝাড়ফুঁক) কুরআন-সুন্নাহনির্ভর হওয়ার শর্তে বৈধ। আলোচ্য হাদিসে এটাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়নি, বরং অন্যের কাছে ঝাড়ফুঁক প্রার্থনা না করে যারা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করবে, তাদের জন্য আল্লাহ পরকালে যে বিশেষ প্রতিদান রেখেছেন সেটা তুলে ধরা হয়েছে। বিপরীতে শুভাশুভ বিশ্বাস রাখা মূলত কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন বিষয়। ফলে এটা ইসলামে নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, স্বতন্ত্রভাবে 'সুলক্ষণ'-গ্রহণ শর্তসাপেক্ষে বৈধ।

প্রবেশ করাবেন। তাদের কোনো হিসাব নেবেন না। কোনো শাস্তি দেবেন না। প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে থাকবে সত্তর হাজার। আরও (অতিরিক্ত) থাকবে তাঁর তিন অঞ্জলি পরিমাণ।'[১২২৮]

কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির মাঝে ফয়সালা করে দেওয়া হবে। মানুষ ও জিন ব্যতীত বাকি সৃষ্টির মাঝে 'কিসাস' কায়েম করা হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেকে প্রত্যেকের হিসাব নগদ বুঝে নেবে। কোনো পশু বা পাখি যদি অপর পশুপাখির উপর জুলুম করে থাকে, তবে সেটার মাঝে ফয়সালা (কিসাস) করে দেওয়া হবে। অতঃপর তাদের মাটি বানিয়ে দেওয়া হবে। বিপরীতে মানুষের মাঝে হিসাব কায়েম করা হবে। তাদের প্রত্যেককে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা হবে। জীবনের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। প্রত্যেকের হাতে নিজ নিজ আমলনামা দেওয়া হবে। তারা সেটা নিজেরা পড়ে দেখবে। আল্লাহ তায়ালা নিজে তাদের কাছে তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। অতঃপর সে অনুযায়ী কারও জন্য জাহান্নামের ফয়সালা করবেন। কাউকে নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেবেন।

আমলনামা উপস্থাপন ও পাঠের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ۝٧ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝٨ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ۝٩ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ۝١٠ فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا ۝١١﴾ অর্থ : 'যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে। কিন্তু যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেওয়া হবে, সে মৃত্যুকে ডাকবে।' [ইনশিকাক : ৭-১১] অন্যত্র বলেন, ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ ۝١٩ إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝٢٠ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٢١ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝٢٢ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝٢٣ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ۝٢٤ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ۝٢٥ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝٢٦ يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۝٢٧﴾ অর্থ : 'অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে : নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখো। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন, সুউচ্চ জান্নাতে, যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে। তাদের বলা হবে, পানাহার করো তৃপ্তির সঙ্গে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। আর যার আমলনামা দেওয়া হবে তার বাম হাতে, সে বলবে, আহা! আমাকে যদি

১২২৮. তিরমিযি (আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ : ২৪৩৭)।

আমলনামা দেওয়াই না হতো! আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! আহা! মৃত্যুতেই যদি আমার সব শেষ হয়ে যেত!' [হাক্কাহ : ১৯-২৭]

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, **'কিয়ামতের দিন বাদী-বিবাদীর মাঝে নেক আমলের মাধ্যমে কিসাস (ইনাসফপূর্ণ ফয়সালা) সত্য। যদি অভিযুক্তের কাছে নেক আমল না থাকে, তবে তার উপর গুনাহ চাপিয়ে দেওয়াও সত্য ও সঠিক।'**[১২২৯] এ কথার দলিল রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর একাধিক হাদিস। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের ইজ্জত-সম্মান কিংবা যেকোনো কিছুতে জুলুম করে থাকে, তবে সেটা যেন আজই মিটমাট করে নেয়, সেদিন আসার আগে যেদিন কোনো দিনার-দিরহাম থাকবে না (থাকবে কেবল আমল)। সুতরাং তার ভালো আমলগুলো অন্যকে দিয়ে দিতে হবে। আর যদি ভালো আমল না থাকে, তবে অন্যের মন্দ আমলগুলো তার উপর দিয়ে দেওয়া হবে।'[১২৩০] ইমাম আজম রহ. ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, **'তোমরা জুলুম থেকে বিরত থাকো। কারণ, জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে আসবে।'**[১২৩১]

প্রসিদ্ধ হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'তোমরা জানো কি আমার উম্মতের মাঝে নিঃস্ব (মুফলিস) কে?' সাহাবাগণ বললেন, নিঃস্ব হলো যার দিনার-দিরহাম ও মালামাল কিছুই নেই। রাসুল (ﷺ) বলেন, 'আমার উম্মতের নিঃস্ব ব্যক্তি হলো যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত নিয়ে আসবে; আবার কাউকে গালি দিয়ে, কাউকে অপবাদ দিয়ে, কারও সম্পদ খেয়ে, কারও রক্তপাত করে, কাউকে মেরে আসবে। তখন প্রত্যেককে তার নেক আমল থেকে দিয়ে দিতে হবে। যদি অপরাধের দায় মেটানোর আগে নেক আমল শেষ হয়ে যায়, তাহলে অভিযোগকারীদের গুনাহ গ্রহণ করতে হবে। একপর্যায়ে সেগুলো তার মাথায় দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'[১২৩২]

প্রশ্ন হতে পারে, যদি কেউ কারও কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকে কিংবা কাউকে জুলুম করে থাকে, অতঃপর সে ব্যক্তি মারা যায় কিংবা অজ্ঞাত থাকে, সেই পাওনা

১২২৯. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।
১২৩০. বুখারি (কিতাবুল মাযালিম : ২৪৪৯)।
১২৩১. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৫৫)।
১২৩২. মুসলিম (কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব : ২৫৮১)। তিরমিযি (আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ : ২৪১৮)।

মেটানো বা জুলুমের প্রায়শ্চিত্ত করার কোনো উপায় না থাকে, তাহলে কী করণীয়? উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যেকোনোভাবে হক আদায়ের চেষ্টা করবে। তার আত্মীয়-স্বজন খুঁজে বের করবে। সম্ভব না হলে তার পক্ষ থেকে পাওনা পরিমাণ সদকা করবে। তার জন্য দোয়া করবে। আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করবে।

হাউযে কাউসার

এটা কিয়ামতের ভয়ংকর দিনের এক বিশেষ নেয়ামত। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে আল্লাহ তায়ালা এ দিন একটি বিশাল হাউজ দান করবেন, যেটা জান্নাতের কাউসার নদীর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে। এর প্রস্থ হবে কয়েক মাসের পথ। পেয়ালা হবে আকাশের তারকার সমান অগণন। পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি। হাশরের ময়দানের প্রচণ্ডতায় যখন মানুষের বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম হবে, তখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এ কূপ থেকে তাঁর বিশুদ্ধ সুন্নাহর অনুসারীদের শীতল পানি পান করাবেন। যে একবার পান করবে, সে আর কখনো পিপাসায় কষ্ট পাবে না।[১২৩৩]

ইমাম আজম রহ. বলেন, **'নবিজি (ﷺ)-এর হাউজ সত্য।'**[১২৩৪] ইমাম তহাবি রহ. বলেন, 'হাউজ সত্য, যা (কিয়ামতের দিন) উম্মাহর পিপাসা নিবারণের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করে সম্মানিত করেছেন।'[১২৩৫]

মুতাযিলা ও রাফেযিরা হাউযে কাউসারকে অস্বীকার করে। কারণ, তারা মুতাওয়াতির হাদিস ছাড়া অন্যান্য হাদিস গ্রহণ করে না। তাদের মতে, হাউজে কাউসারের কথা কুরআনে নেই, স্রেফ হাদিসে আছে; কিন্তু সেগুলো মুতাওয়াতির নয়। ফলে এগুলোতে তারা বিশ্বাস করে না।[১২৩৬] অথচ এটা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি। হাউজে কাউসারের বর্ণনা এত অধিক সংখ্যক সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে যা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে। প্রায় অর্ধশত সাহাবি এ ব্যাপারে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এটা গোটা উম্মাহর সকল মুহাক্কিক আলেমের সর্বসম্মত আকিদা। আহলে

১২৩৩. বুখারি (কিতাবুল ফিতান : ৭০৫০)। মুসলিম (কিতাবুল ফাযায়েল : ২২৯১)। তিরমিযি (আবওয়াবু তাফসিরিল কুরআন : ৩৩৬১)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুয যুহদ : ৪৩৩৪)।

১২৩৪. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।

১২৩৫. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১৬)।

১২৩৬. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৬৬)।

সুন্নাতের বিভিন্ন ধারার মাঝে আকিদার বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত থাকলেও হাউজে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সবাই একমত। ফলে এটাতে অবিশ্বাস মারাত্মক গোমরাহি।

মুমিনদের সন্তানের পরিণতি

সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত আকিদা হলো—কোনো মুসলিম শিশু নাবালেগ অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ তাকে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। কারণ, এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ অর্থ : 'যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তানসন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সঙ্গে মিলিত করব তাদের সন্তানসন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি মোটেও হ্রাস করব না; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।' [তুর : ২১] হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যে মুমিন নারীর তিনটি সন্তান শিশু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দাস্বরূপ হবে।' এক নারী জিজ্ঞাসা করল, দুজন হলে? তিনি বললেন, 'দুজন হলেও।'[১২৩৭] শিশুরা মায়ের জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হয়ে নিজেরা জাহান্নামে যাবে এটা অসম্ভব। আনাসসহ একাধিক সাহাবি সূত্রে পুরুষ তথা পিতার ব্যাপারেও একই ফযিলত বর্ণিত আছে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যে মুসলিম ব্যক্তির তিনটি সন্তান বালেগ হওয়ার আগে মারা যাবে, আল্লাহ তাকে সেই শিশুদের প্রতি অনুগ্রহের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'[১২৩৮]

সহিহ মুসলিমের হাদিসে এসেছে—আবু হাসসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা রাযি.-কে বললাম, আমার দুটি পুত্র সন্তান মারা গিয়েছে। আপনি কি রাসুলুল্লাহ থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করবেন যাতে আমি কিছু সান্ত্বনা পেতে পারি? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। ছোট সন্তানরা জান্নাতের প্রজাপতিতুল্য হবে। তারা তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের কাপড় শক্ত করে ধরে রাখবে। আল্লাহ তাদের মাতা-পিতাসহ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর আগ পর্যন্ত কাপড় ছাড়বে না।'[১২৩৯]

১২৩৭. বুখারি (কিতাবুল ইলম : ১০১)। মুসলিম (কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব : ২৬৩৪)।
১২৩৮. বুখারি (কিতাবুল জানায়েয : ১২৪৮)। ইবনে হিব্বান (কিতাবুল জানায়েয : ২৯৪০)।
১২৩৯. মুসলিম (কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব : ২৬৩৫)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবি হুরাইরা : ১০৪৭৫)।

আরেকটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'গর্ভপাত হওয়া (ভ্রূণ) সন্তানের পিতা-মাতাকে যখন আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তখন সে তার প্রভুর সাথে অভিমান করবে। তাকে বলা হবে, ঠিক আছে! তোমার পিতা-মাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন সে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবে।'[১২৪০] আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'গর্ভপাত হওয়া ভ্রূণকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বললে সে বলবে, আমার পিতা-মাতা জান্নাতে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত আমি প্রবেশ করব না। তখন তাদেরও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।'[১২৪১]

তবে ইমাম আজম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এ ব্যাপারে নীরব থাকতেন। মুসলিম ও মুশরিকদের নাবালক সন্তানের ব্যাপারে জান্নাতি বা জাহান্নামি কোনোটাই বলতেন না। বাযদাবি বলেন, 'এটা ইমাম প্রথম জীবনে হয়তো বলে থাকবেন, যখন তার কাছে রাসুলুল্লাহর হাদিসগুলো পৌঁছে থাকবে না। পরে যখন হাদিস পৌঁছয়, তিনি (মুসলিমদের) নাবালক সন্তানের পরিণতির ব্যাপারে পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে তাদের জান্নাতি বলেন।'[১২৪২]

সাফফার বলেন, "হাকেম শহিদ 'আল-মুনতাকা'-তে লিখেছেন আবু হানিফা মুমিন ও মুশরিক উভয়ের নাবালেগ সন্তানের পরিণতির ব্যাপারে নীরব থাকতেন। কিন্তু তিনি নীরব থাকলেও আবু ইউসুফ-মুহাম্মাদসহ উম্মাহর অন্যান্য আলেমের মতে মুমিনদের শিশু সন্তান তাদের মুমিন মাতা-পিতার সঙ্গে (জান্নাতে) থাকবে।[১২৪৩] এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ, ইনশাআল্লাহ।

মুশরিকদের সন্তানের পরিণতি :

মুশরিকদের নাবালক সন্তানের পরিণতি কী? এ ব্যাপারে আলেমদের মতবিরোধ রয়েছে। একদল মনে করেন, তারা মুমিনদের সন্তানদের মতো জান্নাতে

১২৪০. সুনানে ইবনে মাজা (আবওয়াবুল জানায়েয : ১৬০৮)। মুসনাদে আবি ইয়ালা (মুসনাদু আলি : ৪৬৮)। ইমাম নববি-সহ একাধিক আলেম হাদিসটিকে যয়িফ বলেছেন।

১২৪১. মুসনাদে বাযযার (মুসনাদু আলি ইবনে আবি তালিব : ৮১৬)। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (কিতাবুন নিকাহ : ১০৩৪৩)। হাদিসটির উপর কোনো কোনো আলেমের আপত্তি রয়েছে। তাতে সমস্যা নেই। কারণ, প্রথমে উল্লেখ করা হাদিসগুলো বিশুদ্ধ। এগুলো কেবল সহায়ক হিসেবে উল্লেখ করা হলো।

১২৪২. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২৩৯)।

১২৪৩. দেখুন : তালবিসুল আদিল্লাহ (৮৮৬)। আল-আজনাস, নাতেফি (১/৪৪৬)।

যাবে এবং জান্নাতবাসীর সেবায় নিয়োজিত থাকবে। আরেক দল মনে করেন, তারা 'আরাফে' (জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি একটি স্থানে) থাকবে। আরেক দল বলেন, তাদের পরীক্ষা করা হবে—যে আল্লাহর নির্দেশ মানবে, তাকে জান্নাত দেওয়া হবে; যে মানবে না, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১২৪৪]

এই মতভেদের কারণ হলো, এ ব্যাপারে হাদিসে বৈপরীত্যপূর্ণ বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন—একটি হাদিসে তাদের জান্নাতিদের খাদেম বলা হয়েছে। আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে মুশরিকদের সন্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'তাদের পাপ নেই যে কারণে শাস্তি দেওয়া হবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। আবার তাদের পুণ্যও নেই যার সুবাদে তাদের জান্নাতের মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা জান্নাতিদের খাদেম হবে।'[১২৪৫]

বিপরীতে কিছু হাদিসে এসেছে—তারা তাদের মাতা-পিতার সঙ্গে থাকবে, যেহেতু মাতা-পিতা কাফের হওয়ার কারণে জাহান্নামে থাকবে। বোঝা গেল, তারাও জাহান্নামে যাবে। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে মুশরিকদের বাচ্চার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'তারা (বেঁচে থাকলে) কী করত আল্লাহ জানেন।'[১২৪৬] যদিও এখানে সুস্পষ্টভাবে তাদের জাহান্নামে যাওয়ার কথা বলা হয়নি, তথাপি আয়েশা রাযি.-এর একটি হাদিস থেকে সেটা বোঝা যায়। আয়েশা রাযি.-কে কাফেরদের সন্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : 'তারা তাদের মাতা-পিতার সঙ্গে থাকবে।' আয়েশা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললাম, আমল ছাড়াই (তাদের জাহান্নামে দেওয়া হবে)? তিনি বললেন, 'তারা কী করত আল্লাহ জানেন।'[১২৪৭]

আবার কিছু হাদিস দ্বারা বোঝা যায় তাদের পরীক্ষা করা হবে। যেমন আবু সাইদ খুদরির হাদিস। রাসুল (ﷺ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে আনা হবে। এক. ইসলাম পৌঁছানোর আগে মৃত্যুবরণকারী। দুই. পাগল। তিন. শিশু।

১২৪৪. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২৩৯)।

১২৪৫. মুসনাদে তয়ালেসি (আনাস ইবনে মালেক : ২২২৫)। মুসনাদে বাযযার (মুসনাদে আনাস ইবনে মালেক : ৭৪৬৬)। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (সামুরাহ ইবনে জুনদুব : ৭/২৪৪; হাদিস নং : ৬৯৯৩)।

১২৪৬. বুখারি (কিতাবুল জানায়েয : ১৩৮৪)। মুসলিম (কিতাবুল কদর : ২৬৫৯)।

১২৪৭. মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আয়েশা : ২৫১৮৪)।

ইসলাম পৌঁছার আগে মৃত্যুবরণকারী বলবে—প্রভু, আমার কাছে কোনো কিতাব অথবা রাসুল আসেনি...। পাগল বলবে—হে আল্লাহ, আমাকে আপনি ভালোমন্দের মাঝে পার্থক্য করার বিবেক দেননি। শিশু বলবে—হে আল্লাহ, আমি পরিণত বয়সে পৌঁছতে পারিনি। তখন তাদের সামনে জাহান্নাম উপস্থিত করা হবে। তাদের বলা হবে, এখানে প্রবেশ করো। যে ব্যক্তি আল্লাহর জ্ঞানে সৌভাগ্যবান ছিল, সে তাতে প্রবেশ করবে। আর যে আল্লাহর জ্ঞানে দুর্ভাগা ছিল, সে তাতে প্রবেশ করবে না। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা আমারই অবাধ্য হলে। আমার রাসুলদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করতে তা তো বোঝাই যাচ্ছে।'[১২৪৮]

এখানে 'শিশু' বলতে মুমিন ও কাফের সকলের শিশু অন্তর্ভুক্ত। কারণ, বাবা-মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ব্যতীত কোনো শিশুই আসলে মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত) তথা কাফের বা মুমিন নয়। আবুল ইউসর বাযদাবি উক্ত পদ্ধতির বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, পরকাল পরীক্ষার জায়গা নয়। ফলে তাদের পরীক্ষা করা হবে না।[১২৪৯] তার আপত্তির জবাবে বলা যায়, এটা আক্ষরিক অর্থে দুনিয়ার পরীক্ষা নয়, বরং আল্লাহ তো জানেনই তারা দুনিয়ায় বেঁচে থাকলে কী করত। সে জানা অনুযায়ী তাদের তিনি জান্নাত-জাহান্নাম দান করতে পারেন। কিন্তু তাতে তারা আপত্তি করবে। ফলে তাদের আপত্তি নিরসনে তাদের সামনে প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট করার জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। তাই পরকাল পরীক্ষার জায়গা নয়—স্রেফ এ যুক্তিতে রাসুলুল্লাহর (ﷺ) হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে না।

এই একাধিক ও বিপরীতমুখী বর্ণনার কারণেই সম্ভবত এ ব্যাপারেও ইমাম আজমের সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। ইমাম রহ. নিজস্ব সনদে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে মুশরিকদের (নাবালেগ মৃত) সন্তানের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'তারা (বেঁচে থাকলে) কী আমল করত সেটা আল্লাহ খুব ভালো জানেন।'[১২৫০] নাসাফি বলেন, আবু হানিফা রহ. বলেছেন, 'আমি জানি না তারা জান্নাতে নাকি জাহান্নামে যাবে।'[১২৫১]

১২৪৮. মুসনাদে আবিল জাদ (২০৩৮)। শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালাকায়ি (১০৭৬)।

১২৪৯. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২৩৯)।

১২৫০. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৫৪)।

১২৫১. বাহরুল কালাম (১৭৭)।

অধমের পর্যবেক্ষণ : নাবালেগ অবস্থায় কারও মৃত্যুবরণ করার অর্থ হলো গুনাহবিহীন নিষ্পাপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা। ফলে এই অবস্থার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ কাউকে জাহান্নামে দিতে পারেন না। সেটা তার উপর জুলুম হবে। অথচ আল্লাহ জুলুম থেকে পবিত্র। এমনকি আল্লাহর ইলমে সে বড় হয়ে কাফের হতো এ যুক্তিতেও আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নামে দেবেন না। কারণ, তিনি সরাসরি অপরাধ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেন না। এমন হলে রুহের জগতের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করেই তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামে দিতে পারতেন; দুনিয়াতে পাঠিয়ে পরীক্ষা, নবি-রাসুল প্রেরণ এবং কিতাব অবতীর্ণ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, 'আমার বিশ্বাস—আল্লাহ পাপ ছাড়া কাউকে শাস্তি দেবেন না।'[১২৫২]

একইভাবে আল্লাহ কারও কাছে রাসুল পাঠানো ব্যতীত তাকে শাস্তি দেন না। কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ অর্থ : 'যে সৎপথে চলে, সে নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎপথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। রাসুল পাঠানোর আগ পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি দান করি না।' [ইসরা : ১৫] শিশুর কাছে দাওয়াত পৌঁছানো সত্ত্বেও না পৌঁছানোর মতোই। কারণ, আল্লাহ তাকে বোঝার মতো ক্ষমতাই দেননি। যে বয়সে সে দাওয়াত এবং আল্লাহর দ্বীন বুঝতে পারবে, সে পর্যন্ত তাকে জীবনই দেননি। ফলে এ যুক্তিতেও 'আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দেবেন না' বলা যায়।

ফলে মুসলিম কিংবা মুশরিকের সন্তান যে-ই হোক, নাবালেগ অবস্থায় মারা গেলে তাকে জাহান্নামে দেওয়া আল্লাহর নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বাকি রইল মুসলিম ও মুশরিকদের সন্তানের মাঝে পার্থক্য করা। এটাও ইজতিহাদি বিষয়। কারণ, জন্মের ক্ষেত্রে এবং বাবা-মা বাছাই করার ক্ষেত্রে সন্তানের কোনো হাত নেই। ফলে দুজনই শিশু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার পরে কেবল একজনের বাবা-মা মুসলিম হওয়ার কারণে জান্নাতি হবে, আরেকজনের বাবা-মা মুশরিক হওয়ার কারণে জাহান্নামি হবে—এটাও ইসলামের চিরন্তন ইনসাফের নীতি (একের পাপের বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না)-এর সঙ্গে যায় না। উপরন্তু রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হাদিসও উক্ত পার্থক্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। রাসুলুল্লাহ

১২৫২. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২৩৯)।

(ﷺ) বলেন, 'প্রত্যেক নবজাতক ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি বানায়, খ্রিষ্টান বানায়, অগ্নিপূজারী বানায়...।'[১২৫৩] ফলে শিশু বয়সে কেউ মারা গেলে বাবা-মা তাকে ইহুদি-খ্রিষ্টান বানানোর আগেই ফিতরতের উপর মারা গেল ধর্তব্য হবে। এক্ষেত্রে মুমিন ও কাফেরের শিশু সমান। প্রত্যেকেই সমান ফিতরতের উপর জন্ম নেয়। বরং বুখারির একটি বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা ফিতরতের উপর জন্মের ক্ষেত্রে মুসলিম ও মুশরিকদের শিশুর অভিন্নতা এবং মুশরিকদের শিশু সন্তানের জান্নাতে থাকা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাযি.-এর লম্বা হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) স্বপ্নে জান্নাতের বাগানে ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে দেখতে পান। তাঁর চারপাশে ছোট ছোট শিশু খেলাধুলা করছিল। তারা ছিল সেসব শিশু যারা শৈশবে ফিতরতের উপর মৃত্যুবরণ করেছিল। তখন কেউ জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, মুশরিকদের সন্তানও? আল্লাহর রাসুল বললেন, 'হ্যাঁ, মুশরিকদের সন্তানও।'[১২৫৪] এ হাদিসে মুশরিকদের শিশু সন্তানের জান্নাতি হওয়া সুস্পষ্ট।

বরং ইমামের অন্যান্য বক্তব্য থেকেও এটাই বোঝা যায়। তিনি বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানকে তাঁর (আদমের) পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেছেন। তাদের জ্ঞান দান করেছেন। তাদের সম্বোধন করে ঈমানের নির্দেশ দিয়েছেন। কুফর থেকে বারণ করেছেন। তখন তারা আল্লাহর রবুবিয়্যাতকে স্বীকার করে নিয়েছিল। আর এভাবেই তারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল। পরবর্তীকালে আদম সন্তান সেই ফিতরত (ঈমানের জন্য প্রস্তুত অবস্থা)-এর উপরই জন্মলাভ করে। সুতরাং পরে যে কুফরি করল, সে মূলত (তার প্রতিশ্রুতি) বদলে ফেলল। আর যে ঈমান আনল এবং সত্যায়ন করল, সে (প্রতিশ্রুতির উপর) অটল ও অবিচল রইল।'**[১২৫৫] তাহলে খোদ ইমামের বক্তব্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, মুমিন কিংবা মুশরিক উভয়ের সন্তান রুহের জগতে করা সেই রবুবিয়্যাতের স্বীকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে, যাকে ইমাম 'ঈমানের ফিতরত' বলেছেন। পরবর্তীকালে বড় হয়ে যেহেতু কাফেররা তাদের প্রতিশ্রুতি বদলে ফেলে, এ জন্য শাস্তিযোগ্য। কিন্তু শিশু সন্তান যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আগেই মৃত্যুবরণ করে, সে শাস্তিযোগ্য হবে কোন্ অপরাধে?

১২৫৩. বুখারি (কিতাবুল কদর : ৬৫৯৯)। মুসলিম (কিতাবুল কদর : ২৬৫৮)।

১২৫৪. বুখারি (কিতাবুত তাবির : ৭০৪৭)। সুনানে কুবরা, নাসায়ি (কিতাবুত তাবির : ৭৬১১) ইবনে হিব্বান (কিতাবুর রাকায়েক : ৬৫৫)।

১২৫৫. আল-ফিকহুল আকবার (৩-৪)।

ফলে নাবালেগ অবস্থায় মারা যাওয়া কাফের-মুশরিকদের শিশু সন্তানের জান্নাতি হওয়া এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়াই যৌক্তিক। তবে যেহেতু এ ব্যাপারে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে সেসব হাদিস পরস্পরের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ, উপরন্তু এ ব্যাপারে আলেমদের মতামতও সাংঘর্ষিক, ফলে ইমাম আজমের প্রসিদ্ধ নীতি অবলম্বন করাই উত্তম। সেটা হলো নীরব থাকা। মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখি, ফখরুল ইসলাম বাযদাবি, জামালুদ্দিন গযনবি, গুমুশখানভিসহ অনেক হানাফি আলেম নীরব থাকাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[১২৫৬] তাই আমরাও এ ব্যাপারে নীরব থাকাকে অগ্রাধিকার দিই। এটুকু বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ কাউকে—যেমনটা ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন—গুনাহ ছাড়া শাস্তি দেবেন না।[১২৫৭] উপরন্তু আল্লাহ কাউকেই—যেমনটা তিনি বারবার কুরআনে বলেছেন—বিন্দুপরিমাণ জুলুম করবেন না। [ফুসসিলাত : ৪৬]

শাফায়াত

আহলে সুন্নাতের আকিদামতে কিয়ামতের দিন শাফায়াত সত্য। অর্থাৎ, কেউ গুনাহ করার পরে তাওবা ও ইস্তিগফার ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে পরকালে আল্লাহ তাকে নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আবার চাইলে বিভিন্ন মানুষের সুপারিশেও ক্ষমা করে দিতে পারেন। কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা শাফায়াত প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ অর্থ : 'তাদের সামনে ও পশ্চাতে যা-কিছু আছে, তা তিনি অবগত। তারা শুধু তাদের জন্য শাফায়াত করতে পারে, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।' [আম্বিয়া : ২৮] অন্যত্র বলেন, ﴿يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ অর্থ : 'দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোনো উপকারে আসবে না।' [তহা : ১০৯]

হাদিসে জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আমার শাফায়াত হচ্ছে আমার উম্মতের কবিরা গুনাহকারীদের জন্য।'[১২৫৮] আনাস রাযি.

১২৫৬. দেখুন : আল-ইতিকাদ, বলখি (১০৯-১১০)। উসুলুদ্দিন, গযনবি (২১০)। জামেউল মুতুন (২৯)।
১২৫৭. বাহরুল কালাম (১৭৭)।
১২৫৮. তিরমিযি (আবুওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ : ২৪৩৬)। আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৭৩৯)।

থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "প্রত্যেক নবিই আল্লাহর কাছে কিছু-না-কিছু চেয়েছেন। আল্লাহ তাদের চাওয়া পূর্ণ করেছেন। কিন্তু আমি চাইনি। বরং সেটা আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য 'শাফায়াত'-স্বরূপ রেখে দিয়েছি।"[১২৫৯] সুবহানাল্লাহ!

শাফায়াতসংক্রান্ত হাদিস কেবল একটি কিংবা দুটি নয়। আনাস, জাবের, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, কাব ইবনে উজরাহসহ অসংখ্য সাহাবি (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে শাফায়াতসংক্রান্ত অনেকগুলো বর্ণনা রয়েছে, যা রীতিমতো তাওয়াতুরের পর্যায়ে। এই শাফায়াত এক ধরনের নয়, বরং বিভিন্ন ধরনের শাফায়াত হবে। কোনোটা কবিরা গুনাহকারীদের ক্ষমার জন্য, কোনোটা বিচার কাজ শুরু করার জন্য, কোনোটা জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে এমন মুমিনদের রক্ষার জন্য, কোনোটা জাহান্নাম থেকে তাদের বের করে আনার জন্য, কোনোটা জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। সবগুলোই বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

কিয়ামতের ময়দানে সুদীর্ঘ অপেক্ষার পর বিচার শুরু করতে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর শাফায়াত হলো সর্বোচ্চ ও সর্ববৃহৎ শাফায়াত (শাফায়াতে কুবরা)। কুরআনে এটাকে 'মাকামে মাহমুদ' তথা প্রশংসনীয় মর্যাদা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُودًا﴾ অর্থ : "রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়বেন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত ইবাদত। আশা করা যায়, আপনার প্রতিপালক আপনাকে **'মাকামে মাহমুদ'**-এ পৌঁছাবেন।" [ইসরা : ৭৯] তথাপি কেবল রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নন, অন্যান্য নবি-রাসুল বরং সাধারণ মুমিনরাও অন্যদের জন্য শাফায়াতের সুযোগ পাবে। ফেরেশতারা সুপারিশ করবেন। মাতা-পিতা সন্তানের ব্যাপারে সুপারিশ করবে। সন্তান মাতা-পিতার ব্যাপারে সুপারিশ করবে। আবু সাইদ খুদরি রাযি. বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আমার উম্মতের এক ব্যক্তি অসংখ্য মানুষের জন্য সুপারিশ করবে। কেউ কেউ পুরো কবিলার জন্য সুপারিশ করবে। কেউ একটি দলের জন্য সুপারিশ করবে। আবার কেউ তিন জন, দুই জন এমনকি একজনের জন্যও সুপারিশ করবে। তারা তার সুপারিশে জান্নাতে প্রবেশ

১২৫৯. বুখারি (কিতাবুদ দাআওয়াত : ৬৩০৫)। মুসানে বাযযার (মুসনাদে আনাস ইবনে মালেক : ৬৫০৮)।

করবে।'[১২৬০] বরং বিভিন্ন আমলও আমলকারীর জন্য শাফায়াত করবে। কুরআন কারিম তার তেলাওয়াতকারীর জন্য শাফায়াত করবে। রোযা রোযাদারের জন্য শাফায়াত করবে।[১২৬১]

ইমাম আজম রহ. বলেন, **'আম্বিয়ায়ে কেরামের (পরকালে) শাফায়াত সত্য। পাপী মুমিন এবং শাস্তির উপযুক্ত কবিরা গুনাহকারীদের জন্যও আমাদের নবিজি (ﷺ)-এর শাফায়াত সত্য ও প্রমাণিত।'**[১২৬২] ইমাম 'আল-ওয়াসিয়্যাহ'-তে বলেন, **'প্রত্যেক তাওহিদপন্থি মুমিন জান্নাতের অধিবাসী, রাসুলুল্লাহর শাফায়াত প্রাপ্তির উপযুক্ত, যদিও কবিরা গুনাহ করে থাকে।'**[১২৬৩]

ইমামের উক্ত বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, শাফায়াত সকল মুমিনের জন্য। 'কবিরা গুনাহকারীদের' আলাদা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করার কারণ হলো, খারেজি ও মুতাযিলারা তাদের কাফের মনে করে। ফলে তাদের ধারণা, কবিরা গুনাহকারীদের জন্য কোনো শাফায়াত নেই। এ জন্য ইমাম জোর দিয়ে বলেছেন যে, কবিরা গুনাহকারীসহ শাফায়াত সকল মুমিনের জন্য। ইমাম তহাবি রহ.-এর বক্তব্যে সেটা আরও স্পষ্ট : 'শাফায়াত সত্য, যা তিনি মুমিনদের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন, যেমনটা বিভিন্ন হাদিসে এসেছে।'[১২৬৪]

ইমাম আজম রহ. একদিন কুফার মসজিদে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, খুনি ও ব্যভিচারীর ব্যাপারে আপনার মত কী? আল্লাহ কি তাকে জাহান্নামের শাস্তি দেবেন না? ইমাম বললেন, 'যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মুখে স্বীকৃতি দেয়, অন্তরে বিশ্বাস করে, পরকাল, পুনরুত্থান ও গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে, তবে তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে এমন কথা বৈধ নয়। আল্লাহ চাইলে তাদের অপরাধ পরিমাণ শাস্তি দিতে পারেন। চাইলে একেবারেই শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দিতে পারেন।' লোকটি বলল, চিরস্থায়ী শাস্তি দিতে কী সমস্যা? ইমাম বললেন, কারণ, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যার অন্তরে একদানা পরিমাণ

১২৬০. মুসনাদে আহমদ (মুসনাদে আবি সাইদ খুদরি : ১১৩১৭; মুসনাদে বনি হাশেম : ৩০৪১)।

১২৬১. মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবদিল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস : ৬৭৩৬)।

১২৬২. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।

১২৬৩. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৬০)।

১২৬৪. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১৬)।

ঈমান রয়েছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে।' রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেছেন, 'আগুনে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়ার পরে আমার শাফায়াতের মাধ্যমে একদল মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।'[১২৬৫]

ইমাম আজম নুহ ইবনে কায়স সূত্রে আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কিয়ামতের দিন কার জন্য শাফায়াত করবেন? তিনি বললেন, 'কবিরা গুনাহকারী, হদ্দের উপযুক্ত গুনাহকারী এবং কিসাসযোগ্য অপরাধে অপরাধী।' ইমাম জাবের রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আমার শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে (সকল মুমিন) বের হয়ে আসবে। বাকি থাকবে কেবল তারা যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝٤٢ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝٤٣ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۝٤٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝٤٥ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝٤٦ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ۝٤٧ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۝٤٨ অর্থ : 'তোমাদের কীসে জাহান্নামের দিকে এনেছে? তারা বলবে : আমরা নামায পড়তাম না; মিসকিনকে খাবার দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা বিচার দিবসকে অস্বীকার করতাম। একপর্যায়ে আমাদের মৃত্যু চলে আসে। ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না।' [মুদ্দাসসির : ৪২-৪৮][১২৬৬] অর্থাৎ, কাফেররা ব্যতীত সকল মুমিন শাফায়াত পাওয়ার উপযুক্ত।

শাফায়াত অস্বীকারকারীদের খণ্ডন : খারেজি ও মুতাযিলা সম্প্রদায় কবিরা গুনাহকারীদের জন্য শাফায়াতকে অস্বীকার করে (সকল প্রকারের শাফায়াত নয়)। কারণ, তারা সগিরা গুনাহকে এমনিতেই ক্ষমাপ্রাপ্ত মনে করে, ফলে শাফায়াত নিষ্প্রয়োজন। আর কবিরা গুনাহকারীকে চিরস্থায়ী জাহান্নামি মনে করে; ফলে সেখানে শাফায়াত অর্থহীন।[১২৬৭]

তারা তাদের ভ্রান্ত মাযহাব সঠিক প্রমাণের জন্য রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিভিন্ন হাদিসের আক্ষরিক অর্থ দিয়ে দলিল দেয়। যেমন বুখারি ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাযি.-এর একটি হাদিস। আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি

১২৬৫. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৪৮-১৪৯)।

১২৬৬. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৫৬)।

১২৬৭. দেখুন : তালখিসুল আদিল্লাহ (৮৭২)।

ব্যভিচার করে, তখন সে মুমিন থাকে না। যখন কোনো ব্যক্তি চুরি করে, তখন সে মুমিন থাকে না। যখন কোনো ব্যক্তি মদ্যপান করে, তখন সে মুমিন থাকে না। হ্যাঁ, তাওবার সুযোগ থাকবে।'[১২৬৮] সুতরাং ব্যভিচারী বা চোর যদি তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে, তবে তারা মুমিন নয়। তাই পরকালে তার জন্য শাফায়াতের মাধ্যমে মুক্তির কোনো পথ নেই।

আহলে সুন্নাত তাদের এ বক্তব্যকে ভুল সাব্যস্ত করেন। আহলে সুন্নাতের মতে, খারেজি ও মুতাযিলারা হাদিসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছে; মর্মকে গ্রহণ করেনি। তাই বিচ্যুতির শিকার হয়েছে। অথচ হাদিস পেলেই সেটাকে বাহ্যিক অর্থে গ্রহণের সুযোগ নেই। উদাহরণ হিসেবে আমরা এখানে একটি হাদিস উল্লেখ করব, যেটা তাদের উল্লেখ করা হাদিসের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক। আবু যর গিফারি রাযি. বলেন, আমি একদিন রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এলাম। তিনি একটি শুভ্র কাপড় পরে ঘুমাচ্ছিলেন। আমি এলে তিনি উঠে গেলেন। বললেন, "যেকোনো ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে সাক্ষ্য দেওয়ার পর সে অবস্থায় মারা গেলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" আবু যর বলেন, আমি বললাম, ব্যভিচার ও চুরি করলেও? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ব্যভিচার ও চুরি করলেও।' আমি আবার বললাম, সে ব্যক্তি ব্যভিচার ও চুরি করলেও? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ব্যভিচার ও চুরি করলেও।' আমি আবারও বললাম, ব্যভিচার ও চুরি করা সত্ত্বেও (কেবল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার কারণে জান্নাতে যাবে)? রাসুল (ﷺ) বললেন, 'হ্যাঁ, ব্যভিচার ও চুরি করা সত্ত্বেও। আবু যর না চাইলেও।'[১২৬৯]

এখান থেকে প্রশ্ন জাগে, তাহলে দুই হাদিসের সমন্বয় কী? সমন্বয়ের জন্য আমাদের হাদিসের বাহ্যিক অর্থ ছেড়ে গভীর মর্মে প্রবেশ করতে হবে। প্রথম হাদিসটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। অর্থাৎ, কেউ যদি চুরি ও ব্যভিচারকে হালাল মনে করে, তবে সে মুমিন থাকবে না। হালাল মনে না করে লিপ্ত হলে গুনাহগার হবে। দ্বিতীয় হাদিসে সেটাকেই সমর্থন করা হয়েছে। অর্থাৎ, কেউ হারাম জেনে ব্যভিচার কিংবা চুরিতে লিপ্ত হয়ে গেলেও যদি আল্লাহর উপর ঈমান থাকে এবং ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে সে ঈমানের বিনিময়ে জান্নাতে যাবে।

১২৬৮. বুখারি (কিতাবুল মাযালিম : ২৪৭৫)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ৫৭)।
১২৬৯. বুখারি (কিতাবুল লিবাস : ৫৮২৭)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ৯৪)।

ইমাম আজম রহ. আতিয়্যাহ সূত্রে হুযাইফা, ইবনে আব্বাসসহ একাধিক সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর বাণী ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا﴾ অর্থ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন।' [ইসরা : ৭৯]-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'মাকামে মাহমুদ শাফায়াত। আল্লাহ তায়ালা গুনাহের কারণে একদল মুমিনকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। পরবর্তীকালে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর শাফায়াতের মাধ্যমে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করবেন। 'হায়াওয়ান' (জীবন) নামক এক নদীতে তাদের অবগাহন করাবেন। অতঃপর তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। জান্নাতে তারা 'জাহান্নামি' হিসেবে পরিচয় লাভ করবে। তাই তারা আল্লাহর কাছে (নাম পরিবর্তনের) মিনতি করবে। আল্লাহ তাদের সে নামের পরিবর্তে 'আল্লাহ কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত' নাম দান করবেন এবং তারা সে নামে পরিচিত হবে।'[১২৭০]

ইমাম মাতুরিদি রহ. বলেন, 'কবিরা গুনাহকারীদের জন্য শাফায়াত কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। সগিরা গুনাহ এমনিতেই ক্ষমা হয়ে যায়। এর জন্য তাওবা বা শাফায়াত দরকার হয় না। কুফর ও শিরকের ক্ষেত্রে শাফায়াত কোনো উপকারে আসে না। বোঝা গেল, শাফায়াত কেবল শাস্তিযোগ্য গুনাহগার মুমিনদের জন্যই।'[১২৭১]

মিযান (দাঁড়িপাল্লা)

কিয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। তাতে সকল পুণ্য ও পাপ, ভালো ও মন্দ আমল মাপা হবে। এটা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত সকল আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে গৃহীত একটি জরুরি আকিদা। কাফের-মুমিন সবার জন্য এ দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন আয়াতে এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَٱلۡوَزۡنُ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّۚ فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٨ وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَظۡلِمُونَ ٩﴾ অর্থ : 'সেদিনের ওজন করা সত্য। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে; আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা সেসব লোক যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে সীমালংঘন করে নিজেরা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।' [আরাফ : ৮-৯] অন্য

১২৭০. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৫৬)।

১২৭১. আত-তাওহিদ (২৬৩)।

আয়াতে বলেন, ﴿فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُۥ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُۥ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَـٰلِدُونَ ۝﴾ অর্থ : 'যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম; আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।' [মুমিনুন : ১০২-১০৩] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ﴾ অর্থ : 'আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম হবে না। যদি কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।' [আম্বিয়া : ৪৭] অন্যত্র বলেন, ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُۥ ۝ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُۥ ۝ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ۝ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌۢ ۝﴾ অর্থ : "তখন যার পাল্লা ভারী হবে, সে সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে। কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে 'হাবিয়া।' আপনি কি জানেন 'হাবিয়া' কী? অতি উত্তপ্ত অগ্নি।" [কারিয়াহ : ৬-৭]

পরকালের এ দাঁড়িপাল্লার রূপরেখা কী হবে সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই। তবে এটা দুনিয়ার দাঁড়িপাল্লার চেয়ে ভিন্ন হবে। কারণ, দুনিয়ার দাঁড়িপাল্লা ভারী ও বড় হলে তাতে ছোট ও হালকা জিনিস মাপা যায় না বা হালকা বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। আবার ছোট ও হালকা হলে তাতে বড় ও ভারী জিনিস মাপা যায় না। কিন্তু আখেরাতের মিযানে হালকা-ভারী, ছোট-বড় সবকিছু মাপা যাবে। তবে মিযান তথা দাঁড়িপাল্লার স্বরূপ (কাইফিয়্যাত) আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। এটুকু নিশ্চিত যে, এটা দ্বারা মানুষের আমল পরিমাপ করা হবে। কিন্তু কীরূপে হবে সেটা আল্লাহ ভালো জানেন।

ইমাম আজম রহ. বলেন, **'কিয়ামতের দিন মিযানে আমল ওজন করা সত্য।'**[১২৭২] ইমাম 'আল-ওয়াসিয়্যাহ' গ্রন্থে বলেন, **'মিযান সত্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ﴾ অর্থ : 'আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের তুলাদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কাউকে বিন্দুপরিমাণ জুলুম করা হবে না।' [আম্বিয়া : ৪৭] আমলনামা পড়া সত্য। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,**

১২৭২. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।

﴿اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا﴾ **অর্থ : 'পাঠ করো তুমি তোমার আমলনামা। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।' [ইসরা : ১৪]**[১২৭৩]

ইমাম তহাবি রহ. বলেন, 'আমরা কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান এবং আমলের প্রতিদান পাওয়ার বিশ্বাস রাখি। বিশ্বাস রাখি... মিযানের ব্যাপারে। মিযানে মুমিনের ভালোমন্দ, পাপ-পুণ্য সব ধরনের আমল রাখা হবে।'[১২৭৪]

ইমাম আজম রহ. তাঁর শায়খ হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান থেকে ইবরাহিম নাখায়ি সূত্রে বর্ণনা করেন, 'কিয়ামতের দিন একব্যক্তির আমল মিযানের এক পাল্লায় রাখা হবে। কিন্তু তা অত্যন্ত হালকা হবে। তখন মেঘের মতো কিছু একটা পাল্লায় যোগ করা হলে সেটা ভারী হয়ে যাবে। তাকে বলা হবে, তুমি জানো এটা কী? সে বলবে, না। তাকে বলা হবে, এটা সেই ইলম যা তুমি শিখেছ এরপর মানুষকে শিখিয়েছ। তারা সেগুলো শিখে সে অনুযায়ী আমল করেছে।'[১২৭৫]

মিযান অস্বীকারকারীদের সংশয়ের অপনোদন : কুরআন-সুন্নাহর এসব বর্ণনার ভিত্তিতে আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত আকিদা হলো, মিযান সত্য ও বাস্তব। কিন্তু প্রাচীন মুতাযিলা এবং তাদের বর্তমান অনুসারী বুদ্ধিজীবী দাবিদারগণ এটাতে সন্দেহ পোষণ করে। তাদের যুক্তি হলো, আমলকে ওজন করা অসম্ভব। কেননা আমল হলো বায়বীয় ও বিমূর্ত ব্যাপার। অথচ ওজন করতে হলে মূর্ত ও শরীরী হতে হয়। ফলে আমলের অবস্থা হিসেবে জান্নাত ও জাহান্নাম দেওয়া হবে। পরিমাপ নিষ্প্রয়োজন। মুতাযিলাদের এটা অস্বীকারের আরও একটা কারণ আছে। আমাদের আকিদা—মিযানে পুণ্য ও পাপের হিসাব করা হবে। অথচ মুতাযিলাদের মতে এই দুটো এক হয় না। কেউ কবিরা গুনাহ করলে তাদের মতে সে ঈমান থেকে বেরিয়ে যায়। কোনো পুণ্য থাকে না। ফলে তার পাপ-পুণ্যের পরিমাপ নিষ্প্রয়োজন।[১২৭৬]

তাদের এই বিভ্রান্তির কারণ হলো যুক্তি ও সীমাবদ্ধ ব্রেইনের উপর নির্ভরশীলতা। তারা যদি তাদের ত্রুটিপূর্ণ ব্রেইনের উপর নির্ভর না করে মহান আল্লাহ তায়ালার বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি দিত, তবে মিযান অস্বীকার করতে পারত না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় সুস্পষ্ট ভাষায় দাঁড়িপাল্লা

১২৭৩. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৫৬-৫৭)।

১২৭৪. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৬)।

১২৭৫. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৪৬)।

১২৭৬. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৬৩)।

স্থাপন এবং আমল ওজন করার কথা বলেছেন। যদি মিযান না থাকত, তবে তিনি এগুলো কেন বলতে যাবেন? তা ছাড়া, তাদের যুক্তি আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপের নামান্তর। আল্লাহ তায়ালা সবকিছু করতে পারেন। তিনি সর্বশক্তিমান। তাকে কোনোকিছু অক্ষম করতে পারে না। তাহলে তিনি আমলকে কেন মাপতে পারবেন না? বিভিন্ন হাদিসে কবর এবং কবর থেকে বের হওয়ার সময় আমলকে শরীরী রূপ দিয়ে মানুষের সামনে উপস্থাপনের কথা এসেছে। সুতরাং ওজন করার সময়ও যে আল্লাহ এমন করতে পারবেন সেটা তো সহজবোধ্য।[১২৭৭]

মোটকথা, কিছু হাদিস দিয়ে বোঝা যায় স্বয়ং আমলটাকেই মাপা হবে। যেমন—হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'দুটি বাক্য এমন রয়েছে, মুখে যার উচ্চারণ অতি সহজ, কিন্তু মিযানের পাল্লায় অনেক ভারী এবং আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। তা হলো : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম।'[১২৭৮] আবুদ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন মিযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে উত্তম চরিত্র।'[১২৭৯] আবার কিছু হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, আমলনামা মাপা হবে। যেমন 'হাদিসুল বিতাকাহ' নামক প্রসিদ্ধ হাদিসে এসেছে, একব্যক্তির সকল অন্যায়ের ফিরিস্ত (সিজিল্ল) এক পাল্লায় রাখা হবে, আরেক পাল্লায় কালিমা শাহাদাত লেখা একটা চিরকুট (বিতাকাহ) রাখা হবে, সেই কালিমার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।[১২৮০] আবার কিছু হাদিস দ্বারা বোঝা যায় ব্যক্তিকে মাপা হবে; কিন্তু ব্যক্তির শরীর হিসেবে ওজন নয়, বরং ঈমান ও আমল হিসেবে হবে। যেমন—একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের দুই পায়ের ব্যাপারে (যা বেশ শীর্ণ ছিল) বলেন, 'এ দুটো মিযানের পাল্লায় উহুদ পাহাড়ের চেয়ে বেশি ভারী হবে।'[১২৮১] অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তায়ালা সবগুলোই মাপবেন।

১২৭৭. দেখুন : মুসনাদে আহমদ (আওয়ালু মুসনাদিল কুফিয়্যিন : ১৮৮৩২)। মুসান্নাফে আবদির রাযযাক (কিতাবুল জানায়েয : ৬৭৩৭)।

১২৭৮. বুখারি (কিতাবুদ দাআওয়াত : ৬৪০৬)। মুসলিম (কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া : ২৬৯৪)।

১২৭৯. মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুল কাবায়িল : ২৮২০৩)। ইবনে হিব্বান (কিতাবুল বিররি ওয়াল ইহসান : ৪৮১)।

১২৮০. তিরমিযি (আবওয়াবুল ঈমান : ২৬৩৯)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুয যুহদ : ৪৩০০)।

১২৮১. ইবনে হিব্বান (মানাকিবুস সাহাবাহ : ৭০৬৯)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবদিল্লাহ ইবনে মাসউদ : ৪০৭২)।

তা ছাড়া, মুতাযিলাদের অথর্ব যুক্তি ও নির্বুদ্ধিতার আরেক প্রমাণ হলো আধুনিক বিজ্ঞান। বর্তমান যুগে এসে আমরা কেবল শরীরী বিষয় নয়, বিমূর্ত ও শরীরী সবকিছুকে মাপছি। শরীরের তাপমাত্র মাপছি, ভূমিকম্প মাপছি, শব্দ মাপছি, গতি মাপছি, আলো মাপছি। অর্থাৎ, পৃথিবীর সবকিছুই এখন মাপা হচ্ছে এবং এ সবকিছু মানুষ করছে। তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের আমল মাপতে পারবেন না? অদূর ভবিষ্যতে হয়তো মানবসংশ্লিষ্ট আরও অনেক আপাত অপরিমাপ্য বিষয় পৃথিবীতেই মাপা যাবে। তাই মানুষের উচিত নিজের সীমাবদ্ধ মস্তিষ্ক ও বিবেককে সবকিছুর মানদণ্ড না বানানো। বিবেকের সীমার বাইরে তাকে সালিশ নিযুক্ত না করা।

পৃথিবীর সবকিছুর পরিমাপক যেমন একরকম নয়, কিয়ামতের দাঁড়িপাল্লাও পৃথিবীর চাল-ডাল মাপার দাঁড়িপাল্লা কিংবা জ্বর মাপার যন্ত্রের মতো হবে এমন চিন্তা করা সঠিক নয়। কারণ, এগুলো অদৃশ্যের বিষয় যা আমরা আমাদের মস্তিষ্ক দিয়ে অনুভব করতে পারব না। ফলে এ ব্যাপারে নীরব থাকতে হবে। কুরআন-সুন্নাহতে মিযান থাকার কথা, সকল ভালো ও মন্দ আমল মাপার কথা বলা হয়েছে। আমাদের কর্তব্য হলো সেগুলোতে দৃঢ় ঈমান রাখা। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন আমাদের আমল মাপতে সক্ষম—এটুকু বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট এবং যুক্তির দাবি। সাবুনি বলেন, 'কবিগণ কবিতার জন্যও মিযান (ওজন/ছন্দ) নির্ধারণ করেছেন। সময় জানার জন্য কাঠ দিয়ে তৈরি একটি (প্রাচীন) যন্ত্রের নামও মিযান, যা দিয়ে সূর্যের অবস্থান, নামাযের সময় ইত্যাদি নির্ধারণ করা যায়। এগুলো কেউ না দেখলে এগুলোর রূপরেখা বুঝতে পারবে না; যব ও শস্য মাপার পাল্লা মনে করবে। অথচ এগুলো সব দুনিয়ার দাঁড়িপাল্লা। তাহলে আখেরাতের দাঁড়িপাল্লার ব্যাপারে মাথা ঘামানো কতটুকু সঠিক?'[১২৮২]

পুলসিরাত

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরকালসংক্রান্ত আরেকটি আকিদা হলো 'পুলসিরাত।' এটা জাহান্নামের উপর স্থাপিত একটি পুল। চুলের চেয়ে চিকন, তরবারির চেয়ে ধারালো। এর চারপাশে লোহার কাঁটা রয়েছে। সবাইকে এটা অতিক্রম করতে হবে। একদল এটা অতিক্রম করে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। আরেক

১২৮২. আল-কিফায়াহ, সাবুনি (৩৭৮)।

দল এর উপর থেকে নিচে জাহান্নামের ভিতরে পতিত হবে।[১২৮৩] কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং অগণিত হাদিস দ্বারা পুলসিরাতের সত্যতা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾﴾ অর্থ : 'তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমি মুত্তাকিদের নিষ্কৃতি দেবো আর জালেমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো।' [মারইয়াম : ৭১-৭২] এখানে সবাইকে জাহান্নামে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। অতঃপর সেখান থেকে মুমিনদের মুক্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এটা পুলসিরাতের মাধ্যমেই সম্ভব। অর্থাৎ, পুলসিরাত জাহান্নামের উপর স্থাপিত থাকবে। পুলসিরাতের উপর থেকে জান্নাতিরা জান্নাতে চলে যাবে। জাহান্নামিরা নিচে জাহান্নামে পড়ে যাবে।

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে কুরআনের বাণী : ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ অর্থ : 'যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও। মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে, যিনি এক, পরাক্রমশালী।' [ইবরাহিম : ৪৮] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, (যদি পৃথিবী পুরোপুরি বদলে যায়) তবে সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, 'পুলসিরাতের উপর।'[১২৮৪]

আনাস ইবনে মালেক রাযি. রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে কিয়ামতের দিনের শাফায়াত প্রার্থনা করলেন। রাসুল (ﷺ) বললেন, 'ঠিক আছে, আমি করব।' আনাস বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনাকে আমি কোথায় খুঁজব?' তিনি বললেন : 'পুলসিরাতের কাছে খুঁজবে।' আমি বললাম, যদি পুলসিরাতে আপনার সাক্ষাৎ না পাই? তিনি বললেন : 'মিযানের কাছে।' আমি বললাম, যদি মিযানের কাছে আপনাকে না পাই? তিনি বললেন : 'হাউজে কাউসারের কাছে। এই তিনটি জায়গার কোথাও-না-কোথাও পাবেই।'[১২৮৫]

১২৮৩. মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৮৩)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আয়েশা : ২৫৪৩২)। উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৬৪)।

১২৮৪. মুসলিম (কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়াল জান্নাহ ওয়ান নার : ২৭৯১)। তিরমিযি (আবওয়াবু তাফসিরিল কুরআন : ৩১২১)।

১২৮৫. তিরমিযি (আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ : ২৪৩৩)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আনাস ইবনে মালেক : ১৩০২২)। বাযযার (৭৩০৭)।

আবু হুরায়রা রাযি.-এর শাফায়াতসংক্রান্ত দীর্ঘ ও প্রসিদ্ধ হাদিসে এসেছে, "...(কিয়ামতের দিন) রাসুলুল্লাহ (ﷺ) দোয়ার জন্য দাঁড়াবেন। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক পুলসিরাতের ডানে ও বামে এসে দাঁড়াবে। (তিনি বলেন) 'তোমাদের প্রথম দলটি বিদ্যুদ্গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে।' সাহাবি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বিদ্যুদ্গতিতে' কথাটির মর্ম কী আমাকে বলুন। আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান! রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : 'আকাশে কখনো বিদ্যুচ্চমক দেখোনি? চোখের পলকে আসে আর চলে যায়।' (তারাও সেভাবে দ্রুত পুলসিরাত পার হয়ে যাবে)। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : 'পরবর্তী দলগুলো যথাক্রমে বাতাসের বেগে, পাখির গতিতে এবং সর্বশেষে দৌড়ের গতিতে পার হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই তার আমল হিসেবে পুলসিরাত অতিক্রম করবে। তোমাদের নবি (ﷺ) তখন পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে এ দোয়া করতে থাকবেন : আল্লাহ, আপনি রক্ষা করুন! আল্লাহ, আপনি রক্ষা করুন! আল্লাহ, আপনি নিরাপদে পৌঁছিয়ে দিন। এভাবে আমল যত কমতে থাকবে গতি কমতে থাকবে এবং প্রত্যেকে ধীর থেকে ধীরে পুলসিরাত পার হতে থাকবে। শেষে একব্যক্তি নিতম্ব হিঁচড়ে পুলসিরাত পার হবে।' রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'পুলসিরাতের উভয় পাশে কাঁটাযুক্ত লৌহশলাকা ঝুলন্ত রয়েছে। এগুলো আল্লাহর নির্দেশক্রমে নির্ধারিত পাপীদের ধরে ফেলবে। কেউ তাতে গুঁতো খেয়েও মুক্তি পাবে। কেউ তাতে জড়িয়ে জাহান্নামের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হবে...।'"[১২৮৬]

মুগিরা ইবনে শুবা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'পুলসিরাতের উপর মুমিনদের নিদর্শন হবে (এই দোয়া) : رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ অর্থাৎ, হে আল্লাহ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!'[১২৮৭]

মুতাযিলা, রাফেযি এবং বিভিন্ন বিদআতি সম্প্রদায় পুলসিরাতকে অস্বীকার করে। তারা উপরের আয়াতকে 'জাহান্নামের কাছাকাছি' বা 'পাশ দিয়ে যাওয়া'র মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু এমন ব্যাখ্যা পরিত্যাজ্য। খোদ রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য দ্বারা তাদের অপব্যাখ্যা প্রমাণিত হয়।

১২৮৬. মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৯৫)। মুসতাদরাকে হাকেম (কিতাবুত তাফসির : ৩৪৪৪)।
১২৮৭. তিরমিযি (আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ : ২৪৩২)।

জান্নাত ও জাহান্নাম

জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহর দুটো সৃষ্টি। আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত আকিদা—এ দুটোকে ইতোমধ্যেই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম আজম রহ. বলেন, **'জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্ট (মাখলুক)। বর্তমানে বিদ্যমান। কখনো ধ্বংস হবে না। জান্নাতের হুরও কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। আল্লাহর শাস্তি কখনো শেষ হবে না। শেষ হবে না তাঁর প্রতিদান।'**[১২৮৮] আল-ওয়াসিয়্যাহতে ইমাম বলেন, **'আমরা বিশ্বাস করি, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য। এ দুটি সৃষ্টি। বর্তমানে বিদ্যমান। এগুলো কিংবা এগুলোর অধিবাসীরা কখনো ধ্বংস হবে না। আল্লাহ তায়ালা এ দুটো মুমিনদের পুরস্কার এবং কাফেরদের শাস্তির জন্য সৃষ্টি করেছেন।'**[১২৮৯]

কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও হাদিস এ আকিদার সাক্ষ্য। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ অর্থ : 'তোমরা জাহান্নামকে ভয় করো, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।' [আলে ইমরান : ১৩১] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ অর্থ : 'তোমরা ছুটে যাও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আকাশমণ্ডলী ও যমিনের মতো (বিশাল), যা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।' [আলে ইমরান : ১৩৩] আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেন, ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ অর্থ : 'আর আমি বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার করো। কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' [বাকারা : ৩৫] এখানে আদম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়ার জান্নাতে অবস্থান, নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে ফল ভক্ষণ এবং সেখান থেকে বের করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদি জান্নাত না-ই থাকত, তাহলে তারা কোথায় ছিলেন, বৃক্ষ কোথায় ছিল আর আল্লাহ কোত্থেকেই-বা তাদের বের করলেন? মোটকথা, যদি জান্নাতকে সৃষ্টি না ধরা হয়, তবে এসব কথা অর্থহীন ও মিথ্যা হয়ে যায়। কারণ,

---

১২৮৮. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।

১২৮৯. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৫৪-৫৬)।

জান্নাতই যেখানে নেই, আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাত দেওয়ার অর্থ কী? জান্নাতে তাঁর বসবাসের অর্থ কী? বোঝা গেল, জান্নাত ও জাহান্নামকে আল্লাহ তায়ালা আদমের আগেই সৃষ্টি করেছেন। এ দুটো এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তা ছাড়া, মিরাজের রাতে রাসুলুল্লাহকে (ﷺ) জান্নাত ও জাহান্নাম ভ্রমণ করানো হয়েছে। তিনি জান্নাতের নেয়ামত এবং জাহান্নামের শাস্তি দেখেছেন। যদি জান্নাত-জাহান্নাম না-ই থাকত, তাকে কী দেখানো হলো?

আহলে সুন্নাতের বিপরীতে জাহমিয়্যাহ ও মুতাযিলা সম্প্রদায় মনে করে, জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়নি। তাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা এগুলো যখন প্রয়োজন তখন সৃষ্টি করবেন। এগুলো প্রয়োজন হবে কিয়ামতের দিন পুণ্যবান ও পাপীদের মাঝে ফয়সালা করে দেওয়ার পরে। তাই তখন তিনি জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করবেন। কিন্তু এটা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কথা, যেমনটা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, তিনি জান্নাত ও জাহান্নামকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং অপ্রয়োজন/অপ্রয়োজনের যুক্তি ধরে এটাকে অস্বীকার করা বৈধ হবে না। জান্নাত ও জাহান্নামকে বর্তমানে সৃষ্টি না বলা প্রকারান্তরে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। তা ছাড়া, এর মাধ্যমে আল্লাহকেও মিথ্যুক ও দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ মানুষকে জান্নাতের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন আর জাহান্নাম থেকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। অস্তিত্বহীন কোনো বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করা আর অবিদ্যমান কোনো বিষয় থেকে ভয় দেখানো অন্যায় এবং নৈতিকতাবিরোধী কাজ। আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের কাজ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

ইমাম আজম তাদের যুক্তির মাধ্যমে পরাস্ত করেন। তিনি বলেন, **“জান্নাত ও জাহান্নাম বস্তু কি বস্তু নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই দুটো বস্তু। ইমাম বলেন, কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নিজেকে ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ তথা 'সকল বস্তুর স্রষ্টা' [আনআম : ১০২] হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ অর্থ : 'নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছি পরিমিতভাবে।' [কামার : ৪৯] জান্নাত ও জাহান্নাম যেহেতু বস্তু, সুতরাং এ দুটোও আল্লাহর সৃষ্টি (মাখলুক)। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ অর্থ : 'সকালে**

ও সন্ধ্যায় তাদের আগুনের সামনে পেশ করা হয়।' [মুমিন : ৪৬][১২৯০] এর দ্বারাও বোঝা যায়, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান। কারণ, এগুলো বিদ্যমান না থাকলে তাদের কীভাবে আগুনের সামনে পেশ করা হয়?

জান্নাত-জাহান্নাম ধ্বংসহীন : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত আকিদা হলো, জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংসহীন। ফলে জান্নাতের নেয়ামত কখনো ফুরোবে না। জাহান্নামের শাস্তি কখনো নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ তায়ালা এ দুটোকে স্থায়ীভাবে তৈরি করেছেন। বিপরীতে জাহমিয়্যাহ, কাদারিয়্যাহ ও মুতাযিলা সম্প্রদায় মনে করে, জান্নাত-জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে। একশ্রেণির জাহমিয়্যাহ ও সুফিরা মনে করে, জাহান্নামিরা যখন তাদের কর্মের শাস্তি পেয়ে যাবে, একপর্যায়ে জাহান্নাম তাদের জন্য তেমন হয়ে যাবে যেমন মাছের জন্য পানি হয়। অর্থাৎ, জান্নাতিরা জান্নাতে সুখ উপভোগ করলেও জাহান্নামিরা কোনো দুঃখ ভোগ করবে না। এটাই তাদের শাস্তি! জাহমিয়্যাহদের গুরু জাহম ইবনে সাফওয়ান জান্নাত ও জাহান্নামকে ধ্বংসশীল মনে করত। মুতাযিলাদের নেতা আবুল হুযাইল আল্লাফও একই আকিদা রাখত। রাফেযি গুরু হিশাম ইবনুল হাকাম বলত, 'জাহান্নামবাসী একসময় বেহুঁশের মতো হয়ে যাবে। ফলে কোনো শাস্তি তাদের কাছে শাস্তি মনে হবে না।'[১২৯১]

এ সবকিছু কুরআনি আকিদার বিপরীত। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জান্নাত-জাহান্নামকে চিরস্থায়ী ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝﴾

অর্থ : 'যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অন্য কোথাও যেতে চাইবে না।' [কাহাফ : ১০৭-১০৮]

ইমাম আজম বিদআতিদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করে বলেন, **"কুরআনে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের নেয়ামতের ব্যাপারে বলেছেন, ﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ অর্থ : 'যা শেষ হওয়ার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়।' [ওয়াকিয়া : ৩৩]** সুতরাং যে ব্যক্তি

১২৯০. আল-ফিকহুল আকবার (৫৬)।

১২৯১. দেখুন : তালবিসুল আদিল্লাহ (৮৮৫)। বাহরুল কালাম (১৭৩, ২২০)।

বলবে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে, সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, সে মূলত আল্লাহর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করল। জান্নাত ও জাহান্নামের স্থায়ী হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের বাণী অস্বীকার করল।"[১২৯২] ইমাম আল-ওয়াসিয়্যাহতে বলেন, "জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতে চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন, ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ অর্থ : 'তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তথায় তারা চিরদিন অবস্থান করবে।' [বাকারা : ৮২] একইভাবে জাহান্নামের অধিবাসীরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন, ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ অর্থ : 'তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তথায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে।'" [বাকারা : ৩৯][১২৯৩]

পিছনেও ইমামের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্ট। বর্তমানে বিদ্যমান। কখনো ধ্বংস হবে না। জান্নাতের হুর কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। আল্লাহর শাস্তি কখনো শেষ হবে না। শেষ হবে না তাঁর প্রতিদান।'[১২৯৪] আরও বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য। এ দুটি সৃষ্টি। বর্তমানে বিদ্যমান। এগুলো কিংবা এগুলোর অধিবাসীরা কখনো ধ্বংস হবে না।'[১২৯৫]

ইমাম তহাবি বলেন, 'জান্নাত এবং জাহান্নাম আল্লাহর সৃষ্টি করা দুটো মাখলুক। কিন্তু এ দুটো কখনো ধ্বংস হবে না, বিলীন হবে না।'[১২৯৬] আবু হাফস বলেন, 'আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো জান্নাত ও জাহান্নামকে মাখলুক মনে করা এবং এ দুটো কখনো ধ্বংস হবে না বিশ্বাস করা।'[১২৯৭]

মুতাযিলারা সরাসরি এ দুটোর চিরন্তনতা অস্বীকার করে না, কিন্তু তাদের কথার ফলাফল এটাই দাঁড়ায়। কারণ, তারা মনে করে, মানুষকে পুরস্কার দেওয়া হবে তার ভালো কাজের হিসেবে, শাস্তিও দেওয়া হবে কুফর-অবাধ্যতার হিসেবে।

১২৯২. আল-ফিকহুল আকবার (৫৬)।

১২৯৩. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৬১)।

১২৯৪. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।

১২৯৫. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৫৪-৫৬)।

১২৯৬. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৬)।

১২৯৭. আস-সাওয়াদুল আজম (৩, ২৩)।

কাজ যেহেতু একসময় শেষ হয়ে যাবে, তাই পুরস্কার ও শাস্তিও একসময় শেষ হওয়া উচিত। কিন্তু এটা গলত যুক্তি। খোদ কুরআন এটা প্রত্যাখ্যান করছে। ফলে কুরআনের সামনে যুক্তিকে সালিশ বানানো বৈধ হবে না। কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো : জান্নাত-জাহান্নাম কখনো ধ্বংস হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ অর্থ : 'যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।' [ফুসসিলাত : ৮] জান্নাতের নেয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ﴿لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ অর্থ : 'যা শেষ হওয়ার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়।' [ওয়াকিয়া : ৩৩]

কেউ বলতে পারে, জান্নাত-জাহান্নামকে চিরস্থায়ী বলা হলে আল্লাহও তো চিরস্থায়ী। তাহলে কি এ দুটোকে তাঁর সিফাতের সঙ্গে শরিক করা হবে না? আমরা বলব, কখনোই নয়। কারণ, এগুলো একসময় ছিল না। আল্লাহর সৃষ্টির মাধ্যমে অস্তিত্বে এসেছে। আল্লাহর সুরক্ষার মাধ্যমেই এগুলো স্থায়ীভাবে থাকবে। বিপরীতে আল্লাহ সবসময় ছিলেন। কেউ তাঁকে সৃষ্টি করেনি। তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি চিরন্তন, চিরস্থায়ী, অমুখাপেক্ষী। উপরন্তু কেবল জান্নাত-জাহান্নাম নয়, বরং আল্লাহ তায়ালা আরও কিছু বস্তু তৈরি করেছেন যেগুলোকে ধ্বংস হওয়া থেকে মুক্ত রাখবেন। মোল্লা হুসাইন লিখেন, 'আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো—সাতটি জিনিস কখনো ধ্বংস হবে না। এক. আরশ। দুই. কুরসি। তিন. লাওহে মাহফুজ। চার. কলম। পাঁচ ও ছয়. জান্নাত ও জাহান্নাম এবং এগুলোর অধিবাসীরা। সাত. রুহ। কুরআনে এটার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ﴾ অর্থ : 'যেদিন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীত-বিহ্বল হয়ে (মৃত্যুর কোলে ঢলে) পড়বে, তবে আল্লাহ যাদের চাইবেন তারা ব্যতীত এবং সকলেই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়।' [নামল : ৮৭] আলেমদের মতে, 'তবে আল্লাহ যাদের চাইবেন তারা ব্যতীত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জান্নাত-জাহান্নাম, এগুলোর অধিবাসী, জান্নাত ও জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা এবং জান্নাতে বিদ্যমান হুর-গিলমান ইত্যাদি।'[১২৯৮]

১২৯৮. দেখুন : তালবিসুল আদিল্লাহ (১৭২)। বাহরুল কালাম (২১১)। আল-জাওহারাতুল মুনিফাহ (৮১-৮২)। মাগনিসাভি (১৬০)।

পরকালে আল্লাহর দিদার (সাক্ষাৎ)

মহান আল্লাহ জাল্লা জালালুহুকে পরকালে দেখা সম্ভব কি না বিষয়টি নিয়ে আহলে কিবলা তথা মুসলমানদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। মুতাযিলা, খাওয়ারিজ ও রাফেযিদের মাঝে যাইদিয়্যাহ, জাহমিয়্যাহ এবং অধিকাংশ মুরজিয়া সম্প্রদায় আল্লাহর দিদার অস্বীকার করে। এদের আকিদা ভ্রান্ত। কাররামিয়্যাহ, মুজাসসিমাসহ একাধিক সম্প্রদায় আল্লাহকে দেখা সম্ভব মনে করলেও এ বিষয়ে তারা ভ্রান্ত আকিদা লালন করে। তারা বলে, আল্লাহকে সেভাবে দেখা যাবে যেভাবে অন্যান্য সৃষ্টিকে দেখা যায়। কারণ, তারা আল্লাহর জন্য দেহ সাব্যস্ত করে। ফলে অন্যান্য দেহধারী সৃষ্টিকে যেভাবে দেখা যায়, আল্লাহকেও সেভাবে দেখা যাবে মনে করে। এই দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি আহলে সুন্নাতের অবস্থান। আহলে সুন্নাত বিশ্বাস করে, আল্লাহকে দেখা যাবে। মুমিনগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে কিয়ামতের ময়দানে ও জান্নাতে।[১২৯৯]

পরকালে মুমিনদের আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রতিষ্ঠিত আকিদা। এটা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কামাল ইবনুল হুমাম লিখেন—'শাফায়াত, আল্লাহর দিদার, কবরের ফেরেশতা (মুনকার ও নাকির) এবং কিরামান কাতিবিনকে অস্বীকারকারীর পিছনে নামায আদায় বৈধ নয়। কেননা এগুলো শরিয়তে সুস্পষ্টভাবে ও মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত। ফলে এগুলোর অস্বীকারকারী কাফের। হ্যাঁ, কেউ যদি এগুলোকে অপব্যাখ্যা করে—যেমন আল্লাহর দিদারের ক্ষেত্রে বলে : তিনি অনেক বড় ও মহান। ফলে তাঁকে দেখা সম্ভব নয়—এমন ব্যক্তি বিদআতি গণ্য হবে (কাফের নয়)।'[১৩০০]

আল্লাহর দিদারের সত্যতার উপর কুরআনের অনেকগুলো দলিলের মাঝে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা হলো :

এক. আল্লাহর বাণী ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ অর্থ : 'সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর রবের সাক্ষাৎ প্রত্যাশ্যা করে, সে যেন পুণ্য করে। আর তাঁর রবের ইবাদতের সঙ্গে কাউকে শরিক না করে।' [কাহাফ : ১১০] যদি

১২৯৯. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (৮৩)। তালখিসুল আদিল্লাহ (৮৯০-৮৯১)। আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ (১৪৭)।

১৩০০. ফাতহুল কাদির (১/৩৫০)।

আল্লাহর সাক্ষাৎ সম্ভব না হতো, তবে তাওহিদের বিনিময়ে তিনি সেটার প্রতিশ্রুতি দিতেন না।

দুই. আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَٰتِنَا غَٰفِلُونَ ۝٧ أُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ۝٨﴾ অর্থ : 'নিশ্চয়ই যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট আর এতেই পরিতৃপ্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলি সম্বন্ধে গাফেল, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, কৃতকর্মের কারণে।' [ইউনুস : ৭-৮] সুতরাং আল্লাহর দিদারকে নাকচ করা বড় ধরনের অপরাধ। তাঁর দিদারে বিশ্বাস করা এবং দিদারপ্রাপ্তির আশা করা বিশুদ্ধ আকিদা এবং মুমিন বান্দার দায়িত্ব।

তিন. আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের ব্যাপারে বলেন, ﴿كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ অর্থ : 'কখনোই নয়। সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক থেকে আড়ালে থাকবে।' [মুতাফফিফিন : ১৫] অর্থাৎ, তাঁর সাক্ষাৎ পাবে না। বোঝা গেল, মুমিনগণ সাক্ষাৎ পাবে।

চার. আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝٢٣﴾ অর্থ : 'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে আলোকোজ্জ্বল। তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।' [কিয়ামাহ : ২২-২৩]

পাঁচ. আল্লাহ বলেন, ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ অর্থ : 'যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য উত্তম বিনিময় রয়েছে, আরও রয়েছে অতিরিক্ত।' [ইউনুস : ২৬] এখানে অতিরিক্ত বলতে আল্লাহর সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। খোদ রাসুলুলুল্লাহ (ﷺ) এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১৩০১]

পরকালে আল্লাহর দিদার সুন্নাহ দ্বারাও প্রমাণিত। বরং এটা সাহাবাদের ইজমা তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, আমরা এক রাতে রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সঙ্গে বসা ছিলাম। রাতটি ছিল চৌদ্দ তারিখের (পূর্ণিমা) রাত। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে সেভাবে দেখবে যেমন এই চাঁদকে দেখছ। কোনো অস্পষ্টতা, ধাক্কাধাক্কি ব্যতীত

১৩০১. মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৮১)। তিরমিযি (আবওয়াবু সিফাতিল জান্নাহ : ২৫৫২)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুস সুন্নাহ : ১৮৭)।

তাকে দেখতে পাবে।'[১৩০২] হাদিসে জারির রাযি.-এর বক্তব্য খেয়াল করুন—ঘটনার সময় তিনি একা নন, বরং রাসুলুল্লাহর (ﷺ) অনেক সাহাবি উপস্থিত ছিলেন, যারা নিয়মিত তাঁর মজলিসগুলোতে থাকতেন। তাদের কেউ আপত্তি করেননি। বোঝা গেল, সকল সাহাবি এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, আল্লাহকে দেখা সম্ভব। একইভাবে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মিরাজের রাতে আল্লাহকে দেখেছেন কি না এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস ও আয়েশা রাযি.-এর মতভেদ প্রমাণ করে তারাও বিশ্বাস করতেন আল্লাহকে দেখা সম্ভব। কারণ, তাঁকে যদি দেখা সম্ভবই না হতো, তবে নবিজি দেখেছেন কি না এমন প্রশ্ন অর্থহীন। বরং আল্লাহর দিদারসম্পর্কিত হাদিস বড় ও প্রসিদ্ধ একদল মুহাক্কিক সাহাবা থেকে বর্ণিত। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন—আবু বকর সিদ্দিক, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, সুহাইব, আনাস ইবনে মালেক, আবু মুসা আশআরি, আবু হুরায়রা, আবু সাইদ খুদরি, আম্মার বিন ইয়াসির, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, মুআজ ইবনে জাবাল, সাওবান, উমারা ইবনে রুআইবা, হুযাইফা, যায়দ ইবনে সাবেত, জারির ইবনে আবদুল্লাহ, আবু উমামা বাহেলি, বুরাইদা আসলামি, আবু বারযাহ, আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস রাযি. প্রমুখ। কেউ এর বিপরীত কোনো কথা বলেননি। সুতরাং পরকালে আল্লাহর দিদার সাহাবাদের সর্বসম্মত আকিদা প্রমাণিত হলো।[১৩০৩]

ইমাম আজম রহ. বলেন, **"আমরা বিশ্বাস করি, জান্নাতিরা তাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে। আল্লাহ বলেন, 'وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾' অর্থ : 'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।' [কিয়ামাহ : ২২-২৩] তবে এই দর্শন কোনো ধরন (কাইফিয়্যাত), সৃষ্টির**

১৩০২. বুখারি (তাফসিরুল কুরআন : ৪৮৫১)। মুসলিম (কিতাবুল মাসাজিদ : ৬৩৩)।

১৩০৩. রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মিরাজের রাতে আল্লাহকে দেখেছেন কি না সেটা মতভেদপূর্ণ। খোদ সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। ইবনে আব্বাস রাযি. মনে করতেন—তিনি আল্লাহকে দেখেছেন। আয়েশা রাযি. মনে করতেন—তিনি আল্লাহকে দেখেননি। সাহাবাদের এই মতবিরোধের কারণে আলেমগণ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। একদল মনে করেন, তিনি আল্লাহর নুর দেখেছেন। আরেক দলের মতে, তিনি হৃদয় দ্বারা দেখেছেন, চোখে দেখেননি। অধমের মতে, খুব সম্ভবত তিনি আল্লাহর নুরের পর্দা দেখেছেন। জান্নাতে যেমন সরাসরি দেখা যাবে, সেভাবে দেখেননি। আল্লাহ ভালো জানেন। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। ফলে আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া অধিক নিরাপদ [দেখুন : তাফসিরে তাবারি (২২/৫০৭-৫০৮)। আল-ইতিকাদ, বলখি (১১৪)। ফাতহুল বারি (৮/৬০৮)। বাহরুল কালাম (২০৭-২০৮)]।

সঙ্গে সাদৃশ্য (তাশবিহ) ও দিক (জিহাহ) ছাড়া। কারণ, আল্লাহ এসবের ঊর্ধ্বে।"[১৩০৪]

ইমাম আল-ফিকহুল আকবারে বলেন, **'আখেরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে। মুমিনরা জান্নাতে স্বচক্ষে আল্লাহর দিদার লাভ করবে, তবে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য ও ধরন ব্যতিরেকে। তাঁর ও সৃষ্টির মাঝে তখন কোনো দূরত্ব থাকবে না।'** ইমাম আরও বলেন, **'জান্নাতে আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াও ধরন (কাইফিয়্যাত) ব্যতিরেকে।'**[১৩০৫]

হাসকাফির বর্ণনায় এসেছে, ইমাম নিজস্ব সনদে জারির ইবনে আবদুল্লাহ বাজালি রাযি. থেকে রাসুলুল্লাহর এই হাদিস বর্ণনা করেছেন, **'তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে সেভাবে দেখবে যেভাবে এই চাঁদকে দেখছ। কোনো কষ্টক্লেশ ও ধাক্কাধাক্কি ছাড়াই তাঁকে দেখতে পাবে।'**[১৩০৬]

বিশর ইবনুল ওয়ালিদ বর্ণনা করেন, আমি ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর কাছে বসা ছিলাম। এই অবস্থায় সেখানে বিশর আল-মারিসি এলো। সে আবু ইউসুফের কাছে পরকালে আল্লাহর দিদারসংক্রান্ত (উপরের) হাদিস বর্ণনা করল। আবু ইউসুফ বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি এই হাদিসে ঈমান রাখি; কিন্তু তোমার সঙ্গীরা এটা অস্বীকার করে।'[১৩০৭]

ইমাম তহাবি বলেন, "জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহর দিদার সত্য। কিন্তু তাঁকে সম্যকভাবে পরিব্যাপ্ত করা সম্ভব নয় এবং এর স্বরূপ তিনিই ভালো জানেন। কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সেদিন কতক চেহারা হবে আলোকোজ্জ্বল। তাকিয়ে থাকবে তাদের পালনকর্তার দিকে।' এটার ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা যা উদ্দেশ্য করেছেন সেটাই এবং তিনিই এ ব্যাপারে সম্যক অবগত। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদিসে যেসব বিষয় এসেছে, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন এবং যা উদ্দেশ্য করেছেন, সেগুলোসহই আমরা ঈমান আনি। এ ব্যাপারে আমরা নিজেদের মতামত ঢুকিয়ে

১৩০৪. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৫৮-৫৯)।

১৩০৫. আল-ফিকহুল আকবার (৬-৭)।

১৩০৬. আল-উসুলুল মুনিফাহ (১৯)।

১৩০৭. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৪৫)।

অপব্যাখ্যা করব না কিংবা প্রবৃত্তির অনুসরণপূর্বক অনুমানমূলক কথা বলব না। কারণ, দ্বীনের ক্ষেত্রে সে ব্যক্তিই নিরাপদে থাকে, যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং যা জানে না (সে ব্যাপারে কথা বলা পরিত্যাগ করে) যিনি জানেন তাঁর জন্যই ছেড়ে দেয়।"[১৩০৮]

আল্লাহকে কীভাবে দেখা যাবে?

এমন প্রশ্ন আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে শোভনীয় নয়। কারণ, এটা আল্লাহর সিফাতের একরকম 'কাইফিয়্যাত' বা নিষিদ্ধ ধরন সন্ধান। আহলে সুন্নাতের অনুসারী সকল মাযহাবও এ বাস্তবতা স্বীকার করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নিজেরা এমন কিছু মতভেদে জড়িত, যেগুলো চূড়ান্তভাবে 'আল্লাহকে কীভাবে দেখা যাবে' সেই প্রশ্ন তথা 'দেখার নিষিদ্ধ কাইফিয়্যাত'-এর অনুসন্ধান এবং সেটা নিয়েই বিতর্ক। সমস্যা ও সংকট তৈরি হলে সেটা সমাধানের চেষ্টা করা আবশ্যক—এই মূলনীতির আলোকে আমরা এখানে এমন নিষিদ্ধ আলোচনার অবতারণা করতে বাধ্য হলাম। সংক্ষেপে এ ব্যাপারে কিছু কথা বলব, ইনশাআল্লাহ। মোটাদাগে উক্ত প্রশ্নের জবাবে আলেমগণ দুইভাবে বিভক্ত :

প্রথম দলের বক্তব্য : পিছনে বলা হয়েছে—কাররামিয়্যাহ, মুজাসসিমাসহ একাধিক সম্প্রদায় আল্লাহকে দেখা সম্ভব মনে করে। কিন্তু তারা বলে, আল্লাহকে সেভাবে দেখা যাবে, যেভাবে অন্যান্য সৃষ্টিকে দেখা যায়। কারণ, তারা আল্লাহর জন্য দেহ সাব্যস্ত করে। ফলে অন্যান্য দেহধারী সৃষ্টিকে যেভাবে দেখা যায়, আল্লাহকেও সেভাবে দেখা যাবে মনে করে। অর্থাৎ, আল্লাহর জন্য দেহধারী হওয়া, কোনো বিশেষ দিকে দেখতে পাওয়া, দূরত্ব থাকা, আলোর বিদ্যমানতা ইত্যাদি সাব্যস্ত করে। আহলে সুন্নাতের কিছু দলও কিছু ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে একমত। অর্থাৎ, আল্লাহকে দেখার ক্ষেত্রে তারা 'উপরের দিক' নির্ধারণ করেন। তাদের একজন বলেন, এর দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহকে 'উপর' দিকে দেখা যাবে। তা ছাড়া, সামনাসামনি (উপর) ছাড়া কি কোনোকিছু দেখা সম্ভব? সুতরাং যারা বলে আল্লাহকে 'দিক' ছাড়া দেখা যাবে, তারা যেন নিজের মাথা ঠিক আছে কি না তলিয়ে দেখে।[১৩০৯]

১৩০৮. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১৩-১৪)।

১৩০৯. শরহুত তহাবিয়্যাহ, ইবনে আবিল ইয (১৬০)।

দ্বিতীয় দলের বক্তব্য : এ দলের নেতৃত্বে রয়েছেন খোদ ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.। তাদের বক্তব্য হলো—যেমনটা ইমাম বলেছেন—**'আখেরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে, সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য ও ধরন ছাড়া। তাঁর ও সৃষ্টির মাঝে তখন কোনো দূরত্ব (মাসাফাহ) থাকবে না।'**[১৩১০]

এখানে আরবি শব্দ 'মাসাফাহ' (المسافة)-এর শাব্দিক অর্থ দূরত্ব হলেও ইমামের উদ্দেশ্য সেটা নয়; বরং ইমামের উদ্দেশ্য হলো, দিক (জিহাহ), স্থান (মাকান) ও সামনাসামনি (মুকাবালা) নাকচ করা। এটা ইমাম অন্য জায়গায় স্পষ্ট করেছেন। তিনি আল-ফিকহুল আকবারে বলেন, **'জান্নাতে আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া ধরন (কাইফিয়্যাত) ব্যতিরেকে।'**[১৩১১] ইমাম আল-ওয়াসিয়্যাহতে আরও স্পষ্ট করে বলেন, **'এই দর্শন কোনো ধরন (কাইফিয়্যাত), সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য (তাশবিহ) ও দিক (জিহাহ) ছাড়া। কারণ, আল্লাহ এসবের ঊর্ধ্বে।'**[১৩১২]

অধমের মতে, আল্লাহকে দেখার সঙ্গে এ ধরনের প্রসঙ্গ আনাই অনুচিত। কিন্তু প্রথম পক্ষ যখন আল্লাহকে দেখার জন্য দিকের শর্ত জুড়ে দিলেন, তখন তাদের খণ্ডনে এসব বক্তব্য না দিয়ে উপায় ছিল না। ফলে ইমাম আজম সেটা খণ্ডন করেছেন। পরবর্তী হানাফি উলামায়ে কেরাম ইমাম আজমের অনুসরণ করে আল্লাহকে দেখার ক্ষেত্রে 'দিক', 'দূরত্ব, 'সামনাসামনি', 'আলোর মিলন' এসব শর্ত নাকচ করে দিয়েছেন।[১৩১৩]

○ মাতুরিদি বলেন, 'আল্লাহর দিদার আমাদের কাছে সত্য। তবে তাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যাবে না। এই দিদারের ব্যাখ্যাও দেওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, ﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ﴾ অর্থ : 'দৃষ্টি তাঁকে অবধারণ করতে পারে না; কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি। আর তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।' [আনআম : ১০৩] ...সুতরাং আল্লাহর দিদার পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাঁকে সম্যকভাবে ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ,

---

১৩১০. আল-ফিকহুল আকবার (৬)।
১৩১১. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।
১৩১২. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৫৮-৫৯)।
১৩১৩. দেখুন : শরহুল আকায়েদ, তাফতাযানি (১৯৩)। জামেউল মুতুন (১৭)।

আল্লাহ সকল সীমা ও দিকের ঊর্ধ্বে। ...এক্ষেত্রে আল্লাহ যতটুকু বলেছেন ততটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সকল অর্থ নাকচ করতে হবে হবে। ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা, এক্ষেত্রে (আল্লাহ বা রাসুলের পক্ষ থেকে) ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।[১৩১৪] তিনি অন্যত্র বলেন, 'যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আল্লাহকে কীভাবে দেখা যাবে? আমরা বলব, ধরনহীনভাবে (بلا كيف) ...সৃষ্টির মাথায় দেখার ক্ষেত্রে যত ধরনের কল্পনা ও চিত্র বিদ্যমান, আল্লাহ সে সবকিছুর ঊর্ধ্বে।'[১৩১৫]

○ আবুল ইউসর বাযদাবি লিখেন, 'আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো— আল্লাহকে দেখা সম্ভব। তাঁকে পরকালে দেখা যাবে। জান্নাতবাসী তাদের চোখ দ্বারা আল্লাহকে দেখবে, যেমন তাদের হৃদয় দ্বারা আল্লাহকে ইহকালে জানে, পরকালেও জানবে। তবে এই দিদার ধরনহীন, সামনাসামনি বিহীন, সীমাবিহীন।' বাযদাবি আরও শক্তিশালী যুক্তি তুলে ধরে বলেন, 'সৃষ্টিকে দেখতে দিক লাগে। কারণ, সৃষ্টির জন্য দিক প্রযোজ্য; সৃষ্টি তার অস্তিত্বের জন্য কোনো দিকে থাকার প্রতি মুখাপেক্ষী। বিপরীতে আল্লাহ তায়ালা সকল স্থান ও দিকের ঊর্ধ্বে। ফলে তাঁকে দেখতে দিকের প্রয়োজন নেই।' অন্যত্র বলেন, 'মুমিনরা জান্নাতে তাদের নিজ চোখে আল্লাহকে দেখতে পাবে। কিন্তু সেটা বরাবর, সামনাসামনি কিংবা মুখোমুখি হয়ে নয়। কারণ, মানুষ স্থানে সীমাবদ্ধ হলেও আল্লাহ স্থানের ঊর্ধ্বে। ...আল্লাহর জন্য কোনো দিক প্রযোজ্য নয়। তিনি সকল দিকের ঊর্ধ্বে। দিক সৃষ্টির আগে তিনি যেমন ছিলেন, সবসময় তেমন আছেন ও থাকবেন।'[১৩১৬]

○ আবু ইসহাক সাফফার লিখেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, মুমিনগণ পরকালে তাদের নিজ চোখে আল্লাহকে দেখতে পাবে; তবে এই দেখাটা হবে ধরনহীন। আলো-বাতাসের সম্পৃক্ততা, বসা-দাঁড়ানো, স্থিরতা-নড়াচড়া, ভিতরে-বাইরে, কোনো দিকে ইত্যাদি সব ধরনের সীমার ঊর্ধ্বে হবে এটা। দুনিয়াতে যেমন মানুষ আল্লাহকে ধরনহীন জানে, সেভাবে পরকালে ধরনহীন দেখবে।'[১৩১৭]

১৩১৪. আত-তাওহিদ (৫৯-৬২)।

১৩১৫. আত-তাওহিদ (৬৪)।

১৩১৬. উসুলুদ্দিন (৮৩, ৯২, ২৫০-২৫১)।

১৩১৭. তালখিসুল আদিল্লাহ (১৭৫, ৯০০)।

○ আলাউদ্দিন উসমান্দি বলেন, 'আল্লাহর দিদার সম্ভব। পরকালে মুমিনগণ জান্নাতে আল্লাহকে দেখতে পাবে। এ দিদার দিক, স্থান, আলোর মিলন, দূরত্ব ইত্যাদিসহ সৃষ্টির সকল বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত হবে।'[১৩১৮]

○ সাবুনি লিখেন, 'আল্লাহকে দেখতে স্থান, দিক—কোনোকিছুর প্রয়োজন নেই। কারণ, দিক সৃষ্টির বেশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা 'দিক'-এর প্রয়োজনীয়তা থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। ফলে তাঁকে দেখতেও দিকের প্রয়োজন হবে না।'[১৩১৯]

○ রুকনুদ্দিন সমরকন্দি বলেন, 'পরকালে আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখা যাবে। তবে সেটা সাদৃশ্য, ধরন, দিক ও সুরতহীন।'[১৩২০]

○ মাইমুন নাসাফি লিখেন, 'পরকালে মুমিনগণ আল্লাহকে দেখবে। এটা কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণিত আকিদা। তবে এই দিদার কোনো স্থানে হবে না, সামনাসামনি দিকে হবে না। ...আল্লাহ ও তাঁর মাঝে দূরত্বের বিচারে হবে না। এক কথায়, নবসৃষ্ট সকল উপকরণমুক্ত হবে আল্লাহর দিদার।'[১৩২১]

○ আবদুল্লাহ নাসাফি বলেন, 'জান্নাতে মুমিনগণ আল্লাহকে নিজেদের চোখে দেখবে। এটা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। বুদ্ধি ও যুক্তিরও দাবি এটা। কিন্তু এই দেখা কোনো স্থানে হবে না, দিকে হবে না, আলোর সঙ্গে হবে না, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে দূরত্ব থাকবে না। সব ধরনের নবসৃষ্ট বিষয়ের সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত থাকবে এ দর্শন।'[১৩২২]

অধমের পর্যবেক্ষণ : এক্ষেত্রে ইমাম আজম ও হানাফি আলেমদের বক্তব্যই সঠিক। প্রথম দলের বক্তব্য ভুল। এটা বোঝার জন্য লম্বা দলিল-প্রমাণ ও বিতর্কের দরকার নেই। আমরা কুরআনের একটা আয়াতের প্রতি একটু গভীর ও নিষ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টি দিলেই অনুভব করতে পারব। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ অর্থ : 'তাঁর মতো কিছু নেই।' [শুরা : ১১] সুতরাং আল্লাহর কোনো সাদৃশ্য নেই। তাঁর সদৃশ কিছু নেই। চাঁদ কিংবা সূর্যকে আমাদের উপরের দিকে

১৩১৮. লুবাবুল কালাম, উসমান্দি (পাণ্ডুলিপি : ৫৪)।
১৩১৯. আল-বিদায়াহ মিনাল কিফায়াহ (৭৯-৮০)।
১৩২০. আল-আকিদাহ আর-রুকনিয়্যাহ (২৩)।
১৩২১. আত-তামহিদ (৬৪-৬৭)।
১৩২২. আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (২১৪)।

দেখতে হয়। মাটির উপর বিদ্যমান বস্তুগুলো নিচের দিকে দেখতে হয়; ডানে-বামে বা সামনে-পিছনে দেখতে হয়। আল্লাহকে দেখতেও তেমন হতে হবে? এগুলো তো সৃষ্টিকে দেখা। সৃষ্টির জন্য দিক-কূল প্রযোজ্য। কারণ, সৃষ্টি দিক ও সীমার ভিতরেই থাকে। দেহ-অবকাঠামো, আকার ও ব্যস ছাড়া সৃষ্টি হয় না। এগুলো ছাড়া সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকে না। ফলে সৃষ্টিকে দেখতে স্থান ও দিক লাগে। আল্লাহ তো সকল দিক, স্থান, কাল ও পাত্রের ঊর্ধ্বে। তিনি ছিলেন তখন দিক ও স্থান ছিল না; আজও তিনি আছেন দিক ও স্থানের ঊর্ধ্বে। তাহলে তাঁকে দেখতে দিক লাগবে কেন? আল্লাহকে দেখতে দিক লাগলে তাঁকে তো সৃষ্টির ভিতরে ঢুকতে হবে। জান্নাতের ভিতরে আমরা যখন তাঁকে দেখতে যাব, তাঁরও জান্নাতের ভিতরে থাকতে হবে। কারণ, মানুষের দৃষ্টিসীমা খুবই সীমিত। আল্লাহ যদি জান্নাতের সীমারেখার বাইরে থাকেন, তবে তো দৃষ্টিসীমারও বাইরে চলে যাবেন!

আল্লাহকে দেখার ক্ষেত্রে এগুলো অনুচিত যুক্তি—আমরা বুঝি। কিন্তু অন্যান্য অথর্ব যুক্তি খণ্ডন করতে এ ধরনের যুক্তি না দিয়ে উপায় নেই। সারকথা হলো: প্রথম দল যে আল্লাহকে দেখার জন্য দিকের শর্ত করেন, সেটা বিশুদ্ধ মতে প্রত্যাখ্যাত। কারণ, আল্লাহকে দেখতে সৃষ্টির মতো বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দেওয়া মূলত মুখে স্বীকার না করলেও আল্লাহকে সৃষ্টির সঙ্গে একরকম সাদৃশ্য দেওয়া, তাঁকে দেখার নিষিদ্ধ ধরন (কাইফিয়্যাত) নির্দিষ্ট করা। আল্লাহকে 'দিক'সহ 'উপরে' দেখা যাবে—এটাও যদি ধরন (কাইফিয়্যাত) নির্ধারণ না হয়, তবে এক্ষেত্রে 'কাইফিয়্যাত' বলতে আর বাকি কী থাকে? এ জন্য এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে যতটুকু এসেছে, ততটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকাই নিরাপদ ও যথেষ্ট। পরকালে আমরা আল্লাহকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করব ইনশাআল্লাহ- এটুকু বিশ্বাস করে সেই দিদারের জন্য কাজ করা জরুরি। কীভাবে দেখব সেটা নিয়ে বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন।

ইমাম তহাবি বলেন, 'জান্নাতবাসীর আল্লাহর সাক্ষাৎলাভের ব্যাপারে সে ব্যক্তির ঈমান বিশুদ্ধ হবে না, যে এটাকে নিজের কল্পনার আলোকে বুঝতে চাইবে কিংবা নিজের বুঝবুদ্ধিমতো এটার ভুল ব্যাখ্যা দেবে। কারণ, আল্লাহর সাক্ষাৎসহ আল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয় বোঝার একমাত্র বিশুদ্ধ পন্থা হচ্ছে, অপব্যাখ্যা (তাবিল) বর্জন এবং আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের উপরই দাঁড়িয়ে আছে সকল রাসুলের দ্বীন, নবির শরিয়ত এবং মুসলমানদের দ্বীনদারি।'[১৩২৩]

১৩২৩. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (১৪-১৫)।

আবু হাফস বুখারি লিখেন, 'জান্নাতবাসী আল্লাহকে দেখতে পাবে সাদৃশ্যবিহীন, ধরনহীন, সন্দেহহীন (بلا مثال ولا كيف ولا شك)। মানুষ যেভাবে সুস্পষ্টভাবে চাঁদ দেখতে পায়, আল্লাহকে সেভাবে সন্দেহাতীতভাবে দেখতে পাবে। তবে এই দেখা সাদৃশ্যহীন, ধরনহীন।'[১৩২৪]

আবু সালামা সমরকন্দি লিখেন, 'আল্লাহর দিদার সত্য। এটা তাশবিহ (সাদৃশ্য) ও তাতিল (নাকচ) ছাড়া; আল্লাহকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি (ইদরাক) ছাড়া, যেভাবে কুরআন-সুন্নাহতে এসেছে।'[১৩২৫]

দুনিয়াতে কি আল্লাহকে দেখা সম্ভব?

পরকালে আল্লাহর দিদারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয় হলো—দুনিয়াতে কি আল্লাহকে দেখা সম্ভব? আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো, দুনিয়াতে চর্মচোখে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। কেউ আল্লাহ তায়ালাকে দুনিয়াতে দেখেনি, কখনো দেখবেও না। পরকালে দেখবে। তবে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে একটু মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনে আব্বাস রাযি.সহ কয়েকজন সাহাবি মনে করতেন—রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মিরাজের রাতে আল্লাহকে দেখেছেন। কিন্তু আয়েশা রাযি.সহ অন্য সাহাবিরা মনে করতেন আল্লাহকে দুনিয়াতে দেখা সম্ভব নয়। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি বলবে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর রবকে দেখেছেন, তার কথা ভয়ংকর অসত্য ও ভিত্তিহীন।[১৩২৬]

প্রশ্ন আসতে পারে, স্বপ্নে কি আল্লাহকে দেখা সম্ভব? বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। একদল আলেম মনে করেন, আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা সম্ভব নয়। কারণ, স্বপ্নে মানুষ সাধারণত কল্পনা-জল্পনা দেখে থাকে। আর আল্লাহ সব ধরনের কল্পনা ও সাদৃশ্যের উর্ধ্বে। ফলে তাঁকে স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, পরকালে আল্লাহর দিদার সবচেয়ে বড় নেয়ামত। সুতরাং দুনিয়াতেই সেটা পেয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নাতের মতে স্বপ্নে আল্লাহকে দেখা সম্ভব।[১৩২৭] রুকনুদ্দিন সমরকন্দি লিখেন, 'বিশুদ্ধ আত্মা ও পরিশুদ্ধ অন্তর দিয়ে স্বপ্নে

১৩২৪. আস-সাওয়াদুল আজম (২৭)।
১৩২৫. জুমাল মিন উসুলিদ্দিন (৩০)।
১৩২৬. বুখারি (কিতাবুত তাওহিদ : ৭৩৮০)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৭৭)।
১৩২৭. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (৮৩)। আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ, সাবুনি (১৬৫-১৬৬)।

আল্লাহকে দেখা সম্ভব। তবে এটা ধরনহীন দিদার। অসংখ্য মাশায়েখ আল্লাহকে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।'[১৩২৮] হাফিজুদ্দিন নাসাফি লিখেন, 'আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা সম্ভব। তবে সেটা ধরনহীন, দিকহীন, সামনাসামনি ও কল্পনা-জল্পনাহীন! জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহকে আমরা যেভাবে চিনি, স্বপ্নে সেভাবে দেখি। এর জন্য সৃষ্টির মতো হওয়া আবশ্যক নয়।'[১৩২৯] তাদের বিপরীতে আল্লামা ইবনুল আলা দেহলভি লিখেন, 'এ ব্যাপারে নীরব থাকা উত্তম।'[১৩৩০]

অধমের পর্যবেক্ষণ : বাস্তবতা হলো—এ ব্যাপারে কথা বলা হোক কিংবা নীরব থাকা হোক, ফলাফল সমান। অর্থাৎ, আল্লাহর দিদারের ব্যাপারে বড়দের যেসব বক্তব্য পাওয়া যায় এবং তাদের স্বপ্নে আল্লাহর দিদারসম্পর্কিত যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, সে সবগুলো রূপরেখাহীন, ধরনহীন ও সীমা-পরিসীমাবিহীন। অর্থাৎ, আল্লাহ যেহেতু সৃষ্টির সকল সাদৃশ্য থেকে মুক্ত, ফলে স্বপ্নে তাকে যে কাইফিয়্যাতে দেখা যাবে, সেটা আসলে প্রকৃতপক্ষে তিনি নন; বরং বান্দা নিজের আমল হিসেবে তাঁকে দেখতে পাবে। এ কারণে এই দিদার স্রেফ আত্মার প্রশান্তিস্বরূপ; এর কোনো হাকিকত (বাস্তবতা) নেই।

যার ফলে ইমাম মাতুরিদি এটাকে নাকচ করতেন; বরং তিনি শক্তভাবে বলতেন, 'যে ব্যক্তি বলবে আমি আল্লাহকে স্বপ্নে দেখেছি, সে মূর্তিপূজকের চেয়েও নিকৃষ্ট।'[১৩৩১] কারণ হলো, স্বপ্নে সে নিশ্চয়ই কোনো মানুষের কিংবা কোনো সৃষ্টির সুরত দেখে থাকবে যেটাকে সে আল্লাহর উপর প্রয়োগ করছে! ফলে সে সেই কল্পমূর্তিকেই আল্লাহ হিসেবে সাব্যস্ত করছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা সকল কল্পনা-জল্পনার ঊর্ধ্বে। বরং এর আরেকটি বড় নেতিবাচক দিক হলো—এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর জন্য দেহ, আকার-আকৃতি সাব্যস্ত করা; অথচ আল্লাহ এ সবকিছু থেকে পবিত্র।

১৩২৮. আল-আকিদাহ আর-রুকনিয়্যাহ (২৬)।

১৩২৯. আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (২২৬)।

১৩৩০. ফাতাওয়া তাতারখানিয়্যাহ (১৮/৬)।

১৩৩১. ফাতাওয়া কাযিখান (৩/৩২৯)।

আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের উপর ঈমান

(ইমাম আজমের ভাষ্যে ইসলামের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি)

জনগণ নয়, আল্লাহ ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের উৎস

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে মানুষকে খলিফা হিসেবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ অর্থ : '(স্মরণ করুন) যখন আপনার প্রভু ফেরেশতাদের বলেছিলেন, পৃথিবীতে আমি খলিফা (প্রতিনিধি) বানাতে যাচ্ছি।' [বাকারা : ৩০] ফলে আল্লাহর গড়া মানুষ আল্লাহর গড়া পৃথিবী আবাদ করবে, এখানে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করবে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চলবে এটাই স্বাভাবিক। এটাই খেলাফতের মূল মর্ম। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ﴾ অর্থ : 'তারা এমন লোক যাদের আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত (তথা ক্ষমতাবান) করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর অধীনে।' [হজ: ৪১]

পৃথিবী আল্লাহর। সুতরাং এখানে আল্লাহর শাসন চলবে। পৃথিবী পরিচালিত হবে আল্লাহর আইনে। আল্লাহই হবেন সকল আইন, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের উৎস। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ﴾ অর্থ : 'সৃষ্টি তাঁর, নির্দেশও তাঁর।' [আরাফ : ৫৪] আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ অর্থ : 'আইন কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন—তিনি ছাড়া তোমরা আর কারও দাসত্ব করবে না।' [ইউসুফ: ৪০]

তবে যেহেতু শয়তান এবং তার বাহিনী পৃথিবীতে শয়তানের রাজত্ব গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এ জন্য এখানে সত্য-মিথ্যার সংগ্রাম, হক ও বাতিলের লড়াই চিরন্তন। খেলাফত ও শয়তানিয়্যাতের দ্বন্দ্ব শাশ্বত। এই দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ

যুগে যুগে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানের দাসত্ব করেছে। পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফতের পরিবর্তে শয়তানের রাজত্ব কায়েম করেছে। তথাপি নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মুমিনদের সদাসর্বদা সাহায্যের ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ অর্থ : 'মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।' [রুম : ৪৭] এটা দায়বদ্ধতা অর্থে নয়; কারণ, আল্লাহকে কিছু বাধ্য করতে পারে না; বরং নীতিগত অর্থে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৎকর্ম ও পুণ্যের বদৌলতে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানানোর ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ অর্থ : 'আমি উপদেশের পর যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।' [আম্বিয়া : ১০৫] অন্যত্র বলেন, ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদের পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন যেমন দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী লোকদের। এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরিক সাব্যস্ত করবে না। এর পরও যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই পাপাচারী।' [নুর : ৫৫] দাউদ আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ অর্থ : 'হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি। অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সংগতভাবে রাজত্ব করো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। সেটা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছে।' [সোয়াদ: ২৬]

ফলে এই পৃথিবী পরিচালনার মূল কথা খেলাফত। খেলাফতের মূল কথা আল্লাহর দাসত্বের পূর্ণ বাস্তবায়ন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর গোলামি, তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত। আল্লাহর আইন পরিত্যাগ করে প্রবৃত্তির অনুসরণ,

নিজ খেয়াল-খায়েশমতো আইন প্রণয়ন হলো সবচেয়ে বড় অন্যায়, জুলুম এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল। আল্লাহ বলেন, ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾﴾ অর্থ : “আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আর আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে? এরপর তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়! অথচ তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাগুতকে বর্জন করার। শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসুলের দিকে আসো, তখন মুনাফিকদের আপনি আপনার নিকট থেকে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবেন। তাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাদের কোনো মুসিবত আসবে, তখন তাদের কী অবস্থা হবে? এরপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে আপনার নিকট এসে বলবে, ‘আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাই নাই।’ বাস্তবে এরাই তারা যাদের অন্তরে কী আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং আপনি তাদের উপেক্ষা করুন, তাদের সদুপদেশ দিন এবং তাদের মর্ম স্পর্শ করে তাদের এমন কথা বলুন। আমি রাসুল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে। যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তখন তারা আপনার নিকট এলে, আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে, তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালুরূপে পাবে। কিন্তু না! আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদের বিচারভার আপনার উপর অর্পণ করবে। এরপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা থাকবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেবে।” [নিসা : ৬০-৬৫]

আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানবরচিত আইনের শাসনকে তিনি নিন্দা করেছেন। এগুলোকে জুলুম, পাপাচার ও কুফর আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ﴾ অর্থ : 'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা কাফের।' [মায়িদা : ৪৪] আরও বলেন, ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ﴾ অর্থ : 'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালেম।' [মায়িদা : ৪৫] আরও বলেন, ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ﴾ অর্থ : 'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা পাপাচারী।' [মায়িদা : ৪৭]

মুসলমানদের ইমাম (শাসক) থাকা আবশ্যক

এই খেলাফত বাস্তবায়নের জন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল ইমামের সর্বসম্মতিক্রমে **মুসলমানদের জন্য ইমাম (শাসক=খলিফা) নিযুক্ত করা ওয়াজিব।**[১৩৩২] কারণ, ইমাম না থাকলে মুসলমানদের সামগ্রিক জীবন স্থবির হয়ে পড়বে। শরিয়তের বিধিবিধান এবং হদ-কিসাস প্রয়োগ বন্ধ থাকবে। নামায, জুমা ও জামাত উঠে যাবে। মুসলিম রাষ্ট্রের সীমানা দুশমনদের জন্য উদোম হয়ে পড়বে। মুসলিম সেনাবাহিনী বিলুপ্ত হয়ে যাবে। জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে। যাকাত-সদকা উসুল ব্যাহত হবে। গনিমতের সম্পদ বণ্টনে জটিলতা দেখা দেবে। ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা ও অনাচার ছড়িয়ে পড়বে। অন্যায়, অশ্লীলতা ও ধর্মহীনতার অন্ধকারে উম্মাহ তলিয়ে যাবে। হালাল-হারাম মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। চোরে-ডাকাতে দেশ ভরে যাবে। গরিব, অসহায় ও এতিমরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়বে। এক কথায়, ইমাম না থাকলে মুসলমানদের সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও আধ্যাত্মিক তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে। মুসলমানরা পরিচয়-সংকটে পড়বে। স্বকীয়তা ও দ্বীনদারি হারাবে। অন্যান্য জাতির তাঁবেদার হয়ে পড়বে। উম্মাহর জীবনে দ্বীন চতুর্থ বিষয়ে পরিণত হবে। ইসলামের গৌরব ভূলুণ্ঠিত হবে। ইসলামের সামগ্রিক বাস্তবায়ন বন্ধ হয়ে যাবে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইমামবিহীন মৃত্যুবরণ করল, সে যেন জাহেলি মৃত্যু বরণ

১৩৩২. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৯১)। তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১১০৩)। আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ (২১১-২১২)। আকিদাহ রুকনিয়্যাহ (৪১)।

করল।'[১৩৩৩] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি (ইমামের বাইয়াত তথা) আনুগত্য ছাড়া মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলি মৃত্যু বরণ করল।'[১৩৩৪]

এ কারণে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজে খেলাফত বাস্তবায়ন করেন। তিনি যতদিন পৃথিবীতে জীবিত থাকেন, আল্লাহর আইন অনুযায়ী ইসলামি রাষ্ট্র ও উম্মাহর জীবন পরিচালনা করেন। মদিনায় প্রায় দশ বছর নবুওতি শাসন থাকে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইন্তেকালের আগে খেলাফতের ঘোষণা করে যান। তিনি জানিয়ে যান, তাঁর পরে তাঁর উত্তরসূরি সাহাবাদের 'খলিফা' বলা হবে। তাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মের খেলাফত ত্রিশ বছর অব্যাহত থাকবে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'নবুওতের খেলাফত হবে ত্রিশ বছর। অতঃপর রাজত্ব (বা রাজতন্ত্র) আসবে।'[১৩৩৫]

ফলে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এ বিষয়টির প্রতি শুরু থেকেই অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় আল্লাহর রাসুলই তাদের ইমাম ছিলেন। তিনি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন শীর্ষস্থানীয় সাহাবাগণ তাঁকে কাফন-দাফনের আগেই এ মহা গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করতে মনোযোগী হন, যাতে এক মুহূর্ত ইমাম ছাড়া থাকা না হয়। আল্লাহর শরিয়ত ও উম্মত ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ফলে আহলে বাইতের সদস্যরা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর গোসল ও কাফনে লেগে যান। অপরদিকে অন্য সাহাবাগণ এই বিশাল কাজটি সুরাহার জন্য বসে যান। শেষ পর্যন্ত তারা আবু বকর রাযি.-কে ইমাম নিযুক্ত করেন। আবু বকরের পরে উমর আসেন। উমরের পরে উসমান। উসমানের পরে আলি। আলির পরে হাসান। হাসানের পরে মুআবিয়া। এভাবে সেই নববি যুগ থেকে দ্বিতীয় আবদুল হামিদ পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে কোনো-না-কোনো ইমাম (খলিফা/রাজা) থাকেন। বিভিন্ন উত্থান-পতনের মাঝ দিয়ে খেলাফত কায়েম থাকে। উম্মাহর সামগ্রিক অভিভাবকত্বের ধারা অব্যাহত থাকে। এর পর মুসলিমরা ইমামবিহীন হয়ে পড়ে। কেটে যায় শত বছর। ফলাফল সামনে। গুনতিতে প্রায়

[১৩৩৩]. ইবনে হিব্বান (কিতাবুস সিয়ার : ৪৫৭৩)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুশ শামিয়্যিন : ১৭১৫০)।

[১৩৩৪]. মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুল মাক্কিয়্যিন : ১৫৯৩৬)। মুসনাদে বাযযার (মুসনাদু আমের ইবনে রবিআহ : ৩৮১৭)।

[১৩৩৫]. মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুল আনসার : ২২৩৩৭)। শরহু মুশকিলিল আসার (বাবু বায়ানি মুশকিলি মা রুয়িয়া আন রাসুলিল্লাহ ফি উলাতিল আমরি বাদাহ : ৩৩৪৯)।

দুইশত কোটি হলেও আজকের মুসলিমরা একটা রাষ্ট্রবিহীন, অভিভাবকহীন এবং শরিয়তের সামগ্রিক প্রয়োগবিহীন জাতি। একটা পরিচয়হীন বেওয়ারিশ লাশের মতো, যার অতীতের গৌরব আছে, কিন্তু বর্তমান অস্তিত্ব ভাগাড়ে পড়ে আছে। ভবিষ্যৎ ডুবে আছে ঘোর অন্ধকারে।

শাসকের আবশ্যক গুণাবলি

মুসলমানদের ইমাম হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। কিছু শর্ত হলো অত্যাবশ্যক, যেগুলো ছাড়া কেউ শাসক হতেই পারবে না। যথা : মুসলিম হওয়া, পুরুষ হওয়া,[১৩৩৬] স্বাধীন হওয়া, বালেগ হওয়া, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া, কুরাইশ বংশীয় হওয়া। এর সঙ্গে আরও কিছু শর্ত হলো ইলম, তাকওয়া, বীরত্ব ও বংশ, আখলাক ইত্যাদি দিক থেকে উপযুক্ত হওয়া। কুরআন-সুন্নাহয় জ্ঞানী, দূরদর্শী, শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাবান হওয়া। হালাল-হারামসহ ইসলামের যাবতীয় বিধান সম্পর্কে অবহিত থাকা। অন্যায়ের প্রতিবাদ, জুলুমের নিরসন এবং মজলুমের পক্ষে কাজ করার সামর্থ্য, শক্তি ও সাহস রাখা। যুদ্ধের নেতৃত্বে সমর্থ হওয়া। অর্থাৎ, শারীরিক ও মানসিক সবদিক থেকে উপযুক্ত হওয়া।

তবে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া জরুরি নয়। অর্থাৎ, যদি শ্রেষ্ঠকে বর্জন করে কোনো কারণে অশ্রেষ্ঠ কিংবা পিছনের সারির কাউকে ইমাম নিযুক্ত করা হয় এবং সে শাসন পরিচালনার যোগ্য হয়, তবে সেটা বিশুদ্ধ হবে। মুসলানদের উপর তার

১৩৩৬. আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'ইমামতে উজমা' তথা শাসক হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া জরুরি। ফলে কোনো নারী ইসলামি রাষ্ট্রের খলিফা বা শাসক হতে পারবে না। হ্যাঁ, পরামর্শ দিতে পারবে এবং সহায়তা করতে পারবে, কিন্তু নিজে শাসক হতে পারবে না। এটা ইমাম আজম আবু হানিফা-সহ বাকি তিন ইমাম এবং সকল আলেমের মত। কুরআন-সুন্নাহর দলিল, সুস্থ যুক্তি, দায়িত্বের প্রকৃতি এবং নারীর ফিতরত—সবগুলোর দাবিও এটা। হ্যাঁ, হানাফি মাযহাবে নারী 'কাযি' তথা বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সেটাও উত্তম নয়। বরং কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন, এমন পদেও নারীকে নিয়োগ দেওয়া অবৈধ। তবে নিযুক্ত হয়ে গেলে সে দায়িত্ব পালন করতে পারবে এবং তার ফয়সালা বাস্তবায়িত হবে। তথাপি সেটাও 'হদ' ও 'কিসাস'-এর ক্ষেত্রে নয়; বরং অন্যান্য সাধারণ বিচারকার্যে। সুতরাং নারীর 'ইমামতে উজমা' তথা রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার কোনোই সুযোগ নেই। ইসলামের সকল মুহাক্কিক আলেমের বক্তব্য এড়িয়ে বর্তমানে ফেমিনিজমের প্রভাবে প্রভাবিত গবেষক দাবিদার কিছু মানুষ নারীর শাসক হওয়ার উপযুক্ততা প্রমাণ করতে চান। এক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর দূরবর্তী তাবিল (বা তাহরিফ) এবং দুর্বল যুক্তি-তর্ক ছাড়া তাদের কাছে মজবুত কোনো প্রমাণ নেই। ফলে তাদের কথা বর্জনীয়। [দেখুন : ফাতহুল কাদির: ৭/২৫৩; বাদায়েউস সানায়ে ৭/৩; মাজমাউল আনহুর ২/১৬৮; রদ্দুল মুহতার : ৫/৪৪০]

আনুগত্য মেনে নেওয়া আবশ্যক হবে। ফলে শাসককে সর্বদিক থেকে সবার শ্রেষ্ঠ হতে হবে কিংবা নিষ্পাপ (মাসুম) হতে হবে—এটা জরুরি নয়। কারণ, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেক সৎ-অসৎ ব্যক্তির পিছনে নামায পড়ো।' সুতরাং নামাযের ক্ষেত্রে যেমন উত্তম ছেড়ে অনুত্তমের পিছনে পড়লে আদায় হয়ে যাবে, তেমনই অনুত্তম শাসকও নিযুক্ত হয়ে গেলে তার আনুগত্য করতে হবে। অন্যত্র রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আরও স্পষ্ট করে বলেন, 'যদি তোমাদের উপর এমন কোনো হাবশি দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, যার মাথা কিশমিশের মতো, তবুও তার কথা শোনো এবং তার আনুগত্য করো।' তবে যদি ফেতনা ছাড়া তাকে পদচ্যুত করা যায় এবং তার জায়গায় উত্তম কাউকে নিযুক্ত করা যায়, সেটা করতে হবে।[১৩৩৭]

ফাসেক কি শাসক হতে পারবে?

উপরে বলা হয়েছে, শাসক হওয়ার জন্য মুত্তাকি হওয়া শর্ত। প্রশ্ন হলো, ফাসেক তথা পাপাচারী কি শাসক হওয়ার যোগ্য? শাফেয়ি রহ.-এর মতে, ফাসেক ব্যক্তি সাক্ষী কিংবা বিচারক হতে পারবে না। ফলে শাসক তো হতেই পারবে না। খারেজি ও মুতাযিলাদের মতে ফাসেক ব্যক্তি মুমিনই নয়। ফলে সেও খলিফা হতে পারবে না। ইমাম আজম রহ.-এর মত সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি বলেন, ফাসেক ব্যক্তিকে শাসক বানানো মাকরুহ। তথাপি যদি বানিয়ে ফেলাই হয়, সেটা কার্যকর হবে। সে শাসক গণ্য হবে। উক্ত মতভেদ থেকে আরও একটি ফলাফল পাওয়া যায়। সেটা হলো, শাসক যদি কোনো কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে শাফেয়ি, খারেজি ও মুতাযিলাদের মতে তাকে পদচ্যুত করা হবে। কারণ, সে শাসক হওয়ার যোগ্য থাকবে না। ইমাম আজমের মতে, ফাসেক (যেমন : জালেম, ঘুস গ্রহণকারী) পদচ্যুতির যোগ্য, পদচ্যুত করা হোক বা না হোক। তবে পদচ্যুত করা না হলে এবং শাসক হিসেবে থাকলে সেটা কার্যকর হবে এবং তার আনুগত্য জরুরি হবে।[১৩৩৮] উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে জালেম শাসক (যে মূলত ফাসেক)-এর বিরুদ্ধে ইমামের দৃষ্টিভঙ্গিও বোঝা গেল। সামনে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

১৩৩৭. প্রথম হাদিসটি দেখুন দারাকুতনি (কিতাবুল ঈদাইন : ১৭৬৮)। দ্বিতীয় হাদিসটি দেখুন : বুখারি (কিতাবুল আহকাম : ৭১৪২)। আরও দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৯৩)। দেখুন : লুবাবুল কালাম, উসমান্দি (পাণ্ডুলিপি : ৮৩)। তালখিসুল আদিল্লাহ (৮৪২-৮৪৩)। তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১১১৩)।

১৩৩৮. আখবারু আবি হানিফা, সাইমারি (৮৪)। আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ, সাবুনি (২১৪)।

শাসকের কুরাইশ বংশীয় হওয়ার শর্ত ব্যাখ্যাসাপেক্ষ

প্রশ্ন হলো, মুসলমানদের ইমাম তথা শাসক হওয়ার জন্য কি কুরাইশ বংশের হওয়া জরুরি? এটা নিয়ে সংশয় ও জটিলতা আছে। ফলে কিছু কথা বলা জরুরি মনে করছি।

আহলে সুন্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে শাসক কুরাইশ বংশের হওয়া জরুরি; শ্রেফ বনু হাশিম নয়, যেমনটা রাফেযিরা দাবি করে থাকে এবং সে ভিত্তিতে আবু বকর, উমর ও উসমানের খেলাফতকে তারা প্রত্যাখ্যান করে থাকে। কারণ, আলি ব্যতীত বাকি তিন জন বনু হাশিমের অন্তর্ভুক্ত নন। ফলে শ্রেফ কুরাইশি হওয়াই যথেষ্ট। এর দলিল রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী : 'ইমাম হবে কুরাইশ থেকে।'[১৩৩৯] এই হাদিসের উপর ভিত্তি করেই রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের পরে যখন মুহাজির ও আনসার সাহাবাদের মাঝে খলিফা নিযুক্তি নিয়ে মতবিরোধ দেখা গিয়েছিল, তখন আনসারগণ মুহাজিরদের জন্য খেলাফতের দাবি পরিত্যাগ করেছিলেন। এটা ইমাম আজম রহ.-এর মত। শাফেয়ি ও মুহাদ্দিসিনের মতও এমন। সকল হানাফি আলেমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এটা।[১৩৪০]

বিপরীতে মুতাযিলা ও খারেজি সম্প্রদায়ের মতে, ইমাম হওয়ার জন্য কুরাইশি হওয়া জরুরি নয়। ফলে কুরাইশ বংশের বাইরের লোকজনও মুসলমানদের শাসক হতে পারবে। তাদের দলিল আল্লাহর বাণী : ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ﴾ অর্থ : 'তোমাদের মাঝে আল্লাহর কাছে সে সবচেয়ে সম্মানিত যে তাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।' [হুজুরাত : ১৩] সুতরাং শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড তাকওয়া; বংশ নয়।[১৩৪১]

কিন্তু এটা তাদের দলিল নয়। কারণ, এখানে খেলাফতের প্রসঙ্গ নেই। এটা আল্লাহর কাছে সম্মানিত ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। আর আহলে সুন্নাতের কেউ বলেননি যে, খলিফা সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কিংবা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত হবেন। বরং খলিফার চেয়ে সর্বনিম্ন পর্যায়ের প্রজাও আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত ও প্রিয় হতে পারেন। খলিফা হওয়ার জন্য উম্মাহর সবচেয়ে বড় মুত্তাকি হওয়া শর্ত নয়।

১৩৩৯. বুখারি (কিতাবুল মানাকিব : ৩৫০০, ৩৫০১)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু মালে ইবনে আনাস : ১২৫০১)।

১৩৪০. আল-ইতিকাদ, বলখি (১১২)। তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১১০৬-১১০৭)। আল-কিফায়াহ (২১৪)। আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (৪৭৮)।

১৩৪১. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৯২)।

প্রশ্ন আসতে পারে, কুরাইশ বংশের সঙ্গে নেতৃত্ব নির্ধারিত করা হলো কেন? অথচ আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে সকল জাতিগোষ্ঠী সৃষ্টিগতভাবে এক এবং মর্যাদার পার্থক্য তাকওয়ার ভিত্তিতে, বংশ পরিচয়ে নয়, যেমনটা উপরের আয়াতে বলা হয়েছে [হুজুরাত : ১৩]। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা বিজয়ের দিন খুতবার মাঝে বলেন, 'হে লোকসকল, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের থেকে জাহেলিয়্যাতের আত্ম-অহমিকা এবং বাপ-দাদা নিয়ে অহংকারের দিন বিলুপ্ত করেছেন। সুতরাং এখন থেকে মানুষ কেবল দুই ধরনের। সৎকর্মশীল আল্লাহভীরু ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সম্মানিত, আর অবাধ্য দুরাচার আল্লাহর কাছে অবজ্ঞার পাত্র। সকল মানুষ আদমের সন্তান; আর আদম মাটির তৈরি।' অতঃপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) উপরের আয়াত তেলাওয়াত করলেন।[১৩৪২] বিদায় হজের ঐতিহাসিক খুতবায় রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'হে লোকসকল, তোমাদের প্রভু একজন; তোমাদের পিতাও একজন। মনে রেখো, অনারবদের উপর আরবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আরবদের উপর অনারবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর উপর লালের কিংবা লালের উপর কালোর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের মূল মানদণ্ড হলো তাকওয়া।[১৩৪৩] ফলে ইসলামের চোখে মানুষের সমান অধিকার চিরস্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়। তাহলে শাসক হওয়ার জন্য অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর উপর কুরাইশি হওয়াকে শর্ত দেওয়া হলো কেন?

শাসকের কুরাইশ বংশীয় হওয়ার শর্ত ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। ইমাম মাতুরিদির উদ্ধৃতি দিয়ে নাসাফি লিখেন, স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর তায়ালার নীতি [তোমাদের মাঝে আল্লাহর কাছে সে-ই সবচেয়ে মর্যাদাবান যে তাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে (হুজুরাত : ১৩)] অনুসারে মুসলিমদের শাসক হওয়ার ক্ষেত্রে মূল মানদণ্ড হওয়া উচিত ছিল তাকওয়া। সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি-ই নেতৃত্বের সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাহলে এর বাইরে গিয়ে কুরাইশ বংশের শর্ত কেন করা হলো? কয়েকটি কারণ এখানে উল্লেখ করা যায়। **এক.** শাসনকার্য কেবল দ্বীনি বিষয় নয়, বরং দুনিয়াবি ও পার্থিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে এক্ষেত্রে কেবল তাকওয়া যথেষ্ট নয়; তাকওয়ার পাশাপাশি দুনিয়ার কার্য পরিচালনার মতো মানসিকতা ও সামর্থ্য থাকা দরকার। আর রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশের

১৩৪২. তিরমিযি (আবওয়াবু তাফসিরিল কুরআন : ৩২৭০)। ইবনে হিব্বান (কিতাবুল হজ : ৩৮২৮)।
১৩৪৩. মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুল আনসার : ২৩৯৭২)।

মাঝে এটা পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। ফলে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই তারা সমানভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। **দুই**. উত্তম চরিত্র, শারাফত ও সম্ভ্রম ইত্যাদির ক্ষেত্রে বংশ ও রক্তের প্রভাব সর্বজন স্বীকৃত। এগুলো মানুষকে নীচতা, অশ্লীলতা ও নিম্ন পর্যায়ের কাজকর্ম থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করে, সাধারণ মানুষের আনুগত্য অর্জনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এ কারণে বিবাহের ক্ষেত্রেও ভালো বংশ গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয়ে থাকে।'[১৩৪৪]

অধমের পর্যবেক্ষণ : এগুলো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা, তবে চূড়ান্ত কথা নয়। কারণ, এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তায়ালা কুরাইশের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং আরব ও অনারবের অন্যান্য বংশের মাঝেও এ ধরনের গুণ বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক। গোটা মানবজাতি এক্ষেত্রে কিছু তারতাম্যসহ সমান অংশীদার। ফলে এসব কারণের বাইরে আরেকটি রহস্য উল্লেখ করা যায়, যেটা অধমের কাছে অধিকতর যৌক্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। সেটা হলো, মুসলিমদের ঐক্য ধরে রাখা, সম্ভাব্য সকল বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য থেকে মুসলিম উম্মাহকে সুরক্ষিত রাখা।

এর ব্যাখ্যা হলো, 'রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন কুরাইশ বংশের। চার খলিফাসহ ইসলামের প্রথম সারির অগণিত সাহাবি কুরাইশ বংশের। তারা রাসুলুল্লাহর সবচেয়ে কাছের মানুষ, ইসলামের সর্বাগ্র সেনা এবং বিশ্বাসীদের সর্বপ্রথম কাফেলা। ফলে এ বংশের প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের স্বভাবজাত অনুরাগ ও দুর্বলতা ছিল। এ বংশের মানুষের প্রতি সম্মান এবং তাদের আনুগত্যের প্রতি বিশেষ সম্মতি ছিল। ফলে তখন বিশৃঙ্খল আরব জাতি এবং তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য জাতি, বর্ণ ও ভাষার মুসলমানদের নিয়ে সদ্য তৈরি হওয়া 'উম্মাহ'র ঐক্য বজায় রাখতে, কেন্দ্রীয় শৃঙ্খলা ধরে রাখতে খেলাফতকে কুরাইশের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখার বিকল্প ছিল না। এ জন্য এটা যতটা না ছিল শরয়ি ও 'তাআব্বুদি' (ইবাদতগত) দৃষ্টিকোণ থেকে, তারচেয়ে বেশি ছিল 'নিযাম' তথা শৃঙ্খলা রক্ষার্থে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন কুরাইশ বংশের লোকদের মাঝে দুর্বলতা নেমে আসে, অন্য জাতির মুসলিমরা শক্তিশালী হয়ে যায়, উক্ত শর্ত কার্যত রহিত হয়ে যায়।

তাই এক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ কথা হলো, কুরাইশি শর্ত পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। যদি ইমাম হওয়ার জন্য মুসলিমদের মাঝে একাধিক যোগ্য ব্যক্তি থাকে

১৩৪৪. দেখুন : তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১১০৮-১১১১)।

যারা সামর্থ্য, গুণাবলি, তাকওয়াসহ অন্য সকল বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বে সমান, মুসলমানদের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ যোগ্যতার অধিকারী, কিন্তু তাদের একজন কুরাইশ বংশের অন্যজন বা অন্যরা কুরাইশ বংশের নয়, এক্ষেত্রে কুরাইশিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর যদি এমন হয়, যেকোনো এক কিংবা একাধিক ব্যক্তি কুরাইশি থাকে, কিন্তু তাদের মাঝে ইমামতির কোনো যোগ্যতা না থাকে, তখন যিনি যোগ্য তাকেই ইমাম বানানো হবে। কুরাইশি, তাই অযোগ্যকেও মুসলমানদের ইমাম বানিয়ে ফেলতে হবে এমন কথা কুরআন-সুন্নাহর মেযাজের খেলাফ। কারণ, এটা যতটা না মর্যাদার, তারচেয়ে বেশি দায়িত্বের জায়গা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَـٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّـٰلِمِينَ﴾ অর্থ : "(স্মরণ করুন) যখন ইবরাহিমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলা সে পূর্ণ করেছিল। আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করছি।' সে বলল, 'আমার বংশধরের মধ্য হতেও?' আল্লাহ বললেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি জালেমদের জন্য প্রযোজ্য নয়।'" [বাকারা : ১২৪] সুতরাং যারা জালেম কিংবা অযোগ্য—এমন লোকরা খলিফা হওয়ার উপযুক্ত নয়। এক্ষেত্রে বংশপরিচয় কাজে আসবে না।

একইভাবে ইমাম বলতে খেলাফতের প্রশ্নে কুরাইশি জরুরি হওয়া যৌক্তিক। কিন্তু খেলাফতের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে কায়েম হওয়া ইসলামি রাষ্ট্রের ইমাম হওয়ার জন্য কুরাইশি হওয়া জরুরি নয়। কারণ, পৃথিবীর সর্বত্র কুরাইশ বংশের লোক থাকবেন না। ফলে জগতের কোথাও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে অন্য রাজ্য থেকে কোনো কুরাইশি ব্যক্তিকে ধরে এনে ইমাম বানাতে হবে এটাও অযৌক্তিক কথা। তাই কুরাইশি শর্তটাকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে রেখে বিচার করা চাই। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি বর্জন করা কর্তব্য। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যদি তোমাদের উপর কালো-কদর্য কোনো হাবশি দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, তবুও তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে।'[১৩৪৫]

১৩৪৫. বুখারি (কিতাবুল আযান : ৬৯৩)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুল জিহাদ : ২৮৬০)।

শাসক নিযুক্তির পদ্ধতি

ইসলাম শাসক নিযুক্তির পথ বেশ উন্মুক্ত রেখেছে। ফলে কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্তে একাধিক পদ্ধতিতে শাসক নিয়োগ সম্পন্ন হতে পারে। উদাহরণত:

এক. পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ, বিদ্যমান খলিফা তার জীবনের শেষ মুহূর্তে পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত করে যাবেন, যেমনটা আবু বকর রাযি. করেছেন; তাঁর পরে তিনি উমর রাযি.-কে খলিফা নিযুক্ত করে গিয়েছেন।

দুই. শুরার মাধ্যমে নিযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ, খলিফা যদি তার পরে কাউকে নিযুক্ত করে না যান, তবে একদল গণমান্য ও নেতৃস্থানীয় জামাত যোগ্য কাউকে খলিফা হিসেবে নিয়োগ দেবেন, যেমনটা আবু বকর, উসমান রাযি.-এর বেলায় হয়েছে। এটা সর্বোত্তম এবং সুন্নাহ ও শুরাভিত্তিক পদ্ধতি।

তিন. জোরজবরদস্তিমূলক ক্ষমতা দখল। সাধারণ অবস্থায় মুসলমানদের একসঙ্গে দুজন খলিফা থাকতে পারবে না। অর্থাৎ, একজন খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হয়ে গেলে অন্য কাউকে নিয়োগ করা যাবে না। খলিফা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি অন্য কাউকে খলিফা বানানো হয়, তবে প্রথম জনই খলিফা থাকবেন; দ্বিতীয় জনের দাবি বাতিল গণ্য হবে। খলিফা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কেউ যদি নিজেকে খলিফা দাবি করে তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। প্রতিষ্ঠিত ও ন্যায়নিষ্ঠ কোনো শাসকের বিরুদ্ধে যদি কেউ বিদ্রোহ করে, তবে তাকে শক্তভাবে দমন করা হবে। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। কিন্তু সে যদি বিজয়ী হয়ে প্রথম জনকে পদচ্যুত করে, নিজেকে শাসক হিসেবে ঘোষণা করে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে নেয়, তার রাষ্ট্র পরিচালনার পূর্ণ সামর্থ্য থাকে এবং মানুষের প্রতি ইনসাফ করে, তবে সে আহলে সুন্নাতের মতে 'ইমাম' (শাসক) হিসেবে স্বীকৃতি পাবে; প্রথম জনের ক্ষমতা রহিত হয়ে যাবে।[১৩৪৬]

মুতাযিলা, খারেজি ও কাদায়্যিাহদের কাছে জবরদখলকারী ব্যক্তি শাসক হতে পারে না। অন্যকথায়, জবরদখল করে শাসক হওয়া বৈধ নয়। কিন্তু আহলে সুন্নাতের মতে, এভাবে ক্ষমতা দখলের পরে যদি সে প্রতিষ্ঠিত হয়েই যায় এবং তাকে সরানোর সুযোগ না থাকে, তবে তার ক্ষমতা বৈধ এবং সে শাসক

১৩৪৬. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৯৫, ১৯৮)। তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১১০৪-১১০৫)। আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (৪৮৪)।

বিবেচিত হবে। তার নির্দেশের আনুগত্য করতে হবে। সালাফের আমল এটার প্রমাণ। বনু মারওয়ানের অধিকাংশ শাসককে মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞজন এবং অভিভাবকতুল্য ব্যক্তিবর্গ নিয়োগ দেননি, বরং তারা নিজেরা একের পর এক জোর করে ক্ষমতা দখল করেছে এবং নিজেদের শাসক বানিয়ে নিয়েছে। সালাফের ইমামগণ তাদের শাসক হিসেবে গ্রহণ করেও নিয়েছেন। ফলে এভাবে শাসক নিযুক্ত হওয়া বৈধ। যুক্তিরও দাবি এটাই। কারণ, এসব লোককে শাসক মানা না হলে ভূপৃষ্ঠে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে, ব্যাপক রক্তপাত ও হানাহানি ঘটবে।[১৩৪৭]

শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান

মুসলমানদের ইমাম তথা শাসক হিসেবে যখন একজন যোগ্য, ইনসাফগার, দূরদর্শী মুসলিম ব্যক্তি নিযুক্ত হবেন এবং উম্মাহ তার নেতৃত্ব মেনে নেবে, ইসলামি রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা বিরাজ করবে, ন্যায়-ইনসাফ ও সমৃদ্ধির ঝান্ডা পতপত করে উড়বে, মুসলমানরা শরিয়াহর ছায়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করবে, সে মুহূর্তে সেই রাষ্ট্র কিংবা সেই শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ইসলামের সকল আলেমের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যারা বিদ্রোহ করবে, তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। বিদ্রোহের সকল চাল ও জাল সমূলে উপড়ে ফেলা হবে। কারণ, দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই এ ধরনের আচরণ পরিত্যাজ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ অর্থ : 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে; অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হবে; কিংবা তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। এটা তো তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।' [মায়িদা : ৩৩] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে—'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রাসুল,' তাকে হত্যা করা হবে না (অর্থাৎ, তার জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে)। তবে তিন ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম : এক.

১৩৪৭. দেখুন : আল-ইতিকাদ, বলখি (১১২)। উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৯৮)।

বিবাহিত ব্যভিচারী। দুই. প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ (তথা হত্যাকারী)। তিন. ধর্মত্যাগকারী এবং মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী।[১৩৪৮]

এমনকি মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে শাসক যদি সকল মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হয়, তবুও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হবে না। যেমন—শাসক যদি ফিসক তথা অন্যায়ে জড়িয়ে পড়ে, জুলুম করে, আহলে সুন্নাতের মতে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হবে না। উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের শাসকরা বিভিন্ন অন্যায়-অনাচারে ডুবে ছিল। সাহাবা ও তাবেয়িনসহ সালাফে সালেহিনের বড় বড় ইমাম তখন জীবিত ছিলেন। কিন্তু তারা সহ্য করেছেন। জালেম ও ফাসেক শাসকের পিছনে নামায পড়েছেন। তাদের অনুমতিতে ঈদ পালন করেছেন। তাদের বৈধ নির্দেশ মান্য করেছেন। কারণ, বিদ্রোহ মুসলমানদের মাঝে ফেতনার আগুন ঢেলে দেয়, বিশৃঙ্খলা ছড়ায়, ভূপৃষ্ঠে হানাহানি ও রক্তপাত ঘটায়। এর পর একজনকে সরিয়ে অন্যজনের নিয়োগ সংকটকে আরও জটিল করে। সমাধানের চেয়ে সমস্যা বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে।[১৩৪৯]

কারণ কী? কারণ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলে গিয়েছেন সবকিছু। তিনি একাধিক হাদিসে জালেম ও ফাসেক শাসকদের আবির্ভাবের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সবরের সঙ্গে তাদের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যদি তোমাদের কেউ শাসকের কোনোকিছু অপছন্দ করে, তবে যেন সে সবর করে। কারণ, যে ব্যক্তি সুলতানের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণ বেরিয়ে যাবে, সে জাহেলি মৃত্যু বরণ করবে।'[১৩৫০] অপর হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি (শাসকের) আনুগত্য থেকে বাইরে যাবে এবং মুসলমানদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সে জাহেলি মৃত্যুবরণ করবে।'[১৩৫১] এ কারণে শাসক ফিসক ও জুলুমে জড়িয়ে পড়লে তাকে নসিহত করা হবে, তাওবা করতে বলা হবে; তথাপি তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও বিদ্রোহ বৈধ হবে না। কারণ, এতে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, রক্তপাত ঘটে।

১৩৪৮. মুসলিম (কিতাবুল কাসামাহ ওয়াল মুহারিবিন : ১৬৭৬)। আবু দাউদ (কিতাবুল হুদুদ : ৪৩৫২)। তিরমিযি (আবওয়াবুদ দিয়াত : ১৪০২)।

১৩৪৯. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৯৬)।

১৩৫০. বুখারি (কিতাবুল ফিতান : ৭০৫৩)। মুসলিম (কিতাবুল ইমারাহ : ১৮৪৯)।

১৩৫১. মুসলিম (কিতাবুল ইমারাহ : ১৮৪৮)।

আউফ ইবনে মালেক আশজায়ি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের সর্বোত্তম শাসক হচ্ছে—যাদের তোমরা ভালোবাসো, তারাও তোমাদের ভালোবাসে; যাদের জন্য তোমরা দোয়া করো, তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। আর তোমাদের সর্বনিকৃষ্ট শাসক হচ্ছে—যাদের তোমরা ঘৃণা করো, তারাও তোমাদের ঘৃণা করে; যাদের তোমরা অভিশাপ দাও, তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়।' সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না? তিনি বললেন, 'না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে। (দ্বিতীয়বার বললেন) না, বিদ্রোহ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে। সাবধান! যার উপর কোনো শাসককে নিযুক্ত করা হলো, সে যদি তার মাঝে আল্লাহর কোনো অবাধ্যতা দেখে, তবে আল্লাহর অবাধ্যতাকে যেন ঘৃণা করে। শাসকের আনুগত্য বর্জন না করে।'[১৩৫২]

সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' ইবনে হিব্বান উক্ত হাদিসের শিরোনাম দিয়েছেন, 'শাসক জুলুম করলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে।'[১৩৫৩]

বিদ্রোহের ব্যাপারে ইমাম আজমের দৃষ্টিভঙ্গি

এ ব্যাপারে ইমাম আজমের মত কী ছিল? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আপাত দৃষ্টিতে জটিল। কারণ, এক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান। প্রত্যেক পক্ষের বক্তব্যের সমর্থনে ইমাম আজমের বক্তব্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান। নিচে আমরা উভয় পক্ষের বক্তব্য তুলে ধরে এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পেশ করব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম পক্ষের বক্তব্য : খতিবে বাগদাদি ইমাম আওযায়ি থেকে বর্ণনা করেন, 'আবু হানিফা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হালাল ঘোষণা করেছেন।' খতিবের বর্ণনামতে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, 'আমি আওযায়ির কাছে ইমাম আবু

১৩৫২. মুসলিম (কিতাবুল ইমারাহ : ১৮৫৫)। মুসনাদে দারেমি (কিতাবুর রিকাক : ২৮৩৯)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুল আনসার : ২৪৬৩৩)।

১৩৫৩. ইবনে হিব্বান (কিতাবুস সিয়ার : ৪৫৮৮)।

হানিফার কথা উল্লেখ করলে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, এমন লোকের কাছে যাও যে উম্মতে মুহাম্মাদির মাঝে অস্ত্রধারণ বৈধ মনে করে আবার তার কথা আমাকে বলো?'[১৩৫৪] খতিবের বর্ণনাকৃত এসব ঘটনার সনদ আপত্তিকর হলেও বাস্তবতা অন্যান্য সূত্রেও প্রমাণিত।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবিস্তার কথা বলেছেন খ্যাতনামা হানাফি ফকিহ ও মুফাসসির আবু বকর জাসসাস। তিনি তার বিখ্যাত 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে উক্ত মত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাসসাস লিখেন, '...সুতরাং ফাসেক শাসক হতে পারবে না। তার হুকুম বাস্তবায়িত করা হবে না। ...কোনো কোনো মানুষ মনে করে, ইমাম আজম রহ. ফাসেক ব্যক্তির ইমাম ও খলিফা হওয়া বৈধ মনে করতেন। এটা ভুল কথা। ইমামের কাছে খলিফা কিংবা কাযি সকলের জন্য ইনসাফগার হওয়া আবশ্যক। ফাসেক ব্যক্তি তাঁর মতে খলিফা হতে পারবে না। কাযি (সুতরাং শাসক) হতে পারবে না। তার (হাদিস) বর্ণনা গ্রহণ করা হবে না। সাক্ষ্য কবুল করা হবে না। তার নির্দেশ পালন করা হবে না।' জাসসাস লিখেন, 'জালেম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাব। এ জন্য আওযায়ি বলেছেন, 'আমরা আবু হানিফার সবকিছু মেনে নিয়েছি। কিন্তু একপর্যায়ে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে (তথা জালেমের বিরুদ্ধে) অস্ত্রধারণের বৈধতা ঘোষণা করেন। সেটা আমরা মেনে নিইনি।' জাসসাসের মতে, 'ইমাম আবু হানিফার মত ছিল— মুখে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করা ফরয। যদি মুখে কাজ না হয়, অস্ত্র নিতে হবে।' ইবরাহিম সায়েগ ইমামকে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'এটা ফরয।' অতঃপর ইমাম নিজস্ব সনদে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, 'সর্বোত্তম শহিদ হলেন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। অতঃপর সে ব্যক্তি যে জালেম শাসককে সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং নিহত হয়।' ইমামের এ কথা শুনে ইবরাহিম মারভে গিয়ে সেখানকার শাসক আবু মুসলিমকে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে থাকেন। তাকে জুলুম ও রক্তপাত করতে নিষেধ করেন। একপর্যায়ে আবু মুসলিম ইবরাহিমকে হত্যা করে ফেলে! জাসসাস আরও বলেন, 'যায়দ ইবনে আলির ক্ষেত্রে ইমামের ভূমিকা

১৩৫৪. তারিখে বাগদাদ (১৫/৫২৮)। আওযায়ি প্রথম দিকে ইমাম আজমের প্রতিপক্ষের সমালোচনায় প্রভাবিত হয়ে ইমামের ব্যাপারে বিরূপ ধারণা রাখতেন। পরবর্তী সময়ে ইমাম আজমের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথা হলে তাঁর ভুল ধারণা দূর হয়ে যায় এবং তিনি সেটা খোলাখুলি স্বীকার করেন। দেখুন : মানাকিব, বাযযাযি (৪৫)।

প্রসিদ্ধ। তিনি তাকে সম্পদ দিয়ে সহায়তা করেন। (বিদ্রোহ করার পরে) তাকে সাহায্য করা এবং তার পক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব বলে গোপনে মানুষকে ফাতাওয়া দেন। একইভাবে আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের দুই পুত্র মুহাম্মাদ (আন-নাফসুয যাকিয়্যাহ) ও ইবরাহিমকেও তিনি সহায়তা করেন। আবু ইসহাক ফাযারি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন আপনি আমার ভাইকে ইবরাহিমের সঙ্গে বিদ্রোহ করতে বললেন এবং সে তাতে নিহত হলো? ইমাম বললেন, 'আপনার চেয়ে আপনার ভাইয়ের কাজ আমার কাছে অতি প্রিয়।'[১৩৫৫] হারেসি লিখেন, 'তিনি যায়দ ইবনে আলির কাছে সালাম পাঠাতেন। তাঁর জন্য ইস্তিগফার করতেন।'[১৩৫৬]

জারুল্লাহ যমখশারিও (৫৩৮ হি.) কাছাকাছি কথা বলেছেন। তিনি লিখেন, 'যায়দ ইবনে আলি (উমাইয়্যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে) ইমাম গোপনে তার সঙ্গে যোগ দেওয়া এবং অর্থ ও সম্পদ দিয়ে তাকে সহায়তার ফাতাওয়া দিয়েছিলেন। ...এক নারী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি আমার ছেলেকে আবদুল্লাহ ইবনুল হাসানের পুত্রদ্বয় ইবরাহিম ও মুহাম্মাদের সঙ্গে বিদ্রোহের পরামর্শ দিয়েছিলেন। একপর্যায়ে সে নিহত হয়। এটা কেন করলেন? ইমাম বললেন, 'হায়! আমি যদি আপনার সন্তানের জায়গায় থাকতাম!' (খলিফা) মনসুর ও তার মন্ত্রীসান্ত্রিদের ব্যাপারে তিনি বলতেন, '(কাযির দায়িত্ব তো দূরের কথা) যদি তারা একটি মসজিদ বানাতে চায় আর আমাকে সে মসজিদের ইট গোনার দায়িত্ব দেয়, আমি সেটাও করব না।'[১৩৫৭]

আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ বর্ণনা করেন—আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবু হানিফা রহ. অস্ত্রধারণ (তথা বিদ্রোহ) বৈধ মনে করতেন!' আবু ইউসুফকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি? তিনি বললেন, 'নাউযুবিল্লাহ!' আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকেও বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, 'আবু হানিফা বিদ্রোহ বৈধ মনে করতেন।'[১৩৫৮]

১৩৫৫. দেখুন : আহকামুল কুরআন (১/৮৬-৮৭)।
১৩৫৬. কাশফুল আসার (১/১৬৯)।
১৩৫৭. আল-কাশশাফ (১/১৮৪)।
১৩৫৮. আস-সুন্নাহ, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ (১২৫, ১৩২)।

দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য : উপরের বর্ণনাগুলোতে প্রমাণিত হয়—ইমাম আজম রহ. সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে জালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পক্ষে ছিলেন। জটিলতা হলো—এর ঠিক বিপরীত বর্ণনারও অভাব নেই। ইবনে আবিল আওয়াম বর্ণনা করেন, নজর ইবনে মুহাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করা হলো : আবু হানিফা কি (শাসকের বিরুদ্ধে) অস্ত্রধারণ সঠিক মনে করতেন? নজর বলেন, 'নাউযুবিল্লাহ! ইমাম এমন ছিলেন না।'[১৩৫৯] নজর ইবনে মুহাম্মাদ থেকে আরও বর্ণিত, 'আবু হানিফা রহ. শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ মনে করতেন না। তাঁর শাগরেদরাও এটাকে বৈধ মনে করতেন না।'[১৩৬০]

তহাবি বলেন, 'শরয়ি বিধানের বাইরে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কারও বিরুদ্ধে আমরা তরবারি উত্তোলন বৈধ মনে করি না। আমাদের শাসক ও নেতৃবৃন্দ জালেম হলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ মনে করি না। তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করি না। তাদের আনুগত্য লঙ্ঘন করি না। গুনাহের নির্দেশ দেওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের আনুগত্য মূলত আল্লাহর আনুগত্য হিসেবে অনিবার্য মনে করি। আমরা তাদের শুদ্ধি এবং সুস্থতার জন্য দোয়া করি।'[১৩৬১] এটা তো স্পষ্ট ব্যাপার যে, ইমাম তহাবির আকিদা ইমাম আজম ও তাঁর শাগরেদদের আকিদা থেকে গৃহীত। বোঝা গেল, ইমাম আজম বিদ্রোহ বৈধ মনে করতেন না। কেবল তহাবি নন, পরবর্তী সকল হানাফি আলেমের বক্তব্য এক ও অভিন্ন। তারা সকলে বিদ্রোহের বিপক্ষে।

এখানেই প্রশ্ন হয়—এই পরস্পরবিরোধী বর্ণনার মাঝে সঠিক কোনটা? আসলেই ফাসেক ও জালেম শাসকের ব্যাপারে ইমাম আজমের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? তিনি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ মনে করতেন, নাকি করতেন না? যদি অবৈধ মনে করতেন তবে জাসসাস, যমখশারিসহ প্রথম মতের আলেমদের বর্ণনার ব্যাপারে কী বলা হবে? আর যদি বৈধ মনে করতেন, তবে তহাবিসহ অন্যান্য হানাফি ফকিহদের মাযহাবের ব্যাপারে কী বলা হবে?

অধমের পর্যবেক্ষণ : উক্ত প্রশ্নের উত্তর বেশ দুরূহ বটে। এ কারণে অনেকেই বিষয়গুলো গুলিয়ে ফেলেছেন, এলোমেলো করে দিয়েছেন; নানাজন নানান

১৩৫৯. ফাযায়িলু আবি হানিফা (৭৫)। আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৬৫)।

১৩৬০. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৬৩)।

১৩৬১. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৪)।

প্রান্তিক ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। তবে অধমের ধারণা—এই বৈপরীত্যপূর্ণ অবস্থান ও বক্তব্যগুলো সময়ের বিবর্তনের ফলে ঘটে থাকবে। অর্থাৎ, ইমাম আজম প্রথম যুগে জালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সঠিক মনে করতেন। ফাসেককে শাসকের অযোগ্য মনে করতেন। ফলে বিদ্রোহের মত দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে খলিফা থেকে শুরু করে আমির-উমারা, হাকেম-কাযি সর্বত্র জুলুম ও ফিসক ছড়িয়ে পড়ে, প্রাথমিক সময়ে সংঘটিত বিদ্রোহগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে, তখন তিনিও মত পরিবর্তন করেন, বিদ্রোহ বারণ করেন, সবরের পরামর্শ দেন।

এই যে বিবর্তনটা, এটা মোটেও অস্বাভাবিক ছিল না। বরং প্রথম সময়ে অনেক ইমাম ও আলেমই বিদ্রোহের পক্ষে ছিলেন। মাত্র খিলাফতে রাশেদার যুগ শেষ হয়েছিল। ইসলামের স্বর্ণযুগ, ন্যায়-ইনসাফের উদাহরণ তখনও চোখেমুখে জীবন্ত ছিল। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবাদের শোভামণ্ডিত এ পবিত্র দায়িত্বের আসন ফাসেকরা কলংকিত করবে—এটা সালাফের কেউ মেনে নিতে পারছিলেন না। একদিকে সর্বত্র দায়িত্বশীলদের পাপাচার ও জুলুম দেখে তারা অতিষ্ঠ ছিলেন, অপরদিকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সবরসংক্রান্ত অনেক সতর্কবাণীও তাদের সামনে ছিল। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজন নীরব থাকলেন। কিন্তু সবাই সেটা মেনে নিতে পারলেন না। দ্বীনি গাইরত তাদের তুলনামূলক ঝুঁকি তথাপি আযিমতের পথ অবলম্বনে বাধ্য করল। এতে তাদের কেউ নিন্দিত হবেন না। 'বাগি' (বিদ্রোহী) বিবেচিত হবেন না। কারণ ঈমান, ইখলাস ও দ্বীনি গাইরত তাদের এ পথে নিয়ে এসেছিল। তারা কীভাবে নিন্দিত হবেন যখন খোদ নবি-দৌহিত্র এবং জান্নাতের যুবকদের সর্দার সাইয়েদুনা হুসাইন রাযি. এ পথের পথিকদের নেতৃত্বে ছিলেন? পরবর্তীকালে একাধিক সাহাবি এ পথ অবলম্বন করেছেন।

সাহাবা ও তাবেয়িদের বিদ্রোহ : সাইয়েদুনা হুসাইন রাযি. পাপিষ্ঠ ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। একদল সাহাবি তাকে বারণ করেন, কিন্তু তিনি বিদ্রোহকেই সঠিক মনে করেন। ৬১ হিজরিতে ঐতিহাসিক কারবালার ময়দানে জালেম ইয়াযিদের বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নবি-পরিবারের একাধিক সদস্যসহ শহিদ হয়ে যান।

আবদুল্লাহ ইবনে মুতি আদাভি, আবদুল্লাহ ইবনে হানযালাহ আনসারি, মা'কাল ইবনে সিনান এবং আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ আনসারির নেতৃত্বে গোটা মদিনাবাসী এ জুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠান। যাহাবির ভাষায়—হুসাইন রাযি.-এর পরে মদিনাবাসী ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আল্লাহর পথে দাঁড়িয়ে যান।

দুরাচার ইয়াযিদ মদিনায় রক্তপাত করে। অসংখ্য সাহাবি ও তাবেয়িকে শহিদ করে দেওয়া হয়। কয়েক দিন মদিনায় লুটপাট করা হয় (৬৩ হি.)।[১৩৬২]

অতঃপর কারবালার প্রতিশোধ এবং জালেমদের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঁচু করেন রাসুলুল্লাহর সাহাবি সুলাইমান ইবনে সুরাদ রাযি.। 'তাওয়াবিন বাহিনী' নিয়ে বিদ্রোহ ও প্রতিশোধের আওয়াজ ওঠান তিনি। উমাইয়া শাসক মারওয়ান ইবনুল হাকাম উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে তাদের বিরুদ্ধে পাঠায়। ইবনে সুরাদের বাহিনীতে মুসাইয়াব ইবনে নাজাবাসহ অসংখ্য তাবেয়ি যোগদান করেন। তারাও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। রাসুলের সাহাবিসহ অসংখ্য তাবেয়ি শহিদ হন (৬৫ হি.)। মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে তাঁর ও মুসাইয়াবের কর্তিত মস্তক নিয়ে যাওয়া হয়।[১৩৬৩]

অতঃপর জেগে ওঠেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি রাসুলের হাওয়ারি যুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং আবু বকর রাযি.-এর কন্যা আসমাপুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.। তিনি উমাইয়াদের জুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠান। ইনসাফের খেলাফত ঘোষণা করেন। মক্কাকে এই খেলাফতের রাজধানী বানান। খোদ আসমা রাযি. তাঁর এই জিহাদ ও সংগ্রামে সহায়তা করেন। উমাইয়াদের পক্ষ থেকে জালেম ও পাপিষ্ঠ হাজ্জাজকে প্রেরণ করা হয়। হাজ্জাজ মক্কা শহর অবরোধ করেন। একপর্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরকে হত্যা করে তার মাথা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কাছে পাঠান। তার শরীর জঘন্যভাবে শূলে চড়িয়ে রাখেন! আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের সঙ্গে তার দুজন বিশিষ্ট সহযোগী আবদুল্লাহ ইবনে মুতি ও আবদুল্লাহ ইবনে সফওয়ান রাযি.সহ অসংখ্য বড় বড় তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়ি শাহাদাত বরণ করেন।[১৩৬৪]

সাহাবিদের এই গাইরত ও ঈমানের পথে অটল থাকেন অসংখ্য তাবেয়ি। জালেমের বিরুদ্ধে তারাও সক্রিয় থাকেন, যেটা চূড়ান্তরূপে প্রকাশ পেয়েছিল ইবনুল আশআসের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে, ইতিহাসে যা 'আলেমদের বিদ্রোহ'

১৩৬২. দেখুন : তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ (৫/১৭১)। সিয়ারু আলামিন নুবালা (৪/৩৮)। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১১/৬২৩)।

১৩৬৩. দেখুন : আল-ইসাবাহ (৪/৪৫৪)।

১৩৬৪. দেখুন : তারিখে তাবারি (৬/১৮৮-১৯২)। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১২/২২১-২২২)।

(সাওরাতুল কুররা) নামেও পরিচিত। আবদুর রহমান ইবনুল আশআসের নেতৃত্বে হাজ্জাজ ও উমাইয়া শাসক আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে শরিক হয়েছিলেন প্রায় পাঁচশত সাহাবি ও তাবেয়ি! তাদের মাঝে ছিলেন বিখ্যাত সাহাবি আনাস ইবনে মালেক, আনাসের ছেলে নজর ইবনে আনাস, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের পুত্র মুহাম্মাদ (হাজ্জাজ তাকে হত্যা করে)[১৩৬৫], আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের পুত্র আবু উবাইদা, মুজাহিদ ইবনে জবর, ইবনে দিনার, আমের ইবনে শুরাহবিল, সাইদ ইবনে যুবাইর এবং আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলার মতো বড় বড় মানুষ।[১৩৬৬]

অন্যদিকে পবিত্র আহলে বাইতের অসংখ্য সদস্যও জালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ময়দানে তাজা খুন বিলিয়ে শাহাদাতকে বেছে নেন। নবি-পরিবারের সদস্যরা কারবালার বেদনাদায়ক দৃশ্যের সামনে কখনো দমে যাননি; বরং নিজেদের গাইরত ও ঈমানি দাবি পূরণে সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। জালেম ও পাপাচারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শোণিত তারা বংশীয় সূত্রে ঐতিহ্য হিসেবে বহন করছিলেন। হুসাইন রাযি.-এর পরে তাঁর পুত্র যাইনুল আবিদিনের সন্তান (হুসাইন পৌত্র) যায়দ ইবনে আলি উমাইয়া শাসক হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এ বিদ্রোহের মূল প্রাণোদনা ছিল সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ, যে পথে প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁর দাদা হুসাইন রাযি.। তিনি আলেমদের সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের প্রতি দাওয়াত দেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং সত্যের পক্ষে বঞ্চিতদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তার এ জিহাদে অংশগ্রহণের আহ্বান করেন (১২২ হি.)। একইভাবে পরবর্তী সময়ে ইবরাহিম ইবনে আবদুল্লাহ এবং তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (মুহাম্মাদ আন-নাফসুয যাকিয়্যাহ) আব্বাসিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।[১৩৬৭]

এই যে বিশাল ইতিহাস ও পরম্পরা, অন্যায় ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দ্রোহের উদ্‌গীরণ, হুসাইন রাযি. থেকে শুরু করে নবি-পরিবারের সন্তান মুহাম্মাদ আন-নফসুয যাকিয়্যাহ পর্যন্ত বিদ্রোহের সিলসিলা—ইমাম আজম রহ. সব জানেন, শোনেন ও দেখেন। ঈমান, ইখলাস ও গাইরতসম্পন্ন কোনো মানুষের পক্ষে কি

১৩৬৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা (৪/৩৪৯)।
১৩৬৬. দেখুন : তারিখে খলিফাহ ইবনে খাইয়াত (২৮৭)। সিয়ারু আলামিন নুবালা (৪/১৮৩-১৮৪)।
১৩৬৭. আল কামিল, ইবনুল আসির (৫/২৩৩)।

এর পরেও নীরব থাকা সম্ভব? সংগত কারণে ইমামও নীরব থাকতে পারেননি; বরং বড়দের অনুসরণ করেছেন। সাহাবা ও তাবেয়িদের পথে হেঁটেছেন। অপরদিকে নবি-পরিবারের প্রতি ইমাম আজমের দুর্বলতা ছিল তাঁর ফিতরতের গভীরে প্রোথিত। ফলে বনু মারওয়ানের আহলে বাইত-বিদ্বেষ তার ঈমানি স্পৃহা আরও বাড়িয়ে দেয়। তিনি ঝুঁকিপূর্ণ ও শ্বাপদসংকুল পথে পা বাড়ান। আহলে বাইতের বিদ্রোহে সমর্থন দেন। প্রথমে হিশামের বিরুদ্ধে যায়দ ইবনে আলির বিদ্রোহে সহায়তা করেন। নিজে অংশগ্রহণের ইচ্ছা করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেটা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। ফলে যায়দের জন্য দশহাজার দিরহাম অর্থসহায়তা পাঠান। তার বিদ্রোহকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর বদর রণাঙ্গনে গমনের সঙ্গে তুলনা করেন! পরবর্তীকালে যখনই তাঁর শাহাদাতের কথা মনে করতেন, তিনি কাঁদতেন।[১৩৬৮]

অতঃপর যখন ইবরাহিম ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল হাসান (আন নাফযুস যাকিয়্যাহ) মনসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, ইমাম তাদেরও সহায়তা করেন। তাদের কাছে অর্থ পাঠান! তাদের পক্ষে এবং জালেমের বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতাওয়া দেন। এটা যেকোনো গাইরতসম্পন্ন মুমিনের দায়িত্ব ছিল সে সময়। এ কারণে কেবল ইমাম আজম নন, সে সময় দ্বীনি গাইরতের কারণে অন্যান্য ইমামও জালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহগুলোকে সমর্থন করেন। ইবরাহিমের বিদ্রোহে ইমাম আজম ছাড়াও আবু খালেদ আহমদ, ঈসা ইবনে ইউনুস, আব্বাদ ইবনুল আওয়াম, ইয়াযিদ ইবনে হারুনের মতো ব্যক্তিত্বরা অংশ নেন; বরং ইমাম মালেকও তাতে সমর্থন দেন। ইমাম আজম ও ইমাম মালেক প্রকাশ্যে মানুষকে ইবরাহিম ও মুহাম্মাদ আন নাফসুস যাকিয়্যাহর বিদ্রোহে শরিক হওয়ার দাওয়াত দিতেন! ইবরাহিমের বিদ্রোহে আবু ইসহাক ফাযারির ভাই নিহত হলে ফাযারি ইমাম আজমকে বলেন, আপনি আমার ভাইকে উসকে দিয়ে বিদ্রোহে পাঠালেন। আল্লাহকে ভয় করলেন না! ইমাম আজম বললেন, 'সে তো যেন বদরের দিন নিহত হয়েছে!' অর্থাৎ, ইমামের কাছে এই বিদ্রোহ ছিল বদরের দিনের মতো হক ও বাতিল স্পষ্ট হওয়ার মাপকাঠি। ইমাম শুবা বলতেন, "এ দিনটি আমার কাছে 'বদরে সুগরা'র মতো।"[১৩৬৯]

১৩৬৮. মানাকিব, বাযযাযি (২৬৭)।

১৩৬৯. দেখুন : শাযারাতুয যাহাব (২/২০৩-২০৪)।

বিদ্রোহ বৈধতা থেকে অবৈধতায় রূপান্তর : তবে এসব বিদ্রোহ জুলুম ও জালেমের প্রতি মনস্তাত্ত্বিক ঘৃণা ছাড়া আর কোনো বাস্তবসম্মত অর্জন বয়ে আনছিল না, যদিও এটা মূল্যহীন কিংবা অল্প ফলাফল এমন নয়; বরং জুলুমের প্রতি মনস্তাত্ত্বিক ঘৃণা অনেক বড় অর্জন নিঃসন্দেহে; তথাপি এর মূল্যটা ছিল বেশ চড়া। হাজার হাজার তাবেয়ি এতে নিহত হচ্ছিলেন। লাখ লাখ সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছিল। শহর বিরান হয়ে যাচ্ছিল। উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। বিপরীতে জালেমরা বহাল তবিয়তেই থেকে যাচ্ছিল। বরং তাদের জুলুম বাড়ছিল বই কমছিল না। এ কারণে উলামায়ে কেরাম পুরো বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেন। খোদ ইমাম আজম রহ. পুরো বিদ্রোহের সিলসিলাটির প্রতি পুনরায় মনোযোগ দেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর বারবার সতর্কবার্তা এবং সবরের নসিহতগুলো বাস্তবতার আলোকে পুনর্মূল্যায়ন করেন। পাশাপাশি আলেমদের উপর শাসকদের চাপ বৃদ্ধি পায়। তারা ইমাম আজম, সুফিয়ান সাওরিসহ বিভিন্ন আলেমকে কৌশলস্বরূপ রাষ্ট্রের বড় বড় দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করেন। আলেমদের শ্রদ্ধা করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আলেমদের থেকে সম্ভাব্য বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা প্রকাশের দরজা বন্ধ করা, রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য এবং শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তাদের নিষ্ঠা পরীক্ষা করা। কেউ কেউ শাসকের প্রস্তাব গ্রহণ করে নেন। কিন্তু ইমাম আজমসহ প্রথম শ্রেণির ইমামগণ এখানেও অবিচলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। জুলুমের মুখোমুখি হয়েও সরকারি পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। একপর্যায়ে মক্কাতে পালিয়ে যান। সুফিয়ান সাওরিসহ অনেক আলেমই তখন বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে থাকেন। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি তাদের কৌশলগত পরিবর্তন মেনে নিতে বাধ্য করে। উমাইয়াদের পতনের পরে আব্বাসিরা নেতৃত্বে আসে। আব্বাসি সাম্রাজ্য দ্রুতই মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যায়। শাসকরা ইসলাম, মুসলমান ও আলেমদের প্রতি শ্রদ্ধা যাহির করতে থাকে। অন্যদিকে যাদের থেকে বিদ্রোহের আশঙ্কা ছিল, তাদের নজরবন্দি করে রাখে এবং বিভিন্ন শাস্তির সম্মুখীন করে। মনসুর কৌশল করে ইমাম আজমকে বিচারকের প্রস্তাব দেন। প্রত্যাখ্যান করলে বেত্রাঘাত করেন এবং জেলে বন্দি করে রাখেন। পরবর্তীকালে জেল থেকে ছাড়লেও গৃহবন্দি করে রাখেন। মানুষের সঙ্গে মিশতে, কথা বলতে এবং ছাত্রদের পাঠদান করতে নিষেধ করেন; বরং ঘর থেকে বের হওয়ার উপরও নিষেধাজ্ঞা আসে। এভাবেই একসময় তিনি দুনিয়া থেকে মজলুম ও শহিদ হিসেবে বিদায় নেন।[১৩৭০]

১৩৭০. মানাকিব, বাযযাযি (২৯৯)।

আল্লাহর পথে এই দীর্ঘ সংগ্রাম, দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা, নিজের ঈমান ও আদর্শের উপর অবিচলতা তাঁকে ইমাম আজমে পরিণত করে এবং ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করে। প্রথম জীবনে নবি-পরিবারের প্রতি ভালোবাসা, দুর্বলদের প্রতি অনুরাগ এবং জুলুমের প্রতি বিরাগ ও ঘৃণার ফলে জুলুমের দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হন তিনি। সশস্ত্র সংগ্রামগুলোতে প্রকাশ্য সমর্থন দান করেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন তাঁকে নতুন করে সবকিছু ভাবতে ও দেখতে শেখায়। একপর্যায়ে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, **'কোনো সম্প্রদায় শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে আর সফল হয়েছে—এমন হয়নি কখনো।'**[১৩৭১] এভাবে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ তাবেয়ির মধ্যম পথে হাঁটা শুরু করেন তিনি। একদিকে শাসকগোষ্ঠী থেকে দূরত্ব গ্রহণ করেন, অপরদিকে সশস্ত্র বিদ্রোহ নিষেধ করে দেন। ইমামের মানাকিব ও আকিদার গ্রন্থগুলো এর সাক্ষী।

আবু মুতি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, যেসব মানুষ সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে আর সেটার জন্য জামাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদের কাজ কি সঠিক মনে করেন? ইমাম বললেন, **"না। কারণ, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ ওয়াজিব হলেও তারা যেটা করে তাতে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি। তাতে রক্ত ঝরে, হারামকে হালাল বানানো হয়, মানুষের ধনসম্পদ নষ্ট হয়। এ কারণে আল্লাহ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,** ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ﴾ **অর্থ : 'যদি মুমিনদের দুটি দল পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর আক্রমণ করে, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।' [হুজুরাত : ৯] ফলে মুসলমানদের জামাতের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করবে, তাদের তরবারি দিয়ে শায়েস্তা করা হবে। শাসক যদি জালেমও হয়, নিজেরা ন্যায়ের উপর থাকবে, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত দলের সঙ্গে থাকবে (বিদ্রোহীদের সঙ্গে থাকবে না)। কারণ, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)**

১৩৭১. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৬৪)।

বলেছেন, 'তাদের (শাসকদের) কেউ ইনসাফ করুক কিংবা জুলুম করুক, তোমাদের তাতে ক্ষতি নেই। তোমাদের পুণ্য তোমাদের জন্য, তাদের জুলুম তাদের কাঁধে।'"[১৩৭২]

ইমাম রহ. নিজস্ব সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আমার পরে বিভিন্নরকমের বিচ্যুতি দেখা দেবে। কিন্তু কেউ যদি তোমাদের ঐক্যকে বিশৃঙ্খল করে দিতে চায়, তবে সে যে-ই হোক, তাকে হত্যা করে ফেলো।'[১৩৭৩]

ইমাম রহ. আবু আমর শাইবানি সূত্রে ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে মাসউদ যখন মদিনার বাইরে যাচ্ছিলেন, তখন শাইবানিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করবে। মুসলমানদের জামাতের সাথে থাকবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের গোমরাহির উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না। আর (শাসক জুলুম করলে) সবর করবে যে পর্যন্ত না তুমি তার কাছ থেকে নিরাপদ হয়ে যাও।'[১৩৭৪]

ইয়াহইয়া ইবনে নসরসহ একাধিক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, আবু হানিফা রহ. সকল জালেম ও পাপাচারী শাসকের পিছনে নামায পড়া বৈধ মনে করতেন। শাসক জালেম হলেও তিনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সঠিক মনে করতেন না। তিনি বলতেন, **'কোনো সম্প্রদায় শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে আর সফল হয়েছে—এমন হয়নি কখনো।'**[১৩৭৫]

আবু মুতির বর্ণনায় ইমাম বলেন, **"বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে যুদ্ধ করা হবে, কুফরির কারণে নয় (অর্থাৎ বিদ্রোহীরা কাফের নয়)। সুতরাং ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর দলের সঙ্গে থাকো। জালেম শাসকের সঙ্গে থাকো। তবুও বিদ্রোহীদের সঙ্গ দিয়ো না। কারণ, বৃহত্তর দলের মাঝে কিছু নষ্ট মানুষ ও জালেম থাকলেও তাদের মাঝে পুণ্যবানরাও রয়েছেন। সুতরাং বিদ্রোহী দল থেকে দূরে থাকো। তাদের বর্জন করো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,** ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟

১৩৭২. আল-ফিকহুল আবসাত (৪৪)।

১৩৭৩. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৫৯)।

১৩৭৪. জামিউল মাসানিদ, খাওয়ারযেমি (১/৯২)।

১৩৭৫. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৬৪)।

فِيهَا﴾ অর্থ : ‘আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা হিজরত করে সেখানে চলে যেতে?’ [নিসা : ৯৭] অন্যত্র বলেন, ﴿يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرۡضِي وَٰسِعَةٞ فَإِيَّٰيَ فَٱعۡبُدُونِ﴾ অর্থ : ‘হে আমার মুমিন বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব, তোমরা আমারই ইবাদত করো।’” [আনকাবুত : ৫৬][১৩৭৬]

এভাবে ইমাম আজমের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে যায় যে, **‘যদি কোনো অঞ্চলে অন্যায় দেখা দেয় এবং সেটা কারও পক্ষে পরিবর্তনের সামর্থ্য না থাকে, তবে তার জন্য সেখান থেকে অন্য ভূখণ্ডে হিজরত করে যাওয়া উচিত, তবুও বিদ্রোহ করা উচিত হবে না।’** এ প্রসঙ্গে তিনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে নিজস্ব সূত্রে (হাম্মাদ→ ইবরাহিম→ আলকামা→ ইবনে মাসউদ) হাদিস বর্ণনা করেন; রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, **‘যখন কোনো ভূখণ্ডে অন্যায় প্রকাশ পায় এবং সেটা তোমার পরিবর্তনের সাধ্য না থাকে, তবে অন্যত্র চলে যাও এবং সেখানে গিয়ে তোমার রবের ইবাদত করো।’** ইমাম সাহাবির সূত্রে বলেন, **‘ফেতনার ভয়ে যদি কেউ এক ভূখণ্ড থেকে অন্য ভূখণ্ডে হিজরত করে, আল্লাহ তার জন্য সত্তর জন সিদ্দিকের পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন।’**[১৩৭৭]

ইমামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হত্যাকারীর পিছনে নামায আদায় করা যাবে? তিনি বললেন, **‘প্রত্যেকে সৎ-অসৎ ব্যক্তির পিছনে নামায আদায় বৈধ। তোমার পুণ্য তুমি পাবে, তার পাপ তার কাঁধে যাবে।’** ইমামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তাদের ব্যাপারে বিধান কী যারা গণমানুষের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে এবং তাদের হত্যা করে? তিনি বললেন, **‘তারা ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তারা সকলে জাহান্নামি।’**[১৩৭৮]

কেবল মুখে নয়, কাজেও তিনি প্রমাণ করতেন। ইয়াহইয়া ইবনে নসর ইবনে হাজেব মারওয়াযি বলেন, ‘আবু হানিফা ছিলেন একজন ইনসাফগার মানুষ। ...তিনি গুনাহের কারণে কাউকে কাফের বলতেন না। তিনি জালেম ও পাপিষ্ঠ শাসকের পিছনে নামায পড়তেন।’[১৩৭৯]

১৩৭৬. আল-ফিকহুল আবসাত (৪৮)।

১৩৭৭. প্রাগুক্ত (৪৮)।

১৩৭৮. আল-ফিকহুল আবসাত (৫২)। আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৫৪)।

১৩৭৯. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৫৭)।

এভাবে শাসকের প্রতি ইমাম আজমের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আবু বকর জাসসাস ও যমখশারি যা লিখেছেন সেটা যেমন সঠিক প্রমাণিত হলো, আবার আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, হাম্মাদ, আবু মুতি বলখি, আবু মুকাতিল সমরকন্দি ও তহাবি রহ. যা লিখেছেন সেটাও সঠিক প্রমাণিত হলো। অর্থাৎ, জাসসাস ও যমখশারি ইমামের প্রথম অবস্থার কথা বলেছেন কিংবা ইমামের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছেন। বিপরীতে ইমামের শাগরেদরা ইমাম আজমের প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি এবং সর্বশেষ আকিদা ও মানহাজ উল্লেখ করেছেন। ফলে ইমাম আজমের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হলো, ফাসেক ব্যক্তিকে শাসক বানানো মাকরুহ। তথাপি যদি বানিয়ে ফেলাই হয়, সেটা কার্যকর হবে। সে শাসক গণ্য হবে। তার আনুগত্য জরুরি হবে। বিদ্যমান শাসক যদি ফিসক তথা জুলুমে লিপ্ত হয়, তবে সে পদচ্যুতির উপযুক্ত হবে, কিন্তু পদচ্যুত করা হবে না। ফলে শাসকের বিরুদ্ধে পাপ বা জুলুমের কারণে বিদ্রোহও করা যাবে না।[১৩৮০]

জালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ : যেমনটা বলা হলো—পরবর্তীকালে সকল হানাফি আলেম ইমাম আজমের সর্বশেষ সংশোধিত ও সংস্কারকৃত পথে হেঁটেছেন, প্রথম পথে হাঁটেননি। তারাও জালেম শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে নিষেধ করেছেন :

○ সায়েদ নিশাপুরির বর্ণনা মতে ইমাম আজম রহ. বলেন, **'আহলে সুন্নাতের (আকিদা) হলো : আমরা কোনো মুসলমানকে গুনাহের কারণে কাফের বলি না। ইসলাম থেকে বের করি না। ...আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ (বিদ্রোহ) করি না।'** নিশাপুরি বলেন, 'এটা আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানেরও আকিদা।'[১৩৮১]

○ আবু হাফস বুখারি বলেন, 'আহলে সুন্নাতের বৈশিষ্ট্য হলো—সৎ-অসৎ সকলের পিছনে নামায পড়া, প্রত্যেক শাসকের পিছনে দুই ঈদ ও জুমার নামায পড়া এবং এটাকে হক মনে করা, ...অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করা।' তিনি আরও বলেন, 'চল্লিশজন তাবেয়ি থেকে আমার কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ পৌঁছেছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'সাতটি বস্তু হেদায়াত। তন্মধ্যে একটি হলো জামাতের সঙ্গে থাকা। ...সুতরাং

১৩৮০. দেখুন : আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ (২১৪)।
১৩৮১. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (৯৪)।

তোমরা প্রত্যেক শাসকের সঙ্গে জিহাদ করো। তোমাদের শাসকগণ জুলুম করলেও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করো না। তাদের শুদ্ধি ও সুস্থতার জন্য দোয়া করো। প্রবৃত্তিপূজা থেকে বিরত থাকো।' উক্ত হাদিসের যদিও সনদ উল্লেখ করা হয়নি, তবে এর অর্থ বিশুদ্ধ। পাশাপাশি এটাই আহলে সুন্নাতের মাযহাব; হানাফি ইমামদের মাযহাব। বরং আবু হাফস অন্যত্র আরও কঠিন ভাষায় বলেন, "শাসকের আনুগত্য ফরয। অবাধ্যতা কিংবা তরবারি কোনোভাবেই শাসকের বিরুদ্ধে ময়দানে নামা বৈধ নয়। যদি সে ইনসাফ করে, তবে তার প্রতিদান পাবে। আর যদি জুলুম করে, তবে সেটার বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। কিন্তু মুসলমানদের কর্তব্য হলো শাসকের আনুগত্য করা। কেননা, যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য না করে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে খারেজি! স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তার আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ অর্থ : 'হে মুমিনগণ, আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো। আনুগত্য করো রাসুলের এবং তোমাদের মাঝে যারা দায়িত্বশীল তাদের।' [নিসা : ৫৯] এখানে 'দায়িত্বশীল' বলতে শাসক বোঝানো হয়েছে।"[১৩৮২]

○ আবুল লাইস সমরকন্দি বলেন, 'শাসক যদি জালেম হয়, তবুও তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ নয়। কারণ, তাতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, রক্তপাত ঘটে, ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়।'[১৩৮৩]

○ মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখি বলেন, 'শাসক জালেম হলেও তার আনুগত্য করতে হবে।'[১৩৮৪]

○ আবুল ইউসর বাযদাবি বলেন, 'শাসক যদি ফাসেক কিংবা জালেম হয়, তবুও তাকে পদচ্যুত করা বৈধ নয়। এটা আবু হানিফাসহ সকল হানাফির মত। এটাই গ্রহণযোগ্য মত।' বাযদাবি এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বর্ণনা করেন, সামানিয়্যিনের শেষ যুগে বুখারাতে কাদারিয়্যাহ-মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি ব্যাপক বেড়ে যায়। এমনকি মন্ত্রীও তাদের মতাদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়েন। আহলে সুন্নাত তাদের হাতে ব্যাপকভাবে নির্যাতনের শিকার ছিলেন। ঘটনাক্রমে বুখারার আমিরের একজন শিক্ষক ছিলেন আহলে সুন্নাতের। তিনি একদিন আমিরকে

১৩৮২. আস-সাওয়াদুল আজম (৩, ১০, ১৪)।

১৩৮৩. শরহুল ফিকহিল আকবার, সমরকন্দি (২২)।

১৩৮৪. আল-ইতিকাদ, বলখি (১১১)।

বললেন, যেসব লোক নিজেদের কাদারিয়্যাহ বলে দাবি করে, তারা কিন্তু আপনাকে শাসক মনে করে না। আর যারা নিজেদের 'আহলে সুন্নাত' বলে, তারা আপনাকে শাসক মনে করে। তিনি বললেন, কীভাবে? শিক্ষক বললেন, আগামীকাল নিজ চোখে দেখবেন। পরের দিন সেই শিক্ষক রাজকীয় প্রাসাদে আহলে সুন্নাতের আলেমদের দাওয়াত দিলেন। আমিরকে পর্দার আড়ালে বসতে অনুরোধ করলেন। সবাই এলে তিনি তাদের বললেন, যদি শাসক ব্যভিচার করে, জুলুম করে, মদ্যপান করে, বালকদের সাথে থাকে, এ সবকিছু হারাম জানা ও মানা সত্ত্বেও এগুলোতে লিপ্ত থাকে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান কী? আলেমগণ বললেন, না, সেটা করা যাবে না। কিন্তু শাসকের উচিত হলো এগুলো থেকে তাওবা করা। তিনি তাদের বিদায় দিলেন। অতঃপর কাদারিয়্যাহ ও মুতাযিলা আলেমদের ডাকলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, একজন শাসক জোর করে মানুষের সম্পদ দখল করে, ব্যভিচার ও মদ্যপান করে, কিশোরদের সঙ্গে থাকে; তবে এ সবকিছু হারাম জেনেই করে। তার বিধান কী? তার বিরুদ্ধে কি বিদ্রোহ করা যাবে? তারা বলল, হ্যাঁ, তাকে পদচ্যুত করা হবে। বেশ শক্তভাবেই তারা বিদ্রোহ ও পদচ্যুতির কথা বলল। তিনি তাদের বিদায় দিলেন। বিদায়ের পরে আমিরকে বললেন, তাদের কথা শুনেছেন? আমির বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আমির মুতাযিলা ও কাদারিয়্যাহদের মূলোৎপাটনের নির্দেশ দিলেন। একপর্যায়ে বুখারাতে হানাফি (আহলে সুন্নাত ছাড়া) আর কাউকে দেখা গেল না। আমির আহলে সুন্নাতের সবাইকে সম্মানিত করলেন।[১৩৮৫]

○ জামালুদ্দিন আহমদ গযনবি (৫৯৩) বলেন, 'শাসক জুলুম করলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ নয়। জুলুম কিংবা কবিরা গুনাহের কারণে তারা ক্ষমতাচ্যুতও হবে না। জুলুমের কারণে আমরা তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করব না। বরং তাদের শুদ্ধি ও ন্যায়ের জন্য দোয়া করব।'[১৩৮৬]

○ শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি লিখেন, 'আমাদের বিশুদ্ধ মত হলো—জুলুমের কারণে কাযিকে অপসারণ করা হবে না, যদিও অপসারণের উপযুক্ত হয়। কেননা, আমাদের কাছে ফিসক (পাপাচার) প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা নয়। সুতরাং সে পদে অবশিষ্ট থাকার পথে তো প্রতিবন্ধক হতেই

১৩৮৫. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৯৬-১৯৭)।
১৩৮৬. উসুলুদ্দিন, গযনবি (২৮২-২৮৩)।

পারে না...। খুলাফায়ে রাশেদিনের পরে খলিফা, রাজা-বাদশাহ ও বিচারকদের খুব কম লোকই পাপাচার ও জুলুম থেকে দূরে ছিল। ফলে ফাসেক (বা জালেম)-কে শাসক হিসেবে প্রত্যাখ্যান করলে এই পুরো সময় মুসলমানরা শাসকবিহীন ছিল মানতে হবে। অথচ এটা জঘন্য কথা।'।[১৩৮৭]

○ সারাখসি অন্যত্র বলেন, 'যখন মুসলমানদের মাঝে ফেতনা (বিদ্রোহ, যুদ্ধ) ইত্যাদি দেখা দেয়, তখন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো ফেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ ঘরে বসে থাকা। এটা হাসান আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। ...হ্যাঁ, কোথাও যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে, মুসলমানরা তাদের শাসকের পক্ষে থাকে, নিরাপদে থাকে, তখন কোনো মুসলিম সম্প্রদায় যদি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শাসকের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করা আবশ্যক। ...কেননা, তাদের বিদ্রোহটা অন্যায় ও অসৎকাজ। আর অসৎকাজের প্রতিরোধ করা ফরয।'[১৩৮৮]

উপরের কথা ন্যায়নিষ্ঠ শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, এমন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হলে বিদ্রোহীদের বিপক্ষে শাসককে সহায়তা করবে। কিন্তু খোদ শাসক যদি জালেম থাকে আর তার বিরুদ্ধে একদল বিদ্রোহ করে, তখন হানাফি আলেমদের মত হলো, বিদ্রোহীদের পক্ষ নেবে না, জালেমের পক্ষও নেবে না; বরং নিরপেক্ষ থাকবে।[১৩৮৯]

○ 'আল-হাভি'র উদ্ধৃতিতে তাতারখানিয়্যাহতে এসেছে—আহলে সুন্নাতের দশটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে : ...ছয়. শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ না করা।[১৩৯০]

○ কামাল ইবনুল হুমাম লিখেন, 'ন্যায়নিষ্ঠ অবস্থায় শাসক হিসেবে নিয়োজিত হওয়ার পরে যদি কেউ জুলুম করে এবং পাপে লিপ্ত হয়, তবে সে পদচ্যুতির উপযুক্ত হলেও ফেতনার আশঙ্কা থাকলে পদচ্যুত করা হবে না; বরং তার জন্য দোয়া করা আবশ্যক হবে। বিদ্রোহ করা যাবে না। এটা ইমাম আবু হানিফার মাযহাব।'[১৩৯১]

১৩৮৭. আল-মাবসুত, সারাখসি (৯/৮০)।

১৩৮৮. প্রাগুক্ত (১০/১২৪)।

১৩৮৯. দেখুন : ফাতাওয়া সিরাজিয়্যাহ (৩০০)।

১৩৯০. ফাতাওয়া তাতারখানিয়্যাহ (১৮/১৩)। সবগুলো বৈশিষ্ট্য গ্রন্থের শুরুতে দেখুন।

১৩৯১. আল-মুসায়ারাহ (১৭০)।

হ্যাঁ, ফেতনার আশঙ্কা না থাকলে এবং রক্তপাতহীন পদ্ধতিতে জালেমকে সরিয়ে ন্যায়নিষ্ঠ কাউকে নিয়োগের নিশ্চয়তা থাকলে একদল আলেম অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু রক্তপাতহীনভাবে এবং ফেতনা এড়িয়ে এ ধরনের সাফল্য ইতিহাসে কবে কোথায় সম্ভব হয়েছে জানা নেই। হলেও ব্যতিক্রম, যেটা 'কায়েদাহ কুল্লিয়্যাহ' তথা সাধারণ মূলনীতিতে পরিণত হতে পারে না। তাই জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করাই শেষ কথা। বিপরীতে শাসক যদি সুস্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হয়, সুনিশ্চিতভাবে ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদে পরিণত হয়, তার ওপর হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সে মুসলমানদের শাসক থাকার যোগ্যতা হারাবে। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং তাকে হটানোর জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম করা মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব হবে। এটা উলামায়ে ইসলামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

শাসকের সঙ্গে ইমাম আজমের সম্পর্ক

জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিষিদ্ধের অর্থ এই নয় যে, শাসকের দরবারি আলেম হয়ে যেতে হবে, তার সঙ্গে দহরম-মহরম সম্পর্ক গড়তে হবে; বরং আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো, জালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিষেধ হলেও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ অব্যাহত রাখা আবশ্যক। শাসককে নসিহত করা আবশ্যক। অন্যায়ের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ বর্জন করে তাকে সতর্ক করা আবশ্যক।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'কল্যাণকামনা (নসিহতই) দ্বীন।' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কার জন্য? তিনি বললেন, 'আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, রাসুলের জন্য (অর্থাৎ, তাদের নির্দেশ মানা), মুসলিম শাসকের জন্য (তাদের আনুগত্য করা, সৎপরামর্শ দেওয়া) এবং সকল মানুষের জন্য (তাদের কল্যাণকামনা করা)।'[১৩৯২] অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'অতি শীঘ্রই এমন একদল শাসক আসবে, যাদের তোমরা ভালো কাজ করতে দেখবে, মন্দ কাজ করতে দেখবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের মন্দ কাজ ঘৃণা করবে, সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যে প্রতিবাদ করবে, সে (আল্লাহর পাকড়াও থেকে) নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে তাদের মন্দে সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাদের অনুসরণ করবে (সে তাদের পাপের ভাগীদার হবে)।' সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল,

---

১৩৯২. মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ৫৫)। আবু দাউদ (কিতাবুল আদব : ৪৯৪৪)।

আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, 'না। যতক্ষণ পর্যন্ত নামায কায়েম করে।'[১৩৯৩]

ইমাম নিজস্ব সনদে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, 'সর্বোত্তম শহিদ হলেন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। অতঃপর সে ব্যক্তি যে জালেম শাসককে সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে এবং নিহত হয়।'[১৩৯৪]

ইমাম আজম কেবল কথার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং কাজেও পরিণত করেছেন। জীবনভর অন্যায়ের বিরোধিতা করেছেন এবং শাসকগোষ্ঠীর ভুলের কড়া সমালোচনা করেছেন। ফলে যারা শাসকের অন্যায়ের সমালোচনার ক্ষেত্রেও মুখ বন্ধ করে রাখা সালাফের মানহাজ হিসেবে প্রচার করে, তাদের কথা ভিত্তিহীন।

একবার খলিফা মনসুর ফকিহদের একত্র করে বললেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মুসলমানরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বাধ্য। মাওসিলের লোকজন আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; অথচ তারা এখন আমার গভর্নরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তাহলে কি এখন আমার জন্য তাদের রক্ত বৈধ নয়? কেউ কেউ বলল, তারা আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন। আপনি তাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা করতে পারেন। যদি ক্ষমা করেন, তবে আপনি ক্ষমাশীল। আর যদি শাস্তি দেন, তবে তারা সেটার যোগ্য। মনসুর ইমাম আজমের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, শায়খ, আপনার কী মতামত? ইমাম বললেন, 'আমরা খেলাফতের অধীনে আছি। নিরাপত্তার মাঝে আছি। আপনি মুসলমানদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তিনটি কারণ ব্যতীত কোনো মুসলিমের রক্ত ঝরানো বৈধ নয়। সুতরাং আপনি তাদের রক্ত ঝরালে হারাম রক্ত ঝরাবেন। প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করবেন!' তখন মনসুর সবাইকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ইমাম আজম যাওয়ার সময় মনসুর তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'শায়খ, আপনার কথা ঠিক আছে। এবার আপনার শহরে চলে যান। মানুষের কাছে আপনার ইমাম তথা শাসকের বদনাম হয় এমন কিছু বলবেন না। কারণ, তাতে আপনার শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের হস্ত প্রসারিত হবে।'[১৩৯৫]

১৩৯৩. মুসলিম (কিতাবুল ইমারাহ : ১৮৫৪)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুন নিসা : ২৭২২০)।

১৩৯৪. আহকামুল কুরআন (১/৮৬)।

১৩৯৫. দেখুন : আখবারু আবি হানিফা (৬৮-৬৯)। মানাকিব, বাযযাযি (২৯৬-২৯৭)।

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধের পরিধি ইমাম আজমের কাছে অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইমাম আজম রহ. মনে করতেন, যদি কেউ বৈধ শাসককে গালিগালাজ করে কিংবা তাকে হত্যার কথা বলে, তবুও শাসকের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া বৈধ নয়। এক্ষেত্রে তিনি আলি রাযি.-এর ঘটনা দলিল হিসেবে পেশ করতেন। তাকে কিছু ব্যক্তি গালি দিত। তাদের একজন আলিকে হত্যা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। তাকে আলি রাযি.-এর কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন, তাকে ছেড়ে দাও। একলোক বলল, তাকে কীভাবে ছেড়ে দেবো? সে আপনাকে হত্যা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আলি বললেন, সে তো আমাকে হত্যা করেনি। তাহলে তাকে কেন হত্যা করব? লোকটি বলল, সে আপনাকে গালি দিয়েছে। আলি বললেন, তুমিও তাকে গালি দিয়ে দাও অথবা তার পথ ছেড়ে দাও। এ ঘটনার উপর ভিত্তি করে ইমাম আজম বলতেন, শাসকের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করার আগ পর্যন্ত শাসকের জন্য কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়। শাস্তি দেওয়াও বৈধ নয়। হ্যাঁ, যদি বিদ্রোহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, তখন তাদের ধরে বন্দি করতে পারে, যাতে বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়, ফেতনা সৃষ্টি না হয়।[১৩৯৬]

উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ ও প্রতিহত করতে হবে, সেটা যে কারও অন্যায় হোক। অন্যায়কারী শাসক, তাই মুখ বুজে সহ্য করতে হবে, গোপন নসিহতের পরামর্শ দিয়ে প্রকাশ্যে তার আনুগত্যের কোরাস গাইতে হবে—এটা ইমাম আজম কিংবা সালাফের কারও মানহাজ নয়। ইমাম বলেন, 'আমি গত পঞ্চাশ বছর ধরে প্রত্যেক নামাযের পর আল্লাহর কাছে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের ক্ষেত্রে আমার ত্রুটির কারণে ইস্তিগফার করি!'[১৩৯৭]

পিছনেও আমরা উল্লেখ করেছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইমামের সরব কণ্ঠের কারণে জীবনের শেষ দিনগুলোতে শাসকরা তাকে জেলে বন্দি করে রাখে। পরবর্তীকালে জেল থেকে ছাড়লেও গৃহবন্দি করে রাখে। মানুষের সঙ্গে মিশতে, কথা বলতে এবং ছাত্রদের পাঠদান করতে নিষেধ করে। বরং ঘর থেকে বের

১৩৯৬. দেখুন : আল-আসল, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (৭/৫১২)। আল-মাবসুত, সারাখসি (১০/১২৫)।
১৩৯৭. মানাকিব, মক্কি (৩৪২)।

হওয়ার উপরও নিষেধাজ্ঞা আসে। এভাবেই একসময় তিনি দুনিয়া থেকে মজলুম ও শহিদ হিসেবে বিদায় নেন।[১৩৯৮]

ফলে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার অর্থ এই নয় যে, শাসকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়তে হবে। বরং আমরা ইমাম আজম রহ.-কে সারা জীবন শাসকের দরবার থেকে দূরে পালিয়ে থাকতে দেখব। তাঁর মাঝে এবং শাসকদের মাঝে একটা অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর দেখব। বিদ্রোহ না করলেও তাদের প্রতি সবসময় তাকে বিরূপ ও বিরাগভাজনই দেখব। এ কারণে খুব সম্ভবত তার থেকে নিরাপদ থাকার জন্যই শাসকগোষ্ঠী কৌশল হিসেবে তাকে সবসময় রাষ্ট্রের যেকোনো দায়িত্ব দিতে চেয়েছে, আর তিনিও সেটা প্রত্যাখ্যান করে গেছেন। বরং দেখব, তিনি বলছেন, **'যদি তারা একটি মসজিদ বানাতে চায় আর আমাকে সে মসজিদের ইট গোনার দায়িত্ব দেয়, আমি সেটাও করব না।'**[১৩৯৯]

আবু জাফর মনসুর তাঁকে কাযির দায়িত্ব নিতে বললে তিনি বললেন, 'আমি কাযির দায়িত্বের যোগ্য নই।' খলিফা বললেন, আপনি এর যোগ্য। ইমাম বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন, আমি বললাম যোগ্য নই, আপনি বলছেন যোগ্য। এর মানে আমি মিথ্যা বলেছি। আর মিথ্যুক কাযির দায়িত্বের যোগ্য নয়!' খলিফা ক্রুদ্ধ হন। ইমামকে শাস্তির নির্দেশ দেন। তাঁকে বেত্রাঘাত করা হয়।[১৪০০]

বাযযাযির বর্ণনায় এসেছে, (সর্বশেষ উমাইয়া শাসক মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদের ইরাকের গভর্নর) ইবনে হুবাইরা যখন তাঁকে সরকারি দায়িত্ব দিতে চায়, তিনি বলেন, যদি তারা আমাকে ওয়াসেতের মসজিদের দরজা গোনার দায়িত্ব দেয়, সেটাও করব না। তাহলে মানুষ হত্যার দায়িত্ব নেব কী করে? এভাবে শাসকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণে তিনি বেত্রাঘাতের শিকার হন। তবুও সেটা গ্রহণ করেননি।[১৪০১]

১৩৯৮. মানাকিব, বাযযাযি (২৯৯)।

১৩৯৯. আল-কাশশাফ (১/১৮৪)।

১৪০০. মানাকিব, মক্কি (৪৩৮)।

১৪০১. দেখুন : ফাযায়িলু আবি হানিফা (৬৬)। বাযযাযি (২৭৫-২৭৬)।

ইমাম আজম রহ.-এর এ শক্ত নীতির কারণে হানাফি ফিকহের গ্রন্থগুলোতে শাসকদের থেকে হাদিয়া গ্রহণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে।[১৪০২]

ইমাম কেন শাসকের কাছে যেতেন না? বিভিন্ন কারণ ছিল। তন্মধ্যে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বড় কারণ ছিল আখেরাতের ভয়; শাসকদের জুলুমে যেকোনো প্রকারের সহায়তা হয়ে গেলে পরকাল বরবাদির আশঙ্কা। এ আশঙ্কা থেকেই তিনি শাসকের দরবার থেকে জীবনভর দূরে থেকেছেন এবং বিভিন্ন মুসিবত সহ্য করেছেন, তবুও তাদের দেওয়া কোনো পদ গ্রহণ করেননি। ইমাম আজম হাসান বসরি সূত্রে আবু যর রাযি.-এর হাদিস বর্ণনা করেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আবু যর, নেতৃত্ব কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা ও লজ্জার কারণ হবে।'[১৪০৩] এমন হাদিস জানার পর তিনি এর ধারেকাছেও আসবেন না এটাই তো স্বাভাবিক।

কেবল নিজে নন, ইমাম আজম তাঁর শাগরেদদেরও শাসক থেকে দূরে থাকতে বলতেন। তাদের সঙ্গে সতর্কতামূলক সম্পর্ক রাখতে বলতেন, যে সম্পর্কের মূলনীতি হলো মধ্যমপন্থা। ইমাম আজম তাঁর শাগরেদ আবু ইউসুফকে প্রদত্ত ওসিয়তে বলেন, **'ইয়াকুব, শাসককে সম্মান করো। তার সামনে মিথ্যা বলো না। তার দরবারে বেশি যেয়ো না। প্রয়োজন ছাড়া তার কাছে হাজির হয়ো না। কারণ, যখন শাসকের কাছে বেশি যাবে, তার চোখে তোমার সম্মান পড়ে যাবে, মর্যাদা হ্রাস পাবে। ফলে শাসকের সঙ্গে আগুনের সম্পর্ক রাখবে—তার থেকে উপকৃত হবে, কিন্তু দূরে থাকবে। কাছে গেলে পুড়ে যাবে।'**[১৪০৪]

বরং নসিহত করতে গিয়েও শাসকের মনস্তত্ত্ব পড়ার ক্ষেত্রে ইমাম আজম রহ. দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি আবু ইউসুফকে বলেন, **'যদি শাসকের মাঝে এমন কোনো বিষয় দেখো যা জ্ঞান (তথা কুরআন-সুন্নাহ)-এর বিপরীত, তবে আনুগত্য প্রকাশের সঙ্গে তাকে বোঝাবে। কারণ, তার হাত তোমার হাতের চেয়ে শক্তিশালী। তাকে বলবে, আমি আপনার অনুগত, কিন্তু আপনার এ কাজ কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে যায় না। এভাবে একবার তাকে বলে দেওয়াই যথেষ্ট, বেশি নয়। কারণ, বেশি বলতে গেলে তারা তোমাকে শেষ করে দেবে। আর তুমি শেষ হয়ে গেলে দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ...তবে প্রথমবার বলার পরও যদি তাকে একই কাজ**

১৪০২. ফাতাওয়া তাতারখানিয়্যাহ (১৮/১৭২)।
১৪০৩. আল-আসার, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (হাদিস নং : ৯১২)।
১৪০৪. মানাকিব, মক্কি (৩৭১)।

করতে দেখো, চাইলে গোপনে তার কাছে গিয়ে নিভৃতে তাকে বোঝাতে পারো, নসিহত করতে পারো; তার সামনে কুরআন-সুন্নাহ তুলে ধরতে পারো। যদি গ্রহণ করে, তবে তো ভালো। আর গ্রহণ না করলে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে যেন তিনি তোমাকে জালেমের জুলুম থেকে রক্ষা করেন। ...সুলতানের কাছাকাছি কখনো ঘর বানাবে না।'[১৪০৫]

ইমামের শাগরেদদের শাসকের সঙ্গে সম্পর্ক

তবে ইমামের শাগরেদদের সবার মাঝে এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি। ইমাম রহ. যেখান শাসকের কাছ থেকে দূরে থাকতে গিয়ে নিজের জান কুরবান করে দিয়েছেন, তাঁর শাগরেদগণ সময়ের পরিবর্তনে শাসকদের দরবারে গিয়েছেন, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেছেন এবং বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যেমন—আবু ইউসুফ রহ. কাযির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একপর্যায়ে রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতিতে পরিণত হন। একইভাবে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানিও হারুনুর রশিদের কাযি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যুফার সম্পর্কেও ইবনে আবদিল বার বসরার কাযির দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলেছেন।[১৪০৬] একইভাবে হাফস ইবনে গিয়াস, হাসান ইবনে যিয়াদ প্রমুখও কাযির দায়িত্ব পালন করেন, শাসকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখেন। রমযানসহ বিভিন্ন রাতে তারা শাসকদের সঙ্গে মিলিত হতেন; ইলম ও দ্বীনি-দুনিয়াবি আলাপ করতেন; যুবরাজদের তালিম দিতেন।[১৪০৭]

এর কারণ হলো—ইমাম নিজে এ দায়িত্ব গ্রহণ না করলেও তিনি এটাকে অবৈধ মনে করতেন এমন নয়। বরং নিজের দুনিয়া ও আখেরাতের কথা চিন্তা করে নিজে দূরে থেকেছেন। তথাপি ঈমানি ফারাসাত ও কারামতের মাধ্যমে হয়তো বুঝেছিলেন তাঁর ছাত্ররা ভবিষ্যতে এ দায়িত্বে যাবে। ফলে তিনি বিভিন্ন জায়গায় বারবার তাদের সতর্ক করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন।

ইমামের ছাত্র নুহ ইবনে আবু মারইয়াম মারভের কাযির দায়িত্ব পেলে ইমাম তাকে চিঠিতে বলেন, **'এমন এক দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছ, বড়রাও যা বহন করতে পারে না। তুমি সাগরে নিমজ্জিত ব্যক্তির মতো। ফলে সেখান থেকে বের**

১৪০৫. মানাকিব, মক্কি (৩৭৫)

১৪০৬. আল-ইনতিকা (৩৩৫)।

১৪০৭. আখবারু আবি হানিফাহ ওয়া আসহাবিহি (১৩৭)।

হওয়ার চেষ্টা করো। আল্লাহ ভয় করো। কারণ, সেটাই সবকিছুর মূল, দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি।' অতঃপর ইমাম তাকে বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করেন, যা রাজনীতির ময়দানে ইমামের গভীর পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতার প্রমাণ, যে মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অধিকাংশ কাযিই গাফেল।[১৪০৮]

আবু ইউসুফ রহ. বর্ণনা করেন, বৃষ্টিভেজা এক দিনে আমরা ইমাম আজমের সঙ্গে ছিলাম। সেখানে দাউদ আত-তায়ি, ওয়াকি ইবনুল জাররাহ, আফিয়াহ আওদি, কাসেম ইবনে মা'ন, হাফস ইবনে গিয়াস, মালেক ইবনে মাগুল, যুফার ইবনুল হুযাইল প্রমুখ বিশিষ্ট শাগরেদগণ ছিলেন। ইমাম আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা আমার হৃদয়ের শান্তি, আমার দুঃখ-বেদনা দূরীভূতকারী। তোমাদের জন্য আমি ফিকহের হাওদা সাজিয়ে দিয়েছি। চাইলে তোমরা তাতে আরোহণ করতে পারো। মানুষ তোমাদের দরবারে ছুটে আসবে, তোমাদের চৌকাঠ মাড়াবে, তোমাদের মুখের কথা শুনতে চাইবে। তোমাদের প্রত্যেকেই কাযির পদের উপযুক্ত। তাই আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদের কাছে দাবি রইল—তোমরা ইলমকে লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করো। তোমাদের কেউ যদি কাযির দায়িত্ব গ্রহণের মতো মুসিবতে আক্রান্ত হয়, আর যদি এমন কিছুতে লিপ্ত দেখে নিজেকে, যা আল্লাহ হয়তো গোপন করে রেখেছেন, তবে তার জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ নয়। এখান থেকে প্রাপ্ত রিযিক পবিত্র নয়। আর যদি ভিতরের অবস্থা বাইরের অবস্থার মতো (অমলিন) থাকে, তবে এমন ব্যক্তির কাযির দায়িত্ব বৈধ হবে। তার উপার্জন পবিত্র হবে। যদি কেউ নিরুপায় হয়ে কাযির দায়িত্ব নেয়, তবে সে যেন তার মাঝে আর মানুষের মাঝে পর্দা দাঁড় না করায়। জামে মসজিদে যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। প্রত্যেক নামাযের সময় যেন মানুষের প্রয়োজনের কথা জানতে চায়। ইশার নামাযের পরে যেন তিনবার ডেকে বলে, কারও কোনো প্রয়োজন আছে? এর পর যেন ঘরে যায়।'[১৪০৯]

ইমামের শাগরেদগণ এসব নসিহত জীবনভর মনে রেখেছেন এবং মেনে চলেছেন। ফলে তারা শাসকের বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তাতে মুসলিম উম্মাহ উপকৃত বই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তারাও ঈমান ও ইখলাসের পথ থেকে, ন্যায় ও ইনসাফের পথ থেকে হটে যাননি।

১৪০৮. বিস্তারিত দেখুন : মানাকিব, মক্কি (৩৬৮-৩৬৯)।
১৪০৯. দেখুন : ফাযায়িলু আবি হানিফা (৭১-৭২)। মানাকিব, মক্কি (৩৫৯-৩৬০)। বাযযাযি (৩৫৫)।

কিন্তু বাস্তবতা হলো—পথটা ভয়ংকর, চড়াই-উতরাইয়ে ভরা। তারা হয়তো তাদের পাহাড়সম ইখলাস, সাগরসম ইলম এবং ইমামের হাতে তরবিয়তের কারণে দুনিয়ায় ঢোকার পরও স্বচ্ছতা ও নির্মলতাসহ বেরিয়ে আসতে পেরেছেন; কিন্তু সেটা সবার দ্বারা সম্ভব হবে না। পরবর্তী লোকদের দ্বারা বরং বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ জন্য আমাদের ইমামদের সর্বসম্মত বক্তব্য হলো শাসকের দরবার থেকে দূরে থাকা।[১৪১০] বরং খোদ ইমাম আবু ইউসুফ রহ. যার ব্যাপারে বর্ণিত আছে- প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের পরও প্রতিদিন দুইশত রাকাত নফল নামায আদায় করতেন, তিনি আখেরাতের ভয়ে মৃত্যুর আগে আফসোস করে বলেন, **'হায়! আমি যদি কাযির দায়িত্ব গ্রহণ না করতাম।'**[১৪১১]

ওয়ালা ওয়াল বারা (আল্লাহর জন্য শত্রুতা-মিত্রতা)

এটা ইসলামি আকিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশ্বাসের প্রায়োগিক উদাহরণ। ইসলামি আকিদা স্রেফ কিছু অদৃশ্য বিশ্বাস কিংবা মুখের বুলি নয়, বরং কাজে পরিণত এবং জীবনে বাস্তবায়িত করার বিষয়। ইসলামি শরিয়াহ কেবল আল্লাহ ও বান্দার মাঝের কিছু ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়। বরং আকাশের সঙ্গে সম্পর্ক নির্মাণের পাশাপাশি যমিনের সঙ্গে সম্পর্ক কীরূপ হবে, ইসলাম সেটাও পুঙ্খানুপুঙ্খ বলে দিয়েছে। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের পাশাপাশি মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক কীরূপ হবে ইসলাম সেটা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাই মুসলিম দাবি করে যেমন খুশি চলা যাবে না, যাকে ইচ্ছা পছন্দ করা যাবে না, যার সঙ্গে মন চায় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়া যাবে না, যাকে-তাকে ভালোবাসা যাবে না। পার্থিব স্বার্থকে বন্ধুত্ব ও দুশমনি এবং শত্রুতা-মিত্রতার মানদণ্ড বানানো যাবে না। বরং এই সকল বিষয় সম্পাদিত হবে তাওহিদের মানদণ্ডে এবং আকিদার ভিত্তিতে। কুরআন-সুন্নাহ আপনাকে বলে দেবে কার সঙ্গে ভালোবাসা থাকবে আর কার সঙ্গে বিরোধ থাকবে। শরিয়াহ নির্ধারণ করে দেবে কার সঙ্গে শত্রুতা থাকবে আর কার সঙ্গে মিত্রতা। এটার নাম 'ওয়ালা-বারা।' দ্বীনের জন্য শত্রুতা এবং দ্বীনের জন্য মিত্রতা। এটার নাম 'আল-হুব্ব ফিল্লাহ ওয়াল বুগজ ফিল্লাহ'—আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা।

১৪১০. বিস্তারিত দেখুন ইমাম আবু বকর মারুযিকৃত এবং অধম অনূদিত 'সালাফের দরবারবিমুখতা' গ্রন্থে।
১৪১১. মানাকিব, মক্কি (৪৮৯, ৫০৩)।

আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ অর্থ : 'হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।' [মায়িদা : ৫১] বিপরীতে বলেন, ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ অর্থ : 'মুমিন নর এবং মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু।' [তাওবা : ৭১] আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য শত্রুতা।'[১৪১২]

একজন প্রকৃত মুমিনের জন্য ওয়ালা-বারার এই আদর্শ থেকে বিমুখ হওয়ার সুযোগ নেই; এড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই। এ জন্য ইমাম আজম রহ. এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আহলে সুন্নাতের সকল ইমাম তাদের আকিদার গ্রন্থে এ দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

ইমাম আজম রহ. বলেন, **'ওয়ালা' অর্থ ভালো কাজে সন্তোষ প্রকাশ করা, সমর্থন করা। আর 'বারা' অর্থ মন্দ কাজে বিরোধিতা করা, অসন্তোষ প্রকাশ করা। ব্যক্তিভেদে ওয়ালা ও বারার তিন অবস্থা। এক. কেবল ওয়ালা। এটা হচ্ছে সৎকর্মশীল মুমিনের সঙ্গে, যে সকল ভালো কাজ করে, মন্দ ও পাপ থেকে দূরে থাকে। এমন ব্যক্তিকে কেবল ভালোবাসতে হবে। ঘৃণা কিংবা সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। দুই. কেবল বারা। কাফের ব্যক্তির সঙ্গে। তার বিরোধিতা করবে। তার প্রতি বিদ্বেষ রাখবে। তিন. ওয়ালা-বারার সমন্বয়। এটা গুনাহগার মুমিনের সঙ্গে। তার ভালো কাজে তাকে ভালোবাসবে এবং সমর্থন করবে, আর খারাপ কাজে তার বিরোধিতা করবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এমন ব্যক্তির সঙ্গে অবস্থাভেদে ওয়ালা এবং বারা দুটোই প্রয়োগ করবে।**[১৪১৩]

এটা ওয়ালা-বারা ও শত্রুতা-মিত্রতা বাস্তবায়নের বিশাল মূলনীতির আদর্শ সারসংক্ষেপ। ইমাম আজম রহ. এই কটা লাইনে হাজার পৃষ্ঠার আলোচনা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এ যেন শিশির মাঝে সমুদ্র সংরক্ষণ। অর্থাৎ, ওয়ালা-বারার ক্ষেত্রে মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে।

১৪১২. আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৫৯৯)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুল আনসার : ২১৬৯৮)।

১৪১৩. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (৩২)।

এক. স্রেফ বারা বা শত্রুতা। এটা হবে ইহুদি-খ্রিষ্টানসহ সকল কাফের-মুশরিক এবং যারা তাদের বিধানভুক্ত তাদের সঙ্গে। যেমন—বাতেনি, কাদিয়ানি এবং চরমপন্থি রাফেযি সম্প্রদায় ইত্যাদি। তাদের প্রতি কোনো ভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তরিক সম্পর্ক থাকবে না। প্রয়োজন অনুপাতে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক থাকবে এবং মানবিক সদাচরণ ও সৌজন্য প্রদর্শন করা হবে। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে বলেন, ﴿لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ অর্থ : 'মুমিনগণ যেন মুমিনকে ছেড়ে কোনো কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।' [আলে ইমরান : ২৮] কাফেরের সঙ্গে 'ওয়ালা' গড়ার কঠোর নিন্দা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ۝٨٠ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝٨١﴾ অর্থ : 'আপনি তাদের অনেককে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়তে দেখবেন। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম, যে কারণে তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে! যদি তারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই পাপাচারী।' [মায়িদা : ৮০-৮১] এখানে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা 'ওয়ালা-বারা'কে ঈমানের নিদর্শন বানিয়েছেন এবং কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা মুমিনের কাজ নয় বলেছেন।

দুই. স্রেফ ওয়ালা বা বন্ধুত্ব। এটা আহলে সুন্নাতের অনুসারী সকল মুসলিমের প্রতি প্রকাশ করতে হবে। শাখাগত বিষয় নিয়ে মারামারি করা যাবে না। দ্বীনি ও দুনিয়াবি সকল কাজে একে অন্যের সহায়ক ও পরিপূরক হতে হবে। ভাই-ভাই হয়ে অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। বিশুদ্ধ দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ অর্থ : 'মুমিন নর ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজের নিষেধ করে। নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। এদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [তাওবা : ৭১] আরও বলেন, ﴿إِنَّمَا

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ﴾ অর্থ : 'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনগণ, যারা বিনত হয়ে নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়।' [মায়িদা : ৫৫]

এ ব্যাপারে ইমাম আজম রহ. বলেন, **রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বিচ্ছিন্নতা দূর করে ঐক্যের জন্য এবং মানুষের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ও বন্ধন বৃদ্ধির জন্য এসেছেন। বিচ্ছিন্নতা কিংবা মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়ার জন্য আসেননি।**[১৪১৪]

তিন. ওয়ালা ও বারার সমন্বয়। এটা হলো আহলে বিদআত তথা মুসলমানদের মাঝে বিদআতে লিপ্ত বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে। তাদের ভালো কাজে সহায়তা করতে হবে, মন্দ কাজে সহায়তা পরিত্যাগ করা হবে; দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব সুরক্ষিত রাখা হবে।

কেবল মুখে নয়, বাস্তব জীবনে এসব নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। ইমাম আজম রহ. এগুলো বাস্তবায়ন করতেন। ইয়াহইয়া ইবনে নসর মারওয়াযি বলেন, 'আবু হানিফা ছিলেন একজন ইনসাফগার মানুষ। তিনি অধিক সময় নীরব থাকতেন। প্রশ্ন না করলে কথা বলতেন না। মুনাযারার সময় তিনি রাগ করতেন না। আমানতদারির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন। তার শত্রু-মিত্র ও পক্ষ-বিপক্ষের যে-কেউ তার কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পরামর্শ দিতেন। তিনি ছিলেন তার যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। ...তিনি আহলে কিবলার ব্যাপারে সর্বোত্তম কথা বলতেন।[১৪১৫]

সুতরাং ভালোর সমর্থন এবং মন্দের উৎপাটন করে যেতেই হবে। হককে হক এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে প্রমাণ করতে হবে। তহাবি রহ. বলেন, 'আমরা সুন্নাত এবং জামাতের অনুসরণ করি। বিচ্ছিন্নতা, মতানৈক্য ও বিভেদ এড়িয়ে চলি। ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্তদের আমরা পছন্দ করি। উৎপীড়ক ও খেয়ানতকারীদের ঘৃণা করি।'[১৪১৬]

১৪১৪. প্রাগুক্ত (১১)।
১৪১৫. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৫৭)।
১৪১৬. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৪)।

বিদআতিদের পিছনে নামায বর্জন

ওয়ালা-বারার আরেকটি বাস্তবায়ন হলো বিদআতি সম্প্রদায়ের পিছনে নামায বর্জন করা এবং আহলে সুন্নাতের পিছনে নামায পড়া। এটা ওয়ালা-বারার তৃতীয় প্রকারের একটি বিশেষ বাস্তবায়ন। বিদআতি সম্প্রদায়গুলোর প্রতি সতর্কবার্তা। তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা। এতে তাদের বিদআত প্রচারে অসহায়তা হবে। এ ধরনের উদ্যোগ তাদের বিদআত থেকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবু হানিফা রহ. বিদআতিদের পিছনে নামায পড়া মাকরুহ বলতেন।'[১৪১৭]

তবে এটা স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। অর্থাৎ, স্বাভাবিক অবস্থায় ফাসেক বা গুনাহগার মুসলমানের পিছনে নামায পড়া হবে। এতে নামাযের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আকিদাগত বিচ্যুতির শিকার ভয়ংকর বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি, যার ঈমান থেকে বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং যে তার বিভ্রান্ত আকিদার দিকে মানুষকে ডাকে, এমন ব্যক্তির পিছনে নামায পরিত্যাগ করতে হবে। তাকে কোনো জায়গায় সামনে দেওয়া হবে না এবং মুসলমানদের ইমাম বানানো হবে না। আবু ইউসুফ বর্ণনা করেন, ইমাম আজম বলেছেন, **'জাহমিয়্যাহ, কাদারিয়্যাহ ও রাফেযি সম্প্রদায়ের পিছনে নামায পড়া যাবে না।'**[১৪১৮]

আবু ইউসুফও এটা করতেন। লালাকায়ি আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, আবু ইউসুফ বলেন, 'আমি জাহমি, রাফেযি ও কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের লোকদের পিছনে নামায পড়ি না।'[১৪১৯]

মুহাম্মাদ রহ. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলে, তার পিছনে নামায পড়া যাবে না। যদি কেউ পড়ে, তবে নামায আবার পড়তে হবে।'[১৪২০]

আবু হাফস বলেন, 'আমরা প্রত্যেক সৎ ও অসৎ ব্যক্তির পিছনে নামায আদায় বৈধ মনে করি। ফলে মদ্যপ, ব্যভিচারী ইত্যাদির মতো ফাসেকের পিছনে নামায আদায় বৈধ। কিন্তু বিদআতি ও কাফেরের পিছনে বৈধ নয়।'[১৪২১] কারণ,

---

১৪১৭. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৬৫)।

১৪১৮. প্রাগুক্ত (১৬৫)।

১৪১৯. শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৪/৮০৯)।

১৪২০. উসুলুদ্দিন, বাগদাদি (৩৪২)।

১৪২১. আস-সাওয়াদুল আজম (৮)।

এটা তাদের বিদআত প্রচারে সহায়ক হয়, তাদের সম্মান করা হয়, গোনায় ধরা হয়। অথচ বিদআতি লোকদের সম্মান করা সুন্নাত এবং আহলে সুন্নাতের প্রতি অবিচার।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। সেটা হলো—আল্লাহ এবং আল্লাহর সিফাত নিয়ে অর্থহীন ও বাড়াবাড়িমূলক বিতর্ক করাও এক ধরনের বিদআত। সুতরাং এ ধরনের চরমপন্থি লোকদের পিছনেও নামায পড়া বর্জন করতে হবে। আবু ইউসুফ রহ. বর্ণনা করেন, আমরা আবু হানিফা রহ.-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় একদল লোক দুই ব্যক্তিকে নিয়ে এলো। এসে বলল, এই ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলে। দ্বিতীয় জন তাকে নিষেধ করে বলে, কুরআন মাখলুক নয় (আমরা তাদের ব্যাপারে কী করব?)। ইমাম বললেন, **'তাদের কারও পিছনে নামায পড়ো না।'** আমি বললাম, প্রথম জনের ব্যাপার তো স্পষ্ট। কারণ, সে কুরআনকে মাখলুক বলে। কিন্তু দ্বিতীয়জনের পিছনে নামায বাদ দেওয়ার কারণ কী? তার কথা তো ঠিকই আছে? ইমাম বললেন, **'কারণ, তারা দ্বীন নিয়ে বিবাদ করেছে। অথচ দ্বীন নিয়ে বিবাদ বিদআত।'**[১৪২২]

উক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন নামধারী ব্যক্তি, যারা মুসলিম সমাজে দীনের নানা বিষয় নিয়ে ফেতনা তৈরি করে, তাদের বিদআতি গণ্য করে তাদের পিছনে শাস্তিস্বরূপ নামায বর্জন করা হবে। উম্মাহর সম্মানিত আলেমসমাজের সামনে এসব লোককে ইমাম বানানো হবে না, যেমনটা ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, 'বিদআতি লোক মুসলমানদের ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়।'[১৪২৩]

উলামায়ে কেরামের প্রতি ইমাম সুবকির আকুল আবেদন : বিপরীতে আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ধারার মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগত মতপার্থক্যের কারণে একদল আরেক দলকে বিদআতি আখ্যা দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্নকরণ এবং একে অন্যের পিছনে নামায পরিত্যাগ অবৈধ। এটা ইসলামের 'ওয়ালা' নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বরং এ ধরনের গোঁড়ামিপূর্ণ মানসিকতা ওয়ালা-বারার গোটা রূপরেখাই উলটে দেয়। অভিন্ন শত্রু ছেড়ে মুসলমানদের নিজেদের পিছনে লাগিয়ে দেয়। মুসলিমদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। ইসলামের সর্বসম্মত মৌলিক বিষয়ের ঐক্যগুলোকে পাশে রেখে নিতান্তই তুচ্ছ ও গৌণ বিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলিম

১৪২২. তালবিসুল আদিল্লাহ, সাফফার (৫৬)।

১৪২৩. আল-ইত্তিকাদ, নিশাপুরি (১৬৭)।

উম্মাহকে এক অন্তহীন আত্মঘাতী ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত করে। দুঃখজনকভাবে সেটাই আজ চলছে আমাদের চারপাশে। আরও দুঃখজনক হলো, মুসলমানদের এই দুরবস্থা নতুন নয়, বরং হাজার বছর ধরে তারা এমন বিভক্ত। অমুসলিমদের হাতে এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হওয়ার পরও তারা তাদের মধ্যকার সম্পর্ক এতটুকু ঠিক করেনি এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেনি।

ইমাম তাজুদ্দিন সুবকি (৭৭১ হি.) সেই অষ্টম শতাব্দের মুসলিমসমাজের প্রতি লক্ষ করে বুকভরা আফসোস নিয়ে বলেন:

'শাখাগত বিষয় নিয়ে একে অন্যের পিছনে লাগা এবং মতাদর্শিক গোঁড়ামির ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে একে অন্যের পিছনে নামায পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কদর্য কাজ। তারা আল্লাহর কাছে জবাব দেবে কীভাবে? যদি শাফেয়ি ও আবু হানিফা জীবিত থাকতেন, তারাও তাদের কঠোরভাবে ধমকাতেন। কারণ, এগুলো করার কোনো দরকার নেই। শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য পাশে রেখে দিলেই চলে। এক্ষেত্রে যিনি সঠিক করেছেন, তিনি দুটো পুণ্য পাবেন। আর যিনি ভুল করেছেন, তিনি একটি পাবেন। ফলে শাখাগত মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোকে এভাবেই রেখে দিয়ে আহলে বিদআত ও প্রবৃত্তিপূজারীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি, হাম্বলি—সবাই আকিদার ক্ষেত্রে এক, আলহামদুলিল্লাহ। সামান্য কিছু বিচ্যুত লোক ব্যতীত তাদের সকলেই আহলে সুন্নাতের অনুসারী...।'

'সুতরাং হে মুসলমান, সকলে মিলে প্রবৃত্তিপূজারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো। ইসলামের সুরক্ষা নিশ্চিত করো। যারা আবু বকর ও উমরকে গালি দেয়, আয়েশাকে অপবাদ দেয়, কুরআন এবং আল্লাহর সিফাতের সমালোচনা করে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আবশ্যক। সুতরাং এদিকে মনোযোগী হও। ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা গোটা দুনিয়া দখল করে ফেলছে। তাদের সঙ্গে মুনাযারা এবং তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে কে প্রস্তুত আছ? বরং ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের তোমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছ, তাদের থেকে চিকিৎসা নিচ্ছ, সেবা নিচ্ছ। আজ পর্যন্ত কাউকে দেখিনি তাদের সঙ্গে কিছু সময় বসে কেউ দ্বীনের কথা বলছে এবং হেদায়াতের পথে ডাকছে। আমাদের এই দেশ আলেম-উলামা দিয়ে পরিপূর্ণ, অথচ কখনো কোনো আলেমকে দেখিনি কোনো অমুসলিমকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে। তাদের যারা ইসলাম গ্রহণ করছে, স্রেফ আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে অথবা দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে করছে। সেখানে অন্য কারও ভূমিকা

নেই। বরং ইসলাম গ্রহণ করার পরও আলেমরা তাদের পাত্তা দিচ্ছে না, দ্বীন শেখাচ্ছে না। ফলে তাদের চলাচল দেখে বোঝার উপায় নেই যে, তারা কি আসলেই ইসলামে প্রবেশ করেছে, নাকি আগের ধর্মেই রয়ে গেছে...।'

'সুতরাং হে আলেমসমাজ, এখানে মেহনত করুন। এখানে সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করুন। এখানে জিহাদ করুন। ক্রোধ দেখাতে হলে এখানে দেখান। কিন্তু সেটা না করে ইসলামের শাখাগত বিষয়ে গোঁড়ামি, মাযহাব-মাসলাক নিয়ে মারামারি ও রেষারেষি আল্লাহর কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ জীবিত থাকতেন আর এমন দৃশ্য দেখতেন, তবে অত্যন্ত কঠোরভাবে বারণ করতেন। ...এগুলো বাদ দিন! আপনারা নামাযের শাখাগত মাসআলা নিয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন, অথচ যারা নামায ছেড়ে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো সাড়াশব্দ নেই। ইন্নালিল্লাহ! হে মুসলমান, এটা কোন্ ধরনের ফিকহচর্চা? এটা কোন্ ধরনের দ্বীনদারি? শাখাগত এসব বিষয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের শেষ নেই আপনাদের। অথচ সর্বসম্মত নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কারও কোনো টুঁ শব্দ নেই! এখানে দ্বীনের জন্য কারও গাইরত জাগে না। গাইরত জাগে স্রেফ নিজ নিজ মতাদর্শ এবং মতাদর্শের আলেমদের জন্য। এভাবেই মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত হচ্ছে।'[১৪২৪]

আহ! প্রায় সাত শত বছর পার হয়ে গেল! মুসলিম সমাজের চিত্র একচুল পরিমাণ বদলাল না। সুবকির আহ্বান কারও কর্ণকুহরে আঘাত হানতে পারল না! আল্লাহর পানাহ চাই।

১৪২৪. মুঈদুন নিআম ওয়া মুবিদুন নিকাম, সুবকি (৬২-৬৪)।

সাহাবায়ে কেরাম-সম্পর্কিত আকিদা

সাহাবার পরিচয়

আরবি শব্দ 'সাহাবি' (الصحابي)-এর অর্থ হলো সঙ্গী, সহচর। বহুবচন 'সাহাবা', 'আসহাব।' রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গীসহচরদের 'সাহাবা' বলা হয়। অর্থাৎ, যিনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর জীবদ্দশায় দেখেছেন, তাঁর উপর ঈমান এনেছেন এবং সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি সাহাবি। তবে এই দেখাটা চর্মচক্ষুতে হওয়া জরুরি নয়, বরং যিনি অন্ধ অবস্থায় রাসুলুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুমিন হয়েছেন অথবা মুমিন অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছেন, তিনিও সাহাবি। লম্বা সময় রাসুলুল্লাহর সান্নিধ্যে থাকা জরুরি নয়, তাঁর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করা শর্ত নয়, তাঁর মজলিসে বসা আবশ্যক নয়; বরং মুমিন অবস্থায় রাসুলুল্লাহর জীবদ্দশায় তাঁকে একবার এক পলক দেখাই যথেষ্ট। এ এমন এক সৌভাগ্য, যা তাদের পরে এই উম্মতের আর কেউ লাভ করবে না।

সাহাবাদের মর্যাদা

নবি-রাসুলদের পরে সাহাবারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ। কারণ, তারা রাসুলুল্লাহর হাতেগড়া প্রজন্ম। তাঁর দাওয়াত ও সংস্কারের প্রথম ফসল। তাঁর শিষ্য, বন্ধু, আত্মীয় ও সহচর। কুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য বক্তব্য সাহাবাদের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষী। বরং কুরআনের যেখানেই মুসলিম উম্মাহর প্রশংসা করা হয়েছে, সেগুলোর সর্বপ্রথম ও মূল হকদার সাহাবায়ে কেরাম। তাদের লক্ষ্য করেই এবং তাদের ব্যাপারেই সেগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন—আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ অর্থ : 'এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থি জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও।' [বাকারা : ১৪৩] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

﴿بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ অর্থ : 'তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে, অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।' [আলে ইমরান : ১১০] যদিও গোটা মুসলিম উম্মাহ এসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এর মূল উদ্দিষ্ট প্রজন্ম হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম।

একইভাবে কুরআনের যেখানেই আল্লাহ তায়ালা ঈমান, হিজরত ও জিহাদের প্রশংসা করেছেন, সেখানে সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম। যেমন—আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ অর্থ : 'যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন; তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।' [আনফাল : ৭৪] যদিও উক্ত আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুমিনের জন্য প্রযোজ্য, তথাপি এর দ্বারা সর্বপ্রথম উদ্দিষ্ট দল হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম।

বরং আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন আয়াতে সরাসরি তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্টির সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ অর্থ : 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করছিল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের আসন্ন বিজয় উপহার দিলেন।' [ফাতাহ : ১৮]

আল্লাহ আরও বলেন, ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ⑧ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑨ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑩﴾ 'এই ধনসম্পদ দেশত্যাগী (মুহাজির) নিঃস্বদের জন্য যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণে এবং আল্লাহ তাঁর রাসুলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধনসম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। আর (এ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদিনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস

স্থাপন করেছিল। তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে। মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে, সেজন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদের অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (আর তাদের জন্যও) যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতৃগণকে ক্ষমা করুন আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।' [হাশর : ৮-১০] এখানে আল্লাহ তায়ালা মুহাজির ও আনসারসহ তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়ি এবং পরবর্তীকালে আগত সকল মুমিন-মুসলিমের প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি সকল মুমিনের উপর সাহাবিদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন নবির প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা তার অনুসরণ করেছিল সংকটকালে, এমনকি যখন তাদের একদলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করলেন। তিনি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম অনুগ্রহশীল।' [তাওবা : ১১৭]

আরেক আয়াতে আল্লাহ সকল সাহাবির উচ্চ প্রশংসায় বলেন, ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا ٢٩﴾
অর্থ : 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল। তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি সদয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদের রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাবে পরিস্ফুটিত। তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত এইরূপ। ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, এরপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষীকে আনন্দিত করে। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দিয়ে কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।' [ফাতাহ : ২৯]

আল্লাহ তায়ালা সাহাবাদের হৃদয়কে ঈমান পছন্দ এবং কুফর ঘৃণার পরশপাথর বনিয়েছেন। তিনি বলেন, ﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং একে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।' [হুজুরাত : ৭] আল্লাহ তায়ালা সাহাবাদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মানদণ্ড ধরে পরবর্তী মুমিনদের তাদের মতো ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবাদের ঈমানকে সুপথপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ﴾ অর্থ : 'অতএব, তারা যদি ঈমান আনে তোমাদের ঈমান আনার মতো, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে।' [বাকারা : ১৩৭] এভাবে সাহাবাদের পথের বিরুদ্ধাচরণ থেকে সতর্ক করেছেন। বরং তাদের আদর্শের বিরোধিতাকে ভ্রষ্টতা আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾ অর্থ : 'কারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে <u>এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে</u>, তবে আমি তাকে সে পথেই ছেড়ে দেবো যা সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্য।' [নিসা : ১১৫]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ তো সাহাবাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, তাদের তাকওয়া, নিষ্ঠা, ন্যায্যতা, হেদায়াত, হৃদয়ের নির্মলতা, চারিত্রিক উৎকৃষ্টতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের অগণন সাক্ষ্যে ভরপুর। প্রসিদ্ধ হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'সর্বোত্তম প্রজন্ম হলো আমার প্রজন্ম। অতঃপর তাদের পরবর্তী প্রজন্ম। অতঃপর তাদের পরবর্তী প্রজন্ম...।'[১৪২৫] অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ দল। অতঃপর তাবেয়িগণ। অতঃপর তাবে-তাবেয়িগণ।

সাইয়েদুনা খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফের মাঝে একটু জটিলতা তৈরি হয়েছিল। এতে খালেদ আবদুর রহমানকে একটু মন্দ বললেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কানে গেলে তিনি বললেন, 'তোমরা আমার সাহাবাদের গালি দিয়ো না। তোমরা আমার সাহাবাদের গালি দিয়ো না। আল্লাহর

১৪২৫. বুখারি (কিতাবুশ শাহাদাত : ২৬৫২)। মুসলিম (কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবাহ : ২৫৩৩)।

শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবুও (সেটার পুণ্য) তাদের এক মুষ্টি বা আধা মুষ্টি বরাবর হবে না।'[১৪২৬] এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো—যা অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়—রাসুলুল্লাহ (ﷺ) উক্ত বক্তব্য আমাদের সাধারণ কাউকে লক্ষ্য করে দেননি, বরং তিনি তাঁরই এক সাহাবি খালেদকে লক্ষ্য করে দিয়েছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারী, হিজরত ও জিহাদকারী এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। বয়োজ্যেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয় এই সাহাবির ব্যাপারে আপত্তিকর কথা বলায় রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আরেক সাহাবি—যাকে তিনি নিজে আল্লাহর তরবারি খেতাব দিয়েছেন—তাকে বলছেন, তিনি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করলেও আবদুর রহমানের একমুষ্টি ব্যয়ের পরিমাণ পৌঁছতে পারবেন না। এই যদি হয় পরবর্তী সাহাবাদের তুলনায় প্রথম দিকের সাহাবাদের মর্যাদা, তবে তাদের পরের কোনো মানুষ যে এখানে কতটা অপ্রাসঙ্গিক ও অপাঙ্‌ক্তেয়, সেটা বলাই বাহুল্য। এ জন্য ইবনে উমর রাযি.—যিনি সাহাবা-পরবর্তী প্রজন্মের লোকদের দেখেছেন—তাদের লক্ষ্য করে বলেছেন, 'তোমরা রাসুলের সাহাবাদের সমালোচনা করো না। কারণ, রাসুলুল্লাহর সঙ্গে তাদের এক মুহূর্ত তোমাদের সারা জীবনের আমলের চেয়েও উত্তম।'[১৪২৭] বরং ইবনে উমরেরও আগে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি সাইদ বিন যায়দ রাযি. একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে তাদের কারও আল্লাহর পথে ধুলোয় ধূসরিত একটি লড়াই তোমাদের নুহের মতো দীর্ঘ জীবনের চেয়ে উত্তম।'[১৪২৮]

সাহাবাদের এই মর্যাদা সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছেন তাদের ছাত্র তাবেয়িন ও সালাফে সালেহিন। ইমাম আজম রহ. যেহেতু তাবেয়ি ছিলেন, তাই তিনিও সাহাবাদের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। তাদের প্রতি ছিলেন কৃতজ্ঞ। সেসময় বিভিন্ন ভ্রান্ত লোক বিভিন্ন সাহাবার শানে কটু মন্তব্য করত। ইমাম আজম রহ. তাদের প্রতিহত করেছেন। শানে সাহাবা রক্ষায় সংগ্রাম করেছেন। আবু হামযা আস-

---

১৪২৬. বুখারি (কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবাহ : ৩৬৭৩)। মুসলিম (কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবাহ : ২৫৪০)।

১৪২৭. আস-সুন্নাহ, ইবনে আবি আসেম (২/৬৮৭)।

১৪২৮. আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৬৪৯)। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল (মুসনাদুল আশারাহ আল-মুবাশশারিন বিল জান্নাহ : ১৬৫১)।

সুক্কারি বলেন, 'আমি আবু হানিফার চেয়ে আর কাউকে সাহাবাদের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল দেখিনি। তিনি তাদের প্রত্যেককে যথাযথ সম্মান করতেন। তাদের কারও শানে অশোভন কথা বলতেন না। এভাবেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।'[১৪২৯]

আবদুর রহমান ইবনুল মুসান্না বলেন, 'আবু হানিফা রহ. সকল সাহাবির শানে কেবল উত্তম কথাই বলতেন। তিনি বলতেন, 'রাসুলের সান্নিধ্যে একজন সাহাবির সামান্য মুহূর্ত আমাদের সুদীর্ঘ জীবনের সার্বক্ষণিক আমলের চেয়েও অনেক উত্তম।'[১৪৩০]

সাহাবাদের মর্যাদার তারতম্য

পিছনের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, সাহাবাদের প্রত্যেকে পরবর্তী উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও, তাদের সকলের ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকলেও, সকলের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও তারা সকলে সমস্তরের নন; বরং মর্যাদার দিক থেকে তাদের মাঝে তারতম্য ছিল, যেমনটা নবিদের মাঝে রয়েছে, ফেরেশতাদের মাঝেও রয়েছে। ফলে নবিদের মাঝে পাঁচজন রাসুল তথা মুহাম্মাদ (ﷺ), নুহ, ইবরাহিম, মুসা ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) হলেন অবশিষ্ট সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ফেরেশতাদের মাঝে জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিল ও মালাকুল মওত অন্যান্য ফেরেশতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সাহাবাদের মাঝেও এমন শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় রয়েছে। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রতিষ্ঠিত আকিদা।

কোনো কোনো আলেম বিষয়টি নিয়ে যেন উম্মাহর মাঝে মতপার্থক্য না হয় সেজন্য এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকার মতামত দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য হলো, 'আমরা বিশ্বাস করব—রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সকল সাহাবি মর্যাদাময়, পুণ্যবান। সবাই আমাদের মহব্বতের পাত্র। কিন্তু তাদের কাউকে কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলব না। কারণ, তাতে জটিলতা তৈরির আশঙ্কা রয়েছে'। এটা বিশেষ প্রেক্ষিতে সঠিক; উন্মুক্তভাবে সঠিক নয়; অর্থাৎ, যখন একজনকে শ্রেষ্ঠ বলতে গিয়ে অন্যজনকে খাটো ও অসম্মান করা হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাহাবাদের মর্যাদার তারতম্য নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত। কিন্তু সাহাবাদের মর্যাদাগত তারতম্য নিয়ে আলোচনা পুরোপুরিই বন্ধ করে দিতে হবে—এটা সঠিক কথা নয়। আহলে

১৪২৯. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৫২)।
১৪৩০. মানাকিব, মক্কি (৭৬)।

সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত আকিদা হলো, সাহাবাদের মাঝে মর্যাদাগত পার্থক্য আছে, যেমনটা নবি-রাসুলের মাঝে আছে। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা (আলেমদের সর্বসম্মত মত) দ্বারা সেই পার্থক্য স্বীকৃত। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসুল এবং সাহাবায়ে কেরাম কিছু সাহাবিকে কিছু সাহাবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। তাই তাদের মর্যাদার এই তারতম্যের ব্যাপারে নীরব থাকা ইনসাফ নয়, বরং যিনি শ্রেষ্ঠ তাকে শ্রেষ্ঠ বলাই ইনসাফ; হ্যাঁ, যেমনটা বলা হয়েছে—কাউকে শ্রেষ্ঠ বলে অপরকে খাটো করার বৈধতা নেই।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন, ﴿وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾ অর্থ : 'মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা ইসলামে প্রথম ও অগ্রবর্তী, আর যারা তাদের সত্যের সঙ্গে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো সবচেয়ে বড় সাফল্য।' [তাওবা : ১০০] এখানে সাহাবাদের পারস্পরিক মর্যাদার ব্যাপারটি স্পষ্ট। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মক্কা বিজয়ের আগের ও পরের সাহাবাদের মাঝে আরও স্পষ্ট মর্যাদাগত পার্থক্য টেনে বলেন, ﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ সেসব লোক অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' [হাদিদ : ১০]

ফলে সাহাবাদের মাঝে মর্যাদাগত পার্থক্য ইসলামি উম্মাহর সর্বসম্মত আকিদা। ইমাম আজম বলেন, 'রাসুলুল্লাহর যেসব সাহাবিদের আগে রাখা হয়েছে, আমরা তাদের আগে রাখি। যাদের মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, তাদের শ্রেষ্ঠ বলি।' এটা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদেরও আকিদা।[১৪৩১]

১৪৩১. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (৯৪)।

চার খলিফার শ্রেষ্ঠত্ব

আহলে সুন্নাতের সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, রাসুলুল্লাহর পরে সর্বোত্তম হলেন আবু বকর সিদ্দিক। অতঃপর উমর ইবনুল খাত্তাব। অতঃপর উসমান ইবনে আফফান। অতঃপর আলি ইবনে আবি তালিব। খেলাফতের ধারাক্রম এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারাক্রম অভিন্ন।[১৪৩২]

ইমাম আজম রহ. বলেন, **'নবিদের পরে সর্বোত্তম মানুষ হলেন আবু বকর সিদ্দিক রাযি.। এরপর উমর ফারুক ইবনুল খাত্তাব রাযি.। এরপর উসমান যুন নুরাইন ইবনে আফফান রাযি.। এরপর আলি মুরতাযা ইবনে আবি তালিব রাযি.। তারা সকলেই ছিলেন ইবাদতকারী, হকের উপর অবিচল, ইবাদতের ক্ষেত্রে সত্যপন্থি।[(১৪৩৩)] কুরআনে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে,** 'وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾ أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾' **অর্থ : 'অগ্রবর্তীগণ অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল; নেয়ামতের উদ্যানসমূহে।' [ওয়াকিয়া : ১০-১২] সুতরাং যারা কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী, আল্লাহর কাছে মর্যাদার ক্ষেত্রেও তারা অগ্রগামী।'**[১৪৩৪]

আবদুর রহমান ইবনুল মুসান্না বলেন, 'আবু হানিফা রহ. আবু বকর রাযি.-কে সকল সাহাবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতেন। অতঃপর উমর, অতঃপর আলি ও উসমানের কথা বলতেন। অতঃপর বলতেন, তাদের মাঝে ইসলাম ও তাকওয়ায় যে অগ্রগামী, তার মর্যাদা তত বেশি।'[১৪৩৫]

নুহ ইবনে আবু মারইয়াম ইমাম আজমকে জিজ্ঞাসা করেন, আহলে কিবলা ওয়াল জামাত কারা? জবাবে ইমাম বলেন, **'যারা আবু বকর ও উমরকে (অন্যদের চেয়ে) শ্রেষ্ঠ বলে; উসমান ও আলিকে ভালোবাসে।** মোজার উপর মাসাহ করে। গুনাহের কারণে কাউকে কাফের বলে না। তাকদিরের ভালোমন্দ সবকিছুর উপর ঈমান আনে। আল্লাহর ব্যাপারে মনগড়া কথা বলে না।'[১৪৩৬] এটা কেবল ইমাম আজমের নয়, সালাফের সকল ইমামের আকিদা। তাফতাযানি বর্ণনা করেন, ইমাম

১৪৩২. আস-সাওয়াদুল আজম (৩-৪)।
১৪৩৩. আল-ফিকহুল আকবার (৪-৫)।
১৪৩৪. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৪২-৪৩)।
১৪৩৫. মানাকিব, মক্কি (৭৬)
১৪৩৬. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (৯৭)।

মালেককে জিজ্ঞাসা করা হলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কারা? তিনি বললেন, (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় হলো) 'শাইখাইন তথা আবু বকর ও উমর রাযি.-কে ভালোবাসা; খাতানাইন তথা উসমান ও আলি রাযি.-এর ব্যাপারে মন্দ না বলা; মোজার উপর মাসাহ করা।'[১৪৩৭] মোজার উপর মাসাহসংক্রান্ত আলোচনা সামনে আসবে।

ইমাম রহ. আতিয়্যাহ সূত্রে আবু সাইদ খুদরি রহ. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'জান্নাতের উঁচু স্তরের লোকজনকে নিচের লোকজন সেভাবে দেখতে পাবে যেভাবে আকাশের দিগন্তে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে দেখতে পাওয়া যায়। আর আবু বকর ও উমর তাদের অন্তর্ভুক্ত।'[১৪৩৮]

তিনি নিজস্ব সনদে ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আমার পরে তোমরা আবু বকর ও উমরের অনুসরণ করো।'[১৪৩৯]

ইমাম রহ. হাম্মাদ সূত্রে আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, যখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) (জীবনের শেষ দিনগুলোতে) বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলেন তখন বললেন, 'তোমরা আবু বকরকে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে বলো।' তাকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, আবু বকর আপনার জায়গায় দাঁড়াতে ইতস্তত করছেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের যা বলেছি সেটা করো।'[১৪৪০]

আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব : তিনি ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সবচেয়ে পছন্দের ব্যক্তিত্ব। তাঁর দুনিয়া ও আখেরাতের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তাঁর সবচেয়ে বড় পরামর্শক। তাঁর সর্বপ্রথম খলিফা। ইসলামের সর্বাপেক্ষা বড় সেবক। আবু বকর রাযি.-এর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কারও মতভেদ নেই।

আবু বকর রাযি.-এর মর্যাদা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ব্যাপারে বলেন, ﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَـٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ

১৪৩৭. শরহুল আকায়েদ, তাফতাযানি (১০৪)।

১৪৩৮. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৫৭)।

১৪৩৯. প্রাগুক্ত (৫৭)।

১৪৪০. প্রাগুক্ত (৫৭)।

تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
অর্থ : "যদি তোমরা তাকে (তথা রাসুলকে) সাহায্য না করো, তবে আল্লাহ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাকে বহিষ্কার করেছিল। আর সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয় জন। যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তার সঙ্গী (আবু বকর)-কে বলছিল, 'দুঃখিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।' এরপর আল্লাহ তাঁর উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে যা তোমরা দেখতে পাওনি। আল্লাহ কাফেরদের মাথা নিচু করে দিলেন। আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [তাওবা : ৪০] ফলে তিনি যে আল্লাহর রাসুলের সাহাবি, আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত, সেটা সুস্পষ্ট।

আল্লাহ তায়ালা নিজে আবু বকরকে তাকওয়া এবং হৃদয়ের শুদ্ধতার সনদ দেন এভাবে : ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝١٧ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝١٨﴾ অর্থ : 'আর তথা (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকি ব্যক্তিকে, যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধনসম্পদ দান করে।' [লাইল : ১৭-১৮]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) হাদিসে বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামের মাঝে কোনো সুন্দর বিষয়ের প্রচলন ঘটাল, সে তার পুণ্য পাবে এবং তাকে যারা অনুসরণ করবে সবার পুণ্য লাভ করবে।'[১৪৪১] আবু বকর রাযি. রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণের প্রচলন করেছেন। তাঁর পরে মানুষ রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে অনুসরণ করা শুরু করেছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে, আবু বকর সেটার পুণ্য লাভ করবেন। উসমানসহ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের বেশ কয়েকজন যথা : তালহা, যুবাইর, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং অসংখ্য সাহাবি আবু বকরের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাদের পুণ্যও আবু বকর পাবেন! তাঁর সম্পদ দিয়েও ইসলাম উপকৃত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আবু বকরের সম্পদ আমাকে যতটা উপকার করেছে, অন্য কারও সম্পদ করেনি! যে-ই আমার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করেছে, আমি সেটার বিনিময় দিয়েছি। কিন্তু আবু বকরেরটা দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন দেবেন।'[১৪৪২]

[১৪৪১]. মুসলিম (কিতাবুল ইলম : ১০১৭)। তিরমিযি (আবওয়াবুল ইলম : ২৬৭৫)।
[১৪৪২]. তিরমিযি (আবওয়াবুল মানাকিব : ৩৬৬১)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুস সুন্নাহ : ৯৪)।

আবু বকর রাযি. অন্যদের চেয়ে কেবল তাকওয়া ও ঈমানের ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিলেন এমন নয়; জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তিনি অন্যদের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। রাসুলুল্লাহর সঙ্গে তাঁর সোহবত অন্যদের চেয়ে বেশি দীর্ঘ ছিল, বেশি গভীর ছিল। কিন্তু—যেমনটা বাযদাবি বলেন—আবু বকর রাযি.-এর অভ্যাস ছিল নীরব থাকা। অন্যদের অভ্যাস ছিল কথা বলা। এ জন্য তাঁর থেকে বর্ণিত বক্তব্য ও হাদিস সংখ্যায় বেশ কম। তথাপি আবু বকরের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের পরে যখন কোনো কোনো সাহাবি তাঁর মৃত্যুকে অবিশ্বাস করতে থাকেন, তখন আবু বকর বলেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কারণ, আল্লাহ বলেছেন, ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ অর্থ : 'নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল, তারাও মরণশীল।' [যুমার : ৩০] তিনি আরও বলেন, ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ অর্থ : 'মুহাম্মাদ একজন রাসুল মাত্র। তার পূর্বে বহু রাসুল গত হয়েছে। সুতরাং তিনি যদি মারা যান অথবা নিহত হন, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে? আর কেউ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না; বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।' [আলে ইমরান : ১৪৪] একইভাবে সাহাবায়ে কেরাম যখন রাসুলুল্লাহর দাফনের জায়গা নিয়ে মতভেদ শুরু করেন, আবু বকর বলেন, 'প্রত্যেক নবিকে তাঁর ওফাতের জায়গাতেই দাফন করা হয়।' রাসুলের ওফাতের পরে শামের দিকে (উসামার নেতৃত্বে) বাহিনী পাঠানো নিয়ে মতভেদ তৈরি হলে আবু বকর বললেন, 'তাদের পাঠানো হবে। কারণ, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের প্রস্তুত করেছেন।' পরে দেখা গেল আবু বকরের মত সঠিক ছিল। অতঃপর যখন গোটা আরবে ইরতিদাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ে, তারা যাকাত অস্বীকার করে, অধিকাংশ সাহাবির মত ছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা হোক। কিন্তু আবু বকর বললেন, 'যে ব্যক্তি রাসুলের যুগে একটি ছাগলের রশি দিত, সেটা অস্বীকার করলেও আমি যুদ্ধ করব।' শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করলেন। অধিকাংশ মুরতাদ ইসলামে ফিরে এলো। সাহাবারা বুঝতে পারলেন, আবু বকরই হকের উপর ছিলেন।[১৪৪৩]

এ সবকিছু দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে এ উম্মতের নেতৃত্বের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি তিনি। এটা রাসুলুল্লাহও জানতেন। ফলে তাঁর

১৪৪৩. দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২০০)।

জীবদ্দশায় তিনি তাঁকে মুসলমানদের নামাযের ইমাম বানান। এর মাধ্যমে তিনি যেন তাঁর ওফাতের পরে আবু বকর মুসলমানদের ইমাম (শাসক) হবেন—এমন ইঙ্গিত দিয়ে যান।[১৪৪৪]

রাসুলুল্লাহর (ﷺ) ওফাতের পরে মানুষজন খলিফা নিযুক্তি নিয়ে মতভেদে জড়িয়ে পড়ে। আনসারগণ প্রস্তাব দেন তাদের মাঝ থেকে একজন আমির হবেন আর মুহাজিরদের মাঝ থেকে একজন। কিন্তু আবু বকর রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলে গিয়েছেন, 'ইমাম হবে কুরাইশ থেকে।' তখন সবাই তাঁর কথা মেনে নিলেন। উমর রাযি. কথা বললেন। আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরলেন। সবাই আবু বকর রাযি.-এর হাতে খেলাফতের বাইয়াত নিলেন। রাফেযিরা মনে করে, আলি রাযি. কখনো আবু বকরের খেলাফত মেনে নেননি। এটা আলির উপর তাদের মিথ্যাচার।[১৪৪৫]

উমরের শ্রেষ্ঠত্ব :

আবু বকর রাযি.-এর পরে মুসলিম উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) উমর রাযি.-এর ব্যাপারে বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা উমরের মুখ ও অন্তরে হক প্রতিষ্ঠিত করেছেন।' কারণ, উমর যখনই রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে কোনো ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে সেটার সমর্থনে ওহি নাযিল হতো।[১৪৪৬]

উমরের হৃদয় ছিল কাচের চেয়েও স্বচ্ছ। নিষ্ঠা ছিল আকাশসমান। হকের সামনে তিনি কাউকে পরোয়া করতেন না। বাতিল কোনোভাবেই সহ্য করতেন না। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলকে তিনি হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসতেন। এ জন্য মানুষ তো দূরের কথা, শয়তানও তাঁকে ভয় করত। আল্লাহর রাসুল (ﷺ) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! শয়তান যখনই তোমাকে কোনো পথে হাঁটতে দেখে, সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে!'[১৪৪৭] এভাবে তিনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষদের একজনে পরিণত হন; রাসুলুল্লাহর সর্বোচ্চ আস্থার জায়গা লাভ করেন; তাঁর

১৪৪৪. তিরমিযি (আবওয়াবুল মানাকিব : ৩৬৬১)। তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১১৮০-১১৮৫)।
১৪৪৫. দেখুন : তালখিসুল আদিল্লাহ (৮২৬)।
১৪৪৬. তিরমিযি (আবওয়াবুল মানাকিব : ৩৬৮২)। আবু দাউদ (কিতাবুল খারাজ : ২৯৬১)।
১৪৪৭. বুখারি (কিতাবু বাদয়িল খালক : ৩২৯৪)। মুসলিম (কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা : ২৩৯৭)।

ভালোবাসা অর্জন করেন। তিনি তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। রাসুলুল্লাহ তাঁর মেয়ে হাফসাকে বিবাহ করে তাঁকে সম্মানিত করেন; দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

আবু বকর রাযি. উমরের এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানতেন। ফলে তিনি ওফাতের আগে উমরকে নিজে খলিফা নিযুক্ত করে যান। উমর এই আস্থার সর্বোচ্চ প্রতিদান দেন। তাঁর সময়ে মুসলিম বাহিনীর বিজয়-পতাকা উড়তে থাকে পৌত্তলিকদের কেল্লাতে। ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা সুদূরের ভূখণ্ডে বিস্তৃত হয়। ন্যায়, ইনসাফ ও সুশাসনে অর্ধ জাহান ভরে ওঠে। উমর পৃথিবীর বুকে সুশাসনের এমন নজির স্থাপন করেন, যা মানব সভ্যতা তাঁর আগে ও পরে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি।

উসমানের শ্রেষ্ঠত্ব : উমর রাযি. পরবর্তী খলিফা নিযুক্তির জন্য সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন তথা আশারায়ে মুবাশশারার বেঁচে থাকা ছয়জনকে দায়িত্ব দেন। তারা হলেন : উসমান ইবনে আফফান, আলি ইবনে আবি তালিব, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ এবং যুবাইর ইবনুল আওয়াম।[১৪৪৮]

ইমাম আজম জামে' সূত্রে যিয়াদ ইবনে জারির থেকে বর্ণনা করেন, উমর রাযি. যখন ছুরিকাঘাতপ্রাপ্ত হলেন, তখন বললেন, হে লোকসকল, আমি তোমাদের (খেলাফতের) বিষয়টি এমন ছয়জন মানুষের হাতে রেখে যাচ্ছি, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যাদের উপর সন্তুষ্ট অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমি তাদের তিনদিন সময় দিয়েছি। এর মাঝে যাতে তারা তাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য (একজন খলিফা) নির্বাচন করে। যদি তারা কারও ব্যাপারে একমত হয়ে যায় আর একজন সেটা অস্বীকৃতি জানায়, তবে তোমরা (সংখ্যাগরিষ্ঠ মত অনুযায়ী) তাকে বেছে নাও। আর যদি তারা (সমান সমান সংখ্যায়) মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়ে, তবে ইবনে আউফ যে (তিন জনের) দলে থাকবে তাদের সঙ্গে থাকো।[১৪৪৯] উক্ত ছয়জনের উপদেষ্টা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় অনুযায়ী উসমান রাযি. খলিফা নিযুক্ত হন।

১৪৪৮. অবশ্য তখন আশারায়ে মুবাশশারার সাত জন বেঁচে ছিলেন। সপ্তম ব্যক্তি হলেন সাইদ বিন যায়দ রাযি.। কিন্তু তিনি উমর রাযি.-এর চাচাতো ভাই ও ভগ্নিপতি হওয়ার কারণে উমর রাযি. তাকে মজলিসে শুরার বাইরে রাখেন, যাতে মানুষ পরিবারতন্ত্র কিংবা বংশপ্রীতির সন্দেহ না করে! দেখুন তাদের হৃদয়ের স্বচ্ছতা!

১৪৪৯. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৫৭-৫৮)।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সঙ্গে নিজের দুই কন্যা বিবাহ দেন। একজনের পরে একজন। ইসলামের জন্য তিনি তাঁর অধিকাংশ সম্পদ দান করে দিয়েছিলেন। ইবনে উমর বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় বলতাম : 'তাঁর উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর, অতঃপর উমর, অতঃপর উসমান।'[১৪৫০]

আবু বকর রাযি. কুরআনের প্রাথমিক সংকলন করেছিলেন। সেটা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে উসমান রাযি.-এর হাতে। তিনি একাধিক সাহাবির তত্ত্বাবধানে কুরআনের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। আমাদের কাছে আজকের বিদ্যমান কুরআন উসমান রাযি.-এর সংকলিত ও প্রস্তুতকৃত কুরআন। শিয়ারা দাবি করে, আলি রাযি. কুরআন সংকলন করেছেন। এটা ভিত্তিহীন দাবি।[১৪৫১]

আলির শ্রেষ্ঠত্ব : উপরের তিনজনের পরে গোটা উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আলি রাযি.। তিনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচাতো ভাই। তাঁর কলিজার টুকরো মেয়ে ফাতিমার জামাতা। কিশোর হিসেবে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। উসমান রাযি.-এর ওফাতের পরে উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে তিনি মুসলিম উম্মাহর খলিফা নিযুক্ত হন। তিনিই হলেন খুলাফায়ে রাশেদিনের সর্বশেষ খলিফা, নবুওতের খেলাফতের সর্বশেষ প্রতিনিধি। চরম ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে এসেও তিনি ইসলামি রাষ্ট্রকে নিপুণভাবে পরিচালিত করেন, সমৃদ্ধি আনেন। পরিশেষে মজলুম অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন।

তাঁর শাসনামলে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. একাধিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তন্মধ্যে প্রথমটি ছিল 'উষ্ট্র যুদ্ধ' (জামাল), যা সংঘটিত হয়েছিল আলি আর আয়েশা, তালহা ও যুবাইর রাযি.-এর মাঝে। দ্বিতীয়টি ছিল 'সিফফিনের যুদ্ধ', যা সংঘটিত হয়েছিল আলি আর মুআবিয়া রাযি.-এর মাঝে। তবে এসব যুদ্ধ দুনিয়ার জন্য নয়, বরং ইজতিহাদ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত মতপার্থক্য, ভুল বোঝাবুঝি, শত্রুর ইন্ধন ও ষড়যন্ত্রের ফলে সংঘটিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো—এসব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া সকল সাহাবির মাঝে আলি রাযি. মর্যাদা ও পুণ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, পাশাপাশি তিনি ছিলেন হকের উপর। আর তালহা, যুবাইর, মুআবিয়া প্রমুখ সাহাবি ভুল করেছেন। আয়েশা রাযি. যুদ্ধই চাননি, বরং তিনি দুই পক্ষের মাঝে সমঝোতার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝি হয় এবং

১৪৫০. তিরমিযি (আবওয়াবুল মানাকিব : ৩৭০৭)। আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৬২৮)।

১৪৫১. দেখুন : বাহরুল কালাম (২৭৭-২৭৮)।

সেটা যুদ্ধে গড়ায়। তবে তারা যেহেতু ইজতিহাদ করেছেন, ফলে ভুল করা সত্ত্বেও তারা নিন্দিত নন। আল্লাহ তায়ালা ও রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে সন্তুষ্টি ও ক্ষমার সুসংবাদ দিয়েছেন। এ জন্য সাধারণ মুসলিমদের কর্তব্য হলো তাদের কেবল উত্তম পন্থায় স্মরণ করা, তাদের মাঝে সৃষ্ট সংকটের মাঝে প্রবেশ না করা, সেগুলোর ঘাঁটাঘাঁটি পরিত্যাগ করা। কোনো সাহাবির ব্যাপারে মন্দ আলোচনা না করা। কারণ, তাদের মাঝে যারা ভুল করেছেন, তারাও পরবর্তী সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সঙ্গে তাদের জিহাদের ময়দানের এক মুহূর্ত পরবর্তী লোকদের নুহের মতো জীবন পেয়ে সিজদায় পড়ে থাকার চেয়েও উত্তম।[১৪৫২]

এ কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মৌলিক আকিদা হলো সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা থেকে বিরত থাকা। তাদের মাঝে সৃষ্ট হওয়া সংকট ও জটিলতাগুলো এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যেন তাদের সম্মানে আঘাত না হানে। কারণ, তারাই জানমাল বিসর্জন দিয়ে, সুখশান্তি কুরবান করে, দ্বীনের পথে শত মুসিবত সহ্য করে এই দ্বীন আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

আলি রাযি.-কেন্দ্রিক মতপার্থক্য

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্যে মুসলিম উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বকর রাযি., অতঃপর উমর রাযি., অতঃপর উসমান রাযি., অতঃপর আলি রাযি.। এটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য মত। তবে এর বাইরে বিচ্ছিন্ন কিছু মতামত পাওয়া যায়, বিশেষত আলি রাযি.-কে কেন্দ্র করে।

প্রথম যুগের ইমামদের মাঝে সুফিয়ান সাওরি, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমা, হুসাইন ইবনুল ফযল বাজালি প্রমুখের ব্যাপারে জানা যায় যে, তারা আলি রাযি.-কে উসমান রাযি.-এর চেয়ে উত্তম মনে করতেন। কিন্তু সাওরি পরবর্তীকালে এ মত থেকে উম্মাহর সকল আলেমের মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। একইভাবে মালেক, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, ইবনে হাযাম প্রমুখ থেকে উসমান ও আলি রাযি.-এর মাঝে কে শ্রেষ্ঠ—এ ব্যাপারে নীরব থাকার বক্তব্য পাওয়া যায়। আবদুল আযিয ইবনে হাযেম বলেন, আমি মালেককে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর রাসুলের পরে আপনি কাকে রাখেন?

১৪৫২. দেখুন : তালবিসুল আদিল্লাহ (৮৩৭-৮৩৮)। তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১১৬৬-১১৭৫)।

তিনি বলেন, আবু বকর ও উমর রাযি.। আর কোনোকিছু বলেননি।[১৪৫৩] কিন্তু পরবর্তীকালে মালেকও—যেমনটা কাযি ইয়ায বলেছেন—আহলে সুন্নাতের সকল আলেমের মত গ্রহণ করেন।[১৪৫৪]

ইমাম আজম কি আলিকে উসমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতেন?

ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. থেকেও এমন কিছু বক্তব্য পাওয়া যায়, যাতে মনে হয় তিনি আলি রাযি.-কে উসমান রাযি.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর 'আস-সিয়ারুল কাবির' সূত্রে দলিল দেওয়া হয় যে, ইমাম আবু হানিফাকে আহলে সুন্নাতের মাযহাব জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আবু বকর ও উমর রাযি.-কে শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং আলি ও উসমান রাযি.-কে ভালোবাসা।'[১৪৫৫] তাদের বক্তব্য হলো, যেহেতু ইমাম আজম আলি রাযি.-এর নাম আগে এনেছেন, বোঝা গেল, তিনি আলি রাযি.-কে উসমান রাযি.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন।

কেবল আস-সিয়ারে নয়, বিভিন্ন গ্রন্থে ইমাম আজমের উদ্ধৃতি দিয়ে আলি রাযি.-এর নাম উসমান রাযি.-এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—ইবনে আবদিল বার নুহ ইবনে আবু মারইয়াম থেকে বর্ণনা করেন, আমি আবু হানিফা রহ.-এর কাছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বলেন : 'আল্লাহর ব্যাপারে কথা না বলা। গুনাহের কারণে কাউকে কাফের না বলা। আবু বকর ও উমরকে আগে রাখা। আলি ও উসমানকে ভালোবাসা...।' ইয়াহইয়া ইবনে নসর বলেন, 'আবু হানিফা রহ. আবু বকর ও উমর রাযি.-কে শ্রেষ্ঠ বলতেন। আলি ও উসমানকে ভালোবাসতেন।' আবদুর রহমান ইবনুল মুসান্না বলেন, 'আবু হানিফা আবু বকর ও উমরকে শ্রেষ্ঠ বলতেন। অতঃপর বলতেন, আলি ও উসমান...।' ইমাম পুত্র হাম্মাদ থেকে বর্ণিত, আবু হানিফা রহ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয়ে বলতেন, 'আবু বকর, উমর, আলি ও উসমানকে শ্রেষ্ঠ বলা। কোনো সাহাবির সমালোচনা না করা।'[১৪৫৬]

১৪৫৩. দেখুন : আল-ইনতিকা (৭২)। তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১১৯৫)।
১৪৫৪. দেখুন : ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (৭/১৬)। তাদরিবুর রাবি, সুয়ুতি (২/৬৮৩)। মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ (৪/৪২৬)।
১৪৫৫. শরহুস সিয়ারিল কাবির (১৫৮)।
১৪৫৬. আল-ইনতিকা (৩১৫-৩১৬)।

উপরের বক্তব্যগুলো খেয়াল করে দেখুন। প্রত্যেকটি বর্ণনাতে ইমাম আজম আলি রাযি.-এর নাম উসমান রাযি.-এর আগে এনেছেন। যদিও সরাসরি তিনি আলি কে উসমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেননি, কিন্তু প্রসিদ্ধ ধারাক্রমের বিপরীতে এই ভিন্ন ধারাবাহিকতা কি তাঁর ভিন্নমতের জানান দেয় না? এ জন্যই অনেকে ধারণা করেছেন, তিনি আলি রাযি.-কে উসমান রাযি.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতেন।

কিন্তু অধমের মতে, বাস্তবতা ভিন্ন। আলি রাযি.-এর নাম আগে আনা উসমানের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে না। স্বয়ং ইমাম সারাখসি 'আস-সিয়ার'-এর ব্যাখ্যায় আবু হানিফা রহ.-এর উক্ত বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, আমাদের মাযহাব হলো খেলাফতের আগে ও পরে সবসময়ই উসমান রাযি. আলি রাযি.-এর চেয়ে উত্তম। ইমাম আবু হানিফা রহ. তার বক্তব্যের মাধ্যমে আলি রাযি.-কে উত্তম বলেননি। কারণ, এখানে তার নাম আগে আনাই উত্তম বোঝা যায় না। বরং সামগ্রিকভাবে তাদের দুজনকে ভালোবাসার কথা বলেছেন। আলি রাযি.-কে আগে আনার কারণ হলো, সে সময় অনেক মানুষ আলি রাযি.-এর সমালোচনা করত। ফলে তাদের সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল।[১৪৫৭] হ্যাঁ, এটাই বাস্তবসম্মত বক্তব্য। একটা সময় ছিল যখন আলি রাযি.-এর নাম উচ্চারণ করাও অপরাধ ছিল। কেউ আলির নাম উচ্চারণ করলে (বনু মারওয়ানের) শাসকরা তাকে শাস্তি দিত। ফলে আলেমগণ বিভিন্ন নামে আলি রাযি.-কে বোঝাতেন। যেমন—হাসান বসরি 'আলির'র পরিবর্তে 'আবু যয়নব' (যয়নবের পিতা) বলতেন।[১৪৫৮] এমন বিদঘুটে সময়ে আলি রাযি.-এর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্য ইমামের এই কর্মপদ্ধতি নিঃসন্দেহে বড় ধরনের জিহাদ ছিল।

একইভাবে আল-ফিকহুল আবসাতেও ইমাম আজম রহ.-এর একটি বক্তব্য আছে যেটা সংশয় তৈরি করে। যেমন—ইমাম আজম রহ. বলেন, **'আমরা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো সাহাবি থেকে নিজেদের মুক্ত ও সম্পর্কহীন ঘোষণা করি না। আমরা তাদের কাউকে ভালোবেসে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ রাখি না। উসমান ও আলি রাযি.-এর ব্যাপারটা আমরা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করি'** (وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله)।[১৪৫৯]

১৪৫৭. শরহুস সিয়ারিল কাবির (১৫৮)।

১৪৫৮. মানাকিব, মক্কি (১৪৬)।

১৪৫৯. আল-ফিকহুল আবসাত (৪০)।

এখান থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন, তিনি উসমান ও আলি রাযি.-এর মাঝে মর্যাদায় কে শ্রেষ্ঠ সে সম্পর্কে নীরব ও নিরপেক্ষ থাকার পক্ষপাতী। কিন্তু এমন ধারণাও সঠিক নয়। কারণ, উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে কেবল তাদের মর্যাদা সম্পর্কে নীরব থাকার বিষয়টিই বুঝে আসে এমন নয়, বরং উসমান ও আলি রাযি.-কেন্দ্রিক পরবর্তীকালে যত জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, সবগুলোকে বোঝায়। বরং পরের বিষয়টা বোঝানোই অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ, ইমাম এখানে চার খলিফার প্রথম দুই খলিফার শ্রেষ্ঠত্বের কথাও বলেননি। শ্রেষ্ঠত্বের কোনো আলোচনাই নেই এখানে। স্রেফ সাহাবাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের আলোচনা। ফলে এখান থেকে ইমামের ব্যাপারে এমন দাবি করা যাবে না যে, তিনি উসমানকে আলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতেন। আবুল লাইস সমরকন্দি বলেন, 'এর মাধ্যমে ইমাম তাদের (মর্যাদা) নিয়ে সন্দেহ উদ্দেশ্য নেননি, বরং তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন—যেহেতু আল্লাহ তায়ালা আমাদের হাতকে সেই ফেতনা থেকে রক্ষা করেছেন, সুতরাং আমাদের জিহ্বাকেও সেই ফেতনা থেকে দূরে রাখতে হবে। এটাই সবচেয়ে নিরাপদ পথ।[১৪৬০]

আরও একটি জটিলতা হলো ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর একটি বক্তব্য। কাযি সাইমারি (৪৩৬ হি.) হাসান ইবনে যিয়াদ সূত্রে বর্ণনা করেন, 'আমি মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানকে বলতে শুনেছি—আমার মাযহাব, আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের মাযহাব হলো—আবু বকর, অতঃপর উমর, অতঃপর আলি, অতঃপর উসমান।'[১৪৬১] হাফিজুদ্দিন নাসাফি লিখেন, 'আবু বকর, উমর ও উসমানের পরে আলি রাযি.। এটাই আমাদের (হানাফিদের) মাযহাব। তবে ইমাম আবু হানিফা থেকে বিপরীত বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি আলিকে উসমানের আগে রাখতেন।'[১৪৬২]

উক্ত বক্তব্যগুলো যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে সেটা ইমাম ও তাঁর শাগরেদদের প্রথম যুগের মাযহাব হয়ে থাকবে। বিশেষত তারা কুফার অধিবাসী ছিলেন। সাইয়েদুনা আলি রাযি. কুফাতে ছিলেন। ফলে কুফার সর্বত্র আলির আলোতে আলোকিত ছিল। কুফাবাসীর মনে আলি রাযি.-এর প্রতি একটা অন্যরকম

১৪৬০. শরহুল ফিকহিল আকবার, সমরকন্দি (১০)।
১৪৬১. আখবারু আবি হানিফা, সাইমারি (১৩২)।
১৪৬২. আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (৫১৫)।

ভালোবাসা ও আবেগ কাজ করত—এটাই স্বাভাবিক। এ কারণে খুব সম্ভবত ইমামও হয়তো প্রথম জীবনে আলি রাযি.-কে আগে রেখে থাকবেন। বরং কুফাতে আলিকে উসমানের আগে রাখা তো কোনো আশ্চর্য ব্যাপার ছিল না। সাইমারির বর্ণনা দ্বারা আমরা জানতে পারি, সে সময়ে কুফাতে উসমান রাযি.-এর নামের পরে দোয়া করাও হতো না! সাইদ ইবনে আবি আরুবা কুফায় এসে ইমাম আজমকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি!' তখন সাইদ তাকে বলেন, বরং আপনার উপর আল্লাহর রহমত। কুফায় আসার পরে আপনি ছাড়া আর কাউকে উসমানের উপর 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' পড়তে শুনিনি।[১৪৬৩] ফলে কুফার মতো জায়গাতে থেকে আলি রাযি.-কে উসমানের চেয়ে বেশি ভালোবাসা মোটেই বিস্ময়কর ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা এটা থেকে রুজু করে জমহুরের মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। উল্লেখিত জটিলতা ও অস্পষ্টতাগুলোও সম্ভবত এই বিবর্তনের একটি ব্যাখ্যা হতে পারে। আর এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া মোটেও অস্বাভাবিক নয়, যেমনটা আমরা পিছনে দেখেছি মালেক ইবনে আনাস, সুফিয়ান সাওরি, ইবনে খুযাইমাসহ অনেকেই প্রথম দিকে এমন অভিমত রাখতেন এবং পরবর্তী সময়ে তারা সকলে জমহুরের মত গ্রহণ করেন।

মোটকথা, ইমাম আজম রহ.-এর চূড়ান্ত মাযহাব আর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মাযহাবের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আবু বকর, উমর, উসমান ও আলি—এই ধারাবাহিকতা ইমামের বিভিন্ন গ্রন্থে লিখিত। ফলে তিনি মর্যাদার ক্ষেত্রে উসমানকে তৃতীয় এবং আলিকে চতুর্থ স্থানে রাখতেন এটাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এক্ষেত্রে তাঁর মাযহাব সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নাতের মাযহাবই। আল-ফিকহুল আকবারে এসেছে, ইমাম বলেন, **'নবিদের পরে সর্বোত্তম মানুষ হলেন আবু বকর সিদ্দিক রাযি., এরপর উমর ফারুক ইবনুল খাত্তাব রাযি., এরপর উসমান যুন নুরাইন ইবনে আফফান রাযি., এরপর আলি মুরতাযা ইবনে আবি তালিব রাযি.। তারা সকলেই ছিলেন ইবাদতকারী, হকের উপর অবিচল, ইবাদতের ক্ষেত্রে সত্যপন্থি।**[১৪৬৪]

১৪৬৩. আখবারু আবি হানিফাহ (৮২)।

১৪৬৪. আল-ফিকহুল আকবার (৪-৫)।

ইমাম 'আল-ওয়াসিয়্যাহ'-তে বলেন, "আমরা স্বীকার করি, আমাদের নবিজির পরে এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন আবু বকর আস-সিদ্দিক, অতঃপর উমর, অতঃপর উসমান, অতঃপর আলি। রাযিয়াল্লাহু আনহুম। তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾' কুরআনের অর্থ : 'অগ্রবর্তীগণ অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল; নেয়ামতের উদ্যানসমূহে।' [ওয়াকিয়া : ১০-১২] সুতরাং যারা কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী, আল্লাহর কাছে মর্যাদার ক্ষেত্রেও তারা অগ্রগামী। প্রত্যেক মুত্তাকি মুমিন তাদের ভালোবাসে। হতভাগা মুনাফিক তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে।"[১৪৬৫]

একই ধারাবাহিকতায় ইমাম তহাবি রহ. লিখেছেন, 'আমরা নবিজি (ﷺ)-এর পরে সর্বপ্রথম আবু বকর রাযি.-এর জন্য খেলাফত সাব্যস্ত করি। কারণ, তিনি গোটা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রগামী। অতঃপর খেলাফত সাব্যস্ত করি উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি., অতঃপর উসমান রাযি., অতঃপর আলি ইবনে আবি তালিব রাযি.-এর জন্য। তারা সুপথপ্রাপ্ত খলিফা, হেদায়াতপ্রাপ্ত শাসক, যারা সত্যসহ ফয়সালা করতেন, ইনসাফ করতেন।'[১৪৬৬]

সায়েদ নিশাপুরি লিখেন—আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত, ইমাম আজম বলেন, 'নবিজির পরে উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছেন আবু বকর, অতঃপর উমর, অতঃপর উসমান, অতঃপর আলি।'[১৪৬৭]

আকিদাহ তহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যাতা কওনভি লিখেন, 'ইমাম আজম রহ.-এর ব্যাপারে বলা হয়—তিনি আলি রাযি.-কে উসমান রাযি.-এর চেয়ে উত্তম মনে করতেন। এটা সঠিক নয়। বরং সঠিক কথা হলো, তিনিও আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ মতের মতো উসমান রাযি.-কে আলি রাযি.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন।'[১৪৬৮]

সাবুনি লিখেন, 'যদিও আবু হানিফার একটি বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় তিনি আলি রাযি.-কে উসমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন, তবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাব হলো উসমানের পরে আলি।'[১৪৬৯]

১৪৬৫. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৪৩-৪৪)।
১৪৬৬. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৯)।
১৪৬৭. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৫৩)।
১৪৬৮. আল-কালাইদ, কওনভি (১৬৭)।
১৪৬৯. আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ (২৭৬)।

আলিকে শ্রেষ্ঠ বলার বিধান

প্রশ্ন হতে পারে, কেউ যদি শাইখাইন তথা আবু বকর রাযি. এবং উমর রাযি.-এর শ্রেষ্ঠত্ব, উসমান রাযি.-এর মর্যাদা স্বীকার করা সত্ত্বেও আলি রাযি.-কে বেশি ভালোবাসে, তাঁর প্রতি বেশি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তবে সে কি আহলে সুন্নাত থেকে বেরিয়ে যাবে? বিচ্যুত ও পথভ্রষ্ট গণ্য হবে?

জবাবে আমরা বলব, না। এটা আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়। বিচ্ছিন্ন মতামত এবং বিচ্ছিন্ন কাজ বলে গণ্য হবে। কিন্তু আহলে সুন্নাত কাউকে জুলুম করে না। ফলে এটুকুর কারণে কাউকে গোমরাহ আখ্যা দেয় না, যেমন পিছনে বলা হয়েছে—ইবনে খুযাইমাসহ কিছু আলেম আলি রাযি.-কে উসমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতেন। তাই বলে তাদের গোমরাহ বলার সুযোগ নেই।

তা ছাড়া, এই শেষ্ঠত্বের বিষয়টি যেহেতু সরাসরি কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত হয়নি, সে কারণে এটা 'কাতয়ি' (নিশ্চিত) নাকি 'যন্নি' (অনুমানমূলক) এটা নিয়েও আলেমগণ মতবিরোধ করেছেন। আবুল হাসান আশআরি রহ. মনে করতেন এই শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত বিষয়। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিপরীতে আবু বকর বাকেল্লানি, ইমামুল হারামাইন জুয়াইনিসহ একদল আলেম মনে করতেন এটা ইজতিহাদি বিষয়, কুরআন-সুন্নাহ থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়।[১৪৭০] আবু সুলাইমান খাত্তাবি বলেন, আমাদের মাশায়েখের কারও কারও মত হলো, আবু বকর (সোহবতের কারণে) সবচেয়ে উত্তম। আলি (আত্মীয়তার কারণে) সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।[১৪৭১]

আল্লামা কামাল ইবনুল হুমাম লিখেছেন, রাফেযিদের মাঝে যারা আলি রাযি.-কে বাকি তিনজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তারা বিদআতি। আর যদি কেউ আবু বকর ও উমর রাযি.-এর খেলাফত অস্বীকার করে, তবে সে কাফের।[১৪৭২] কিন্তু এটা উন্মুক্তভাবে গৃহীত হবে না। ফলে কেউ আলি রাযি.-কে বাকি তিনজনের চেয়ে উত্তম মনে করলেই বিদআতি হয়ে যাবে এমন নয়, বরং বাকি তিনজনের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে আলিকে শ্রেষ্ঠ মনে করলে বিদআতি। একইভাবে শাইখাইনের খেলাফত অস্বীকার করলেই কেউ কাফের হবে না, বরং যদি

১৪৭০. দেখুন : শরহে মুসলিম, নববি (১৫/১৪৮)। তাদরিবুর রাবি (২/৬৮৪)।

১৪৭১. দেখুন : আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, ইবনে হাজার হাইতামি (১/১৭১)।

১৪৭২. ফাতহুল কাদির (১/৩৫০)।

বিদ্বেষবশত অস্বীকার করে এবং কুরআন ও সুন্নাহতে তাদের দুজনের যেসব ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা এসেছে সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস না রাখে, তবে এমন ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। যেমন—কেউ যদি আবু বকর রাযি.-এর সোহবত অস্বীকার করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, প্রকারান্তরে সে কুরআনের এই আয়াতকে অস্বীকার করল, إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا অর্থ : "যদি তোমরা তাকে (তথা রাসুলকে) সাহায্য না করো, তবে আল্লাহ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাকে বহিষ্কার করেছিল। আর সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয় জন। যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তার সঙ্গী (আবু বকর)-কে বলেছিল, 'দুঃখিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।'" [তাওবা : ৪০] ফলে তিনি যে আল্লাহর রাসুলের সাহাবি এবং আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত সেটা সুস্পষ্ট।

মোটকথা, এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের সঙ্গে থাকা যেমন কর্তব্য, কেউ যদি ভিন্নমত পোষণ করে, সেক্ষেত্রে ইনসাফের সঙ্গে খণ্ডন করাও কর্তব্য। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আহলে সুন্নাত থেকে খারিজ করে শিয়া-রাফেযি বানানোর সুযোগ নেই। তাসাওউফের ইমাম শায়খ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি রহ. বলেন, 'দুঃখজনকভাবে শয়তান এই উম্মতের মাঝে যে বিষয়টিতে সফল হয়েছে এবং যেটা নিয়ে বিতর্ক উসকে দিতে সক্ষম হয়েছে সেটা হচ্ছে—রাসুলের সাহাবাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ থেকে উদ্ভূত ফলাফল। এগুলো পরবর্তীকালে হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ তৈরি করেছে। যুগের পর যুগ এই উত্তরাধিকার মুসলিম উম্মাহ বহন করেছে। ধীরে ধীরে এ রোগ মারাত্মক থেকে মারাত্মকতর হয়েছে। সুতরাং প্রবৃত্তিপূজা থেকে মুক্ত হে প্রাণের বন্ধু, আমাদের মনে রাখতে হবে সাহাবাগণের হৃদয়ের স্বচ্ছতা এবং অন্তরের নির্মলতা সত্ত্বেও তারা মানুষ ছিলেন। তাদের ভিতরে নফস ছিল। আর নফসের বিভিন্ন রং ও গুণের কথা কে না জানে! এ জন্য মাঝে মাঝে তাদের নফসে এমন কিছু তৈরি হতো, যেটা তাদের হৃদয় গ্রহণ করত না। তখন তারা হৃদয় দিয়ে নফসকে পরাভূত করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এমন একটি সম্প্রদায় আসে যাদের হৃদয় ছিল না। ফলে সাহাবাদের হৃদয়ের কথা তারা উপলব্ধি করতে পারল না, যে কারণে তারা সেটাকে নফসের মানদণ্ডে বিচার করল। বাহ্যিক অবস্থার উপর ফয়সালা করে এমন কিছু বিদআত ও সংশয়ে নিপতিত হলো, যা তাদের ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেল। তাদের মনে সাহাবাদের সম্পর্কে বিষ

ঢুকিয়ে দিলো। সাহাবাদের হৃদয়ের স্বচ্ছতা তাদের কাছে অজ্ঞাত থাকল। তারা ইনসাফ করতে পারল না। এভাবে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ল। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, সাহাবিদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি বন্ধ করা, তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসা এবং তাদের কাউকে কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা থেকে বিরত থাকা। যদি এমন কিছু করতেই হয়, তবে সেটা মনের ভিতর রাখো। প্রকাশ করার দরকার নেই। তাদের একজনকে আরেকজনের চেয়ে বেশি ভালোবাসার দরকার নেই। একজনের চেয়ে আরেকজনকে শ্রেষ্ঠ বলার দরকার নেই। বরং সবাইকে ভালোবাসো। সবার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দাও। বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি করতে গেলেই জটিলতা তৈরি হয়। এটুকু বিশ্বাস রাখো যে, আবু বকর, উমর, উসমান ও আলি—চারজনের খেলাফতই বিশুদ্ধ ও হক ছিল।'[১৪৭৩]

যেমনটা আমরা উপরে বলেছি, শায়খ সোহরাওয়ার্দিও মনে করতেন, এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা চাই। ফলে বাড়াবাড়ির আশঙ্কা থাকলে সাহাবাদের মর্যাদা ও স্তর নিয়ে টানা-হেঁচড়া এবং তর্ক-বিতর্ক না করা উত্তম। কারও যদি আলি রাযি.-এর প্রতি অধিক দুর্বলতা থাকে, তবে সেটা মনে মনে রাখবে। প্রকাশ করে বিভ্রান্তি তৈরি করবে না।

এটা আরও স্পষ্ট হয় বাযযাযির (৮২৭ হি.) বক্তব্যে। তিনি তাঁর মানাকিবে লিখেন, 'যদি কেউ আবু বকর, উমর ও উসমান রাযি.-এর খেলাফত ও ফযিলতের স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু বলে, আমি আলি রাযি.-কে অধিক ভালোবাসি, তবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন না, ইনশাআল্লাহ। কেননা, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, হে আল্লাহ, এটুকু আমার সাধ্যে আছে। আমার সাধ্যের বাইরের কিছুর জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না।'[১৪৭৪] অর্থাৎ, সে প্রথম তিন সাহাবার খেলাফত ও মর্যাদা স্বীকার করছে, কিন্তু আলি রাযি.-এর প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা অনুভব করছে। এটুকু করলেই কাউকে আহলে সুন্নাত থেকে খারিজ করা হবে না। এটা তার দুর্বলতা ও অক্ষমতা হিসেবে দেখতে হবে। কিন্তু কাজটাকে উত্তম মনে করলে জটিলতা। কারণ, এটা পরবর্তীকালে অন্যান্য সীমালঙ্ঘনের দিকে নিয়ে যাবে। এ জন্য ইমাম আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'কেউ যদি বলে, আমি রাসুলুল্লাহর কোনো সাহাবিকে গালি দিই না,

---

১৪৭৩. আলামুল হুদা ওয়া আকিদাতু আরবাবিত তুকা, সোহরাওয়ার্দি (৪৪-৪৬)।

১৪৭৪. মানাকিব, বাযযাযি (৩৬)।

কিন্তু আলি রাযি. বাকি সবার চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয়, তবে এই লোকের মাঝে সমস্যা আছে এবং তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হবে (رجل دغل وهو متهم)।'[১৪৭৫] অর্থাৎ, এটা যেহেতু শরিয়তের সাধারণ রুচি ও মেযাজের বিপরীত, ফলে এ ধরনের মানসিকতার ব্যক্তি আশঙ্কামুক্ত নয়। এটা যে তাকে পরবর্তী সময়ে অন্যান্য বাড়াবাড়ির দিকে ঠেলে দেবে না, এমন নিশ্চয়তা নেই। ফলে এটুকুও নিষেধ করা হবে।

আলি রাযি.-কেন্দ্রিক বিচ্যুতি

উপরের কথাগুলো হলো আলি রাযি.-কে নিয়ে আহলে সুন্নাতের সামগ্রিক অবস্থান। অর্থাৎ, চার খলিফার মাঝে আলি রাযি.-এর অবস্থান চতুর্থ স্থানে। তথাপি কেউ যদি তাঁর প্রতি অধিক ভক্তির ফলে উক্ত ধারাবাহিকতার বিরোধিতা করে, সেক্ষেত্রে স্রেফ এটুকুর কারণে তাকে সরাসরি পথভ্রষ্ট আখ্যা দেওয়া যাবে না।

বিপরীতে সেই শুরু থেকেই সাহাবাদের পরের একাধিক প্রজন্ম আলি রাযি.-এর ব্যাপারে বিপথগামী হয়েছে। বরং খোদ আলি রাযি. এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে জেনে বলে গিয়েছেন, 'আমার ব্যাপারে দুটো শ্রেণি ধ্বংস হবে—এক. আমার ভালোবাসা ও সম্মানের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনকারী। দুই. আমার বিদ্বেষের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী।'[১৪৭৬]

রাসুলুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হওয়ার ছিল না। ফলে বাস্তবেও তা-ই হয়েছে। একদল আলি রাযি.-কে কাফের আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তারা ইতিহাসে খারেজি (বিদ্রোহী), নাসেবি (আহলে বাইতের শত্রু) হিসেবে পরিচিত হয়েছে। আর কতগুলো দল বিপরীত প্রান্তিকতার শিকার হয়েছে। তারা আলি রাযি.-এর ভালোবাসা ও ভক্তির ক্ষেত্রে সব ধরনের শরয়ি সীমারেখা লঙ্ঘন করেছে। এদের একদল আলি রাযি.-কে 'খোদা' (ইলাহ) বানিয়ে দিয়েছে! এরা আবদুল্লাহ ইবনে সাবার গোষ্ঠী। আরেক দল আলি রাযি.-কে নবি বানিয়ে দিয়েছে। এরা বিভিন্ন বাতেনি সম্প্রদায়। আরেক দল আলি ও নবি-পরিবারের ভালোবাসার দোহাই দিয়ে সকল সাহাবিদের দুশমন বানিয়ে দিয়েছে। আবু বকর,

---

১৪৭৫. দেখুন : আল-আজনাস, নাতেফি (১/৪৫০-৪৫১)।

১৪৭৬. মুসনাদে আবি ইয়ালা (মুসনাদু আলি : ৫৩৪)। মুসান্নাফে আবদির রাযযাক (কিতাবুল জামে : ২০৬৪৭)। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (কিতাবুল ফাযায়েল : ৩২৭৯৭)।

উমর, উসমান, আয়েশা, হাফসা, মুআবিয়া রাযি.সহ রাসুলুল্লাহর অধিকাংশ সাহাবাকে কাফের ও ফাসেক আখ্যা দিয়েছে। এরা শিয়া ও রাফেজা নামে পরিচিত। উপরের প্রত্যেকটি দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ আকিদা থেকে বিচ্যুত, আহলে বিদআত হিসেবে পরিগণিত। তাদের কিছু কিছু গোষ্ঠী কাফের। বাকিরা পথভ্রষ্ট।[১৪৭৭]

আশারায়ে মুবাশশারা তথা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন

শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে চার খলিফার পরে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আশারায়ে মুবাশশারা বা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবি। ইমাম আজম আবদুল মালেক সূত্রে সাইদ ইবনে যায়দ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, **'দশ জন জান্নাতে—আবু বকর জান্নাতে, উমর জান্নাতে, উসমান জান্নাতে, আলি জান্নাতে, তালহা জান্নাতে, যুবাইর জান্নাতে, সাইদ জান্নাতে, আবদুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতে, আবু উবাইদা জান্নাতে। তাকে বলা হলো, আপনি? তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন।'**[১৪৭৮]

সাইদ বিন যায়দ রাযি. একবার কুফার এক মসজিদে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, একব্যক্তি সেখানে কাউকে গালি দিচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে কাকে গালি দিচ্ছে? লোকজন বলল, আলিকে! তিনি বললেন, আল্লাহর রাসুলের সাহাবিকে

১৪৭৭) বাতেনি সম্প্রদায় দ্বীনের সকল মৌলিক বিষয় এবং কুরআন-সুন্নাহকে জঘন্যভাবে অপব্যাখ্যা করে। এর ফলে ইসলামের সকল বিধানকে তারা নাকচ করে দিয়েছে। নামায-রোযা এবং ইসলামের অন্যান্য ইবাদতকে অস্তিত্বহীন করে দিয়েছে। তাদের কিছু কিছু ফিরকা আল্লাহ, ফেরেশতা, নবি-রাসুল, ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি, পরকাল—সবকিছু অস্বীকার করে। ফলে তারা কাফের। রাফেযিরাও অসংখ্য ফিরকায় বিভক্ত। তাদের একদল আলি রাযি.-কে খোদা বানিয়ে দিয়েছে। বজ্রের শব্দকে তারা আলি রাযি.-এর আওয়াজ মনে করে। আরেক দল নামায-রোযা, হজ-যাকাত—সবকিছু অস্বীকার করে। সকল হারামকে হালাল মনে করে। মাহরামের সঙ্গে বিবাহ, মদ্যপান সবকিছু বৈধ মনে করে। আরেক দল সকল সাহাবিকে কাফের মনে করে! তাদের আরেক দল মনে করে, জিবরাইল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা আলির কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জিবরাইল ভুল করে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে চলে যান! এ কারণে তারা জিবরাইল ও মুহাম্মাদ (ﷺ) দুজনকেই অভিশাপ দেয়! তারা 'মুতআ' (চুক্তিভিত্তিক) বিয়েকে বৈধ মনে করে। তারাও কাফের। হ্যাঁ, তাদের মধ্য থেকে যাদের আকিদা ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়; কেবল আলি ও আহলে বাইতকেন্দ্রিক বাড়াবাড়ি রয়েছে, সাহাবাদের যারা কাফের নয়, পাপী ও বিদ্রোহী মনে করে, তারা গোমরাহ; কাফের নয়। [দেখুন : তালখিসুল আদিল্লাহ : ৮৫১-৮৫২, বাহরুল কালাম : ২৭২]

১৪৭৮. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৯-৩০)। আল-উসুলুল মুনিফাহ (৫৮)।

গালি দেওয়া হচ্ছে আর তোমরা নীরব? কোনো প্রতিবাদ করছ না? আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি না বললে আমি এটা বলতাম না; কারণ, কাল কিয়ামতের দিন তিনি আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন, 'আবু বকর জান্নাতে, উমর জান্নাতে, উসমান জান্নাতে, আলি জান্নাতে, তালহা জান্নাতে, যুবাইর ইবনুল আওয়াম জান্নাতে, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস জান্নাতে, আবদুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতে। দশম জনের নামও আমি জানি।' লোকজন বলল, আপনি? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি বললেন, 'রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে তাদের কারও আল্লাহর পথে ধুলোয় ধূসরিত একটি লড়াই তোমাদের নুহের মতো দীর্ঘ জীবনের চেয়ে উত্তম।'[১৪৭৯]

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবা মাত্র এই দশজনই। বরং তাদের বাইরে অসংখ্য সাহাবা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। যেমন—ইমাম আজম নিজস্ব সনদে হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেখানে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা রাযি.-কে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, 'আয়েশা জান্নাতে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসুলকে জাহান্নামের কোনো অঙ্গার জীবনসঙ্গিনী হিসেবে দান করবেন এরচেয়ে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।'[১৪৮০]

তাই বরং অসংখ্য সাহাবিকেই রাসুলুল্লাহ (ﷺ) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু তাদের মাঝে এই দশজন শ্রেষ্ঠ, শীর্ষস্থানীয়, অধিকতর প্রসিদ্ধ এবং ইসলামের খেদমতে তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের দশজনকে একসঙ্গে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এ জন্য তারা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

সাহাবাদের ব্যাপারে নাসেবি ও রাফেযিদের সীমালঙ্ঘন

সাহাবাগণ এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু তারা মাসুম ছিলেন না। ফলে মানুষ যেমন ভুল করে, তাদের কেউ কেউ ভুল করেছেন, বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন। কিন্তু সাহাবা আর আমাদের মাঝে পার্থক্য হলো—তারা ভুলের পরে আল্লাহর আরও কাছাকাছি চলে যেতেন, তাদের মর্যাদা আগের চেয়ে আরও সমুন্নত

১৪৭৯. আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৬৪৯)। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল (মুসনাদুল আশারাহ আল-মুবাশশারিন বিল জান্নাহ : ১৬৫১)।

১৪৮০. শরহু মুসনাদে আবি হানিফা (৪১৭)।

হতো। এটা মূলত তাদের ইখলাস, তাওবা, অনুতাপ-অনুশোচনা ও লিল্লাহিয়্যাতের কারণে। বিপরীতে সাধারণ মানুষ একবার গুনাহে লিপ্ত হলে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তার কেবল দূরত্বই তৈরি হয়। শয়তানের পিছনে ছুটতে থাকে।

মোটকথা, সাহাবাগণ মানবিক কারণে ভুল করেছেন। বরং রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে তাদের বড় বড় সংকট তৈরি হয়েছে। তারা পারস্পরিক একাধিক যুদ্ধে জড়িয়েছেন। যেমন—রাসুলুল্লাহর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা রাযি. এবং রাসুলের জামাতা আলি (রা)-এর মাঝে সংঘটিত হওয়া জামাল যুদ্ধ। আলি রাযি. ও মুআবিয়া রাযি.-এর মাঝে সংঘটিত সিফফিন যুদ্ধ। এসব যুদ্ধে অসংখ্য বড় বড় সাহাবিও জড়িয়ে পড়েন। অনেক সাহাবি তাতে শাহাদাত বরণ করেন!

এসব দুর্ঘটনা পরবর্তী মুসলিম উম্মাহর জন্য ফেতনা (পরীক্ষা) হয়ে দাঁড়ায়। তারা রাসুলুল্লাহর সাহাবাদের এসব যুদ্ধের আলোকে বিচার করা শুরু করে। একদল সাহাবার প্রতি ভালোবাসার দাবিতে তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে অন্য দলের প্রতিপক্ষ হয়ে যায়। তাদের দুনিয়ালোভী, ফাসেক, ফাজের এমনকি কাফের বানিয়ে ফেলে। এভাবে একদল ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের প্রতিপক্ষের শত্রু হয়ে পড়ে! অথচ তারা সবাই ভুলে যায় সাহাবাদের প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসুল। আল্লাহ কি জানতেন না যে, রাসুলুল্লাহর পরে সাহাবাগণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন, বিভিন্ন ধরনের সংকট তাদের ঘিরে ধরবে, তাদের কেউ কেউ ভুল করবেন? তিনি সবকিছু জানতেন। তবুও তাদের তাকওয়া, নিষ্ঠা ও সন্তুষ্টির সনদ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ওহির মাধ্যমে ভবিতব্য এসব ঘটনা জানতে পেরেছিলেন। তবুও তিনি বলে গিয়েছেন, 'আমার প্রজন্ম সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম।'[১৪৮১] আবু সাইদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন—'তোমরা আমার সাহাবাদের গালি দিয়ো না। কারণ, তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করলেও তাদের একজনের এক মুষ্টি সমপরিমাণ হবে না।'[১৪৮২]

১৪৮১. বুখারি (কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবাহ : ৩৬৫০)। মুসলিম (কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা : ২৫৩৩)।

১৪৮২. বুখারি (কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবাহ : ৩৬৭৩)। তিরমিযি (আবওয়াবুল মানাকিব : ৩৮৬১)। আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৬৫৮)। আবু হুরাইরা থেকে মুসলিম (কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা : ২৫৪০)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুস সুন্নাহ : ১৬১)।

সাহাবাদের ব্যাপারে ইনসাফপূর্ণ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িতে লিপ্ত হয়েছে একাধিক প্রান্তিক গোষ্ঠী। মোটাদাগে তাদের দুইভাগে ভাগ করা যায়—এক. খারেজি নাসেবি, যারা আলি ও আহলে বাইতের সাহাবাদের বিদ্বেষে সীমালঙ্ঘন করেছে। দুই. শিয়া-রাফেযি, যারা আহলে বাইতের বাইরে অন্য সকল সাহাবির প্রতি বিদ্বেষে সীমালঙ্ঘন করেছে। সাহাবাসংক্রান্ত আলোচনায় ইমাম আজম রহ. একাধিক জায়গায় এই দুই প্রান্তিক সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করেছেন এবং দুই প্রান্তিকতার মাঝে আহলে সুন্নাতের ভারসাম্যপূর্ণ মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

রাফেযিরা মনে করে—আবু বকর, উমর ও উসমানসহ অন্য সাহাবিরা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের পরে মুরতাদ হয়ে গিয়েছেন, তাঁর দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছেন! ইমাম তাদের খণ্ডনে বলেন, 'নবিদের পরে সর্বোত্তম মানুষ হলেন আবু বকর সিদ্দিক রাযি., এরপর উমর ফারুক ইবনুল খাত্তাব রাযি., এরপর উসমান যুন নুরাইন ইবনে আফফান রাযি., এরপর আলি মুরতাযা ইবনে আবি তালিব রাযি.। তারা সকলেই ছিলেন ইবাদতকারী, হকের উপর অবিচল।'[১৪৮৩] ফলে রাসুলুল্লাহর পরে তাদের পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার দাবি সর্বৈব মিথ্যা।

আহলে সুন্নাতের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান

সাহাবাদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অবস্থান উপরের দুই প্রান্তিক গোষ্ঠীর বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝামাঝি। সাহাবাদের ব্যাপারে তাদের আকিদা সবচেয়ে মধ্যমপন্থি ও ভারসাম্যপূর্ণ। কয়েকভাবে এটা বাস্তবায়িত হয় :

এক. সাহাবাদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ নিয়ে কথা না বলা : সাহাবাসম্পর্কিত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মৌলিক আকিদাগুলোর একটা হলো সাহাবাদের মাঝে তৈরি হওয়া সাময়িক সংকট এবং ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখা। সেগুলো ব্যাখ্যা করতে হলে এমনভাবে করা, যা তাদের সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখে। কারণ, তারাই আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য তাদের জানমাল ব্যয় করেছেন, সুখশান্তি ও বিলাসিতা বিসর্জন দিয়েছেন, শত মুসিবত ও বিপদাপদ সহ্য করেছেন। এভাবে শত কুরবানির বদৌলতে তারা এ দ্বীনকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তারা পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষের সান্নিধ্য ও সংশ্রবপ্রাপ্ত

১৪৮৩. আল-ফিকহুল আকবার (৪-৫)।

এক মুবারক ও পবিত্র সম্প্রদায়। ফলে তাদের শানে মুখ লম্বা করা, তাদের গালি দেওয়া, ফাসেক বলা বিদআত, আহলে সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি।

কেউ বলতে পারে, আমাদের আপনারা সাহাবাদের সমালোচনা করতে নিষেধ করেন, কেউ কোনো সাহাবিকে গালি দিলে তাকে রাফেযি বলেন, স্বয়ং সাহাবারাও তো পরস্পরের সমালোচনা করেছেন। বরং যুদ্ধ করেছেন, একে অন্যের রক্ত ঝরিয়েছেন। আমরা বলব, সাহাবাদের মাঝে এসব ঘটনা ঘটেছে তাদের ইজতিহাদের কারণে। তাদের প্রত্যেকে ইজতিহাদ করেছেন। কেউ ভুল করেছেন। অন্যরা সেই ভুলের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাদের কেউ একে অন্যকে ফাসেক বলেননি, গালি দেননি। এই যদি হয় তাদের অবস্থা, আমাদের জন্য কীভাবে তাদের সমালোচনা বৈধ হয়? উপরন্তু তাদের প্রত্যেকে সঠিক কাজটা করতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে কারও ভুল হলেও তিনি ক্ষমাপ্রাপ্ত।[১৪৮৪] স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন, 'সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার যুগের মানুষ।'[১৪৮৫] অন্য হাদিসে বলেছেন, 'যখন তোমাদের সামনে আমার সাহাবাদের সমালোচনা করা হয়, তখন সেটা থেকে বিরত থাকো।'[১৪৮৬] ফলে উসমান রাযি.-এর যুগে সৃষ্ট জটিলতার আগে ও পরে সর্বাবস্থায় সকল সাহাবি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ন্যায়-ইনসাফের প্রতীক।

দুই. সকল সাহাবি 'উদুল' (ন্যায়নিষ্ঠ) : আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত আকিদা অনুযায়ী সকল সাহাবি উদুল তথা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতীক। স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল তাদের প্রশংসা করেছেন। যদি তাদের কারও কাছ থেকে এমন কোনো কাজ প্রকাশ পেয়ে থাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা খারাপ দেখায়, সেটাও ছিল ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে, প্রবৃত্তির দাসত্বে নয়, ইসলাম বা ঈমানের ক্ষতির জন্য নয়। ফলে তারা কোনো ভুল করে থাকলেও দ্রুত তাওবা করে আল্লাহর আরও অধিক প্রিয় হয়ে গিয়েছেন। নিজেদের সম্পর্ক শুধরে নিয়েছেন। দূরত্ব দূর করেছেন। ইমাম আজম একবার ইমাম মুহাম্মাদ বাকেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, **'আলি রাযি. কি উমর রাযি.-এর জানাযায় শরিক হয়েছিলেন?'**

১৪৮৪. দেখুন : তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (১১৭৯)।

১৪৮৫. বুখারি (কিতাবুশ শাহাদাত : ২৬৫২)। মুসলিম (কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবাহ : ২৫৫৩)।

১৪৮৬. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (সাওবান : ২/৯৬; হাদিস নং ১৪২৭)। আল মাতালিবুল আলিয়াহ (কিতাবুল ঈমান ওয়াত তাওহিদ : ২৯৫৬)।

তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! তিনি কি বলেননি এই কাফনে ঢাকা মানুষটির সঙ্গে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে অন্য কারও সঙ্গে উপস্থিত হওয়া আমার কাছে প্রিয় নয়? তা ছাড়া, তিনি তার সঙ্গে নিজ মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। যদি তাকে যোগ্য মনে না-ই করতেন, তবে কখনো এটা করতেন? তার মেয়ে ছিলেন জগতের শ্রেষ্ঠ নারীদের একজন।'[১৪৮৭]

উমর ইবনে আবদিল আযিয রহ.-কে আলি, উসমান, জামাল ও সিফফিন যুদ্ধের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা সেসব রক্ত থেকে আমার হাত রক্ষা করেছেন। তাহলে সেগুলোতে কেন আমার মুখ ডোবাব?'[১৪৮৮]

হ্যাঁ, আহলে সুন্নাতের মতে, আলি ও মুআবিয়া রাযি.-এর মধ্যকার যুদ্ধে আলি রাযি. ছিলেন হকের উপর। মুআবিয়া রাযি. ভুল করেছেন। এটুকু বলা যাবে। কিন্তু এটা বলতে গিয়ে প্রতিপক্ষের সমালোচনার আশঙ্কা থাকলে এসব আলোচনা সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। ইমাম আজম বলেন, **'যুদ্ধের ক্ষেত্রে আলি রাযি. সঠিক ছিলেন। তার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছে, তারা ভুলের উপর ছিল। তবে আমরা তালহা, যুবাইর, আয়েশা রাযি. প্রমুখ সাহাবির যুদ্ধ সম্পর্কে চুপ থাকব এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব না।'**[১৪৮৯] মক্কি বর্ণনা করেন, ইমাম আজমকে আলি ও মুআবিয়া এবং সিফফিনের শহিদদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, **'এ ব্যাপারে কথা বলতে আমি পরকালে আল্লাহর জবাবদিহিতার ভয় করি। তা ছাড়া, পরকালে আল্লাহ আমাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন না। বরং আমাকে আমার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তাই সেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকাই উত্তম।'**[১৪৯০]

সুতরাং কোনো যুক্তিতেই সাহাবিদের 'আদালতের' (সত্যনিষ্ঠার) বিরুদ্ধাচার বৈধ নয়। তাদের সমালোচনা বৈধ নয়। ফলে কেউ যদি আলি রাযি.-কে অধিক ভালোবাসে, তার জন্য মুআবিয়া রাযি.-এর সঙ্গে দুশমনি করা বৈধ নয়।

১৪৮৭. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৫৮)।
১৪৮৮. তাবাকাতে ইবনে সাদ (৭/৩৮২)।
১৪৮৯. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৫৮)।
১৪৯০. মানাকিব, মক্কি (৩৪৭)।

তাফতাযানি লিখেন, 'সালাফে সালেহিন এবং পূর্ববর্তী যুগের একজন আলেমও মুআবিয়া রাযি. এবং তাঁর বাহিনীর লোকদের অভিশাপ দেওয়ার বৈধতার কথা বলেননি।[১৪৯১] গযনবি লিখেন, 'আলি ও মুআবিয়া রাযি.-এর মাঝে যা হয়েছে

১৪৯১. শরহুল আকায়েদ, তাফতাযানি (১০৩)। এখানে প্রসঙ্গক্রমে মুআবিয়া রাযি.-এর সন্তান ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়ার কথা এসে যায়। তার ব্যাপারে ইমামদের লম্বা ও প্রসিদ্ধ মতভেদ রয়েছে। একদল ইমাম তাকে লানত (অভিশাপ) দেওয়া বৈধ মনে করতেন, আরেক দল বৈধ মনে করতেন না। তৃতীয় আরেক দল এ ব্যাপারে বৈধতা-অবৈধতা দুটোর একটাও অবলম্বন না করে নীরব থাকাকে অগ্রাধিকার দেন।

আলাউদ্দিন বুখারি লিখেন, 'একদল আলেমের মতে ইয়াযিদকে লানত করা বৈধ নয়। কারণ, সে মুসলিম ছিল। আর মুসলিম ক্ষমার উপযুক্ত। আরেক দলের মতে লানত করা বৈধ। আরেক দল বলেন, যদি সে হুসাইন রাযি.-এর হত্যায় খুশি হয়ে থাকে, তাহলে লানত করা বৈধ, অন্যথায় নয়।' বুখারির মতে, 'এটাই সঠিক কথা।' [রিসালাহ ফিল ইতিকাদ : ১৬২-১৬৩]

'খোলাসা গ্রন্থে এসেছে—যেমনটা তাফতাযানি ও আলি কারি বর্ণনা করেন—'ইয়াযিদকে লানত করা উচিত নয়, হাজ্জাজকেও নয়। কারণ, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নামায আদায়কারী এবং আহলে কিবলা (তথা মুসলমানদের) লানত করতে নিষেধ করেছেন।' [শরহুল আকায়েদ : ১০৩; শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি : ২১৭] ইমাম গাযালিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হুসাইন রাযি.-কে হত্যাকারী অথবা হত্যার নির্দেশ দানকারী হিসেবে ইয়াযিদকে লানত করা বৈধ কি না? জবাবে তিনি বলেন, 'এটা আমাদের কাছে প্রমাণিত নয়। ফলে তাকে লানত দেওয়া বৈধ নয়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একাধিক হাদিসে মুসলমানকে লানত করতে নিষেধ করেছেন। [ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৩/১২৫] ইমাম ইবনুস সালাহকে ইয়াযিদের লানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'ইয়াযিদকে গালি কিংবা লানত দেওয়া মুমিনের কাজ নয়। কারণ, সে-ই হুসাইন রাযি.-কে হত্যা করেছে এমন কোনো প্রমাণ আমার হাতে নেই। আর হত্যা করে থাকলেও তাতে সে কাফের হবে না, মুসলমান থাকবে। আর মুসলমানকে লানত করা হত্যা করার সমান।' [আন-তানভির শরহুল জামে আস-সগির, সানআনি ১/৯৭]। রমলি লিখেন, 'ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়াকে লানত করা বৈধ নয়।' [ফাতাওয়া রমলি ৪/৩৩৪] আলি কারি লিখেন, 'নির্ধারিতভাবে ইয়াযিদকে লানত দেওয়া বৈধ নয়।' [শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (দারুল বাশায়ের) ২১৭]

আরেক দল আলেম ইয়াযিদকে লানত করা বৈধ মনে করেন। তাফতাযানি লিখেন, 'হুসাইন রাযি.-এর হত্যায় ইয়াযিদের সম্মতি ছিল। সে হত্যার খবর শুনে খুশি হয়েছিল। আহলে বাইতের সদস্যকে সে লাঞ্ছিত করেছে। এ সবকিছুই একাধিক সূত্রে প্রমাণিত। ফলে আমরা তার ব্যাপারে নীরব থাকি না, বরং তার লানতকে বৈধ মনে করি।' উক্ত বক্তব্যের পর তাফতাযানি মুখের কথাকে কাজেও পরিণত করেন। তিনি ইয়াযিদকে লানত দিয়ে লিখেন, 'তার এবং তার সঙ্গীদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।' [দেখুন : শরহুল আকায়েদ : ১০৩] ইবনুল জাওযি ইয়াযিদের লানতের বৈধতায় স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকাও লিখেছেন।

বিপরীতে একদল আলেম এ ব্যাপারে নীরব থাকাকে অগ্রাধিকার দিতেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়াযিদকে লানত দেওয়ার ব্যাপারে আপনার মত কী? আহমদ বললেন, 'আমি এ ব্যাপারে কথা বলি না।' তাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মুসলমানকে লানত দেওয়াকে হত্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ...ফলে এ ব্যাপারে চুপ থাকাই আমার পছন্দ।' [দেখুন : আস-সুন্নাহ, খাল্লাল : ৩/৫২১]

এ ব্যাপারে ইমাম আজম রহ. কিংবা তাঁর শীর্ষ শাগরেদগণ থেকে কোনো বক্তব্য নেই। ফলে সম্ভবত তারাও এক্ষেত্রে নীরব থাকা পছন্দ করতেন। কামাল ইবনুল হুমাম লিখেন, 'ইয়াযিদের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সুতরাং তার ব্যাপারে নীরব থাকা এবং আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেওয়াই উত্তম।' [আল-মুসায়ারাহ : ১৬৯]

উপরন্তু ইমাম আজম রহ.-এর একটি মূলনীতি অনুযায়ী লানত না দেওয়াই প্রমাণিত হয়। আবু মুকাতিল ইমাম আজমকে প্রশ্ন করেন, কবিরা গুনাহকারীর জন্য ইস্তিগফার করা উত্তম, নাকি তার উপর লানত করা? ইমাম বলেন, 'শিরক ছাড়া গুনাহ দুই প্রকার—একটা হলো আল্লাহসম্পর্কিত গুনাহ (আল্লাহর হক), আরেকটা হলো বান্দাসম্পর্কিত গুনাহ (বান্দার হক)। উভয় ক্ষেত্রেই লানতের চেয়ে ইস্তিগফার করা উত্তম। তবে লানত করলেও গুনাহ হবে না। সুতরাং যদি কেউ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো গুনাহ করে (উদাহরণস্বরূপ : হক নষ্ট করা), কিন্তু সে ওটা ক্ষমা করে দেয়, লানত না করে, তবে সেটা তো উত্তম। আর যদি আল্লাহসম্পর্কিত কোনো গুনাহ করে এবং সেটা শিরক না হয়, তবে সেক্ষেত্রেও কালিমার সম্মানের দিকে তাকিয়ে তার জন্য ইস্তিগফারের দোয়া করা উত্তম। তবে যদি ধ্বংসের দোয়া করা হয়, গুনাহ হবে না। যেমন বলা হলো, হে আল্লাহ, তাকে তার গুনাহের কারণে ধ্বংস করে দিন। তবে গুনাহ ছাড়া এভাবে ধ্বংসের দোয়া করলে উলটো বদদোয়াকারীর গুনাহ হবে। সারকথা হচ্ছে, উভয়ক্ষেত্রেই বদদোয়া না দিয়ে ইস্তিগফার ও দোয়া উত্তম। কারণ, একদিকে সে মুমিন, অপরদিকে কারও জানা নেই যে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন কি না। কারণ, সেটা যদি জানাই থাকত (যেমন : কাফেরকে আল্লাহ শাস্তি দেবেন), সেক্ষেত্রে (ক্ষমার) দোয়া করা তো নিষিদ্ধ। কারণ, কাফেরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অর্থ হলো আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা। একইভাবে মুমিনের জন্য শাস্তির দোয়া করাও আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা। কারণ, আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন কি না সেটা সুস্পষ্টভাবে জানা নেই। হতে পারে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার ফয়সালা করেছেন, অথচ মানুষ তাকে শাস্তি দেওয়ার দোয়া করছে! কালিমার চেয়ে বড় পুণ্যের কাজ আর কিছু হতে পারে না। সাত আকাশ, সাত যমিন এবং এগুলোর মাঝের জায়গার তুলনায় একটা ডিম যতটা ক্ষুদ্র, কালিমার তুলনায় সকল ফরয ইবাদতের পরিমাণ তারচেয়েও নগণ্য। বিপরীতে সকল গুনাহের মাঝে শিরক সবচেয়ে জঘন্য। আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিলেও শিরক ক্ষমা করবেন না। তিনি কুরআনে এটাকে সবচেয়ে বড় জুলুম আখ্যা দিয়েছেন [লুকমান : ১৩]। সুতরাং কোনো ব্যক্তি কালিমা পড়ার পরে গুনাহ করে ফেললেও শিরক থেকে বেঁচে থাকার কারণে এবং কালিমার মর্যাদার দিকে তাকিয়ে তার জন্য অভিশাপের পরিবর্তে দোয়া করা উচিত।' [আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম ১৭-১৮] কিন্তু এটা ইমাম আজমের সাধারণ ও উন্মুক্ত বক্তব্য। সরাসরি ইয়াযিদের ব্যাপারে তাঁর কোনো বক্তব্য আমাদের চোখে পড়েনি।

এ ব্যাপারে অধমের কথা হলো, তিনটি মতের ক্ষেত্রেই যুক্তি ও দলিল-প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং যদি কেউ আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসার ভাবাবেগে ইয়াযিদকে লানত করেন, তবে সেটাকে গুনাহের কাজ বলার সুযোগ নেই। আবার কেউ যদি দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে ইয়াযিদকে লানত দেওয়া অবৈধ মনে করেন, সেটাকেও ছুড়ে ফেলার সুযোগ নেই। তবে সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা, যেটা আমাদের অধিকাংশ সালাফের মানহাজ। এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য নেই। কারণ, এটা দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো জরুরি বিষয় নয়। অন্যদিক থেকে এ ব্যাপারে কথা বলা বরং ঝুঁকিপূর্ণ। অনেকেই ইয়াযিদের ব্যাপারে কথা শুরু করে শেষ পর্যন্ত তার পিতা সাইয়েদুনা মুআবিয়া রাযি.-এর উপর অভিশাপ কিংবা গোস্বা দিয়ে শেষ করে। এটা অভিজ্ঞতালব্ধ দুঃখজনক বাস্তবতা। ফলে ইয়াযিদের ব্যাপারে নীরব থাকাই উত্তম। আল্লাহু আলাম।

সেটা ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে হয়েছে। এক্ষেত্রে আলি রাযি. ছিলেন হকের উপর। তবে যেহেতু প্রত্যেকে ইজতিহাদ করেছেন, তাই যার ইজতিহাদ ভুল হয়েছে তিনিও পুণ্যের অধিকারী হবেন।'[১৪৯২]

বরং কেবল সিফফিন নয়, সকল যুদ্ধেই আলি রাযি. ছিলেন হকের উপর। হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আজম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, **'আলি রাযি. যার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছেন, প্রতিপক্ষের চেয়ে তিনি অধিকতর হকের উপর ছিলেন।'** ইমাম আরও বলেন, **'আলি ইবনে আবি তালিব কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে আমাদের হুজ্জত (দলিল)। তিনি না থাকলে আমরা জানতেই পারতাম না বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কীভাবে (আদর্শপূর্ণ) হয়! অথবা আহলে কিবলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কীভাবে (মহানুভবতাপূর্ণ) হয়।'**[১৪৯৩]

নাসাফি ইমামের অনুসরণে বলেন, 'জামালের যুদ্ধে আলি রাযি. ছিলেন সঠিক। কারণ, তিনি ছিলেন ইমাম। ফলে অন্যদের জন্য তার আনুগত্য করা জরুরি ছিল। ...একই কথা সিফফিনের ময়দানে আহলে শামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, এখানেও আলি ছিলেন হকের উপর। তা ছাড়া, আলি ও মুআবিয়ার মাঝে ব্যবধান ছিল অনেক। শ্রেষ্ঠত্ব, জ্ঞান, বীরত্ব, কুরবানি, ইসলামের প্রতি অগ্রগামিতা—সর্বক্ষেত্রে আলি রাযি. মুআবিয়া রাযি.-এর চেয়ে সুস্পষ্টভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু মুআবিয়া রাযি. ইজতিহাদ করেছেন। আর সেক্ষেত্রে ভুল করেছেন। তবে যেহেতু তাবিলের কারণে ভুল করেছেন, এ জন্য তাকে পাপী (ফাসেক) বলার সুযোগ নেই।'[১৪৯৪]

মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখি বলেন, 'মুআবিয়া, খারেজিসহ বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আলি রাযি. ছিলেন হকের উপর। যে এটার বিপরীত বলবে, সে বিভ্রান্ত খারেজি গণ্য হবে। তিনি আরও বলেন, তালহা, যুবাইর, আয়েশা রাযি. প্রমুখ (ভুল করেছেন এবং) তাওবা করেছেন। হকের পথে ফিরে এসেছেন। উপরন্তু আয়েশা রাযি. যুদ্ধের জন্য নয়, সন্ধির জন্য এসেছিলেন। তারা সকলে

১৪৯২. উসুলুদ্দিন, গযনবি (২৯৪-২৯৫)।

১৪৯৩. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৫৯- ১৬০)।

১৪৯৪. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (২/১১৬৬-১১৬৭, ১১৭২)।

জান্নাতি। আমরা তাদের কেবল উত্তমরূপেই স্মরণ করি।'[১৪৯৫] কাযি সদর বাযদাবি বলেন, 'আলি রাযি. ছিলেন হকের উপর। মুআবিয়া ছিলেন ভুলের উপর। তবে তিনি ইজতিহাদ করেছেন।'[১৪৯৬]

মোটকথা, সাহাবাদের মাঝে যিনি হকের উপর ছিলেন আর যিনি ভুলের শিকার হয়েছেন, উভয়ই আল্লাহর কাছে সম্মানিত। আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট। ফলে তাদের কারও প্রতি বিদ্বেষ রাখা যাবে না, কারও সমালোচনা করা যাবে না। ইমাম গাযালি লিখেন, কুরআন ও সুন্নাহ সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষী। সংঘবদ্ধভাবে যেমন তাদের প্রশংসা করা হয়েছে, স্বতন্ত্রভাবেও তাদের প্রত্যেকের প্রশংসা করা হয়েছে। সুতরাং সাহাবাদের ব্যাপারে এসব আকিদা মনে রাখা দরকার। তাদের ব্যাপারে মনে কখনোই কুধারণা স্থান দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, তাদের ব্যাপারে কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো সুধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক; কিন্তু সেসব বর্ণনার অধিকাংশই তাদের শত্রুদের মনগড়া ও ভিত্তিহীন। আর যেগুলো প্রমাণিত, সেগুলোও বিভিন্ন ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। সেসব জায়গায় ভুলভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব ছিল না। ফলে তারা ভুল করলেও তাদের উদ্দেশ্য কল্যাণকর ছিল। তাই তাদের ব্যাপারে সুধারণা রাখা আবশ্যক।[১৪৯৭]

তিন. সকল সাহাবাকে ভালোবাসা। কারও সমালোচনা না করা। কারও প্রতি বিদ্বেষ না রাখা। কোনো সাহাবি থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা না করা। কাউকে ভালোবাসা আর কারও সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা থেকেই সকল অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনের উৎপত্তি। ফলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে ভালোবাসা কর্তব্য। ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. বলেন, **'আমরা সকল সাহাবির প্রতি ভালোবাসার সম্পর্ক রাখি, ভালোর সঙ্গে তাদের স্মরণ করি।'**[১৪৯৮] আল-ফিকহুল আবসাতে এসেছে, ইমাম বলেন, **'আমরা রাসুলুল্লাহর (ﷺ) কোনো সাহাবি থেকে নিজেদের মুক্ত ও সম্পর্কহীন ঘোষণা করি না। আমরা তাদের কাউকে ভালোবেসে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ রাখি না।'**[১৪৯৯]

১৪৯৫. আল-ইতিকাদ, বলখি (১০৯)।

১৪৯৬. উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (২০৩)।

১৪৯৭. দেখুন : আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ (১৭৩; দারু কুতাইবা) [১৩১; দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ]।

১৪৯৮. আল-ফিকহুল আকবার (৪-৫)।

১৪৯৯. আল-ফিকহুল আবসাত (৪০)।

ইবনে আবদিল বার ইমামপুত্র হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম বলেছেন : (আহলে সুন্নাত ওয়াল) জামাত হলো : আবু বকর, উমর, আলি ও উসমানকে শ্রেষ্ঠ বলা, **রাসুলের কোনো সাহাবির সমালোচনা না করা**, গুনাহের কারণে কাউকে কাফের না বলা, প্রত্যেক মুমিনের জানাযা পড়া, প্রত্যেক মুমিনের পিছনে নামায পড়া, মোজার উপর মাসাহ করা, তাকদিরের ভালোমন্দ আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া এবং আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে কথা বলা পরিত্যাগ করা।[১৫০০]

এটাই ইমাম আজমের সকল শাগরেদ এবং তাদের পরবর্তী সকল হানাফি আলেমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তোমরা বিভ্রান্ত ও তর্কপ্রিয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিতর্ক করো না। চারটি বিষয় মনে রাখতে পারলে তোমরা এই উম্মতের প্রথম প্রজন্ম যে পথে ছিল সে পথে থাকতে পারবে : (এক.) 'তাকদিরের ভালোমন্দ সবকিছুতে বিশ্বাস রাখবে। (দুই.) গুনাহের কারণে কোনো মুসলিমকে কাফের বলবে না। (তিন.) নিজেদের ঈমানের মাঝে সন্দেহ করবে না। (চার.) **আল্লাহর রাসুলের কোনো সাহাবির সমালোচনা করবে না।**'[১৫০১]

আবু হাফস আল কাবির (তাঁর শায়খ) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, **'তোমরা আল্লাহর রাসুলের সাহাবাদের ব্যাপারে ভালো ব্যতীত কোনো মন্দ কথা বলো না।'**[১৫০২]

আবু হাফস বলেন, 'আহলে সুন্নাতের নীতি হলো রাসুলুল্লাহর সাহাবাদের ব্যাপারে মন্দ কথা না বলা, তাদের সমালোচনা না করা। যে ব্যক্তি তাদের নামে মন্দ বলবে, সে পথভ্রষ্ট ও বিদআতি।'[১৫০৩]

আবুল লাইস সমরকন্দি লিখেন, 'আমরা রাসুলুল্লাহর কোনো সাহাবি থেকে নিজেদের সম্পর্কহীন ঘোষণা করি না। এটা রাফেযি সম্প্রদায়ের নীতি। তারা আলি রাযি. ছাড়া অন্য সাহাবিদের থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করে। অথচ রাসুলুল্লাহ তাঁর সকল সাহাবির প্রশংসা করেছেন। যেমন—আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেন,

---

১৫০০. আল-ইনতিকা (৩১৫)।

১৫০১. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১২৪)।

১৫০২. প্রাগুক্ত (১২২, ১২৪)।

১৫০৩. আস-সাওয়াদুল আজম (২৬)।

'আমার সাহাবিরা আকাশের তারার মতো। তাদের ভিতর থেকে তোমরা যার অনুসরণ করবে, হেদায়াত পাবে।' শিয়াদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হলো, শিয়ারা সকল সাহাবিকে বাদ দিয়ে কেবল আলিকে মহব্বত করে; তাকে নিজেদের বন্ধু ও অভিভাবক ঘোষণা করে। কিন্তু আমরা সকল সাহাবিকে মহব্বত করি।'[১৫০৪]

চার. সাহাবাদের সমালোচনা কখনো পাপ, কখনো কুফর : সাহাবাদের প্রতি ভালোবাসা স্রেফ মুস্তাহাব আমল নয়। সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ ও সমালোচনা থেকে বেঁচে থাকা নফল কাজ নয়। এমন নয় যে, মনে চাইলে করা হবে, মনে না চাইলে করা হবে না; বরং এগুলো দ্বীনের জন্য আবশ্যক। ইসলামি আকিদার অংশ। কারণ, সাহাবাদের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে সাধারণ মুমিন থেকে ওলি-আউলিয়া ও সিদ্দিকদের স্তরে উন্নীত করে। অপরদিকে সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ একজন মুমিনকে মুনাফিকে পরিণত করে, তার হৃদয়কে অসুস্থ করে, অন্তরে পর্দা ফেলে দেয়। অনেক সময় ইসলাম থেকে বের করে কুফর ও বদদ্বীনির দিকে নিয়ে যায়। সাহাবাদের সমালোচনা একসময় খোদ রাসুলুল্লাহর সমালোচনা এবং কুরআন-হাদিসের সমালোচনার পথ উন্মুক্ত করে। এ জন্য আমাদের সালাফে সালেহিন এ ব্যাপারে তাদের আকিদার গ্রন্থগুলোতে সতর্ক করেছেন।

ইমাম আজম রহ. সাহাবাদের ভালোবাসা মুমিন হওয়ার লক্ষণ আর সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ মুনাফিক হওয়ার লক্ষণ সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন, **'প্রত্যেক মুত্তাকি মুমিন তাদের ভালোবাসে। আর দুর্ভাগা মুনাফিক তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে।'**[১৫০৫] তহাবি লিখেন, 'যে ব্যক্তি রাসুলের সাহাবি, তাঁর পূতপবিত্র সহধর্মিনীগণ এবং তাঁর নিষ্কলুষ সন্তানগণের ক্ষেত্রে উত্তম কথা বলে, সে মুনাফিকি থেকে মুক্ত।'[১৫০৬] তহাবি আরও লেখন, 'আমরা রাসুলুল্লাহর সকল সাহাবিকে ভালোবাসি। তাদের ভালোবাসাকে দ্বীন, ঈমান ও ইহসান আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখাকে কুফর, নিফাক এবং সীমালঙ্ঘন মনে করি।'[১৫০৭]

উপরের বক্তব্য থেকে প্রাপ্ত ফলাফল হলো, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ সর্বাবস্থায় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বিবেচিত হবে। কারণ, সাহাবাবিদ্বেষীর পরিণতি সুন্দর

১৫০৪. শরহুল ফিকহিল আকবার, সমরকন্দি (১০)।
১৫০৫. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৪৪)।
১৫০৬. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (৩০)।
১৫০৭. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৯)।

হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে দুরারোগ্য ও সর্বনাশা ব্যাধি আর নেই। দুনিয়ার বিধান হিসেবে সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ কখনো ফিসক তথা গুনাহ ও নিফাকি বিবেচিত হবে, আবার কখনো কুফর বিবেচিত হবে। অর্থাৎ, যখন ব্যক্তিগত রোষ কিংবা হিংসা বা মতাদর্শিক কারণে কোনো সাহাবিকে অপছন্দ করবে, সাহাবির ব্যাপারে মন্দ বলবে, সেটা পাপ ও মুনাফিকি বিবেচিত হবে। কিন্তু এই হিংসা-বিদ্বেষ যদি কোনো সাহাবির ব্যাপারে এমন কোনো কটুকথা কিংবা সমালোচনার দিকে নিয়ে যায় যা কুরআন ও দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তবে সেটা কুফর হবে।

উদাহরণস্বরূপ সকল উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কেউ আয়েশা রাযি.-এর জীবনের স্বাভাবিক কোনো দিক নিয়ে সমালোচনা করে, তবে সেটা গুনাহ; কুফর নয়। কিন্তু কেউ যদি তাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তাঁর উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা প্রকারান্তরে কুরআনকে অস্বীকার করা। ইমাম আজম বলেন, **‘খাদিজাতুল কুবরার পরে আয়েশা রাযি. জগতের নারীদের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি মুমিনদের মাতা (উম্মুল মুমিনিন)। ব্যভিচার থেকে পবিত্র। রাফেযিদের অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যদি তাকে কেউ ব্যভিচারিণী বলে, তবে সে নিজে ব্যভিচারের ফসল।’**[১৫০৮]

অভিন্ন মূলনীতি অনুযায়ী কেউ যদি আবু বকর রাযি.-এর সমালোচনা করে, তবে সে পাপী ও মুনাফিক বিবেচিত হবে। কিন্তু কেউ যদি তাঁর সাহাবি হওয়া অস্বীকার করে, তবে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, তাঁর সাহাবি হওয়া কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। একইভাবে রাসুলুল্লাহর কোনো সাহাবির প্রতি ‘সাহাবি হওয়ার’ কারণে বিদ্বেষ রাখলে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। কারণ, সেটা মূলত রাসুলুল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ রাখা।

মোটকথা, স্বাভাবিক অবস্থায় সাহাবাদের সমালোচনা ফিসক তথা গুনাহের কাজ বিবেচিত হবে। কিন্তু সমালোচনা যদি কুরআন কিংবা মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিংবা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার নামান্তর হয়, সেটা কুফর হবে। নাসাফি লিখেন, ‘সাহাবাদের সমালোচনা যদি (কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত) কোনো মৌলিক বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, সেটা

১৫০৮. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৬১)।

কুফর গণ্য হবে। যেমন—আয়েশা রাযি.-কে অপবাদ দেওয়া (কারণ, তাতে কুরআনকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা হয়) কুফর। কিন্তু সাধারণ সমালোচনা গুনাহের কাজ ও বিদআত।'[১৫০৯]

আহলে বাইতকে ভালোবাসা শিয়া হওয়া নয়

আহলে বাইতের প্রতি আহলে সুন্নাতের অনুসারীরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করলেও এক্ষেত্রে অনেক সময় বিচ্যুতি দেখা যায়। অর্থাৎ, অনেকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন বলতে অন্যান্য সাহাবির মতো তাদের সমান ভালোবাসা বোঝে। তাদের প্রতি একটু বেশি ভালোবাসাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। অথচ আহলে বাইত রাসুলুল্লাহর পরিবার। ফলে তাদের নিজের চেয়ে, নিজের পরিবারের চেয়ে বেশি ভালোবাসা কর্তব্য। জীবনের শেষ লগ্নে তথা বিদায় হজ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে 'গদিরে খুম্ম' অঞ্চলে প্রদত্ত ঐতিহাসিক খুতবায় রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তিনবার সাহাবাদের বললেন, 'আমি তোমাদের আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।'[১৫১০]

সুতরাং রাসুলুল্লাহর চলে যাওয়ার পরে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব উম্মাহর কাঁধে। আহলে বাইতের প্রতি কারও গভীর ভালোবাসা ও আকর্ষণ থাকলে সেটাকে মোটেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা যাবে না। হ্যাঁ, ভালোবাসার নামে যদি অতিরঞ্জন করা হয়, সুন্নাহবিরোধী কোনো কথা বা কাজ করা হয়, সেটা ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু অন্য সাহাবিদের প্রতি বিদ্বেষ না রেখে আহলে বাইতের প্রতি অধিকতর মহব্বত ও দুর্বলতার মাঝেও ষড়যন্ত্র কিংবা 'শিয়াবাদ' সন্ধান করা অনুচিত। এটা একটা পুরোনো রোগ। যুগে যুগে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের হাতে বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। যেমন—ইমাম আজমের ক্ষেত্রেও এ ধরনের লোকেরা অভিন্ন আচরণ করেছে। সাহাবায়ে কেরাম বিশেষত আহলে বাইতের প্রতি ইমামের অত্যধিক মহব্বতের কারণে একদল মানুষ তাকে শিয়া হওয়ার অপবাদ দিয়েছে! অথচ তিনি এমন অপবাদ থেকে মুক্ত।

আহলে বাইত, বিশেষত আলি রাযি.-এর প্রতি তাঁর মহব্বতের একাধিক উদাহরণ পিছনে আমরা উল্লেখ করেছি। সেখানে দেখেছি তিনি আলি রাযি.-এর

১৫০৯. শরহুল আকায়েদ, তাফতাযানি (১০২)।

১৫১০. মুসলিম (ফাযায়িলুস সাহাবাহ : ২৪০৮)। সুনানে কুবরা, নাসায়ি (কিতাবুল মানাকিব : ৮১১৯)। সহিহ ইবনে খুযাইমা (কিতাবুয যাকাত : ২৩৫৭)।

নাম উসমান রাযি.-এর নামের আগে কিংবা একসঙ্গে রাখতেন। যদিও মর্যাদার দিক থেকে তিনি আহলে সুন্নাতের অনুসরণে আলিকে পরে রাখতেন, কিন্তু মহব্বত করতেন অনেক বেশি। ফলে কেউ যেন আলির প্রতি বিরূপ ধারণা না রাখে, সে জন্য তিনি কখনো কখনো তাকে উসমান রাযি.-এর আগে উল্লেখ করতেন! বরং তিনি বলতেন, **'আলি আমাদের কাছে উসমানের চেয়ে বেশি প্রিয়।'**[১৫১১]

আলি রাযি.-এর প্রতি এই ভালোবাসা ইমাম থেকে বারংবার প্রকাশ পেয়েছে। সালম ইবনে সালেম বলেন, আবু হানিফা রহ. একবার উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বলেন, 'তোমরা কি জানো আহলে বসরা কেন আমাদের অপছন্দ করে?' সবাই বলল, না। ইমাম বললেন, **'কারণ, আমরা যদি সিফফিনের ময়দানে উপস্থিত থাকতাম, তবে মুআবিয়ার বিপরীতে আলির শিবিরে যোগ দিতাম! এ কারণে তারা আমাদের পছন্দ করে না।'**[১৫১২]

উক্ত বর্ণনায় হক ও আহলে বাইত দুটোর প্রতি ইমাম আজমের নিবেদিতপ্রাণ হওয়া প্রকাশ পায়। কারণ, আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মতিক্রমে আলি ও মুআবিয়া রাযি.-এর মধ্যে সৃষ্ট সংকটে আলি রাযি. ছিলেন হকের উপর, আর মুআবিয়া রাযি. ইজতিহাদি ভুলের শিকার ছিলেন। অপরদিকে আলি রাযি. মর্যাদায় মুআবিয়া রাযি.-এর অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি ছিলেন সেই মানুষ যার ব্যাপারে নবিজি বলে গিয়েছেন, 'তোমাকে কেবল মুমিনই ভালোবাসে, কেবল মুনাফিকই তোমাকে ঘৃণা করে।'[১৫১৩] ফলে তাঁর শিবিরে থাকা যেকোনো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীর প্রত্যাশা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এতে তাকে শিয়া হতে হবে না।

আলি রাযি.-এর পরে তাঁর বংশধর তথা আহলে বাইতের প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে ইমাম আজমের গভীর মহব্বতপূর্ণ ও মজবুত সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আহলে বাইতের পাশে ছিলেন তিনি। উমাইয়া ও আব্বাসি শাসকদের প্রতি তিনি বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি রাখতেন। কেবল এটুকু নয়—যেমনটা পিছনে বলা হয়েছে—তিনি জালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহগুলোতে আহলে বাইতের সদস্যদের প্রকাশ্য সমর্থন দিয়েছেন। অর্থ, ফাতাওয়া, পরামর্শ ও দোয়ার মাধ্যমে

১৫১১. দেখুন : মানাকিব, মক্কি (৩৪৩, ২৫৯)। কাশফুল আসার, হারেসি (১/১৪৬-১৪৭)।

১৫১২. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৫৯)।

১৫১৩. তিরমিযি (আবওয়াবুল মানাকিব : ৩৭৩৬)। সুনানে কুবরা, নাসায়ি (কিতাবুল খাসাইস : ৮৪৩৩)।

সহায়তা অব্যাহত রেখেছেন। কখনোই নিজের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে শাসকের সঙ্গ দেননি। যায়দ ইবনে আলি বিদ্রোহ করলে তিনি তার কাছে দশ হাজার দিরহাম অর্থ পাঠিয়ে বলেন, 'এটা আপনার সংগ্রামে কাজে লাগান।' নিজেও অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু হুসাইন রাযি.-এর মতো যায়দ ইবনে আলির সঙ্গেও কুফাবাসীর গাদ্দারির আশঙ্কায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন (এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর আশঙ্কাই বাস্তবায়িত হয়েছিল)। অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁর কাছে মানুষের আমানত গচ্ছিত ছিল। এগুলো ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া শহিদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি যায়দ ইবনে আলির সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। ইবরাহিম ইবনে সুওয়াইদ বলেন, আমি আবু হানিফাকে ইবরাহিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের (বিদ্রোহের) ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি, আপনার কাছে হজ উত্তম, নাকি এটা (অর্থাৎ, তার বিদ্রোহে শরিক হওয়া)? তিনি বলেন, **'ফরয হজের পরে একটি যুদ্ধে শরিক হওয়া পঞ্চাশটি হজের চেয়ে উত্তম।'**[১৫১৪]

ফলে শরয়ি সীমার ভিতরে থেকে আহলে বাইত কিংবা আলি রাযি.-এর প্রতি মহব্বত থাকার কারণে কাউকে শিয়া বলা ভ্রান্ত নাসেবিদের বৈশিষ্ট্য। এটাকে গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। বরং যুগে যুগে আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসাবঞ্চিত নাসেবিয়্যাতের বাতাসলাগা কিছু মানুষ এটা করেছে। যে-ই রাসুলুল্লাহর পরিবারের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছে, তাকেই তারা রাফেযি আখ্যা দিয়েছে। যেমন—ইমাম আজমের সঙ্গে এটা হয়েছে। তাঁর পরে শাফেয়ির সঙ্গেও হয়েছে। আবু নুআইম বর্ণনা করেন, শাফেয়ি রহ. আহলে বাইতকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, পছন্দ করতেন। ফলে কিছু মানুষ তার সমালোচনা করে। কেউ কেউ তাকে রাফেযি বানিয়ে দেয়। তখন তিনি বলেন, যদি মুহাম্মাদের পরিবারকে ভালোবাসলে 'রাফেযি' হতে হয়, তবে জিন ও ইনসান সাক্ষী থাকুক, আমি রাফেযি।[১৫১৫]

ইমাম আজমের ক্ষেত্রেও এমন হয়েছে। আহলে বাইতের প্রতি ইমামের ভালোবাসাকে কিছু লোক ভুল বুঝেছেন কিংবা ভুল শব্দে ব্যক্ত করেছেন। তারা ইমাম আজমকে শিয়া আখ্যা দিয়েছেন। হ্যাঁ, যদিও প্রাচীন পরিভাষায় আলি রাযি. এবং আহলে বাইতের প্রতি মহব্বতকে 'তাশাইউ' নাম দেওয়া হতো, তথাপি ইমাম আজমের উপর এ ধরনের শব্দপ্রয়োগ উচিত নয়। কারণ, আহলে বাইতকে

১৫১৪. মানাকিব, মক্কি (৩৪২-৩৪৩)। বাযযাযি (২৬৭)।

১৫১৫. দিওয়ানুল ইমাম শাফেয়ি (১৪)। দেখুন : হিলইয়াতুল আউলিয়া (৯/১৫২)।

কেউ মহব্বত করলেই সে প্রচলিত অর্থে শিয়া হয়ে যাবে—এটা ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক ব্যাপার। বরং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আহলে বাইতকে ভালোবাসা অপরিহার্য। তাহলে তো সবাইকে শিয়া বলতে হবে! নবিপরিবারের সদস্যগণ—যাদের প্রতি ইমাম আজম রহ. অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং যাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে জড়িত ছিলেন, যেমন : জাফর আস-সাদেক এবং মুহাম্মাদ আল বাকের প্রমুখ—তারাও কেউ প্রচলিত অর্থে শিয়া (রাফেযি) ছিলেন না; বরং ইমাম আজম রহ. শিয়া ও রাফেযিদের বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডন করেছেন। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদসহ ইমামের অন্যান্য শাগরেদও শিয়াদের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। আলি রাযি. এবং আহলে বাইতের প্রতি গভীর মহব্বত ও ভালোবাসা সত্ত্বেও তারা তাদের ব্যাপারে কখনো শরিয়তের সীমা লঙ্ঘন করতেন না, যেমনটা শিয়া ও রাফেযিরা করেছে। ভালোবাসার পাশাপাশি যেকোনো ক্ষুদ্র সীমালঙ্ঘন এবং লঘু বিচ্যুতির ব্যাপারেও সমান সতর্ক থাকতেন। আলি রাযি.-কে নিয়ে যেন মানুষ বাড়াবাড়ি না করে, এ জন্য ইমাম আজম বলতেন, **“নবি-রাসুল ও ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কারও উপর সালাম পাঠ করা** (অর্থাৎ, ‘আলাইহিস সালাম’ বলা) **যাবে না।”** ইমাম মুহাম্মাদও এটাকে মাকরুহ বলতেন। আলি রাযি. বা ফাতিমা রাযি.-এর নামের শেষে ‘আলাইহিস সালাম’ বলা কোনো মারাত্মক বিচ্যুতি নয়। বরং আহলে বাইতের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসার কারণে তারা এটাকে বৈধ বলবেন—এটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তারা আবেগের কাছে শরিয়তকে ভূলুণ্ঠিত হতে দিতেন না। বরং ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, ‘কেউ যদি বলে, আমি রাসুলুল্লাহর কোনো সাহাবিকে গালি দিই না, কিন্তু আলি রাযি. বাকি সবার চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয়, তবে এই লোকের মাঝে সমস্যা আছে এবং তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হবে (رجل دغل وهو متهم)।’[১৫১৬] মহব্বত ও শরিয়তের মাঝে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের ইমামদের আদর্শ দেখুন!

ইমাম আজম শিয়া হবেন তো দূরের কথা, বরং শিয়াদের সাহাবাবিদ্বেষের কারণে তিনি তাদের সঙ্গে সুস্পষ্ট সম্পর্কহীনতার ঘোষণা করেন। তাদের উপর অনাস্থা প্রকাশ করেন। তাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করতে নিষেধ করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকে বর্ণিত, নুহ ইবনে আবু মারইয়াম ইমামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করব? তিনি বললেন,

---

১৫১৬. দেখুন : আল-আজনাস (১/৪৫০-৪৫১)।

'প্রত্যেক ইনসাফগার সত্যে অবিচল (আদল) ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করো। তবে রাফেযিদের কাছ থেকে গ্রহণ করো না। কেননা, তাদের মাযহাবের ভিত্তিই হচ্ছে নবিজির সাহাবাদের গোমরাহ বলা। আবু বকর ও উমরকে শ্রেষ্ঠ বলো। আলি ও উসমানকে ভালোবেসো। তাদের যে ভালো না বাসে, তার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করো না।'[১৫১৭]

ইমাম রাফেযিদের খণ্ডনে আরও বলেন, **খাদিজাতুল কুবরার পরে আয়েশা রাযি. জগতের নারীদের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি মুমিনদের মাতা (উম্মুল মুমিনিন)। ব্যভিচার থেকে পূত ও পবিত্র। রাফেযিদের অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যদি তাকে কেউ ব্যভিচারিণী বলে, তবে সে নিজে ব্যভিচারের ফসল।**[১৫১৮]

ফলে ইমামকে শিয়া সাব্যস্ত করার কোনো সুযোগ নেই, শাব্দিক অর্থের প্রতি লক্ষ রেখেও নয়। বিশেষত আহলে সুন্নাত থেকে শিয়া সম্প্রদায়ের সুস্পষ্ট বিভাজন প্রকাশ হওয়ার পরে এবং এটা পরবর্তী সময়ে রাফেযিদের একক পরিচয়বোধক নামে পরিণত হওয়ার ফলে আহলে সুন্নাতের কারও উপর 'শিয়া' লকব প্রয়োগ করা বাস্তবতাবিবর্জিত বক্তব্য। ইমামের উপর 'মুরজিয়া' শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও পিছনে আমরা আহলে সুন্নাতের একই মূলনীতির কথা উল্লেখ করেছি।

সমকালীনদের মাঝে মিসরীয় লেখক আবু যাহরা তাঁর ইমাম আজমের জীবনী গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় ইমামকে 'আহলে বাইতের প্রতি মহব্বত ও অনুরাগ' অর্থে শিয়া বলেছেন। কিন্তু সঠিক কথা হলো, এই অর্থেও তাঁর উপর শিয়া শব্দ প্রয়োগ বিশুদ্ধ নয়। বরং অসম্ভব নয় যে, উক্ত লেখক শিয়াদের কারও বক্তব্যও গ্রহণ করে থাকবেন। কারণ, ইমাম আজম রহ.-কে শিয়া বলা নতুন নয়। বিভিন্ন সময়ে মুরজিয়ারা যেমন তাকে মুরজিয়া দাবি করেছে, শিয়ারাও তাকে শিয়া দাবি করেছে। তাদের একজন ছিলেন আবুল ফযল সুলাইমানি। যাহাবি রহ. তাকে খণ্ডন করে লিখেন, 'আবু ফযল সুলাইমানি নুমান ইবনে সাবেত, শুবা ইবনুল হাজ্জাজ, আবদুর রাযযাক, আবদুর রহমান ইবনে আবি হাতেম প্রমুখকে শিয়া মুহাদ্দিসদের তালিকায় উল্লেখ করেছে। এটা জঘন্য কাজ।'[১৫১৯]

১৫১৭. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৫৮)।
১৫১৮. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৬১)।
১৫১৯. দেখুন : মিযানুল ইতিদাল (২/৫১৭)।

মহাপ্রলয়ের নিদর্শনসমূহ

(কিয়ামতের আলামত)

ইসলামি আকিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পৃথিবীর শেষ দিনগুলো। এ নশ্বর জগতের বিলুপ্তি এবং এক অবিনশ্বর জগতের আনুষ্ঠানিক সূচনা, যেটাকে আরবিতে 'সাআহ' বা বাংলাতে মহাপ্রলয় বলা যায়। এই মহাপ্রলয়ে গোটা বিশ্বজগৎ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পরকাল শুরু হবে। যেহেতু এটা ইহকাল ও পরকালের মাঝে সেতুবন্ধন, যেহেতু এই জটিল সময়ে পৃথিবীতে অত্যন্ত বিস্ময়কর বড় বড় অলৌকিক ঘটনা ঘটবে, কুফর ও ঈমানের মাঝে চূড়ান্ত সংঘাত হবে, এ জন্য সকল নবি এ সময়ের ব্যাপারে সতর্ক করে গিয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহ এ সময়ের ব্যাপারে নানা আঙ্গিকে আলোচনা করেছে। এটার আগমনের বিভিন্ন নিদর্শন বলে দিয়েছে, যেগুলোকে আমরা 'কিয়ামতের আলামত' নামে জানি। উদ্দেশ্য একটিই, মানুষ এ সম্পর্কে সচেতন হবে। এ দিনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। যদি কখনো সামনে উপস্থিত হয়েই যায়, নিজের ঈমানকে যেন সুরক্ষিত রাখতে পারে।

কিয়ামত হঠাৎ সংঘটিত হবে, যার দিনক্ষণ আল্লাহ ছাড়া আর কারও জানা নেই। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾ অর্থ : 'নিশ্চয়ই কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান।' [লুকমান : ৩৪] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ অর্থ : 'তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটবে। বলুন, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাসময়ে এটা প্রকাশ করবেন। এটা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর একটি ভয়ংকর ঘটনা হবে। আচমকা এটা তোমাদের উপর চলে আসবে। তারা আপনাকে এমনভাবে (এ সম্পর্কে) প্রশ্ন করে যেন আপনি এ বিষয়ে অনুসন্ধানে লিপ্ত রয়েছেন। আপনি বলে দিন,

এই বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক উপলব্ধি করে না।' [আরাফ : ১৮৭]

কিয়ামতের আগে অসংখ্য ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটতে থাকবে, যার সবগুলো চূড়ান্ত মহাপ্রলয়ের বার্তা বহন করবে। এসব ঘটনার কিছু ঘটবে কিয়ামত সংঘটনের বহু শতাব্দী এবং দীর্ঘ সময় আগে। ক্ষুদ্র ও স্বাভাবিক হবে। বিশ্বের জীবনযাত্রায় নানামুখী প্রভাব ফেললেও যুগান্তকারী কোনো বিস্ময় জন্ম দেবে না। এগুলোকে বলা হয় কিয়ামতের 'আলামতে সুগরা' বা ছোট আলামত। আর কিছু ঘটনা ঘটবে কিয়ামতের ঠিক আগ মুহূর্তে। এগুলো হবে অত্যন্ত বড়, বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক। এগুলো কেবল মানুষ নয়, গোটা বিশ্বজগতের পথচলা বদলে দেবে। মানুষকে বিহ্বল ও বিমূঢ় করবে। এগুলো প্রকাশিত হলে বুঝে নিতে হবে কিয়ামত পৃথিবীর দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ﴾ অর্থ : 'তারা কি কেবল এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের উপর এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? বস্তুত কিয়ামতের আলামতসমূহ তো এসেই পড়েছে। কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?' [মুহাম্মাদ: ১৮]

কিয়ামতের ছোট আলামতসমূহ

উপরে যেমনটা বলা হয়েছে, কিয়ামতের ছোট আলামত বলতে সেসব আলামত বোঝায়, যেগুলোর মাঝে আর কিয়ামতের মাঝে লম্বা সময়ের ব্যবধান থাকবে। অর্থাৎ, সেগুলো কিয়ামতের দূরবর্তী ভূমিকা হিসেবে কাজ করবে। সেগুলো প্রকাশ পাওয়ামাত্রই কিয়ামত হয়ে যাবে এমন নয়; বরং সেগুলো প্রকাশের সঙ্গে কিয়ামত কাছাকাছি চলে আসছে মনে করতে হবে। এসব ঘটনা সাধারণত প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মতোই হবে। দূরদর্শী লোক ব্যতীত সাধারণ মানুষ এগুলো অনুভব করতে পারবে না। কিয়ামতের বৃহৎ আলামতগুলো যেখানে অস্বাভাবিক এবং পৃথিবীর গতিপ্রকৃতিতে, মানব ইতিহাসে ব্যাপক সাড়াজাগানিয়া হবে, ছোট আলামতগুলো সে তুলনায় নিতান্তই স্বাভাবিক হবে। ফলে মানুষ এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। গুরুত্ব দেবে না, ভ্রুক্ষেপ করবে না।

এ কারণে হাদিসে এসব আলামতের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদিসে এমন অনেক আলামতের কথা এসেছে। ইমাম আজম রহ.-এর আকিদার গ্রন্থগুলোতে কিয়ামতের ছোট আলামত উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু আমরা

আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সংক্ষেপে এতৎসম্পর্কিত কিছু বর্ণনা তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ।

আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'কিয়ামতের কিছু আলামত হলো : ইলম উঠে যাবে। মূর্খতার প্রসার ঘটবে। ব্যভিচার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। মদ্যপান বাড়বে। পুরুষদের সংখ্যা কমতে থাকবে। নারীদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। একজন পুরুষের বিপরীতে পঞ্চাশজন নারী হবে।'[১৫২০] কোনো কোনো বর্ণনায় চল্লিশ জন নারীর কথাও পাওয়া যায়। হাদিসে মূলত তত্ত্বাবধান শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে (আল-কাইয়িম)। এই তত্ত্বাবধানের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন আলেমগণ। তন্মধ্যে একটি ব্যাখ্যা হলো, সাধারণত প্রত্যেক পুরুষের এক থেকে চারজন স্ত্রী থাকবে। তাদের পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য নারীও থাকবে। মোটকথা, নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অত্যন্ত বেশি হবে।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যখন আমানত নষ্ট হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করতে থাকবে।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এর অর্থ কী, ইয়া রাসুলাল্লাহ? রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'যখন অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।'[১৫২১]

আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'কিয়ামতের একটি আলামত হলো, মানুষ মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে।'[১৫২২] অর্থাৎ, মসজিদের বাহ্যিক রূপ-অবয়ব সুন্দর করার ক্ষেত্রে মানুষ প্রতিযোগিতা করবে। প্রত্যেকে অন্য মসজিদের তুলনায় নিজেদের মসজিদের বিশালতা, সৌন্দর্য ইত্যাদি নিয়ে অহংকার করবে!

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদিসে জিবরিলে এসেছে—জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবিকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, সেটা জিবরাইল যেমন জানেন না, তিনিও জানেন না। অতঃপর জিবরাইল তাঁকে কিয়ামতের আলামতের ব্যাপারে প্রশ্ন

১৫২০. বুখারি (কিতাবুন নিকাহ : ৫২৩১)। ইবনে হিব্বান (কিতাবুত তারিখ : ৬৭৬৮)।

১৫২১. বুখারি (কিতাবুর রিকাক : ৬৪৯৬)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবি হুরাইরা : ৮৮৫০)।

১৫২২. আবু দাউদ (কিতাবুস সালাত : ৪৪৯)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুল মাসাজিদ : ৭৩৯)।

করলে নবিজি (ﷺ) বলেন, 'যখন দাসী তার মনিবকে জন্ম দেবে, যখন ভুখা-নাঙ্গা নিঃস্ব-দরিদ্র উটের রাখালরা বড় বড় অট্টালিকা বানিয়ে গর্ব করবে।'[১৫২৩] উক্ত হাদিসে দাসী কর্তৃক মনিবকে জন্ম দেওয়া-সংবলিত বক্তব্যের আলেমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, এখানে দাস-দাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, একটা সময় দাসীর গর্ভে মনিবের বাচ্চা হবে। আর মনিবের বাচ্চা তার সন্তান হলেও তার মনিবের মতোই।

কিয়ামতের আরেকটি আলামত হচ্ছে ফেতনা এবং মুসিবত প্রচণ্ডরূপে বৃদ্ধি পাওয়া। ইমাম আজম রহ. আবদুর রহমান আরাজ সূত্রে আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'অতি শীঘ্রই এমন একটি যুগ আসবে, যখন মানুষ গোপনে কবরের কাছে গিয়ে তাতে নিজেদের পেট লাগিয়ে বলবে, হায়! আমরা যদি এই কবরের অধিবাসী হতাম!' জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, কারণ কী? তিনি বললেন, 'যুগের দুর্বিপাক, বিপদাপদ এবং ফেতনার আধিক্য।'[১৫২৪] এই হাদিসটিই বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় এভাবে এসেছে, 'ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না মানুষ কবরের কাছে গিয়ে বলবে, হায়! আমি যদি তার জায়গায় হতাম!'[১৫২৫] অর্থাৎ, মৃত্যু কামনা করবে। মাটির উপরে থাকার চেয়ে নিচে থাকতে চাইবে। এটা দ্বীনের দুরবস্থা দেখে দ্বীনদার মানুষ বলতে পারে, আবার দুনিয়াবি নানা সমস্যা, সংকট ও মুসিবতের সাগরে পড়ে দুনিয়াদারও বলতে পারে।

কিয়ামতের আরেকটি আলামত হলো ইসলাম উঠে যাওয়া। ইমাম আজম রহ. আবু মালেক আশজায়ি সূত্রে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'ইসলাম (পৃথিবী থেকে) সেভাবে মুছে যাবে যেভাবে কাপড়ের আল্পনা মুছে যায়। বাকি থাকবে কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মানুষ যারা বলবে, আমাদের আগে একটি সম্প্রদায় ছিল যারা বলত 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।'[১৫২৬]

১৫২৩. মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ৮)। আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৬৯৫)।
১৫২৪. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৬২)।
১৫২৫. বুখারি (কিতাবুল ফিতান : ৭১১৫)। মুসলিম (কিতাবুল ফিতান : ১৫৭)।
১৫২৬. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৬২)।

তবে এসব বিষয়ে তফসিলি জ্ঞান আবশ্যক নয়; বরং মৌলিক বিষয়গুলোতে ইজমালি ঈমান এনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবরণ আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়াই যথেষ্ট। এ জন্য ইমাম বলেছেন, **'বিশুদ্ধ হাদিসে কিয়ামতের যত আলামত বর্ণিত হয়েছে, সবই সত্য এবং তদনুযায়ী সংঘটিত হবে।'**[১৫২৭] 'কিয়ামতের যত আলামত' বলে ইমাম বিষয়টাকে ইজমালি করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, সবগুলো আলামত জানা জরুরি নয়। তবে বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত কোনো আলামত নিয়ে যদি সন্দেহ-সংশয় তৈরি হয়, তখন সন্দেহ ছুড়ে ফেলে তাতে ঈমান আনা জরুরি হবে।

কিয়ামতের বড় আলামতসমূহ

ছোট আলামতের বিপরীতে কিয়ামতের বড় আলামতগুলো কিয়ামত সংঘটনের ঠিক আগ মুহূর্তে প্রকাশিত হবে। সেগুলো প্রকাশ হওয়ামাত্রই ভাবতে হবে কিয়ামতের দিনক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। প্রকৃতিগতভাবে সেগুলো অতিপ্রাকৃতিক হবে। ব্যতিক্রমী ও বিষম বিস্ময়কর হবে।

কিয়ামতের বড় আলামতের সংখ্যাও একাধিক। বিভিন্ন হাদিসে এ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়। হুযাইফা ইবনে আসিদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা (কোনো বিষয় নিয়ে) আলোচনা করছিলাম। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কী নিয়ে কথা বলছ? আমরা বললাম, কিয়ামত নিয়ে। তিনি বললেন, 'দশটি আলামত প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।' অতঃপর তিনি বললেন : 'ধোঁয়া, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ প্রকাশিত হওয়া। পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হওয়া। ঈসা ইবনে মারইয়ামের (আকাশ থেকে) অবতরণ। ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব। তিনটি বৃহৎ ভূমিধস : একটি প্রাচ্যে, একটি পশ্চিমে, আরেকটি আরব উপদ্বীপে। সর্বশেষ আলামত হলো, ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হবে, যা মানুষকে হাশরের মাঠের দিকে তাড়িয়ে নেবে।'[১৫২৮]

ইমাম আজম রহ. বলেন, **'দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় এবং ঈসা আলাইহিস সালামের আসমান থেকে অবতরণ সত্য। বিশুদ্ধ হাদিসে কিয়ামতের যত আলামত বর্ণিত হয়েছে, সবই সত্য এবং তদনুযায়ী**

১৫২৭. আল-ফিকহুল আকবার (৮)।

১৫২৮. মুসলিম (কিতাবুল ফিতান : ২৯০১)। আবু দাউদ (কিতাবুল মালাহিম : ৪৩১১)।

সংঘটিত হবে।'[১৫২৯] ইমাম আজমের অনুসরণে তহাবি বলেন, "আমরা কিয়ামতের আলামতসমূহে বিশ্বাস রাখি। যেমন—দাজ্জালের আগমন, আকাশ থেকে ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ ইত্যাদি। আমরা আরও বিশ্বাস করি, পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হবে এবং 'দাব্বাতুল আরদ' বের হবে।"[১৫৩০] বলখি লিখেন, 'আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো : দাজ্জালের আগমন, ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ, মাহদির আগমন, দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব ইত্যাদি প্রমাণিত বর্ণনাগুলোতে বিশ্বাস রাখা।'[১৫৩১]

ইমাম আজম কিংবা প্রথম যুগের হানাফি ইমামগণ এসব আলামত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেননি। কারণ, এসব ক্ষেত্রে তারা ইজমালি ঈমানই যথেষ্ট মনে করেছেন। তবে পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে, যখন কিয়ামতের ছোট ছোট আলামতের সবগুলোই ইতোমধ্যে প্রায় প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এগুলো তফসিলিভাবে জানা জরুরি। আল্লাহর অনুগ্রহে এ ব্যাপারে আমাদের স্বতন্ত্র গ্রন্থ রয়েছে। সম্মানিত পাঠকগণকে সেটা অধ্যয়নের অনুরোধ করছি।

মাহদির আগমন : তিনি শেষ যুগে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং মুসলিম উম্মাহর ইমাম হিসেবে আবির্ভূত হবেন। তাঁর নাম হবে মুহাম্মাদ। পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ। তিনি রাসুলুল্লাহর (ﷺ) বংশধর হবেন। ফেতনাবিক্ষুদ্ধ এবং জুলুমে পূর্ণ পৃথিবীতে এসে ইনসাফের রাজত্ব কায়েম করবেন। পৃথিবী থেকে জুলুম দূর করবেন। গোটা পৃথিবীতে শান্তি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করবেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন হাদিসে তাঁর আগমনের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আমার বংশধর থেকে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যার নাম আমার নামসদৃশ হবে, যার পিতার নাম আমার পিতার নামে হবে। তিনি জুলুমে পূর্ণ গোটা পৃথিবী ন্যায়-ইনসাফে পূর্ণ করবেন।'[১৫৩২]

১৫২৯. আল-ফিকহুল আকবার (৮)।
১৫৩০. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (৩১)।
১৫৩১. আল-ইতিকাদ, বলখি (১১১)।
১৫৩২. আবু দাউদ (কিতাবুল মাহদি : ৪২৮২)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুল ফিতান : ৪০৮৬)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবদিল্লাহ ইবনে মাসউদ : ৩৬৪৩)। ইবনে হিব্বান (কিতাবুত তারিখ : ৬৮২৩)।

বিভিন্ন হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, মাহদি কিয়ামতের পূর্বলগ্নে আগমন করবেন। পৃথিবী তখন বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত থাকবে। ন্যায়-ইনসাফ নিশ্চিহ্ন থাকবে। মানুষের অধিকার ভূলুণ্ঠিত হবে। গোটা পৃথিবী অন্যায়-অনাচারে ছেয়ে যাবে। ইসলামি শাসনের কোনো চিহ্ন বাকি থাকবে না। তখন ফাতেমা রাযি.-এর বংশে এই পবিত্র পুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিক থেকে পূর্ণতা দান করবেন। তাকে তৌফিক দেবেন। তিনি পৃথিবীতে নববি খেলাফত ফিরিয়ে আনবেন। উৎপীড়ন ও অরাজকতা দূর করে ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন। শতাব্দের পর শতাব্দ জুলুমে দগ্ধ পৃথিবীতে বয়ে চলবে রহমতের বারিধারা। আসমানবাসী ও জমিনবাসী সবাই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। কমবেশি সাত বছর স্থায়ী হবে তাঁর খেলাফত। এই সাত বছর পৃথিবী জাগতিক ও আসমানি নেয়ামতের মাঝে ডুবে থাকবে। অতঃপর কিয়ামতের অন্যান্য বড় আলামত (ফিতান ও মালাহিম) প্রকাশিত হওয়া শুরু করবে। দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। ঈসা আলাইহিস সালাম উম্মাহর সুরক্ষার জন্য আসমান থেকে অবতরণ করবেন।[১৫৩৩]

তবে এর অর্থ এই নয় যে, এখন থেকে মাহদির আগমনের আগ পর্যন্ত পৃথিবী কেবল অধঃপতনের পথেই হাঁটবে, পৃথিবীতে শান্তি আসবে না, মাহদির আগে কখনো খেলাফত কায়েম হবে না। এ ধরনের বিশ্বাস বরং মাহদি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহর (ﷺ) ভবিষ্যদ্বাণীর হিকমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানদের মাহদি শিয়াদের মাহদির মতো প্রতীক্ষিত ব্যক্তি নন। তাঁর জন্য মুসলিম উম্মাহ সব কাজ বাদ দিয়ে বসে থাকবে এটা বৈধ নয়। বিজয়, নেতৃত্ব ও সংস্কারের সব আশা ছেড়ে দিয়ে মুসলিম উম্মাহ তাঁর অপেক্ষায় বসে বসে দিন গুনবে—এটা ইসলামের রুহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং উম্মাহ তাদের সকল কাজ অব্যাহত রাখবে। দাওয়াত, তাবলিগ, তালিম, জিহাদ, নেতৃত্ব, সংস্কার—সবকিছুর জন্য মেহনত জারি থাকবে। ফলাফল আল্লাহর যিম্মায় থাকবে। মাহদি যখন আসার আসবেন, উম্মাহর প্রত্যেক সদস্যকে তার নিজের কাজের হিসাব দিতে হবে। মাহদির কথা বলে কেউ পার পাবে না।

১৫৩৩. আবু দাউদ (কিতাবুল মাহদি : ৪২৮৫)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবি সাইদ খুদরি : ১১৫০১, ১১৬৬০)। মুসনাদে বাযযার (মুসনাদু আবি সাইদ খুদরি : ১৮/৭৫)।

দাজ্জালের আগমন : এটা ইসলামের কিয়ামতসম্পর্কিত বিষয়গুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকিদা। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত অগণিত সহিহ হাদিসের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত। ফলে এ নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মত থেকে ত্রিশজন দাজ্জাল (মিথ্যুকের) আবির্ভাব ঘটবে। তাদের সর্বশেষে থাকবে কানা দাজ্জাল। ...সে বের হয়ে নিজেকে 'আল্লাহ' দাবি করবে। যে ব্যক্তি তার উপর ঈমান আনবে এবং তার অনুসরণ করবে, তার সকল ভালো আমল বাতিল হয়ে যাবে। যে তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না (অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন)। সে পুরো ভূপৃষ্ঠ ঘুরে বেড়াবে। তবে হারাম ও বাইতুল মুকাদ্দাসে ঢুকতে পারবে না। সে মুমিনদের বাইতুল মুকাদ্দাসে অবরুদ্ধ করে রাখবে। তখন আল্লাহ তায়ালা দাজ্জাল এবং তার বাহিনী ধ্বংস করে দেবেন...। প্রত্যেক দেওয়াল ও গাছের নিচ থেকে আওয়াজ বের হবে : 'হে মুমিন/মুসলিম, এই এক ইহুদি আমার পিছনে লুকিয়ে আছে। আসো, তাকে হত্যা করো।"[১৫৩৪]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে ইবনে সাইয়াদ নামে এক ইহুদি ছিল। প্রথমে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরাম তাকে দাজ্জাল মনে করেছিলেন। কারণ, তার মাঝে দাজ্জালের অনেক আলামত দেখা গিয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার মূল দাজ্জাল না হওয়া প্রমাণিত হয়। আজ পর্যন্ত দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটেনি। তার অস্তিত্ব কিংবা বাসস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি। কিয়ামতের আগ মুহূর্তে আল্লাহ যখন অনুমতি দেবেন, তখন সে আবির্ভূত হবে। প্রথমে ভালোর অভিনয় করবে। পরে নবুওতের দাবি করবে। সবশেষে নিজেকে খোদা ঘোষণা করবে।[১৫৩৫]

বিভিন্ন হাদিস দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, কানা দাজ্জাল একজন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি। ফলে সভ্যতা কিংবা জাতি দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এ ধরনের ব্যাখ্যা কুরআন-সুন্নাহর বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা গণ্য হবে। ইবনে হাজার কাযি ইয়াযের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, দাজ্জাল একজন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি হবে। আল্লাহ তার মাধ্যমে

১৫৩৪. মুসতাদরাকে হাকেম (কিতাবুল কুসুফ : ১২৩৪)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুল বাসরিয়্যিন : ২০৪৯৫)। সহিহ ইবনে খুযাইমা (কিতাবুস সালাত : ১৩৯৭)।

১৫৩৫. দেখুন : ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (১৩/৯১)।

মানুষকে পরীক্ষা করবেন। মৃতকে জীবিত করা, ভূমি উর্বর করে তাতে ফসল ফলানো, নদী প্রবাহিত করা, জান্নাত-জাহান্নাম সামনে তুলে ধরা, ভূপৃষ্ঠের সম্পদ তার পিছনে ছোটা, তার নির্দেশে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়াসহ আল্লাহ তাকে বিভিন্ন ক্ষমতা দান করবেন। এটা করা হবে মানুষকে পরীক্ষার জন্য। এর ফলে সন্দেহকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে। দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী মুমিনরা রক্ষা পাবে। অতঃপর একপর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তার ক্ষমতা তিনি ছিনিয়ে নেবেন। ফলে সে কিছুই করতে পারবে না। ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম এসে তাকে হত্যা করবেন।[১৫৩৬]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) দাজ্জাল সম্পর্কে কেবল সতর্ক করেই শেষ করেননি, বরং তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। তার ষড়যন্ত্র, শয়তানি এবং ফেতনার ভিতরের কথাও বলেছেন। মুসলমানরা কী করে তার ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকবে সে পথও বাতলে দিয়েছেন।

আবু উমামা বাহেলি রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল আমাদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন। খুতবার বেশিরভাগ অংশ জুড়ে ছিল দাজ্জালের আলোচনা। তিনি দাজ্জাল থেকে আমাদের সতর্ক করলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ কর্তৃক আদম সন্তানকে সৃষ্টি করার পর থেকে পৃথিবীতে দাজ্জালের চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ ফেতনা আর নেই। আল্লাহ যত নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন, প্রত্যেকেই তাদের উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। আমি হলাম সর্বশেষ নবি। তোমরা হলে সর্বশেষ উম্মত। সুতরাং সে অবশ্যই তোমাদের মাঝেই আবির্ভূত হবে। যদি আমি তোমাদের মাঝে থাকা অবস্থায় সে এসে পড়ে, তবে আমিই তোমাদের দেখব। আর যদি সে আমার পরে আসে, তাহলে প্রত্যেককে নিজের দায়িত্ব নিতে হবে। তবে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহকে রেখে যাচ্ছি। সে ইরাক ও শামের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে বের হবে। ডানে ও বামে সর্বত্র ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা অবিচল থাকো! হে লোকসকল, তোমরা দৃঢ়পদ থাকো!'

'আমি তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে এমন বর্ণনা দেবো, যা আমার পূর্বে কোনো নবি দেননি। সে এসে প্রথমে বলবে, আমি নবি। অথচ আমার পরে কোনো নবি নেই। অতঃপর সে বলবে, আমি তোমাদের রব। অথচ তোমরা মৃত্যুর আগে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে না। তার এক চোখ কানা থাকবে। অথচ তোমাদের

১৫৩৬. প্রাগুক্ত (১৩/১০৫)।

রব কানা নন। তার দু চোখের মাঝখানে 'কাফের' (كافر) লেখা থাকবে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি সেটা পড়তে পারবে। তার আরেকটি ফেতনা হবে এই যে, তার সঙ্গে জান্নাত এবং জাহান্নাম থাকবে। তার জান্নাত মূলত জাহান্নাম আর জাহান্নাম মূলত জান্নাত। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি তার জাহান্নামে পতিত হবে, সে যেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় এবং সুরা কাহাফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে। তাহলে দাজ্জালের জাহান্নাম তার জন্য শীতল এবং শান্তিদায়ক হয়ে যাবে যেমনটা ইবরাহিমের ক্ষেত্রে (নমরুদের আগুন) হয়েছিল। তার আরেকটি ফেতনা হলো—সে একজন গ্রাম্য লোককে বলবে, যদি আমি তোমার বাবা-মাকে জীবিত করে দিই, তাহলে তুমি কি আমাকে রব হিসেবে মেনে নেবে? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন দুটো শয়তান তার বাবা-মায়ের রূপ ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হবে এবং বলবে, বৎস, তার অনুসরণ করো। কেননা, সে তোমার রব! দাজ্জালের আরেকটি ফেতনা হলো—সে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলবে। তাকে করাত দিয়ে দুই টুকরো করে মানুষকে বলবে, তোমরা সবাই আমার এই বান্দাকে দেখো! আমি এখন তাকে পুনরায় জীবিত করব অথচ সে আমাকে রব বলে না মেনে অন্য কাউকে রব বলবে! অতঃপর দাজ্জাল লোকটাকে জীবিত করে বলবে, তোমার রব কে? লোকটি বলবে, আমার রব আল্লাহ। তুই আমার দুশমন। তুই মিথ্যুক দাজ্জাল। আল্লাহর শপথ! আমি তোকে আজকের চেয়ে ভালো করে আর কখনো চিনিনি।'[১৫৩৭] দাজ্জালের এই কূট-কৌশলে দুর্বল হৃদয়ের মুমিন ও মুনাফিকরা আরও বেশি বিভ্রান্ত হবে। এভাবে তার ফেতনা অব্যাহত থাকবে। একপর্যায়ে ঈসা আলাইহিস সালাম এসে তাকে হত্যা করবেন।

ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরাগমন : এটা ফিতানসম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আকিদা। আহলে সুন্নাতের প্রায় সকল আকিদার কিতাবে কিয়ামতের আলামত হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরায় দুনিয়াতে আগমনের বিষয়টি রয়েছে। এর কারণ হলো, অতীত ও বর্তমানে অনেক মানুষ এক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। তারা ঈসা আলাইহিস সালামের জীবিত অবস্থায় আকাশে উড্ডয়ন এবং পৃথিবীর শেষ সময়ে পুনরাগমনের বিষয়টি অস্বীকার করেছে। কারণ, তাদের মতে, এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। ফলে এতে বিশ্বাস রাখা আকিদার আবশ্যক অংশ নয়। অতীত ও সমকালীন আহলে সুন্নাতের অনুসারী

১৫৩৭. ইবনে মাজা (আবওয়াবুল ফিতান : ৪০৭৭)। মুসতাদরাকে হাকেম (কিতাবুল ঈমান : ৬৫)।

বিভিন্ন আলেমও এ ধরনের বিচ্যুত ও গলত ফাতাওয়া দিয়েছেন। এর অন্যতম কারণ হলো, কুরআন-সুন্নাহর মাঝে এবং সালাফের পথে সীমাবদ্ধ না থেকে নিজের উপর অতি আস্থা স্থাপন এবং পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন। ফলে তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছেন। এ বিষয়ে তাদের অনুসরণ বৈধ নয়।

আহলে সুন্নাতের ইমামগণ এই ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডনের উদ্দেশ্যে আকিদার প্রায় সকল কিতাবে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। বরং এর উপর অনেকেই অসংখ্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখেছেন। সেখানে তারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে, ঈসা আলাইহিস সালামের জীবিত অবস্থায় আকাশে উড্ডয়ন এবং পৃথিবীর শেষ দিনগুলোতে পুনরায় তাঁর আগমন কুরআন-সুন্নাহর সন্দেহাতীত আকিদা; অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক বিষয় নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ অর্থ : 'আর স্মরণ করো যখন আল্লাহ বলেছিলেন, হে ঈসা, আমি তোমাকে নিয়ে নেব এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নেব। কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে, তাদের কিয়ামতের দিন পর্যন্ত কাফেরদের উপর জয়ী করে রাখব। বস্তুত তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো।' [আলে ইমরান : ৫৫] অন্যত্র আল্লাহ আরও স্পষ্ট করে বলেন, ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝١٥٧ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝١٥٨﴾ অর্থ : '(তাদের উপর অভিশম্পাত) তাদের এ কথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসিহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে, আর না শূলে চড়িয়েছে; বরং তারা এরূপ বিভ্রমে পতিত হয়েছিল। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানারকম কথা বলে। তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। শুধু অনুমান করা ছাড়া এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই তাকে তারা হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [নিসা : ১৫৭-১৫৮] প্রথম আয়াতে কিছুটা দ্ব্যর্থতা ও অস্পষ্টতা

থাকলেও দ্বিতীয় আয়াত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। এর পরেও এ ব্যাপারে সন্দেহ রাখা গোমরাহি ছাড়া কিছু নয়।

কুরআনের পাশাপাশি অসংখ্য হাদিস দ্বারা ঈসা আলাইহিস সালামের দুনিয়াতে পুনরাগমনের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এসব হাদিস অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং সনদের ক্ষেত্রে মুতাওয়াতির পর্যায়ের। ফলে যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে, তার কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বুখারি ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাযি.-এর বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! অতি শীঘ্রই তোমাদের মাঝে মারইয়াম পুত্র ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হিসেবে অবতরণ করবেন। ক্রুশ চূর্ণ করবেন। শূকর হত্যা করবেন। জিযিয়া রহিত করবেন। তাঁর সময়ে প্রচুর সমৃদ্ধি আসবে। একপর্যায়ে মানুষ কেউ কারও দান-অনুদান গ্রহণ করবে না।'[১৫৩৮]

আবু দাউদ আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আমার মাঝে আর ঈসার মাঝে কোনো নবি নেই। তিনি (শীঘ্রই) অবতরণ করবেন। তোমরা তাকে দেখে চিনতে পারবে। তিনি মধ্যম গড়নের। তার গায়ের রং লালিমা বর্ণের সাদা। হলদে/জাফরানি রঙের দুই টুকরো কাপড় পরিধান করা থাকবেন। তার মাথা থেকে যেন টপটপ পানি ঝরতে থাকবে, অথচ তিনি সিক্ত থাকবেন না (অর্থাৎ, অত্যধিক পরিচ্ছন্ন হবেন)। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। ক্রুশ চূর্ণবিচূর্ণ করবেন। শূকর হত্যা করবেন। (কাফেরদের উপর) জিযিয়া রহিত করবেন (অর্থাৎ, ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না)। আল্লাহ তায়ালা তখন ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম ও জাতি মিটিয়ে দেবেন। কানা দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন।' মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে, 'ঈসা আলাইহিস সালাম চল্লিশ বছর বেঁচে থাকবেন। অতঃপর মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানাযা আদায় করবে।'[১৫৩৯]

১৫৩৮. বুখারি (কিতাবুল বুয়ু : ২২২২)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৫৫)।

১৫৩৯. আবু দাউদ (কিতাবুল মালাহিম : ৪৩২৪)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবি হুরাইরা : ৯৩৯৩)। অধিকাংশ মুহাক্কিকের মতে, চল্লিশ বছর বেঁচে থাকবেন বলতে আকাশে উড্ডয়নের আগের ত্রিশ বছর আর অবতরণের পরে সাত বছর। কোথাও সতেরো বছরের কথাও পাওয়া যায়। কারও কারও মতে, অবতরণের পরেও চল্লিশ বছর বেঁচে থাকবেন। বাস্তব কথা হলো, এ বিষয়ে সুনিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়। দাজ্জালের অবতরণের সময় পৃথিবীর

ঈসা আলাইহিস সালাম শেষ যুগে যদিও নবুওতসহই আগমন করবেন, অন্যকথায়, তিনি তখনও নবি ও রাসুল থাকবেন, তথাপি তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শরিয়তের অনুসারী হয়ে আসবেন। শরিয়তে মুহাম্মাদির একজন প্রচারক (দাঈ) ও মুজাদ্দিদ গণ্য হবেন। নতুন নবুওত বা শরিয়ত নিয়ে আসবেন না। ফলে 'খতমে নবুওত' আকিদার সঙ্গে তাঁর পুনরাগমনের কোনো সংঘাত নেই।[১৫৪০]

ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন : এটাও কিয়ামতের একটি বড় আলামত। বরং পৃথিবীর এক যুগান্তকারী অভাবনীয় ঘটনা। এমন ঘটনার সাক্ষী পৃথিবী আগে কখনো হয়নি এবং হবেও না। এক অদ্ভুত মানব প্রজাতি গোটা পৃথিবীর বুক দাপিয়ে বেড়াবে। তাদের নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, অনাচার, ত্রাস আর ধ্বংসে মুহুর্মুহু কম্পিত হবে পৃথিবীর বুক। আবির্ভাবের পর থেকে ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত পৃথিবী তাদের পদভারে ক্লান্ত থাকবে।

ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীর চূড়ান্ত লগ্নে জন্ম নেবে এমন নয়, বরং তারা এখনও বিদ্যমান। তারা পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বেড়াত। এ জন্য বাদশাহ যুলকারনাইন তাদের সামনে এক বিশাল প্রাচীর নির্মাণ করেন। তারা প্রাচীরের ওপারে বন্দি হয়ে যায়। কিয়ামতের আগে তারা জেগে উঠবে। প্রবল বেগে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তায়ালা তাদের পুরো ঘটনা সংক্ষেপে বলেন,
﴿حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوا۟ يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًا قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا ٱسْطَٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَٰعُوا۟ لَهُۥ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّى فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّا ﴿٩٨﴾ ۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾﴾ অর্থ : 'অবশেষে যখন তিনি (যুলকারনাইন) দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তার কথা যেন বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ এ দেশে বিপর্যয়

দিনগুলোর ব্যাপ্তিতে পরিবর্তন আসবে। ফলে বয়সের হিসাব বর্তমান সময়ের হিসেবে এদিক-সেদিক হওয়া স্বাভাবিক। উপরন্তু ঈসা আলাইহিস সালামের বয়সের বিষয়টি ইসলামি আকিদার কোনো মৌলিক বিষয় নয়। ফলে সুনিশ্চিতভাবে সে ব্যাপারে কিছু জানাও জরুরি নয়। চূড়ান্ত জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার কাছে।

১৫৪০. দেখুন : আল-মুতামাদ ফিল মুতাকাদ, কাসানি (১০)।

সৃষ্টি করে বেড়ায়। আমরা কি আপনাকে কিছু কর দেবো, যার বিনিময়ে আপনি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন? তিনি বললেন : আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তা-ই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করো। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেবো। তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ নিয়ে আসো। অতঃপর যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হলো, তখন তিনি বললেন, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাকো। যখন তা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হলো তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা আনো, আমি তা ঢেলে দিই এটার উপর। অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রাচীরের উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হলো না। যুলকারনাইন বললেন : এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য। সেদিন আমি তাদের ছেড়ে দেবো এই অবস্থায় যে, একদল অন্যদলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে এবং শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে। এরপর আমি তাদের সকলকেই একত্র করব।' [কাহাফ : ৯৩-৯৯]

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتۡ يَأۡجُوجُ وَمَأۡجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٖ يَنسِلُونَ ۝٩٦ وَٱقۡتَرَبَ ٱلۡوَعۡدُ ٱلۡحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَٰخِصَةٌ أَبۡصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَٰوَيۡلَنَا قَدۡ كُنَّا فِي غَفۡلَةٖ مِّنۡ هَٰذَا بَلۡ كُنَّا ظَٰلِمِينَ ۝٩٧﴾ অর্থ : 'অবশেষে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে আছড়ে পড়তে দেখা যাবে। অমোঘ প্রতিশ্রুত কাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ কাফেরদের চোখ স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন। না, আমরা বরং সীমালঙ্ঘনকারীই ছিলাম।' [আম্বিয়া : ৯৬-৯৭] মোটকথা, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খুলে দেওয়া হলে তারা বাঁধভাঙা স্রোতের মতো বেরিয়ে আসবে। তাদের সামনে কেউ দাঁড়ানোর হিম্মত পাবে না। তারা পৃথিবীতে ভীষণ নৈরাজ্য ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম মুমিনদের নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেবেন। আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করবেন। আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজকে নিজ কুদরতে ধ্বংস করে দেবেন।[১৫৪১]

১৫৪১. মুসলিম (কিতাবুল ফিতান : ২৯৩৭)। তিরমিযি (আবওয়াবুল ফিতান : ২২৪০)।

ইয়াজুজ-মাজুজবিষয়ক আকিদার ক্ষেত্রে অনেক লোক, বিশেষত আকলপূজারীরা, বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। এসব বিষয়কে তারা প্রাচীন রূপকথার অংশ মনে করেছে। মানবিক বিবেক-বুদ্ধির মানদণ্ডে এগুলো মাপতে অক্ষম হয়ে বিভিন্ন যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করেছে। অথচ ইয়াজুজ-মাজুজবিষয়ক আকিদা ইসলামের কিয়ামতের আলামতসম্পর্কিত আকিদার একটি মৌলিক মাসআলা। কুরআন এবং বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। ফলে তাদের অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ কিংবা অস্বীকার করা কুফর। বরং এগুলো চূড়ান্ত সত্য হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। এগুলোতে পূর্ণ ও দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে। আমাদের ইমামগণ যুগে যুগে সেটাই করেছেন। প্রত্যেকে তাদের আকিদার কিতাবে এগুলো উল্লেখ করেছেন। যুক্তির দোহাই দিয়ে সন্দেহ করেননি, প্রত্যাখ্যান করেননি। অথচ তারা বর্তমানের মানুষের তুলনায় অনেক বেশি বিদ্বান, সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও যুক্তিমান ছিলেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে খুব সামান্য জ্ঞান দান করেছেন [ইসরা : ৮৫]। আল্লাহ মানুষকে অত্যন্ত দুর্বল [নিসা : ২৮] অথচ প্রচণ্ড বিতর্কপ্রবণ ও ঝগড়াটে বানিয়েছেন [কাহাফ : ৫৪]। ফলে নিজের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাকে বুঝে কুরআন-সুন্নাহর সামনে আত্মসমর্পণই প্রকৃত বুদ্ধিমানের পরিচয়।

'দাব্বাতুল আরদ'-এর বহিঃপ্রকাশ : কিয়ামতের আগ মুহূর্তে মাটির গর্ভ থেকে এক বিস্ময়কর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে, যাকে 'দাব্বাতুল আরদ' বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এ প্রাণীর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ﴿وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ অর্থ : 'যখন প্রতিশ্রুতি (তথা কিয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব (দাব্বাতুল আরদ) নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।' [নামল : ৮২]

এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "যখন তিন বস্তুর আবির্ভাব ঘটবে, তখন আল্লাহ তায়ালা নতুন করে (কোনো কাফেরের) ঈমান কবুল করবেন না। সেগুলো হলো : পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয়, দাজ্জালের আবির্ভাব, 'দাব্বাতুল আরদ'-এর বহিঃপ্রকাশ।"[১৫৪২]

১৫৪২. মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৫৮)।

কিন্তু এ প্রাণীর তফসিলি রূপরেখা এবং আবির্ভাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান নেই। এ ব্যাপারে যেসব বর্ণনা পেশ করা হয়, সেগুলোও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ও চূড়ান্ত নয়। ফলে কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহতে যতটুকু এসেছে, ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকা কর্তব্য।

পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয় : এটা কিয়ামতের বড় নিদর্শনসমূহের একটি। পৃথিবীর চূড়ান্ত ধ্বংসের কার্যক্রম শুরু হবে এর মাধ্যমে। বৈজ্ঞানিকভাবেও এটা উপলব্ধি করা সম্ভব। বিজ্ঞানীদের ভাষ্যমতে, আমাদের পৃথিবী মহাবিশ্বে টিকে আছে অতীব সূক্ষ্ম এক শৃঙ্খলার উপর। জগতের প্রত্যেকটি বস্তু নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তর্পণে ঘুরছে। এখান থেকে একবিন্দু এদিক-সেদিক হয়ে গেলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। মহাবিশ্বে মহাবিপর্যয় ঘটবে। এ হিসেবে পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয়ের অর্থ হলো পৃথিবীর উলটো দিকে আবর্তিত হওয়া। পৃথিবীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়া। পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বস্তুনিচয়ের শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

ইমাম আজম রহ. মুআবিয়া ইবনে ইসহাক থেকে সাফওয়ান ইবনে আসসাল রাযি. সূত্রে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদিস বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল বলেছেন, **'আল্লাহ তায়ালা পূর্ব দিকে তাওবার একটি দরজা খুলেছেন। পাঁচশত বছরের রাস্তার দূরত্ব পরিমাণ সময় এটা খোলা থাকবে। অতঃপর এটা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং পশ্চিমে খোলা হবে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত খোলা থাকবে। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন,** ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيٓ إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ **অর্থ : 'সেদিন এমন ব্যক্তির ঈমান তার কোনো উপকার করবে না যে আগে ঈমান আনেনি কিংবা স্বীয় ঈমান অনুযায়ী কোনো সৎকর্ম করেনি।' [আনআম : ১৫৮]**[১৫৪৩]

আবু যর গিফারি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, আবু যর, সূর্য ডোবার পরে কোথায় যায় বলতে পারো? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "সূর্য ডোবার পরে আরশের নিচে গিয়ে সিজদা করে। পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি চায়। তাকে উদিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু একটা সময় তাকে অনুমতি

১৫৪৩. আল-উসূলুল মুনিফাহ (৬১)। হাদিসটি দেখুন : বুখারি (কিতাবু তাফসিরিল কুরআন : ৪৬৩৫)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৫৭)।

দেওয়া হবে না। বরং সূর্যকে বলা হবে, যেদিক থেকে অস্ত গিয়েছ সেদিক থেকে উদিত হও। তখন সূর্য পশ্চিমাকাশ থেকে উদিত হবে। এটাই আল্লাহ তায়ালার বাণী : ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ 'সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানীর নির্ধারিত বিষয়' [ইয়াসিন : ৩৮]-এর মর্ম।"[১৫৪৪]

ফলে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সূর্যের পশ্চিমাকাশ থেকে উদিত হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত আকিদা। কিন্তু এটা ঠিক কখন ঘটবে, কীভাবে ঘটবে এবং পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয়ের পরিণতি কী হবে এ সম্পর্কে আমাদের অনুমান ছাড়া চূড়ান্ত জ্ঞান নেই। এ জন্য এসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহতে যতটুকু এসেছে ততটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। নতুবা চিন্তা ও বিশ্বাসগত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এসব হাদিস রাসুলুল্লাহ (ﷺ) অসংখ্য সাহাবির সামনে বর্ণনা করেছেন। তারা কোনো আপত্তি করেননি। যুগের পর যুগ ইমামগণ এগুলো এভাবে বর্ণনা করেছেন, এগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। মানবিক যুক্তির মানদণ্ডে তারা এগুলো যাচাই করতে যাননি। কারণ, আমাদের বিবেক-বুদ্ধি অত্যন্ত সীমিত। ফলে এসব সীমিত উপকরণ দিয়ে এমন বড় বড় গায়েবি বিষয় মাপতে গেলে ভুল ফলাফল প্রদান করবে, যা মানুষকে ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকার করবে না। তাই এসব ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণের বিকল্প নেই।

১৫৪৪. বুখারি (কিতাবু বাদয়িল খালক : ৩১৯৯)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৫৯)।

কুফর

কুফরের পরিচয়

কুফর (الكفر) শব্দের শাব্দিক অর্থ গোপন করা, লুকানো। ইমাম আজমের ভাষ্যে, **'কুফর অর্থ অস্বীকার করা, অস্বীকৃতি জানানো, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।'**[১৫৪৫] পরিভাষায় কুফর বলা হয়, 'আল্লাহকে বা আল্লাহর রাসুলকে কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যা-কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলোর মাঝে কোনো মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করা।'[১৫৪৬]

ইমাম আজম বলেন, **'...কুফর অস্বীকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত; জ্ঞানহীনতার সঙ্গে নয়। এ কারণে কেউ যদি ইসলামের কোনো বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে তাকে কাফের বলা হবে না। যেমন—ইসলাম ও মুসলিমের কেন্দ্রভূমি থেকে দূরে কেউ যদি শিরকে নিমজ্জিত কোনো ভূখণ্ডে থাকে এবং সে কারণে তার কাছে ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছয়, ইসলামি শরিয়াহর ফরয ও ওয়াজিব বিধিবিধান সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান না থাকে, কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে তার বিশ্বাস থাকে এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তবে সে ব্যক্তি মুমিন হিসেবে গণ্য হবে।'**[১৫৪৭] অন্যকথায়, যৌক্তিক কারণে সৃষ্ট অজ্ঞতা কুফরের প্রতিবন্ধক হবে। কুফর হবে না। সামনে এ বিষয়ে আলোচনা আসছে।

ইমাম আজমকে কুফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আরও বিস্তৃতভাবে বলেন, **'কুফর শব্দটি আরবিতে অস্বীকার বোঝায়। আরবরাও এই অর্থে ব্যবহার করে। কুরআনে আল্লাহ কুফর শব্দকে অস্বীকৃতি অর্থেই ব্যবহার করেছেন। ফলে এটাকে ভিন্ন অর্থে নেওয়া যাবে না। অস্বীকৃতি আর অবাধ্যতার মাঝে পার্থক্য আছে। যেমন—কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত। সময়মতো পাওনাদার এসে তার কাছে ঋণ**

১৫৪৫. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৯)।

১৫৪৬. দেখুন : আস-সাহায়িফুল ইলাহিয়্যাহ (৪৫১)।

১৫৪৭. আল-ফিকহুল আবসাত (৪২)।

পরিশোধের দাবি জানালে সে যদি ঋণের কথা স্বীকার করে কিন্তু আদায় না করে, তবে পাওনাদার তাকে বলবে, তুমি টালবাহানা করছ। ঋণ অস্বীকার করছ—এটা বলবে না। আর যদি সে ঋণের কথা অস্বীকার করে, তবে বলবে, তুমি অস্বীকার করছ। টালবাহানা করছ—এটা বলবে না। মুমিনের অবস্থাও তদ্রূপ। যদি মুমিন ব্যক্তি অস্বীকার করা ব্যতীত কোনো ফরয ইবাদত ছেড়ে দেয়, তবে তাকে গুনাহগার বলা হবে। আর যদি অস্বীকার করে, তবে তাকে কাফের বলা হবে।'[১৫৪৮]

ইমাম আজম রহ. থেকে বর্ণিত কুফরের কারণসমূহ

ইমাম আজম রহ. বলেন, "আল্লাহর কোনো গুণকে আংশিকভাবে হলেও অস্বীকার করা (কুফর)। যেমন—কেউ যদি ইসলামের সবকিছু স্বীকার করে, কিন্তু পৃথিবীতে বিদ্যমান কোনো বিশেষ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে বলে, এটার স্রষ্টা কে আমি জানি না, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, পৃথিবীর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা। কুরআনে তিনি বলেছেন, ﴿ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ অর্থ : 'আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।' [যুমার : ৬২] আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করার পরেও উক্ত বক্তব্য কুফর গণ্য হবে। কারণ, তার উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায়, পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়াও দ্বিতীয় কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে।"[১৫৪৯]

ইমাম আরও বলেন, "একইভাবে ইসলামের কোনো বিধানকে অস্বীকার করাও কুফর। যেমন—কেউ যদি বলে, আল্লাহ নামায, রোযা ও যাকাত ফরয করেছেন কি না আমার জানা নেই, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, কুরআনে আল্লাহ নামায কায়েম এবং যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ﴾ অর্থ : 'তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো।' [বাকারা : ৪৩] অন্যত্র বলেন, ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ অর্থ : 'হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে।'" [বাকারা : ১৮৩][১৫৫০] সুতরাং কুরআন কিংবা মুতাওয়াতির সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত ইসলামের কোনো সুস্পষ্ট বিধান অস্বীকার করা কুফর প্রমাণিত হলো।

১৫৪৮. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৯)।

১৫৪৯. আল-ফিকহুল আবসাত (৪১)।

১৫৫০. প্রাগুক্ত (৪১)।

সরাসরি অস্বীকার করা হোক কিংবা অস্বীকারের পর্যায়ে কিছু বলা বা করা হোক সবগুলোই কুফর গণ্য হবে। ফলে বিশ্বাসগত নিফাক বা মুনাফিকিও কুফর। মুনাফিক বরং নিকৃষ্টতম কাফের। ইমাম এ ব্যাপারে বলেন, **“নিফাক হলো মুখে ইসলাম প্রকাশ করা, অন্তরে অস্বীকার এবং মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা। যে ব্যক্তি এমন করবে, তাকে বলা হবে মুনাফিক। মুনাফিকের কথা মিথ্যা হওয়া জরুরি নয়। সে সত্য** (তথা বাস্তবসম্মত কথা) **বলতে পারে। তবে তার মুখের কথা আর অন্তরের বিশ্বাস এক হয় না। সে মুখে যা বলে, অন্তরে সেটা বিশ্বাস করে না। এ কারণেই তাকে মুনাফিক বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের বৈশিষ্ট্য কুরআনে উল্লেখ করেছেন এভাবে :** ﴿إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ﴾ **অর্থ : ‘যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল।’ [মুনাফিকুন : ১] তখন আল্লাহ তাদের জবাবে বলেন,** ﴿وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُه وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ﴾ **অর্থ : ‘আল্লাহ জানেন আপনি নিশ্চয়ই তাঁর রাসুল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।’ [মুনাফিকুন : ১] আল্লাহ তাদের এ জন্য মুনাফিক বলেননি যে, তারা মিথ্যা কথা বলেছে। কারণ, তারা তো সত্যই বলেছে** (মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসুল)। **কিন্তু তারা মুখে এটা বললেও অন্তরে বিপরীত বিশ্বাস লালন করে, যেমনটা আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন,** ﴿وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ﴾ **অর্থ : ‘তারা যখন ঈমানদারদের কাছে আসে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) স্রেফ উপহাস করি।’” [বাকারা : ১৪]**[১৫৫১]

কুফরকে কুফর মনে না করাও কুফর। কারণ, সেটা দ্বীনের মৌলিক বিষয় অস্বীকারের নামান্তর। ইমাম বলেন, **“যদি কেউ বলে—আমি কাফেরকে কাফের মনে করি না, তবে সেও তার মতো গণ্য হবে। যদি কেউ বলে, কাফেরের পরকালে কী পরিণতি হবে আমার জানা নেই, তবে সেও কাফের হয়ে যাবে। কারণ, উক্ত বক্তব্য মূলত কুরআন অস্বীকার করা। আর কুরআন অস্বীকারকারী কাফের। কেউ যদি বলে, কাফের ব্যক্তি জান্নাতি নাকি জাহান্নামি আমি নিশ্চিত নই, তবে সেও কাফের হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহ বলেছেন,** ﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضٰى

১৫৫১. প্রাগুক্ত (২১)।

عَلَيۡهِمۡ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنۡهُم مِّنۡ عَذَابِهَاۚ﴾ অর্থ : 'যারা কাফের, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা মৃত্যুবরণ করবে না। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না।'" ইমাম আজম রহ. সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি কাফেরদের তাদের উপযুক্ত স্তরে রাখবে না, সে তাদের মতো গণ্য হবে।'[১৫৫২]

মোটকথা, এমন কোনো কথা বলা কিংবা এমন কোনো কথার সমর্থন করা, যা কুরআনের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক, তা কুফর বিবেচিত হবে। এ হিসেবে অমুসলিমদের সত্য ধর্মের অনুসারী মনে করা কিংবা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে আল্লাহকে পাওয়ার পথ মনে করা কুফর। তাই কেবল ইসলাম গ্রহণ করলেই হবে না, অন্যান্য সকল ধর্ম-দর্শনকে বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

ইমাম আজমের উল্লেখ করা আরেকটি কুফর হলো—ইসলামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়কে অবমাননা করা। ইমাম একটি উদাহরণের মাধ্যমে এটা বুঝিয়েছেন। যেমন—কেউ যদি দাবি করে, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনাকে রাসুল হিসেবে স্বীকার করি, কিন্তু আপনাকে হত্যা করতে মন চায়, তবে এ ব্যক্তির ব্যাপারে বক্তব্য কী? ইমাম বললেন : "**এটা বেহুদা প্রশ্ন, অসম্ভব ব্যাপার। কেউ যদি নবিজি (ﷺ)-কে চিনতে পারে যে, তিনি আল্লাহর রাসুল, কখনো তাঁকে হত্যার ইচ্ছা করতে পারে না, তাঁর মৃত্যু চাইতে পারে না। এমনকি তাঁকে কষ্ট দেওয়ার কথাও ভাবতে পারে না। এটার উদাহরণ এভাবে বুঝে নিতে হবে যে, একব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলছে, তুমি আমার কাছে সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয়, কিন্তু আমার মনে চায় তোমাকে নিজের হাতে হত্যা করে তোমার মাংস চিবিয়ে খাই! তদ্রূপ পৃথিবীর কোনো মানুষ কল্পনাও করতে পারে না যে, কেউ আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং নবিজি (ﷺ)-কে রাসুল বলে বিশ্বাস করবে, এরপর তাঁর মর্যাদা-পরিপন্থি কিছু বলতে বা করতে পারে। যেমন বলল, নবিজি বেদুইন ছিলেন কিংবা তিনি ফকির ছিলেন। কারণ, সে যদি সত্যি আল্লাহকে চিনত এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আল্লাহর রাসুল হিসেবে মানত, তবে আল্লাহ এবং তাঁর নবিজি থাকতেন তাঁর চোখে সবচেয়ে সম্মানিত সত্তা। তাদের জন্য মানহানিকর কিছু তাঁর মুখ থেকে বের হওয়া সম্ভব ছিল না। নবিজির সম্মানে আল্লাহ বলেছেন,** ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ

১৫৫২. প্রাগুক্ত (৪৬-৪৭)।

أَطَاعَ اللَّهَ﴾ অর্থ 'যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল।' [নিসা : ৮০] কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সকল মানুষ ও জিনের নেতা বানিয়েছেন। তাঁকে সুন্নাত ও ওয়াজিবের সংরক্ষক বানিয়েছেন। এ জন্য বলেছেন : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ অর্থ : 'রাসুল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকো।'" [হাশর : ৭][১৫৫৩] সুতরাং আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল, দ্বীন ও শরিয়তের বিভিন্ন শাআইর (নিদর্শন) যেগুলোকে সম্মান করা আবশ্যক, সেগুলোর কোনো প্রকার অবমাননা ও উপহাস কুফর গণ্য হবে।

কুফর বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রান্তিকতা বর্জন

কুফর বর্ণনার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই আজ পর্যন্ত যুগে যুগে নানামুখী প্রান্তিকতা তথা বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটো প্রান্তিকতা হলো : **এক**. কুফরকে স্রেফ অবিশ্বাস ও অস্বীকৃতির মাঝে সীমাবদ্ধ করা। **দুই**. বিশ্বাস-অবিশ্বাস গৌণ করে স্রেফ কর্মকে কুফর বলা। নিচে আমরা সেগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করছি :

কুফর বর্ণনার ক্ষেত্রে ছাড়াছাড়ি

কুফর বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রান্তিকতা বা ছাড়াছাড়ি হলো কেবল অস্বীকার করাকেই কুফর মনে করা, অবিশ্বাসের মাঝে কুফরকে সীমাবদ্ধ ভাবা। কোনো কাজ কুফর হতে পারে এমন মনে না করা। অনেকে সালাফের বক্তব্যকে ভুল বুঝে এ ধরনের বিচ্যুতির শিকার হয়েছে। যেমন—আমরা যদি পিছনে উল্লিখিত ইমাম আজমের কুফরসংক্রান্ত বক্তব্যগুলো দেখি, সেগুলোকে সাধারণত (অন্তরের) অবিশ্বাস ও (মুখের) অস্বীকৃতিজনিত কুফর দেখব। অর্থাৎ, কর্মগত কুফরের অনুপস্থিতি প্রকট। বরং ইমামের কিতাবগুলোতেও এমন বক্তব্য বিদ্যমান। তিনি বলেন, **'কুফর অর্থ অস্বীকার করা, অস্বীকৃতি জানানো, মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা।'**[১৫৫৪] ইমাম আরও বলেন, **'যে ব্যক্তি স্রেফ ঈমান আনে, কিন্তু নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, ইসলামের অন্য কোনো আমল করে না, সে**

১৫৫৩. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২০-২১)।

১৫৫৪. প্রাগুক্ত (১৯)।

আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থাকবে—চাইলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন, চাইলে অনুগ্রহ করবেন। কারণ, যতক্ষণ না কেউ আল্লাহর কিতাবের কোনোকিছু অস্বীকার করে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হিসেবে গণ্য হবে।'[১৫৫৫]

ইমাম তহাবি রহ. লিখেছেন, 'আমরা আমাদের কিবলার অনুসারীদের ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম-মুমিন হিসেবে আখ্যায়িত করব যতক্ষণ তারা নবি কারিম (ﷺ) আনীত সকল বিষয়ের স্বীকৃতি দেবে, তাঁর সকল বক্তব্য এবং সংবাদকে সত্যায়ন করবে।' তিনি আরও লিখেছেন, (وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ) অর্থাৎ, 'একজন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয় না, যতক্ষণ না সে সেসব মূলনীতি অস্বীকার করে, যেসবের স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে ঈমানে প্রবেশ করেছিল।'[১৫৫৬] কাসানি লিখেছেন, 'রিদ্দাহর রুকন হলো ঈমান আনার পরে মুখে কুফরি কালিমা উচ্চারণ করা।'[১৫৫৭]

ফলে এখান থেকে একদল মনে করেছে, মুখে অস্বীকার ব্যতীত আর যত অন্যায় কাজ করা হোক, সেগুলো কুফর নয়। অন্যকথায়, কুফর কেবল অবিশ্বাস ও অস্বীকারের মাঝে সীমাবদ্ধ। কাজের কারণে কেউ কাফের হয় না। অথচ এটা একটা ভুল ধারণা। হ্যাঁ, মূল কুফর অবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু মুখের কথার মতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যেসব কাজ সেই অবিশ্বাসের নির্দেশক হবে, সেগুলোও কুফর বিবেচিত হবে। এ প্রসঙ্গে খোদ ইমাম কাসানির বক্তব্যই উপরের ভুল ভেঙে দেবে। তিনি তাঁর আকিদাগ্রন্থে লিখেছেন, (وكل من دخل في ربض الإيمان لا يخرج منه إلا من الباب الذي دخله، أي ما لم يبدل التصديق بالتكذيب لا يخرج من الإيمان) অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি ঈমানের গণ্ডিতে প্রবেশ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান থেকে বের হবে না যতক্ষণ না সেই দরজা দিয়ে বের হবে যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল। অর্থাৎ, যতক্ষণ না সত্যায়নকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন দিয়ে বদলাবে।'[১৫৫৮] আর মিথ্যাপ্রতিপন্ন কেবল মৌখিক অস্বীকার (জহুদ বা ইনকার) নয়; বরং কর্মের মাধ্যমেও মিথ্যা সাব্যস্ত করা যায়। বরং মৌখিক সত্যায়নের চেয়ে কর্মগত মিথ্যাপ্রতিপন্ন অধিকতর

১৫৫৫. আল-ফিকহুল আবসাত (৪৭)।

১৫৫৬. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২০-২১)।

১৫৫৭. বাদায়েউস সানায়ে (৭/১৩৪)।

১৫৫৮. আল-মুতামাদ ফিল মুতাকাদ (১৪)।

বিবেচ্য। ইবনুল হুমাম রহ. লিখেছেন, ‘কুফর হলো অন্তর থেকে সত্যায়ন গায়েব হয়ে যাওয়া (অর্থাৎ, অন্তরের মিথ্যাপ্রতিপন্ন কুফর)। কিন্তু ঈমান যেহেতু শরিয়তকে সম্মান করা, অসম্মান থেকে বিরত থাকা, তাই শরিয়তের প্রতি বিদ্রূপ বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায় এমন যেকোনো কথা বা কর্ম হানাফি আলেমদের কাছে কুফর।’[১৫৫৯]

মোটকথা, অন্তরের অবিশ্বাস মুখের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ফলে এমন যেকোনো কাজ যা ইসলামের মৌলিক কোনো বিষয়ের প্রতি অস্বীকৃতি, অবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ, সেটা কুফর বলে বিবেচিত হবে।

এখান থেকেই প্রশ্ন ওঠে, গুনাহ কি কুফর নয়?

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল ধারার একটি প্রতিষ্ঠিত আকিদা হলো, গুনাহের কারণে আহলে কিবলা তথা মুসলিমকে কাফের না বলা। এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের কোনো নির্ভরযোগ্য আলেম দ্বিমত করেননি। কারণ, এটা খারেজি ও মুতাযিলাদের বিপক্ষে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয়নির্দেশক (শিআর)। পিছনে ‘ঈমান ও কবিরা গুনাহ’ অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইমাম আজম রহ. বলেন, **‘তাওহিদ এবং রাসুলুল্লাহর রিসালাতের অনুসারীদের মাঝে যারা গুনাহগার, তারা (গুনাহ সত্ত্বেও) নিঃসন্দেহে মুমিন। তারা সন্দেহাতীতভাবেই কুফর থেকে মুক্ত।’**[১৫৬০] আল-ফিকহুল আবসাতে ইমাম রহ. বলেন, **‘আমাদের আকিদা হচ্ছে, গুনাহের কারণে কোনো আহলে কিবলাকে আমরা কাফের বলব না। গুনাহের ফলে কারও ঈমানকে আমরা নাকচ করব না।’**[১৫৬১] আল-ফিকহুল আকবারে ইমাম রহ. বলেন, **“আমরা গুনাহের কারণে কোনা মুসলিমকে কাফের মনে করি না, হোক সেটা কবিরা গুনাহ, যতক্ষণ না সেটাকে হালাল মনে করবে। এ কারণে তার কাছ থেকে ‘মুমিন’ শব্দটি কেড়ে নিই না। বরং সে বাস্তবিক অর্থেই মুমিন—এমন বলি। হ্যাঁ, সে ফাসেক মুমিন হতে পারে, কিন্তু কাফের নয়।”**[১৫৬২]

১৫৫৯. আল-মুসায়ারাহ (১৮১)।

১৫৬০. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৩১)।

১৫৬১. আল-ফিকহুল আবসাত (৪০)।

১৫৬২. আল-ফিকহুল আকবার (৫)।

ইমাম আরও বলেন, ‘অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, চুরি করা, ডাকাতি করা, অন্যায়-অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া, ব্যভিচার করা এবং মদ্যপান করা কুফর নয়, ফিসক (পাপাচার)। সুতরাং কোনো মুমিন এসবে জড়িয়ে পড়লে সে পাপী ও অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে, কাফের নয়। আল্লাহ চাইলে তাকে এ পাপের জন্য জাহান্নামের শাস্তি দিতে পারেন। পরে ঈমানের কারণে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন।’[১৫৬৩]

অর্থাৎ, খারেজিরা গুনাহে লিপ্ত মুমিনকে কাফের বলে এবং পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নামি বলে। মুতাযিলারাও দুনিয়াতে এমন ব্যক্তিকে ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি কিংবা মুনাফিক বলে। পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নামি বলে। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত গুনাহের কারণে কাউকে ঈমান থেকে বের করে দেয় না, তার কাছ থেকে মুমিন নাম কেড়ে নেয় না; বরং তাকে গুনাহগার (ফাসেক) মুসলিম নামে অভিহিত করে। কারণ, হারামকে হালাল কিংবা হালালকে হারাম মনে করা ছাড়া গুনাহ কুফরের পর্যায়ে পৌঁছয় না। ফলে এমন বিশ্বাস ছাড়া স্রেফ গুনাহের কারণে কাউকে কাফের বলা যাবে না।[১৫৬৪]

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘তোমরা বিভ্রান্ত ও তর্কপ্রিয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিতর্ক করো না। চারটি বিষয় মনে রাখতে পারলে তোমরা এই উম্মতের প্রথম প্রজন্ম যে পথে ছিল সে পথে থাকতে পারবে : (এক.) ‘তাকদিরের ভালোমন্দ সবকিছুতে বিশ্বাস রাখবে। (দুই.) গুনাহের কারণে কোনো মুসলিমকে কাফের বলবে না। (তিন.) নিজেদের ঈমানের মাঝে সন্দেহ করবে না। (চার.) আল্লাহর রাসুলের কোনো সাহাবির সমালোচনা করবে না।’[১৫৬৫]

কিন্তু এসব বক্তব্যের অর্থ কখনোই এটা নয় যে, কোনো গুনাহই কুফর নয় এবং কোনো গুনাহের কারণেই মানুষ কাফের হয় না; বরং অনেক গুনাহ ও পাপ কাজ কুফর। ‘গুনাহ বা অন্যায় কর্মের কারণে কাফের হয় না’—এটা মূলত খারেজি ও মুতাযিলা সম্প্রদায়কে খণ্ডনের জন্য আমাদের ইমামগণ বলেছেন। ফলে স্বাভাবিক কবিরা গুনাহ, যা কুফর নয়—যেমন : অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, চুরি করা, ডাকাতি করা, অন্যায়-অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া,

---

১৫৬৩. আল-ফিকহুল আবসাত (৪৭)।

১৫৬৪. দেখুন : আস-সাওয়াদুল আজম (৩)।

১৫৬৫. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১২৪)।

ব্যভিচার করা, মদ্যপান করা কুফর নয়—তা ফিসক (পাপাচার)। কোনো মুমিন ব্যক্তি এসবে জড়িয়ে পড়লে সে পাপী ও অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে, কাফের নয়। একইভাবেই (অলসতাবশত) নামায পরিত্যাগ, রোযা পরিত্যাগ ইত্যাদিও গুনাহ; কুফর নয়।[১৫৬৬]

তবে সকল গুনাহ ফিসক নয়, বরং অনেক গুনাহ কুফর। অর্থাৎ, যেখানে গুনাহের প্রকৃতিটাই কুফর সেখানে 'গুনাহ কুফর নয়' এমন যুক্তি চলবে না। খোদ ইমাম বলেন, **'কালিমার চেয়ে বড় পুণ্যের কাজ আর কিছু হতে পারে না। সাত আকাশ, সাত জমিন এবং এগুলোর মাঝের জায়গার তুলনায় একটা ডিম যতটা ক্ষুদ্র, কালিমার তুলনায় সকল ফরয ইবাদতের পরিমাণ তারচেয়েও নগণ্য। বিপরীতে সকল গুনাহের মাঝে শিরক সবচেয়ে জঘন্য। আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিলেও শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না।'**[১৫৬৭] এখানে ইমাম সুস্পষ্টভাবে 'শিরক'-কে গুনাহ সাব্যস্ত করছেন। এমন অনেক গুনাহ রয়েছে যা মূলত কুফর। অর্থাৎ, সেটা গুনাহ এবং কুফর একসঙ্গে। ফলে কেউ যদি এমন গুনাহে লিপ্ত হয় যা প্রকারান্তরে কুফর বা শিরক, তবে গুনাহের মাধ্যমে সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং কোনো গুনাহ কিংবা পাপ কাজই কুফর নয়—এমন বক্তব্য যেন মুরজিয়াদের আকিদার দিকে ঠেলে না দেয় সে ব্যাপারে সতর্কতা কাম্য।[১৫৬৮]

কুফরের কিছু উদাহরণ

হানাফি মাযহাবের কিতাবসমূহে বর্ণিত অবিশ্বাসগত কুফরের উল্লেখযোগ্য কিছু উদাহরণ হলো : ❑ উসুলুদ্দিন তথা দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা। যেমন—আল্লাহ, ফেরেশতা, পরকাল কিংবা রাসুলুল্লাহর শেষ নবি হওয়া অস্বীকার করা ❑ শরিয়তে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত কোনো ফরয বিধান—যেমন : পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযানের রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি—অস্বীকার করা ❑ শরিয়তে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত কোনো হারাম—যেমন : সুদ, ব্যভিচার, জুয়া, মদ্যপান ইত্যাদি—অস্বীকার করা ❑ সুস্পষ্ট হালালকে হারাম মনে করা ❑ সুনিশ্চিত হারামকে হালাল মনে করা ❑ সগিরা কিংবা কবিরা যেকোনো গুনাহকে হালাল মনে করা ❑ গণক ও জ্যোতিষীদের গায়েব সম্পর্কে অবহিত বিশ্বাসপূর্বক

১৫৬৬. দেখুন : আল-ফিকহুল আবসাত (৪৭)।

১৫৬৭. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৭-১৮)।

১৫৬৮. দেখুন : আল-জাওহারাতুল মুনিফাহ (৫৭)।

সত্যায়ন করা ❑ কুরআনের কোনো শব্দ বা বিধান অস্বীকার করা ❑ কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহর মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত আল্লাহর কোনো গুণ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা। ❑ আল্লাহকে সৃষ্টির মতো মনে করা ❑ আল্লাহ ছাড়া কাউকে বিধানদাতা মানা ❑ আল্লাহর আইন অবজ্ঞা করা এবং আধুনিক সময়ের অনুপযোগী ভাবা ❑ মানবরচিত আইনকে শরিয়তের চেয়ে উত্তম কিংবা উপযুক্ত বিকল্প মনে করা।

মৌখিক অস্বীকৃতি এবং কর্মগত কুফরের কিছু উদাহরণ হলো : ❑ আল্লাহ অথবা তাঁর কোনো নবি বা রাসুলকে গালি দেওয়া কিংবা তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা ❑ আল্লাহর শানে অশোভন কথা বলা কিংবা তাঁর কোনো নাম বা গুণ নিয়ে ঠাট্টা করা ❑ আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল, দ্বীন ও ঈমানের কোনো রুকন কিংবা দ্বীনসংশ্লিষ্ট মৌলিক যেকোনো বিষয় (যথা ফেরেশতা, কুরআন, নামায, হজ্জ ইত্যাদি) নিয়ে উপহাস করা ❑ মূর্তি-প্রতিমা বা এ-জাতীয় বস্তুর সামনে সিজদা করা ❑ ছোট্ট অথচ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত কোনো সুন্নতকেও অবজ্ঞা করা ❑ এমন কোনো কথা বলা বা কাজ করা যাতে রাসুলুল্লাহর প্রতি বিন্দুমাত্র অবহেলা কিংবা বিদ্বেষ বা বিরক্তি প্রকাশ পায়। যেমন—কারও সামনে বলা হলো, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) লাউ পছন্দ করতেন। সে (রাসুলুল্লাহর সত্তা, রুচি বা তাঁর কাজের প্রতি বিরক্ত হয়ে) বলল, আমি পছন্দ করি না! এমন লোক মুরতাদ হয়ে যাবে। ❑ পৃথিবীতে যদি নবি-রাসুল না আসতেন এমন আকাঙ্ক্ষা করা প্রকাশ করা ❑ বাদ্যযন্ত্রের তাল ও বাঁশির সুরের সঙ্গে মিলিয়ে কুরআন পড়া ❑ কুরআনের ব্যাপারে যেকোনা অমূলক, ঠাট্টা কিংবা বিদ্রুপাত্মক কথা বলা ❑ মসজিদ, মাদরাসা কিংবা ইসলামের সম্মানিত যেকোনো নিদর্শনকে অবজ্ঞা করা। ফলে মদ্যপান, ব্যভিচার কিংবা হারাম কাজের আগে 'বিসমিল্লাহ' বলা কুফর ❑ নামায-রোযা কিংবা ইসলামের যেকোনো ফরয বিধানকে বিরক্তি, ঠাট্টা কিংবা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করা। যেমন—কাউকে নামায পড়তে বলার পরে সে খোদ নামাজের প্রতি বিরক্তি বা অবজ্ঞা দেখিয়ে বলল, জীবনেও নামায পড়ব না ❑ শরিয়ত বর্জন করে নিজেদের বানানো শরিয়তবিরোধী আইনে জীবন ও জগত পরিচালনা করা।[১৫৬৯]

উপরের উদাহরণগুলোতে দৃষ্টি দিলে যে কারও চোখে পড়বে, অস্বীকার ও অবিশ্বাসজনিত কুফরের পাশাপাশি এখানে কর্মগত কুফরের সংখ্যাও কত বেশি!

১৫৬৯. দেখুন : আল-বাহরুর রায়েক (৫/২০২-২১০। শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (১৩৮-১৫৮)।

কারণ, কর্মটাও মূলত অবিশ্বাসেরই প্রকাশ। সুতরাং অবিশ্বাসটা স্রেফ মুখে নয়, কর্মেও প্রমাণিত। কারও সকল কাজ যদি অবিশ্বাসের সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু স্রেফ মুখে বলে, ‘আমি মুসলিম’, তবে সে মুখের স্বীকৃতির মূল্য নেই। বরং যদি অন্তরেও কুফরের ইচ্ছা না থাকে, স্রেফ পার্থিব স্বার্থ কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কুফরি কথা বলে বা কাজ করে, তবুও বিশুদ্ধ মতে এমন ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। কারণ, প্রবৃত্তির অনুসরণ ‘ইকরাহ’ (তথা বাধ্যকরণ) নয়, ফলে কুফরের প্রতিবন্ধকও নয়।

কুফর বর্ণনার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি

কুফর বর্ণনার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িমূলক প্রান্তিকতা হলো অন্তর ও অবিশ্বাসের বিষয়টি কম গুরুত্ব দিয়ে স্রেফ কর্মগত বিষয়টি দেখা। সামান্য কথা কিংবা কাজের কারণে কাউকে কাফের বলা, অথচ বাস্তবে দেখা যাবে সে কথা বা কাজটা কুফর নয়। ফিকহের প্রাচীন কিতাবগুলোতে এমন অসংখ্য কাজকে কুফর ও রিদ্দাহ (ধর্মত্যাগ) বলা হয়েছে, যেগুলোর সিংহভাগই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এবং বিশেষ প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কোনো অর্থে নিলে হয়তো সেগুলোকে কুফর বলা যাবে। কিন্তু উন্মুক্তভাবে সেগুলো মোটেই কুফর নয়।

ফিকহের কিতাবগুলোতে বিদ্যমান এ ধরনের কিছু উদাহরণ হলো : ☐ কারও সামনে বলা হলো, আল্লাহর রাসুল লাউ পছন্দ করতেন। সে বলল, আমি লাউ পছন্দ করি না; তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। [উপরে আমরা দেখিয়েছি—এটা কুফর হওয়া ব্যাখ্যাসাপেক্ষ] ☐ কাউকে বলা হলো : আল্লাহর ওয়াস্তে এই কাজটা করো, সে বলল, করব না; তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। ☐ কাউকে কুরআন পড়তে বলায় সে যদি বলে, তৃপ্ত হয়ে গেছি অথবা ভালো লাগে না, কাফের হয়ে যাবে ☐ কাউকে নামায পড়তে বলার পরে যদি বলে পড়ব না, সেও কাফের হয়ে যাবে [পিছনে আমরা বলেছি এটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ] ☐ কেউ যদি কুরআনের আয়াতকে তার নিজের কথার মাঝে প্রবেশ করায়, তবে সে কাফের হয়ে যাবে! যেমন—কেউ ভিড় দেখে যদি বলে : ﴿فَجَمَعْنَٰهُمْ جَمْعًا﴾ অর্থ : ‘আমি তাদের একত্র করলাম!’ [যা মূলত কুরআনের আয়াত, কাহাফ : ৯৯] কেউ যদি ভরা কোনো পাত্র দেখে বলে, ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ অর্থ : ‘পূর্ণ পানপাত্র’ [যা মূলত কুরআনের আয়াত, নাবা : ৩৪], তবে কাফের হয়ে যাবে! অর্থাৎ, দৈনন্দিন কথার মাঝে কেউ কুরআনের আয়াত প্রবেশ করালেই কাফের হবে! ☐ ইচ্ছাকৃত যদি কেউ পবিত্রতা

অর্জন ছাড়া নামায পড়ে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। ❑ কেউ যদি বলে, কেন ইলম শিখব জানি না, সে কাফের হয়ে যাবে! ❑ কেউ যদি বলে, জানি না আল্লাহ তায়ালা ওই লোকটাকে কেন সৃষ্টি করলেন, সে কাফের হয়ে যাবে! ❑ কাউকে যদি বলা হয়, 'কোথায় যাও?' আর সে জবাবে বলে, 'জাহান্নামে যাই', তবে কাফের হয়ে যাবে।[১৫৭০]

এখানে উল্লিখিত অধিকাংশ বিষয় মৌলিকভাবে কুফর নয়। হ্যাঁ, কুফরের অন্যান্য কারণ, যথা : অস্বীকার, বিরক্তি, বিদ্রুপ, ঘৃণা, সরাসরি প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলে কাফের হবে, কিন্তু উন্মুক্তভাবে কাফের বলার সুযোগ নেই।

একইভাবে অনেক আলেমের আকিদা বিষয়ক স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলিতে এ ধরনের উন্মুক্ত তাকফিরের প্রচুর উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—আবু ইসহাক সাফফার তাঁর প্রসিদ্ধ 'তালখিসুল আদিল্লাহ' গ্রন্থে কাদারিয়্যাহ, মুতাযিলা, রাফেজা, খারেজি, জাহমিয়্যাহ, কাররামিয়্যাহ, জাবরিয়্যাহ প্রমুখ সম্প্রদায়কে উন্মুক্তভাবে কাফের বলেছেন।[১৫৭১] কেবল সাফফার নন, 'আস-সাওয়াদুল আজম', মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখির 'আল-ইতিকাদ' (তিনি পুরো গ্রন্থ জুড়ে বিভ্রান্ত বিদআতি ফিরকাগুলোকে ঢালাওভাবে তাকফির করেছেন), আবুল ইউসর বাযদাবির 'উসুলুদ্দিন', সাবুনির 'আল-কিফায়াহ'সহ সে যুগের অধিকাংশ আকিদার গ্রন্থেই বিপরীত ফিরকাগুলোকে, এমনকি বিভিন্ন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেও, একরকম উন্মুক্তভাবে তাবদি-তাকফিরের (বিদআতি ও কাফের বলার) চিত্র প্রকট। পরবর্তী আলেমদের মাঝে গুমুশখানভি রহ. কাদারিয়্যাহ, রাফেজা, খারেজি থেকে শুরু করে মুতাযিলা, জাবরিয়্যাহ, মুজাসসিমাহ ও মুরজিয়াদের কাফের বলা আবশ্যক করে দিয়েছেন। বরং তিনি 'যারা আল্লাহকে একটি নির্দিষ্ট স্থান তথা আরশে অথবা আকাশে বলবে', তাদেরও তাকফির করা ওয়াজিব বলেছেন! কেউ যদি আল্লাহর ব্যাপারে দাঁড়ানো বা বসার কথা বলে, তাঁর জন্য 'উপর' অথবা 'নিচ' শব্দ প্রয়োগ করে তাকে কাফের বলেছেন! বরং কেউ যদি বলে, 'আমার জন্য আকাশে আল্লাহ আর যমিনে আপনি আছেন', তাকেও

১৫৭০. দেখুন : আলি কারির শরহুল ফিকহিল আকবার (১৪০-১৫৫)। আরও দেখুন : গুমুশখানভির জামেউল মুতুন (৩১-৮৫)

১৫৭১. দেখুন : তালখিসুল আদিল্লাহ (৭২৭)।

কাফের বলেছেন! কেউ যদি বলে, 'আল্লাহ তায়ালা আমাদের আরশের উপর থেকে অথবা আকাশের উপর থেকে দেখছেন', তাকেও কাফের বলেছেন! ফারসি কিংবা অন্য ভাষায় কেউ কুরআনের কাব্যানুবাদ করলে তাকেও কাফের বলেছেন![১৫৭২] অথচ সালাফে সালেহিনের ইমামগণ এসব সম্প্রদায়কে ঢালাওভাবে কাফের বলেননি। ব্যক্তির তাকফিরের ক্ষেত্রে তো তাদের সতর্কতার মাত্রা আরও বেশি। এসব শব্দ উচ্চারণ করলেই কেউ কাফের হয়ে যাবে এমন সুযোগই নেই। কারণ, এক্ষেত্রে অনেক বিষয় পর্যবেক্ষণযোগ্য। উপরন্তু আল্লাহর জন্য 'দিক' সাব্যস্ত করলে কিংবা কুরআনের কাব্যানুবাদ করলে কেউ কাফের হয়ে যাবে—এটা তো চূড়ান্ত পর্যায়ের উদ্ভট বক্তব্য।

এতে করে বড় ধরনের একটি সংকট সামনে আসে। সেটা হলো—ফকিহদের কেউ কেউ এমন অনেক বক্তব্যকে কুফর বলেছেন যা উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের বক্তব্য। স্রেফ মতবিরোধের কারণে সেগুলোকে কেবল ভুল বলে ক্ষান্ত হননি, কুফর পর্যন্ত বলেছেন! ফলে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী সালাফের বিশাল সংখ্যক ইমামকে কাফের হয়ে যেতে হয়! যেমন—উপরে আল্লাহর জন্য 'উপর' বা 'নিচ' তথা দিকসংক্রান্ত বক্তব্য দেখানো হয়েছে। একইভাবে কেউ যদি বলে, 'ঈমান বাড়ে ও কমে', তারা তাকেও কাফের বলেছেন! অথচ এটা সালাফের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের বক্তব্য। কী ভয়ংকর ব্যাপার!

তাদের কেউ কেউ লিখেছেন, কেউ যদি তাবিল ছাড়া 'আমি মুমিন, ইনশাআল্লাহ' বলে, তবে সে কাফের।[১৫৭৩] অথচ এটা অনেক সাহাবি, তাবেয়ি এবং সালাফে সালেহিনের বক্তব্য। ফলে তারাও কি সবাই কাফের? ইবনে নুজাইম (৯৭০ হি.) 'আল-খুলাসাহ' (খুলাসাতুল ফাতাওয়া) ও 'বাযযাযিয়্যাহ'র উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, "যে ব্যক্তি বলবে, 'আমি মুমিন, ইনশাআল্লাহ', সে কাফের। তার সঙ্গে বিয়েশাদি বৈধ নয়।" আবু হাফস তার 'ফাওয়ায়িদ'-এ লিখেন, 'কোনো হানাফির জন্য তাঁর মেয়েকে কোনো শাফেয়ির কাছে বিয়ে দেওয়া বৈধ নয়, তবে তাদের মেয়ে বিয়ে করা বৈধ, আহলে কিতাবদের বিধানের মতো!' অথচ সালাফের বিশাল সংখ্যক ইমাম তাবিল ছাড়াই 'আমি মুমিন, ইনশাআল্লাহ'

১৫৭২. বিস্তারিত দেখুন : জামেউল মুতুন (৩১-৮৬)।
১৫৭৩. দেখুন : আলফাজুল কুফর, বদরুর রশিদ হানাফি (৫১)।

বলেছেন। ফলে এটা কোনোভাবেই কুফর নয়। এ কারণে ইবনে নুজাইম রহ. এসব বক্তব্য উল্লেখের পরে সেগুলো কঠোরভাবে খণ্ডন করেন। তিনি লিখেন, "ঈমানের ক্ষেত্রে 'ইস্তিসনা' করায় কাউকে কাফের বলা গলত। এরচেয়েও জঘন্য হলো তাদের সঙ্গে বিয়েশাদি নিষেধ করা। এটা তো স্রেফ (মতাদর্শিক) গোঁড়ামি। আল্লাহ আমাদের নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।"[১৫৭৪]

কেউ কেউ আল্লাহর 'মাজি' (আগমন) ও 'নুযুল' (অবতরণ)-কে স্থানান্তর (ইন্তিকাল) দ্বারা ব্যক্ত করাকে কুফর বলেছেন! আরও লিখেছেন, 'কেউ যদি বলে, আল্লাহ আরশের উপর বিদ্যমান, তবে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, আরশের উপর আল্লাহর সত্তাকে সাব্যস্ত করা কুফর!' কেউ লিখেছেন, যদি কেউ আল্লাহর জন্য 'মাকান' তথা স্থান সাব্যস্ত করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। বরং কেউ আরও একধাপ সামনে এগিয়ে 'আল্লাহর জন্য জিহাহ তথা (উপরের) দিক সাব্যস্ত করাকে'ই কুফর বলেছেন![১৫৭৫] ফাতাওয়া আলমগিরিতে আল-বাহরুর রায়েক এবং ফাতাওয়া কাযি খানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, কেউ যদি বলে, আল্লাহ ইনসাফের জন্য 'উপবিষ্ট' হয়েছেন, কিংবা কেউ যদি আল্লাহকে 'উপর' বা 'নিচ'-এর গুণে গুণান্বিত করে, তবে সে কাফের![১৫৭৬] দামাদ আফেন্দি লিখেছেন, কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহকে স্বপ্নে দেখেছি, তবে সে কাফের হয়ে যাবে![১৫৭৭]

সুবহানাল্লাহ! এগুলোকে কুফর বলার কোনো সুযোগ নেই। ভুলশুদ্ধ পরের কথা। কুরআন-সুন্নাহর অনেক 'যাহের' (বাহ্যিক অবস্থা) থেকে এগুলো বোঝা যায়। ফলে আহলে সুন্নাতের পূববর্তী ও পরবর্তী একদল আলেম এ ধরনের কথা বলেছেন। মাযহাবের আলোকে এগুলোকে সর্বোচ্চ ভুলবিচ্যুতি বলা যেতে পারে, কিন্তু কুফর বলা এবং এগুলো যে বলবে তাকে কাফের বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। বরং তারা এক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের শিকার হয়ে বিশুদ্ধ আকিদাকেও ভুল বলেছেন। 'আল্লাহ আরশের উপর ধরনহীন ইস্তিওয়া করেছেন', 'আল্লাহ ধরনহীন আগমন

১৫৭৪. আল-বাহরুর রায়েক (২/৮১)।

১৫৭৫. দেখুন : আত-তামহিদ, আবু শাকুর (২০৫)। মুলজিমাতুল মুজাসসিমাহ (৬০-৬১)। আল-বাহরুর রায়েক (৫/২০২-২০৩)।

১৫৭৬. ফাতাওয়া আলমগিরি (২/২৫৯)।

১৫৭৭. মাজমাউল আনহুর (১/৬৯১)।

করেন এবং নুযুল করেন'—এটাকেও বিদআত বলেছেন। এটা গলত বক্তব্য। কারণ, শেষোক্ত কথাগুলো ইমাম আজম এবং সালাফে সালেহিনের আকিদা।[১৫৭৮]

এ ধরনের উদাহরণ অসংখ্য। আমরা কেবল এলোপাতাড়ি কয়েকটা উল্লেখ করলাম। এটা যে সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টিতে পড়েছে এমন নয়, বরং অনেক বড় বড় আলেমও এ ধরনের পর্যবেক্ষণ পেশ করেছেন। খোদ কামাল ইবনুল হুমাম লিখেন, '...বিভিন্ন মাযহাবের আলেমদের বক্তব্যে অনেক তাকফির পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলো মুজতাহিদ ফকিহদের বক্তব্য নয়, বরং অন্যদের বক্তব্য। আর (মুজতাহিদ) ফুকাহা ছাড়া অন্যদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।'[১৫৭৯] ইবনে নুজাইম লিখেন, '... (ফিকহি গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত) কুফরের অধিকাংশ বক্তব্যের কারণে কাউকে কাফের বলা যাবে না। আমি নিজেও এগুলোর ভিত্তিতে ফাতাওয়া দিই না।'[১৫৮০]

কিন্তু ইবনে নুজাইমও উক্ত মূলনীতির উপর থাকেননি। তিনি অন্যত্র লিখেছেন, 'যে ব্যক্তি শাইখাইন তথা আবু বকর ও উমরকে গালি দেবে এবং তাদের সমালোচনা করবে, সে কাফের। তাকে হত্যা করা হবে। তাওবা করে নতুন করে মুসলমান হলেও তাওবা কবুল করা হবে না।'[১৫৮১] অথচ আবু বকর ও উমর রাযি.-এর গালিদাতাকে উন্মুক্তভাবে কাফের বলা যাবে না। এ কারণে পরবর্তী অনেক হানাফি ফকিহ উক্ত বক্তব্যকে ভিত্তিহীন ও বাতিল বলেছেন। আমলযোগ্য নয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লামা ইবনে আবিদিন লিখেন, 'বিস্ময়কর হলো, আল-বাহরুর রায়েকের গ্রন্থকার এসব ক্ষেত্রে কাফের ফাতাওয়া না দেওয়ার কথা বললেও শিথিলতা দেখিয়েছেন এবং এমন ব্যক্তিকে হত্যার কথা বলেছেন।'[১৫৮২]

এটাই সঠিক বক্তব্য। কারণ, যেমনটা পিছনে আমরা বলে এসেছি—আবু বকর, উমর কিংবা কোনো সাহাবিকে গালি দিলেই কেউ কাফের হয়ে যাবে না; বরং কাফের হওয়ার জন্য কুরআন দ্বারা প্রমাণিত কাতয়ি (সুনিশ্চিত) কোনো

১৫৭৮. দেখুন : আত-তামহিদ, আবু শাকুর সালেমি (২০৫)। হ্যাঁ, যদি কেউ এগুলোকে সৃষ্টির সিফাত হিসেবে আল্লাহর উপর প্রয়োগ করে, এসব সিফাতকে সৃষ্টির সিফাতের মতো মনে করে এবং তাকে স্পষ্ট করে বোঝানোর পরেও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে তার বিধান ভিন্ন।

১৫৭৯. ফাতহুল কাদির (৬/১০০)।

১৫৮০. আল-বাহরুর রায়েক (৫/২১০)।

১৫৮১. প্রাগুক্ত (৫/২১২)।

১৫৮২. রদ্দুল মুহতার (৬/৩৮৭) (দারু আলামিল কুতুব)।

বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিশ্বাস বা বক্তব্য থাকতে হবে। যেমন—কেউ যদি আয়েশা রাযি.-এর চরিত্রের উপর অপবাদ দেয়, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, তাঁর পবিত্রতা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। কেউ যদি আবু বকরের সাহাবি হওয়া অস্বীকার করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, তাঁর সোহবত কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। একইভাবে কেউ যদি আলি রাযি.-কে খোদা মনে করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। মোটকথা, সাহাবিদের ক্ষেত্রে সেসব বক্তব্য বা সমালোচনা কুফর হবে, যেগুলো কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এমন না হলে কুফর হবে না। ফাতাওয়া আলমগিরিতেও আবু বকর ও উমর রাযি.-এর গালিদাতাকে কাফের বলা হয়েছে।[১৫৮৩] কিন্তু এটা উন্মুক্তভাবে আমলযোগ্য নয়।

ইবনে হাজার হাইতামি লিখেন, (তাকফির ও রিদ্দাহর) 'অধিকাংশ মাসআলা হানাফিদের ফাতাওয়া গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান। তারা তাদের মাশায়েখ থেকে এগুলো বর্ণনা করেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের সচেতন হানাফি আলেমগণ এগুলোর অধিকাংশেরই বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যান করেন। এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হলো—এসব লোকের তাকলিদ বৈধ নয়। কারণ, তারা ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ নন। উপরন্তু তারা এসব মাসআলা ইমাম আবু হানিফার মূলনীতির আলোকে বের করেননি; বরং এগুলো তাঁর থেকে বর্ণিত আকিদার বিপরীত। ফলে হানাফি হোক বা শাফেয়ি হোক, প্রত্যেকের কর্তব্য হলো এসব বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে মানুষকে কাফের বলা থেকে সতর্ক থাকা! কারণ, মুসলমানকে কাফের বলতে গিয়ে নিজের কাফের হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।'[১৫৮৪] হাইতামি যদিও এখানে কেবল হানাফি মাযহাবকে অভিযুক্ত করেছেন, বাস্তবতা হলো, কোনো মাযহাবই এর বাইরে নয়; বরং সর্বত্রই চিত্র এক ও অভিন্ন। এমনকি যারা নিজেদের চার মাযহাবের বাইরে এবং সকল তাকলিদের ঊর্ধ্বে দাবি করেন, তাদের গ্রন্থেও তাকফিরের চিত্র আরও প্রকট এবং অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ। নিকট অতীতেও এর বাস্তব উদাহরণ বিদ্যমান।

মোটকথা, এসব কথা বা কাজ সরাসরি কুফর নয়; বরং এগুলোকে কুফর বলতে হলে ব্যক্তির নিয়ত, উদ্দেশ্য, পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট, পারিপার্শ্বিক সার্বিক অবস্থাসহ অনেক বিষয়ের বিবেচনা মাথায় রাখতে হবে। এসব বিবেচনার পরেও

১৫৮৩. ফাতাওয়া আলমগিরি (২/২৬৪)।

১৫৮৪. আল ইলাম বিকাওয়াতিয়িল ইসলাম (১১০)।

যদি কুফর বলা হয়, তবে সেটা ইসলামের মৌলিক কোনো বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে কুফর হবে, কেবল এসব কথা বলার কারণে নয়। অর্থাৎ, দেখা যাবে সে এসব কথা ইসলামকে অপছন্দ করে, আল্লাহর শরিয়তের প্রতি বিরক্ত হয়ে কিংবা কুরআন-সুন্নাহর প্রতি উপহাস করে বলছে। ফলে কুফরটা বিরক্তি, উপহাস ইত্যাদির কারণে হবে, স্রেফ কথার কারণে নয়। এ জন্য কুফর বর্ণনা এবং মানুষকে কাফের বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। একইভাবে বিভিন্ন ফিরকাকে তাকফির করার ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

(তাকফির) কাউকে কাফের বলার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন

আলোচ্য অধ্যায়ের আরেকটি প্রান্তিকতা হলো, কুফর বর্ণনা এবং তাকফিরের মাঝে ফারাক না করা। অথচ কোনো কথা বা কাজকে কুফর বলা আর ব্যক্তিকে কাফের বলা এক বিষয় নয়। প্রথমটাকে বলা হয় 'তাকফিরে মুতলাক' তথা কুফরের সাধারণ বর্ণনা। আর ব্যক্তিবিশেষকে কাফের বলা হলো 'তাকফিরে মুআইয়ান।' দুটোর মাঝে বেশ ফারাক রয়েছে। কারণ, কুফরে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও শুবুহাত (সন্দেহ-সংশয় ও অস্পষ্টতা), জাহালত (অজ্ঞতা), গলত-খাতা (ভুলবিচ্যুতি), তাবিল (ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যা), ইখতিলাফ (মতভেদ) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকলে হুজ্জত কায়েম হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি কাফের হবে না। তাই সাধারণ কুফর বর্ণনার মতো ব্যক্তিবিশেষকে কাফের বলা সহজ নয়। এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থাকা ওয়াজিব।

ইমাম আজমকে জিজ্ঞাসা করা হলো—কেউ যদি নিজেকে কাফের আখ্যা দেয়, তবে তার বিধান কী? ইমাম আজম রহ. বলেন, **'ব্যক্তির মুখের দাবি নয়, বরং কথা ও কাজই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে কাফের আখ্যা দেয় অথচ সে আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল এবং দ্বীনের যাবতীয় মৌলিক আকিদায় বিশ্বাস রাখে, তবে সে মুমিন হিসেবে গণ্য হবে, ঠিক যেমন বিপরীতে কেউ যদি নিজেকে মুমিন হিসেবে আখ্যা দেয়, অথচ সে আল্লাহ কিংবা আল্লাহর রাসুলকে অস্বীকার করে, তবে তার মুখের দাবির কোনো মূল্য নেই।'**[১৫৮৫] ইমামের বক্তব্যের প্রথম অবস্থা বাস্তবে সংঘটিত হওয়ার উদাহরণ বিরল হলেও এটা ব্যক্তিকে কাফের বলার ক্ষেত্রে ইমামের সর্বোচ্চ সতর্কতার দলিল।

১৫৮৫. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২৭)।

উপরন্তু কুরআন-সুন্নাহর বাইরে মানবরচিত আইনে শাসনকারীকেও তিনি উন্মুক্তভাবে কাফের বলতেন না, বরং সেটাকে বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতেন। এ ব্যাপারে তিনি ইবনে উমরের বক্তব্য দিয়ে দলিল দিতেন। হারেসি বর্ণনা করেন—আবু হানিফা রহ. ইবনে উমর থেকে আল্লাহর বাণী : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ অর্থ : 'আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা কাফের।' [মায়িদা : ৪৪]-এর অর্থ করেছেন—**যারা আল্লাহর অবতীর্ণ করা বিধানে ঈমান না রাখবে, তারা কাফের।'**[১৫৮৬] 'ঈমান না রাখা'র বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসাপেক্ষ আলোচনা। সারকথা হলো, আল্লাহর আইনের শাসন অবধারিত- এটাতে যারা ঈমান রাখবে না তারা সুস্পষ্ট কাফের। কিন্তু আল্লাহর আইন অবধারিত মেনে অন্য কোনো কারণে যদি মানুষের বানানো আইনে শাসন করে, সেটার বিধান অবস্থাভেদে ভিন্ন হবে। মোটকথা, শর্ত ও কুয়ুদ ছাড়া এমন ব্যক্তিকে উন্মুক্তভাবে কাফের বলা হবে না।

ইমাম আজম প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওজর তালাশ করতেন, ব্যাখ্যা খুঁজতেন, যেটা সকল সালাফে সালেহিনের মানহাজ। অর্থাৎ, কারও কাছ থেকে কোনো কুফরি বাক্য পাওয়ার পর সেটার যদি ইতিবাচক ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে, তবে ব্যাখ্যা করতে হবে। যদি কোনো ব্যাখ্যাই না করা যায়, তখন তাকফির করা যাবে। ইমাম আজমকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কেউ যদি আপনাকে বলে—আমি তোমার দ্বীন থেকে কিংবা তুমি যার ইবাদত করো তার থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি, এমন লোককে কি কাফের বলা যাবে? ইমাম বলেন, **'এমন ব্যক্তির ব্যাপারে উপস্থিত সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না, বরং তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। সে যদি আল্লাহ কিংবা আল্লাহর দ্বীন থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি সে আমার দ্বীনকে ভ্রান্ত দ্বীন মনে করে বলে—আমি তোমার দ্বীন থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি। কারণ, তোমার দ্বীন কুফর। কিংবা আমি শয়তানের ইবাদত করি এমন অভিযোগ করে, তবে সে মিথ্যাবাদী হিসেবে গণ্য হবে; কাফের নয়।**[১৫৮৭] আল্লাহ ইমাম আজমকে রহম করুন। তাঁর চিন্তার গভীরতা, ফিকহি দূরদর্শিতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততা দেখুন!

১৫৮৬. কাশফুল আসার (১/২২৯)।

১৫৮৭. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২৭)।

ব্যক্তির মতো মুসলমানদের বিভিন্ন ফিরকার ব্যাপারেও তিনি ধীরস্থিরতা ও দূরদর্শিতার অভিন্ন মানহাজ লালন করতেন। ইমামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মুহাক্কিমাহ খারেজিদের ব্যাপারে আপনার মতামত কী?[১৫৮৮] তিনি বললেন, **'তারা তাদের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সম্প্রদায়।'** জিজ্ঞাসা করা হলো, তাহলে কি আমরা তাদের কাফের বলব? তিনি বললেন, **'না। তবে আলি ও উমর ইবনে আবদিল আযিযের মতো সালাফের ইমামগণ যেমন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, আমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।'**[১৫৮৯] জঘন্য পথভ্রষ্ট খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বললেও সেটা তাদের অমুসলিম গণ্য করে নয়। এ কারণে অমুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ-পরবর্তী নীতি খারেজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। ইমাম বলেন, **'খারেজিদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ সম্পন্ন হবে, তাদের উপর কিছু চাপানো হবে না। হদ কায়েম করা হবে না। যেসব রক্তপাত হয়েছে, সেসবের কিসাসও নেওয়া হবে না। এর দলিল সাহাবাদের আমল। হযরত উসমান রাযি.-কে কেন্দ্র করে যখন ফেতনা সংঘটিত হলো, তখন সকল সাহাবি এ ব্যাপারে একমত পোষণ করলেন যে, যারা তাবিলের কারণে কাউকে হত্যা করেছে, তাদের উপর কোনো কিসাস নেই; কিংবা যারা তাবিলের মাধ্যমে কোনো নারীকে লুণ্ঠন করেছে, তাদের উপর কোনো হদ নেই। একইভাবে যারা তাবিলের মাধ্যমে সম্পদ নিয়েছে, তাদেরও জরিমানা করা হবে না। হ্যাঁ, হুবহু সম্পদটি যদি তার কাছে বিদ্যমান থাকে, তবে সেটা মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'**[১৫৯০]

তাফতাযানি 'আল-মুনতাকা'র উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, 'ইমাম আবু হানিফা রহ. আহলে কিবলার (বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকার) কাউকে কাফের বলেননি। এটাই অধিকাংশ ফকিহের মত।'[১৫৯১]

১৫৮৮. এরা খারেজিদের সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ প্রকাশ ছিল। সিফফিনের যুদ্ধে যখন আলি রাযি. ও মুআবিয়া রাযি. সমঝোতার লক্ষ্যে শালিশ নিযুক্ত করেন, তখন তারা আলি রাযি.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তার বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই চরমপন্থি জঙ্গিগোষ্ঠী যুদ্ধ ও খুন-খারাবি ছাড়া অন্য কিছু বুঝত না। এরাই রাসুলুল্লাহর সাহাবি খাব্বাব ইবনে আরত রাযি.-কে রাসুলুল্লাহ থেকে ফেতনা-বিরোধী হাদিস বর্ণনা এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রশংসার অপরাধে (!) জবাই করে হত্যা করে। তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীর পেট চিরে বাচ্চা বের করে ফেলে! পরবর্তী সময়ে আলি রাযি. তাদের শক্তহাতে দমন করেন। এতকিছু সত্ত্বেও ইমাম আজম-সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফ তাদের কাফের বলা থেকে বিরত থেকেছেন। কারণ, তারা কুরআন-সুন্নাহর উসুলকে আবেগের উপর অগ্রাধিকার দিতেন।

১৫৮৯. আল-ফিকহুল আবসাত (৪৪)।

১৫৯০. প্রাগুক্ত (৪৫)।

১৫৯১. শরহুল মাকাসিদ (২/২৬৯)।

এসব বক্তব্য থেকে মুসলমানদের তাকফিরের ক্ষেত্রে ইমামের চূড়ান্ত সতর্কতার দৃষ্টান্ত মেলে। পরবর্তী উলামায়ে আহনাফ ইমামের পথেই হেঁটেছেন। আবু হাফস বুখারি বলেন, 'চল্লিশজন তাবেয়ি থেকে আমার কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ পৌঁছেছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সাতটি বস্তু হেদায়াত। তন্মধ্যে একটি হলো জামাতের সঙ্গে থাকা। সুতরাং তোমরা আহলে কিবলার ব্যাপারে কুফরের সাক্ষ্য দিয়ো না। তাদের মুশরিক বা মুনাফিক বলো না। তাদের ভিতরের অবস্থা আল্লাহর কাছে সঁপে দাও। আহলে কিবলার যে মারা যায়, তার জানাযা পড়ো। সৎ-অসৎ প্রত্যেকের পিছনে নামায আদায় করো।'[১৫৯২] উক্ত হাদিসের যদিও সনদ উল্লেখ করা হয়নি, তবে এর অর্থ বিশুদ্ধ। পাশাপাশি এটাই আহলে সুন্নাতের মাযহাব, হানাফি মাযহাব।

কামাল ইবনুল হুমাম লিখেন, 'আমরা আমাদের (ফাতহুল কাদির) গ্রন্থে বিদআতপন্থি ও প্রবৃত্তিপূজারীদের অনেক কুফরের আলোচনা করেছি। অথচ আবু হানিফা ও শাফেয়ি প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, তারা বিদআতপন্থি আহলে কিবলা (তথা মুসলমানদের) কাফের বলতেন না। তাহলে দুটোর মাঝে সমন্বয় হবে কী করে? এটার সমন্বয় হলো, আহলে বিদআত যেসব আকিদা রাখে, সেগুলো বাস্তবেই কুফর। ফলে কেউ যদি তেমন কথা বলে, তবে কুফরি কথা বলার অপরাধে অভিযুক্ত হবে, কিন্তু হতে পারে সে নিজে কাফের হবে না।'[১৫৯৩]

ইবনে নুজাইম (৯৭০ হি.) লিখেন, 'জামেউল ফুসুলাইন' ও 'ফাতাওয়া সুগরা'-তে এসেছে—'কুফর একটি ভয়ংকর ব্যাপার। ফলে কোথাও একটি রেওয়ায়েত পাওয়া গেলেই সেটার উপর ভিত্তি করে মুমিনকে কাফের বানানো থেকে বিরত থাকতে হবে।' ...'খুলাসা'সহ অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে, 'যদি কোনো মাসআলাতে তাকফির করার একাধিক দিক থাকে, তাকফির না করার মাত্র একটি দিক থাকে, তবে মুফতির কর্তব্য হলো মুসলমানের প্রতি সুধারণা রেখে সেই একটি দিক গ্রহণ করা' (এবং তাকফির না করা)। ...'তাতারখানিয়্যাহ'-তে এসেছে, 'কোনো সংশয়-সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে কাউকে কাফের বলা

১৫৯২. আস-সাওয়াদুল আজম (১০)।

১৫৯৩. ফাতহুল কাদির (১/৩৫১)। এ ব্যাপারে মুতাযিলাদের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন—আমাদের ইমামগণ বলছেন, আল্লাহর কুরআনকে মাখলুক বলা কুফর। মুতাযিলারা আল্লাহর কুরআনকে মাখলুক বলে। তথাপি আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফ মুতাযিলাদের কাফের বলেননি। কারণ, তাদের উক্ত বিভ্রান্তির পিছনে তাবিল (অপব্যাখ্যা), গলত ইজতিহাদ, প্রবৃত্তির অনুসরণ-সহ বিভিন্ন কারণ রয়েছে।

যাবে না।' ...শেষে ইবনে নুজাইম বলেন, 'ফলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো—যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুসলিমের কথা ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় অথবা সেটা কুফর হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকে—এমনকি দুর্বল কোনো বর্ণনার উপর ভিত্তি করে হলেও—সেক্ষেত্রে কোনো মুসলিমকে কাফের ফাতাওয়া দেওয়া যাবে না। এ ভিত্তিতে (ফিকহি গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত) কুফরের অধিকাংশ বক্তব্যের কারণে কাউকে কাফের বলা যাবে না। আমি নিজেও এগুলোর ভিত্তিতে ফাতাওয়া দিই না।'[১৫৯৪]

ইবনে আবিদিন এ ব্যাপারে অত্যন্ত মূল্যবান কথা লিখেছেন। তিনি প্রথমে ইমাম তহাবি রহ.-এর বক্তব্য—'কোনো ব্যক্তি ঈমান থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত বের হবে না যতক্ষণ না এমন কোনো বিষয় অস্বীকার করে যেগুলো স্বীকারের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করেছিল'—উল্লেখ করেন। কারণ, তাকফিরের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।[১৫৯৫] অতঃপর 'আদ-দুররুল মুখতার'সহ বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত কুফরি কথা ও কাজের যেসব মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি বলেন, 'এ অধ্যায়ে এমন অনেক মাসআলা পাওয়া যাবে, যেগুলোকে কুফর বলা হয়েছে; অথচ উক্ত মূলনীতির আলোকে এগুলো কুফর নয়!' সুতরাং একজন আলেমের কাছে যখন কোনো কুফর উল্লেখ করা হয়, তখন সে যেন হুট করে কোনো মুসলিমকে কাফের ফাতাওয়া না দেয়। এটা ফিকহি গ্রন্থগুলোর (কুফরসংবলিত অধ্যায়ের) মাসআলা বোঝার গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।'[১৫৯৬]

অন্যান্য মাযহাবের আলেমদেরও একই বক্তব্য। ইবনে হাজার হাইতামি বলেন, আমাদের ইমামগণ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'যদি কেউ এমন কোনো কথা বলে যা কুফরির সম্ভাব্য নির্দেশক, তবে তার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়ার আগ পর্যন্ত কাফের বলা হবে না।'[১৫৯৭] কাযি ইয়ায (৫৪৪ হি.) লিখেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে অশোভন কিছু বলে বা বিশ্বাস রাখে এবং সে বিশ্বাসের উৎস থাকে তাবিল, ইজতিহাদ, বিদআতের অনুসরণ এবং প্রবৃত্তিঘটিত ভুলবিচ্যুতি ইত্যাদি;

১৫৯৪. আল-বাহরুর রায়েক (৫/২১০)।

১৫৯৫. এই গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখুন আমাদের 'আকিদাহ তহাবিয়্যাহ'র ব্যাখ্যাগ্রন্থে।

১৫৯৬. দেখুন : রদ্দুল মুহতার (৪/২২৪)। ইবনে নুজাইমের বক্তব্যগুলোও তিনি নকল করেছেন।

১৫৯৭. আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (৪/২১৬)।

গালি, রিদ্দাহ কিংবা কুফরের ইচ্ছা না থাকে...এমন লোককে তাকফির করার ক্ষেত্রে সালাফের মতভেদ রয়েছে...। ইমাম মালেক এবং তাঁর অধিকাংশ শাগরেদের মতে তাকে কাফের বলা হবে না, হত্যা করা হবে না। হ্যাঁ, কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে, বন্দি করে রাখা হবে, যাতে প্রকাশ্যে তাওবা করে।'[১৫৯৮]

দুঃখজনকভাবে আমাদের চারপাশে তাকফিরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত দেখা যায়। একজন অন্যজনকে কাফের বলার ক্ষেত্রে এটুকু ছাড় দিতে চায় না। তাদের জন্য ইমামের কর্মপন্থা আদর্শ হতে পারে। ইমামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি কেউ আপনাকে কাফের বলে, তার ব্যাপারে আপনি কী বলবেন? ইমাম বললেন, **'আমি তাকে মিথ্যাবাদী বলব, কিন্তু কাফের বলব না। কারণ, আল্লাহর সম্মান নষ্ট করা আর বান্দার সম্মান নষ্ট করা এক বিষয় নয়। আল্লাহর সম্মানে আঘাত করা হলো আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করা, তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা, কুফরি করা ইত্যাদি। আর বান্দার সম্মান নষ্ট করা হয় জুলুমের মাধ্যমে। সুতরাং আল্লাহ কিংবা রাসুলের নামে মিথ্যাচার করা আর আমার নামে মিথ্যাচার করা সমান নয়। কারণ, আল্লাহ ও রাসুলের উপর মিথ্যাচার করা সমগ্র মানবজাতির উপর মিথ্যাচারের চেয়েও জঘন্য। সুতরাং যে আমাকে কাফের বলবে, তাকে আমি মিথ্যুক বলব। কিন্তু বিনিময়ে তার নামে আমার মিথ্যাচার করা জায়েয হবে না। কারণ, আল্লাহ বলেছেন,** ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ **অর্থ : 'হে মুমিনগণ, কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের ইনসাফ পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ না করে। ইনসাফ করো। এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী।' [মায়িদা : ৮]**[১৫৯৯]

তাকফিরের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

উপরের আলোচনাতে আরও যে বিষয়টি স্পষ্ট হলো সেটা হচ্ছে, আকিদাকেন্দ্রিক সব ধরনের বিচ্যুতি কুফর নয়। বরং এক্ষেত্রে যেগুলো সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর উসুলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে, কুরআন-সুন্নাহর সরাসরি প্রত্যাখ্যানের পর্যায়ে হবে, সেগুলো কুফর গণ্য হবে। আর যেগুলো বিভিন্ন 'শুবুহাত' (সংশয়-সন্দেহ), 'জাহালত' (অজ্ঞতা), 'তাবিল' (অপব্যাখ্যা), 'তাকলিদ' (অনুকরণ), 'ইখতিলাফ' (মতপার্থক্য) ইত্যাদির কারণে হবে,

---

১৫৯৮. শিফা, কাযি ইয়ায (২/২৭২)।

১৫৯৯. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২৭)।

সেগুলো বিদআত ও ভ্রষ্টতা বিবেচনা করা হবে। প্রথমটার উদাহরণ হলো, যেমন—কাদারিয়্যাহদের চরমপন্থি সম্প্রদায়গুলো তাকদির অস্বীকারের পাশাপাশি আল্লাহর ইলম তথা জ্ঞানকেও অস্বীকার করেছে। এটা কুফর গণ্য হবে। কারণ, এটা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত বাস্তবতাকে অস্বীকার করছে। ফলে এটা কুরআন অস্বীকারের নামান্তর। এ কারণে সাহাবা ও তাবেয়িদের একাধিক আলেম কাদারিয়্যাহকে ইসলামত্যাগী (কাফের) সম্প্রদায় গণ্য করেছেন। এ ধরনের আরও একটি উদাহরণ হলো জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়। তারা আল্লাহর অসংখ্য সিফাতকে সরাসরি অস্বীকার করেছে। দ্বীনের অসংখ্য মৌলিক বিষয় সরাসরি লঙ্ঘন করেছে। এ কারণে ইমাম আজমসহ সালাফের অসংখ্য আলেম তাদের কাফের বলেছেন। কাফের সম্প্রদায়ের আরও কিছু উদাহরণ হলো ইসমাইলি, নুসাইরি, কারামেতাসহ বাতেনি সম্প্রদায়গুলো। তারা ইসলামকে ঢাল বানানো সত্ত্বেও এবং নিজেদের মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো অস্বীকার করে। ফলে তাদের কুফর সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো মুতাযিলাদের আল্লাহর বিভিন্ন সিফাতের অস্বীকৃতি, আল্লাহ কর্তৃক মানুষের সকল কর্ম সৃষ্টি, পরকালে আল্লাহর দিদার, কবরের আযাব, মুনকার-নাকিরের প্রশ্ন, শাফায়াত, হাউযে কাউসার, মিযান, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নামের বর্তমান বিদ্যমানতা কিংবা এগুলোর ধ্বংসহীনতা ইত্যাদি অস্বীকৃতি। এসব অস্বীকৃতি সত্ত্বেও তারা মুহাক্কিক আলেমদের মতে কাফের নয়, বরং পথভ্রষ্ট। কারণ, তারা কুরআনের আয়াত কিংবা মুতাওয়াতির তথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত সুন্নাহকে সরাসরি অস্বীকার করে না; বরং বিভিন্ন সংশয়ের বশবর্তী হয়ে অপব্যাখ্যা করে। ফলে তাদের উদ্দেশ্য ইসলামের মুখোমুখি হওয়া নয়, বরং আল্লাহ ও তাওহিদের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ, তাদের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু সেটা বাস্তবায়নের জন্য তারা যে পথ অবলম্বন করেছে, সেটা সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা। এ জন্য তারা গোমরাহ; কাফের নয়। একই কথা খারেজি ও শিয়াদের বিভিন্ন ফিরকার ব্যাপারেও প্রযোজ্য।[১৬০০]

বরং ইমাম আজম নেশাগ্রস্ত মাতাল ব্যক্তির ধর্মত্যাগ (রিদ্দাহ) অধর্তব্য গণ্য করেছেন। তাঁর মতে, কুফর হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস। সুস্থ ও সজাগ অবস্থায় এ

১৬০০. বিস্তারিত দেখুন : আত-তামহিদ, আবু শাকুর (১০৭-এর পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ)। ফাতহুল কাদির (৬/১০০)।

বিশ্বাস পরিত্যাগ ছাড়া কেউ মুরতাদ হবে না। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যেহেতু সংজ্ঞাহীন, সে কী বলে নিজেও জানে না। ফলে এ অবস্থায় তার উপর মুরতাদের বিধান প্রযোজ্য হবে না! যদিও বিষয়টা মতভেদপূর্ণ এবং খোদ ইমাম আজম রহ. থেকেও বিপরীত মত বিদ্যমান (অর্থাৎ, এ অবস্থায় মুরতাদ হলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ হবে। কারণ, যে অবস্থার প্রেক্ষিতে সে এটা করেছে সেটা কোনো উজর নয়), তথাপি এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ব্যক্তির উপর কুফরের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইমাম আজম রহ. কতটা সতর্ক ছিলেন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কেউ ভুলে অথবা বেঘোরে অনিচ্ছাকৃত মুখ থেকে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না।[১৬০১]

এ বিষয়ে আল্লামা হাসকাফি অনেক সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি লিখেন, 'কিবলার অনুসারী (তথা মুসলমান) সংশয় বিদ্যমান থাকার কারণে কাফের হবে না। ফলে খারেজি সম্প্রদায়, যারা আমাদের রক্ত ও সম্পদকে হালাল মনে করে, রাসুলুল্লাহকে গালি দেয়, আল্লাহর সিফাত এবং পরকালে তাঁর দিদারকে অস্বীকার করে, তারাও কাফের নয়। (মুসলিম হিসেবে আদালতে) তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। মূলত তাবিল ও সংশয়ের কারণে তারা এসব ক্ষেত্রে বিচ্যুতির শিকার হয়েছে। ...হ্যাঁ, যদি দ্বীনের সুস্পষ্ট ও অত্যাবশ্যক কোনো বিষয়কে সরাসরি অস্বীকার করে, যেমন—কেউ আল্লাহকে অন্যান্য শরীরী বস্তুর মতো দেহধারী বলে কিংবা আবু বকর রাযি.-এর সাহাবি হওয়াকে অস্বীকার করে, সে কাফের হয়ে যাবে।'[১৬০২]

একইভাবে সাহাবাদের গালি ও সমালোচনার বিষয়টিও এখানে অভিন্ন মূলনীতিতে বিচার্য। অর্থাৎ, স্বাভাবিক অবস্থায় সাহাবাদের সমালোচনা ফিসক তথা গুনাহের কাজ বিবেচিত হবে। কিন্তু সমালোচনা যদি কুরআনের কোনো বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিংবা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার নামান্তর হয়, তবে সেটা কুফর গণ্য হবে। নাসাফি লিখেন, 'সাহাবাদের সমালোচনা যদি (কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত) কোনো মৌলিক বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তবে সেটা কুফর গণ্য হবে। যেমন—আয়েশা রাযি.-কে অপবাদ দেওয়া (মূলত কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা)

১৬০১. দেখুন : আল-আজনাস (১/৪৩২-৪৩৩)।

১৬০২. আদ-দুররুল মুখতার [রদ্দুল মুহতারের অন্তর্ভুক্ত] (১/৫৬১)।

কুফর। কিন্তু সাধারণ সমালোচনা গুনাহের কাজ ও বিদআত।'[১৬০৩] আলাউদ্দিন বুখারি লিখেন, 'একদল রাফেযি মনে করে, জিবরাইল আলাইহিস সালাম ভুল করে আলির পরিবর্তে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে ওহি নিয়ে গিয়েছেন। আরেক দলের মতে, আলি রাযি. নবুওতের শরিক। এরা কাফের। কারণ, এরা কুরআনকে অস্বীকার করেছে।'[১৬০৪] এখানে খেয়াল করে দেখুন, আল্লামা বুখারি সকল শিয়া ও রাফেযিকে কাফের বলেননি। নির্দিষ্টভাবে এই দলকে কাফের বলার কারণ হলো—তারা সরাসরি কুরআন-বিরোধী আকিদায় লিপ্ত হয়েছে।

আরেকটি ব্যাপার হলো, অনেক ক্ষেত্রে কাজ কুফর হলেও ব্যক্তিকে কাফের বলা হয় না। এটা এ জন্য যে, ব্যক্তির সেই কুফরে নিমজ্জিত হওয়ার ভিন্ন কারণ থাকে, যা তাকে কাফের বলার পথে প্রতিবন্ধক। যেমন—ইমাম আজম রহ. আল-ওয়াসিয়্যাহতে বলেছেন, **'তাকদিরের ভালোমন্দ উভয়টিই আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং কেউ যদি এটা মনে করে যে, ভালোমন্দ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে, তার তাওহিদ নষ্ট হবে এবং সে কাফের হয়ে যাবে।'**[১৬০৫] এটা বাস্তব কথা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মুতাযিলারা মনে করে, মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়, বরং স্রেফ ভালোটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং মন্দ কাজ মানুষ নিজে করে। ফলে উপর্যুক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে মুতাযিলাদের কাফের বলা আবশ্যক হয়ে পড়ে। একইভাবে বিভিন্ন ফিরকা আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে তাশবিহ ও তাতিলের শিকার হয়েছে, তাদেরও কাফের বলা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তথাপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম তাদের কাফের বলেননি। কারণ, তারা মূলত কুরআন-সুন্নাহ অস্বীকারের উদ্দেশ্যে উক্ত বক্তব্য দেয়নি কিংবা সরাসরি অবিশ্বাস বা প্রত্যাখ্যান করেনি; বরং উক্ত বক্তব্যের উৎস শুবুহাত (সংশয়), জাহালত (অজ্ঞতা), তাবিল তথা অপব্যাখ্যা ও আখতা তথা ভুলবিচ্যুতি। তারা কুরআন কারিমের ভাষা বুঝতে ভুল করেছে। আল্লাহকে মন্দ বিষয় থেকে পবিত্র রাখার মহতি উদ্দেশ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা (যা মূলত অপব্যাখ্যা) করেছে। অর্থাৎ, তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু এ লক্ষ্যে পৌঁছতে তারা ভুল পথ অবলম্বন করেছে। ফলে আলেমগণ তাদের বিভ্রান্ত বলেছেন, কাফের বলেননি।[১৬০৬]

১৬০৩. শরহুল আকায়েদ (১০২)।

১৬০৪. রিসালাহ ফিল ইতিকাদ (১৮১)।

১৬০৫. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৩৪)।

১৬০৬. শরহুল ওয়াসিয়্যাহ, মুফতি যাদাহ (৬৮-৬৯)।

ইমামের শাগরেদ হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন, 'কাদারিয়্যাহরা বিভ্রান্ত সম্প্রদায়, প্রবৃত্তির অনুসারী। তাদের অনুসরণ করা যাবে না। কিন্তু তারা কাফের নয়। কারণ, তারা তাবিল করেছে। তাবিলের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে।'[১৬০৭]

শরিফ জুরজানি লিখেন, 'আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার, নবুওত অস্বীকার কিংবা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনীত দ্বীনের কোনো মৌলিক বিষয় অস্বীকার কুফর। একইভাবে উম্মাহর সর্বসম্মত কোনো হালালকে হারাম বলা কিংবা হারামকে হালাল বলাও কুফর। তবে যদি সেখানে মতপার্থক্য থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে কাফের বলা যাবে না।'[১৬০৮]

মোল্লা খসরু ও গুমুশখানভি লিখেন, যদি কোনো মাসআলাতে কাউকে কাফের বলার অসংখ্য দিক থাকে, কিন্তু কাফের না বলার একটা দিক থাকে, তবে তাকে কাফের বলা হবে না...। যদি কেউ বাধ্য হয়ে অথবা ভুলে কুফরি কথা বলে, সে কাফের হবে না। কিন্তু যদি ঠাট্টা বা উপহাস করে বলে, তবে কাফের হয়ে যাবে।[১৬০৯]

মোটকথা, কোনোকিছুকে অস্বীকার করা কিংবা বিপরীত আকিদা রাখাই কুফর নয়; বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়টির মৌলিকত্ব এবং দ্বীনের মাঝে এর অবস্থান, কুফরের কারণ এবং তাকফিরের প্রতিবন্ধকতাসমূহের উপর ভিত্তি করে অপরাধের পর্যায় নির্ণীত হবে। আল্লামা মারআশি লিখেন, "আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে 'জিহাহ' (দিক), 'জিসম' (শরীর), 'মাকান' (স্থান) ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সাহাবাদের মাঝে কোনো আলোচনাই হয়নি, ঐকমত্য তো দূরের কথা। ফলে এক্ষেত্রে মতভেদ হলে এবং ভুলের শিকার হলে সর্বোচ্চ বিদআত বলা যেতে পারে, কুফর নয়। আল্লাহ তায়ালা শরীর, দিক, আকার-আকৃতি ইত্যাদির ঊর্ধ্বে। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর ব্যাপারে এমন আকিদা রাখে, সেটাকে বিদআত বলা হবে, কুফর নয়।"[১৬১০]

মুসলমানের রক্তপাত নিষিদ্ধ

তাকফিরের সঙ্গে ব্যক্তিকে হত্যার একটা গভীর সম্পর্ক আছে। ফলে তাকফিরের বিধান বর্ণনার পরে এ ব্যাপারে কিছু কথা বলা জরুরি। প্রথমেই মনে রাখা উচিত, ইসলামে মুসলিমের রক্ত সুরক্ষিত। অন্যায়ভাবে রক্তপাত সম্পূর্ণ

১৬০৭. দেখুন : আল-আজনাস (১/৪৪৭)।

১৬০৮. শরহুল মাওয়াকিফ (৮/৪০০)।

১৬০৯. দেখুন : দুরারুল হুক্কাম শরহু গুরারিল আহকাম (১/৩২৪)। জামেউল মুতুন, গুমুশখানভি (৩৮)।

১৬১০. রিসালাতুত তানযিহাত (৮-৯)।

নিষিদ্ধ। বরং কুরআনে কোনো মুসলিমকে হত্যা করলে জাহান্নামে দীর্ঘকাল কঠোর শাস্তির ঘোষণা এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ অর্থ : 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হন। তাকে লানত করেন। তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত করেন।' [নিসা : ৯৩]

হাদিসে মানুষ হত্যাকে ধ্বংসাত্মক কাজ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[১৬১১] কিছু হাদিসে একজন মুসলমানকে হত্যার চেয়ে গোটা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া লঘু সাব্যস্ত করা হয়েছে।[১৬১২] কোনো কোনো হাদিসে মুসলিমের রক্তের গুরুত্ব বোঝাতে হত্যাকে কুফর সাব্যস্ত করা হয়েছে।[১৬১৩]

এত সতর্কতা সত্ত্বেও খারেজি ও মুতাযিলারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা মুসলমানের রক্তকে পানির মতো বানিয়ে দিয়েছে। তাদের মতে, কেউ যদি কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয় অথবা কোনো বিদআত আবিষ্কার করে, কোনো ফরয আমল ছেড়ে দেয়, তবে তার রক্তপাত বৈধ। তাকে হত্যা করা হবে! এগুলো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি। কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। পিছনে 'ঈমান ও আমল', 'ঈমান ও কবিরা গুনাহ' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, তাহলে কি মুসলমানকে কখনোই হত্যা করা যাবে না? মুসলমানের রক্তপাত সম্পূর্ণভাবেই নিষিদ্ধ? না, বিষয়টি তেমন নয়। বরং স্বাভাবিকভাবে মুসলমানের রক্তপাত নিষিদ্ধ। কিন্তু এমন গর্হিত কিছু অপরাধ রয়েছে, যে কারণে এই নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যায়। তখন রক্তপাত বৈধ হয়। আহলে সুন্নাতের মতে, মোটামুটি তিন কারণে একজন মুসলিমের রক্তপাত বৈধ হয়, যা মূলত একটি হাদিস থেকে উৎসারিত। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, কোনো ব্যক্তি যখন 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল'—এই সাক্ষ্য দেবে, তখন তার রক্ত ঝরানো বৈধ হবে না। হ্যাঁ, তিন ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ হবে : ১. অন্যকে হত্যাকারী। ২. বিবাহিত ব্যভিচারী। ৩. ধর্মত্যাগী বিদ্রোহী।[১৬১৪]

১৬১১. বুখারি (কিতাবুল ওসায়া : ২৭৬৬)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ৮৯)।
১৬১২. তিরমিযি (আবওয়াবুত দিয়াত : ১৩৯৫)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুত দিয়াত : ২৬১৯)।
১৬১৩. বুখারি (কিতাবুল আদাব : ৬০৪৪)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ৬৪)।
১৬১৪. বুখারি (কিতাবুদ দিয়াত : ৬৮৭৮)। মুসলিম (কিতাবুল কাসামাহ : ১৬৭৬)।

প্রথম প্রকারটি কিসাস—হত্যার বিনিময়ে হত্যা। দ্বিতীয় প্রকারটি 'হদ।' তৃতীয় প্রকারটিতে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—দুটোই অন্তর্ভুক্ত। ফলে ইসলামে মুরতাদের শাস্তি হলো হত্যা।

একইভাবে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে (অন্যায়মূলক) সশস্ত্র বিদ্রোহও অস্ত্রসহ দমন করা হবে। প্রয়োজনে তাদের হত্যা করা হবে। খারেজিদের বিরুদ্ধে আলি রাযি.-এর যুদ্ধ ছিল এর বাস্তব প্রয়োগ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ অর্থ : 'মুসলিমদের দুটি দল আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তবে যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে যাবৎ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং যদি ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সংগতভাবে মীমাংসা করে দাও এবং ইনসাফ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।' [হুজুরাত : ৯]

একইভাবে কেউ যদি মুসলিম ভূখণ্ডে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি করে, ডাকাতি ও লুটতরাজের মাধ্যমে জনমনে ত্রাস ছড়ায়, তাকেও হত্যা করা হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ অর্থ : 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হবে, কিংবা তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। এটা তো তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।' [মায়িদা : ৩৩] প্রসিদ্ধ 'উরানিয়্যিন'-এর ঘটনায় তারা প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় অপরাধেই লিপ্ত হয়েছিল। ফলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশে তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড কঠোর অভিযান চালানো হয়। তাদের সমূলে উৎখাত করা হয়।

মোটকথা, ইসলামের চোখে মানুষ-হত্যা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। ফলে শরিয়তে নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কিছু অপরাধের বাইরে কোনো মানুষের রক্তপাত করার সুযোগ নেই। তাই খারেজি বা মুতাযিলাদের মতের অনুসরণ করে কেউ গুনাহ করলে কিংবা কোনো ফরয ইবাদত ছেড়ে দিলেই তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। এমনকি

কারও হাতে হত্যাযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হলেও যে-কেউ শরিয়তের শাস্তি প্রয়োগ করার অধিকার রাখে না। বরং শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বশীল তদন্ত ও যাচাই-বাছাই শেষে নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়িত করবেন।[১৬১৫]

ইসলামি শরিয়াহর সিদ্ধান্ত হলো, যদি কোনো ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়, তাকে বন্দি করা হবে। তিন দিন তার কাছে ইসলাম পেশ করা হবে। তার সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হবে। যদি ইসলামে ফিরে আসে, ভালো কথা; নতুবা হত্যা করা হবে। যদি ইসলাম পেশ করার আগেই কেউ তাকে হত্যা করে ফেলে, তবে সেটা মাকরুহ ও নিষিদ্ধ গণ্য হবে। কিন্তু হত্যাকারীকে এ জন্য হত্যা কিংবা গুরুতর শাস্তি দেওয়া হবে না। কারণ, নিহত ব্যক্তির রক্ত আগে থেকেই মুরতাদ হওয়ার কারণে অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। ইসলামে কিসাস নীতি (হত্যার বদলে হত্যা) স্রেফ সংরক্ষিত রক্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১৬১৬]

এটা পুরুষ মুরতাদের বিধান। নারী মুরতাদকে কেবল বন্দি করা হবে, হত্যা করা হবে না। ইমাম আজম রহ. বলেন, নারী মুরতাদকে হত্যা করা হবে না, বরং ইসলামে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত বন্দি করে রাখা হবে। এক্ষেত্রে ইমামের দলিল ইবনে আব্বাস রাযি.-এর হাদিস। তিনি বলেছেন, 'কোনো নারী মুরতাদ হয়ে গেলে ইসলামে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হবে।' ইমাম আরও যুক্তি দেন, যুদ্ধের ময়দানে মুশরিক নারীদের রাসুলুল্লাহ (ﷺ) হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। বোঝা গেল, মুরতাদকেও নারী হিসেবে হত্যা থেকে বিরত থাকতে হবে।[১৬১৭]

কাফের বা মুরতাদ হওয়ার পরে ঈমানে ফিরে আসা

যদি কোনো মুসলিম মুরতাদ হয়ে যায়, অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহে আবার ঈমানের পথে ফিরে আসে, তাওবা করে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে ব্যক্তির ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে। সে মুসলিম গণ্য হবে। প্রশ্ন

১৬১৫. দেখুন : বাহরুল কালাম (২৫৭)। মুরতাদের বিধান, তার জন্য নির্ধারিত শাস্তি এবং সেটা বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন আমাদের 'আকিদাহ তহাবিয়্যাহ'র মুরতাদের বিধান অধ্যায়ে।

১৬১৬. দেখুন : তুহফাতুল মুলুক (৩০৭)। ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম (৬/৭১)। আল-বাহরুর রায়েক (৫/২০১-২০২)।

১৬১৭. দেখুন : আল-আসল, ইমাম মুহাম্মাদ (৭/৪৯৭)। কাশফুল আসার, হারেসি (১/৯১)। অন্য আলেমদের মতে, মুরতাদের শাস্তি হত্যা। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হবে না। (আল-হাভি আল-কাবির, মাওয়ারদি : ১৩/১৫৬)।

হলো, মাঝের সময়টুকুর বিধান কী? মুরতাদ হওয়ার আগে সে জীবনভর যা আমল করেছিল, সেগুলোর অবস্থা কী?

এটা মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলা। এই মতপার্থক্যের উৎস আরেক মাসআলা। আহলে সুন্নাতের বিশুদ্ধ মতে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ উপস্থিত কর্ম ও অবস্থা অনুযায়ী সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগা বিবেচিত হবে। অর্থাৎ, যতক্ষণ ঈমানের উপর থাকবে, ততক্ষণ সৌভাগ্যবান বিবেচিত হবে। যতক্ষণ কুফরের উপর থাকবে, ততক্ষণ দুর্ভাগা বিবেচিত হবে। ফলে কেউ যদি কাফের থাকার পরে ঈমান আনে, তবে ঈমান আনার আগ পর্যন্ত সে দুর্ভাগা এবং আল্লাহর কাছে ঘৃণিত থাকবে। ঈমান আনার মুহূর্ত থেকে সৌভাগ্যবান এবং আল্লাহর প্রিয় বিবেচিত হবে; যেমন ওয়াহশি, আবু সুফিয়ান রাযি. প্রমুখ সাহাবি। ঈমান আনার আগে তারা কাফের ছিলেন; আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় ও দুর্ভাগা ছিলেন। কিন্তু ঈমান আনার পরে সৌভাগ্যবান হয়ে গেলেন। আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হিসেবে বরিত হলেন। বিপরীতে ইবলিস কুফরে লিপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিল, আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসাপ্রাপ্ত ছিল। কিন্তু কুফর করার মুহূর্ত থেকে দুর্ভাগাদের তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। সে আল্লাহর কাছে ঘৃণিত ও বিতাড়িত হলো। ইমাম আজম বলেন, **'ঈমান ও কুফর বান্দার কাজ। যে ব্যক্তি কুফরি করে, আল্লাহ তাকে কুফরি অবস্থায় কাফের হিসেবে জানেন। পরবর্তীকালে সে যখন ঈমান আনে, তখন তাকে ঈমান অবস্থায় মুমিন হিসেবে জানেন এবং তাকে ভালোবাসেন। এতে তাঁর জ্ঞান ও গুণের ভিতরে কোনো পরিবর্তন আসে না।'**[১৬১৮]

বিপরীতে আবু মুহাম্মাদ আল-কাত্তান এবং আবুল হাসান আশআরি রহ.-এর মত হলো, সার্বক্ষণিক অবস্থা নয়, বরং শেষ অবস্থার উপর চিরন্তন সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, ভালোবাসা-ঘৃণা নির্ভর করবে। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে যদি লেখা থাকে যে, সে প্রথম জীবনে কাফের এবং শেষ জীবনে মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তবে সে জীবনভর কাফের থাকা অবস্থাতেও সৌভাগ্যবান এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র বিবেচিত হবে! এ কথার ফল দাঁড়ায়, শেষ অবস্থা যদি মুমিন লেখা থাকে, তবে কেউ মূর্তির সামনে সিজদারত অবস্থাতেও আল্লাহর কাছে মুমিন গণ্য হবে এবং তাঁর মহব্বতের পাত্র হবে! বিপরীতে কারও ব্যাপারে যদি লেখা থাকে সে

১৬১৮. আল-ফিকহুল আকবার (৪)।

প্রথম জীবনে মুমিন থাকবে, কিন্তু শেষ জীবনে মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তবে সে জীবনভর ঈমানের উপর থাকা সত্ত্বেও দুর্ভাগা এবং আল্লাহর কাছে ঘৃণিত বিবেচিত হবে![১৬১৯]

এটা গলত কথা এবং বাস্তবতাবিবর্জিত বক্তব্য। সুস্থ বিবেক ও যুক্তিও ইমাম আজম তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নাতের বক্তব্যকে সমর্থন করে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন। ফলে একটা লোকের ব্যাপারে যখন আল্লাহর জানা থাকে যে, এ লোকটি জীবনভর কাফের থাকবে এবং শেষ জীবনে ঈমান এনে মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তায়ালা জীবনভর তার সঙ্গে তার কর্মের বিপরীত ফয়সালা করেন না। বাস্তবতার বিপরীত আচরণ করেন না। অর্থাৎ, সে জীবনভর মূর্তিপূজা করতে থাকবে, আল্লাহকে গালি দিতে থাকবে, কিন্তু শেষে যেহেতু মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জন্য মূর্তিপূজা ও গালি দেখেও আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন এটা অর্থহীন এবং অযৌক্তিক ব্যাপার। বরং শেষ জীবনেরটা শেষ জীবনে হবে। আল্লাহ প্রত্যেকের সঙ্গে তার অবস্থা অনুযায়ী আচরণ করেন। একইভাবে আল্লাহর ইলমে আছে কেউ সারা জীবন ভালো কাজ করবে, কিন্তু জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে মুরতাদ হয়ে যাবে। এ জন্য জীবনভর সে যখন আল্লাহকে ডাকবে, আল্লাহর ইবাদত করবে, তবুও আল্লাহ তাকে ঘৃণা করবেন, অপছন্দ করবেন, দুর্ভাগা হিসেবে তাকে মূল্যায়ন করবেন—এটা বেইনসাফি, অযৌক্তিক। বরং তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে অবস্থা অনুযায়ী আচরণ করেন। বরং হতে পারে আল্লাহ তাঁর নিষ্ঠা ও বন্দেগি দেখে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করবেন, শেষ জীবনে তাকে নিজ ইচ্ছায় তিনি মুরতাদ হওয়া থেকে রক্ষা করবেন!

উপর্যুক্ত মতপার্থক্যের ফলাফল হলো, যেহেতু আশআরির কাছে সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের মাপকাঠি শেষ অবস্থা, তাই কোনো মুমিন যদি মুরতাদ হয়ে যায়, অতঃপর মৃত্যুর আগে আবারও ঈমানে ফিরে আসে, তবে তার আগের আমল বাতিল হবে না। সকল পুণ্য আমলনামায় রয়ে যাবে। কারণ, সে যেহেতু ঈমানের উপর মৃত্যু বরণ করবে লেখা আছে, সুতরাং সে মুরতাদ অবস্থাতেও সৌভাগ্যবান এবং আল্লাহর মহব্বতের পাত্র ছিল। এমনকি মুরতাদ হওয়ার আগে যদি হজ পালন করে থাকে, দ্বিতীয়বার ঈমান আনার পরে পুনরায় হজ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, আগের হজ বাতিল হয়নি! তারা তাদের মতের পক্ষে কুরআন থেকে দলিল

১৬১৯. আস-সাওয়াদুল আজম (৫১-৫৩)। আত-তামহিদ, নাসাফি (১৫২-১৫৩)।

দেন : ﴿وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে (মুরতাদ হয়ে) যাবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।' [বাকারা : ২১৭] এখানে আমল বাতিল হওয়া 'কুফর অবস্থায় মৃত্যু'র সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ফলে কুফর অবস্থায় মৃত্যু না হলে আমল বাতিল হবে না। পুনরায় ঈমান আনলে আগের পুণ্য নষ্ট হবে না। কারণ, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শেষ পরিণতি, সাময়িক অবস্থা নয়। কিন্তু এ দলিল সঠিক নয়। কারণ, এখানে স্রেফ একটা অবস্থার কথা বলা হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য আয়াত দেখলে সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসবে যে, অন্য বিভিন্ন কারণে আমল বাতিল হয়। উদাহরণস্বরূপ কুফর ও শিরক সর্বাবস্থায় আমল বাতিলকারী, মৃত্যুবরণ করা জরুরি নয়।

এ জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নাত এবং হানাফি আলেমগণ বলেন, কেউ মুরতাদ হলে তার সকল আমল বাতিল হয়ে যায়। ফলে কোনো মুসলমান মুরতাদ হওয়ার পরে যদি দ্বিতীয়বার ইসলামে প্রবেশ করে, তবে তার হজ পুনরায় আদায় করতে হবে। আহলে সুন্নাতের ইমামদের দলিল কুরআনের একাধিক আয়াত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾ অর্থ : 'যে ব্যক্তি ঈমান প্রত্যাখ্যান করে, তার সকল আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' [মায়িদা : ৫] এখানে মৃত্যুর সঙ্গে কোনো সম্পৃক্ততা নেই। কাফের হলেই আমল বাতিল হয়ে যাবে। একইভাবে কুফরের উপর মৃত্যু হলেও আমল বাতিল হয়ে যাবে। দুটোর মাঝে কোনো সংঘাত নেই। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾। অর্থ : 'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে—যদি আল্লাহর শরিক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।' [যুমার : ৬৫] এখানেও সরাসরি শিরকের সঙ্গে আমল বাতিল হয়ে যাওয়াকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মৃত্যু প্রসঙ্গ নেই।[১৬২০]

১৬২০. বিস্তারিত দেখুন : উসুলুদ্দিন, বাযদাবি (১৭৭-১৮১)। নাজমুল ফারায়েদ (৫৬-৫৭)।

কাউকে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলার বিধান

কারও ব্যাপারে জান্নাত-জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়ার বিধান কী? বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। অর্থাৎ, জান্নাত-জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়ার বিধান একাধিক প্রেক্ষিতে বিচার্য—কিছু ক্ষেত্রে জান্নাত ও জাহান্নামের সাক্ষ্য দিতে হবে, কিছু ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না।

সাধারণ কাফের-মুশরিকদের ব্যাপারে জাহান্নামের সাক্ষ্য দিতে হবে। কারণ, কুরআন-সুন্নাহতে তাদের জাহান্নামি বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَظَلَمُوا۟ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۝ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۝﴾ অর্থ : 'যারা কুফরি ও সীমালঙ্ঘন করেছে, আল্লাহ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না এবং তাদের কোনো পথও দেখাবেন না, জাহান্নামের পথ ব্যতীত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।' [নিসা : ১৬৮-১৬৯] অন্যত্র বলেন, ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ অর্থ : 'নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন।' [আহযাব : ৬৪] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! এই উম্মতের মধ্য থেকে কোনো ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান যদি আমার ব্যাপারে শোনে, অতঃপর আমার আনীত দ্বীনের উপর ঈমান আনা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জাহান্নামি হবে।'[১৬২১]

বিপরীতে সাধারণভাবে মুমিনদের জান্নাতি বলে সাক্ষ্য দেওয়া যাবে। কারণ, কুরআন-সুন্নাহতে তাদের ব্যাপারে জান্নাতের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلنَّعِيمِ﴾ অর্থ : 'যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত।' [লুকমান : ৮] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা সে ব্যক্তির উপর জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্য দেয়।[১৬২২]

এটা হলো উন্মুক্ত ও সাধারণ অবস্থায়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে জান্নাত-জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়ার বিধান কী? এটা নিয়েই মূলত আলোচনা। এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের স্বাভাবিক নীতি হলো, নির্দিষ্ট কারও ব্যাপারে জান্নাত ও

১৬২১. মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ১৫৩)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবি হুরাইরা : ৮৩২০)।

১৬২২. বুখারি (কিতাবুস সালাত : ৪২৫)। মুসলিম (কিতাবুল মাসাজিদ : ৩৩)।

জাহান্নামের সাক্ষ্য না দেওয়া। ইমাম আজম বলেন, **'যদি কেউ নিজেকে জান্নাতি হিসেবে দাবি করে, তবে সে মিথ্যুক। কারণ, সে জান্নাতি নাকি জাহান্নামি সে সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অবহিত নয়। একইভাবে কেউ যদি নিজেকে জাহান্নামি বলে, সেও মিথ্যাবাদী। কারণ, আল্লাহ ছাড়া কারও সে-সম্পর্কিত জ্ঞান নেই।'**[১৬২৩]

ইমামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, নবিগণ ছাড়া অন্য কাউকে যদি আপনি দিনরাত নামায ও রোযায় মগ্ন দেখেন, তবে কি তার জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দেবেন? ইমাম বললেন, **'আমরা কেবল তাদের জন্য জান্নাত ও জাহান্নামের সাক্ষ্য দেবো যাদের জন্য কুরআন-সুন্নাহ সাক্ষ্য দিয়েছে। এর বাইরে আমরা কথা বলব না।'**[১৬২৪]

এটা একটা বিশাল মূলনীতি। এই মূলনীতির উপরই দাঁড়িয়ে আছে আহলে সুন্নাতের এ-সম্পর্কিত আকিদা। অর্থাৎ, কুরআন ও সুন্নাহ যাদের ব্যাপারে জান্নাত কিংবা জাহান্নামের সাক্ষ্য দিয়েছে, আমরা তাদের ব্যাপারে এ সাক্ষ্য দেবো। বাকি সকল মুসলমানের পরিণতির ব্যাপারে নীরব থাকব। ইমাম এ মূলনীতি বিভিন্ন জায়গায় ব্যাখ্যা করেছেন। আবু মুকাতিল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি, **'আমাদের কাছে মানুষ তিন মঞ্জিলে বিভক্ত : এক. নবিগণ। তারা নিশ্চিতভাবে জান্নাতি। একইভাবে নবিগণ যাদের ব্যাপারে জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন তারাও জান্নাতি। দুই. মুশরিকগণ। তাদের ব্যাপারে আমরা জাহান্নামের সাক্ষ্য দিই। তিন. সাধারণ মুমিনগণ। তাদের ব্যাপারে আমরা নীরব থাকি। তাদের মধ্যে নির্ধারিত ব্যক্তিবিশেষের জন্য আমরা জান্নাত কিংবা জাহান্নামের সাক্ষ্য দিই না। কিন্তু তাদের জন্য আমরা জান্নাতের আশা করি, জাহান্নামের আশঙ্কা করি।** তাদের ব্যাপারে আমরা বলি যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : ﴿وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ অর্থ : 'কিছু লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা তাদের ভালো কাজের সঙ্গে মন্দ কাজ মিশ্রিত করেছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।' [তাওবা : ১০২] ফলে আল্লাহ তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন। আর তাদের জন্য (গুনাহ সত্ত্বেও) আমরা (ভালোর) আশা করি। কারণ, আল্লাহ কুরআনে

১৬২৩. আল-ফিকহুল আবসাত (৪৬)।

১৬২৪. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২৩)।

বলেছেন, ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ অর্থ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করা ক্ষমা করেন না। এটা ভিন্ন যেকোনো বিষয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করল, সে এক গুরুতর অপবাদ আরোপ করল।' [নিসা : ৪৮] **ফলে নবিগণ এবং তারা যাদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, তারা ছাড়া আর কাউকে আমরা জান্নাতি বলি না, সে যত নামায-রোযা করুক, যত মুত্তাকি-পরহেযগার হোক।**'[১৬২৫]

উক্ত মাসআলাতে ইমাম আজম আরও কিছু আয়াত ও হাদিস দলিল হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি নিজস্ব সনদে ইবনে আব্বাস সূত্রে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, **'আমার উম্মতের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো সে ব্যক্তি যে বলে, আমি জাহান্নামে নয়, জান্নাতে যাব।'** আবু যিবইয়ান সূত্রে তিনি বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, **'আল্লাহর উপর শপথকারীদের জন্য সর্বনাশ! জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা কারা? তিনি বললেন, যারা বলে অমুক জান্নাতে, অমুক জাহান্নামে!'** তিনি নাফে' সূত্রে ইবনে উমর রাযি. থেকে রাসুলুল্লাহর হাদিস বর্ণনা করেন, **'তোমরা আমার উম্মতকে জান্নাতি বা জাহান্নামি ঘোষণা দিয়ো না। ওটা কিয়ামতের দিন আল্লাহর ফয়সালার জন্য ছেড়ে দাও।'** ইমাম আজম আবান থেকে হাসান বসরি সূত্রে আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেন যেখানে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—তোমরা আমার বান্দাদের জান্নাতি বা জাহান্নামি বলে ঘোষণা করো না। বরং আমিই কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে ফয়সালা করব এবং তাদের প্রাপ্য স্থান দেবো।'**[১৬২৬]

অর্থাৎ, সাধারণভাবে বাহ্যিক অবস্থা দেখে ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করা গেলেও পরকালের ব্যাপারে মূল্যায়ন করা যাবে না। ফলে কোনো মুসলমানকে 'জান্নাতি' বা 'জাহান্নামি' ঘোষণা করা যাবে না। প্রত্যেকের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর কাছে সঁপে দিতে হবে। এর মানে এটা নয় যে, কারও ব্যাপারেই জান্নাত-জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না। বরং কুরআন ও সুন্নাহতে যাদের ব্যাপারে জান্নাত-জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তাদের ব্যাপারে জান্নাত-জাহান্নামের সাক্ষ্য দিতে হবে। যেমন—কুরআন-সুন্নাহতে নবি-রাসুলসহ একাধিক ব্যক্তির ব্যাপারে জান্নাতের

১৬২৫. আল-ইনতিকা (৩১৯-৩২০)।

১৬২৬. আল-ফিকহুল আবসাত (৫২)।

সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে; আবার একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। কুরআনে ইবলিসের ব্যাপারে জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ইবলিসকে লক্ষ্য করে বলেন, ﴿قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۝٨٤ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٨٥﴾ অর্থ : 'তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি—আমি তোমার দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুগামী হবে তাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।'[সোয়াদ : ৮৪-৮৫] কুরআনে ফেরাউনের ব্যাপারে জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ۝٤٥ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ۝٤٦﴾ অর্থ : 'আর ফেরাউন-গোত্রকে পরিবেষ্টন করল শোচনীয় শাস্তি। সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন-গোত্রকে প্রচণ্ডতম শাস্তিতে দাখিল করো।'[গাফের : ৪৫-৪৬] কুরআনে আবু লাহাব এবং তার স্ত্রীর ব্যাপারে জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ۝٤ فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍۭ ۝٥﴾ অর্থ : 'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। কোনো কাজে আসেনি তার ধনসম্পদ এবং যা সে উপার্জন করেছে। অচিরেই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে। এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে। গলদেশে রজ্জু পাকানো অবস্থায়।' [লাহাব : ১-৪] হাদিসে আমর ইবনে লুহাই খুযায়ি, আবু জাহল এবং অন্য একাধিক কাফেরের বিরুদ্ধে জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো, কুরআন-সুন্নাহতে যাদের ব্যাপারে জান্নাত বা জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, আমরা তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবো। বাকিদের ব্যাপারে নীরব থাকব। এটাই ইমাম আজম এবং সকল আহলে সুন্নাতের ইমামের আকিদা।

নুহ ইবনে আবু মারইয়াম বলেন, আমি আবু হানিফা রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবিগণ ব্যতীত আর কারও ব্যাপারে কি আপনি জান্নাতের সাক্ষ্য দেন? তিনি বলেন, **'হ্যাঁ। বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যাদের ব্যাপারে জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাদের ব্যাপারে আমি জান্নাতের সাক্ষ্য দিই।'**[১৬২৭]

১৬২৭. আল-ইনতিকা (৩১৯)।

ইমাম তহাবি বলেন, ‘আমরা আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত সৎ-অসৎ সকলের পিছনে নামায আদায় এবং সকলের মৃত্যুর পরে জানাযা পড়া শরিয়তসম্মত মনে করি। তাদের কাউকে আমরা জান্নাতি-জাহান্নামি সাব্যস্ত করি না। বাইরে প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে আমরা কুফর, শিরক কিংবা মুনাফিকির সাক্ষ্য দিই না। সকলের ভিতরের অবস্থা আমরা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করি।’[১৬২৮]

কাসানি লিখেন, ‘নবিগণ এবং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যাদের জান্নাতি বলেছেন, তারা ব্যতীত অন্য কাউকে জান্নাতি ঘোষণা করা বৈধ নয়। একইভাবে কোনো মুমিনকে জাহান্নামি বলা বৈধ নয়।’[১৬২৯]

১৬২৮. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৩-২৪)।

১৬২৯. আল-মুতামাদ ফিল মুতাকাদ (১৫)

শিরক

শিরকের সংজ্ঞার্থ ও পরিচয়

শিরক (الشرك) শব্দের শাব্দিক অর্থ : অংশীদার সাব্যস্ত করা। পরিভাষায় শিরক বলা হয়, 'আল্লাহ তায়ালার সত্তা, তাঁর নাম, গুণ, কর্ম ও ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা।' যেমন—সন্তান দেওয়া, রিযিক দেওয়া, জীবন ও মৃত্যু দেওয়া আল্লাহর কর্ম। যদি কেউ মনে করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জীবন ও মৃত্যু দিতে পারে কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সন্তান দিতে পারে, রিযিক দিতে পারে, তবে এটা শিরক গণ্য হবে। গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার গুণ। যদি কেউ মনে করে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে, তবে সেটা শিরক হবে। ইবাদত একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে পশু যবাই করলে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য রুকু-সিজদা কিংবা নামায-রোযা অথবা যেকোনো ইবাদত করলে সেটা শিরক হবে।

আরও সরলীকরণ করে বলা যায়—শিরক তাওহিদের বিপরীত বস্তু। যেসব বিষয় বাস্তবায়ন করাকে তাওহিদ বলা হয়, সেগুলোকে লঙ্ঘন করাই শিরক। ইমাম আজম রহ. তাওহীদ সম্পর্কে বলেন, **'আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনো বস্তুর মতো নন। তাঁর সৃষ্টির কোনো বস্তুও তাঁর মতো নয়।'**[১৬৩০]

ইমাম তহাবি লিখেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর মতো কিছুই নেই। কোনোকিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি সর্বদাই ছিলেন, তাঁর কোনো শুরু নেই। তিনি সর্বদাই থাকবেন, তাঁর কোনো শেষ নেই। তাঁর কোনো ক্ষয় নেই, লয় নেই। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না। কোনো কল্পনাশক্তি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে

১৬৩০. আল-ফিকহুল আকবার (১)।

না। বোধবুদ্ধি তাঁকে পরিব্যপ্ত করতে পারে না। সৃষ্টির কোনোকিছুই তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না। তিনি সদা জীবিত, তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি সদা বিদ্যমান রক্ষাকর্তা, নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি রিযিকদাতা, রিযিকদানে কোনো কষ্ট-ক্লান্তি নেই তাঁর। তিনি মৃত্যু দানকারী, নির্ভয়ে মৃত্যু দান করেন। তিনি পুনরুত্থানকারী, বিনাক্লেশে সৃষ্টিকে পুনরুত্থিত করেন।'[১৬৩১]

এসব আকিদার বিপরীত আকিদা ও আমলই শিরক। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা কিংবা পালনকর্তায় বিশ্বাস করা শিরক। দুই কিংবা ততোধিক খোদায় বিশ্বাস করা শিরক। আল্লাহকে সৃষ্টির মতো মনে করা কিংবা কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর মতো মনে করা শিরক। সুতরাং আল্লাহর জন্য পুত্র সাব্যস্ত করা—যেমনটা খ্রিষ্টানরা করে থাকে—শিরক। আল্লাহর উপর সৃষ্টির গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করা কিংবা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির উপর প্রয়োগ করা শিরক। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে বিশ্বাস করা শিরক। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রিযিকদাতা মনে করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, পৃথিবীর পরিচালক, জীবন ও মৃত্যুর মালিক, স্বতন্ত্র প্রয়োজন পূর্ণকারী মনে করে তাদের কাছে প্রার্থনা করা শিরক। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে স্বয়ংসম্পূর্ণ সামগ্রিক আশ্রয়স্থল হিসেবে বিশ্বাস করে তার কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক। সুতরাং কোনো ওলি-আউলিয়া বা পিরকে গায়েবের ভান্ডার, আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত পৃথিবীর পরিচালক ও ত্রাতা মনে করা শিরক। ইমাম আজমকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, **'এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর (পৃথিবী পরিচালনা এবং অন্য সকল) কাজের দায়িত্ব অন্য কারও হাতে সঁপে দেননি।'**[১৬৩২] সুতরাং পৃথিবী পরিচালনা কিংবা জগতের যেসব বিষয় একমাত্র আল্লাহর হাতে (তাসাররুফ), তাতে অন্য কাউকে অংশীদার কিংবা ক্ষমতাশালী মনে করা শিরক।

ইমাম আজম বলেন, **'মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার হলো—সকল মানুষ কেবল তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করবে না।'**[১৬৩৩] বোঝা

১৬৩১. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (৭-৯)।
১৬৩২. আল-ফিকহুল আবসাত (৪২)।
১৬৩৩. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৭)।

গেল, যেগুলো একমাত্র আল্লাহর অধিকার, সেগুলো অন্য কাউকে দেওয়া শিরক। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দাসত্ব করা—সেটা যে প্রকারেরই দাসত্ব হোক যথা: মূর্তিপূজা, পিরপূজা, কবরপূজা, ক্ষমতাপূজা, অর্থপূজা, প্রেমপূজা, প্রবৃত্তিপূজা—সবকিছু শিরক।

শিরকের বিরুদ্ধে ইমাম আজম

শিরকের ব্যাপারে ইমাম আজম রহ. থেকে খুব বেশি আলোচনা পাওয়া যায় না। কারণ, তিনি ছিলেন তাবেয়ি-যুগের মানুষ। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে গড়া আলোকিত প্রজন্ম সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তখনও পৃথিবীতে তাওহিদের দীপ জ্বেলে প্রোজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা এবং ঈমানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কাজ প্রকাশ পাচ্ছিল, আকিদাগত নানারকম বিচ্যুতি শুরু হচ্ছিল। কিন্তু সরাসরি শিরক সংঘটনের পরিমাণ ছিল নিতান্তই সীমিত। উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিরকের অস্তিত্ব ছিল একেবারেই বিরল।

যেহেতু আমাদের সালাফে সালেহিনের নীতি ছিল প্রচলিত বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে কথা বলা, বিদ্যমান ফেতনার মোকাবিলা করা, এ জন্য খারেজি, জাহমিয়্যাহ, মুরজিয়া, কাদারিয়্যাহ, মুতাযিলা, শিয়াসহ বিভিন্ন ফিরকার বিরুদ্ধে আমরা ইমামের সংগ্রাম দেখতে পেলেও শিরকের বিরুদ্ধে তাঁর বিশেষ কোনো আলোচনা বা সংগ্রাম দেখতে পাই না। কারণ, মুসলিম উম্মাহ তখন আল্লাহর অনুগ্রহে সেসব শিরক থেকে মুক্ত ছিল, যেগুলো পরবর্তীকালে উম্মাহকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে।

যেহেতু বর্তমান গ্রন্থটি ইমাম আজম রহ.-এর আকিদার ব্যাপারে, এ জন্য আমরা এখানে ইমাম আজমের বক্তব্য এবং সরাসরি সংশ্লিষ্টতার বাইরে লম্বা কোনো আলোচনার সুযোগ দেখি না। তবে উম্মাহর মাঝে যেহেতু শিরকের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে, এ জন্য আল্লাহ তৌফিক দিলে উম্মাহকে সতর্ক করার জন্য আমরা তাওহিদ ও শিরকের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছা রাখি। এখানে কেবল ইমাম আজম এবং হানাফি আলেমদের বক্তব্যের আলোকে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বিষয় তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ।

শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে ইমাম বলেন, **“শিরক নেক আমল নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ বলেন,** ﴿مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾ **অর্থ :** ‘যে

ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কুফর করবে, তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে। পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।' [মায়িদা : ৫][১৬৩৪]

ইমাম আরও বলেন : **'যেভাবে শাহাদাতের মর্যাদা (সকল ইবাদতের মাঝে) সবচেয়ে বেশি, তেমনইভাবে শিরকের গুনাহ সকল গুনাহের চেয়ে মারাত্মক। শিরক সবচেয়ে জঘন্য গুনাহ। কুরআনে এটাকে সবচেয়ে বড় জুলুম বলা হয়েছে: ﴿إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٌ﴾ [লুকমান : ১৩]। অন্য কোনো গুনাহকে আল্লাহ 'বড় জুলুম' হিসেবে আখ্যা দেননি। শিরকের ভয়াবহতা বোঝাতে আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّيۡرُ أَوۡ تَهۡوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٖ سَحِيقٖ﴾ অর্থ : 'যে-কেউ আল্লাহর সাথে শরিক করল, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।' [হজ : ৩১] অন্যত্র বলেন, ﴿تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنشَقُّ ٱلۡأَرۡضُ وَتَخِرُّ ٱلۡجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَن دَعَوۡاْ لِلرَّحۡمَٰنِ وَلَدٗا ﴿٩١﴾ অর্থ 'নভোমণ্ডল ফেটে পড়া, ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হওয়া আর পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্য সন্তান দাবি করেছে।' [মারইয়াম : ৯০-৯১] হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ কিংবা অন্য কোনো পাপের ক্ষেত্রেও আল্লাহ এমন রোমহর্ষক উদাহরণ দেননি।"**[১৬৩৫]

ইমাম নিজস্ব সূত্রে আবু যর রাযি. থেকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[১৬৩৬] বোঝা গেল, কেউ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। সে মুশরিক হিসেবে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে।

শিরকের কিছু উদাহরণ

কাউকে আলিমুল গায়েব মনে করা : ইলমে গায়েব হলো অদৃশ্যের জ্ঞান। এটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার গুণ। আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমিনের আর কেউ

১৬৩৪. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২৬)।
১৬৩৫. প্রাগুক্ত (১৮)।
১৬৩৬. কাশফুল আসার, হারেসি (১/১৫১-১৫২)।

অদৃশ্যের সংবাদ জানে না। ইমাম রহ. বলেন, **'যে ব্যক্তি ওহি ছাড়া অন্তরের খবর জানার দাবি করল, সে যেন আল্লাহর ইলমে ভাগ বসাতে চাইল। এটা বিশাল অপরাধ। পরিণামে কুফর ও জাহান্নাম ছাড়া উপায় নেই।'**[১৬৩৭]

গায়েবের জ্ঞান নিজে দাবি করা আর অন্যের ব্যাপারে এ ধরনের আকিদা রাখা দুটোই অমার্জনীয় অপরাধ, দুটোই শিরক। হানাফি মাযহাবের কিতাবগুলোতে জোরালোভাবে বলা হয়েছে, যদি কেউ এমন আকিদা রাখে যে, পির-মাশায়েখের রুহ সর্বত্র বিদ্যমান, সবকিছু জানে, অন্যকথায় হাজির-নাজির, তবে এমন ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। কারণ, জীবিত কিংবা মৃত কোনো মানুষ বা জিন গায়েব সম্পর্কে অবহিত নয়। হ্যাঁ, আল্লাহ চাইলে ওহির মাধ্যমে নবিদের এবং কাশফ-কারামত বা ইলহামের মাধ্যমে ওলিদের কোনো বিষয় জানিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সেটা একান্তই তাঁর অনুগ্রহ। নবি বা ওলিদের নিজস্ব অর্জন নয়। উপরন্তু সেটা সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। নবি বা ওলি নিজেও জানেন না কখন তিনি সেই সৌভাগ্য অর্জন করবেন। ফলে নবি বা পিরের ধ্যান করা, সবসময় তিনি দেখছেন এবং সবকিছু জানছেন—এমন আকিদা রাখা শিরক। একইভাবে কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির পৃথিবী পরিচালনায় হাত রয়েছে, সে প্রকৃতির মাঝে যা ইচ্ছা করতে পারে—এমন বিশ্বাসও শিরক।[১৬৩৮]

গাইরুল্লাহর নামে কসম খাওয়া : আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র শপথের উপযুক্ত। তিনি ছাড়া আর কারও নামে শপথ করা বৈধ নয়। হানাফি মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ করা হারাম।[১৬৩৯] কেউ কেউ কুফর ও শিরক বলেছেন, বিশেষত যদি শপথের সঙ্গে এমন কোনো আকিদার মিশ্রণ থাকে যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ব্যাপারে রাখা বৈধ নয়।[১৬৪০] কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে কসম খাওয়া, রিয়া তথা লৌকিকতা প্রদর্শন করা ইত্যাদি গুনাহ, যেগুলোকে হাদিসে শিরক বলা হয়েছে, সেগুলোর আক্ষরিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং পাপের ভয়াবহতা বোঝাতে শিরক বলা হয়েছে। এগুলো করলে কেউ মুশরিক হবে না, কিন্তু মারাত্মক গুনাহগার হবে।

১৬৩৭. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২২)।

১৬৩৮. দেখুন : আল-বাহরুর রায়েক (৫/২০৯)। মাজমাউল আনহুর (১/৬৯১)।

১৬৩৯. আল-মুহিতুল বুরহানি (৪/২০০৩)।

১৬৪০. আল-বাহরুর রায়েক (৪/৪৮২)।

কবরকেন্দ্রিক শিরক : উম্মতে মুসলিমা কবরকেন্দ্রিক যতটা বিচ্যুতি ও বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে, অন্য ক্ষেত্রে খুব কমই হয়েছে। এটা সম্ভবত রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবদ্দশাতেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য তিনি বারবার কবর থেকে মানুষকে সতর্ক করেছেন। বরং ওফাতের কয়েক দিন আগেও তিনি এ ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করে গিয়েছেন। জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের পাঁচ দিন আগে আমি তাকে বলতে শুনেছি, 'সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলো তাদের নবি ও সালেহিনের কবরকে সিজদার জায়গা হিসেবে গ্রহণ করত। সাবধান! তোমরা কবরকে সিজদার জায়গায় পরিণত করো না। আমি তোমাদের নিষেধ করছি।'[১৬৪১]

সুতরাং কবরের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শন করা, কবরের চারপাশে তাওয়াফ বা যিকির করা এবং কবরকে চুমু দেওয়া হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ। জীবিত পিরের সামনে কিংবা মৃত পিরের মাজারকে সিজদা দেওয়া অত্যন্ত জঘন্য গুনাহ, পৌত্তলিকতার শামিল। কেউ যদি ইবাদত কিংবা ইবাদত-সদৃশ তাযিমপূর্বক এমন সিজদা করে, সে কাফের হয়ে যাবে। এটা আলেমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। তবে কেউ যদি জাহেলি পারস্য রীতি অনুযায়ী অভিবাদনপূর্বক সিজদার মতো করে ভূমি চুম্বন করে (যমিন-বুস), তবে কাফের হবে না, কিন্তু শক্ত গুনাহগার হবে। বরং কাসানি, কুহুস্তানিসহ একদল হানাফি আলেম লিখেছেন, সম্মানের উদ্দেশ্যে হোক কিংবা অভিবাদনের উদ্দেশ্যে হোক, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সামনে সিজদা করা কুফর।[১৬৪২]

বর্তমান সময়ে বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে শেষোক্ত মতকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। অর্থাৎ, কেউ সিজদা দিয়ে ফেললে ব্যক্তিবিশেষকে কাফের বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে, কিন্তু বর্তমানে যেহেতু সিজদা দিয়ে অভিবাদন জানানোর প্রথা নেই, সুতরাং এটাকে ইবাদত এবং ইবাদত-সদৃশ 'তাযিম' ধরা হবে, আর সেক্ষেত্রে সবার সর্বসম্মতিক্রমে এটা কুফর ও শিরক বিবেচিত হবে।

যাদু ও যাদকুরের বিধান

পরিচয় : যাদুর সঙ্গে কুফর ও শিরকের ব্যাপক সংশ্লিষ্টতা আছে। যাদু কার্যকর করার জন্য অধিকাংশ যাদুকরই কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়। এ জন্য ইসলামে

১৬৪১. মুসলিম (কিতাবুল মাসাজিদ : ৫৩২)।
১৬৪২. রদ্দুল মুহতার (৬/৩৮৩)।

যাদু কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যাদুকরদের বিরুদ্ধে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অত্যন্ত কঠোর।

আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরামের সকলের মতে, যাদুর অস্তিত্ব আছে। ক্রিয়া ও প্রভাব আছে। মুতাযিলারা সেটা দেখতে না পেয়ে যাদু অস্বীকার করেছে। অথচ এটা জীবনের বাস্তবতা; অস্বীকারের সুযোগ নেই। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) জীবনের শেষ দিকে যাদুর মাধ্যমে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, অসুস্থ হয়েছেন। যাদু থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তায়ালা সুরা ফালাক এবং সুরা নাস অবতীর্ণ করেছেন।[১৬৪৩]

জটিলতা হলো, খোদ ইমাম আজম রহ. থেকেও মুতাযিলাদের বক্তব্যসদৃশ কথা বর্ণনা করা হয়। তিনি মনে করতেন, 'যাদু স্রেফ চোখের ধোঁকা। বাস্তবে এর কোনো প্রভাব নেই!'[১৬৪৪] এখান থেকে কেউ মনে করেছে—ইমাম আজম যাদুর প্রভাব ও প্রকৃতি অস্বীকার করতেন। এমন ধারণা সঠিক নয়। কেউ কেউ ইমামের বক্তব্য আর মুতাযিলাদের বক্তব্য এক ও অভিন্ন মনে করেছে। বাস্তবতা এমন নয়। মুতাযিলারা যাদু বলতে কিছুর অস্তিত্বই স্বীকার করে না। বিপরীতে ইমাম আজম রহ. যাদুর প্রভাব স্বীকার করতেন। তিনি স্রেফ প্রভাবের একটা বিশেষ ধরনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর কথাই সঠিক। সেটা হলো—ইমাম আজমের মতে—যাদু কোনো বস্তুর মাহিয়্যাত (স্বরূপ)-কে বদলাতে পারে না। এক্ষেত্রে এটার কোনো প্রভাব নেই। ফলে যাদুর মাধ্যমে মানুষকে গাধায় কিংবা গাধাকে মানুষে পরিণত করা সম্ভব নয়। মাটিকে মিষ্টি কিংবা বালুকে চিনিতে পরিণত করা সম্ভব নয়। যেমন—ফেরাউনের যাদুকরদের যাদুর প্রভাবে মুসা আলাইহিস সালামের কাছে তাদের নিক্ষিপ্ত লাঠি ও রশিগুলো সাপ মনে হচ্ছিল। অথচ বাস্তবে সেগুলো সাপে পরিণত হয়নি; লাঠি ও রশিই ছিল। আল্লাহ তায়ালা এ বাস্তবতা তুলে ধরে বলেন : ﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾ অর্থ : 'মুসা বললেন : বরং তোমরাই নিক্ষেপ করো। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হলো, যেন তাদের রশি ও লাঠি ছোটাছুটি করছে।' [তহা : ৬৬]

১৬৪৩. দেখুন : আল-আকিদাহ আর-রুকনিয়্যাহ (৫৪)। আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (২৭৫-২৭৬)।
১৬৪৪. দেখুন : তাফসিরে ইবনে কাসির (১/২৫৫)।

তবে বস্তুর গুণাগুণ পরিবর্তন করা সম্ভব। ফলে সুস্থকে অসুস্থ, সুখীকে দুঃখী, ঠান্ডাকে গরম, গরমকে ঠান্ডা—এভাবে ব্যক্তি বা বস্তুর গুণাগুণ পরিবর্তন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে যাদু ক্রিয়াশীল। ফলে ইমাম আজম রহ. যাদুকে স্রেফ দৃষ্টিবিভ্রম বলেছেন প্রথম অবস্থার প্রতি লক্ষ করে, বস্তুর 'মাহিয়্যাত' পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যাদুর অক্ষমতা তুলে ধরতে। বস্তুর গুণাগুণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যাদুকে তিনি প্রভাবহীন ও ক্রিয়াশূন্য বলেননি। সেটা বলা সম্ভবও নয়। কারণ, খোদ কুরআনে যাদুর এ ধরনের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বলা হয়েছে [বাকারা : ১০২]। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হয়েছেন।

বিধান : আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে যাদু হারাম। কারণ, যাদুকর মূলত বিভিন্ন মিথ্যা, প্রতারণা, জিন ও শয়তানের সহায়তা এবং কুফর ও শিরকের আশ্রয় নিয়ে যাদু করে থাকে। ফলে কেউ এটাকে হালাল মনে করলে সে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হালাল মনে করা ছাড়া যাদু শেখা ও চর্চার বিধান কী? বিষয়টা মতভেদপূর্ণ। একদল (হানাফি) আলেমের মতে, যাদু শেখা ও চর্চা করাই কুফর। হালাল মনে করা শর্ত নয়। ফলে যেকোনো অবস্থাতে যাদু শিখলে কিংবা চর্চা করলে তাকে হত্যা করা হবে।[১৬৪৫]

ইমাম মাতুরিদি রহ. মনে করেন, একবাক্যে যাদুকে কুফর বলা এবং যাদুকরকে হত্যা করা যাবে না, বরং এর প্রকৃতি কী সেটা যাচাই করে নিতে হবে। যদি তাতে ঈমানের মৌলিক বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু থাকে, তবে কুফর হবে, নতুবা কুফর হবে না।[১৬৪৬]

ইমাম মাতুরিদির বক্তব্যের যৌক্তিকতা আছে। কারণ, যাদু কিছু কথা ও কর্মের সমন্বয়। ফলে উন্মুক্তভাবে কুফর নয়। যদি কুফরের উপাদান থাকে, তবে কুফর। যদি শিরকের উপাদান থাকে, তবে শিরক। নতুবা কবিরা গুনাহ। কামাল ইবনুল হুমাম ইমাম মাতুরিদির উদ্ধৃতিতে বলেন, 'যদি কোনো যাদুকর তার যাদুকে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা তৈরির কাজে ব্যবহার করে, তবে আকিদাগত কুফর না থাকলেও হত্যা করা হবে। কারণ, এক্ষেত্রে অপরাধ পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা। কিন্তু যদি

১৬৪৫. ফাতহুল কাদির (৬/৯৯)।

১৬৪৬. দেখুন : আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ (২৭৬)। রদ্দুল মুহতার (৪/২৪১)।

বিশৃঙ্খলার কাজে ব্যবহার না করে বরং সাধারণ যাদু করে, তবে এককথায় কুফর বলা হবে না। আকিদাগত কুফর থাকলে কাফের। নতুবা কাফের নয়।[১৬৪৭]

কিন্তু অন্য হানাফি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের বক্তব্য আরও বস্তুনিষ্ঠ ও অধিকতর বাস্তবসম্মত। কারণ, কুফর ও শিরকের উপাদান না থাকলে সেটা মৌলিক ও কার্যকর যাদুর মাঝে পড়ে না; দৃষ্টিবিভ্রম, ভোজবাজি ও চোখের ছলনার নামান্তর হয়। বিপরীতে কার্যকর যাদুর জন্য জিন ও শয়তানের সহায়তা নিতে হয়। অথচ জিন ও শয়তান বিনিময় ছাড়া মানুষকে সহায়তা করে না। ফলে এক্ষেত্রে যাদুকরদের কুফর ও শিরকে লিপ্ত হতে হয়, কুফরি বাক্য উচ্চারণ করতে হয়। জিন-শয়তানদের পূজা দিতে হয়, সিজদা করতে হয়, তাদের নামে পশু বলি দিতে হয়। তাদের কাছে প্রার্থনা (ইস্তিগাসা) করতে হয়। তাদের নির্দেশে কুরআন কারিমকে অপদস্থ করা, পায়খানা ও ময়লার মাঝে ফেলে রাখা, কুরআনের উপর জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটাসহ বিভিন্ন কুফর ও শিরকে লিপ্ত হতে হয়। তখনই শয়তান সন্তুষ্ট হয়ে যাদুকরদের সহায়তা করে। এটাই যাদুর প্রকৃত রূপ। এ কারণেই উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম যাদুকরদের একবাক্যে কাফের আখ্যা দিয়ে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।

কুরআন-হাদিসেও যাদু এবং কুফর-শিরকের মাঝে এক গভীর সম্পর্ক চোখে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ অর্থ : '(হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়) তারা উভয়ই এ কথা না বলে কাউকে (যাদু) শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য (প্রেরিত হয়েছি); কাজেই তুমি (যাদুর মাধ্যমে) কাফের হয়ো না।' [বাকারা : ২০১] উক্ত আয়াতে যাদুকে প্রকারান্তরে 'কুফর' সাব্যস্ত করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) হাদিসে বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে বেঁচে থাকো। সেগুলো হলো, আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সচ্চরিত্র নিষ্কলঙ্ক মুমিন নারীকে অপবাদ দেওয়া।[১৬৪৮] ফলে যাদুর সঙ্গে শিরকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বরং কিছু হাদিসে যাদুকে সরাসরি শিরক বলা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

---

১৬৪৭. ফাতহুল কাদির (৬/৯৯)।

১৬৪৮. বুখারি (কিতাবুল ওয়াসায়া : ২৭৬৬)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ৮৯)।

‘রুকা’ (নিষিদ্ধ ঝাড়ফুঁক), ‘তামায়িম’ (ধাতুনির্মিত কবচ), ‘তিওয়ালা’ (স্বামী/স্ত্রী বশের যাদু) শিরক।[১৬৪৯] উক্ত হাদিসে যাদুকে স্পষ্ট করেই শিরক বলা হয়েছে। সুতরাং যাদুর মাঝে কুফর ও শিরকের উপস্থিতি অনস্বীকার্য বিষয়।

গণক ও জ্যোতিষী

কিছু লোক মানুষের ভাগ্যের ক্ষেত্রে তারকা এবং গ্রহ-উপগ্রহের প্রভাবে বিশ্বাস করে। এ কারণে তাদের মতে, নক্ষত্রের পাঠ এবং তারকার গতিপথ দেখে মানুষের ভালোমন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যেতে পারে। কিন্তু এটা ভ্রান্ত আকিদা ও শিরক। মহাকাশের সকল তারকা-নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর আজ্ঞাবহ। ফলে মানুষের জীবন ও ভাগ্যে এগুলোর কোনো প্রভাব নেই। আল্লাহ তায়ালা মানুষের ভাগ্যবিধাতা। একমাত্র আল্লাহ তায়ালা মানুষের ভবিষ্যৎ জানেন। কোনো নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য মানুষের ভবিষ্যৎ জানে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾ অর্থ : ‘তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; এরপর তিনি আরশে ইস্তিওয়া করেন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দিয়ে আচ্ছাদিত করেন যাতে এদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। <u>সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তাঁরই আজ্ঞাধীন। এগুলো তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখো, সৃষ্টি ও আদেশ দুটোই তাঁর</u>। মহিমাময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ।’ [আরাফ : ৫৪] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَـٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ অর্থ : ‘নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে বারিবর্ষণের মাধ্যমে ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন, তাতে আর তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।’ [বাকারা : ১৬৪] সুতরাং আল্লাহ

১৬৪৯. আবু দাউদ (কিতাবুত তিব্ব : ৩৮৮৩)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুত তিব্ব : ৩৫৩০)।

ছাড়া অন্য কারও ব্যাপারে এ ধরনের আকিদা রাখা শিরকে আকবর, যা একজন মুসলিমকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

ইমাম আজম রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা **'কিরামান কাতিবিনকেও বাহ্যিক বিষয়গুলো লিখে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদেরও অন্তরের খবর রাখার ক্ষমতা নেই। কারণ, অন্তরের খবর কেবল আল্লাহ তায়ালা জানেন। আর জানেন ওহিপ্রাপ্ত রাসুল। সুতরাং যদি কেউ ওহি ছাড়া অন্তরের খবর জানার দাবি করে, সে যেন আল্লাহর ইলমে ভাগ বসাতে চাইল। এটা বিশাল অপরাধ। পরিণামে কুফর ও জাহান্নাম ছাড়া উপায় নেই।'**[১৬৫০]

সুতরাং কোনো গণক বা জ্যোতিষী অদৃশের বিষয় জানে এমন বিশ্বাস করা বৈধ নয়। ইমাম তহাবি বলেন, '<u>আমরা কোনো গণক কিংবা জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করি না</u>। কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মাহর সর্বসম্মত মতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো দাবি-দাওয়া সত্য বলে স্বীকার করি না।'[১৬৫১]

কারণ, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ অর্থ : 'আপনি বলুন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে, কেউ গায়েব জানে না। একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন।' [নামল : ৬৫] অন্যত্র বলেন, ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ অর্থ : 'অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই কাছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা-কিছু আছে, তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণা অঙ্কুরিত হয় না বা আর্দ্র কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।' [আনআম : ৫৯]

নবিদের আল্লাহ যতটুকু চান, জানিয়ে দেন। নবিরাও তাঁর জানানো ব্যতীত গায়েব জানেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন : ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ অর্থ : (আপনি বলুন) 'আর আমি তোমাদের বলি না যে,

---

১৬৫০. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২২)।

১৬৫১. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (৩১)।

আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার রয়েছে। এ কথাও বলি না যে, আমি গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ জানি। এ কথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আর আমি এ কথা বলি না যে, তোমাদের দৃষ্টিতে যারা ক্ষুদ্র-নগণ্য, আল্লাহ তাদের কোনো কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হব।' [হুদ : ৩১]

সুতরাং 'ইলমুল গায়েব'-এর একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তায়ালা। এটা তাঁর একক বিশেষত্ব। এতে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক। ফলে গণক-জ্যোতিষীকে কেউ 'অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত' মনে করলে শিরকের অপরাধে অভিযুক্ত হবে। বরং হানাফি মাযহাবের গ্রন্থগুলোতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'কেউ যদি এমন বিশ্বাস রাখে যে, নবিজি (ﷺ) গায়েব জানেন, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, এটা কুরআনের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক।'[১৬৫২] এই যদি হয় নবিদের বেলায়, সেখানে গণক কিংবা জ্যোতিষী অথবা জিন-শয়তানরা কীভাবে গায়েব জানতে পারে? বরং তারা যা বলে, সেটা স্রেফ অনুমান ও মিথ্যা।

এ কারণেই ইসলামে গণক ও জ্যোতিষীদের কাছে যেতে কঠোরভাবে বারণ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়ে তার কথা সত্যায়ন করবে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না।'[১৬৫৩] অন্য হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে যাবে এবং তার কথা সত্যায়ন করবে, তবে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ (দ্বীন) থেকে সে বেরিয়ে যাবে।'[১৬৫৪]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোনো গণক বা জ্যোতিষীর কাছে যাবে এবং তার কথা বিশ্বাস করবে, সে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর যা-কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, সবকিছু অবিশ্বাস করল।'[১৬৫৫]

১৬৫২. আল-মুসায়ারাহ (১২৯-১৩০)। ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত ইলমকে 'গায়েব' জানা বলা হয় না। গায়েবের একমাত্র অধিকারী মহান আল্লাহ তাআলা।

১৬৫৩. মুসলিম (কিতাবুস সালাম : ২২৩০)। মুসনাদে আহমদ (আউয়ালু মুসনাদিল মাদানিয়্যিন : ১৬৯০৬)।

১৬৫৪. আবু দাউদ (কিতাবুল কিহানাহ ওয়াত তাতাইউর : ৩৯০৪)।

১৬৫৫. মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবি হুরাইরা : ৯৬৬৭)। বাযযার (মুসনাদু আবদিল্লাহ ইবনে মাসউদ : ১৮৭৩)।

গণক ও জ্যোতিষী (কাহেন ও আররাফ)-এর বিধানও যাদুর বিধানের কাছাকাছি। খোদ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছু শিখল, সে যেন কিছু যাদু শিখল।'[১৬৫৬] কারণ, তারা সাধারণত জিন-শয়তান ও তারকার মাধ্যমে তাদের কাজ করার দাবি করে। সুতরাং কেউ যদি এ ধরনের বিশ্বাস রাখে যে, আকাশের তারকা তার ভালোমন্দ করার ক্ষমতা রাখে কিংবা জিন ও শয়তানরা তার মনের আশা এবং সকল প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে, তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। তবে যদি এসব বিশ্বাস ছাড়া কেবল অনুমানভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণী করার দাবি করে, তবে সে মুশরিক হবে না; শক্ত গুনাহগার হবে। আর যদি যাদুর আশ্রয় নেয়, তবে তার বিধান যাদুকরের বিধানের মতো।[১৬৫৭]

গণক কিংবা জ্যোতিষীর কথা অনেক সময় সত্য হয়ে থাকে। এর মূল কারণও কুফর ও শিরক। অর্থাৎ, তারা কখনো কখনো যাদুকরদের মতো জিন ও শয়তানের আনুগত্য করে তাদের সাহায্য নেয়। তাদের পূজা দেয়। তাদের কাছে প্রার্থনা করে। ফলে তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু বিষয় জেনে নেয়। কিছু কথা মিলে যায়। কিন্তু সেগুলো হাজারে দুই-চারটা সত্য হয়। বাকিগুলো মিথ্যা। জিন ও শয়তানরাই তাদের মিথ্যা বলে। ফলে তাদের বিশ্বাস করার কোনো সুযোগ নেই। উপরন্তু এভাবে জিন-শয়তানের ইবাদত ও সাহায্যগ্রহণ শিরক। আল্লাহ তায়ালা এ কারণে কাফেরদের নিন্দা করে বলেছেন, ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ অর্থ : 'মানুষের মধ্যে কিছু লোক জিনদের কিছু লোকের আশ্রয় গ্রহণ করত। এভাবে তারা জিনদের আরও বেশি আত্মম্ভরী করে তুলেছিল।' [জিন : ৬] আবার কখনো কখনো এরা আদৌ কিছুই জানতে পারে না। আন্দাজে বলে এবং কাকতালীয়ভাবে কিছু কিছু মিলে যায়, যেভাবে টিয়া কিংবা অক্টোপাসের কথাও মিলে যেতে পারে। এসব স্রেফ কাকতালীয়। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে এমন বিশ্বাস শিরক। ফলে গণক, জ্যোতিষী, টিয়াপাখি, রাশিবিদ, তন্ত্রসাধক, পাথর-ব্যবসায়ী, ফকির-কবিরাজ—কারও কাছেই যাওয়া বৈধ নয়।

১৬৫৬. আবু দাউদ (কিতাবুল কিহানাহ : ৩৯০৫)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুল আদাব : ৩৭২৬)।

১৬৫৭. দেখুন : ফাতহুল কাদির (৬/৯৯)।

সুন্নাত ও বিদআত

সুন্নাতের সঙ্গে ইমামের সম্পর্ক

ইমাম আজমের জীবন ও চিন্তার ভিত্তিই ছিল কুরআন ও হাদিস। রাসুলুল্লাহর সুন্নাহ ছিল ইমাম আজম রহ.-এর ধ্যান ও জ্ঞান। ফলে তিনি যেমন পুরো জীবন সুন্নাহময় কাটিয়েছেন, তেমনই তাঁর হাতেগড়া হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাও হয়েছে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ এবং সাহাবাদের সুন্নাহর উপর। আল্লামা ইবনে আবদিল বার রহ. নিজস্ব সনদে এ ব্যাপারে ইমাম আজমের একাধিক বক্তব্য এবং তাঁর শানে অন্য ইমামদের সাক্ষ্য বর্ণনা করেছেন। ইমাম আজম রহ. বলেন, **'আমি আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করি। যদি তাতে না পাই, তবে রাসুলুল্লাহর সুন্নাহর অনুসরণ করি। আর যদি সুন্নাহতেও না পাই, তবে রাসুলুল্লাহর সাহাবাদের অনুসরণ করি। ...অন্যদের কথা গ্রহণ করি না।'**[১৬৫৮] হারেসি বর্ণনা করেন, ইমাম আজমকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কেন প্রাণীর বিনিময়ে বাকিতে প্রাণী বিক্রি মাকরুহ বলেন? তিনি বললেন, 'কারণ, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেছেন। আর **যখন রাসুলুল্লাহ থেকে কোনো আদেশ বা নিষেধসংবলিত হাদিস আসবে, সেটা আমার জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য মানা আবশ্যক।'** আবু খালেদ বলেন, 'আবু হানিফা সত্য বলেছেন। তিনি রাসুলুল্লাহর হাদিসের অনুসারী ছিলেন।'[১৬৫৯]

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, 'আবু হানিফা রহ. অত্যন্ত ইলম অনুরাগী ছিলেন। আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু (হারাম) থেকে অনেক দূরে ছিলেন। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিশুদ্ধ সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সাব্যস্ত আমল অনুসরণ করতেন। কুফার আলেমদের বক্তব্য গ্রহণ করতেন। তবুও একদল মানুষ তার সমালোচনা করেছে। আল্লাহ আমাদের ও তাদের ক্ষমা করুন।[১৬৬০]

১৬৫৮. দেখুন : আল-ইনতিকা (২৬১-২৬২)।

১৬৫৯. কাশফুল আসার (১/২৩৮)।

১৬৬০. আল-ইনতিকা (২৬২)।

সুফিয়ান সাওরির বক্তব্যে স্পষ্ট যে, ইমাম আজমকে হাদিসবিরোধী প্রচারণা পুরোটাই মিথ্যা ও গুজবনির্ভর ছিল। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে প্রমাণিত বিশুদ্ধ হাদিসকে তিনি কখনোই বর্জন করতেন না। ইমামের ছাত্র যুফার বলেন, 'তোমরা বিরোধীদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না। আবু হানিফা এবং আমাদের সঙ্গীদের কেউ কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফের বক্তব্য ছাড়া কথা বলতেন না। (এগুলোতে যদি কিছু না পেতেন, তখন) তারা এগুলোর আলোকে কিয়াসের আশ্রয় নিতেন।'[১৬৬১] ইয়াহইয়া ইবনে আদম বলেন, 'কিছু মানুষ আবু হানিফার ব্যাপারে এ অভিযোগ করেছে যে, তিনি হাদিস পরিত্যাগ করে নিজের মনোমতো (কিয়াস অনুযায়ী) কথা বলেন। অথচ এটা তাঁর উপর অপবাদ। কারণ, তিনি এবং তাঁর শাগরেদদের গ্রন্থসমূহ এমন অসংখ্য মাসআলায় ভরপুর, যেগুলোতে তারা কিয়াস বাদ দিয়ে হাদিস অনুযায়ী আমল করেছেন।'[১৬৬২] ইবনে হাযাম এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে ইমাম আজম রহ.-এর বক্তব্য নকল করেন : 'কিয়াস করার চেয়ে আমার কাছে যয়িফ হাদিসের উপর আমল করা উত্তম।'[১৬৬৩]

হ্যাঁ, ইমাম আজম রহ. কিয়াস করতেন, নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতেন। কিন্তু সেটা তাঁর দোষ নয়, বরং দূরদর্শিতা এবং আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামত। এই নেয়ামতের বদৌলতেই তিনি এমন অনেক সমস্যার সমাধান দিয়ে যেতে পেরেছিলেন, সে যুগে যেসব সমস্যার অস্তিত্বই ছিল না, বরং কয়েকশো বছর পরে প্রকাশ পেয়েছিল। বরং এটাই হানাফি মাযহাবকে সেই উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে যেখানে অন্য কোনো মাযহাব যেতে পারেনি। এটাকেই বলা হয় প্রকৃত ইজতিহাদ। একজন প্রকৃত 'মুজতাহিদ' ইমামের কাজ এটাই। কিন্তু সেটা মনগড়া নয়, কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে নয়। বরং কুরআন-সুন্নাহর আলোতে আলোকিত মেধা ও কিয়াসের মাধ্যমে। ইমাম আজম রহ. বলেন, **'যখন আমাদের কাছে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে কোনো হাদিস আসে, আমরা সেটার অনুসরণ করি। অন্য কিছু খুঁজি না। যখন সাহাবাদের বক্তব্য আসে, তখন সেগুলোর মাঝ থেকে উত্তমটা গ্রহণ করি। আর যখন তাবেয়িদের বক্তব্য আসে, তখন আমরাও মতামত দিই।'**[১৬৬৪] এটা নিতান্তই

১৬৬১. মানাকিব, মক্কি (৭৫)।

১৬৬২. প্রাগুক্ত (৮৩)।

১৬৬৩. আল-ইহকাম ফি উসুলি আহকাম (৭/৫৪)।

১৬৬৪. আল-ইনতিকা (২৬৬)।

স্বাভাবিক বিষয়। ইমাম আজম নিজেও তাবেয়ি ছিলেন। ফলে কোনো মাসআলাতে কুরআন-সুন্নাহ কিংবা সাহাবাদের বক্তব্য না থাকলে তিনি মতামত দিতেই পারেন এবং সেটা দেওয়াই একজন মুজতাহিদের কাজ।

হানাফিরা কি একক সাহাবি কর্তৃক বর্ণিত সুন্নাহকে অস্বীকার করেন?
পরবর্তী হানাফি আলেমগণও ইমাম আজমের পথেই হেঁটেছেন। হানাফি মাযহাব দাঁড়িয়েছে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ইজতিহাদের বিশুদ্ধ ভিত্তির উপর। তারা কখনোই রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত কোনো হাদিসকে স্রেফ কিয়াসের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেননি। রাসুলুল্লাহর বিশুদ্ধ হাদিসকে বিভিন্ন প্রকরণে আবদ্ধ করে অর্থহীন যুক্তিতে বর্জন করেননি, যেমনটা তাদের নামে অভিযোগ আরোপ করা হয়। এসব অভিযোগের কারণ ঠিক সেটাই যা ছিল ইমাম আজমের উপর অভিযোগের কারণ। এগুলোর জবাবও ইমাম আজমের ব্যাপারে অভিযোগের জবাবগুলো। আবু ইউসুফ রহ. বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যা-কিছু নিয়ে এসেছেন সবকিছুতে ঈমান রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।'[১৬৬৫] হাদিসের মাঝে বিভাজন টেনে কিছুর প্রতি ঈমান আনা হবে আর কিছুর প্রতি ঈমান আনা হবে না—এমন নয়। ইমাম তহাবি তাঁর আকিদাতে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা কুরআনে যেসব বিধান অবতীর্ণ করেছেন এবং যা-কিছু হাদিসে আল্লাহর রাসুল (ﷺ) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত, তার সবকিছুই সত্য।'[১৬৬৬]

বিশেষত পরবর্তী সময়ের একদল আলেম হানাফি আলেমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, তারা আকিদার ক্ষেত্রে 'খবরে ওয়াহিদ' (তথা এক/দুই ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত) হাদিস বিশুদ্ধ হলেও গ্রহণ করেন না; বরং নিজেদের মনগড়া আকিদা মানেন। এমন অভিযোগ সঠিক নয়। বরং হানাফি উলামায়ে কেরাম 'খবরে ওয়াহিদ'-কে 'মুতাওয়াতির'[১৬৬৭] হাদিসের পর্যায়ে রাখেন না—

১৬৬৫. আল-হুজ্জাহ ফি বায়ানিল মাহাজ্জাহ (১/১২৪)।

১৬৬৬. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২২)।

১৬৬৭. অসংখ্য ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত হাদিস যা সন্দেহাতীতভাবে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে প্রমাণিত বলে বিবেচিত হয়। কারণ, এত অধিক সংখ্যক মানুষ ভুল করবেন বা মিথ্যা বলবেন এটা সম্ভব নয়। ফলে এ ধরনের হাদিস চূড়ান্তভাবে সত্য ও নির্ভরযোগ্য। এর সত্যতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করা বৈধ নয়। যেমন—কুরআন সংকলন, নামাযের ওয়াক্ত ও রাকাত সংখ্যা, যাকাতের পরিমাণ ইত্যাদি। মুতাওয়াতির হাদিস চূড়ান্ত জ্ঞানের উৎস। এ ধরনের হাদিস সরাসরি প্রত্যাখ্যানকারী কুরআন প্রত্যাখ্যানকারীর মতো কাফের বিবেচিত হয়।

এটুকুই। তারা একক ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত লম্বা সিলসিলার হাদিসকে কুরআন এবং মুতাওয়াতির হাদিসের মতো চূড়ান্তজ্ঞান করেন না। এ ধরনের হাদিসের মাধ্যমে সাব্যস্ত আকিদাকে কুরআন এবং মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত আকিদার স্তরে রাখেন না—এটুকুই। এ কারণে তাদের হাদিস অস্বীকারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা সঠিক নয়।

ইমাম বাযদাবি লিখেন, "খবরে ওয়াহিদ হলো এক, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত সেসব হাদিস যা 'মুতাওয়াতির' কিংবা 'মাশহুর'-এর পর্যায়ে নয়। এর মাধ্যমে 'আমল' আবশ্যক হয়, কিন্তু ইয়াকিনি তথা চূড়ান্ত 'ইলম' আবশ্যক হয় না।" এখান থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন, তাদের মাযহাব হলো খবরে ওয়াহিদ হাদিসকে আকিদার ক্ষেত্রে বর্জন করা। অথচ তারা যদি হানাফি ইমামদের পুরো বক্তব্য শুনতেন, তবে এ ধরনের অভিযোগ করতেন না। খোদ বাযদাবি লিখেন, 'কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, খবরে ওয়াহিদ হাদিসের উপর আমল করা আবশ্যক। সাহাবাগণ এ ধরনের হাদিসের উপর আমল করেছেন। কিন্তু এক ব্যক্তির যেহেতু মিথ্যা বলা কিংবা ভুল করার আশঙ্কা রয়েছে, ফলে আশঙ্কা বিদ্যমান থাকার কারণে এটাকে চূড়ান্ত জ্ঞান (ইলমুল ইয়াকীন) আবশ্যককারী বলা যায় না। বরং 'অধিক সম্ভাবনাসম্পন্ন জ্ঞান' (ইলমু গালিবির রায়) আবশ্যককারী বলা যায়। ...যেমন—আখেরাতসংক্রান্ত বিভিন্ন খবরে ওয়াহিদ হাদিস। এগুলো এক ধরনের ইলম এবং এক ধরনের আমলকে আবশ্যক করে। আর সেটা হলো অন্তরের বিশ্বাস।[১৬৬৮] বোঝা গেল, আকিদার ক্ষেত্রে একক হাদিস তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য।

ইমাম সারাখসি বলেন, 'কবরের আযাব ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলোর কিছু মাশহুর (তিন বা ততোধিক ব্যক্তির হাদিস) আর কিছু খবরে ওয়াহিদ (একক ব্যক্তির হাদিস)। এগুলো হৃদয়ের বিশ্বাসকে আবশ্যক করে।'[১৬৬৯] ইবনুল হুমাম লিখেন, 'খবরে ওয়াহিদ' 'কারায়িন' (তথা সদৃশ-সমর্থক বর্ণনার) মাধ্যমে ইলমকে আবশ্যক করে।'[১৬৭০]

১৬৬৮. উসুলুল বাযদাবি (১৫৪-১৫৮)।

১৬৬৯. উসুলুস সারাখসি (১/৩২৯)।

১৬৭০. আত-তাহরির ফি উসুলিল ফিকহ (৩৩১)।

উক্ত বক্তব্যসমূহে স্পষ্ট যে, হানাফি আলেমগণ আকিদার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করেন না। তবে এগুলোকে তারা ইয়াকিনের সেই চূড়ান্ত স্তরে রাখেন না, যেখানে কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদিসকে রাখেন। এটাই ইনসাফ। এটাই সত্য। খবরে ওয়াহিদ হাদিসকেও কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদিসের পর্যায়ে রাখলে এগুলো অস্বীকারকারীকে কাফের বলতে হবে। অথচ দীর্ঘ মানবসারির (সনদ) কোনো এক ব্যক্তির ভুল করার আশঙ্কা অযৌক্তিক নয়। এই আশঙ্কা সত্ত্বেও মানুষকে কাফের বলা অযৌক্তিক। বরং এই পার্থক্য না রাখা হলে হাদিসের প্রকারভেদই নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং খবরে ওয়াহিদ আকিদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য এবং খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত আকিদায় বিশ্বাস রাখা আবশ্যক—এটা হানাফিসহ সকল আহলে সুন্নাতের প্রতিষ্ঠিত বক্তব্য। এ ব্যাপারে হানাফি আলেমদের অভিযুক্ত করা শুদ্ধ নয়। তথাপি এক্ষেত্রে হানাফি আলেমগণের মাঝে আর অন্যদের মাঝে যে ফারাক, সেটা হানাফি আলেমদের দূরদর্শিতার সাক্ষী, বাস্তবমুখী বক্তব্য এবং হাদিসে নববির প্রতি ইনসাফ। ঈমান ও কুফর বর্ণনার ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত। সুতরাং খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত আকিদা যখন উম্মাহর মাঝে সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে, সেটা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে বিবেচিত হবে, সেটাতে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক হবে এবং সেটাকে প্রত্যাখ্যান করা মুতাওয়াতির প্রত্যাখ্যানের নামান্তর হবে। কিন্তু সে পর্যায়ে উত্তীর্ণ না হলে এ ধরনের হাদিসকে মুতাওয়াতিরের চেয়ে নিম্নমানের বিবেচনা করেই সেটা অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে,[১৬৭১] কিন্তু পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা হবে না। সদরুল ইসলাম বাযদাবি লিখেন, 'আমরা খবরে ওয়াহিদ প্রত্যাখ্যানকে বৈধ মনে করি না। কারণ, তা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।'[১৬৭২] আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি লিখেছেন, "খবরে ওয়াহিদ দ্বারা 'যন্ন'-এর জ্ঞান অর্জিত হয়। 'যন্ন' বলতে স্রেফ অনুমান কিংবা দুর্বল ধারণা নয়, বরং ইয়াকিনের কাছাকাছি পর্যায়ের শক্তিশালী ধারণা।"[১৬৭৩]

১৬৭১. দেখুন ইমাম মাতুরিদির বক্তব্য : তাফসিরে মাতুরিদি (২/১৮)।
১৬৭২. উসুলুদ্দিন (৩৯)।
১৬৭৩. ফাতহুল মুলহিম (১/২৩)।

ইসালে সওয়াবের পরিচয় এবং সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি

মৃত মুসলমানদের জন্য জীবিতদের পক্ষ থেকে দোয়া ও সদকাসহ বিভিন্নভাবে পুণ্য পাঠানো এবং সেগুলোর মাধ্যমে মৃতদের উপকৃত হওয়া ইসলামি শরিয়াহর প্রতিষ্ঠিত আকিদা। আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরাম সকলে এ ব্যাপারে একমত। কারণ, কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণিত। কিন্তু দুই দল মানুষ এক্ষেত্রে দুই ধরনের প্রান্তিকতার শিকার হয়েছে। একদল ইসালে সওয়াবের নামে মুসলিম সমাজে নানান বিদআতি রসম-রেওয়াজ চালু করেছে। বিভিন্ন পৌত্তলিক কুংস্কার ও রীতিনীতি মুসলমানদের মাঝে ঢুকিয়ে দিয়েছে। মৃতকে ঘিরে একুশা, চল্লিশা, বিশাল ভোজসভা, টাকাপয়সার বিনিময়ে কুরআনখানি, কবরকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের প্রথা-পার্বণ ইত্যাদিকে সওয়াবের কাজ মনে করেছে। অথচ ইসলাম ও সুন্নাহসম্মত ইসালে সওয়াবের সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো মৃতদের জন্য অনুপকারী এবং জীবিতদের জন্য ক্ষতিকর। বিপরীতে আরেক দল লোক ইসালে সওয়াবের নানান বৈধ পদ্ধতিকেও বিদআত গণ্য করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো—কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইসালে সওয়াব করা। একটু পরে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে।

ইমাম আজমের রহ.-এর মতে, জীবিতদের বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে মৃতদের উপকৃত হওয়া কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। পরবর্তীকালে সকল হানাফি আলেম ইমাম আজমের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইমাম তহাবি বলেন, 'জীবিতদের দোয়া ও সদকাতে মৃতদের জন্য উপকার রয়েছে।'[১৬৭৪] আবু হাফস বলেন, 'আহলে সুন্নাতের বৈশিষ্ট্য হলো, মৃতদের জন্য জীবিতদের দোয়া ও সদকাকে উপকারী মনে করা। মুতাযিলা ও বিদআতিরা এটা অস্বীকার করে।'[১৬৭৫]

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মাতা-পিতার জন্য দোয়া করতে শিখিয়েছেন, ﴿وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا﴾ অর্থ : মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক, তাদের দুজনের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' [ইসরা : ২৪] কেবল মাতা-পিতা নয়, সকল মুমিনের জন্য দোয়ার কথা বলেছেন, ﴿رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ

১৬৭৪. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৮)।

১৬৭৫. আস-সাওয়াদুল আজম (৩, ১৯)।

﴾وَالْمُؤْمِنَاتِ﴿ অর্থ : 'হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে, তাদের এবং সমস্ত মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদের ক্ষমা করুন।' [নুহ : ২৮] অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ⑩﴾ অর্থ : 'যারা তাদের পরে আগমন করেছে, তারা বলে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতৃগণকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।' [হাশর : ৮-১০] যদি জীবিতদের দোয়া মৃতদের কোনো উপকারই না করত, তবে এভাবে দোয়া শিখিয়ে দেওয়া অর্থহীন কাজ গণ্য হতো। আল্লাহ তায়ালা এমন কাজ থেকে পবিত্র।

একাধিক হাদিস দ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত। যেমন—জানাযাবিষয়ক একাধিক হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, জানাযা মূলত মৃতের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফার। এর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয়। আরেক হাদিসে সুস্পষ্টভাবে এসেছে—মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কেবল তিনটি পুণ্যের পথ খোলা থাকে। এক. সদকা জারিয়া। দুই. তার রেখে যাওয়া মানুষের জন্য উপকারী ইলম। তিন. নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।[১৬৭৬] আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গিয়েছেন। তিনি কোনো ওসিয়ত করে যাননি। তবে আমার ধারণা, ওসিয়ত করে যেতে পারলে সদকার কথা বলতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকা করি, তিনি কি উপকৃত হবেন? রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ।[১৬৭৭] সাদ ইবনে উবাদা থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসুলকে বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার জন্য কোন সদকা উত্তম হবে? রাসুল (ﷺ) বললেন, পানি। তখন সাদ তার মায়ের পক্ষ থেকে একটি কূপ খনন করেন।[১৬৭৮] জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে কুরবানির

১৬৭৬. মুসলিম (কিতাবুল ওয়াসিয়্যাহ : ১৬৩১)। আবু দাউদ (কিতাবুল ওয়াসায়া : ২৮৮০)। তিরমিযি (আবওয়াবুল আহকাম : ১৩৭৬)।

১৬৭৭. বুখারি (কিতাবুল জানায়েয : ১৩৮৮)। মুসলিম (কিতাবুয যাকাত : ১০০৪)।

১৬৭৮. আবু দাউদ (কিতাবুয যাকাত : ১৬৮১)।

দিন ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। খুতবার পরে তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন। একটি ছাগল নিজ হাতে যবাই করলেন। বললেন, 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার! এটা আমার এবং আমার উম্মতের যারা কুরবানি করেনি সবার পক্ষ থেকে।'[১৬৭৯] এখানে জীবিত ও মৃতের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইসালে সওয়াব বৈধ : মৌলিকভাবে জীবিতদের দোয়া ও সদকার মাধ্যমে মৃতদের উপকৃত হওয়া ইসলামের প্রতিষ্ঠিত এবং আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত আকিদা। তবে কোন কোন আমলের পুণ্য মৃতদের কাছে পৌঁছয় আর কোন আমল পৌঁছয় না, সেটা নিয়ে আলেমদের কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা এবং হানাফি মাযহাবের উলামায়ে কেরাম মনে করেন, সব ধরনের আমলের সওয়াব মৃতদের কাছে ইসাল করা সম্ভব এবং তারা এর মাধ্যমে উপকৃত হয়। কারণ, কুরআন ও সুন্নাহতে বিশেষ কোনো আমল ইসালে সওয়াবের জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি। মালেক ও শাফেয়ি (বিশেষত পরবর্তী মালেকি ও শাফেয়িগণ) থেকেও একই মতামত পাওয়া যায়। বিপরীতে একদল আলেম মনে করেন, আর্থিক ইবাদত (সদকা, হজ) ইসালে সওয়াব করা যায়; শারীরিক ইবাদত (নামায, রোযা, তেলাওয়াত) ইসাল করা যায় না।[১৬৮০]

হাসকাফি (১০৮৮ হি.) মৃতের যিয়ারত প্রসঙ্গে লিখেন, কবরের কাছে গিয়ে বলবে, 'আসসালামু আলাইকুম মুমিন সম্প্রদায়, আমরা শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে এসে মিলিত হচ্ছি' (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ)। অতঃপর সুরা ইয়াসিন পাঠ করবে। হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি এগারোবার সুরা ইখলাস পাঠ করবে, অতঃপর এর সওয়াব মৃতদের জন্য বখশে দেবে, তাকে মৃতদের সংখ্যাসমপরিমাণ সওয়াব দান করা হবে (অর্থাৎ, প্রত্যেকের পক্ষ থেকে পড়া হবে)। 'শরহুল লুবাব' গ্রন্থে এসেছে, (যিয়ারতের সময়) যতটুকু সম্ভব কুরআন পাঠ করবে। যেমন—সুরা ফাতিহা, সুরা বাকারার শুরু থেকে 'আল-মুফলিহুন' পর্যন্ত, আয়াতুল কুরসি, (বাকারার শেষে) 'আমানার রাসুল' থেকে শেষ পর্যন্ত, সুরা ইয়াসিন, সুরা মুলক, সুরা তাকাসুর এবং এগারো/বারো/তেরো বা সতেরোবার সুরা ইখলাস পড়বে। শেষে দোয়া করবে, 'হে আল্লাহ, আমরা যা পাঠ করলাম এর সওয়াব আপনি অমুক অমুক ব্যক্তির রুহে পৌঁছিয়ে দিন।' ইবনে

১৬৭৯. আবু দাউদ (কিতাবুয যাহায়া : ২৮১০)। তিরমিযি (আবওয়াবুল আযাহি : ১৫২১)।

১৬৮০. দেখুন : হিদায়াহ (১/১৭৮)।

আবিদিন লিখেন, আমাদের উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—নামায, রোযা, সদকা ইত্যাদিসহ যেকোনো আমল মৃতের জন্য ইসালে সওয়াব করা যেতে পারে। হ্যাঁ, মালেক ও শাফেয়ি শারীরিক ইবাদত—যেমন : নামায, তেলাওয়াত এগুলোকে—আলাদা রাখেন। তাদের মতে, এগুলোর সওয়াব মৃতের রুহে পৌঁছয় না। বিপরীতে হজ, সদকা এগুলোর পুণ্য পৌঁছয়। তবে মুতাআখখিরিন তথা পরবর্তী সময়ের শাফেয়ি উলামায়ে কেরামও তাদের মত পরিবর্তন করেন এবং তেলাওয়াতের সওয়াব মৃতের রুহে পৌঁছয় বলে মত প্রকাশ করেন।[১৬৮১]

বিভিন্ন বর্ণনায় বোঝা যায়, খোদ ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদও তেলাওয়াতের সওয়াব মৃত ব্যক্তির রুহে পৌঁছয় মনে করতেন। কারণ, সাহাবা ও তাবেয়িন থেকে কুরআন তেলাওয়াতের ওসিয়ত পাওয়া যায়। যেমন—ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি মৃত্যুর আগে ওসিয়ত করে যান যেন তার কবরের কাছে সুরা বাকারা পাঠ করা হয়। ইমাম আহমদ প্রথমে এটা নিষেধ করতেন। এ জন্য এক অন্ধ ব্যক্তিকে তিনি কবরের কাছে কুরআন পাঠ করতে দেখে বলেন, এটা বিদআত! পরে মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা তাকে বলেন, আবদুর রহমান ইবনুল আলা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মৃত্যুর আগে ওসিয়ত করে যান যেন দাফনের সময় তার মাথার কাছে সুরা বাকারার প্রথম ও শেষ অংশ তেলাওয়াত করা হয়। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরকে এমন ওসিয়ত করতে শুনেছি! এটা শুনে ইমাম আহমদ বলেন, যাও! লোকটিকে গিয়ে বলো সে যেন কুরআন তেলাওয়াত করে! সুন্নাহর প্রতি আহমদ ইবনে হাম্বলের আত্মসমর্পণ দেখুন! তা ছাড়া, তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, আয়াতুল কুরসি তিনবার এবং সুরা ইখলাস একবার পড়ে সেটার সওয়াব মৃতদের প্রতি ইসাল করা। ইমাম শাফেয়ি রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কবরের কাছে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি না? তিনি বললেন, 'কোনো সমস্যা নেই।'[১৬৮২]

এসব বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব চার মাযহাবের ঐকমত্যে মৃত ব্যক্তির রুহে বখশ করা যায়। তবে মতভেদ থেকে বেঁচে থাকতে যদি দোয়া ও সদকার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা হয়, সেটা নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম।

১৬৮১. রদ্দুল মুহতার (২/২৪২-২৪৩)।
১৬৮২. দেখুন : আর-রুহ, ইবনুল কাইয়িম (২১-২২, ১৭৪)।

মুতাযিলারা একবাক্যে সব ধরনের ইসালে সওয়াব অস্বীকার করে। তাদের দাবি, মানুষের তাকদিরের পরিবর্তন নেই। তা ছাড়া, মানুষ নিজে যা করে তার মাধ্যমে উপকৃত হবে। মৃত্যুর পরে অন্যের আমলে তার কোনো লাভ নেই। মুতাযিলাদের খণ্ডনে আহলে সুন্নাত বলেন, দোয়া ও সদকার মাধ্যমে মৃতের উপকৃত হওয়ার সঙ্গে তাকদিরের কোনো সংঘাত নেই। কারণ, তাকদিরে এভাবে লেখা আছে যে, মৃত্যুর পরেও সে দোয়া পাবে এবং এর মাধ্যমে উপকৃত হবে। আর অন্যের আমলের মাধ্যমে উপকৃত হওয়াও মূলত নিজের আমলই। অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তি দুনিয়াতে হয়তো এমন কোনো পুণ্য বা ভালো কাজ করে গিয়েছে যার কারণে জীবিতরা তার জন্য দোয়া করছে। ফলে প্রকারান্তরে জীবিতদের দোয়া ও সদকা তার নিজের কর্মেরই ফসল! তা ছাড়া, এটা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং যুক্তি দেখিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ ছেড়ে দেওয়া বৈধ হবে না।

তাওয়াসসুল (ওসিলা দিয়ে দোয়া করা)

এটা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যেটার বৈধতা-অবৈধতা কিংবা সুন্নাত-বিদআত হওয়া নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক দেখা যায়। ফলে এ ব্যাপারে ইমাম আজম আবু হানিফা এবং হানাফি মাযহাবের আলেমদের বক্তব্য দেখা আবশ্যক। পাশাপাশি অন্যান্য মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের বক্তব্য দেখাও জরুরি, যাতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বিচ্যুতি দূর হয় এবং মুস্তাহাব অথবা নিদেনপক্ষে মুবাহ (বৈধ) কোনো আমলকে বিদআত ভাবা না হয়।

'তাওয়াসসুল' আরবি শব্দ 'ওসিলা' (الوسيلة) থেকে উদ্গত। এর অর্থ হলো : মাধ্যম, নৈকট্য, মর্যাদা ইত্যাদি। কোনো ব্যক্তি কিংবা কাজের মাধ্যমে/সুবাদে/সম্মানে অন্য কারও কাছে যাওয়ার চেষ্টাকে 'তাওয়াসসুল' বলা হয়। গৃহীত মাধ্যমটিকে 'ওসিলা' বলা হয়। বাংলাতেও আরবি শব্দটি অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

শরয়ি পরিভাষায় 'তাওয়াসসুল' শব্দের অর্থ হলো, আল্লাহর কাছে কোনোকিছুর ওসিলা দিয়ে দোয়া করা। অন্যকথায়, আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় সেটা অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার জন্য কোনোকিছুকে ওসিলা ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা। যেমন—আল্লাহর নাম কিংবা গুণের ওসিলা দিয়ে এভাবে দোয়া করা : 'হে আল্লাহ, আপনি তো পরম করুণাময়। আমাদের উপর করুণা

করুন! আল্লাহ, আপনি রহমান! আমাদের উপর রহম করুন!’ অথবা “আল্লাহ, আপনি ‘গাফফার’ (ক্ষমাশীল) নামের ওসিলায় আমাদের ক্ষমা করুন” ইত্যাদি। এগুলো বৈধ বরং উত্তম। দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে সহায়ক। একইভাবে কোনো নেক আমলের ওসিলা দিয়ে দোয়া করা। যেমন—‘হে আল্লাহ, আমি সম্পূর্ণ কুরআন খতম করেছি। এ ওসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দিন।’ অথবা ‘হে আল্লাহ, আমি একশত টাকা সদকা করেছি। এ ওসিলায় আমাকে এবং আমার পরিবারকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন।’ কিংবা ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করি। আপনি আমার রিযিকের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান’ ইত্যাদি। এভাবেও দোয়া করা যাবে, ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার রাসুলকে মহব্বত করি, সাধ্যমতো তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করি। এই মহব্বত ও অনুসরণের বরকতে আমাকে ক্ষমা করুন, আখেরাতে আমাকে মুক্তি দান করুন।’

গোটা উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে এসব ওসিলা গ্রহণের মাধ্যমে দোয়া বৈধ। কারণ, এটা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾ অর্থ : ‘আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। কাজেই তোমরা তাঁকে সেসব নামে ডাকো।’ [আরাফ : ১৮০] আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ অর্থ : ‘হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর নৈকট্যলাভের ওসিলা অন্বেষণ করো এবং তাঁর পথে জিহাদ করো যাতে তোমরা সফলকাম হও।’ [মায়িদা : ৩৫] বিভিন্ন হাদিস দ্বারাও নেক আমলের ওসিলা দিয়ে দোয়া করার বৈধতা প্রমাণিত।[১৬৮৩]

একইভাবে জীবিত কারও দোয়াকে ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করাও সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। অর্থাৎ, জীবিত কারও কাছে দোয়া চাওয়া সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন সময়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর দোয়া চেয়েছেন। যেমন—এক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনার দোয়া করলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) দোয়া করেন। আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টি দান করেন। এক সপ্তাহ টানা বৃষ্টি হওয়ার পরে তিনি রাসুলুল্লাহর কাছে এসে বৃষ্টি বন্ধের দোয়া করতে বলেন।

১৬৮৩. বুখারি (কিতাবুল হারসি ওয়াল মুযারাআহ : ২৩৩৩)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আনাস ইবনে মালেক : ১২৬৪৯))।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) দোয়া করলে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়।[১৬৮৪] এক সাহাবি অসুস্থ হলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে দেখতে যান। তিনি আল্লাহর রাসুলকে বলেন, আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ যেন হেদায়াত থেকে বিচ্যুত না করেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তার জন্য দোয়া করলেন।[১৬৮৫] উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের কাছে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিম বাহিনীর সমুদ্র বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করলে উম্মে হারাম বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার জন্য দোয়া করুন যাতে সেই বাহিনীতে শরিক হতে পারি। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) দোয়া করলেন অতঃপর জানালেন, তুমি তাদের অগ্রভাগে থাকবে (পরে তা-ই হয়েছিল)।[১৬৮৬] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একদিন ভরা মজলিসে বললেন, 'কিয়ামতের দিন সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' উক্কাশা নামক এক সাহাবি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার জন্য দোয়া করুন যাতে তাদের মাঝে থাকতে পারি। রাসুল বললেন, হে আল্লাহ, তাকে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।[১৬৮৭] ফলে জীবিত যে-কারও দোয়া কামনা একধরনের ওসিলা। এটার বৈধতাও সর্বজন স্বীকৃত।

বাকি থাকল জীবিত কিংবা মৃত কারও সত্তা ও ব্যক্তিত্বের ওসিলায়/মাধ্যমে দোয়া কামনা। যেমন—'হে আল্লাহ, আপনার নবির ওসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দিন।' অথবা 'হে আল্লাহ, অমুক পির বা বুযুর্গের ওসিলায় আমাকে সন্তান দান করুন' ইত্যাদি। এটার বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে উম্মাহর মাঝে ব্যাপক মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। আমাদের আলোচনার বিষয় মূলত এ ধরনের ওসিলা গ্রহণই। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এটাকেও বৈধ বলেছেন। একদল আলেম এটাকে অবৈধ ও বিদআত বলেছেন। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, যার ওসিলা দিয়ে দোয়া করা হচ্ছে, তিনি উপকার বা অপকার কোনোকিছু করার সামর্থ্য রাখেন না; উপকার-অপকারের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তায়ালা। আরও বিশ্বাস রাখা যে, ওসিলা দিয়ে দোয়া করলেই কবুল হয়ে যাবে কিংবা যার ওসিলা দিয়ে দোয়া করা হচ্ছে তিনি দোয়া কবুলের মালিক—এমন নয়। বরং আল্লাহ চাইলে দোয়া কবুল করবেন। তিনি না চাইলে কবুল করবেন না। এখানে অন্য কারও কিছু বলার নেই,

---

১৬৮৪. বুখারি (কিতাবুল ইসতিসকা : ১০১৫)। ইবনে মাজা (আবওয়াবু ইকামাতিস সালাত : ১২৬৯)।

১৬৮৫. বুখারি (কিতাবুল ওয়াসায়া : ২৭৪৪)।

১৬৮৬. বুখারি (কিতাবুল জিহাদ : ২৭৮৮)।

১৬৮৭. মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ২১৬)।

ক্ষমতা নেই। ওসিলা স্রেফ আল্লাহর প্রতি সুধারণা ও আশা, বান্দার বিনয় ও আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ।

'তাওয়াসসুল' বৈধতার দলিল

এক. আল্লাহর বাণী : ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ অর্থ : 'হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর নৈকট্যলাভের ওসিলা অন্বেষণ করো।' [মায়িদা : ৩৫] এখানে 'ওসিলা'-কে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। ফলে ব্যক্তিকে ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করে দোয়া করাও বৈধ হবে।

দুই. উসমান ইবনে হুনাইফ থেকে বর্ণিত, এক অন্ধ ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে সুস্থ করে দেন। রাসুল (ﷺ) বললেন, 'যদি দোয়া চাও, তবে তোমার জন্য দোয়া করব; আর যদি চাও তবে সবর করতে পারো। এটাই তোমার জন্য উত্তম।' লোকটি বলল, দোয়া করুন। নবিজি তাকে সুন্দর করে ওজু করে নিম্নোক্ত দোয়া করতে বললেন, (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ) অর্থাৎ : 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আপনার নবি রহমতের নবি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে আপনার অভিমুখী হয়েছি। (হে নবি) আমি আপনার মাধ্যমে আমার রবের অভিমুখী হয়েছি, যাতে আমার এ প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়। হে আল্লাহ, আপনি আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল করুন।[১৬৮৮] এ হাদিসটি বিশুদ্ধ। এটি কারও ওসিলা ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া করার বৈধতার সুস্পষ্ট দলিল এবং সাহাবির আমল দ্বারা প্রমাণিত। যদিও বিপক্ষের আলেমগণ এটাকে বিভিন্নভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেটা নিতান্তই 'তাকাল্লুফ' বরং ক্ষেত্রবিশেষে হাদিসের অপব্যাখ্যা। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের বক্তব্যই সঠিক, ইনশাআল্লাহ।

১৬৮৮. তিরমিযি (আবওয়াবুত দাআওয়াত : ৩৫৭৮)। তিরমিযি এটাকে 'হাসান-সহিহ' বলেছেন। হাকেম তার মুসতাদরাকে এটাকে বুখারি-মুসলিমের শর্তে সহিহ বলেছেন। আরও দেখুন : মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুশ শামিয়্যিন : ১৭৫১৩)।

তিন. সাহাবি উসমান ইবনে হুনাইফ কর্তৃক উক্ত হাদিসের বাস্তবায়ন। তাবারানি 'আল-মুজামুল কাবির'-এ সাহল ইবনে হুনাইফ থেকে বর্ণনা করেন—এক ব্যক্তি বারবার বিশেষ কোনো প্রয়োজনে উসমান ইবনে আফফানের কাছে আসতেন। কিন্তু উসমান সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। উসমান ইবনে হুনাইফের সঙ্গে দেখা হলে লোকটি তাকে এ কথা জানাল। তখন তিনি বললেন, তুমি ওজু করে মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামায পড়ো। অতঃপর এভাবে দোয়া করো, (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَتَقْضِي لِي حَاجَتِي) অর্থা: 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আমাদের নবি, রহমতের নবি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে আপনার অভিমুখী হয়েছি। হে মুহাম্মাদ, আমি আপনার মাধ্যমে আমার রবের অভিমুখী হয়েছি, যাতে আমার এ প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়।' দোয়ার মাঝে তোমার প্রয়োজনের কথা বলো। ইবনে হুনাইফের কথা অনুযায়ী লোকটি সবকিছু করে উসমান ইবনে আফফানের দরজায় এলো। দ্বাররক্ষী এসে তাকে ভিতরে উসমান রাযি.-এর কাছে নিয়ে গেল। উসমান রাযি. তাকে নিজের সঙ্গে মাদুরের উপর বসিয়ে বললেন, তোমার প্রয়োজন বলো। লোকটি তার প্রয়োজনের কথা বললে উসমান রাযি. সেটা পূর্ণ করলেন। লোকটি ইবনে হুনাইফের কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা জানালে ইবনে হুনাইফ তাকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে ঘটে যাওয়া অন্ধ ব্যক্তির ঘটনা শোনান।[১৬৮৯]

চার. আবু সাইদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের জন্য নিজ ঘর থেকে বের হয়ে এই দোয়া পড়বে : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا ، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً ، وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ অর্থাৎ : হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনাকারীদের হকের ওসিলায়, আমার এই (মসজিদের দিকে) হাঁটার ওসিলায় আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, এ অবস্থায় যে আমি অহংকার, দম্ভ কিংবা রিয়া-লৌকিকতাবশত বের হইনি, বরং আপনার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য এবং আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বের হয়েছি। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আপনি

১৬৮৯. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (উসমান ইবনে হুনাইফ : ৮৩১১)। তাবারানি এটাকে সহিহ বলেছেন এবং এটার অংশবিশেষ যা তিরমিযি-সহ বিভিন্ন গ্রন্থে রয়েছে সেটা সর্বসম্মতিক্রমে সহিহ।

আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন। আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন। কারণ, আপনি ব্যতীত আর কেউ গুনাহ ক্ষমার সাধ্য রাখে না'—আল্লাহ তায়ালা তার দিকে ফিরে তাকান, সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য ইস্তিগফার করে ...।'[১৬৯০]

পাঁচ. আলি রাযি.-এর মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ রাযি. মৃত্যুবরণ করলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কাছে যান। তাঁর মাথার কাছে গিয়ে বলেন, 'মা, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। আমার মায়ের পরে আপনিই আমার মা ছিলেন।' ...অতঃপর তাঁকে গোসল ও কাফন পরানো হয়। রাসুল (ﷺ) নিজে তাঁর কবর খননের কাজে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁকে কবরে রাখার সময় দোয়া করেন : اللهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ، وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ অর্থাৎ, '(হে) আল্লাহ, আপনি যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন, যিনি নিজে চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। আপনি আপনার নবি (তথা আমি) এবং আমার পূর্ববর্তী নবিদের হকের ওসিলায় আমার মা ফাতিমা বিনতে আসাদকে ক্ষমা করুন। তাঁকে মুক্তির বাণী শিখিয়ে দিন। তাঁর গমনস্থল (কবর)-কে তার জন্য প্রশস্ত করুন। নিশ্চয়ই আপনি পরম করুণাময়।[১৬৯১] এখানেও স্বয়ং নবিজি (ﷺ) তাঁর নিজের এবং অন্য নবিদের ওসিলায় দোয়া করছেন। অন্য নবিগণ কিন্তু দুনিয়ার হিসেবে মৃত। ফলে এর মাধ্যমে মৃতদের নামে ওসিলা দিয়ে দোয়া করাও প্রমাণিত।

ইমাম আজমের মাযহাব

ইমাম আজম রহ. থেকে 'তাওয়াসুসল' বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর কয়েকটা অস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে, যা এক্ষেত্রে পরবর্তী ইমামগণ নিজ নিজ মাযহাবের দলিল হিসেবে পেশ করেন। যেমন—ইমাম আজম রহ. বলেছেন,

---

১৬৯০. ইবনে মাজা (আবওয়াবুল মাসাজিদ : ৭৭৮)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আবি সাইদ খুদরি : ১১৩২৫)। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (কিতাবুদ দোয়া : ২৯৮১২)। উক্ত হাদিসটিকে সিন্দি যয়িফ বলেছেন। তবে তিনি এটাও বলেছেন, ইবনে খুযাইমা তাঁর সহিহতে এটা ফুযাইল ইবনে মারযুক থেকে বর্ণনা করেছেন। এটা তার কাছে সহিহ হিসেবে গণ্য। ইরাকি ইহইয়ার তাখরিজে এটাকে হাসান বলেছেন।

১৬৯১. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (ফাতিমা বিনতে আসাদ : ২৪/৩৫১; হাদিস নং ৮৭১)। আল-মুজামুল আওসাত (আহমদ : ১/৬৭; হাদিস নং ১৮৯) এটার সনদে 'রওহ ইবনে সালাহ' নামক এক ব্যক্তি রয়েছেন। দারাকুতনি, ইবনে আদি-সহ কেউ কেউ তাকে যয়িফ বলেছেন। বিপরীতে হাকেম, ইবনে হিব্বান তাকে 'সিকাহ' বলেছেন। সনদের অন্যান্য ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য।

(يكره أن يقول الرجل: أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك) অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ, আমি অমুক ব্যক্তি কিংবা আপনার নবি, রাসুলের **হকের** ওসিলায়, বাইতুল্লাহ ও মুযদালিফার (পবিত্র) স্থানের **হকের** ওসিলায় আপনার কাছে চাইছি—এমন বলা **মাকরুহ**।' ইমাম আজম থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেছেন, (وكره أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أن يقول الداعي: اللَّهُمَّ إني أسألك بمعقد العز من عرشك / اللَّهُمَّ إني أسألك بمقعد العز من عرشك) অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আপনার **আরশের সম্মানের** ওসিলায়/**আরশে বসার** ওসিলায় চাইছি—এমন বলা **মাকরুহ**।[১৬৯২]

উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তাওয়াসসুল অবৈধের প্রবক্তা আলেমগণ দাবি করেছেন—ইমাম আজম তাদের মতো আল্লাহ ছাড়া আর কোনোকিছুর ওসিলা দিয়ে দোয়া করাকে নিষেধ করেছেন। কারণ, এখানে নবি-রাসুল, বাইতুল্লাহ, আরশ ইত্যাদির ওসিলা দিয়েও দোয়া করাকে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে সাধারণ মানুষের ওসিলা দিয়ে দোয়া করা তো আরও বেশি নিষেধ। বোঝা গেল, ইমাম আজমের মত তাদের মতোই—তাওয়াসুসল নিষিদ্ধ।

বিপরীতে হানাফি এবং অন্যান্য মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম ভিন্নভাবে এই বাক্য দুটোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাসআলার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের কথার সারমর্ম হলো : উক্ত বাক্যদুটো ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা এ দুটোর মাঝে বিদ্যমান ভিন্ন জটিলতার কারণে। ইমাম আজম কিংবা তাঁর শাগরেদগণ উন্মুক্তভাবে দোয়ায় ওসিলা গ্রহণ নিষেধ করতেন এমন নয়।[১৬৯৩]

আল্লামা মারগিনানি 'হিদায়াহ'-তে লিখেন, 'আরশের মাধ্যমে দোয়া করা নিষিদ্ধ দুই কারণে : এক অর্থে তাতে আরশের উপর আল্লাহর বসা সাব্যস্ত করা হয় (ومقعد العز، ولا ريب في كراهة الثانية؛ لأنه من القعود)। অথচ তিনি এটা থেকে পবিত্র। অন্য অর্থে এতে আরশের সঙ্গে তাঁর ইযযতের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয়, অথচ যখন আরশ ছিল না, তখনও তিনি ইযযতের অধিকারী ছিলেন। আরশ হাদেস তথা পরবর্তীকালে সৃষ্ট। বিপরীতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল গুণে চিরন্তন।'

১৬৯২. আল-হিদায়াহ (৪/৩৮০)। আল-মুহিতুল বুরহানি (৫/৩১২)। শরহুল হিদায়াহ, আইনি (১২/২৪৬)।
১৬৯৩. দেখুন : ফাতাওয়া সিরাজিয়্যাহ (৩১৬)।

...একইভাবে 'কোনো নবির হকের ওসিলায়' দোয়া করা মাকরুহ। কারণ, আল্লাহর উপর কারও হক তথা অধিকার নেই।'[১৬৯৪]

কাসানি লিখেন, 'নবি-রাসুলের হকের ওসিলায় দোয়া করা মাকরুহ। কারণ, আল্লাহর উপর কারও হক বা অধিকার নেই। আর (بمعقد العز) আরশের সম্মানের ওসিলায় দোয়া করাও মাকরুহ। কারণ, আল্লাহর একটি সৃষ্টি। ফলে আল্লাহর ইযযত এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে না।'[১৬৯৫]

বদরুদ্দিন আইনি লিখেন, 'আল্লাহর বসার মাধ্যমে (بمقعد العز) তাঁর কাছে প্রার্থনার নিষেধাজ্ঞা স্পষ্ট। কারণ, তাতে আরশের উপর আল্লাহর স্থান গ্রহণ সাব্যস্ত করা হয়। অথচ এটা দেহবাদীদের বক্তব্য। বাতিল আকিদা। বিপরীতে আরশের সম্মানে দোয়া করা (بمعقد العز) বিষয়টি আরেকটু লঘু। এ কারণে ইমাম আবু ইউসুফ, ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি প্রমুখ এভাবে দোয়া করা বৈধ বলেছেন। তারা এক্ষেত্রে একটি হাদিস দিয়ে দলিল দিয়েছেন, যেখানে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এভাবে দোয়া করেছেন' (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسألك بمعاقد العز من عرشك)। কিন্তু ইবনুল জাওযিসহ আলেমগণ এটাকে জাল বলেছেন। ফলে আইনি এভাবে দোয়া করাও নিষেধ মনে করেন। একইভাবে কারও 'হকের মাধ্যমে' দোয়া করা নিষিদ্ধ। কারণ, তাতে আল্লাহর উপর অন্যের অধিকার সাব্যস্ত হয়; অথচ তাঁর উপর কারও অধিকার নেই।[১৬৯৬]

অধমের পর্যবেক্ষণ

এখানে ইমাম আজম রহ. সব ধরনের 'ওসিলা' গ্রহণকে নিষেধ করেননি, বরং নির্দিষ্ট কিছু শব্দের ব্যবহার ও বিশ্বাসকে নাকচ করেছেন। যেমন—প্রথম বাক্যে আল্লাহর উপর কারও অধিকার খাটিয়ে দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন। মানুষের উপর তাঁর দেওয়া সবকিছু স্রেফই অনুগ্রহ ও করুণা। তাঁর উপর নবি-রাসুল কিংবা ফেরেশতা কারও কোনো অধিকার নেই। বরং সবাই তাঁর অনুগ্রহের ভিখারী। ফলে কোনো নবির প্রতি কিংবা কাবা ঘরের প্রতি অতিরঞ্জিত সম্মান প্রদর্শন করে আল্লাহর উপর সেগুলোর অধিকার সাব্যস্ত

১৬৯৪. আল-হিদায়াহ (৪/৩৮০)।

১৬৯৫. বাদায়েউস সানায়ে (৫/১২৬)।

১৬৯৬. আল-বিনায়াহ (১২/২৪৬-২৪৯)।

করাকে নাকচ করা হয়েছে। এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। সুতরাং ইমাম আজম উক্ত বাক্যে ওসিলাগ্রহণকে নাকচ করেননি, অধিকার সাব্যস্ত করাকে নাকচ করেছেন। দুটোর মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। ওসিলার ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর কারও অধিকার সাব্যস্ত করা হয় না, বরং আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তির মর্যাদা, আল্লাহর সঙ্গে তাঁর মহব্বতের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের সুবাদে দোয়া করা হয়। ফলে প্রথমটা নিষেধ, তাই দ্বিতীয়টাও নিষেধ হবে এটা অযৌক্তিক কথা। এ জন্য 'নবির হকের ওসিলায়' বলার দ্বারা যদি 'নবির সম্মানের ওসিলা' উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তবে সেটা মোটেই নিষিদ্ধ নয়।

একইভাবে দ্বিতীয় বাক্য নিষিদ্ধের কারণ হলো আরশের সম্মান প্রার্থনা করা কিংবা আরশের সম্মানে প্রার্থনা করা। সাধারণত ওসিলা সেসব বিষয়ের গ্রহণ করতে হয়, যেগুলোর সঙ্গে বান্দার সরাসরি সম্পর্ক থাকে। যেমন—আপনি আল্লাহর রাসুলের অনুসরণ করছেন, তখন রাসুলের ওসিলায় প্রার্থনা করবেন। আপনি কোনো বুযুর্গকে মহব্বত করেন এবং ভালোবাসেন, তাদের অনুসরণ করেন, তাদের ওসিলায় প্রার্থনা করবেন। কারণ, তাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এমন বিষয় যার সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই, সেটার ওসিলায় প্রার্থনা করার যৌক্তিকতা কী? আল্লাহর আরশের ওসিলায় আপনি কেন প্রার্থনা করবেন? আরশের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী? তাহলে তো পৃথিবীর সবকিছুর ওসিলা দিয়ে দোয়া করা বৈধ হবে। বিপরীতে রাসুলুল্লাহর ওসিলায় যখন প্রার্থনা করবেন, তখন এর অর্থ অনেকটা এমন দাঁড়াবে—হে আল্লাহ, আমি আপনার রাসুলকে ভালোবাসি, তাঁর অনুসরণের চেষ্টা করি। আমি তাঁর একজন একনিষ্ঠ উম্মত। তিনি যেহেতু আপনার কাছে সম্মানিত ও মহব্বতের পাত্র, তাই তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা ও অনুসরণের সুবাদে তাঁর মর্যাদার দিকে তাকিয়ে আপনি আমার দোয়া কবুল করুন! দুটোর মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

বরং খোদ ইবনে তাইমিয়্যাহ, যার বক্তব্য প্রথম মতাদর্শের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়, তিনিও কুরআন-সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহিনের মাঝে এ প্রকারের তাওয়াসসুলের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেন, আবু হানিফা এবং অন্যান্য আলেম থেকে 'নবি-রাসুলসহ অন্যান্য মাখলুকের মাধ্যমে দোয়া করার নিষেধাজ্ঞা'-সম্পর্কিত যেসব বক্তব্য এসেছে, সেগুলোতে দুটো বিষয় রয়েছে : এক. তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার উপর কসম খাওয়া। এটা আলেমদের সর্বসম্মতিতে নিষিদ্ধ। দুই. তাদের মাধ্যমে দোয়া করা। এটাকে

একদল লোক বৈধ বলেছেন। কতক সালাফ থেকে এ ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে। অনেক মানুষই এভাবে দোয়া করে (فهذا يجوزه طائفة من الناس ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود في دعاء كثير من الناس)।'[১৬৯৭] তিনি অন্যত্র বলেন, 'ফলে এ ধরনের দোয়া সালাফ থেকে প্রমাণিত। আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবিজি (ﷺ)-এর ওসিলা দিয়ে দোয়া করেছেন। আরেক দল সেটা নিষেধ করেছে' (فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ونهى عنه آخرون)।'[১৬৯৮] উপরের বক্তব্যে স্পষ্ট যে, যদি তাওয়াসসুলের বিপক্ষের লোকদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য ধরা হয়, তবুও সেটা স্রেফ মতভেদপূর্ণ একটা বিষয়ে পরিণত হয়, যাকে সর্বোচ্চ মাকরুহ অভিহিত করা যায়। অথচ এমন একটা বিষয়কে বড় করে যুগের পর যুগ উম্মাহর দেহ ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে। এটাকে শিরক এবং কাফেরদের মূর্তিপূজাসদৃশ আখ্যা দিয়ে মুসলমানদের উপর খড়্গ চালানো হয়েছে, যা দ্বীনের নামে বাড়াবাড়ি এবং কোনোক্রমেই বৈধ নয়।

তা ছাড়া, বর্তমান আলোচনার শুরুতেই যেমন বলা হয়েছে, কোনো নবি বা ওলির ওসিলা দিয়ে দোয়া করলেই সেটা কবুল হয়ে যাবে কিংবা যার ওসিলা দেওয়া হচ্ছে তিনি দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখবেন—এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস রাখা যাবে না। বরং দোয়া কবুলের একমাত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা। তিনি বলেন, ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ অর্থ : 'আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, (আপনি বলুন) আমি তো নিকটেই। যখন কেউ আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় আর আমার প্রতি ঈমান আনে। তাহলে তারা সুপথপ্রাপ্ত হবে।' [বাকারা : ১৮৬] ফলে কেবল আল্লাহর কাছে, তাঁর প্রতি সুধারণা রেখে, তাঁর অনুগ্রহের আশা নিয়ে দোয়া করতে হবে। এটা আহলে সুন্নাতের নির্ভরযোগ্য সকল আলেমের সিদ্ধান্ত।

হ্যাঁ, আলেমদের মতভেদপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের উপর আমল করা অধিক উত্তম ও নিরাপদ। আল্লাহর নাম ও গুণাবলি, নিজের নেক আমল,

---

১৬৯৭. মাজমুউল ফাতাওয়া (১/২২২)।

১৬৯৮. প্রাগুক্ত (১/২৬৪)।

আল্লাহর ইবাদত এবং রাসুলুল্লাহর ইত্তিবা (অনুসরণ), বুযুর্গানে দ্বীনের মহব্বত ইত্যাদির ওসিলা দিয়ে দোয়া করা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। ফলে এর কাছাকাছি থাকাই নিরাপদ।

রওযা অভিমুখী হয়ে সালাম দেওয়া এবং নবিজির (ﷺ) শাফায়াত প্রার্থনা (ইস্তিশফা)

রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর রওযা যিয়ারতের সময় কোন দিকে ফিরে দোয়া করতে হবে? ইমাম আজম রহ. এবং মুহাক্কিক আলেমগণের মতে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর রওযা যিয়ারতের সময় তাঁর রওযার দিকে ফিরেই দোয়া করা মুস্তাহাব। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বর্ণনা করেন, একদা ইমাম আজম মদিনায় ছিলেন। তখন আইয়ুব সাখতিয়ানি মদিনায় এলেন। ইমাম আইয়ুব রহ.-এর যিয়ারতের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করলেন। দেখলেন, আইয়ুব কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর রওযা অভিমুখী হয়ে দোয়া করলেন। দোয়াতে প্রচুর কাঁদলেন। ইমাম আজম বলেন, 'একজন ফকিহের জন্য এমন করাই শোভনীয়।'[১৬৯৯]

এটা কেবল ইমাম আজম রহ.-এর আদর্শ নয়, চার মাযহাবের ইমাম থেকেই একই বক্তব্য এবং রওযা যিয়ারতের অভিন্ন আদব বর্ণিত আছে। মালেকি মাযহাবের কাযি ইয়ায বর্ণনা করেন, খলিফা আবু জাফর মনসুর মসজিদে নববিতে এসে ইমাম মালেককে যিয়ারতের সময় দোয়ার আদব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কিবলামুখী হয়ে দোয়া করব, নাকি রওযামুখী হয়ে? ইমাম মালেক বললেন, 'কেন আপনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে আপনার মুখ ফিরিয়ে নেবেন? অথচ তিনি আপনার এবং আপনার পিতা আদমের ওসিলা। সুতরাং আপনি তাঁর দিকে মুখ করে দোয়া করুন। তাঁর কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করুন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর শাফায়াত কবুল করবেন।'[১৭০০] নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ সামেরি হাম্বলি (৬১৬ হি.) কবর যিয়ারতের আদব প্রসঙ্গে লিখেন : '...অতঃপর রওযার সামনে এসে দাঁড়াবে। কবরকে সামনে রাখবে। কিবলাকে রাখবে পিছনে। অতঃপর বলবে, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ! ...অতঃপর নবির ওসিলায় দোয়া করবে।'[১৭০১]

১৬৯৯. দেখুন : ফাযায়িলু আবি হানিফা (১৯৪)।

১৭০০. শিফা, কাযি ইয়ায (২/৪১)।

১৭০১. আল-মুসতাওয়িব (১/৫২৪-৫২৫)।

হ্যাঁ, আবুল লাইস সমরকন্দি হাসান ইবনে যিয়াদ সূত্রে ইমাম আজম রহ. থেকে সালামের সময় কিবলামুখী হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেটা মুহাক্কিক ফকিহদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, বরং বিশুদ্ধতর হলো রওযামুখী হওয়া। কামাল ইবনুল হুমাম রওযা যিয়ারতের আদব সম্পর্কে লিখেন, 'অতঃপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর রওযার সামনে গিয়ে তাঁর অভিমুখী হয়ে কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবে। এ ব্যাপারে আবুল লাইসের কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানোর বক্তব্য প্রত্যাখ্যাত। কারণ, ইমাম আজম তাঁর মুসনাদে ইবনে উমর রাযি. থেকে রওযামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে সালাম প্রদানের কথা বলেছেন। ...অতঃপর বলবে, 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ, আসসালামু আলাইকা ইয়া খাইরা খালকিল্লাহ। ...অতঃপর হযরত (ﷺ)-এর ওসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরবে। ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুর তৌফিক চাইবে, ক্ষমা চাইবে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করে বলবে, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আপনার কাছে শাফায়াত চাইছি। আপনার ওসিলায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, যেন আমি আপনার মিল্লাত এবং আপনার সুন্নাতের উপর মৃত্যুবরণ করতে পারি।'[১৭০২]

শুরুম্বুলালি লিখেন, "অতঃপর হযরত রাসুলুল্লাহর দিকে মুখ করে কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবে। ধ্যান করবে—তাঁর সৌভাগ্যদৃষ্টি তোমার উপরে রয়েছে। তিনি তোমার কথা শুনছেন। তোমার সালামের জবাব দিচ্ছেন। তোমার দোয়ায় 'আমিন' বলছেন। অতঃপর বলবে—আসসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদি রাসুলাল্লাহ! আসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ! ...হে আল্লাহর রাসুল আমি দূর দেশ থেকে আপনার কাছে এসেছি আপনাকে যিয়ারত করতে; আপনার শাফায়াত পেতে; আপনার কিছু হক সামান্য আদায় করতে; আমাদের প্রতিপালকের কাছে আপনার মাধ্যমে শাফায়াত প্রার্থনা করতে। ...সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন যেন তিনি আপনার সুন্নাতের উপর আমাদের মৃত্যু দান করেন, আপনার দলে এবং আপনার পতাকাতলে হাশর করেন। আপনার হাউযে আমাদের উপস্থিত করেন এবং আপনার হাতে শীতল কাউসার পানে ধন্য করেন।'[১৭০৩]

১৭০২. ফাতহুল কাদির (৩/১৮০-১৮১)।

১৭০৩. নুরুল ইযাহ (১৫৪-১৫৫)।

অধমের পর্যবেক্ষণ : এগুলো রওযা যিয়ারতের বৈধ আদব। কিছু মানুষ এগুলোকে স্রেফ বিদআত বলেই ক্ষান্ত হননি, রীতিমতো শিরকে আকবর বানিয়ে ফেলেছেন। অথচ চার মাযহাবের বড় বড় ইমামের সর্বসম্মত বক্তব্য এটা। গ্রন্থের কলেবর দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। 'আকিদাহ তহাবিয়্যাহ'র ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এখানে স্রেফ এটুকু বলা যথেষ্ট মনে করছি যে, আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মতিক্রমে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কবরে জীবিত। সুতরাং তাঁকে সালাম দিতে হলে তাঁর দিকে ফিরেই সালাম দেওয়া আবশ্যক। এটা তাঁর প্রতি আদব। তাঁর দিকে ফিরে দোয়া করাতেও কোনো শরয়ি প্রতিবন্ধকতা নেই। কারণ, দোয়াটা তাঁর কাছে নয়, আল্লাহর কাছে করা হচ্ছে। তিনি আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের পরম বন্ধু, আত্মার আত্মীয়, অভিভাবক। তাহলে তাঁর দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কেন করব? তাঁর মুহাব্বত ও ইত্তেবা'র ওসিলা দিয়ে দোয়া করাও উত্তম কাজ। এতে দোয়া কবুলের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে।

বাকি থাকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে শাফায়াত প্রার্থনাসংক্রান্ত মাসআলা। এটি একটি জটিল ও দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ বিষয়। চার মাযহাবের অসংখ্য মুহাক্কিকের কাছে এটা বৈধ। তাদের যুক্তি—রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কবরে জীবিত। তাঁর কাছে গিয়ে সালাম প্রদান করা হলে তিনি শুনতে পান, সালামের জবাব দেন। সুতরাং তাঁর কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করা হলেও তিনি শুনবেন এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে শাফায়াত করবেন—এটুকু অসম্ভব নয়। এতে গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে প্রার্থনার কিছু নেই। কারণ, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে স্বতন্ত্রভাবে কিছু চাওয়া হচ্ছে না। তিনি নিজ থেকে তাঁকে পরকালে জান্নাত ধরিয়ে দেবেন এমন বিশ্বাস রাখা হচ্ছে না। বরং তাঁর কাছে স্রেফ বলা হচ্ছে তিনি যেন আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া ও সুপারিশ করেন—এটুকুই। ফলে চূড়ান্ত পর্যায়ে এটা আল্লাহর কাছেই দোয়া করা হচ্ছে।

অধমের মতে, বিষয়টি প্রচণ্ড স্পর্শকাতর। বিশেষত সাধারণ মানুষ রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে শাফায়াত প্রার্থনা আর দুনিয়া ও আখেরাতের অন্যান্য বস্তু প্রার্থনার মাঝে ফারাক করতে পারবে না। শাফায়াত ও সাহায্য প্রার্থনার মাঝে গুলিয়ে ফেলবে। আল্লাহর পরিবর্তে হয়তো সরাসরি রাসুলুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। একপর্যায়ে সেটা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে অন্যান্য মৃত ওলি-আউলিয়ার দিকেও বিস্তৃত হবে। মানুষ সাধারণ ওলি-আউলিয়ার কবরের কাছে গিয়েও প্রার্থনা শুরু করে দেবে। এটা বিশাল ভয়ংকর ব্যাপার।

হ্যাঁ, কিছু হাদিসে এসেছে, ‘সাধারণ মৃত ব্যক্তিকে সালাম দিলেও মৃত ব্যক্তি সালাম শুনতে পায়, সালামদাতাকে চিনতে পারে এবং তার সালামের জবাব দেয়।’[১৭০৪] ইমাম আজম রহ. বলেছেন, **‘কবরে বান্দার শরীরে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া সত্য।’**[১৭০৫] কিন্তু মৃত্যুপরবর্তী জগতের হাকিকত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই। ফলে এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে যতটুকু এসেছে, ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। কবরে মৃত ব্যক্তির দেহে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়, কবরবাসী সালামদাতাকে চিনতে পারে, সালাম শুনে জবাব দিতে পারে—এসব সত্য। কিন্তু এ যুক্তিতে তাদের কাছে কিছু চাওয়া হারাম। দোয়া চাওয়াও অনুচিত। আর যদি তাদের প্রয়োজন পূর্ণকারী বিশ্বাস করে সরাসরি তাদের কাছে প্রার্থনা করা হয়, তবে সেটা শিরক। দূর থেকে মৃত ব্যক্তিকে ডেকে কিছু প্রার্থনাও শিরক। এ ব্যাপারে মুহাক্কিক আলেমদের মাঝে দ্বিমত নেই। ফলে এসব মাসআলায় কঠোরতা করা চাই। একদিকে যেমন রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর রওযার কাছে গিয়ে ইস্তিশফা'কে শিরক বলা হবে না, আবার এগুলোকে উত্তম সাব্যস্ত করে সাধারণ মানুষকে এগুলোর প্রতি উন্মুক্ত দাওয়াত দেওয়া হবে না।

বরং এসব বিষয়ে শিথিলতা উম্মাহকে যুগে যুগে ভয়ংকর বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কবর যিয়ারতের মুস্তাহাব আমল করতে গিয়ে মুসলমানদের শিরকে লিপ্ত করেছে। কিছু মানুষ হাদিস বানিয়েছে, ‘যখন তোমরা কোনো ব্যাপারে পেরেশান হয়ে পড়ো, তখন কবরবাসীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।’[১৭০৬] নাউযুবিল্লাহ! এটা অত্যন্ত ভয়ংকর ও জঘন্য কথা; সুস্পষ্ট কবরপূজার আহ্বান। পেরেশান হলে আল্লাহর কাছে ছুটে যেতে হবে। হাদিসে এসেছে—রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর যখনই কোনো পেরেশানি আসত, তিনি মসজিদে ছুটে যেতেন, নামায আদায়

১৭০৪. আল-ইসতিযকার, ইবনে আবদিল বার (১/১৮৫)। হাদিসটির সনদ সহিহ। ইবনে আবদিল বার ছাড়াও ইমাম আহমদ এবং অন্যান্য আলেম কাছাকাছি অর্থে একাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর সারকথা হলো—মৃত ব্যক্তি জীবিতদের আওয়াজ শুনতে পায়। পরিচিত হলে তাকে চিনতে পারে। সালাম শোনে এবং সালামের জবাব দেয়। কিন্তু এগুলোকে সালাম পর্যন্তই রাখতে হবে। কবরে থেকে মৃত ব্যক্তি জীবিতদের দেখতে পায়, বাড়িতে চলে আসে, মৃত ব্যক্তি জীবিতদের যেকোনো কথা শুনতে পারে এবং তার প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে—এসব আকিদার অনিবার্য পরিণতি শিরক।

১৭০৫. আল-ফিকহুল আকবার (৭)।

১৭০৬. এ-সম্পর্কিত সমালোচনা দেখুন : আকিদাহ রুকনিয়্যাহ (৫১)।

করতেন।[১৭০৭] আর এখানে পেরেশান হলে কবরস্থানে ছুটে গিয়ে মৃতদের কাছে করুণা-ভিক্ষার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে। উপরন্তু সেটা আল্লাহর রাসুলের হাদিস বলে চালানো হচ্ছে! ফলে কবরকেন্দ্রিক বিষয়ে ঈমান রক্ষার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা আবশ্যক।

বিদআতের সংজ্ঞা ও পরিচয়

ইমাম আজম রহ. তথা তাবেয়িদের যুগে উম্মাহর মাঝে শিরকের মতো (আমলি) বিদআতের পরিমাণও ছিল অত্যন্ত কম। ফলে এ ব্যাপারে ইমাম আজম রহ.-এর লম্বা আলোচনা পাওয়া যায় না। যেহেতু এই গ্রন্থ ইমাম আজমের আকিদার জন্য নিবেদিত, তাই বিদআত বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। বরং কেবল ইমাম আজম রহ.-সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়, তাঁর কিছু বক্তব্য এবং এ বিষয়ে হানাফি মাযহাবের কিছু মাসআলা পেশ করব, ইনশাআল্লাহ।

বিদআত (البدعة) শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো নতুন আবিষ্কার, নব আবিষ্কৃত বস্তু। শরয়ি পরিভাষায় এর অর্থ নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা, পর্যালোচনা, মতামত ও মতভেদ রয়েছে, আলোচ্য গ্রন্থে যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। আল্লামা শুরুম্বুলালি শুমুন্নির উদ্ধৃতিতে বিদআতের সংজ্ঞায় লিখেন, 'রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আনীত ইলম, আমল ও পদ্ধতির বিপরীতে নতুন কোনো ইলম, আমল বা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। সংশয়ের কারণে হোক কিংবা সৎ উদ্দেশ্যে হোক, যখন এমন কিছুকে দ্বীন ও সিরাতে মুস্তাকিম বানিয়ে ফেলা হবে, তখন সেটা বিদআত গণ্য হবে।'[১৭০৮] এটা বিদআতের স্পষ্ট সংজ্ঞা; কোনো অস্পষ্টতা নেই। ফলে ইলম, আমল, মানহাজ—সবকিছু বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে যদি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে প্রমাণিত নয় এমন কোনো বিষয়কে দ্বীনের অংশ বানানো হয়।

শাতেবি বিদআতের সুন্দর অর্থ লিখেছেন, যা বিদআতের সূক্ষ্ম, সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেশ করে। শাতেবি লিখেন, 'বিদআত হলো দ্বীনের মাঝে শরিয়ত-সদৃশ নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন, যার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন।' উক্ত সংজ্ঞার্থের মাধ্যমে কয়েকটি জিনিস স্পষ্ট হয়।

১৭০৭. আবু দাউদ (কিতাবুস সালাত : ১৩১৯)। মুসনাদে আহমদ (মুসনাদুল আনসার : ২৩৭৭৩)।
১৭০৮. গুনইয়াতু যাবিল আহকাম (১/৮৫) [দুরারুল হুক্কামের সঙ্গে সংযুক্ত হাশিয়া]।

এক. বিদআত কেবল দ্বীনি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে। পৃথিবীর জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিত্যনতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা বিদআত নয়। এ কারণে গাড়িতে চড়া বিদআত হবে না, ভাত-বিরিয়ানী খাওয়া বিদআত হবে না, মোবাইল বা মাইক চালানো বিদআত গণ্য হবে না। কারণ, এগুলো দ্বীনি বিষয় নয়।

দুই. শরিয়তের মাঝে সম্পূর্ণ নতুন উদ্ভাবিত হতে হবে। অর্থাৎ, শরিয়তের সঙ্গে এর কোনো পূর্বসম্পর্ক কিংবা ভিত্তি (الأصل) না থাকতে হবে। কিন্তু যদি শরিয়তের উসুলের আলোকে উদ্ভাবিত হয়, তবে সেটা বিদআত হবে না। এ কারণে নাহু, সরফ, আকিদা, উসুলুল ফিহহ ইত্যাদি শেখা ও চর্চা করা বিদআত হবে না। মাদরাসায় নির্দিষ্ট সিলেবাসে পড়া বিদআত হবে না। কারণ, এগুলোর মূল ভিত্তি কুরআন-সুন্নাহতে বিদ্যমান।

তিন. শরিয়তসদৃশ হতে হবে। অর্থাৎ, শরিয়তে যেমন ইবাদতের নির্দিষ্ট সময় ও পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে, ইবাদতের জন্য এ ধরনের বিশেষ সময়, অবস্থা ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা। যেমন—বিশেষ কোনো দিন বিশেষ বিশ্বাসের সঙ্গে নিয়ম করে রোযা রাখা অথচ শরিয়তে এ ধরনের রোযার কথা বলা হয়নি। বিশেষ কোনো পদ্ধতিকে ইবাদত মনে করে সর্বদা সে পদ্ধতিতে জিকির করা যে পদ্ধতি শরিয়তে বলা হয়নি। বিশেষ কোনো দিনে কোনো বিশেষ ধর্মীয় আচার নিয়মতান্ত্রিকভাবে পালন করা। কিন্তু এমন সাদৃশ্য ছাড়া এমনিতেই কোনো বিশেষ দিনে রোযা রাখলে কিংবা হঠাৎ এমনিতেই বিশেষ পদ্ধতিতে জিকির করলে সেটা বিদআত হবে না।

চার. উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর বেশি ইবাদত। সুতরাং ইবাদতের নিয়তে নতুন বিষয় সংযোজন করলে বিদআত হবে, বাহ্যত সেটা দ্বীনি বিষয় না হলেও। যেমন—ইবাদতের নিয়তে বিশেষ কোনো পোশাক পরা কিংবা বিশেষ কোনো খাবার খাওয়া! বাহ্যত এগুলো দ্বীনি কাজ না হলেও বিদআত হওয়ার কারণ ইবাদতের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, ইবাদতের উদ্দেশ্যের বিদ্যমানতা নিছক দুনিয়াবি কাজটাকেও 'দ্বীনি' বিষয় এবং 'শরিয়তসদৃশ' করে দিচ্ছে, ফলে সেটা বিদআতে পরিণত হবে। কিন্তু ইবাদতের নিয়ত না থাকলে সেটা সাধারণ আচার-অভ্যাস কিংবা সাধারণ কর্ম হিসেবে গণ্য হবে।[১৭০৯]

বিদআত থেকে রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সতর্কবার্তা

উলামায়ে কেরামপ্রদত্ত বিদআতের বিভিন্ন সংজ্ঞার্থের মূল ভিত্তি হলো রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কিছু হাদিস। যেমন—আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

---

১৭০৯. দেখুন : আল-ইতিসাম, শাতেবি (১/৪৭-৫৫)।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মাঝে এমন কোনো নতুন বিষয় যোগ করল যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটা প্রত্যাখ্যাত হবে।'[১৭১০] এই নবসৃষ্ট প্রত্যাখ্যাত বিষয়টিই বিদআত।

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'মনে রেখো, সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কালাম (কুরআন)। আর সর্বোত্তম হেদায়াত হচ্ছে রাসুলুল্লাহর হেদায়াত (সুন্নাত)। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে দ্বীনের মাঝে নবসৃষ্ট বিষয়গুলো। প্রত্যেক নবসৃষ্ট বিষয় বিদআত। প্রত্যেক বিদআত গোমরাহি। আর প্রত্যেক গোমরাহির পরিণতি হলো জাহান্নাম।'[১৭১১]

ইরবাজ ইবনে সারিয়াহ থেকে বর্ণিত, 'একদিন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামাযশেষে আমাদের দিকে ফিরে গুরুগম্ভীর ওয়াজ করলেন। তাতে অশ্রু প্রবাহিত হলো, হৃদয় কম্পিত হলো। কেউ বলল, হে আল্লাহর রাসুল, মনে হচ্ছে আপনি বিদায়ের ওয়াজ করলেন! আমাদের প্রতি আপনার ওসিয়ত কী? রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি তোমাদের তাকওয়া ও আনুগত্যের ওসিয়ত করছি, একজন হাবশি দাসকেও (তোমাদের শাসক বানানো হলে তার আনুগত্য করবে)। কেননা, আমার পরে তোমাদের যারা বেঁচে থাকবে, প্রচণ্ড মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরবে। সেগুলো তোমরা মজবুতভাবে ধরে রাখবে। দাঁত কামড়ে পড়ে থাকবে। সাবধান! (দ্বীনের মাঝে) নবসৃষ্ট বিষয়গুলো থেকে তোমরা বেঁচে থাকো। কারণ, (দ্বীনের ক্ষেত্রে) প্রত্যেক নবসৃষ্ট বিষয় বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা।'[১৭১২]

আলি রাযি. রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, অথবা নতুন কিছু সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেবে (অর্থাৎ, বিদআত শুরু করবে কিংবা বিদআতিকে আশ্রয় দেবে), তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত!'[১৭১৩]

১৭১০. বুখারি (কিতাবুস সুলহ : ২৬৯৭)। মুসলিম (কিতাবুল আকযিয়াহ : ১৭১৮)।

১৭১১. মুসলিম (কিতাবুল জুমুআহ : ৮৬৭)।

১৭১২. আবু দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ : ৪৬০৭)। দারেমি (মুকাদ্দিমা : ৯৬)। ইবনে হিব্বান (মুকাদ্দিমা : ৫)। একদল মুহাক্কিক আলেম যেটাকে 'বিদআতে হাসানাহ' বলেছেন, সেটা আসলে বিদআতই নয়। শব্দের প্রতি লক্ষ করে তারা সেগুলোকে বিদআতে হাসানাহ বলেছেন। নতুবা সকল প্রকারের বিদআত সাইয়্যিআহ তথা মন্দ। বিদআতের ভিতরে কল্যাণকর কিছু নেই।

১৭১৩. বুখারি (ফাযায়িলুল মদিনা : ১৮৭০)। মুসলিম (কিতাবুল হজ : ১৩৭১)।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, 'সর্বোত্তম হেদায়াত হলো আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর হেদায়াত। সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কথা। অতি শীঘ্রই তোমরা দ্বীনে নতুন বিষয় সৃষ্টি করবে। তোমাদের জন্য নতুন বিষয় সৃষ্টি করা হবে। মনে রেখো, প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি (বিদআত) গোমরাহি। আর প্রত্যেক গোমরাহির পরিণতি জাহান্নাম।'[১৭১৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সুতরাং যখন তোমাদের মাঝে কোনো বিদআত সৃষ্টি করা হবে, তখন তোমরা সেটা বর্জন করে প্রথম যুগের হেদায়াত আঁকড়ে ধরবে। আহলে কিতাব (তথা ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা) মূলত এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তাদের হৃদয় এগুলো ভালোবেসেছে। তাদের মুখ এগুলোকে মিষ্টি মনে করেছে। শতাব্দের পর শতাব্দ তারা এগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে বহন করেছে। অথচ হক অত্যন্ত ভারী। ফলে একপর্যায়ে তারা আল্লাহর কিতাবকে পিছনে ছুড়ে ফেলেছে। অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আজ তারা কিছুই জানে না।'[১৭১৫]

এ কথা স্পষ্ট যে, উম্মতে মুহাম্মাদি বিদআত আঁকড়ে ধরলেও অভিন্ন পরিণতি তৈরি হবে। উম্মত সুন্নাত বাদ দিয়ে বিদআতের মাঝে ডুবে যাবে। দুঃখজনকভাবে উম্মতের বিভিন্ন অংশে এমন হৃদয়বিদারক বাস্তবতা তৈরি হয়েছেও। বরং একটি অংশ তো শিরক ও বিদআতের মাঝে এমনভাবে ডুবে গেছে যে, তাদের মাঝে আর পৌত্তলিক ধর্মের অনুসারীদের মাঝে ফারাক করা কঠিন।

বিদআতের বিরুদ্ধে ইমাম

ইমাম আজম রহ. বিদআত থেকে শক্তভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি নিজস্ব সূত্রে এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর একাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাম্মাদ→ ইবরাহিম→ আলকামা→ ইবনে মাসউদ সূত্রে) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, **'যে ব্যক্তি ইসলামে নতুন কিছুর উদ্ভাবন করবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যে কোনো বিদআতের সূচনা করবে, সে গোমরাহ হয়ে যাবে। আর গোমরাহের পরিণতি হলো জাহান্নাম।'**[১৭১৬]

১৭১৪. শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালাকায়ি (১/৮৬)।

১৭১৫. আল-ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৮৬)।

১৭১৬. আল-উসুলুল মুনিফাহ (৯)।

ইমাম আজম হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে মাসউদ রাযি. বলতেন, **'সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে (দ্বীনের মাঝে) নব আবিষ্কৃত বিষয়। প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বিষয় বিদআত। প্রত্যেক বিদআত গোমরাহি। প্রত্যেক গোমরাহির পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম।'**[১৭১৭]

ইমাম আরও বলেন, **'তোমরা যেসব বস্তু শিখছ এবং মানুষকে শেখাচ্ছ, তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম (ইলম) হলো সুন্নাহ। মানুষের আবিষ্কৃত বিদআতের মাঝে হেদায়াত নেই। হেদায়াত তো কেবল কুরআন, রাসুলুল্লাহর সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের পথে। এ ছাড়া সবই দ্বীনের ক্ষেত্রে সংযোজন। বিদআত।'**[১৭১৮] ইমাম আরও বলেন, **'সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো। সালাফের অনুসরণ করো।** প্রত্যেক নবসৃষ্ট বিষয় থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, সেগুলো বিদআত।'[১৭১৯]

ইমাম আজম মাইমুন ইবনে মিহরান থেকে ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন, একব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে আপনি শিক্ষা দিন। তিনি বললেন, 'যাও, কুরআন শেখো।' তাকে তিনি তিনবার এ কথা বললেন। অতঃপর চতুর্থবার বললেন, 'বন্ধু হোক কিংবা শত্রু হোক, সত্য যার কাছেই পাও, গ্রহণ করে নাও। কুরআন শেখো। কুরআনের পথে চলো।'[১৭২০]

কবরকেন্দ্রিক বাড়াবাড়ি : এত সতর্কতা সত্ত্বেও উম্মাহ সালাফের যুগ থেকে যত দূরে সরে যায়, বিভিন্ন বিদআত তাদের ঘিরে ধরে। এর মাঝে সবচেয়ে মারাত্মক ছিল কবরকেন্দ্রিক নানা বিদআত, যে সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) জীবনের শেষ দিনগুলোতেও সতর্ক করে গিয়েছেন।

খোদ ইমাম আজম, অন্যকথায়, তাঁর কবরকে ঘিরেই বিভিন্ন বিদআত সংঘটিত হয়েছে। ১৫০ হিজরিতে বাগদাদে ইন্তিকাল করলে সেখানেই ইমামকে দাফন করা হয়। প্রায় তিনশত বছর কবরটি একরকমই থাকে। অতঃপর ৪৫৩ হিজরিতে ইমামের কবরের উপর বিশাল গম্বুজ তৈরি করা হয়, অথচ ইমাম নিজেই এগুলো নিষেধ করতেন। হানাফি মাযহাবমতে কবর পাকা করা নিষিদ্ধ। ইমাম আবু হানিফা কবরের উপর কোনো অবকাঠামো নির্মাণ কিংবা কোনো নির্দেশক

১৭১৭. আল-ফিকহুল আবসাত (৫২-৫৩)।

১৭১৮. আর-রিসালাহ (৩৫)।

১৭১৯. যাম্মুল কালাম ওয়া আহলিহি (৫/২০৭)।

১৭২০. আল-ফিকহুল আবসাত (৫২-৫৩)।

তৈরি করা অপছন্দ করতেন (যেমন—গম্বুজ, মিনার, পতাকা ইত্যাদি)। ইমাম আবু ইউসুফ কবরের উপর সব ধরনের লেখালিখিকে মাকরুহ বলতেন। কেননা, এগুলো হাদিসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা কবরে চুনকাম করো না। কবরের উপর ভবন নির্মাণ করো না। কবরের উপর বসো না। কবরে কিছু লিখো না।' হানাফি উলামায়ে কেরাম আরও লিখেছেন—কবরে এসব করা সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; কিন্তু মৃত ব্যক্তির এসব নিষ্প্রয়োজন। উপরন্তু এগুলোতে অনর্থক অর্থ নষ্ট হয়। ফলে এগুলো মাকরুহ (তাহরিমি) হবে।[১৭২১]

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ এবং কবরে বাতি প্রজ্জ্বলন : পরবর্তী যুগের একদল আলেম এক্ষেত্রে শৈথিল্যের শিকার হয়েছেন। তাদের মতে, কোনো উজর ছাড়া কবরের উপর কিংবা কবরস্থানের ভিতরে মসজিদ নির্মাণ কিংবা মসজিদের ভিতরে কাউকে দাফন, ওলির কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সেখানে বাতি প্রজ্বলন, চাদর চড়ানো, ফুল প্রদান, কবরকেন্দ্রিক উরস-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বৈধ। অথচ মুহাক্কিক আলেমদের মতে এগুলো বৈধ হওয়ার কোনো যুক্তি বা সুযোগ নেই!

হযরত গঙ্গুহি রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর রওযার উপরেও তো অবকাঠামো রয়েছে, চতুর্দিকে বাতি লাগানো হয়েছে। তাহলে এটা নিষিদ্ধ হয় কী করে? বড় বড় সাহাবার কবরও এমন বিশাল স্থাপত্যের মাঝে বিদ্যমান। এগুলোর বিধান কী? তিনি বললেন, 'এ সবকিছু অবৈধ। কোনো মুহাক্কিক ও মাকবুল আলেম এগুলো করেননি। বরং এগুলো রাজা-বাদশাহদের কাজ। তা ছাড়া, কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত সকল কথা ও কাজ পরিত্যাজ্য। কে বলল কিংবা কে করল সেটা দেখার বিষয় নয়।'[১৭২২]

কবরস্থানে কুরআন তেলাওয়াতের বিধান : ইমাম আজম রহ.-এর মতে, কবরের কাছে কুরআন তেলাওয়াত মাকরুহ। ইমাম আবু ইউসুফও এটাকে মাকরুহ বলেছেন। তবে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বৈধ বলেছেন। এ কারণে পরবর্তী হানাফি উলামায়ে কেরাম ইমাম মুহাম্মাদের অনুসরণে এটাকে বৈধ বলেছেন।

ইবনুল হুমাম লিখেন, 'কবরের পাশে কুরআন তেলাওয়াতের বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। তবে গ্রহণযোগ্য কথা হলো—এটা মাহরুহ নয়।'[১৭২৩] আল্লামা উশি

১৭২১. আল-মুহিতুল বুরহানি (২/১৯৩)। বাদায়েউস সানায়ে (১/৩২০)।

১৭২২. ফাতাওয়া রশিদিয়া (১৫২)।

১৭২৩. ফাতহুল কাদির (২/১৪২)।

লিখেন, ‘কবরের কাছে কুরআন পড়া আবু হানিফার মতে মাকরুহ, মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে মাকরুহ নয়। এটার উপরই (মাযহাবের) ফাতাওয়া।’[১৭২৪] কাসানি লিখেন, ‘কবর যিয়ারত এবং সেখানে কুরআন পড়া রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মুসলমানদের সর্বসিদ্ধ আমল।’[১৭২৫]

পরবর্তীকালে সময় যত গড়িয়েছে, বৈধতা থেকে বিষয়টি মুস্তাহাবের দিকে গিয়েছে। পরবর্তী আলেমগণ এটাকে মুস্তাহাব ও ফযিলতের কাজ আখ্যা দিয়েছেন, যদিও প্রথম যুগের আলেমগণ এমন বলেননি। তারা কবরস্থানে নির্দিষ্ট সুরা ও আয়াত তথা ইয়াসিন, মুলক, বাকারার প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো এবং সুরা ইখলাস পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন।[১৭২৬] ইবনে নুজাইম লিখেন, ‘কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। বরং অন্য দোয়ার চেয়ে উত্তম। যিয়ারতকারীর দোয়া ও তেলাওয়াতের ওসিলায় আল্লাহ কবরের আযাব হালকা করে দেবেন কিংবা একেবারে বন্ধ করে দেবেন এটাও সম্ভব।’[১৭২৭] শুরুম্বুলালি বলেন, ‘কবরের পাশে ইয়াসিন পড়া মুস্তাহাব...। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কবরের পাশে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য বসা মাকরুহ নয়।’[১৭২৮]

অধমের পর্যবেক্ষণ : তবে এ ব্যাপারে তাহকিকি কথা হলো, বিষয়টি উন্মুক্ত না করে আমাদের আসলাফ তথা ইমাম আজমের বক্তব্যের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ, (এক.) হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, মৃত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তির সালাম শুনতে পায় এবং উত্তর দেয়। ইমাম আজম রহ.-এর মতে, কবরে মৃত ব্যক্তির রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। (দুই.) স্থানগত দিক থেকে শরিয়তে কবরস্থানে কুরআন তেলাওয়াত নিষেধাজ্ঞার মতো কোনো উপাদান নেই। কারণ, জায়গাটা নোংরা কিংবা কুরআনের শানের জন্য অনুপযুক্ত নয়। (তিন.) কুরআন তেলাওয়াত এক ধরনের দোয়া, বরং সর্বোত্তম দোয়া। আর কবরস্থানে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া পড়া বৈধ। ফলে কবরের পাশে কুরআন তেলাওয়াত বৈধ হওয়া যৌক্তিক।

১৭২৪. ফাতাওয়া সিরাজিয়্যাহ (৩১৩)।

১৭২৫. বাদায়েউস সানায়ে (২/২১২)।

১৭২৬. আল-মুহিতুল বুরহানি (৫/৩১১)। হাশিয়াতুত তাহতাভি (৬২১)।

১৭২৭. আল-বাহরুর রায়েক (২/৩৪৩)।

১৭২৮. নুরুল ইযাহ (৯৮)।

তবে যেহেতু হুবহু এ পদ্ধতিটা (তথা সরাসরি কুরআন তেলাওয়াত) রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবা থেকে প্রমাণিত নয়, ফলে এটাকে সুন্নাত ও ইবাদত মনে করে নিয়মিত আমলের অংশ বানানো উচিত হবে না। মুহাক্কিক হানাফি আলেমদের বক্তব্যের সারমর্মও এটা। মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখি বলেন, 'কবরস্থানে নিম্নস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করলে মাকরুহ হবে না। কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করলে মাকরুহ হবে। হ্যাঁ, যদি কবরবাসীকে তেলাওয়াত শুনিয়ে তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে পড়ে, তবে বৈধ।'[১৭২৯]

এ বক্তব্যে স্পষ্ট যে, তেলাওয়াতের পদ্ধতিটাকে ইবাদত বা সুন্নাত মনে করা হচ্ছে না, বরং মূল উদ্দেশ্য ইসালে সওয়াব। এ কারণেই নিম্নস্বরে তেলাওয়াতের কথা বলা হয়েছে। আর ইমাম আজম এবং হানাফি মাযহাবমতে ইসালে সওয়াবের জন্য কুরআন তেলাওয়াত মসজিদ, ঘর কিংবা দোকান—সর্বত্র করা যায়। সুতরাং কবরস্থানেও করা যাবে। হ্যাঁ, যেহেতু মৃত ব্যক্তি জীবিতদের আওয়াজ শুনতে পায়, তাই তাকে শোনানোর উদ্দেশ্যে যদি উচ্চৈঃস্বরে পড়ে, তবে তাতে অসুবিধা নেই। কাযিখান একই কথা স্পষ্ট করে লিখেন, 'যদি কবরবাসীকে তেলাওয়াত শুনিয়ে তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যে কবরের পাশে কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তবে করা যেতে পারে। যদি ইসালে সওয়াব উদ্দেশ্য হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা সকল জায়গার তেলাওয়াত শুনতে পান (কবরের পাশে তেলাওয়াত নিষ্প্রয়োজন)।'[১৭৩০] কিন্তু যদি পদ্ধতিটাকেই সুন্নাত মনে করা হয়, তবে সেটা বিদআত হবে।

মোটকথা, কবরস্থানে কুরআন পড়াকে একবাক্যে বিদআত বলে দেওয়া সঠিক নয়, যেমনটা একদল আলেম নির্বিচারে সবগুলোকে বিদআত গণ্য করে থাকেন। খোদ সাহাবা ও তাবেয়িন থেকে কবরের কাছে কুরআন তেলাওয়াতের ওসিয়ত পাওয়া যায়। তাহলে এটাকে একবাক্যে বিদআত বলা যায় কীভাবে? যেমন—ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি মৃত্যুর আগে ওসিয়ত করে যান যেন তার কবরের কাছে সুরা বাকারা পাঠ করা হয়। ইমাম আহমদ প্রথমে এটা নিষেধ করতেন। এ জন্য এক অন্ধ ব্যক্তিকে তিনি কবরের কাছে কুরআন পাঠ করতে দেখে বলেন, এটা বিদআত! পরে মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা তাকে বলেন, আবদুর রহমান ইবনুল আলা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি মৃত্যুর আগে

১৭২৯. আল-মুহিতুল বুরহানি (৫/৩১১)।

১৭৩০. ফাতাওয়া কাযিখান (৩/৩২৬)।

ওসিয়ত করে যান যেন দাফনের সময় তার মাথার কাছে সুরা বাকারার প্রথম ও শেষ অংশ তেলাওয়াত করা হয়। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরকে এমন ওসিয়ত করতে শুনেছি! এটা শুনে ইমাম আহমদ বলেন, যাও! লোকটিকে গিয়ে বলো সে যেন কুরআন তেলাওয়াত করে! ইমাম শাফেয়ি রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কবরের কাছে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি না? তিনি বললেন, 'কোনো সমস্যা নেই।'[১৭৩১]

সুতরাং কবরের কাছে কুরআন তেলাওয়াত ইমাম মুহাম্মাদ, শাফেয়ি, ও আহমদের মতে বৈধ। পরবর্তী ইমামদের মাঝে কাযি ইয়ায ও কারাফিও এটাকে বৈধ লিখেছেন। হানাফি উলামায়ে কেরামের সকলে বৈধ এবং কেউ কেউ মুস্তাহাব পর্যন্ত লিখেছেন। তারা সাহাবির আমল ও ইস্তিহসানের ভিত্তিতে এটা বলেছেন। ফলে এটাকে একবাক্যে বিদআত বলে দেওয়ার সুযোগ নেই। বিপরীতে ইমাম আজম ও আবু ইউসুফ রহ. এটাকে মাকরুহ (তাহরিমি) বলতেন। ইমাম মালেকও মাকরুহ বলতেন। তারা মনে করতেন এটা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়। অসম্ভব নয় যে, ইবনে উমরের বক্তব্য তাদের কাছে পৌঁছয়নি কিংবা পৌঁছলেও সেটাকে বিশুদ্ধ গণ্য করেননি। খোদ ইমাম আহমদ থেকেও কবরের কাছে তিলাওয়াত সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা রয়েছে।[১৭৩২]

তাই যদি ইসালে সওয়াব উদ্দেশ্য হয়, তবে কবরস্থানে কুরআন পড়া নিষ্প্রয়োজন। পড়লেও নিম্নস্বরে পড়া উচিত। যদি মৃতদের শুনিয়ে তাদের প্রফুল্ল এবং তাদের চিত্ত প্রশান্ত করা উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটা করা মুবাহ (বৈধ) হবে। আর যদি কবরের পাশে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পড়াটাই কবর যিয়ারতের সুন্নাতের অংশ কিংবা অতিরিক্ত পুণ্যের মাধ্যম মনে করা হয়, তবে সেটা মাকরুহ তাহরিমি বা নিষিদ্ধ হবে, যেমনটা ইমাম আজম ও আবু ইউসুফের মত। কারণ, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরাম সচরাচর এমন করতেন না। এটা সালাফে সালেহিনের আমলও নয়। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে সুন্নাত ও সালাফের যত কাছাকাছি থাকা যায়, তত উত্তম।

১৭৩১. দেখুন : আর-রুহ, ইবনুল কাইয়িম (২১-২২, ১৭৪)।

১৭৩২. দেখুন: আবু দাউদের বর্ণনায় 'মাসায়েলুল ইমাম আহমদ' (১৫৮)।

বিবিধ মাসআলা

মোজার উপর মাসাহ করা

মোজার উপর মাসাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের শিআর তথা পরিচিতিমূলক নিদর্শন। এটায় বিশ্বাস ও আমল তাদের বিভিন্ন বিভ্রান্ত বিদআতি ফিরকা থেকে আলাদা করে। এ কারণে বিষয়টি ফিকহি হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আজম রহ.-এর একাধিক গ্রন্থে এ-বিষয়ক আলোচনা এসেছে।

ইমাম আল-ফিকহুল আকবারে বলেন, **'মোজার উপর মাসাহ করা সুন্নাত।'**[১৭৩৩] আল-ওয়াসিয়্যাহতে বলেন, **'আমরা বিশ্বাস করি, মোজার উপর মাসাহ করা ওয়াজিব। মুকিমের জন্য এক দিন এক রাত। মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত। এমনটাই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে, তার ব্যাপারে কুফরের আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, এ-সংক্রান্ত বিধানের হাদিস মুতাওয়াতিরের কাছাকাছি।'**[১৭৩৪] এখানে ওয়াজিব হওয়ার অর্থ মাসাহ করা ওয়াজিব নয়, বরং এটা শরিয়তের অংশ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। ইমাম তহাবি রহ. বলেন, 'আমরা সুন্নাহর আলোকে ঘরে ও সফরে মোজার উপর মাসাহকে জায়েয মনে করি।'[১৭৩৫]

কেবল ইমাম ইমাম আজম বা তহাবি নন, আহলে সুন্নাতের অধিকাংশ আকিদার গ্রন্থে উক্ত মাসআলাটি বর্ণনা করা হয়। উদ্দেশ্য আহলে সুন্নাতকে রাফেযি, খারেজিসহ বিভিন্ন গোমরাহ ফিরকা থেকে আলাদা করা।

রাফেযি, খারেজিসহ বিভিন্ন ভ্রান্ত সম্প্রদায় মোজার উপর মাসাহ বৈধ মনে করে না; বরং সরাসরি পা মাসাহ করে। ইমাম আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত, 'মোজার

১৭৩৩. আল-ফিকহুল আকবার (৫)।

১৭৩৪. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৫০)।

১৭৩৫. আকিদাহ তহাবিয়্যাহ (২৫)।

উপর মাসাহের বৈধতা অস্বীকারকারী কাফের। কারণ, এটা তাওয়াতুর সূত্রে প্রমাণিত।' হানাফি ফকিহদের মতে, যে ব্যক্তি মোজার উপর মাসাহ অস্বীকার করবে, তার পিছনে নামায পড়া যাবে না।[১৭৩৬] কামাল ইবনুল হুমাম লিখেন, 'মোজার উপর মাসাহ অস্বীকারকারীর পিছনে নামায পড়া যাবে না।'[১৭৩৭]

একটি বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, শাইখাইন (তথা আবু বকর ও উমর)-কে শ্রেষ্ঠ বলা। খাতানাইন (রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর দুই জামাতা তথা উসমান ও আলি)-কে ভালোবাসা। **মোজার উপর মাসাহ করা।** সৎ-অসৎ প্রত্যেক মুসলমানের পিছনে নামায আদায় করা।[১৭৩৮]

বস্তুত মোজার উপর মাসাহ সুন্নাহ দ্বারা দিবালোকের মতো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। গোমরাহ ছাড়া অন্য কেউ এটাকে অস্বীকার করতে পারে না। এ জন্য কারখি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মোজার উপর মাসাহ অস্বীকার করে, তার ব্যাপারে আমার কুফরির আশঙ্কা হয়। কারণ, এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদিস এবং সাহাবিদের বর্ণনা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে।'[১৭৩৯]

সংশয় নিরসন : যেমনটা বলা হয়েছে—খারেজি ও শিয়া সম্প্রদায় মোজার উপর মাসাহকে স্বীকার করে না। তাদের মতে, মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ নয়। তারা কিছু সাহাবির বক্তব্য দিয়ে দলিল দেয়। যেমন—ইবনে আব্বাসের বক্তব্য, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সুরা মায়িদা অবতরণের পর থেকে কখনো মাসাহ করেননি! আয়েশা রাযি. বলেন, মোজার উপর মাসাহ করার চেয়ে আমার দুই পা কেটে ফেলা বেশি পছন্দ করি! উক্ত সংশয়ের জবাব হলো, তারা মোজার উপর মাসাহের বৈধতা সম্পর্কে তখন জানতেন না। পরবর্তীকালে যখন জানতে পারেন, তখন সবাই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৭৪০]

১৭৩৬. আল-জাওহারাতুল মুনিফাহ (৭৫-৭৬)।

১৭৩৭. ফাতহুল কাদির (১/৩৫০)।

১৭৩৮. শরহুল ফিকহিল আকবার, মাগনিসাভি (১৪১)।

১৭৩৯. আল-মাবসুত, সারাখসি (১/৯৮)।

১৭৪০. দেখুন : শরহুল ওয়াসিয়্যাহ, বাবিরতি (১১৭-১১৮)।

রমযান মাসে তারাবিহ পড়া সুন্নাত

ইমাম আজম রহ.সহ আহলে সুন্নাতের আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে রমযানের রাতগুলোতে তারাবিহ পড়া সুন্নাত। ইমাম আজম বলেন, **'রমযান মাসের রাতের বেলা তারাবিহ পড়া সুন্নাত।'**[১৭৪১] তারাবিহের রাকাতসংখ্যা নিয়ে আলেমদের দ্বিমত থাকলেও হাদিস, সাহাবাদের বক্তব্য এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলের মাধ্যমে প্রমাণিত বিশুদ্ধতর কথা হলো, তারাবিহর নামায বিশ রাকাত। ইশা ও বিতরের নামায এর বাইরে।

প্রশ্ন আসতে পারে, আকিদার কিতাবে নামাযের ব্যাপারে আলোচনা করার কারণ কী? এটা মূলত আগের মাসআলার মতো রাফেযিদের খণ্ডনে। তারা তারাবিহর নামায অস্বীকার করে। উমর রাযি.-এর প্রতি বিদ্বেষবশত তারাবিহকে বিদআত বলে উমরকেও তারা বিদআতি সাব্যস্ত করতে চায়। কিন্তু উম্মাহর কাছে তাদের এ ষড়যন্ত্র স্পষ্ট। ফলে তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যাত।

মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল বলখি লিখেন, 'তারাবিহর নামায সুন্নাত। শরিয়তে প্রমাণিত। যে এটা অস্বীকার করবে, সে রাফেযি গণ্য হবে।'[১৭৪২] সারাখসি লিখেন, 'গোটা উম্মত তারাবিহের বৈধতার ব্যাপারে একমত। রাফেযিরা ছাড়া কোনো আলেম এটাকে অস্বীকার করেনি।'[১৭৪৩]

১৭৪১. আল-ফিকহুল আকবার (৫)।

১৭৪২. আল-ইতিকাদ (১১০)।

১৭৪৩. আল-মাবসুত (২/১৪৩)।

আত্মশুদ্ধি এবং উন্নত জীবন গঠন

তাত্ত্বিকতা ছেড়ে সুলুকের সন্ধান আবশ্যক

ইসলাম স্রেফ তাত্ত্বিকতা নয়; ইসলামি আকিদা স্রেফ কিছু তত্ত্ব ও তথ্য জানার নাম নয়; বরং এটা বিশ্বাস ও আমলের নাম, জীবনে বাস্তবায়িত করার নাম। এ জন্য কুরআন-সুন্নাহর সর্বত্র ঈমানের সঙ্গে আমলকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ঈমান ও আমল দুটোর সমন্বয়কারীদের প্রশংসা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ অর্থ : 'যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের মেহমানদারির জন্য আছে জান্নাতুল ফিরদাউস।' [কাহাফ : ১০৭] আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾ অর্থ : 'তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাদের আমার নিকটবর্তী করে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।' [সাবা : ৩৭]

আল্লাহ তায়ালা মুমিনের জীবনে ঈমানের প্রভাব সম্পর্কে বলেন, ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝١ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝٣ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝٤﴾ অর্থ : তারা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসুলের। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করো। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। (মুমিন তারা) যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের

উপরই নির্ভর করে। যারা নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে, তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।'[আনফাল : ১-৪]

বিভিন্ন হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মানুষকে ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে আমল ও আখলাক শিক্ষা দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আবদুল কাইসের প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের বললেন, 'তোমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। তোমরা কি জানো এক আল্লাহর উপর ঈমান কী?' তারা বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ভালো জানেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসুল'—এ সাক্ষ্য দেওয়া, নামায আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা এবং গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ দান করা।[১৭৪৪]

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কালিমার পাশাপাশি লজ্জাকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। রাস্তা থেকে ময়লা-আবর্জনা সরিয়ে ফেলাকে ঈমানের শাখা সাব্যস্ত করেছেন।[১৭৪৫] নিজের জন্য যা পছন্দ অন্যের জন্য সেটা পছন্দ করাকে ঈমান বলেছেন। এমন না করা পর্যন্ত কেউ মুমিন হতে পারবে না বলে সতর্ক করেছেন।[১৭৪৬] আরেক হাদিসে বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয় (তিনবার বললেন) যার প্রতিবেশীরা তার অনাচার থেকে মুক্ত না থাকে।'[১৭৪৭]

ফলে ঈমানের সঙ্গে আমল, আদব ও আখলাকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রকৃত মুমিন কখনো আমলহীন ও আখলাকহীন হতে পারে না। আবার আখলাকহীন, বে-আমল ও প্রতারক কখনো প্রকৃত মুমিন হতে পারে না। নিজেকে সংশোধন, পরিশুদ্ধীকরণ, ভিতর ও বাহির সুনির্মল করার এই মিশন নিয়েই রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ﴾ অর্থ : 'যেমন আমি তোমাদের মধ্যে একজন রাসুল পাঠিয়েছি

১৭৪৪. বুখারি (কিতাবুল ঈমান : ৫৩)। সহিহ ইবনে হিব্বান (কিতাবুল ঈমান : ১৭২)।

১৭৪৫. বুখারি (কিতাবুল ঈমান : ৯)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ৩৫)।

১৭৪৬. বুখারি (কিতাবুল ঈমান : ১৩)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ৪৫)।

১৭৪৭. বুখারি (কিতাবুল আদব : ৬০১৬)। মুসলিম (কিতাবুল ঈমান : ৪৬)।

তোমাদেরই মধ্য হতে, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের বিশুদ্ধ (তাযকিয়া) করবেন। তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তার তত্ত্বজ্ঞান (হিকমত) এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা তোমরা জানতে না।' [বাকারা : ১৫১] অন্য আয়াতে বলেন, ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ অর্থ : 'তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদের বিশুদ্ধ (তাযকিয়া) করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতঃপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।' [জুমুআ : ২]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন এই বিশুদ্ধতার মূর্ত প্রতীক। আল্লাহ তায়ালা তাকে লক্ষ করে বলেন, ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ অর্থ : 'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।' [কলম: ৪] রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর চরিত্র সম্পর্কে আম্মাজান আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন!'[১৭৪৮] অর্থাৎ, কুরআনের সকল শিক্ষা ও দীক্ষা তাঁর মাঝে জীবন্ত ছিল।

সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর জীবনও ছিল কুরআন-সুন্নাহর এই আলোকিত রাজপথের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ফলে তারা ঈমান ও আমল দুটো একসঙ্গে শিখতেন। কেবল বিশ্বাসের কিছু বিষয় অন্তরে সত্যায়ন করে সেগুলো মুখে আওড়ে ক্ষান্ত থাকতেন না, বরং হৃদয়ের গভীর থেকে সেগুলো অনুধাবন করতেন এবং কাজে বাস্তবায়িত করতেন। এ জন্য তারা ছিলেন নবিদের পরে সবচেয়ে নির্মল এবং সবচেয়ে বিশুদ্ধতম প্রজন্ম। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, 'আমাদের (তথা সাহাবাদের) কেউ কুরআনের দশটি আয়াত শেখার পরে সেগুলোর অর্থ জানা এবং সেগুলোর উপর আমল করার আগ পর্যন্ত আগে বাড়তেন না!' তাবেয়ি আবু আবদুর রহমান সুলামি বলেন, 'আমাদের যারা কুরআন শিখিয়েছেন (অর্থাৎ সাহাবারা) বলেছেন, তারা কুরআনের দশটি আয়াত শেখার পরে সেগুলোর উপর আমল করার আগে অন্য আয়াত শিখতেন না। এভাবে আমরা কুরআন ও আমল একসঙ্গে শিখি!'[১৭৪৯]

১৭৪৮. মুসনাদে আহমদ (মুসনাদু আয়েশা : ২৫২৪০)। ইবনে আবি শাইবা (কিতাবুন নিকাহ : ১৭৫০৬)।
১৭৪৯. তাফসিরে তাবারি (১/৮০)।

আকিদার মূল উদ্দেশ্য আমল : ফলে ঈমান ও আকিদা বলতে সাহাবায়ে কেরাম কেবল তাত্ত্বিকতা বুঝতেন না, বিতর্ক বুঝতেন না; বরং আমল ও কাজে বাস্তবায়ন বুঝতেন। এ জন্য আমরা সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-কে দেখব, তারা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমলহীন তাত্ত্বিক বিষয়ের পরিবর্তে আমলের বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। বরং রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছ থেকে বিস্ময়কর কিছু শোনার পরও সে সম্পর্কে অর্থহীন কৌতূহলী প্রশ্ন না করে তাতে আমলের এবং নিজেদের করণীয় কী আছে সেটা খুঁজতেন! যেমন দাজ্জালবিষয়ক হাদিস এর সুস্পষ্ট সাক্ষী। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন সাহাবাদের বললেন, 'দাজ্জাল চল্লিশ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করবে। এর একটি দিন এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের দিনসমূহের মতো হবে।' সাহাবায়ে কেরাম এটা কীভাবে ঘটবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন করার পরিবর্তে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, যেদিন এক বছরের সমান হবে, সেদিন আমরা নামায পড়ব কীভাবে!? আমাদের জন্য কি একদিনের নামাযই যথেষ্ট হবে? জবাবে তিনি বললেন, 'না, বরং তোমরা বর্তমান দিনের হিসাবে ওই দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে নামায পড়বে।'[১৭৫০] ফলে সাহাবাদের জীবনের সকল ইলম ও আকিদার মূল উদ্দেশ্য ছিল জীবনে বাস্তবায়িত করা, ঈমানের আলোয় আলোকিত হওয়া।

সাহাবাদের এই আলোকিত পথেই ছিলেন তাদের ছাত্র তথা তাবেয়িগণ। ইমাম আজম রহ. ছিলেন তাদের একজন। এ জন্য তিনিও আত্মশুদ্ধি, ইখলাস, তাকওয়া, আখলাক ও খোদাভীতির সেই সানুদেশে ছিলেন, যা বর্তমানে ইলম ও আকিদার শুষ্ক ও নিরস চর্চার যুগে কল্পনাও করা যায় না। তিনি ইলম চর্চা করেছেন, আকিদা নিয়ে কথা বলেছেন, কিন্তু বাড়াবাড়ি করেননি। আত্মশুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে তাত্ত্বিকতা ঝাড়ায় মত্ত থাকেননি। আকিদা নিয়ে তর্কের জেরে হৃদয়ের কথা ভোলেননি। ফলে তিনি আকিদা ও ফিকহের ক্ষেত্রে যেমন নিজ যুগের ইমাম ছিলেন, তেমনই আল্লাহভীতি, নিষ্ঠা, বিনয়, দুনিয়া-বিমুখতা, চরিত্র-মাধুরী, তাযকিয়া ও ইহসানের ময়দানেও ছিলেন শিখরদেশে। তাঁর যুহদ, আধ্যাত্মিকতা, নফসের নিয়ন্ত্রণ, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা, চারিত্রিক নির্মলতা ও আত্মশুদ্ধির চমৎকার সব দৃষ্টান্তে ইতিহাসের গ্রন্থগুলো ভরপুর।

১৭৫০. মুসলিম (কিতাবুল ফিতান : ২৯৩৭)। আবু দাউদ (কিতাবুল মালাহিম : ৪৩২১)। তিরমিযি (আবওয়াবুল ফিতান : ২২৪০)। ইবনে মাজা (আবওয়াবুল ফিতান : ৪০৭৫)।

ইমাম আজমের আধ্যাত্মিক জীবন

খলিফা হারুনুর রশিদ ইমাম আজম সম্পর্কে জানতে চাইলে আবু ইউসুফ রহ. বলেন, 'আমিরুল মুমিনিন, তিনি হারাম থেকে অনেক দূরে থাকতেন। দুনিয়াদারদের দুনিয়া এড়িয়ে চলতেন। অধিক সময় নীরব থাকতেন। সর্বক্ষণ চিন্তার মাঝে ডুবে রইতেন। বেশি কথা বলতেন না। বেশি কথা পছন্দ করতেন না। যদি তাঁকে কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হতো, সেটুকু জবাব দিয়ে ক্ষান্ত থাকতেন। তিনি নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। দ্বীনকে সুরক্ষিত রাখতেন। মানুষের পিছনে লাগার পরিবর্তে নিজেকে নিয়ে থাকতেন। সবার প্রশংসা করতেন। কারও ব্যাপারে কটু কথা বলতেন না।' সবকিছু শুনে হারুনুর রশিদ বললেন, 'এটাই সালেহিনদের চরিত্র।'[১৭৫১]

হ্যাঁ, এটাই আল্লাহর ওলিদের জীবন। সুন্নাহর আলোতে উদ্ভাসিত জীবন। এটাই বিশুদ্ধ ও প্রকৃত ঈমানের সুফল। মানুষের সঙ্গে কম মেশা, কম কথা বলা এবং কম হাসা ইমাম আজম রহ.-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, যে ব্যাপারে সবাই সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই যে, ইমাম আজম তাঁর নফস ও মুখের নিয়ন্ত্রক ছিলেন। প্রয়োজনের বাইরে কথা বলতেন না। কারও নামে মন্দ বলতেন না।[১৭৫২] কারণ, নিজের আত্মার শুদ্ধিতে এবং নিজের নফস নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত থাকলে, বিশুদ্ধ ইলম ও আখেরাতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকলে, অন্য মানুষ নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় থাকে না। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, 'তিনি কুফার সবচেয়ে বড় মুত্তাকি মানুষ ছিলেন। আমানত রক্ষায় তিনি ছিলেন সকলের শীর্ষে।'[১৭৫৩]

তিনি অর্থহীন হাসি-মশকরা করতেন না। উচ্চৈঃস্বরে হাসতেন না। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণে তিনি সর্বদা মুচকি হাসতেন।[১৭৫৪] তাঁর সামনে কেউ কারও মন্দ বললে তিনি থামিয়ে দিয়ে বলতেন, 'বাদ দাও। মানুষের নামে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকো। আমাদের নামে যারা মন্দ বলে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিন। যারা আমাদের ভালো বলে, আল্লাহ তাদের রহম করুন।'[১৭৫৫]

১৭৫১. দেখুন : ফাযায়িলু আবি হানিফা, ইবনে আবিল আওয়াম (৪৭)। আখবারু আবি হানিফা, সাইমারি (৪৩)।

১৭৫২. দেখুন : উকুদুল জুমান (২৩০)। আল খাইরাতুল হিসান (৯৯)।

১৭৫৩. দেখুন : ফাযায়িলু আবি হানিফা (৫৫-৫৬)।

১৭৫৪. দেখুন : আখবারু আবি হানিফা (৪৪)।

১৭৫৫. দেখুন : আল-খাইরাতুল হিসান (৯৯)।

আত্মশুদ্ধির আরেক ভিত্তি হলো নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করা, বিনয়ী হওয়া এবং মানুষকে সম্মান করা। ইমাম আজমের মাঝে এটাও পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি কাউকে ছোট করতেন না। তাঁর ছাত্রদের তিনি অত্যন্ত মহব্বত করতেন, যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন। আবদুল জাব্বার হাযরমি বলেন, 'আমি তাঁর চেয়ে আর কাউকে নিজের শাগরেদদের এতটা সম্মান দিতে দেখিনি।'[১৭৫৬] তাঁর ছাত্রদের মাঝে অনেকে অন্যান্য আলেমের কাছে গমন করত, যাদের সঙ্গে তাঁর নানাবিধ দূরত্ব ছিল, যাদের কেউ কেউ হিংসাবশত তাঁর সমালোচনাও করত। কিন্তু তিনি কখনো নিজের ছাত্রদের তাদের কাছে যেতে বারণ করতেন না।[১৭৫৭] তাঁর ঈমান, আমল, আখলাক ও তাযকিয়ার সিলসিলা ছাত্রদের মাঝেও বিস্তৃত হয়। তাঁর ছাত্ররা একেকজন হেদায়াতের দিশারী হয়ে ওঠেন। দাউদ আত-তায়ি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ফলে তাযকিয়া ও তাসাওউফের বরকতময় ধারার ইমাম তিনি।

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মশুদ্ধির এই দৃশ্য তাঁর জীবনের সর্বত্র বিদ্যমান। তাঁকে কেউ কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'রাব্বি সাল্লিম! রাব্বি সাল্লিম! (আল্লাহ রক্ষা করুন। আল্লাহ রক্ষা করুন) অনেক সময় কেউ তাঁকে অবমূল্যায়ন করলেও নিজেকে তিনি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রসিদ্ধি এবং দুনিয়ার মর্যাদাকে নিজের নফসের তুষ্টির কাজে লাগাতেন না, প্রতিশোধ নিতেন না। একবার একব্যক্তি ইমাম আজমকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিতে গিয়ে বলেন, 'এক্ষেত্রে হাসান (বসরি) ভুল করেছেন।' তখন এক লোক ইমামের মাকে তুলে গালি দিয়ে বলল, হে ...পুত্র! 'হাসান ভুল করেছেন' এমন কথা বলার সাহস হলো কী করে? তাঁর নাম অস্পষ্ট রেখে কুনিয়ত দিয়ে বোঝাতে পারলে না? এটা ছিল বড় মাত্রার বেয়াদবি ও ধৃষ্টতা। হাসান বসরি ভুল করেছেন বলা কোনো গলত কথা ছিল না। লোকজন তাকে পাকড়াও করার জন্য ছুটে গেল। ইমাম আজম কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকলেন। এরপর মাথা উঠিয়ে বললেন, 'হাসান ভুল করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঠিক করেছেন।' লোকটিকে কিছুই বললেন না। আরেক দিন আরেক ব্যক্তি ইমাম আজম রহ.-কে 'কাফের', 'যিন্দিক' বলে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল। ইমাম আজম জবাবে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তিনি জানেন তুমি যা বলছ আমার মাঝে

১৭৫৬. ফাযায়িলু আবি হানিফা (৪৮)।

১৭৫৭. দেখুন : উকুদুল জুমান (২৭২)।

সেগুলো নেই। তাঁকে চেনার পর থেকে কখনো অন্য কাউকে তাঁর সঙ্গে শরিক করিনি। তিনি ছাড়া অন্য কারও কাছে কিছুর প্রত্যাশা করিনি। অন্য কারও শাস্তির ভয় করিনি।' অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁর শরীর কেঁপে উঠল! লোকটি ভুল বুঝতে পেরে বলল, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তিনি বললেন, 'তুমি মুক্ত। এমন কথা আমার ব্যাপারে যে-ই বলেছে, সবাই মুক্ত। ভাই! প্রসিদ্ধি অনেক মন্দ ব্যাপার। প্রসিদ্ধি অনেক ক্ষতিকর।'[১৭৫৮]

একব্যক্তি তাঁকে বলল, আল্লাহকে ভয় করুন! তিনি কেঁপে উঠলেন। তাঁর রং বিবর্ণ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, ভাই। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দিন। এমন আরও বলবেন। আমরা সবসময় এ ধরনের উপদেশের প্রতি মুখাপেক্ষী।'[১৭৫৯] মুসলমানদের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম হয়ে সাধারণ একজন মানুষ থেকে সবার সামনে এ ধরনের নসিহত হজম করার জন্য যে বশীভূত ও নিয়ন্ত্রিত নফস দরকার, আমাদের অধিকাংশ মানুষেরই সেটা নেই। বরং ইলম ও খ্যাতিতে আমাদের যে যতটা অগ্রসর হয়, নফস ততটাই ফুলে-ফেঁপে ওঠে।

মোটকথা, বিশুদ্ধ আকিদার পাশাপাশি হৃদয়কে বিশুদ্ধ করা, নিজের আত্মাকে সুস্থ রাখা, প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রত্যেক মুমিনের উপর ফরয। ইমাম আজমের জীবনীগুলোতে দেখা যায়, তিনি মাসের পর মাস রাতে ঘুমাতেন না। ইশার ওজু দ্বারা ফজরের নামায পড়তেন। রাতে তাঁর জায়নামাযে কান্নার আওয়াজে প্রতিবেশীরা সজাগ হয়ে যেত।[১৭৬০] এটা তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলোর সর্বসম্মত সাক্ষ্য। এ ছাড়া তাঁর অত্যধিক আমলের ব্যাপারে শত শত বর্ণনা বিদ্যমান। তথাপি আমরা এখানে সেগুলো উল্লেখ করিনি। কারণ, নামায-রোযা এবং বাহ্যিক ইবাদত, আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমরা যেটুকু অগ্রসর, আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ততটাই অনগ্রসর ও অমনোযোগী। ফলে এ দিকটাতে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলতেন, 'যদি মানুষের সমস্যার চিন্তা না থাকত, তবে আমি ফাতাওয়া দেওয়া বন্ধ করে দিতাম।'[১৭৬১]

১৭৫৮. উকুদুল জুমান (২৭০)।

১৭৫৯. আখবারু আবি হানিফা (৪৮)। ফাযায়িলু আবি হানিফা (৬২)।

১৭৬০. দেখুন : আল-খাইরাতুল হিসান (৯৬)।

১৭৬১. ফাযায়িলু আবি হানিফা (৬৩)।

এভাবে ঈমান, আকিদা, ইলম ও আমলের মতো আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রেও তিনি ইমাম ছিলেন। বকর ইবনে মারুফ বলেন, 'আমি উম্মতে মুহাম্মাদির মাঝে আবু হানিফার চেয়ে উত্তম জীবনের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।'[১৭৬২] এটাই আত্মশুদ্ধির মূল কথা। এ কারণে যারা আত্মশুদ্ধিকে অবজ্ঞা করে, তাত্ত্বিকতার পিছনে থাকে, ইমাম আজম রহ. তাদের শক্ত সমালোচনা করেছেন। ইমাম মনে করতেন, যারা কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের পথ ছেড়ে অর্থহীন তাত্ত্বিকতার পিছনে পড়ে, তাদের চেহারায় নুর থাকে না। তাদের হৃদয় নরম থাকে না, বরং পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। সেখানে তাকওয়া ও খোদাভীতি থাকে না। থাকে অন্যকে ছোট করার এবং প্রতিপক্ষকে গোমরাহ সাব্যস্ত করার জিঘাংসা। এ কারণে তিনি তাঁর ছেলেকে এসব অর্থহীন বিতর্কে জড়াতে নিষেধ করে দেন।[১৭৬৩]

ইমামের জীবনের এই অভিজ্ঞতা সহস্র বছর পরে আজও সমান বাস্তবতা হিসেবে আমাদের সামনে বিদ্যমান। যে কালিমা এসেছিল আমাদের এক করতে, সেটাকে আমরা আজ বানিয়েছি নিজেদের বিভক্তির হাতিয়ার। যে তাওহিদ এসেছিল আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত নির্মাণ করতে, সব বাদ দিয়ে সেটাকে আমরা আজ নিছক কিছু তাত্ত্বিক তর্কে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। কুরআনের যেসব আয়াত এসেছিল আমাদের আল্লাহর কাছাকাছি নিতে, তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্যের সৌভাগ্য অর্জন করাতে, সেগুলো আজ আমাদের বিতর্কের উপকরণ ছাড়া তেমন কোনো কাজে লাগে না। তাসাওউফের সমালোচনায় আমরা জীবন শেষ করি ফেলি। নিজের কলবটা ভালো আছে কি না খুঁজে দেখার সময় পাই না। এ জন্য ঈমানকে যতটা আমলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়, আকিদাকে যতটা তাত্ত্বিকতা ও বিতর্ক থেকে বের করে নিজেদের তাকওয়া ও তাযকিয়ার কাজে লাগানো যায়, তত মঙ্গল।

উন্নত জীবন গঠনে ইমাম আজমের মূল্যবান নসিহত

শেষ পর্যায়ে এসে এবার আমরা ইমাম আজমের কিছু নসিহত ও ওসিয়ত তুলে ধরতে চাই। এগুলো সেসব উপদেশ যেগুলো তিনি তাঁর শাগরেদদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতি ও উপলক্ষ্যে পেশ করেছিলেন। সেসব উপদেশের উপর আমল করে তারা তাদের জীবন সুন্দর ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। কারণ, একজন শুদ্ধ

১৭৬২. আল খাইরাতুল হিসান (১০০)।

১৭৬৩. দেখুন : মানাকিব, মক্কি (৫৪-৫৫, ১৮৩-১৮৪)।

আকিদার মুমিনের জন্য সুস্থ চরিত্র এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হওয়াও আবশ্যক। আখলাকবিহীন বিশুদ্ধ আকিদা অনেক সময় ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের পাশাপাশি একজন বিশুদ্ধ মানুষ হতে আলেম-উলামা, তালেবুল ইলম, দ্বীনি জ্ঞান অর্জনেচ্ছুক প্রত্যেক শিক্ষার্থী, বরং সকল মুমিন-মুসলিমের এসব উপদেশ জানা এবং মেনে চলা আবশ্যক। পিছনে এ ধরনের বেশ কিছু উপদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আরও দুটো মূল্যবান নসিহত সংযুক্ত করে দিচ্ছি।

ইউসুফ ইবনে খালেদ সামতির প্রতি ইমামের নসিহত

জ্ঞান অর্জন শেষ করে নিজ শহর বসরায় যাওয়ার জন্য ইমাম আজমের অনুমতি চাইলে তিনি ইউসুফ সামতিকে বলেন, 'তুমি যাওয়ার আগে আমি তোমাকে মানুষের সঙ্গে চলাফেরা ও আখলাক-আদব সম্পর্কে কিছু নসিহত করতে চাই, যা তোমার ইলমের সৌন্দর্য বাড়াবে। মনে রেখো, আচার-আচরণ আপনকে পর করে, পরকে আপন করে। অসাদাচরণ বাবা-মায়ের মতো আপনকেও পর করে দেয়। আর সদাচরণ পরকেও বাবা-মায়ের মতো আপন করে ফেলে।'

'বসরায় গিয়ে তোমার প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় মাঠে নেমে যেয়ো না। তাদের উপর নিজেকে এবং নিজের ইলম জাহির করো না। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে ত্রুটি করো না। না হলে তারা তোমার বিরুদ্ধে লেগে যাবে। সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। হিংসা-বিদ্বেষ তৈরি হবে। তখন একে অন্যের বিপদে হাসবে। পরস্পরকে গোমরাহ, বিদআতি আখ্যা দেবে। হয়তো একসময় এটার জন্য শহরও ছাড়তে হতে পারে! অথচ এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই যেখানে সৌজন্য দেখানোর প্রয়োজন, বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে চলার প্রয়োজন, সেখানে সেভাবে চলো।'

'বসরায় ফেরার পরে সেখানকার মানুষ তোমাকে দেখতে ছুটে আসবে। তাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত সম্মান দিয়ো। বিশেষত গুণিজন, উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখের প্রতি পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা পেশ করো। তাদের সঙ্গে বিনম্রতা প্রদর্শন করো। সাধারণ মানুষদের সঙ্গে ভালো কথা বলো। বদলোকদের সঙ্গে কৌশলী হও। ভালো মানুষদের সঙ্গী ও সহচর হিসেবে গ্রহণ করো। শাসককে অবজ্ঞা করো না। কাউকে তুচ্ছ করো না। নিজের আত্মমর্যাদাবোধ নষ্ট করো না। নিজের গোপন

কথা কাউকে বলো না। ভালো চিন-পরিচয় হওয়ার আগে কাউকে নিজের কাছে টেনো না। মন্দ ও ইতর লোককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। প্রকাশ্যে এমন কিছু করো না যাতে মানুষ তোমার সমালোচনার সুযোগ পায়। বোকা লোকদের সঙ্গে বেশি মেশো না। অতি বোকা কিংবা ক্ষমতাশালী—এই দুই শ্রেণির লোকদের দাওয়াত গ্রহণ করো না। তাদের হাদিয়াও নিয়ো না।'

'সবসময় সৌজন্যবোধ, সবর, ধৈর্য, উত্তম চরিত্র, হৃদয়ের বিশালতা ইত্যাদি গুণের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করো। বাহ্যিক বেশভূষা সাধ্যমতো সুন্দর রাখো। (সাধ্যমতো) নতুন কাপড় পরিধান করো। (সাধ্যমতো) ভালো বাহনে চড়ো। অধিক সুগন্ধি ব্যবহার করো। নিয়মমতো নিজেকে সময় দাও। সে সময় নিজের প্রয়োজনগুলো সারবে। নওকর-ভৃত্যদের প্রতি খেয়াল রাখবে। তারা ভুল করলে উত্তমভাবে এবং নম্রতার সঙ্গে সংশোধন করবে। বেশি নিন্দা-ভর্ৎসনা করবে না। কারণ, তাতে একসময় সেটা তাদের গায়ে লাগবে না। শাস্তি দেওয়ার হলে নিজে দেবে। তাতে তোমার অবস্থান দৃঢ় থাকবে।'

'নামাযের প্রতি যত্নবান থেকো। মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করো। কারণ, কৃপণ ব্যক্তি কখনো নেতৃত্ব দিতে পারে না। একদল মানুষকে নিজের সঙ্গী করো যারা তোমাকে মানুষের ভালোমন্দ জানাবে, মন্দ হলে সংশোধন করবে, ভালো হলে সহায়তা করবে।'

'কেউ তোমাকে দেখতে আসুক না আসুক, তুমি মানুষকে দেখতে যাবে। কেউ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুক না করুক, তুমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করবে, ক্ষমা করবে। কেউ কষ্ট দিলে তাকে ছেড়ে দেবে। কাছের কেউ অসুস্থ হলে নিজে তাকে দেখতে যাবে। লোক পাঠিয়ে খবর নেবে। কেউ অনুপস্থিত হলে তার ব্যাপারে খোঁজখবর নেবে। কেউ তোমার কাছে আসা ছেড়ে দিলে তুমি ছাড়বে না। যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তুমি তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়বে। কেউ অসাদাচরণ করলে ক্ষমা করবে। যে তোমার সমালোচনা করে তার প্রশংসা করবে। কারও সুখের মুহূর্তে তাকে শুভেচ্ছা জানাবে। দুঃখের মুহূর্তে সান্ত্বনা দেবে। মুসিবতে দেখলে নিজে ব্যথিত হবে। কেউ পাশে চাইলে তার পাশে দাঁড়াবে। সাহায্য চাইলে সাহায্য করবে। মানুষের প্রতি যথাসম্ভব বেশি বেশি ভালোবাসা প্রকাশ করবে। বাজে লোকদের মাঝেও সালামের প্রসার ঘটাবে। বিভিন্ন মজলিস, মসজিদ কিংবা অন্য কোথাও মানুষকে বিতর্ক করতে দেখলে চুপ থাকবে। নিজ থেকে বিতর্কে জড়াবে না। হুট করেই বিপরীতমুখী বক্তব্য দেবে না।'

'হ্যাঁ, যদি তোমাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয় আর তোমার জানা থাকে, তবে তুমি প্রথমে তাদের জানা কথা উল্লেখ করবে। অতঃপর বলবে, এ ব্যাপারে আরও একটা বক্তব্য আছে। তখন নিজের বক্তব্য দলিলসহ তুলে ধরবে। এতে মানুষ তোমার মর্যাদা ও মর্তবা বুঝতে পারবে। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে তার অবস্থা অনুযায়ী কথা বলবে। স্পষ্ট বিষয়ে কথা বলবে। জ্ঞানের গভীর বিষয় সাধারণ মানুষের কাছে বলবে না। (ছাত্রদের সঙ্গে) মাঝে মাঝে মজা করবে। এটা তোমার প্রতি তাদের অনুরাগ ও আকর্ষণ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে, ইলম অর্জনে আগ্রহ পাবে। মাঝে মাঝে তাদের খাওয়াবে। কেউ ভুল করলে এড়িয়ে যাবে। তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করবে। তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করবে। উদার হবে। কারও প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করবে না। সবার সঙ্গে সবার মতোই একজন হয়ে থাকবে। মানুষের সঙ্গে তেমন আচরণ করবে যেমনটা নিজের সঙ্গে করা পছন্দ করো। নিজের জন্য যা চাও তাদের জন্য তা চাইবে। নিজের নফসের প্রতি খেয়াল রাখবে। ভুল পথে চললে ঠিক করবে।'

'বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা ছড়াবে না। কেউ তোমার প্রতি বিরক্তি দেখালে তুমিও বিরক্তি দেখাবে না। মানুষের উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেবে না। সত্য পথে চলবে। অহংকার থেকে দূরে থাকবে। কেউ তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তুমি করবে না। কেউ খেয়ানত করলেও আমানত রক্ষা করে চলবে। ওয়াফাদারি ও তাকওয়ার উপর থাকবে। প্রত্যেক ধর্মের মানুষের সঙ্গে যথোপযুক্ত আচরণ করবে।'

'এসব ওসিয়ত মেনে চললে, আশা করি, ভালো থাকবে। তুমি চলে যাচ্ছ, আমার খারাপ লাগছে (ছাত্রের প্রতি ওস্তাদের আখলাক দেখুন)**! তবে তোমার সম্পর্কে জানতে পারলে আমার ভালো লাগবে। তাই আমার সঙ্গে পত্র মারফত যোগাযোগ রাখবে। নিজের প্রয়োজন জানাবে। আমার সঙ্গে পুত্রের মতো থাকবে। আমি তোমার পিতার মতো থাকব!'**

কেবল মুখে নসিহত করেই ইমাম ক্ষান্ত থাকার মানুষ ছিলেন না। ফলে যেমনটা তাঁর ছাত্র ইউসুফ বর্ণনা করেন, 'অতঃপর তিনি আমাকে অনেকগুলো দিনার, পোশাক ও বাহন প্রদান করলেন। আমাকে বিদায় দিতে নিজে তাঁর সঙ্গী-সাথিসহ বের হলেন। ফোরাতের তীর পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিলেন! অতঃপর বিদায় নিলেন! তাঁর মতো অনুগ্রহ আমার জীবনে আর কারও নেই। তাঁর নসিহতের সুবাদে বসরাতে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাই। সেখানকার আলেম-উলামা, তালেবুল

ইলম এবং সাধারণ মানুষ—সবার প্রিয়পাত্রে পরিণত হই। কুফার মতো বসরাতেও হানাফি মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃত্যু পর্যন্ত ইমামের চিঠি ও হাদিয়া আমার কাছে আসতে থাকে। কত মহান ও কল্যাণকর শিক্ষক ছিলেন তিনি। তাঁর মতো আর কে আছে?'[১৭৬৪]

আবু ইউসুফের প্রতি ইমামের নসিহত

আমরা আগেই বলেছি, ইমাম আজম রহ. বারবার শাসকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দায়িত্বের প্রস্তাব পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, তিনি তাদের কোনো কাজ করা পছন্দ করতেন না। তথাপি তিনি হয়তো ঈমানি ফারাসতের মাধ্যমে তাঁর ছাত্রদের সরকারি দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি জীবদ্দশাতেই অনুভব করেছিলেন। এ জন্য তিনি তাদের এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দান করেন। পিছনে শাসকসম্পর্কিত অধ্যায়ে বৃষ্টিভেজা এক দিনে ছাত্রদের প্রতি তাঁর নসিহতের কথা উল্লেখ করেছি। তিনি তাঁর সর্বজ্যেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ শাগরেদ ইমাম কাযি আবু ইউসুফকে প্রদত্ত নসিহতের শুরুতেও এ ব্যাপারে কথা বলেন। এরপর অন্যান্য বিষয়ে নসিহত করেন। ইমাম বলেন :

'ইয়াকুব, শাসককে সম্মান করো। তার সামনে মিথ্যা বলো না। তার দরবারে বেশি যেয়ো না। প্রয়োজন ছাড়া তার কাছে হাজির হয়ো না। কারণ, যখন শাসকের কাছে বেশি যাবে, তার চোখ থেকে তোমার সম্মান পড়ে যাবে। মর্যাদা হ্রাস পাবে। **ফলে শাসকের সঙ্গে আগুনের সম্পর্ক রাখবে—তার থেকে উপকৃত হবে, কিন্তু দূরে থাকবে। কাছে গেলে পুড়ে যাবে।** শাসকের সামনে বেশি কথা বলবে না। কারণ, তাতে তিনি তোমার ভুল ধরবেন। তার লোকদের কাছে তুমি ছোট হবে। শাসকের কাছে গেলে নিজের, শাসকের এবং তাঁর কাছে উপস্থিত সবার মর্যাদার প্রতি লক্ষ রাখবে। তাঁর কাছে অন্য কোনো আলেম থাকলে সাবধানে কথা বলবে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হও এবং শাসকের চোখ থেকে পড়ে না যাও।'

'সাধারণ মানুষের সামনে যে সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করা হবে এর বাইরে কিছু বলবে না। যা বলবে ইলমের উপর নির্ভর করে বলবে, যাতে তারা তোমার ব্যাপারে মন্দ ধারণা না করে। সাধারণ মানুষের সামনে হাসবে না। বেশি বাজারে যাবে না। ছোট শিশুদের সঙ্গে কথা বলতে পারো। তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে পারো।

১৭৬৪. মানাকিব, মক্কি (৩৬৫-৩৬৮)। মানাকিব, বাযযাযি (৩৬০-৩৬৩)।

কিন্তু উঠতি বয়সের কিশোরদের সঙ্গে কথা বলবে না। কারণ, তারা ফেতনা। বয়োজ্যেষ্ঠ সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাস্তায় হাঁটবে না। কারণ, তাদের পিছনে হাঁটলে সেটা তোমার ইলমের জন্য শোভনীয় হবে না। আবার তাদের সামনে হাঁটলে সেটাও তোমার জন্য শোভনীয় নয়।'

'রাস্তায় বসবে না। একান্ত বসতে হলে মসজিদে বসবে, দোকানে বসবে না। বাজারে বা মসজিদে খাবে না। খোলা জায়গায় পান করবে না। রেশম, অলংকার ইত্যাদি পরবে না। কারণ, এগুলো অহংকারের দিকে ঠেলে দেয়। প্রয়োজন ছাড়া বিছানায় (শুয়ে) স্ত্রীর সঙ্গে বেশি কথা বলবে না। তার সঙ্গে অতিরিক্ত মাখামাখি করবে না। আল্লাহর যিকির ছাড়া তার কাছে যাবে না। তার সামনে অন্য ব্যক্তির স্ত্রী কিংবা যেকোনো নারী-পরিচারিকার আলোচনা করবে না। এতে তার ভালো লাগবে না। হতে পারে তুমি অন্য নারীর আলোচনা করলে সেও অন্য পুরুষের আলোচনা করবে।'

'যাবতীয় সক্ষমতা অর্জন ব্যতীত বিয়ে করবে না। প্রথমে ইলম অর্জন করো। এরপর হালাল উপার্জন করো। শেষে বিবাহ করো। কারণ, ইলম অর্জনের সময় সম্পদের পিছনে মনোযোগ দিলে ইলম থেকে বঞ্চিত হবে। সম্পদ তোমাকে গোলাম-দাসী এবং দুনিয়ার আসবাবপত্রের প্রেমে ডুবিয়ে দেবে। একইভাবে ইলম অর্জন শেষ করার আগে বিবাহ করলে তোমার সময় বরবাদ হবে। সন্তান, সম্পদ ইত্যাদি ইলম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তাই যৌবনের শুরুতে ইলম অর্জন করবে, যখন হৃদয় ও মন শূন্য থাকে, স্থির থাকে। অতঃপর সম্পদ অর্জন করবে। সম্পদ অর্জিত হয়ে গেলে বিবাহ করবে। যথাসাধ্য স্ত্রীর বাড়িতে কম যাবে। তার বাপের বাড়িতে সংসার পাতবে না। (একাধিক স্ত্রী থাকলে) এক ঘরে দুই স্ত্রী রাখবে না। স্ত্রীর সঙ্গে সদাচরণ করবে।'

'আল্লাহকে ভয় করে চলবে। আমানত রক্ষা করবে। সবার জন্য কল্যাণ কামনা করবে। কাউকে তুচ্ছ করবে না। আমজনতার মাঝে দ্বীনের সূক্ষ্ম বিষয়ে কথা বলবে না। কারণ, তোমার অনুসরণে তারাও তখন সেসব বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কেউ তোমাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করলে যতটুকু প্রশ্ন করা হবে ততটুকু উত্তর দেবে। নিজের পক্ষ থেকে অন্য কিছু যোগ করবে না। কারণ, তাতে সে জবাব বুঝতে পারবে না। ...**সাধারণ মানুষ এবং বাজারি লোকদের সঙ্গে ইলমি বিতর্ক করবে না। তাতে নিজের সম্মানহানি হবে। সত্য প্রকাশে কাউকে ভয় করবে না, হোক সে**

রাজা-বাদশাহ। অন্যদের চেয়ে কম ইবাদতে সন্তুষ্ট থাকবে না। কারণ, সাধারণ মানুষ যখন তাদের চেয়ে তোমাকে বেশি ইবাদত করতে না দেখবে, তোমার ব্যাপারে বিভিন্ন মন্দ ধারণা করবে। আমলের প্রতি তাদের আগ্রহ কমে যাবে। ইলম এবং আহলে ইলমকে তারা মূল্যহীন মনে করবে।'

'কখনো ইলম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। যদি দশ বছরও কামাই-রোজগার ছাড়া থাকতে হয়, খাবার ছাড়া থাকতে হয়, তবুও ইলম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। কেননা, ইলম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া সংকীর্ণ জীবন ডেকে আনে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ﴾ অর্থ : 'যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকুচিত হয়ে পড়বে আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।' [তহা : ১২৪]

'নতুন কোনো শহরে গেলে নিজেকে সেখানকার আলেমদের একজন মনে করো। পুরোটা নিজের করার চেষ্টা করো না, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তুমি তাদের সম্মান-মর্যাদার ভাগ নিতে আসোনি। কারণ, এমন হলে তারা সবাই মিলে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে, তোমার মতাদর্শের উপর আঘাত হানবে, সাধারণ মানুষ তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। কারণ, সাধারণ মানুষের নিজস্ব চোখ নেই। তারা তোমার প্রতিপক্ষ আলেমদের চোখ দিয়েই তোমার দিকে তাকাবে। ফলে শুধু শুধু অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তাই তাদের সামনে ফাতাওয়া দেবে না। তাদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ ও মুনাযারা করবে না। দলিল ছাড়া তাদের সঙ্গে কথা বলবে না। তাদের ওস্তাদ-মাশায়েখের সমালোচনা করবে না। সমালোচনা করলে তারাও তোমার সমালোচনায় লিপ্ত হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ অর্থ : আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা ডাকে তাদের তোমরা গালি দিয়ো না। কেননা, তাহলে তারাও সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দেবে।' [আনআম : ১০৮]

'মানুষের ব্যাপারে সদাসর্বদা সতর্ক থাকবে। নিজের গোপন ও প্রকাশ্য উভয় অবস্থা আল্লাহর কাছে সমান রাখবে। কারণ, এটাই ইলমের কাফফারা যে, তোমার যাহের ও বাতেন আল্লাহর কাছে সমান থাকবে। ...বেশি হাসাহাসি করবে না। কারণ, এটা অন্তর মেরে ফেলে। নারীদের সঙ্গে বেশি কথা বলবে না বা ওঠবস করবে না। কারণ, এটাও অন্তরকে হত্যা করে ফেলে। ধীরস্থিরতার সঙ্গে চলাফেরা করবে। কোনো কাজে তাহাহুড়া করবে না। পিছন থেকে কেউ ডাক দিলে সাড়া

দেবে না। যখন কথা বলবে, অতি উচ্চৈঃস্বরে বলবে না। আওয়াজ উঁচু করবে না। স্থির থাকবে। কম নড়াচড়ার অভ্যাস করবে। মানুষের সামনেও বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করবে, যাতে তারা সেটা দেখে শিখতে পারে। প্রত্যেক নামাযের পরে কুরআনের কিছু অংশ তেলাওয়াত করবে। আল্লাহর যিকির করবে। তাঁর নেয়ামত ও (মুসিবতের) সবরের উপর শুকরিয়া আদায় করবে। প্রতি মাসে কয়েকটা দিন রোযা রাখবে। তাতে সাধারণ মানুষও রোযার প্রতি উৎসাহিত হবে। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যতটুকু ইবাদত প্রত্যাশা করো, নিজের কাছ থেকে ততটুকুতে সন্তুষ্ট থেকো না। নিজের নফসকে দেখে রেখো। তাকে সুরক্ষিত রাখতে চেষ্টা করো।'

'নিজে নিজে কেনাবেচা করবে না (বরং ইলমের পিছনে সময় দেবে)। একজনকে সহায়ক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তার কাছে দায়দায়িত্ব সঁপে দেবে। দুনিয়ার মাঝে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবাস করো না। কারণ, আল্লাহ তোমাকে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। কিশোরদের কাছে যেয়ো না। শাসকদের কাছে যেয়ো না। ...মানুষের দোষ খুঁজো না, বরং ভালো দিকগুলো খুঁজো। যদি কারও মাঝে খারাপ কিছু দেখো, তবে সেটা প্রচার করো না, বরং তাকে ভালোটা করতে বলো। ভালোভাবে স্মরণ করো। হ্যাঁ, যদি কারও দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি-বিচ্যুতি থাকে, তবে সেটা মানুষের সামনে তুলে ধরো যাতে মানুষ সতর্ক থাকে, তার কাছ থেকে দূরে থাকে। দ্বীনের ব্যাপারে হক কথা বলতে গিয়ে কাউকে ভয় পেয়ো না। কারণ, আল্লাহ তোমার সাহায্যকারী। একবার এটা করতে পারলে মানুষ তোমাকে ভয় পেতে শুরু করবে। তখন তোমার সামনে, তোমার শহরে আর কেউ বিদআত করার সাহস পাবে না। কেউ করলেও সাধারণ মানুষই তোমার পক্ষ থেকে সেটার প্রতিবাদের জন্য যথেষ্ট হবে।'

'মৃত্যুকে স্মরণ করবে। উস্তাদ-মাশায়েখসহ যাদের কাছ থেকে ইলম শিখেছ তাদের জন্য ইস্তিগফার করবে। সবসময় কুরআন তেলাওয়াত করবে। বেশি বেশি কবর যিয়ারত করবে। মাশায়েখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। পবিত্র স্থানগুলো দর্শন করবে। দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু শুধু বিদআতপন্থিদের সঙ্গে মিশবে না, তাদের সঙ্গে বসবে না। গালিগালাজ করবে না। অভিশাপ দেবে না। আজান দিলেই মসজিদে চলে যাবে, যাতে সাধারণ মানুষ তোমার সামনের কাতারে না থাকে! শাসকের প্রাসাদের আশেপাশে বসবাস করবে না।'

‘প্রতিবেশীর গোপনীয়তা রক্ষা করবে। কেননা, সেটা আমানত। মানুষের গোপনীয় কথা প্রকাশ করবে না। কেউ কোনো বিষয়ে পরামর্শ চাইলে ইবাদত মনে করে যথাসাধ্য সুপরামর্শ দেবে। কৃপণতা করবে না। লোভ করবে না। মিথ্যা বলবে না। গোঁজামিল দেবে না। বরং স্পষ্টভাষী এবং ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলবে। সাদা কাপড় পরবে। মনের দিক থেকে ধনী হবে। দুনিয়ার প্রতি কম আগ্রহ দেখাবে। দরিদ্র হলেও দারিদ্র্য প্রকাশ করবে না। সাহসী ও হিম্মতওয়ালা হও। কারণ, যার হিম্মত যত কম, তার মর্তবাও তত কম।’

‘রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটবে। ডানে-বামে তাকাবে না। দোকানে গেলে বেশি দরাদরি করবে না। বরং (সম্ভব হলে) সবাই যা দেয় তারচেয়ে বেশি দেবে। এতে সাধারণের মাঝে তোমার ব্যক্তিত্ব তৈরি হবে, সবাই সম্মান করবে। বিভিন্ন কাজের জন্য লোক রাখবে। তাতে ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে সময় দিতে সুবিধা হবে। পাগল ও খ্যাতির পূজারী লোকদের সঙ্গে মুনাযারা-বিতর্ক করবে না। কারণ, তারা সুযোগ খুঁজবে। হক খুঁজবে না।’

‘বড় আলেমদের সামনে নিজেকে যাহির করতে যাবে না। এতে করে একসময় তারাই তোমাকে ওঠাবেন। নিজেকে যাহির করতে গেলে উলটো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একইভাবে কোনো এলাকায় বা লোকদের মাঝে গেলে তারা তোমাকে নামাযের সময় সামনে ঠেলে না দিলে নিজে নিজে সামনে যাবে না। ...ইলমের মজলিসে রাগ করবে না। সাধারণ মানুষের সামনে কেচ্ছা-কাহিনি বলবে না। কারণ, কেচ্ছা-কাহিনি বলতে হলে মিথ্যা বলা অপরিহার্য। তোমার নামে যেসব যিকির কিংবা ওয়াজের মজলিস চলে, সেখানে নিজে যেয়ো না। বরং নিজের শাগরেদ কিংবা পরিচিত কাউকে পাঠাও। একইভাবে বিয়ে পড়ানো, জানাযা এবং ঈদের নামায পড়ানোর দায়িত্বও তোমার এলাকার ইমামের উপর ছেড়ে দেবে (অর্থাৎ, নিজে এরচেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে)। আমাকে তোমার দোয়ায় স্মরণ রেখো।’[১৭৬৫]

শেষকথা

সবশেষে ইমামের একটি বক্তব্যের মাধ্যমে গ্রন্থ শেষ করতে চাইছি। ইমাম রহ. বলেন, **‘অনুগ্রহ করে খোঁটা দেওয়া আমলকে নষ্ট করে দেয়। রিয়া তথা লৌকিকতাও আমলকে নষ্ট করে দেয়।’**[১৭৬৬] অথচ এ দুটো গুনাহ মহামারীর মতো

১৭৬৫. দেখুন : মানাকিব, মক্কি (৩৭০-৩৭৭)। মানাকিব, বাযযাযি (৩৬৫-৩৭০)।

১৭৬৬. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (২৬)।

আমাদের মাঝে বিদ্যমান। বিশেষত এগুলো ধার্মিক ও আল্লাহভীরু মানুষের মাঝে বেশি বিদ্যমান। আল্লাহর প্রতি ভয় এবং জান্নাত কামনা থেকেই মানুষ একে অন্যের প্রতি ইহসান করে। পরে শয়তানের প্রবঞ্চনায় খোঁটা দিয়ে ফেলে। একইভাবে রিয়া ভালো কাজ ও ইবাদতের মাঝেই বেশি আসে। গুনাহের মাঝে রিয়া নেই। ফলে এই দুটো অপরাধে গুনাহগার ও পাপীদের চেয়ে ধার্মিক লোকেরাই বেশি জড়ায়। অনেক সময় অনেকে অনুভবও করে না কিংবা গুনাহই মনে করে না। এটা আরও ভয়ংকর ব্যাপার। আল্লাহ তায়ালার কাছে আমরা এ ধরনের পাপ থেকে ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইখলাস চাইছি। তিনি হেদায়াতের মালিক এবং তৌফিকদাতা।

আল্লাহ তায়ালার কাছে আমরা দোয়া করছি, তিনি ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. এবং সালাফের সকল ইমামকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে তাদের উত্তম বিনিময় দিন। তাদের পথে আমাদের থাকার তৌফিক দিন। আমৃত্যু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ আকিদার উপর দৃঢ়পদ রাখুন। আমিন।

আল্লাহর অনুগ্রহে সমাপ্ত

তথ্যসূত্র

১. আলামুল হুদা ওয়া আকিদাতু আরবাবিত তুকা, শিহাবুদ্দিন উমর সোহরাওয়ার্দি, পাণ্ডুলিপি, আল-মাকাতাবাহ আল-আম্মাহ- দোহা

২. আওয়ারিফুল মাআরিফ, শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি, মাকতাবাতুস সাকাফাহ আদ-দ্বীনিয়্যাহ, মিশর

৩. আকাউইলুস সিকাত ফি তাবিলিল আসমা ওয়াস সিফাত, যায়নুদ্দিন মারয়ি ইবনে ইউসুফ হাম্বলি, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.

৪. আকিদাতুস সালাফ ওয়া আসহাবুল হাদিস, আবু উসমান ইসমাইল সাবুনি, দারুল আসিমাহ, রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি.

৫. আখবারু আবু হানিফা ওয়া আসহাবিহি, কাযি আবদুল্লাহ সাইমারি, আলামুল কুতুব, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৪০৫ হি.

৬. আত-তানভির শরহুল জামে আস সগির, আমির মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল সানআনি, মাকতাবাতু দারিস সালাম, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি.

৭. আত-তামহিদ ফি বায়ানিত তাওহিদ, আবু শাকুর সালেমি, মাতবা আল ফারুকি, দিল্লি, ১৩০৯ হি.

৮. আত-তামহিদ লিকাওয়ায়িদিত তাওহিদ, মাহমুদ ইবনে যায়েদ লামিশি, দারুল গরব আল-ইসলামি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫

৯. আত-তারিখুল কাবির, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি, দায়িরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়্যাহ, হায়দ্রাবাদ

১০. আত-তাহরির ফি উসুলিল ফিকহ, কামাল ইবনুল হুমাম, মাতবাআতু মুস্তফা আল-বাবি হলবি, মিশর, ১৩৫১ হি.

১১. আত-তাওহিদ, আবু মনসুর আল-মাতুরিদি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি.

১২. আত-তাবসির ফিদ দ্বীন, আবুল মুজাফফর তাহের ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইসফারায়েনি, আলামুল কুতুব, লেবানন, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩ হি.

১৩. আত-তাবসির ফি মাআলিমিদ দ্বীন, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারির তাবারি, দারুল আসিমাহ, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬

১৪. আত-তাবাকাতুল কাবির (তাবাকাতু ইবনে সাদ আল-কুবরা), মুহাম্মাদ ইবনে সাদ, মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি.

১৫. আত-তাবাকাতুস সানিয়্যাহ ফি তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ, তাকিউদ্দিন আল-গাজ্জি, দারুর রিফায়ি

১৬. আত-তামহিদ ফি উসুলিদ্দিন, আবু মুঈন নাসাফি, আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত তুরাস, ২০০৬ ঈ.

১৭. আত-তামহিদ লিমা ফিল-মুওয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল আসানিদ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল বার, উইযারাতু উমুমিল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, মরক্কো, ১৩৮৭ হি.

১৮. আতায়া-আল ফাইয়াজ আল-আকদাম শরহু ওয়াসিয়্যাতিল ইমাম আজম, আবদুর রহিম ইবনে সাইদ (মুফতি যাদাহ), পাণ্ডুলিপি, মাকতাবাতুল গাযি খসরু বেগ
১৯. আদ দুররুল আযহার ফি শরহিল ফিকহিল আকবার, আবদুল কাদের সিলেটি, মাতবা নিযামি, কানপুর, ১২৯৮ হি.
২০. আদিল্লাতু মুতাকাদি আবি হানিফাহ আল-আযাম ফি আবাওয়াইর রাসুল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আলি কারি, মাকতাবাতুল গুরাবা আল-আসারিয়্যাহ, মদিনা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি.
২১. আয যাহরুন নাযির ফি হালিল খিযির, ইবনে হাজার আসকালানি, মাকতাবাতু আহলিল আসার, ২য় প্রকাশ, ১৪২৫ হি.
২২. আর রাওযাতুল বাহিয়্যাহ ফিমা বাইনাল আশায়িরাহ ওয়াল মাতুরিদিয়্যাহ, হাসান ইবনে আবদুল মুহসিন আবু আযবাহ, ১ম প্রকাশ, দায়িরাতুল মাআরিফিন নিযামিয়্যাহ, হায়দ্রাবাদ, ১৩২২ হি.
২৩. আর রাফউ ওয়াত তাকমিল ফিল জারহি ওয়াত তাদিল, আবুল হাসানাত মুহাম্মাদ আবদুল হাই লাখনৌভি, মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়্যাহ
২৪. আর-রাওযুল উনুফ, আবুল কাসেম সুহাইলি, দার ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি.
২৫. আর-রুহ, ইবনুল কাইয়িম, দারুল ফিকরিল আরাবি, বৈরুত, ১৯৯৬ ঈ.
২৬. আল-আকিদাতুত তহাবিয়্যাহ, আবু জাফর তহাবি, দার ইবনে হাযাম, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি.
২৭. আল-আকিদাহ আর-রুকনিয়্যাহ ফি শরহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (শরহু কালিমাতিত তাওহিদ), উবাইদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (রুকনুদ্দিন সমরকন্দি), পাণ্ডুলিপি
২৮. আল আজনাস ফি ফুরুয়িল ফিকহিল হানাফি, আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আবুল আব্বাস নাতেফি, দারুল মাসুর, মদিনা মুনাওয়ারা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৭ হি.
২৯. আল আরবায়িন ফি উসুলিদ্দিন, ফখরুদ্দিন রাযি, মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আযহারিয়্যাহ, কায়রো
৩০. আল-আরাফুশ শাযি শরহু সুনানিত তিরমিযি, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি, দারুত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫
৩১. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, আবু বকর বাইহাকি, দারুল জিল, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি.
৩২. আল-ইতিকাদ, মুহাম্মাদ ইবনে ফযল আল-বলখি, তাহকিক : আয়েজ আদ-দোসরি
৩৩. আল-ইলাম বিকাওয়াতিয়িল ইসলাম, ইবনে হাজার হাইতামি, দারুত তাকওয়া, সিরিয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি.
৩৪. আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, আবু হামেদ গাযালি, দারু কুতাইবা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি.
৩৫. আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, আবু হামেদ গাযালি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি.

৩৬. আল-ইনতিসার ওয়াত তারজিহ লিল মাযহাবিস সহিহ, সিবতু ইবনিল জাওযি, আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত তুরাস, ২০১০ ঈ.
৩৭. আল-ইবানাহ আন উসুলিদ দিয়ানাহ, আবুল হাসান আশআরি, ইদারাতুত তিবাআহ আল-মুনিরিয়্যাহ, ১৩৪৮ হি.
৩৮. আল ইমাম ইবনু মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান, মুহাম্মাদ আবদুর রশিদ নুমানি, মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
৩৯. আল-ইসতিযকার, ইবনে আবদিল বার, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি.
৪০. আল-ইসাবাহ ফি তাময়িযিস সাহাবা, ইবনে হাজার আসকালানি, দারু হাজার, মিশর, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি.
৪১. আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম, আবু মুহাম্মাদ আলি ইবনে হাযাম, দারুল আফাক আল জাদিদাহ, বৈরুত, ১৩৪৭ হি.
৪২. আল-উসুলুল খামসাহ, কাযি আবদুল জাব্বার, তাহকিক : ফয়সাল আউন, মজলিসুন নাশর আল-ইলমি, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮ ঈ.
৪৩. আল-উসুলুল মুনিফাহ লিল ইমাম আবু হানিফা, কামালুদ্দিন বায়াযি, আল-মাকাতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত তুরাস, কায়রো, ২০০৮ ঈ.
৪৪. আল-কওলুল ফাসল শরহুল ফিকহিল আকবার, মুহাম্মাদ বাহাউদ্দিন যাদাহ, দারুল মুনতাখাবিল আরাবি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.
৪৫. আল-কাফি, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব কুলাইনি, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, তেহরান, ৩য় প্রকাশ, ১৩৮৮ (শিয়াসূত্র)
৪৬. আল-কামিল ফিত তারিখ, ইযযুদ্দিন ইবনুল আসির, দারুস সাদের, বৈরুত, ১৩৮৫ হি.
৪৭. আল-কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ, নুরুদ্দিন আস-সাবুনি, দার ইবনে হাযাম, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি.
৪৮. আল-খাইরাতুল হিসান ফি মানাকিবিল ইমাম আজম আবু হানিফা আন নুমান, ইবনে হাজার হাইতামি, দারুল হুদা ওয়ার রাশাদ, দামেশক, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি.
৪৯. আল-গুনইয়াহ লিতালিবি তরিকিল হক, আবদুল কাদের জিলানি, আল-মাতবাআতুল মিসরিয়্যাহ, ১৮৭১ ঈ.
৫০. আল-জাওয়াহিরুল মুযিআহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ, আবদুল কাদের কুরাশি, মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, করাচি
৫১. আল-জাওহারাতুল মুনিফাহ ফি শরহি ওয়াসিয়্যাতিল ইমাম আজম আবু হানিফা, মোল্লা হুসাইন ইবনে ইস্কান্দার হানাফি, ১ম প্রকাশ, দারুল মাআরিফিন নিযামিয়্যাহ, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩২১ হি. [সমরকন্দির শরহুল ফিকহিল আকবার (যা মূলত আবাসত)-এর সঙ্গে সংযুক্ত]
৫২. আল-ফাতাওয়া আল-হামাবিয়্যাহ আল-কুবরা, ইবনে তাইমিয়্যাহ, দারুস সুমাইয়ি, রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৫ হি.

৫৩. আল-ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, ইবনে হাযাম আন্দালুসি, মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো
৫৪. আল-ফিহরিসত, আবুল ফরয ইবনুন নাদিম, দারুল মারিফাহ, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭ হি.
৫৫. আল বাদউ ওয়াত তারিখ, মুতাহহার আল-মাকদিসি, মাকতাবাতুস সাকাফাহ আদ-দ্বীনিয়্যাহ, পোর্ট সাইদ
৫৬. আল-বাহরুর রায়েক শরহু কানযিদ দাকায়েক, যাইনুদ্দিন ইবনু নুজাইম, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.
৫৭. আল-বিদায়াহ মিনাল কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ, নুরুদ্দিন সাবুনি, দারুল মাআরিফ, মিশর, ১৯৬৯ ঈ.
৫৮. আল-বুরহান ফি বায়ানিল কুরআন, মুওয়াফ্ফাক উদ্দিন ইবনে কুদামা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি. (আল-মিহনাহ আলাল ইমাম আহমদ গ্রন্থের সঙ্গে সংযুক্ত)
৫৯. আল-মাওয়াকিফ ফি ইলমিল কালাম, আজুদুদ্দিন ইজি, আলামুল কুতুব, বৈরুত
৬০. আল-মাকসিদুল আসনা ফি শরহি মাআনি আসমায়িল্লাহিল হুসনা, আবু হামেদ গাযালি, আল-জাফফান ওয়াল জাবি, সাইপ্রাস, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭
৬১. আল-মানখুল মিন তালিকাতিল উসুল, আবু হামেদ গাযালি, দারুল ফিকরিল মুআসির, বৈরুত, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
৬২. আল-মানারুল মুনিফ ফিস সহিহ ওয়ায যয়িফ, শামসুদ্দিন ইবনুল কাইয়িম, তাহকিক : আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, মাকতাবাতুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ, হলব, ১ম প্রকাশ, ১৩৯০ হি.
৬৩. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, আবদুল করিম শাহরাস্তানি, মুআসসাসাতুল হলবি
৬৪. আল-মুফরাদাত ফি গরিবিল কুরআন, রাগেব আস্ফাহানি, দারুল কলম, দামেশক, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি.
৬৫. আল-মুসতাওয়িব, নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ সামেরি, মক্কা মুকাররমা, ১৪২৪ হি.
৬৬. আল-মুসায়ারাহ ফি ইলমিল কালাম, কামাল ইবনুল হুমাম, আল-মাতবাআতুল মাহমুদিয়্যাহ, মিশর, ১ম প্রকাশ
৬৭. আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, খলিল আহমদ সাহারানপুরি, নাফিস মঞ্জিল, লাহোর
৬৮. আল-মুহিতুল বুরহানি ফিল ফিকহিন নুমানি, বুরহানুদ্দিন মাহমুদ ইবনে মাযাহ বুখারি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি.
৬৯. আল-হাদি ফি উসুলিদ্দিন, জালালুদ্দিন উমর খাব্বাযি, ইস্তাম্বুল, ২০০৬ ঈ.
৭০. আল-হাভি লিল ফাতাওয়া, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২৪ হি.
৭১. আল-আকিদাতুল হাসানাহ, ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি, ফরিদ বুকস্টল, লাহোর
৭২. আল-আকিদাহ আন-নিযামিয়্যাহ, আবুল মাআলি জুয়াইনি, দারু সাবিলির রাশাদ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি.

৭৩. আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ, আবদুল্লাহ ইবনে মুফলিহ, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি.

৭৪. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম, রিসালাতু আবি হানিফা ইলা উসমান আল-বাত্তি, আল-ফিকহুল আবসাত, মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো, ১৩৬৮ হি.

৭৫. আল-আসল (মাবসুত), মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানি, উইযারাতুল আওকাফ, কাতার, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি.

৭৬. আল-আসামি ওয়াল কুনা, আহমদ আল-হাকেম, দারুল গুরাবা আল-আসারিয়্যাহ, মদিনা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪ ঈ.

৭৭. আল-আসার (কিতাবুল আসার), আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত

৭৮. আল-আসার (কিতাবুল আসার), মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানি, দারুন নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি.

৭৯. আল-আসারুল মারফুআহ ফিল আখবারিল মাওযুআহ, আবদুল হাই লাখনৌভি, মাকতাবাতুশ শারকিল জাদিদ, বাগদাদ

৮০. আল-ইতিকাদ, আবুল আলা সায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ নিশাপুরি, তাহকিক : ড. সাইয়েদ বাগজাওয়ান

৮১. আল-ইতিসাম, ইবরাহিম ইবনে মুসা শাতেবি, দার ইবনিল জাওযি, সৌদি আরব, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি.

৮২. আল-ইখতিলাফ ফিল লফজ, আবু মুহাম্মাদ ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি, দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি.

৮৩. আল-ইনতিকা ফি ফাযায়িলিস সালাসাহ আল-ফুকাহা, আবু উমর ইউসুফ ইবনে আবদিল বার, মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ, হলব

৮৪. আল-ইমতা বিসিরাতিল ইমামাইন হাসান ইবনে যিয়াদ ও মুহাম্মাদ ইবনে শুজা', যাহেদ কাওসারি, আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত তুরাস

৮৫. আল-ইস্তিগাসাহ ফি বিদায়িস সালাসাহ, আলি ইবনে আহমদ আবুল কাসেম কুফি, মুআসসাসাতুল আলামি, তেহরান, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৩ (শিয়াসূত্র)

৮৬. আল-ঈমান, আবু বকর বাইহাকি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৪১০ হি.

৮৭. আল-ওয়াসিয়্যাহ, আবু হানিফা নুমান ইবনু সাবিত, দার ইবনে হাযাম, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.

৮৮. আল-কামিল ফি যুআফায়ির রিজাল, আবু আহমদ ইবনে আদি, আল-কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.

৮৯. আল-কালাইদ ফি শরহিল আকাইদ, মাহমুদ ইবনে আহমদ কওনভি, পাণ্ডুলিপি, মাকতাবাতুল হারামিল মক্কি আশ শরিফ

৯০. আল-কাশশাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিযিত তানযিল, জারুল্লাহ যমখশারি, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৭ হি.

৯১. আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, ইবনে তাইমিয়্যাহ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি.
৯২. আল-ফাতাওয়াল আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুবরা, ইবনে হাজার হাইতামি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি.
৯৩. আল-ফিকহুল আকবার, আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবিত, দারুল মাআরিফিল উসমানিয়্যাহ, হায়দ্রাবাদ, ৩য় প্রকাশ, ১৩৯৯
৯৪. আল-ফিকহুল আকবার, আবু হানিফা, হাম্মাদের রেওয়ায়েত, পাণ্ডুলিপি, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি
৯৫. আলফিয়াতুল ইরাকি (আত-তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ ফি উলুমিল হাদিস), মাকতাবাতু দারিল মিনহাজ, রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৮ হি.
৯৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির, দারু হাজর, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.
৯৭. আল-বুরহানুল মুআইয়াদ, আহমদ রিফায়ি, তাহকিক : আবদুল গনি
৯৮. আল-মাজরুহিন মিনাল মুহাদ্দিসিন, ইবনে হিব্বান, দারুস সুমাইয়ি, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি.
৯৯. আল-মাবসুত, মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ সারাখসি, দারুল মারিফাহ, বৈরুত, ১৪১৪ হি.
১০০. আল-মুগির আলাল আহাদিসিল মাওযুআহ ফিল জামিয়িস সগির, আহমদ গুমারি, দারুল মাশারি, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি.
১০১. আল-মুনতাযাম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম, আবুল ফরজ ইবনুল জাওযি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি.
১০২. আল-মুসামারাহ শরহুল মুসায়ারাহ, কাসেম ইবনে কুতলুবুগা, আল মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত তুরাস, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ২০০৬ হি.
১০৩. আল-হিদায়াহ ফি শরহি বিদায়াতিল মুবতাদি, বুরহানুদ্দিন মারগিনানি, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত
১০৪. আল-হুজ্জাহ ফি বয়ানিল মাহাজ্জাহ, ইসমাইল ইবনে মুহাম্মাদ (কিওয়ামুস সুন্নাহ), দারুর রায়াহ, রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
১০৫. আশ-শরিয়াহ, আবু বকর আল-আজুররি, দারুল ওয়াতান, রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি.
১০৬. আশ-শিফা বিতারিফি হুকুকিল মুস্তফা, কাযি ইয়ায ইবনে মুসা, দারুল ফিকর, ১৪০৯ হি.
১০৭. আস-সাইফুল মাশহুর ফি আকিদাতি আবি মনসুর, তাজুদ্দিন সুবকি, ইস্তাম্বুল, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি.
১০৮. আস-সাওয়াদুল আজম, অজ্ঞাত লেখক, দারুত তিবাআহ আল-আমিরাহ, কায়রো, ১২৫৩ হি.
১০৯. আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ আলা আহলির রাফজি ওয়ায যলাল ওয়ায যানদাকাহ, আহমদ ইবনে হাজার হাইতামি, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, লেবানন, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি.

১১০. আস-সাবেক ওয়াল লাহেক ফি তাবাউদি মা বাইনা ওফাতি রাবিয়াইনি আন শাইখিন ওয়াহিদ, আবু বকর খতিবে বাগদাদি, দারুস সুমাইয়ি, রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৪২১ হি.
১১১. আস-সুন্নাহ, আবু বকর ইবনে আবি আসেম, দারুস সুমাইয়ি, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
১১২. আস-সুন্নাহ, আবু বকর খাল্লাল, দারুর রায়াহ, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি.
১১৩. আস-সুন্নাহ, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল, তাহকিক : আদেল আলে হামদান, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি.
১১৪. আহওয়ালুর রিজাল, ইবরাহিম ইবনে ইয়াকুব (আবু ইসহাক) জুযজানি, হাদিস অ্যাকাডেমি, ফয়সালাবাদ
১১৫. আহকামুল কুরআন, আবু বকর রাযি আল-জাসসাস, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১৪০৫ হি.
১১৬. ইকফারুল মুলহিদিন ফি জরুরিয়্যাতিদ দ্বীন, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি, দারুল বাশায়ের আল-ইসলামিয়্যাহ
১১৭. ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন বিশারহি ইহইয়ায়ি উলুমিদ্দিন, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ মুরতাযা যাবিদি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
১১৮. ইলজামুল আওয়াম আন ইলমিল কালাম, আবু হামেদ গাযালি, দারুল মিনহাজ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৯ হি.
১১৯. ইশারাতুল মারাম আন ইবারাতিল ইমাম, কামালুদ্দিন আহমদ বায়াযি, যমযম পাবলিশার্স, করাচি, ১ম প্রকাশ, ২০০৪ ঈ.
১২০. ইসবাতুল হদ লিল্লাহ, মাহমুদ ইবনে আবিল কাসিম দাশতি, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি.
১২১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, আবু হামেদ গাযালি, দারুল মারিফাহ, বৈরুত
১২২. উকুদুল জুমান ফি মানাকিবিল ইমাম আজম আবু হানিফা আন-নুমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সালেহি, তাহকিক : মোল্লা আবদুল কাদের আফগানি, মাস্টার্স থিসিস, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা, ১৩৯৮ হি.
১২৩. উমদাতু আকিদাতি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, হাফিজুদ্দিন আবুল বারাকাত নাসাফি, উইলিয়াম কিউরটন, লন্ডন
১২৪. উমদাতুল কারি শরহু সহিহিল বুখারি, বদরুদ্দিন আইনি, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত
১২৫. উসুলু ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, হিবাতুল্লাহ লালাকায়ি, দারু তাইবা, সৌদি আরব, ৮ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি.
১২৬. উসুলুদ্দিন, আবুল ইউসর বাযদাবি, আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত তুরাস, কায়রো, ১৪২৪ হি.
১২৭. উসুলুদ্দিন, আবদুল কাহের বাগদাদি, মাদরাসাতুল ইলাহিয়্যাহ (দারুল ফুনুন), ইস্তাম্বুল, ১ম প্রকাশ, ১৩৪৬ হি.
১২৮. উসুলুদ্দিন, জামালুদ্দিন আহমদ গযনবি, দারুল বাশায়ের আল-ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.

১২৯. উসুলুস সারাখসি, মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ সারাখসি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি.

১৩০. কাওয়ায়িদু ফি উলুমিল হাদিস, যফর আহমদ উসমানি, দারুল কলম, বৈরুত, ৩য় প্রকাশ, ১৩৯২ হি.

১৩১. কানযুল ওয়াসুল ইলা মারিফাতিল উসুল (উসুলুল বাযদাবি), ফখরুল ইসলাম বাযদাবি, মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, করাচি

১৩২. কালায়িদু উকুদিদ দুরার ওয়াল ইকইয়ান ফি মানাকিবি আবু হানিফাহ আন-নুমান, আবুল কাসেম ইবনে আবদুল আলিম আল-ইয়ামানি, পাণ্ডুলিপি, আরেফ হিকমত লাইব্রেরি, মদিনা

১৩৩. কাশফুল আসরার শরহু উসুলিল বাযদাবি, আলাউদ্দিন বুখারি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.

১৩৪. কাশফুল আসরার শরহুল মানার, হাফিজুদ্দিন আবুল বারাকাত নাসাফি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত

১৩৫. কাশফুল আসারিশ শরিফাহ ফি মানাকিবিল ইমাম আবি হানিফা, আবু মুহাম্মাদ হারেসি, মাকতাবাতুল ইরশাদ, ইস্তাম্বুল, ১ম প্রকাশ, ১৪৪১ হি.

১৩৬. কাশফুল খাফা ওয়া মুযিলুল ইলবাস, ইসমাইল আল-আজলুনি, আল-মাকাতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০

১৩৭. কাশশাফুল কিনা আন মাতনিল ইকনা, মনসুর ইবনে ইউনুস বাহুতি, উইযারাতুল আদল, সৌদি আরব, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি.

১৩৮. কিতাবুস সিফাত, আবুল হাসান আলি আদ-দারাকুতনি, আবদুল্লাহ গুনাইমান, মাকতাবাতুদ দার, মদিনা মুনাওয়ারা, ১ম প্রকাশ, ১৪০২ হি.

১৩৯. খালকু আফআলিল ইবাদ ওয়ার রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ ওয়া আসহাবিত তাতিল, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারি, দারু আতলাসিল খাযরা, ১ম প্রকাশ, ২০০৫ ঈ.

১৪০. খিযানাতুর রিওয়ায়াত, কাযি জগন হানাফি গুজরাটি, পাণ্ডুলিপি, খানকাহ আহমদিয়্যাহ

১৪১. গামযু উয়ুনিল বাসায়ের ফি শরহিল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, শিহাবুদ্দিন হামাভি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি.

১৪২. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল বার, দার ইবনিল জাওযি, সৌদি আরব, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪

১৪৩. জামেউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন (তাফসিরে তাবারি), ইবনে জারির তাবারি, তাহকিক : আহমদ মুহাম্মাদ শাকের, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি.

১৪৪. জামেউল মাসানিদ, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-খাওয়ারযেমি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

১৪৫. জামেউল মুতুন, আহমদ ইবনে মুস্তফা গুমুশখানভি, দারুত তিবাআহ আল-আমেরাহ, ১২৭৩ হি.

১৪৬. জুমাল মিন উসুলিদ্দিন, আবু সালামাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ সমরকন্দি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪৩৬ হি.

১৪৭. যুহাল ইসলাম, আহমদ আমিন, আল-হাইআ আল-মিসরিয়্যাহ আল-আম্মা লিল-কিতাব, মিশর, ২০০৩ ঈ.
১৪৮. তাজুত তারাজিম, আবু ফিদা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা, দারুল কলম, দামেশক, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি.
১৪৯. তাদরিবুর রাবি ফি শরহি তাকরিবিন নববি, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, দারু কুতাইবা
১৫০. তাফসিরে ইবনে কাসির, ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
১৫১. তাফসিরে কুরতুবি, শামসুদ্দিন কুরতুবি, দারু আলামি কুতুব, রিয়াদ, ১৪২৩ হি.
১৫২. তাফসিরে বায়যাবি (আনওয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারুত তাবিল) নাসিরুদ্দিন বায়যাবি, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.
১৫৩. তাফসিরে মাতুরিদি (তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ, আবু মনসুর আল-মাতুরিদি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি.
১৫৪. তাফসিরে মাযহারি, সানাউল্লাহ পানিপথি, মাকতাবাতুর রুশদিয়্যাহ, পাকিস্তান, ১৪১২ হি.
১৫৫. তাবয়িযুস সহিফাহ বিমানাকিবি আবি হানিফা, জালাল উদ্দিন সুয়ুতি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১০
১৫৬. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ ফি উসুলিদ্দিন, আবুল মুঈন মাইমুন নাসাফি, আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত তুরাস, আযহার, ১ম প্রকাশ, ২০১১ ঈ.
১৫৭. তাবাকাতুল ফুকাহা, আবু ইসহাক শিরাজি, দারুর রায়েদ আল-আরাবি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৯৭০ ঈ.
১৫৮. তাবাকাতুশ শাফেইয়্যাহ আল-কুবরা, তাজুদ্দিন ইবনে তাকি উদ্দিন সুবকি, হাজর লিত তিবাআহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৩ হি.
১৫৯. তাযকিরাতুল মাওযুআত, মুহাম্মাদ তাহের ইবনে আলি আল-পাট্টানি, ইদারাতুত তিবাআহ আল-মুনিরিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৪৩ হি.
১৬০. তারিখুল আদাবিল আরাবি, কার্ল ব্রুকলম্যান, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ৩য় প্রকাশ
১৬১. তারিখে খলিফা ইবনে খাইয়াত, আবু আমর খলিফা ইবনে খাইয়াত, দারুল কলম, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৭ হি.
১৬২. তারিখে তাবারি (তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক), মুহাম্মাদ ইবনে জারির তাবারি, দারুত তুরাস, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৩৮৭
১৬৩. তারিখে বাগদাদ, আবু বকর আহমদ খতিবে বাগদাদি, তাহকিক : বাশার আওয়াদ মারুফ, দারুল গারব আল-ইসলামি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.
১৬৪. তালখিসুল আদিল্লাহ লিকাওয়াইদিত তাওহিদ, আবু ইসহাক সাফফার বুখারি, আল-মা'হাদুল আলমানি লিল আবহাস আশ-শারকিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি.
১৬৫. তাহযিবুত তাহযিব, ইবনে হাজার আসকালানি, মাতবাআতু দায়িরাতিল মাআরিফিন নিযামিয়্যাহ, ভারত, ১ম প্রকাশ, ১৩২৬
১৬৬. তাহযিবুল আসার, মুহাম্মাদ ইবনে জারির তাবারি, মাতবাআতুল মাদানি, কায়রো

১৬৭. তাহযিবুল খাসায়িসিন নাবাবিয়্যাতিল কুবরা, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, দারুল বাশায়ের ইসলামিয়্যাহ, মাগরিব, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.

১৬৮. তুহফাতুল মুলুক, যয়নুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবি বকর রাযি, দারুল ফারুক

১৬৯. দাফউ শুবাহি মান শাব্বাহা ওয়া তামাররাদা, তাকিউদ্দিন হিসনি, আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত তুরাস, কায়রো

১৭০. দালায়েলুন নুবুওয়্যাহ, আবু বকর বাইহাকি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি.

১৭১. দুরারুল হুক্কাম শরহু গুরারিল আহকাম, মুহাম্মাদ মোল্লা খসরু, দারু ইহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ

১৭২. নকজুদ দারেমি আলাল মারিসি, উসমান ইবনে সাইদ দারেমি, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩

১৭৩. নাকজুদ দারেমি আল-বিশর আল-মারিসি, উসমান ইবনে সাইদ দারেমি, মাকতাবাতুর রুশদ, সৌদি আরব, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮

১৭৪. নাজমুল ফারায়িদ ওয়া জামউল ফাওয়ায়িদ, আবদুর রহিম ইবনে আলি শায়খ যাদাহ, আল-মাতবাআতুল আদাবিয়্যাহ, মিশর, ১ম প্রকাশ, ১৩১৭ হি.

১৭৫. নুখবাতুল ফিকার ফি মুস্তালাহি আহলিল আসার, ইবনে হাজার আসকালানি, দারুল হাদিস, কায়রো, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯৭ ঈ.

১৭৬. নুরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ, হাসান ইবনে আম্মার শুরুম্বুলালি, দারুল হিকমাহ, দামেশক

১৭৭. ফয়যুল কাদির, আবদুর রউফ মুনাভি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত

১৭৮. ফয়যুল বারি আলা সহিহিল বুখারি, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি, সংকলন : বদরে আলম মিরাঠি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি.

১৭৯. ফাযায়িলু আবি হানিফা ওয়া আখবারুহু ওয়া মানাকিবুহু, আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইবনে আবিল আওয়াম, আল-মাকতাবাতুল ইমদাদিয়্যাহ, মক্কা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি.

১৮০. ফাতহুল কাদির, কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম, দারুল ফিকর

১৮১. ফাতহুল বারি শরহু সহিহিল বুখারি, ইবনে হাজার আসকালানি, দারুল মারিফাহ, বৈরুত, ১৩৭৯ হি.

১৮২. ফাতহুল মুলহিম বিশারহি সহিহিল ইমাম মুসলিম, শাব্বির আহমদ উসমানি, দারুল বাইযা, কুয়েত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬

১৮৩. ফাতাওয়া আলমগিরি (আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ), দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ, ১৩১০ হি.

১৮৪. ফাতাওয়া ইবনিস সালাহ, তাকিউদ্দিন ইবনুস সালাহ, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি.

১৮৫. ফাতাওয়া কাযিখান, হাসান ইবনে মনসুর কাযিখান, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ২০০৯ ঈ.

১৮৬. ফাতাওয়া তাতারখানিয়্যাহ, ফরিদুদ্দিন আলম ইবনুল আলা দেহলভি, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১
১৮৭. ফাতাওয়া রমলি, শিহাবুদ্দিন রমলি শাফেয়ির ফাতাওয়া, সংকলন : শামসুদ্দিন রমলি, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ
১৮৮. ফাতাওয়া রশিদিয়া, রশিদ আহমদ গঙ্গুহি, দারুল ইশাআত, করাচি
১৮৯. ফাতাওয়া সিরাজিয়্যাহ, সিরাজুদ্দিন উশি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ (ও দারুল উলুম যাকারিয়া), ১৪৩২ হি.
১৯০. বাদায়েউস সানায়ে, আলাউদ্দিন কাসানি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬ হি.
১৯১. বাহরুল কালাম, আবুল মুঈন নাসাফি, মাকতাবাতু দারিল ফারফুর,২য় প্রকাশ, ১৪২১ হি.
১৯২. মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন ওয়া ইখতিলাফুল মুসল্লিন, আবুল হাসান আশআরি, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি.
১৯৩. মাকালাতুল কাওসারি, মুহাম্মাদ যাহেদ কাওসারি, আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, কায়রো
১৯৪. মাজমাউল আনহুর ফি শরহি মুলতাকাল আবহুর, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ দামাদ আফেন্দি, দার ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি
১৯৫. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ, তাহকিক : আবদুর রহমান ইবনে কাসিম, মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা মুনাওয়ারা, ১৪১৬ হি.
১৯৬. মাদারিকুন তানযিল ওয়া হাকায়িকুত তাবিল, হাফিজুদ্দিন নাসাফি, দারুল কালিমিত তাইয়িব, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯
১৯৭. মানাকিবু আবী হানিফা, মুওয়াফফাক আল-মক্কি, মুহাম্মাদ বাযযাযি, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, ১৪০১ হি.
১৯৮. মানাকিবুল ইমাম আবি হানিফাহ ওয়া সাহিবাইহি, শামসুদ্দিন যাহাবি, লাজনাতু ইহইয়ায়িল মাআরিফিন নুমানিয়্যাহ, হায়দ্রাবাদ, ৩য় প্রকাশ (বৈরুত), ১৪০৮ হি.
১৯৯. মানাকিবুল ইমাম আহমদ, আবুল ফরজ ইবনুল জাওযি, দারু হাজর, ২য় প্রকাশ, ১৪০৯ হি.
২০০. মানাকিবুশ শাফেয়ি, আবু বকর বাইহাকি, মাকতাবাতু দারিত তুরাস, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৩৯০ হি.
২০১. মারিফাতুল হুজাজ আশ-শরইয়াহ, আবুল ইউসর বাযদাবি, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি.
২০২. মাসায়িলুল ইমাম আহমদ, রিওয়াইয়াতু আবি দাউদ, দারুল মারিফাহ, ১৩৫৩ হি.
২০৩. মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার, শিহাবুদ্দিন আল-উমরি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ২০১০ ঈ.

২০৪. মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ ফি নকযি কালামিশ শিয়াহ আল-কাদারিয়্যাহ, আহমদ ইবনে তাইমিয়্যাহ, জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.
২০৫. মিনাহুর রাওযিল আযহার ফি শরহিল ফিকহিল আকবার, মোল্লা আলি কারি, দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ আল-কুবরা, মিশর
২০৬. মিযানুল ইতিদাল, শামসুদ্দিন যাহাবি, মুআসসাসাতুর রিসালাহ আল-আলামিয়্যাহ, দামেশক, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি.
২০৭. মুঈদুন নিআম ওয়া মুবিদুন নিকাম, তাজুদ্দিন সুবকি, মুআসসাসাতুল কুতুব আস-সাকাফিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি.
২০৮. মুখতাসারুল ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ, আবুল মাহাসিন মুহাম্মাদ কাওকজি, মুআসসাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি.
২০৯. মুখতাসারুল হিকমাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, ইসহাক হাকিম আর-রুমি (পাণ্ডুলিপি)
২১০. মুলজিমাতুল মুজাসসিমাহ, আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ বুখারি, দারুয যাখায়েন, বৈরুত
২১১. মুসনাদে আহমদ, আহমদ ইবনে হাম্বল, দারুল মিনহাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি.
২১২. যাখায়িরুল উকবা ফি মানাকিবি যাবিল কুরবা, মুহিব্বুদ্দিন তাবারি, মাকতাবাতুল কুদসি, কায়রো, ১৩৫৬ হি.
২১৩. যাম্মুল কালাম ওয়া আহলিহি, আবু ইসমাইল হারাভি, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.
২১৪. রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, মুহাম্মাদ আমিন ইবনে আবিদিন, দারুল ফিকর, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৪১২ হি.
২১৫. রাসায়িলুল ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি, রাশেদ খলিলি, আল-মাকাতাবা আল-আসরিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি.
২১৬. রাসায়েল ফিত তাওহিদ, ইয ইবনে আবদিস সালাম, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি.
২১৭. রাসায়েলে ইবনে কামাল পাশা, শামসুদ্দিন আহমদ ইবনে কামাল পাশা, মাতবাআতু ইকদাম, দারুল খিলাফাহ, ১৩১৯ হি.
২১৮. রিসালাতুত তানযিহাত, মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর মারআশি (সাচকলি যাদাহ), ইস্তাম্বুল, ২০২০ ঈ.
২১৯. রিসালাতুল কাযা ওয়াল কাদার, ইসামুদ্দিন আহমদ তাশকুবরা যাদাহ, জুমাল প্রকাশনি
২২০. রিসালাতুস সুরুর ওয়াল ফারাহ, মুহাম্মাদ আল-মারআশি (১১৫০ হি.)। পাণ্ডুলিপি। কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ
২২১. রিসালাহ ইলা আহলিস সাগর, আবুল হাসান আশআরি, জামিয়া ইসলামিয়্যাহ, মদিনা মুনাওয়ারা, ১৪১৩ হি.
২২২. রিসালাহ ফিল ইতিকাদ, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আলা বুখারি, দারুয যিয়া, কুয়েত
২২৩. রুহুল বায়ান, ইসমাইল হাক্কি ইস্তাম্বুলি, দারুল ফিকর, বৈরুত

২২৪. রুহুল মাআনি ফি তাফসিরিল কুরআনিল আজিম, শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আলুসি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি.
২২৫. লাওয়ামিউল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ, মুহাম্মাদ আস-সাফারিনি, মুআসসাসাতুল খাফিকাইন, দামেশক, ৩য় প্রকাশ, ১৪০২
২২৬. লিসানুল মিযান, ইবনে হাজার আসকালানি, দারুল বাশায়ের আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ২০০২ হি.
২২৭. লুবাবুল কালাম (তাসহিহুল ইতিকাদ ফি উসুলিদ্দিন), আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল হামিদ উসমান্দি সমরকন্দি, পাণ্ডুলিপি
২২৮. শরহু ওয়াসিয়্যাতিল ইমাম আবি হানিফা, আকমাল উদ্দিন বাবিরতি, দারুল ফাতহ, ১ম প্রকাশ, ২০০৯ ঈ.
২২৯. শরহু জাওহারাতিত তাওহিদ, ইবরাহিম বাইজুরি, ১৩৯১ হি.
২৩০. শরহু মুশকিলিল আসার, আবু জাফর তহাবি, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি.
২৩১. শরহু মুসনাদে আবি হানিফা, আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবেত, মোল্লা আলি কারি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি.
২৩২. শরহুল আকায়েদ আন-নাসাফিয়্যাহ, সাদুদ্দিন মাসউদ তাফতাযানি, মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আযহারিয়্যাহ, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭ হি.
২৩৩. শরহুল আকিদাহ তহাবিয়্যাহ, সদরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবিল ইয, উইযারাতুল আওকাফ, সৌদি আরব, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.
২৩৪. শরহুল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম, আবু বকর ইবনে ফওরক, মাকতাবাতুস সাকাফাহ আদ-দ্বীনিয়্যাহ, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি.
২৩৫. শরহুল ফিকহিল আকবার (আবসাত), আবুল লাইস সমরকন্দি, দারুল মাআরিফিন নিযামিয়্যাহ, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩২১ হি.
২৩৬. শরহুল ফিকহিল আকবার, আবুল মুনতাহা আল-মাগনিসাভি, ১ম প্রকাশ, দারুল মাআরিফিন নিযামিয়্যাহ, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩২১ হি. [সমরকন্দির শরহুল ফিকহিল আকবার (যা মূলত আবাসত)-এর সঙ্গে সংযুক্ত]
২৩৭. শরহুল মাওয়াকিফ, আলি ইবনে মুহাম্মাদ মীর শরিফ জুরজানি, মাতবাআতুস সাআদাহ, মিশর
২৩৮. শরহুল মাকাসিদ ফি ইলমিল কালাম, সাদুদ্দিন মাসউদ তাফতাযানি, দারুল মাআরিফিন নুমানিয়্যাহ, ১৪০১ হি.
২৩৯. শরহুশ শিফা, আলি ইবনে সুলতান কারি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি.
২৪০. শরহে মুসলিম (আল-মিনহাজ শরহু সহিহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ) ইয়াহইয়া ইবনে শরফ নববি, দার ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২ হি.
২৪১. শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব, ইবনুল ইমাদ হাম্বলি, দারু ইবনে কাসির, দামেশক, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.

২৪২. সহিহ বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারি, দারু তাওকিন নাজাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.

২৪৩. সহিহ মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ কুশাইরি, দারুল জিল, বৈরুত, ১৩৩৪ হি.

২৪৪. সাদাদুদ দ্বীন ওয়া সিদাদুদ দাইন ফি ইসবাতিন নাজাত ওয়াদ দারাজাত লিল ওয়ালিদাইন, সাইয়েদ মুহাম্মদ ইবনে রাসুল বারযানজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ২০০৬ ঈ.

২৪৫. সালামুল আহকাম আলা সাওয়াদিল আজম, ইবরাহিম হুলমি, বৈরুত (?), ১৩১৩ হি.

২৪৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা, শামসুদ্দিন যাহাবি, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৫ হি.

২৪৭. সিরাতুন নুমান, শিবলি নুমানি, মাতবা মুফিদে আম, আগ্রা, ২য় প্রকাশ, ১৮৯২ ঈ.

২৪৮. সুনানে আবি দাউদ, আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস সিজিস্তানি, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত

২৪৯. সুনানে ইবনে মাজা, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ (ইবনে মাজা), দারুর রিসালাহ আলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি.

২৫০. সুনানে তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযি, দারুল গরব আল-ইসলামি, বৈরুত, ১৯৯৬ : ১৯৯৮ ঈ.

২৫১. সুনানে নাসায়ি, আহমদ ইবনে শুআইব আন-নাসায়ি, দারুল মারিফাহ, বৈরুত, ১৪২৮ হি.

২৫২. হাশিয়াতুত তাহতাভি আলা মারাকিল ফালাহ শরহু নুরিল ইযাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ তাহতাভি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.

২৫৩. হাশিয়াতুস সুয়ুতি আলা সুনানিন নাসায়ি, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, মাকতাবাতুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ, হলব, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬ হি.

২৫৪. হিদায়াতুল মুরিদ লিজাওহারাতিত তাওহিদ, ইবরাহিম লাকানি মালেকি, দারুল বাসায়ের, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি.

২৫৫. হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, আবু নুআইম আল-আস্ফাহানি, দারুস সাআদাহ, মিশর, ১৩৯৪ হি.